সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

ন্যায়দর্শন

(গৌতমসূত্র)

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

ও

বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত

প্রথম খণ্ড

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক
অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

:০:

কলিকাতা, ২৪৩।১ নং আপার সাকু্লার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩২৪

মূল্য—
সদস্য পক্ষে— ১৷৷৹
শাখা-সভার
সদস্য পক্ষে— ২৲
সাধারণ পক্ষে— ২৷৷৹

ভূমিকা

ন্যায়দর্শনের পরিচয় ও প্রয়োজনাদি

যে ষড়্দর্শন পুণ্যতীর্থ ভারতের অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-জ্ঞানগৌরবের গৌরবময়, বিস্ময়ময় বিজয়-পতাকারূপে আজিও দীর্ঘদর্শীকে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র লীলা দর্শন করাইতেছে, ন্যায়দর্শন তাহারই অন্যতম দর্শনশাস্ত্র। জীবের পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভে আত্মাদি পদার্থের যে দর্শন বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার চরম কর্ত্তব্য ও পরম কর্ত্তব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহার জন্য প্রথমে শাস্ত্র-দ্বারা আত্মাদি পদার্থের শ্রবণরূপ উপাসনা, তাহার পরে হেতুর দ্বারা মনন অর্থাৎ যথার্থ অনুমান-রূপ উপাসনা, তাহার পরে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যানাদিরূপ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে[1], ন্যায়শাস্ত্র ঐ আত্মাদি দর্শনের সাধন-মননরূপ দ্বিতীয় উপাসনা নির্ব্বাহরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হওয়ায় দর্শনশাস্ত্র নামেও অভিহিত হইয়াছে। আত্মাদি পদার্থের শ্রবণের পরে যুক্তির দ্বারা তাহার যে "ঈক্ষা" বা মনন অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মতরূপে অনুমান, তাহাকে "অন্বীক্ষা" বলে। এই অন্বীক্ষা নির্ব্বাহের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহা "আন্বীক্ষিকী" নামে অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী অনুমানকে "অন্বীক্ষা" বলে, "ন্যায়"ও বলে। ঐ অন্বীক্ষা বা ন্যায়ের জন্য অর্থাৎ উহাতে যে সকল পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, তাহা সম্পাদন করিয়া উহা নির্ব্বাহের জন্য যে বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ জন্য আন্বীক্ষিকী বলে, ন্যায়-বিদ্যা বলে, ন্যায়শাস্ত্র বলে; এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্ম-বিদ্যা। এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের নিরূপণ করিয়াছে, তর্কশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে; এ জন্য ইহাকে তর্কবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রও বলে। ইহা "ন্যায়" ও "তর্ক" নামেও উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ অক্ষপাদ মহর্ষি-সূত্রগ্রন্থের দ্বারা এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি ইহার স্রষ্টা নহেন। আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বেদাদি বিদ্যার ন্যায় বিশ্বস্রষ্টার অনুগ্রহ-দান। মহাভারতে পাওয়া যায়, নীতি, ধর্ম্ম ও সদাচারের প্রতিষ্ঠার জন্য দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ম্ভু ভগবান্ শত সহস্র অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি বহু বিষয় এবং ত্রয়ী, আন্বীক্ষিকী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্ব্বিধ বিপুল বিদ্যা দর্শিত হইয়াছে[2]। ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন যে, প্রাণিগণ বা মানবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য (ত্রয়ী প্রভৃতি) এই চারিটি বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাদিগের মধ্যে চতুর্থী এই আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা। শ্রীমদ্-

---

১। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।—বৃহদারণ্যক।২।৪।৫। শ্রোতব্যঃ পূর্ব্বমাচার্য্যত আগমতশ্চ। পশ্চান্মন্তব্যস্তর্কতঃ।—শঙ্করভাষ্য।

২। ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ। দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ॥—শান্তিপর্ব্ব।৫৯।৩৩।

ভাগবতে পাওয়া যায়, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা এবং ব্যাহৃতি ও প্রণব বিশ্বস্রষ্টার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে[১]। তাই বলিয়াছি, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিশ্বস্রষ্টার অনুগ্রহ-দান। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায়, কোন সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাপ্রার্থী হইলে, সনৎকুমার বলিলেন, "তুমি কি কি বিদ্যা জান, তাহা অগ্রে বল; তাহার পরে তোমার অজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ করিব।" তদুত্তরে নারদ বলিলেন,—"আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ জানি, পঞ্চম বেদ ইতিহাস, পুরাণও জানি এবং ঐ সমস্ত বেদের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রও জানি। পিত্র্য (শ্রাদ্ধকল্প), রাশি (গণিত), দৈব (উৎপাতবিদ্যা), নিধি, (মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা [বেদাঙ্গ শিক্ষাকল্পাদি], ভূতবিদ্যা [ভূততন্ত্র], ক্ষত্রবিদ্যা [ধনুর্ব্বেদ], নক্ষত্রবিদ্যা [জ্যোতিষ], সর্পবিদ্যা [গারুড়], দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ গন্ধযুক্তি নৃত্য-গীত, বাদ্যশিল্পাদি-বিজ্ঞান, এই সমস্তও জানি[২]। নারদের অধিগত কথিত বিদ্যার মধ্যে যে "বাকোবাক্য" আছে, ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্"। সংহিতাকার মহর্ষি কাত্যায়ন প্রত্যহ বাকোবাক্য পাঠের ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন[৩]। সংহিতাকার গৌতম বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বাকোবাক্যে অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন[৪]। কোষকার অমরসিংহ আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—'তর্কবিদ্যা'[৫]। আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারে আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকেই বাকোবাক্য বলিয়া বুঝা যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে বহুশ্রুত নারদের বিদ্যার বর্ণনায় নারদকে পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের গুণ-দোষবেত্তা বলা হইয়াছে[৬]। গৌতম ন্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যের অনুকূল তর্করূপ গুণ এবং হেত্বাভাস প্রভৃতি দোষ নারদ জানিতেন। টীকাকার নীলকণ্ঠও সেখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে নারদের পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যায় পাণ্ডিত্য বর্ণিত হওয়ায় ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত নারদের অধিগত তর্কশাস্ত্রকে পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যা বলিয়া

১। আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥—তৃতীয় স্কন্ধ।১২।৪৪।

ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিক্রমেণোৎপত্তিমাহ আন্বীক্ষিকীতি। আন্বীক্ষিকাদ্যা মোক্ষ-ধর্ম্মকামার্থবিদ্যাঃ। দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ।—স্বামিটীকা।

২। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থং, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্-ভগবোঽধ্যেমি" ।৭।১।২।

৩। মাংসক্ষীরৌদনমধুকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ পঠন্। বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চান্বহং ॥ ১৪শ খণ্ড।১১

৪। স এব বহুশ্রুতো ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলঃ। ইত্যাদি। অষ্টম অঃ।

৫। আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রয়োঃ।—অমরকোষ। স্বর্গবর্গ।১৫৫।

৬। পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।—সভাপর্ব্ব।৫।৫।

বুঝা যাইতে পারে। কারণ, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিবে, ইহা মহাভারতই বলিয়াছেন[১]। অন্য উপনিষদেও বেদাদি বিদ্যার সহিত ন্যায়বিদ্যারও উল্লেখ দেখা যায়[২]। ন্যায়সূত্র-বৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথ "ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি" এই বাক্যটি শ্রুতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতি ও পুরাণে ন্যায়বিদ্যা চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত[৩] হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দ্দশ বিদ্যার পরিগণনায় যে "ন্যায়বিস্তর" বলা হইয়াছে, তাহা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সমস্ত ন্যায়তন্ত্র, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরীকার মহামনীষী জয়ন্ত ভট্ট ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যাই ঐ ন্যায়বিস্তর শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত, উহাই আন্বীক্ষিকী। বৈশেষিক ঐ ন্যায়শাস্ত্রের সমান তন্ত্র, সুতরাং বৈশেষিকের আর পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু ন্যায় না বলিয়া "ন্যায়বিস্তর" কেন বলা হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু মহাভারত বলিয়াছেন,—"ন্যায়তন্ত্র অনেক"।[৪] মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ ন্যায়তন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের ভূমিকায় মহাভারতের ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকাদির সহিত ব্রহ্মমীমাংসাও যে অংশবিশেষে ন্যায়তন্ত্র, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যা ভিন্ন কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশেষেরও আন্বীক্ষিকী নামে উল্লেখ দেখা যায়। ভগবানের ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয় অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে "আন্বীক্ষিকী" বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে[৫]। দত্তাত্রেয়-প্রোক্ত ঐ আন্বীক্ষিকী যে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা, উহা গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যা নহে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও উহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "প্রাণতোষিণী" নামক তন্ত্র-সংগ্রহকার,

১। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥ আদিপর্ব্ব, ১ম অঃ।২৬৭।

২। তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেবৈতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিসাময়নং ন্যায়ো মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাণি ইত্যাদি। সুবালোপনিষৎ। ২য় খণ্ড।

৩। পুরাণন্যায়মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।১।৩

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাশ্চেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অঃ।

৪। ন্যায়-তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ।
হেত্বাগম-সদাচারৈর্যদুক্তং তদুপাস্যতাং ॥—শান্তিপর্ব্ব ।২১০।২২।
ন্যায়তন্ত্রাণি তার্কিক-বৈশেষিক-কাপিল-পাতঞ্জলাদীনি। হেতুর্যুক্তিঃ, আগমো বেদঃ, সদাচারঃ প্রত্যক্ষং, তৈঃ প্রমাণৈঃ কৃত্বা এতৈর্মুনিভির্যদ্ব্রহ্ম উক্তং তদুপাস্যতাং।—নীলকণ্ঠ ॥

৫। ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্ ॥ ভাগবত ।১।৩।১১। আন্বীক্ষিকীং আত্মবিদ্যাং।—শ্রীধরস্বামী।

নব্য বাঙ্গালী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দত্তাত্রেয়-প্রোক্ত আন্বীক্ষিকী ও গৌতম-প্রকাশিত আন্বীক্ষিকী এই উভয়কেই আন্বীক্ষিকী বলিয়া, তন্মধ্যে গৌতম ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা বিষয়ে গন্ধর্ব্বতন্ত্রের বচনাবলম্বনে অবতারিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের যে শ্লোকের দ্বারা আন্বীক্ষিকীর নিন্দা সমর্থন করা হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়া অনুরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মীমাংসায় বহু বক্তব্য থাকিলেও তিনি গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যা ও তাহার অধ্যয়ন নিন্দিত, ইহা সিদ্ধান্ত করেন নাই; পরন্ত তাহার প্রতিবাদই করিয়াছেন, এই মাত্রই এই প্রসঙ্গে এখানে বক্তব্য। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য সাংখ্যকেও আন্বীক্ষিকীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কথা পরে আলোচনা করিব। শান্তিপুরের মহামনীষী, স্মৃতি ও ন্যায় গ্রন্থের বহু টীকাকার রাধামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য্য ন্যায়সূত্রবিবরণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রবণের পরে ঈক্ষা অর্থাৎ বেদোপদিষ্ট আত্মমননকে অন্বীক্ষা বলে। তাহার নির্ব্বাহক শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী, ইহা আন্বীক্ষিকী শব্দের যৌগিক অর্থ। এই অর্থে অন্য শাস্ত্রও আন্বীক্ষিকী হইতে পারে, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে ন্যায়ের বলবত্তাবশতঃ এবং উহাতেই আন্বীক্ষিকী শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ থাকায় গৌতমীয় ন্যায়-বিদ্যাতেই আন্বীক্ষিকী শব্দের রূঢ়ি কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র-বোধক আন্বীক্ষিকী শব্দটি যোগরূঢ়। তাহা হইলে কোন যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়াই কোন কোন অধ্যাত্মবিদ্যা বা মনন-শাস্ত্রও আন্বীক্ষিকী নামে কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আন্বীক্ষিকী শব্দের যে বুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রথমেই বলিয়াছি, তদনুসারে গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যাই আন্বীক্ষিকী। বাৎস্যায়নও ন্যায়বিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া তাহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। এবং প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই সকল পদার্থ বলা হয়, আবার পৃথক্ করিয়া সংশয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পদার্থ কেন বলা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ এই চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। প্রস্থানের ভেদেই বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী, এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান আছে। তন্মধ্যে আন্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ। উহা আর কোন বিদ্যায় বর্ণিত হয় নাই। উহারা ন্যায়বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান কেন? উহাদিগের তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন কি? তাহা প্রথম সূত্র-ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ন্যায়-বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি ন্যায়বিদ্যায় সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিদ্যা হইত না। তাহা হইলে ইহা কেবল মাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া ত্রয়ীর অন্তর্গত হইত। ফলকথা, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি হইতে চতুর্থী যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, ঐ চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যা। ঐ বিদ্যা অক্ষপাদের পূর্ব্ব হইতেই আছে। অক্ষপাদ সূত্রগ্রন্থের দ্বারা উহা বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার কর্ত্তা নহেন। ইহাই বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়।

আমরাও দেখিতেছি, মন্বাদি সংহিতাকার ঋষিগণ বিচার দ্বারা রাজ্য রক্ষার জন্য

রাজাকে ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির সহিত চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন[১]।

মন্বাদি ঋষিগণ যে উদ্দেশ্যে রাজাকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার আলোচনা করিতে বলিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে ন্যায়বিদ্যা, তাহা বুঝা যায়। কুল্লুকভট্টও মনুবচনোক্ত আন্বীক্ষিকীর অন্যরূপ কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও মনূক্ত আন্বীক্ষিকীকে ন্যায়শাস্ত্রই বলিয়াছেন। মেধাতিথি প্রথমে তর্কবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিকে আন্বীক্ষিকী বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে 'আত্মবিদ্যা' আন্বীক্ষিকীর বিশেষণ। রাজা আত্মহিতকরী তর্কাশ্রয়া আন্বীক্ষিকী শিক্ষা করিবেন। নাস্তিক তর্কবিদ্যা শিক্ষা করিবেন না। বস্তুতঃ মন্বাদি ঋষিগণ বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রকে অসৎশাস্ত্র বলিয়া তাহার অধ্যয়নাদিকে উপপাতকের মধ্যে গণ্য করায়[২] রাজার শিক্ষণীয়রূপে তাঁহাদিগের কথিত আন্বীক্ষিকীকে নাস্তিক তর্কবিদ্যা বলিয়া বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু নাস্তিক গ্রন্থে "শাস্ত্র" শব্দের ন্যায় নাস্তিক তর্কবিদ্যাতে আন্বীক্ষিকী শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে তাহা হইয়াছে, ইহা আমরা মেধাতিথির কথার দ্বারাও বুঝিতে পারি এবং মন্বাদি সংহিতায় বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা দেখিয়া তদনুসারে মহাভারতেও নাস্তিক তর্ক-বিদ্যারই নিন্দা বুঝিতে পারি। মূলকথা, মনু-বচনে আত্মবিদ্যা আন্বীক্ষিকীর বিশেষণ হইলেও ঐ আন্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্যা হইতে পারে। কারণ, ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল আত্মবিদ্যা না হইলেও আত্মবিদ্যা। কেবল আত্মবিদ্যারূপ কোন আন্বীক্ষিকী আন্বীক্ষিকী শব্দের দ্বারা রাজার শিক্ষণীয়রূপে কথিত হয় নাই, ইহা যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতমের বচনের দ্বারাও বুঝা যায়। বিচারের জন্য, বাদ-প্রতিবাদের জন্য, যুক্তির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য ন্যায়বিদ্যায় অভিজ্ঞতা রাজার বিশেষ আবশ্যক। মহাভারতও রাজ-ধর্ম্মবর্ণনায় রাজাকে শব্দ-শাস্ত্রাদির সহিত যুক্তি-শাস্ত্রও জানিতে বলিয়াছেন[৩]। শ্রীরামচন্দ্র

১। ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥—মনুসংহিতা।৭।৪৩।
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১।৩১১।
রাজা সর্ব্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্জং সাধুকারী
স্যাৎ সাধুবাদী, ত্রয্যাং আন্বীক্ষিক্যাঞ্চাভিবিনীতঃ।—গৌতমসংহিতা।১১ অঃ।

২। অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া।—মনুসংহিতা।১১।৬৬।
অসচ্ছাস্ত্রাণি চার্ব্বাকনির্গ্রন্থাঃ। যত্র ন প্রমাণং বেদঃ, ন কর্ম্ম ফলসম্বন্ধমাপদ্যতে।—মেধাতিথি। শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ-শাস্ত্রশিক্ষণং। কুল্লূকভট্ট।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনমাকরেষ্বধিকারিতা।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।৩।২৪১।

৩। প্রজাপালনযুক্তশ্চ ন ক্ষতিং লভতে ক্বচিৎ।
যুক্তিশাস্ত্রঞ্চ তে জ্ঞেয়ং শব্দশাস্ত্রঞ্চ ভারত॥—অনুশাসন পর্ব্ব, ১০৪।১৪৮।

উত্তরোত্তর যুক্তিতে বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা ছিলেন, ইহা বাল্মীকি বর্ণন করিয়াছেন[১]। সেখানে বাল্মীকি ন্যায়-শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক 'কথা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা রামানুজের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ধনুর্ব্বেদ ও রাজনীতির সহিত আন্বীক্ষিকী বিদ্যারও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে[২]।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজাকে বলিয়াছিলেন যে,[৩] বেদান্ত-জ্ঞান-কোবিদ বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব আমার নিকটে বেদ বিষয়ে চতুর্ব্বিংশতি প্রশ্ন এবং আন্বীক্ষিকী বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। আমি তাহার উত্তর দিবার জন্য চিন্তা করিতে একটু সময় লইয়া, সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করিয়া পরা অন্বীক্ষিকীর সাহায্যে উপনিষৎ ও তাহার বাক্যশেষ অর্থাৎ উপসংহার-বাক্যকে মনের দ্বারা মন্থন করি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই চতুর্থী অর্থাৎ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি হইতে চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। এই বিদ্যা তোমাকে বলিয়াছি। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব আন্বীক্ষিকী বিষয়ে যে পঞ্চবিংশ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বাবসুর প্রশ্ন যে অন্য কোন আন্বীক্ষিকী বিষয়ে নহে, ইহা নীলকণ্ঠেরও স্বীকৃত। তাহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য যে চতুর্থী বিদ্যা

১। ...... ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ। উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা ॥—অযোধ্যাকাণ্ড ।২।৪২।৪৩।

২। সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাং ॥—১০।৪৫।৩৪।
ন্যায়পথান্ মীমাংসাদীন্। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাং।—শ্রীধরস্বামী।

৩। বিশ্বাবসুস্ততো রাজন্ বেদান্তজ্ঞানকোবিদঃ।
চতুর্ব্বিংশাংস্ততোঽপৃচ্ছৎ প্রশ্নান্ বেদস্য পার্থিব ॥
পঞ্চবিংশতিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছান্বীক্ষিকীং তদা। ২৭।২৮।
তত্রোপনিষদঞ্চৈব পরিশেষঞ্চ পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাং ॥৩৪।
চতুর্থী রাজশার্দ্দূল বিদ্যৈষা সাম্পরায়িকী ॥
উদীরিতা ময়া তুভ্যং পঞ্চবিংশাদধিষ্ঠিতা ॥
এষা তেঽন্বীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্থী সাম্পরায়িকী ॥৪৭॥
বিদ্যোপেতং ধনং কৃত্বা ইত্যাদি ।৪৮।
অক্ষয়ত্বাৎ প্রজননে ইত্যাদি। ॥৪৬॥ শান্তিপর্ব্ব ।৩১৮ অ০।
শ্রবণমনু ঈক্ষা যুক্ত্যা আলোচনমন্বীক্ষা তৎপ্রধানামান্বীক্ষিকীং ।২৮।
চতুর্থী, ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিঞ্চাপেক্ষ্য। সাম্পরায়িকী—মোক্ষায় হিতা ।৩৫।

বিদ্যোপেতং ধনং আন্বীক্ষিক্যা বিদ্যয়া সহিতং ধনং......বেদবিদ্যা ধনং, তাং সোপপত্তিকাং সম্পাদ্য শ্রবণমননে কৃত্বেতি ভাবঃ ।৪৮। প্রজননে অনিত্যসর্গে অক্ষয়ত্বং পরোক্তং শ্রুত্বা অক্ষপাদাদয় আচার্য্যা অত্র ব্যবহারে যদক্ষমাকাশাদি তদেবাবায়মিত্যাহুঃ ।৪৬।—নীলকণ্ঠ।

আন্বীক্ষিকীর সাহায্যে মনের দ্বারা উপনিষদের মন্থন করিয়াছিলেন, তাহাও যে বিচার দ্বারা, তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের অনুকূল কোন তর্কবিদ্যা, ইহাও বুঝা যায়। মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঐ আন্বীক্ষিকীকে চতুর্থী বিদ্যা ও মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী বলিয়া বেদবিদ্যাকে ঐ আন্বীক্ষিকী বিদ্যাযুক্ত করিবে অর্থাৎ বেদবিদ্যার দ্বারা শ্রবণ ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার দ্বারা মনন করিবে, ইহাও বলা হইয়াছে। এবং পরে সাঙ্গোপাঙ্গ সমগ্র বেদ পড়িয়াও বেদবেদ্য না বুঝিলে সে ব্যক্তি 'বেদভারহর' এই কথা বলিয়া বেদবাক্য বিচারের আবশ্যকতাও সূচিত হইয়াছে। এবং ন্যায়শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদবাদের আশ্রয়ে মোক্ষলাভ হয় না ; মোক্ষ আছে, এই মাত্র বলা যায়। অর্থাৎ বিচার দ্বারা বেদার্থের শ্রবণ আবশ্যক, তর্কের দ্বারা মনন আবশ্যক ; নচেৎ কেবল বেদ পড়িলেই মুক্তি হয় না, এই কথাও শান্তিপর্ব্বে পাওয়া যায়[১]। সুতরাং মহাভারতোক্ত ঐ আন্বীক্ষিকী—ন্যায়বিদ্যা, যাজ্ঞবল্ক্য উহার সাহায্যে বেদার্থ বিচার করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। ন্যায়সূত্র-বৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত "তত্রোপনিষদঞ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য—চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে ন্যায়বিদ্যাই বলিয়াছেন। বৈদান্তিক-চূড়ামণি শ্রীহর্ষও নৈষধীয় চরিতে গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়-বিদ্যাকে আন্বীক্ষিকী বলিয়া মোক্ষোপযোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন[২]। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় গৌতম-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী নামে উল্লেখ করিয়া সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথার দ্বারাও মহাভারতোক্ত ঐ চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকীকে যে তাঁহারা গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যাই বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইন্দ্র-কাশ্যপ-সংবাদে যে আন্বীক্ষিকীকে 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নাস্তিক তর্কবিদ্যা। তাহাকে গৌতম-প্রকাশিত বেদানুগত আন্বীক্ষিকী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ বুঝেন নাই। মন্বাদি সংহিতা ও মহাভারতে যেরূপে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ আছে এবং মহাভারত সভাপর্ব্বে যে ন্যায়বিদ্যায় নারদ মুনির পাণ্ডিত্য বর্ণন করিয়াছেন এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিশ্বাবসু যে আন্বীক্ষিকী বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর দিয়াছেন, ইহাও মহাভারত বর্ণন করিয়াছেন, সেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে মহাভারত 'নিরর্থিকা' বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক।

বস্তুতঃ মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ইন্দ্রকাশ্যপ-সংবাদে বেদনিন্দক, নাস্তিক, সর্ব্বশঙ্কী, বেদবাক্য বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাষী, মূর্খ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তিরই নিন্দা

১। বেদবাদং ব্যপাশ্রিত্য মোক্ষোঽস্তীতি প্রভাষিতুং।
অপেতন্যায়শাস্ত্রেণ সর্ব্বলোকবিগর্হিণা ॥—শান্তিপর্ব্ব, ২৬৮ অঃ। ৬৪।

২। উদ্দেশপর্ব্বণ্যপি লক্ষণেঽপি দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ।
আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমালীং তাং মুক্তিকাম্যা কলিতাং প্রতীমঃ। ১০ সর্গ। ৮১

করিয়া, তদ্দ্বারা বৈদিক মত পরিত্যাগপূর্ব্বক নাস্তিক-মতাবলম্বী হইবে না, বৈদিক মার্গেই অবস্থান করিবে, এই উপদেশ করিয়াছেন। ঐ স্থলে যে তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইলে বেদপ্রামাণ্য, পরলোকাদি কিছুই মানে না, নাস্তিত্ববাদী ও সংশয়বাদী হয়, বেদনিন্দাদি তথাকথিত কার্য্য করে, সেই তর্ক-বিদ্যায় অনুরক্ত হইবে না, অর্থাৎ তাহার মত গ্রহণ করিবে না—ইহাও উপদেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে নিরর্থক তর্কবিদ্যা বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে[১]। মহাভারতের ঐ নিন্দার উদ্দেশ্য বুঝিলে এবং সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিলে ঐ তর্কবিদ্যা যে বার্হস্পত্য সূত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যা এবং তর্কবিদ্যাত্ব নিবন্ধন তাহাতে আন্বীক্ষিকী শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদ-নিন্দক, নাস্তিক, বেদবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাষী ইত্যাদি কথার দ্বারা মহাভারত ঐরূপ ব্যক্তিকে কোন্ তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত বলিয়াছেন, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। শেষে অনু-শাসন পর্ব্বে ঐ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে[২] এবং অনুশাসনপর্ব্বে অন্যত্র যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে ভীষ্মদেব প্রত্যক্ষমাত্র-প্রামাণ্যবাদী নাস্তিকদিগকে হৈতুক বলিয়া নাস্তিত্ববাদী ও সংশয়বাদী এবং অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন যে, হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যে ব্রাহ্মণ মূলশাস্ত্রদ্বয় শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবজ্ঞা করিবে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণ বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন[৪]। ভাষ্যকার মেধাতিথি, টীকাকার গোবিন্দরাজ ও

১। অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাং॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু চ হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেয়ং ফলনির্ব্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ॥—শান্তিপর্ব্ব। ১৮০।৪৭।৪৮।৪৯।

২। অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাঞ্চাভিলঙ্ঘনং।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ॥১১।
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাং॥১২।
হেতুবাদান্ ব্রুবন্ সৎসু বিজেতাহহেতুবাদিকঃ।
আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি॥ ১৩।
সর্ব্বাভিশঙ্কী মূঢ়শ্চ বালঃ কটুকবাগপি।
বোদ্ধব্যস্তাদৃশস্তাত নরং শ্বানং হি তং বিদুঃ॥১৪।—অনুশাসনপর্ব্ব, ৩৭ অঃ।

৩। প্রত্যক্ষং কারণং দৃষ্ট্বা হৈতুকাঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ।
নাস্তীত্যেবং ব্যবস্যন্তি সত্যং সংশয়মেব চ॥
তদযুক্তং ব্যবস্যন্তি বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ইত্যাদি। অনুশাসন, ১৬২।৫।৬।

৪। যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥—মনুসংহিতা, ২।১১।

নারায়ণ মনুবচনোক্ত ঐ হেতুশাস্ত্রকে নাস্তিক-তর্কশাস্ত্র বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য যে কোন তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া, নাস্তিক হইয়া বেদনিন্দা করিলেও সাধুগণ তাহার শাসন করিবেন, ইহাও বেদনিন্দক ও নাস্তিক শব্দের দ্বারা হেতু সূচনা করিয়া মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু মনুসংহিতায় নাস্তিক ও আস্তিক দ্বিবিধ হৈতুক ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়। যাহারা শাস্ত্র না মানিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হেতুবাদবক্তা, তাহারা নাস্তিক হৈতুক। মনু এই হৈতুককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ"। ৪।৩০। এখানে পাষণ্ডী, বকবৃত্তি প্রভৃতি নিন্দিত ব্যক্তিগণের সাহচর্য্যবশতঃ হৈতুক শব্দের দ্বারা নাস্তিক হৈতুক-দিগকেই বুঝা যায়। ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রভৃতিও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাহার পরে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের জন্য মনু প্রথমে যে মহাপরিষদের বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনু—বেদজ্ঞ, মীমাংসা-তর্কজ্ঞ, নিরুক্তজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত হৈতুক পণ্ডিতেরও উল্লেখ করিয়াছেন[১] এবং ঐ হৈতুক পণ্ডিতকে বেদত্রয়জ্ঞ পণ্ডিতের পরেই দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। এখানে মেধাতিথি অনুমানাদি-কুশল পণ্ডিতকে এবং কুল্লুক ভট্ট শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে হৈতুক বলিয়াছেন। মনু কেবল তর্কী বলিলেও মীমাংসাতর্কজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় ন্যায়তর্কজ্ঞ পণ্ডিতও বুঝা যাইত। তথাপি বিশেষ করিয়া তর্কীর পূর্ব্বে হৈতুক পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র সুচিরকাল হইতেই আছে এবং ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আস্তিক হৈতুক পণ্ডিতও ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয়-পরিষদের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহা মনুর কথার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে এবং মনু পূর্ব্বে যে হৈতুকদিগকে অসম্মান্য বলিয়াছেন, তাহারা নাস্তিক হৈতুক, ইহাও বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে মনুসংহিতা ও মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বচনগুলির সমন্বয়ের দ্বারা মহাভারতে বেদপ্রামাণ্য পরলোকাদি-সমর্থক সর্ব্বশাস্ত্রপ্রদীপ গোতম ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা নাই, নাস্তিক তর্কশাস্ত্রেরই নিন্দা আছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন যে,[৩] বৎস! তুমি ত

১। ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাৎ দশাবরা॥—মনুসংহিতা।১২।১১১।
(হৈতুকঃ) অনুমানাদিকুশলঃ। তর্কী অয়মূহাপোহবুদ্ধিযুক্তঃ। মেধাতিথি। (হৈতুকঃ) শ্রুতি-স্মৃত্য-বিরুদ্ধন্যায়শাস্ত্রজ্ঞঃ। (তর্কী) মীমাংসাত্মকতর্কবিৎ। কুল্লুকভট্ট।

২। শঙ্খ ও লিখিত মুনিও নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে ধর্ম্মনির্ণয়-পরিষদের অন্যতমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের কথায় পাওয়া যায়। "শঙ্খলিখিতৌ চ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ববিদঃ ষড়ঙ্গবিদ্ ধর্ম্মবিদ্-বাক্যবিদ্ নৈয়ায়িকো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী পঞ্চাগ্নিরিতি দশাবরা পরিষদিত্যূচতুঃ"।—ন্যায়মঞ্জরী, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৩। কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥—অযোধ্যাকাণ্ড।১০০।৩৮।৩৯।

লোকায়তিক ব্রাহ্মণদিগকে সেবা কর না ? পরে কেন তাহাদিগের সেবা করা রামচন্দ্রের অনভিপ্রেত, তাহা বলিতে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু তাহারা অনর্থ-কুশল এবং অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী। মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ এবং তন্মূলক ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই দুর্ব্বুধগণ আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি লাভ করিয়া অনর্থক প্রবাদ করে। এখানে লোকায়তিক ব্রাহ্মণমাত্রকেই অনর্থকুশল দুর্ব্বুধ প্রভৃতি বলিয়া যে নিন্দা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক-মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণেরই নিন্দা বুঝা যায়। সুতরাং এখানে আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি বলিতে নাস্তিক-তর্কবিদ্যায় অনুরাগাদি-মূলক নাস্তিকের বুদ্ধি বা মতবিশেষই বুঝা যায়। টীকাকার রামানুজ এখানে চার্ব্বাক-মতাবলম্বীদিগকে প্রথম প্রকার লোকায়তিক বলিয়া ন্যায়-মতাবলম্বীদিগকে দ্বিতীয় প্রকার লোকায়তিক বলিয়াছেন। রামানুজের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা না গেলেও পূর্ব্বকালে ন্যায়শাস্ত্রও যে লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা রামানুজের কথায় বুঝা যায়। সুতরাং নৈয়ায়িকদিগকেও রামানুজ লোকায়তিক শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে প্রথম শ্লোকে যে লোকায়তিকগণ নিন্দনীয়রূপে বুদ্ধিস্থ, দ্বিতীয় শ্লোকেও তাহারাই "তৎ"শব্দের দ্বারা বুদ্ধিস্থ, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। আস্তিক হৈতুক মাত্রকেই বাল্মীকি ঐরূপে বর্ণন করিতে পারেন না। নাস্তিক হৈতুক সম্প্রদায় গৌতম ন্যায়শাস্ত্র হইতে তর্ক শিক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যে নাস্তিক-মতের সমর্থন করিতে পারেন। বাল্মীকি তাহা বলিলেও ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা হয় না। তাহা হইলে অন্য শাস্ত্রেরও নিন্দা হইতে পারে। বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক ন্যায়-বৈশেষিকের আর্ষ সিদ্ধান্তের ঐরূপে নিন্দা শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছেন, ইহাও বাল্মীকি বর্ণন করিতে পারেন না। পরন্তু শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় হেতুবাদকুশল হৈতুক পণ্ডিতগণেরও অন্যান্য আস্তিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত সসম্মানে নিমন্ত্রণ দেখিতে পাই[১]। মূল কথা, লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ করিয়া রামায়ণে হৈতুক পণ্ডিত মাত্রেরই নিন্দা হয় নাই। মনুসংহিতায় যেমন হৈতুক শব্দের প্রয়োগ করিয়াই নাস্তিক হৈতুকদিগকে অসম্মান্য বলা হইয়াছে, তদ্রূপ রামায়ণেও লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ করিয়া নাস্তিক হৈতুকদিগকেই অসম্মান্য বলা হইয়াছে। তবে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকটে শুনিয়াছি। রামানুজের কথাতেও তাহা বুঝা যায়। পরন্তু অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য তাঁহার সম্মত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে লোকায়ত বলিয়াছেন[২]। কৌটিল্য

১। হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্।—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১০৭-৮। হৈতুকান্ তার্কিকান্।—রামানুজ।

২। চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ। তাভির্ধর্ম্মার্থৌ যদ্‌বিদ্যাৎ তদ্‌বিদ্যায়া বিদ্যাত্বং। সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষকী। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রয্যাং। অর্থানর্থৌ বার্ত্তায়াং। নয়ানয়ৌ দণ্ডনীত্যাং। বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণা লোকস্যোপকরোতি ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্য-ক্রিয়া-বৈশারদ্যঞ্চ করোতি—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা॥—অর্থশাস্ত্র।

ন্যায়শাস্ত্র না বলিয়া লোকায়ত শব্দের দ্বারা বার্হস্পত্য সূত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যাকেই গ্রহণ করিলে তিনি "বিদ্যা" ও "আন্বীক্ষকী" শব্দের যে ব্যুৎপত্তি সূচনা করিয়াছেন এবং আন্বীক্ষিকী বিদ্যার যে সকল ফল কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সুসংগত হয় না। সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্ব কর্ম্মের উপায়, সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া শেষে যে প্রশংসা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তিনি যে ন্যায়শাস্ত্রকেও আন্বীক্ষিকীর মধ্যে বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। বাৎস্যায়ন ভাষ্যেও "প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের ঐরূপ প্রশংসা দেখা যায়। সুতরাং কৌটিল্য লোকায়ত শব্দের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। বার্হস্পত্য সূত্রের মত লোকসম্মত—লোকবিস্তৃত। অধিকাংশ লোকই দেহকেই আত্মা মনে করে, পরলোকে বিশ্বাস করে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঐ মত লোকসিদ্ধ, ইত্যাদি প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ মত ও ঐ মত-প্রতিপাদক গ্রন্থ সুচিরকাল হইতে "লোকায়ত" নামে উল্লিখিত দেখা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও (১।২ অঃ, ২৪ সূত্রে) পরলোকে অবিশ্বাসী সংশয়বাদীর "লৌকায়তিক" নামে উল্লেখ দেখা যায়। এইরূপ বহু গ্রন্থেই লৌকায়তিক ও কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দেরও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অর্থে দেখা যায়।[1] কিন্তু ন্যায়দর্শনের অনেক মত লোকসিদ্ধ। আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্ব-লোকসিদ্ধ এবং সকল লোকই তর্ক করে, অনুমান করে, অনুমানের দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে; সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত লোকসিদ্ধ, উহা লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক বলিয়া লোকে বিস্তৃত, এইরূপ কোন ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও 'লোকায়ত' নামে অভিহিত হওয়া অসম্ভব নহে। নাস্তিক শাস্ত্রবিশেষেই লোকায়ত শব্দের ভূরি প্রয়োগে লোকায়ত শব্দের ঐ অর্থই প্রসিদ্ধ হওয়ায় পরিবর্ত্তী কালে ন্যায়শাস্ত্র বলিতে লোকায়ত শব্দের প্রয়োগ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাও অসম্ভব নহে। প্রাচীনগণের প্রযুক্ত অনেক শব্দ পরবর্ত্তিগণ সেই অর্থে ব্যবহার করেন নাই, ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ভাষাপ্রয়োগের পরিবর্ত্তন সুচিরকাল হইতেই হইতেছে। প্রাচীন কালে বৈশেষিক অর্থে যোগ শব্দেরও প্রয়োগ হইত। হেমচন্দ্র সূরি যোগ শব্দের অন্যতম অর্থ বলিয়াছেন—'নৈয়ায়িক' (বাচস্পত্য অভিধানে যোগ শব্দ দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কালে নৈয়ায়িকগণ যোগ নামেও অভিহিত হইতেন। পরন্তু হরিবংশের কোন শ্লোকে[2] "লোকায়তিকমুখ্য" শব্দ দেখিতে পাই। সেখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রসিদ্ধ অর্থে অনুপপত্তি দেখিয়া লক্ষণা অবলম্বনে

১। লোকায়ত শব্দের পরে তদ্ধিতপ্রত্যয়ে "লৌকায়তিক" প্রয়োগের ন্যায় "লোকায়তিক" এইরূপ প্রয়োগও হয়, ইহা রামানুজ ও নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যানুসারে তাঁহাদিগের সম্মত বুঝা যায়। রামায়ণ ও হরিবংশে "লোকায়তিক" এইরূপ পাঠও প্রকৃত হইতে পারে। কোন বহুশ্রুত উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি, "লোকায়তি" শব্দের উত্তরে তদ্ধিত প্রত্যয়েই কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহ লোকেই যাহাদিগের আয়তি, (উত্তরকাল) অর্থাৎ যাহাদিগের মতে উত্তরকালীন পরলোক নাই, এইরূপ অর্থে লোকায়তিক বলিতে নাস্তিক। রামায়ণে তাহারাই নিন্দিত।

২। ঐকানানাত্মসংযোগ-সমবায়-বিশারদৈঃ।
লোকায়তিক-মুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতং ॥—হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব, ৬৭ অঃ, ৩০।

অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ লোকায়তিকমুখ্য বলিতে ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিলে সেখানে কোন অনুপপত্তি থাকে না এবং সেখানে তাহাই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। মূলকথা, রামানুজের কথা, কৌটিল্যের কথা এবং হরিবংশের শ্লোক চিন্তা করিলে প্রাচীন কালে ন্যায়-শাস্ত্র "লোকায়ত" নামেও অভিহিত হইত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। লোকায়ত-শাস্ত্র দ্বিবিধ হইলে, আস্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ লোকায়তিক হইতে পারে। হরিবংশে লোকায়তিক-মুখ্য বলিয়া আস্তিক লোকায়তিকেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং রামায়ণে অনর্থকুশল, অজ্ঞ, দুর্ব্বুধ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিন্দা করিয়া কথিত লোকয়তিকদিগকে নাস্তিক বলিয়াই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। মহাভারতে বেদনিন্দক, নাস্তিক প্রভৃতি বহু বাক্যের দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে। পরন্তু যদি লোকায়তিক শব্দের দ্বারা চার্ব্বাক-মতাবলম্বী ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাই না যায়, ন্যায়শাস্ত্রের 'লোকায়ত' নামে উল্লেখ কোন কালে হয় নাই বলিয়াই নির্ণীত হয়, অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য, বার্হস্পত্য সূত্রাদিকেই যদি "লোকায়ত" বলিয়া অন্বীক্ষিকীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রামায়ণে লোকায়তিক শব্দের দ্বারা নৈয়ায়িকের গ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং রামানুজের ব্যাখ্যা কল্পনা-প্রসূত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এ পক্ষেও অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীর মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ নাই, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, কৌটিল্যের শেষ কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা না বুঝিয়া পারা যায় না। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে যোগ শব্দের দ্বারা ন্যায় অথবা ন্যায়বৈশেষিক উভয়ই আন্বীক্ষিকীর মধ্যে কথিত হইয়াছে, ইহাই এ পক্ষে বুঝিতে হইবে। এবং অর্থশাস্ত্রে "যোগং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝিতে হইবে। ক্লীবলিঙ্গ "যোগ" শব্দের যে প্রাচীন কালে ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ হইত, তাহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায়। হেমচন্দ্র সূরির কথা এবং আরও অনেক জৈন ন্যায়ের গ্রন্থের দ্বারা ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের "যোগানাং" এই কথার ব্যাখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। বাৎস্যায়নের "সাংখ্যানাং যোগানাং" এই প্রয়োগ দেখিয়া কৌটিল্যের "সাংখ্যং যোগং" এই প্রয়োগের প্রতিপাদ্য বুঝা যায় (২২৬। ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত বলিতে ন্যায়শাস্ত্র বুঝিলে, যোগ বলিতে কেবল বৈশেষিক অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। আন্বীক্ষিকীর মধ্যে যোগশাস্ত্রও কৌটিল্যের বক্তব্য হইলে সাংখ্য শব্দের দ্বারাও সাংখ্য-প্রবচন উভয় দর্শনকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কৌটিল্য ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী না বলিলে হেতুর দ্বারা ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতির বলাবল পরীক্ষা করতঃ লোকের উপকার করিতে কৌটিল্যের কথিত কোন্ আন্বীক্ষিকী সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। মতান্তরে বিদ্যা ত্রিবিধ, ইহাও কৌটিল্য বলিয়াছেন। রামায়ণেও ত্রিবিধ বিদ্যার উল্লেখ আছে। তবে সে কথার দ্বারা আর বিদ্যা নাই, ইহা বুঝা যায় না। সেখানে বিদ্যার পরিগণনা উদ্দেশ্য নহে। মহাভারতেও কোন স্থলে ঐরূপ প্রসঙ্গে ত্রিবিধ বিদ্যারই উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহা হউক, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ন্যায়শাস্ত্রকে কোন বিদ্যার মধ্যে গণ্য করেন নাই, সুতরাং তাঁহার সময়ে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না বা তাহার আলোচনা ছিল না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু যে দিন হইতে শাস্ত্রার্থবিচারের আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে ব্যাকরণশাস্ত্রের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, কিরূপে বিচার করিতে হইবে, বাদবিচার কাহাকে বলে, সদুত্তর কাহাকে বলে, অসদুত্তর কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিচারকের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় ন্যায়শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। বিচারোপযোগী সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ ন্যায়শাস্ত্রেরই প্রস্থান। অনুমান-প্রমাণের বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ হেতু বা হেত্বাভাসের নিরূপণপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গ এই ন্যায়শাস্ত্রেই সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হইয়াছে। শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে অনুমান-প্রমাণের সম্যক্ জ্ঞানও যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা সর্ব্বসম্মত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি-পুরাণাদি শব্দপ্রমাণের সহিত অনুমান-প্রমাণেরও উল্লেখ আছে।[১] ভগবান্ মনুও পূর্ব্বোক্ত পরিষদ্‌বর্ণনের পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণীষু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্ররূপ শব্দ-প্রমাণের সহিত অনুমান-প্রমাণকেও সম্যক্‌রূপে বুঝিবেন এবং তাহার পরশ্লোকেই আবার বলিয়াছেন যে, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্র-বিচার করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানেন; যিনি ঐরূপ তর্কের দ্বারা শাস্ত্র বিচার করেন না, তিনি শাস্ত্রগম্য ধর্ম্ম জানিতে পারেন না[২]। এখানে মনু-বচনের "তর্ক" শব্দের দ্বারা অনেকে তর্কশাস্ত্র বুঝিয়াছেন। ন্যায়সূত্র-বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে জন্য এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহারও উহাই অভিপ্রেত বুঝা যাইতে পারে। অনেকে ঐ "তর্ক" শব্দের দ্বারা অনুমান-প্রমাণ বুঝিয়াছেন[৩]। ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রথমে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়া পরে মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত তর্কের কথাও বলিয়াছেন। কুল্লুক ভট্ট "মীমাংসাদিন্যায়" বলিয়া প্রমাণ-সহকারী সর্ব্বপ্রকার তর্কই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য "তর্ক" শব্দ পূর্ব্বোক্ত অনেক অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। অনুমান-প্রমাণ অর্থেও তর্ক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শারীরক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও কোন কোন স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মনু পূর্ব্বশ্লোকে প্রমাণত্রয়ের কথা বলিয়া পরশ্লোকে ঐ প্রমাণের সহকারী তর্কের কথাই বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ঐ তর্ক ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক পদার্থ। উহা কেবল অনুমান-প্রমাণেরই সহকারী নহে, উহা সকল প্রমাণেরই সহকারী। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ ন্যায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝাইয়াছেন এবং মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত তর্কও যে ন্যায়দর্শনোক্ত তর্কপদার্থ অর্থাৎ যে তর্কের নাম "মীমাংসা", তাহাও ন্যায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত

১। স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষং ঐতিহ্যং অনুমানচতুষ্টয়ং। এতৈরাদিত্যমণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে॥ ১, ২।

২। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ ১২, ১০৫-৬।

৩। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট মনুবচনোক্ত "তর্ক" শব্দের অর্থ 'অনুমান'ই বলিয়াছেন। তর্কশব্দঃ কেচিদনুমানে প্রযুজ্যতে যথা স্মৃতিকারাঃ আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ ইত্যাদি।—ন্যায়মঞ্জরী, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

তর্ক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা বুঝাইতে সেখানে মীমাংসাচার্য্যের কারিকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বরদরাজ ন্যায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত মনু-বচন উদ্ধৃত করায় তিনি মনু-বচনের ঐ তর্ক শব্দের দ্বারা প্রমাণ-সহকারী ন্যায়দর্শনোক্ত ঊহবিশেষরূপ তর্কই বুঝিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বেদান্তসূত্রে বেদব্যাস[১] "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" এই কথা বলিয়া পরেই আবার ঐ সূত্রেই বলিয়াছেন যে, যদি বল—অন্য প্রকারে অনুমান করিব, তাহা হইলেও অর্থাৎ অনুমান করিতে পারিলেও সেই অনুমান-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কজন্য জ্ঞান মোক্ষ-সাধন নহে। বেদব্যাস তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, এই কথা বলিয়া শেষে আবার ঐ কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, তর্কমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে লোকযাত্রার উচ্ছেদ হয়। পরন্তু যদি তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ হয়, অনুমানমাত্রেরই প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রই যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে ? কতকগুলি তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তদ্দৃষ্টান্তে তর্কের দ্বারাই অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাই তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তর্কমাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠ বা সন্দিগ্ধ-প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠাও তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। শঙ্কর এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। শেষে বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণসহকারী অনেক তর্কবিশেষও আবশ্যক, সুতরাং তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহাও বলিয়াছেন। উহা সমর্থন করিতে সেখানে পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ" ইত্যাদি মনু-বচন দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে আনন্দগিরি মনু-বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মনু-বচনে ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা ব্রহ্মও পরিগৃহীত। অর্থাৎ বিচারের দ্বারা ধর্ম্মনির্ণয়ের ন্যায় ব্রহ্ম-নির্ণয়েও বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, বেদান্তদর্শন বা শারীরক ভাষ্যে তর্কমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠ বলা হয় নাই। পরন্তু শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে অনুমান-প্রমাণ ও প্রমাণ-সহকারী তর্কবিশেষ আবশ্যক, ইহা আচার্য্য শঙ্কর সমর্থনই করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে মনুর কথা তিনিও স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তর্ককে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেহই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিচার দ্বারা যাঁহারাই শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বেদব্যাসের বেদান্তবাক্য-মীমাংসাও তর্কই। তাহার অবিরোধী যে সকল তর্ক পূর্ব্বমীমাংসা ও ন্যায়দর্শনে কথিত হইয়াছে, সেগুলি ঐ বেদান্ত-বাক্য-মীমাংসার উপকরণ, ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভামতী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথাতেই ব্যক্ত আছে[২]।

১। সম্পূর্ণ বেদান্ত-সূত্রটি এই,—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। ২, ১, ১১।

২। তস্মাদ্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্তবাক্য-মীমাংসা-তদবিরোধি-তর্কোপকরণা প্রস্তূয়তে।—শারীরক ভাষ্য, ১ম সূত্রভাষ্যের শেষ। সূত্রতাৎপর্য্যমুপসংহরতি তস্মাদিতি। বেদান্ত-মীমাংসা তাবৎ তর্ক এব, তদবিরোধিনশ্চ যেঽন্যেঽপি তর্কা অধ্বরমীমাংসায়াং ন্যায়ে চ বেদপ্রত্যক্ষাদি-প্রামাণ্য-পরিশোধনাদিষূক্তাস্তে উপকরণং যস্যাঃ সা তথোক্তা।—ভামতী।

বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শব্দপ্রমাণের ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও যুক্তি অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণকেও আশ্রয় করিয়াছেন। ("যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। ২।১।১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে শেষে "ন্যায়াচ্চ" (৩।৪) ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনের এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার জন্য সকল আচার্য্যই বহুবিধ তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন। বিচারশাস্ত্রে, দর্শনশাস্ত্রে তর্ক সকলেরই অপরিহার্য্য অবলম্বন। সকলেই হেতু উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। হেতুবাদ পরিত্যাগ করিলে কেহই স্বপক্ষের সমর্থন ও বিজ্ঞাপন করিতেই পারেন না,—তাহা অসম্ভব। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ," "তত্তু সমন্বয়াৎ," "ঈক্ষতের্নাশব্দং" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রেও হেতু উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্পিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ও বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" (১৩।৫); সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"হেতুমদ্ভির্যুক্তিযুক্তৈঃ।" শ্রীধরস্বামী "ঈক্ষতের্নাশব্দং" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করিয়াই ঐগুলি হেতুবিশিষ্ট, ইহা দেখাইয়াছেন। এখন যদি হেতুর দ্বারাই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হয়, শব্দপ্রমাণেরও সহকারিরূপে হেতু বা যুক্তি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হেতু কাহাকে বলে, কোন্ হেতুর দ্বারা কোন্ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কোন্ হেতুর দ্বারা তাহা পারে না, হেতুর দোষ কি, গুণ কি, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি, শাস্ত্রে কোথায় কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও সকলকেই বুঝিতে হইবে। উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি ষড়্বিধ লিঙ্গের দ্বারা বেদের যে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেও ত তর্কের দ্বারাই তাৎপর্য্য নির্ণয়। ফলকথা, হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বিচার দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। তাই ভগবান্ মনু ধর্ম্মনির্ণয়-পরিষদে হৈতুক পণ্ডিতকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্ব, অনুমান-প্রমাণের তত্ত্ব, তর্কের তত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্রেই সম্যক্‌রূপে—সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইয়াছে, ঐগুলি ন্যায়বিদ্যারই প্রস্থান। সুতরাং হেতুর দ্বারা কিছু বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলেই ন্যায়শাস্ত্র অপরিহার্য্য অবলম্বন। তাই পুরাণে এবং বেদের চরণব্যূহে ন্যায়শাস্ত্র "ন্যায়তর্ক" নামে বেদের উপাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে[১]। আচার্য্য শঙ্করও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্রভাষ্যে বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে বেদকে বলিয়াছেন—"অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিত"। অনেক অঙ্গ ও উপাঙ্গ বেদের উপকরণ। পুরাণ, ন্যায় মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গ, এই দশটি বিদ্যাস্থান অর্থাৎ বেদার্থবোধে হেতু। বেদ ঐ দশটি বিদ্যাস্থানের দ্বারা উপকৃত। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকার শঙ্করের ঐ কথার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদার্থ-বোধের জন্য সুপ্রাচীন কালেও বেদাঙ্গ ব্যাকরণশাস্ত্রের ন্যায় বেদের উপাঙ্গ ন্যায় শাস্ত্রও আলোচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং যে আকারেই হউক, ন্যায়শাস্ত্র সুপ্রাচীন কালেও ছিল, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সকল বিদ্যারই পরমাত্মা হইতে প্রবৃত্তি, ইহা উপনিষদে

১। মীমাংসা-ন্যায়তর্কশ্চ উপাঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।—ন্যায়সূত্রবৃত্তিকারের উদ্ধৃত পুরাণ-বচন। তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। তথা প্রতিপদমনুপদং ছন্দো ভাষা ধর্ম্মো মীমাংসা ন্যায়তর্কা ইত্যুপাঙ্গানি।—চরণব্যূহ।

বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তন্মধ্যে "সূত্রাণি" এই কথাও পাওয়া যায় (২।৪।১০)। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় "সূত্রাণি ভাষ্যাণি" এই কথার দ্বারা সূত্রের ন্যায় ভাষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায় (৩ অ°, ১৮৯)। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ন্যায়ভাষ্যের শেষে অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, এই কথা বলিয়াছেন; অক্ষপাদ ঋষিকে ন্যায়শাস্ত্রকর্ত্তা বলেন নাই। ন্যায়-বার্ত্তিকারম্ভে উদ্দ্যোতকরও অক্ষপাদ মুনিকে ন্যায়শাস্ত্রের বক্তা বলিয়াছেন, কর্ত্তা বলেন নাই।

পরন্তু বিচারপূর্ব্বক বেদার্থবোধে যেমন ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক, তদ্রূপ মুমুক্ষুর শ্রবণের পর কর্ত্তব্য মননে ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ আবশ্যক। কারণ, শাস্ত্র দ্বারা যে তত্ত্বের শ্রবণ অর্থাৎ শাব্দ বোধ করিবে, অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ নির্ণীত তত্ত্বের পুনর্জ্ঞানই মনন। শ্রুত তত্ত্বে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবার জন্যই বহু হেতুর দ্বারা ঐ জ্ঞাত বিষয়েও পুনঃ পুনঃ অনুমানরূপ মননের বিধি শাস্ত্রে উপদিষ্ট। (মন্তব্যশ্চোপ-পত্তিভিঃ)। শ্রবণের পরে মনের দ্বারা ধ্যানাদিই মনন নহে। ধ্যানাদি (নিদিধ্যাসন) মননের পরে বিহিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির "মন্তব্যঃ" এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্করও বলিয়াছেন—"পশ্চান্মন্তব্যস্তর্কতঃ"। অর্থাৎ শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা মনন করিবে, উপনিষদুক্ত যোগাঙ্গবিশেষ উহরূপ তর্ককেই মনন বলেন নাই। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বেদান্তবাক্যের অবিরোধি অনুমান প্রমাণও শ্রুত বেদার্থজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য অবলম্বনীয়। কারণ, শ্রুতিই তর্ককে সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। এই বলিয়া শেষে "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভামতী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ঐ মননের ব্যাখ্যা করিতে যুক্তিবিশেষের দ্বারা বিবেচনকে মনন বলিয়াছেন এবং ঐ যুক্তিকে বলিয়াছেন—অর্থাপত্তি অথবা অনুমান। মীমাংসক-মতে অর্থাপত্তি অনুমান-প্রমাণ হইতে ভিন্ন প্রমাণ; সুতরাং বাচস্পতি মিশ্র তাহারও প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মতে অর্থাপত্তি অনুমানবিশেষ। মূলকথা, শ্রবণের পরে অনুমানরূপ মনন সর্ব্বসম্মত। আচার্য্য শঙ্করও তর্কের দ্বারা মনন কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আত্মবিষয়ে কুতর্কেরই নিষেধ করিয়াছেন, তর্কমাত্রের নিষেধ করেন নাই। পরন্তু শ্রুতিই যে ঐ বিষয়ে তর্ককে অবলম্বনীয় বলিয়াছেন, ইহাও শঙ্কর বলিয়াছেন। কঠোপনিষৎ যেখানে আত্মাকে "অতর্ক্য" বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া," সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর ঐ তর্ক শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—শাস্ত্র-নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা উহরূপ কুতর্ক[১]।

শাস্ত্রদ্বারা আত্মার শ্রবণ (শাব্দ বোধ) করিয়াই পরে সেই শাস্ত্র-সম্মতরূপে অনুমানরূপ মনন করিতে হইবে। শাস্ত্রকে অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীন বুদ্ধিবলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। এবং বেদশাস্ত্র-বিরোধি তর্ক—কুতর্ক। এই সকল সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্র-দায়েরই সম্মত। ন্যায়শাস্ত্রেও উহার বিপরীত বাদ নাই। বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক গৌতম মতে

১। অতর্ক্যমতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ। নহি কুতর্কস্য প্রতিষ্ঠা কচিদ্বিদ্যতে। নৈষা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহমাত্রেণ।—কঠ, ১অ, ২ বল্লী। ৮-৯। শঙ্করভাষ্য।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমান ন্যায়ই নহে, উহা ন্যায়াভাস নামে কথিত; উহা অপ্রমাণ। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতম কোন স্থানে কোন বিরুদ্ধ অনুমানের চিন্তা করিয়া "শ্রুতিপ্রামাণ্যাচ্চ" (৩।১।২৯) এই সূত্রের দ্বারা ঐ অনুমানের বেদবিরুদ্ধতা সূচনা করতঃ উহার অপ্রামাণ্য সূচনা করিয়া গিয়াছেন। গৌতম মতে শ্রুতি অপেক্ষায় যুক্তিই প্রধান, অনুমানের অবিরোধে শ্রুতির প্রামাণ্য, ইহা একেবারেই অসত্য কথা। শ্রুতিসেবক ঋষির ঐরূপ মত হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমানই অন্বীক্ষা। সেই অন্বীক্ষা নির্ব্বাহের জন্যই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ। সুতরাং ন্যায়দর্শনে মীমাংসা-দর্শনের ন্যায় বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বাক্যার্থ বিচার হয় নাই। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রবক্তা গোতম যে বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অনুমানের দ্বারাই আত্মাদি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায় না। বেদপ্রতিপাদিত পদার্থকে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়ের দ্বারা পরীক্ষা করিলে ঐ পদার্থে কাহারও সংশয় বা আপত্তি থাকে না। কারণ, ঐ পঞ্চাবয়বের মূলে সর্ব্বপ্রমাণ থাকায় ঐ ন্যায়নির্ণীত পদার্থ সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই জন্য ঐ ন্যায়কে পরমন্যায় বলা হইয়াছে; উহাই প্রকৃত ন্যায়। ঐ প্রকৃত ন্যায়ের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞার মূলে সর্ব্বত্রই আগম-প্রমাণ থাকিবে। বেদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে ঐ পরমন্যায় অবলম্বনে বেদার্থের পরীক্ষা আবশ্যক হয়। গৌতমের পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায় নিরূপণের ইহা মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাত বেদার্থের সমর্থন করিতে দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই অনুমানেরও অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রেও তাহা পাওয়া যাইবে। কেবল অনুমানের দ্বারাও অনেক স্থলে আচার্য্যগণ সকলেই অনেক তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে অনুমান বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহা বৈদিক সম্প্রদায়ের সকলের মতেই অপ্রমাণ। কোন্ অনুমান বেদবিরুদ্ধ, তাহা নির্ণয় করিতেও পূর্ব্বে বেদার্থ নির্ণয় আবশ্যক। বেদে বহু প্রকারে বহু দুর্ব্বোধ তত্ত্বের বর্ণন আছে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদে সকল সিদ্ধান্তই বর্ণিত আছে। পূর্ব্বপক্ষরূপে সমস্ত নাস্তিক মতেরও উল্লেখ আছে। বেদের সর্ব্বাংশই মহর্ষিগণের অধিগত ছিল। যে সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞাতব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যার দ্বারা জ্ঞাপন আবশ্যক। সকল বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ স্মৃতির দ্বারা তাহার জ্ঞাপন ও সমর্থন না করিলে আর কেহ তাহা করিতে পারে না। বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক পুরাণশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্র প্রভৃতির প্রণেতা মহর্ষিগণ শিষ্ট, তাঁহারা সকলেই বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সকল বিদ্যাস্থানের দ্বারা বেদ উপকৃত, ইহা আচার্য্য শঙ্করের বক্তব্যবিশেষ বুঝাইতে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন[১]। মূলকথা, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ জীবের সকল দুঃখের নিদান মিথ্যাজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে কৃপা করিয়া নানাপ্রকারে বেদবর্ণিত নানা সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়াছেন। অধিকারানুসারে

১। "অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য"। পুরাণ-ন্যায়মীমাংসাদয়ো দশ বিদ্যাস্থানানি তৈস্তয়া তয়া দ্বারা উপকৃতস্য। তদনেন সমস্ত-শিষ্টজনপরিগ্রহেণাপ্রামাণ্যশঙ্কাপ্যপাকৃতা। পুরাণাদি-প্রণেতারো হি মহর্ষয়ঃ শিষ্টাস্তৈস্তয়া তয়া দ্বারা বেদান্ ব্যাচক্ষাণৈস্তদর্থঞ্চাদরেণানুতিষ্ঠদ্ভিঃ পরিগৃহীতো বেদ ইতি।—ভামতী, ৩ সূত্র।

গুরু ও শাস্ত্র-সাহায্যে বিচার দ্বারা শ্রবণ ও মনন করিলে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে অধিকার জন্মে না; সুতরাং পরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য বিবিধ তত্ত্বের বিচারাদি আবশ্যক হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক ধ্যান-ধারণাদির ফলেই চরমজ্ঞেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সে জন্য মুমুক্ষু মাত্রকেই যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতমও শেষে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য, বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিবার জন্য দার্শনিক ঋষিগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বর্ণন করিলেও তাঁহাদিগের মতভেদ দেখিয়া প্রকৃত অধিকারীর শ্রবণ-মননাদি সাধনা আজও উঠিয়া যায় নাই। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-গুলির বিচার ও সমালোচনা হইয়াছে। তাহার ফলে যে, জ্ঞান-রাজ্যের কোনই উন্নতি হয় নাই, তদ্দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের পথে আজ পর্য্যন্ত কোন লোকই যে অগ্রসর হন নাই, ইহা বলিলে পরম সত্যের অপলাপ করা হইবে। ঋষিগণ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ, আচার্য্যগণ সুচির কাল হইতে বহু প্রকারে জ্ঞানরাজ্যের বিপুল বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের গুরু। সকলের সিদ্ধান্তই তত্ত্বনির্ণীষুর জ্ঞাতব্য। সিদ্ধান্তের ভেদ না থাকিলে বিচার প্রবৃত্ত হয় না; এ জন্য মহর্ষি গোতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সিদ্ধান্তের বিশেষ উল্লেখপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ বলিয়া সিদ্ধান্তের ভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গোতম অন্য দর্শনের সিদ্ধান্তকেও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। সকল সিদ্ধান্তবাদীই বিভিন্ন প্রকার তর্কের দ্বারা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তকে শ্রৌত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বিচারদ্বারা তত্ত্বনির্ণীষুর সে সমস্ত ব্যাখ্যাও আলোচ্য। ন্যায়াচার্য্যগণ যেরূপে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। এখন প্রকৃত কথা এই যে, মুমুক্ষুর তত্ত্ব শ্রবণের পরে বহু হেতুর দ্বারা ঐ তত্ত্বের যে মনন করিতে হইবে, তাহাতে ন্যায়দর্শন সকল সম্প্রদায়েরই পরম সহায়। কারণ, ন্যায়দর্শনে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের মননের হেতু বলা হইয়াছে, তাহা সকল সাধকেরই গ্রাহ্য। আত্মা নিত্য, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপে বহু হেতুর দ্বারা দীর্ঘকাল মনন করিলে পরলোক, জন্মান্তর, কর্ম্মফল প্রভৃতি সিদ্ধান্তে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ঐ সকল সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস সকল সাধকেরই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এইরূপ আরও অনেক সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের সমর্থন ন্যায়দর্শনে আছে। ন্যায়দর্শন যে ঐ সকল মননের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিবাদ। পরন্ত যে সম্প্রদায় গুরূপদেশ অনুসারে যেরূপেই যে তত্ত্বের মনন করিবেন, ঐ মননের হেতুজ্ঞান এবং ঐ হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক। অনুমানরূপ মনন নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাহাতে যে সকল জ্ঞান আবশ্যক, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যেই সম্যক্ লাভ করা যায়। হেতু ও হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যথার্থরূপে মনন হইতেই পারে না। সুতরাং বেদের আদেশানুসারে সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই যখন অনুমানরূপ মনন করিতেই হইবে, তখন সেই মনন নির্ব্বাহের জন্য ন্যায়শাস্ত্র সকলেরই আবশ্যক। শ্রবণ-মননের কোনই প্রয়োজন নাই, পরন্ত শাস্ত্র-বিচার ও তর্ক,

ভক্তির পরিপন্থী; সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়, ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে। শাস্ত্রানুসারী কোন সম্প্রদায়ই ইহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না। শ্রবণ ও মনন ব্যতীত কেহ উত্তমাধিকারী হইতে পারে না। যে কোন জন্মে শ্রবণ ও মনন করিয়া মহাত্মগণ সকলেই উত্তমাধিকারী হইয়াছেন এবং সকলকেই তাহা করিয়া উত্তমাধিকারী হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবও শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ ব্যক্তিকেই উত্তমাধিকারী[১] বলিয়া কৃতশ্রবণ ও কৃতমনন ব্যক্তিকেই উত্তমাধিকারী বলিয়াছেন এবং তিনি জিজ্ঞাসু সন্ন্যাসিগণকে তাঁহার অবলম্বিত ঈশ্বর-পরিণাম-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইয়া হেতু ও দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ঐ সিদ্ধান্তে আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক তর্কদ্বারা নির্ব্বিকারস্বরূপে ঈশ্বরের মনন-পদ্ধতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জিগীষাবশতঃই সেখানে বহু বিচার ও তর্ক করেন নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক[২]।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণের বাক্য অবলম্বনে অনেক কথার আলোচনা করা গেল। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে ১০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িলে ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যাইবে। পুনরুক্তি অকর্ত্তব্য বলিয়া এখানে আর সে সকল কথা বলা গেল না।

ন্যায়দর্শনের অধ্যায়াদি-সংখ্যা

ন্যায়দর্শনে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এক দিবসে যতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাই একটি আহ্নিক নামে কথিত হইয়াছে। দশ দিনে সমস্ত ন্যায়সূত্র রচিত হওয়ায় দশটি আহ্নিক হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষি সর্ব্বপ্রথমে এক দিবসে যতগুলি সূত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তাহাই আহ্নিক নামে কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। বাচস্পত্য অভিধানে পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি আহ্নিক শব্দের অন্যতম অর্থ লিখিয়াছেন, সূত্রগ্রন্থের ভাষ্যের পাদাংশ ব্যাখ্যাবিশেষ। এবং এক দিবসে পাঠ্য, ইহাই ঐ আহ্নিক শব্দের যৌগিক অর্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সূত্রগ্রন্থের অংশবিশেষও আহ্নিক নামে কথিত হইয়াছে। তদনুসারেই তাহার ভাষ্যেরও অংশবিশেষ আহ্নিক নামে কথিত বলিয়া বুঝা যায়। পরে যে দেবীপুরাণের বচন প্রদর্শন করিব, তাহাতে ন্যায়সূত্রকার গোতম দশ দিনে প্রথমে শিষ্যগণকে ন্যায়সূত্র পড়াইয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইবে।

পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায়সূত্রই যে মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি

১। শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তমাধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥—চৈ০ চ০, মধ্য, ২২।

২। অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত মণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৭ম প০।

আচার্য্যগণ নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কোন সংশয়েরও সূচনা করেন নাই। কিন্তু এখন কোন কোন ঐতিহাসিক মনীষীর সমালোচনায় ইহাও পাইয়াছি যে, প্রচলিত ন্যায়-দর্শনের অধিকাংশ সূত্রই পরে অন্য কর্ত্তৃক রচিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পরে রচনা করিয়া সংযোজিত করা হইয়াছে। ঐ সকল অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতের আলোচনা থাকায়, উহা বৌদ্ধ-যুগে রচিত এবং মূল ন্যায়শাস্ত্র কেবল হেতুবিদ্যা; উহাতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন কথাই ছিল না। এই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নবীন মতের আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থ-শেষে সমালোচনা দ্বারা সকল কথা বুঝা যাইবে।

পঞ্চাধ্যায় ন্যায়দর্শনই মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, এ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদের চিহ্ন না থাকিলেও ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও অনেক সূত্র পাঠে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দেখা যায়। বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে ন্যায়সূত্র বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও যে ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠ লইয়া বিবাদ ছিল, তাহা বাৎস্যায়নের কথার দ্বারাও অনেক স্থানে মনে আসে। যথাস্থানে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। বাৎস্যায়ন ন্যায়-ভাষ্যে ভাষ্যলক্ষণানুসারে প্রথমতঃ সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করিয়া পরে নিজেই ঐ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাকেই বলে "স্বপদ-বর্ণন"। পরে বাৎস্যায়নের ঐ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলির মধ্যে অনেক বাক্যকে অনেকে ন্যায়সূত্র-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার প্রকৃত ন্যায়সূত্রকেও অনেকে বাৎস্যায়নের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে হস্ত-লিখিত পুঁথিতে সূত্র ও ভাষ্য কোন চিহ্নাদি যোগ ব্যতীত লিপিবদ্ধ থাকায় অনেকের ঐরূপ ভ্রম হইয়াছে। সেই ভ্রমের ফলেও ন্যায়সূত্র বিষয়ে কতকগুলি মত-ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। আবার অনেকে স্বমত সমর্থনের জন্যও ন্যায়সূত্রের কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। ন্যায়সূত্র-বিবরণকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য চতুর্থাধ্যায়ের সর্ব্বশেষে "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" এইরূপ একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া তাহারও বিবরণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত কোন আচার্য্যই ঐরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; ঐ ভাবের কথাই কেহ বলেন নাই। নবীন গোস্বামিভট্টাচার্য্য যে ঐ সূত্রটি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। তিনি ঐ সূত্রটি কোন পুস্তকে পাইয়া, উহা ন্যায়সূত্র হওয়াই সম্ভব ও আবশ্যক মনে করিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ঐ সূত্রটি যে পরে কোন পণ্ডিতের রচিত, ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। মহর্ষি অক্ষপাদ ন্যায়দর্শনে বলিবেন যে, "যাহা বলিলাম, তাহা তত্ত্ব নহে। তত্ত্ব কিন্তু বাদরায়ণ হইতে অর্থাৎ বেদব্যাস-প্রণীত শাস্ত্র হইতে জানিবে", ইহা কি সম্ভব? কোন দর্শনকার ঋষি কি এইরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন? গোস্বামি ভট্টাচার্য্যও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা সংগত বোধ না হওয়ায় কষ্ট-কল্পনা করিয়া অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ঐরূপ ভাব একেবারে যায় নাই। ফলকথা, বহু কারণেই ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠ বিষয়ে বহু মত-ভেদ হইয়াছে।

প্রাচীন উদ্দ্যোতকরের সময়েও ন্যায়সূত্র-পাঠে মতভেদ ছিল, ইহা তাঁহার বার্ত্তিকে প্রকটিত আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অতিরিক্ত কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার বৃত্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকারের সংক্ষিপ্ত বাক্যমধ্যেও তাঁহার কোন কোন সূত্র দেখা যায়। বিশ্বনাথের পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য বোধসিদ্ধি বা ন্যায়পরিশিষ্ট নামে এবং গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় "অন্বীক্ষানয়-তত্ত্ববোধ" নামে ন্যায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। মিথিলেশ্বরসূরি নবীন বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়-তত্ত্বালোক নামে ন্যায়সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়া ন্যায়সূত্র-পাঠ নির্ণয়ের জন্য ন্যায়সূত্রোদ্ধার নামে গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফলকথা, ন্যায়সূত্র-পাঠাদি বিষয়ে সুচিরকাল হইতেই যে নানা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নানা গ্রন্থের দ্বারাই বুঝা যায়। এবং তাহার দ্বারা পূর্ব্বকালে ন্যায়সূত্র যে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হইয়া বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল, ইহাও বুঝা যায়। তাহাতেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা নির্ম্মাণ করিয়াও ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠাদি বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবার জন্য "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের পাঁচ অধ্যায়ে যে যে সূত্রের দ্বারা যে নামে যে প্রকরণ আছে, তাহাও সেই স্থানেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আবার সমস্ত সূত্রাদির গণনার দ্বারা ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই ন্যায়শাস্ত্রে অধ্যায় ৫। আহ্নিক ১০। প্রকরণ ৮৪। সূত্র ৫২৮। পদ ১৭৯৬। অক্ষর ৮৩৮৫। বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে সমস্ত ন্যায়সূত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়া কেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন। ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকাকার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রই যে "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করিয়াছেন, ইহাই পণ্ডিতসমাজের সিদ্ধান্ত। কারণ, ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি ন্যায়সূচীনিবন্ধের প্রারম্ভেও দেখা যায় এবং ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে "ইচ্ছামঃ কিমপি পুণ্যং" ইত্যাদি যে চতুর্থ শ্লোকটি আছে, উহা (চতুর্থ চরণ "উদ্দ্যোতকরগবীনাং" এই স্থলে "শ্রীগোতমসুগবীনাং" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া) "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"র শেষে উল্লিখিত দেখা যায় এবং ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার শেষে কথিত "সংসারজলধিসেতৌ" ইত্যাদি শ্লোকটিও ন্যায়সূচীনিবন্ধের শেষে দেখা যায়। গ্রন্থারম্ভেও "শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ" এইরূপ কথা রহিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র নামে অন্য কোন পণ্ডিত ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে তিনি সুবিখ্যাত বাচস্পতিমিশ্রের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকাদি লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের পরিচয়-বোধের বিরোধি কার্য্য কেন করিবেন ? ঐ সব শ্লোক তাঁহার নিবদ্ধ করিবার কারণই বা কি আছে ? অন্য কোন একজন পণ্ডিত "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষে অপর কেহ তাৎপর্য্যটীকাকারের শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কোন কারণ নাই। নিষ্কারণে ঐরূপ কল্পনা করিলে নানা গ্রন্থেই ঐরূপ কল্পনা করা যায়। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় যেরূপ সূত্রপাঠের উল্লেখ করিয়াছেন, ন্যায়সূচীনিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাহার সাম্য দেখা যায়। দুই এক স্থানে যে একটু বৈষম্য দেখা যায়, তাহা লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদ-জন্য, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। মুদ্রিত

তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থে অনেক স্থলে ন্যায়সূত্র পাঠের উল্লেখ দেখাও যায় না (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য)। আবার মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকায় লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ কোন কোন স্থলে অনেক অংশ মুদ্রিতও হয় নাই ; ইহাও এক স্থলে ভাষ্যব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি (২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থের সহিত ন্যায়সূচীনিবন্ধের কোন বিরোধ নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু ন্যায়সূচীনিবন্ধের সূত্রপাঠের সহিত তাৎপর্য্যটীকার সূত্রপাঠের যে সাম্য দেখা যায়, তাহার দ্বারা তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রই যে ন্যায়সূচীনিবন্ধকার, ইহা বুঝা যায়। এই গ্রন্থের টিপ্পনীতে যথাস্থানে তাহা দেখাইয়াছি এবং ন্যায়সূত্রপাঠে মতভেদের আলোচনাও করিয়াছি। উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে ন্যায়সূত্রগুলির উদ্ধার করিয়াই পরে তাঁহার নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মত সূত্রপাঠ নির্ণয় করা যায় না। মুদ্রিত বার্ত্তিক গ্রন্থে সূত্রপাঠের বৈষম্যও দেখা যায়। উদ্দ্যোতকর বার্ত্তিকনিবন্ধে অনেক স্থলে "ইহা সূত্র" ইত্যাদি প্রকারে সূত্রের পরিচয় দিলেও অনেক স্থলে ঐরূপ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু কোন স্থলে সূত্রপাঠে বিবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের টীকা করিয়াও শেষে স্বতন্ত্রভাবে ন্যায়সূত্রের পাঠাদি নির্ণয়ের জন্য ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে সমস্ত ন্যায়-সূত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি হইতে প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত বহুশ্রুত মহামনীষী তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়সূচীনিবন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। তাই ন্যায়সূচীনিবন্ধানুসারেই সূত্রপাঠাদি গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে ন্যায়সূচীনিবন্ধের সূত্রপাঠেরও সমালোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ন্যায়সূচীনিবন্ধানুসারেই সেই অধ্যায়ের প্রকরণগুলির নাম ও সূত্রসংখ্যা প্রকাশ করিয়াছি। প্রথমাধ্যায়ের প্রকরণাদি-সংখ্যা এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষির নামাদি

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বহু আচার্য্য ন্যায়সূত্রকার মহর্ষিকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ন্যায়সূত্র যে মহর্ষি গৌতম বা গোতম মুনির প্রণীত, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ আছে ; বহু গ্রন্থকারও তাহা লিখিয়াছেন। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষির অক্ষপাদ নামবিষয়ে কোন বিবাদ নাই ; কিন্তু তিনি যে গৌতম বা গোতম, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। কেহ বলেন গৌতম, কেহ বলেন গোতম। গোতম মুনি বলিলে অন্য গোতম মুনিকেও বুঝা যাইতে পারে, এই জন্যই মনে হয়, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি দূরদর্শী আচার্য্যগণ অক্ষপাদ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন অক্ষপাদ কোন্ মুনির নামান্তর, ইহা জানিতে পারিলেই ন্যায়সূত্রকার মহর্ষির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অনুসন্ধানের ফলে স্কন্দপুরাণে পাইয়াছি[১], অহল্যাপতি গৌতম মুনির নামান্তর অক্ষপাদ। অহল্যাপতি ঋষি যে গৌতম, ইহা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে

১। অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোঽভবন্মুনিঃ।
গোদাবরীসমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ ॥—মাহেশ্বরখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, ৫৫ অঃ, ৫ শ্লোক।

পাওয়া যায় এবং তিনি গৌতম নামেই সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারতাদি বহু গ্রন্থের গৌতম পাঠ অশুদ্ধ বলা এবং ঐ সুপ্রসিদ্ধিকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ নৈষধীয়চরিতে ইন্দ্রের নিকটে চার্ব্বাকের কথা বর্ণন করিতে ন্যায়শাস্ত্রবক্তা মুনিকে গোতম নামে উল্লেখ করিয়াছেন[১]। চার্ব্বাক ন্যায়শাস্ত্রবক্তা মুনিকে গোতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠ বা মহাবৃষভ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, ইহা শ্রীহর্ষ ঐ শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ গৌতম বলিয়াও ঐ উপহাস বর্ণন করিতে পারিতেন। কারণ, গৌতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠের বংশধর, এই অর্থেও গৌতম বলিয়া চার্ব্বাক ঐ ভাবে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ যখন গোতম নামের উল্লেখ করিয়াই চার্ব্বাকের উপহাস বর্ণন করিয়াছেন এবং "গোতমং তং অবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ" অর্থাৎ তোমরা বিচার করিয়াই তাহাকে গোতম বলিয়া যেমন জান, তিনি তাহাই, এইরূপ কথা বলিয়া ঐ উপহাস বর্ণন করিয়াছেন, তখন শ্রীহর্ষ যে ন্যায়শাস্ত্রবক্তা মুনিকে গোতমই বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈষধীয় চরিতের টীকাকারগণও ঐ শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোতমের বহু অপত্য বুঝাইলেই পাণিনি সূত্রানুসারে গোতম পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং "গোতমং" এই প্রয়োগে গোতমের অপত্য বুঝাও যায় না।

রামায়ণাদি বহু গ্রন্থে আমরা অহল্যাপতি ঋষির গৌতম নামে উল্লেখ দেখিলেও এবং এ দেশে ঐরূপ সুপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মিথিলায় তিনি গোতম নামে প্রসিদ্ধ, ইহাও জানা যায়। বর্ত্তমান দারভাঙ্গা ষ্টেশনের ৭ ক্রোশ উত্তরে কামতৌল ষ্টেশন। সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে গোতমের আশ্রম নামে সুপ্রসিদ্ধ একটি স্থান আছে। তত্রত্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কথায় জানা যায়, ঐ আশ্রমেই গোতম মুনি তপস্যা করিয়া গোতমী গঙ্গা আনয়ন করেন। তন্মধ্যে যে কূপ আছে, তাহা দেবদত্ত কূপ। এক সময়ে গোতম মুনি পিপাসায় পীড়িত হইয়া দেবগণের নিকটে জলপ্রার্থী হইলে দেবগণ অদূরস্থ কূপকে উদ্ধৃত করিয়া যে দিকে গোতম ঋষি অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিক্ দিয়া বক্রভাবে প্রেরণ করেন। এইরূপে কূপ লইয়া দেবগণ জলের দ্বারা গোতম ঋষিকে পরিতৃপ্ত করেন। ঋগ্বেদসংহিতায় এইরূপ বর্ণন আছে। পূর্ব্বোক্ত গোতমের আশ্রমের দুই ক্রোশ দূরে "আহিরিয়া" নামে প্রসিদ্ধ অহল্যাস্থান আছে। বর্ত্তমান ছাপরা নগরীর সন্নিহিত গঙ্গাতীরেও অহল্যাপতি গোতমের অপর আশ্রম ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে মহর্ষি গোতমের স্মরণার্থ ঐ স্থানে "গোতম পাঠশালা" নামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালায় মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কিন্তু

১। মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাং।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥ ১৭, ৭৫॥

যঃ সচেতসাং চৈতন্যবতাং সুখদুঃখাদ্যনুভবাভাবাৎ শিলাত্বায় পাষাণাবস্থারূপায়ৈ মুক্তয়ে মুক্তিং প্রতিপাদয়িতুং শাস্ত্রমূচে, ন্যায়দর্শনং নির্ম্মমে, যূয়ং তং স্বয়মেব অবেত্য বিচার্য্যৈব গোতমং এতন্নামানং যথা বিত্থ জানীত স এব তথা নান্য ইত্যর্থঃ। স গোতমো যথা যুষ্মাকং সম্মতস্তথা মমাপীত্যর্থঃ। নায়ং পরং নাম্না গোতমঃ, কিন্তু প্রকৃষ্টো গৌঃ গোতমো মহাবৃষভঃ পশুরেব। টীকাকারাঃ।

মিথিলার আশ্রমেই ন্যায়সূত্র রচিত হইয়াছে, মিথিলাতেই ন্যায়সূত্রের প্রথম চর্চ্চা, ইহা মৈথিল পণ্ডিতগণের নানা কারণে বিশ্বাস। (পূর্ব্বোক্ত গোতমের আশ্রম সম্বন্ধে মৈথিলবার্ত্তা "ভারতবর্ষ" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ ঋগ্বেদসংহিতায়[১] গোতম ঋষির কূপ লাভের কথা আমরা দেখিতেছি। ঐ মন্ত্রের পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপ আখ্যায়িকার বর্ণন করিয়াছেন। রাহূগণ গোতম ঐ সূক্তের ঋষি। কাশী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ বহুদর্শী ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় প্রথমে ন্যায়কন্দলীর ভূমিকায়, মৎস্যপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত উশিজ মহর্ষির পুত্র দীর্ঘতমা নামে অন্ধ গোতমকে ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছিলেন। পরে ন্যায়বার্ত্তিক-ভূমিকায় তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত অজ্ঞতামূলক বলিয়া নানা কল্পনার আশ্রয়ে রাহূগণ গোতমকেই ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন। তিনি সূক্তদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া তাঁহার শাস্ত্রকর্তৃত্ব সম্ভব। দীর্ঘতমা গোতম অন্ধ, তাঁহার শাস্ত্র-কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। পরন্তু অন্ধের অক্ষপাদত্ব প্রমাণ সহস্রেও হয় না। রাহূগণ (রহূগণপুত্র) গোতম বিদেহরাজের পুরোহিত ছিলেন, ইহা শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে[২]। অহল্যার পুত্র শতানন্দ জনকরাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহা বাল্মীকি রামায়ণেও বর্ণিত আছে। সুতরাং রাহূগণ গোতমই অহল্যাপতি। তাঁহারই পুত্র শতানন্দ। তিনি গোতম নহেন। শ্রীহর্ষও ন্যায়সূত্রকারকে গোতম বলিয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয়ের এই সকল কথা ও শেষ সিদ্ধান্ত "ন্যায়বার্ত্তিক ভূমিকা" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

দ্বিবেদী মহাশয়ের যুক্তির বিচার না করিয়া এখন এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি ঋগ্বেদাদি-বর্ণিত রাহূগণ গোতমকেই অহল্যাপতি ও ন্যায়সূত্রকার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, বিদেহ-রাজবংশে তাঁহার পৌরোহিত্য নিবন্ধন জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও তিনি গোতমবংশীয় বলিয়া তাঁহাকে গৌতম বলিতে হয়। কারণ, বৌধায়ন, গোত্রপ্রবর্ত্তক সপ্তর্ষির মধ্যে যে গোতমের নাম (পাঠান্তরে গৌতম) বলিয়াছেন, তাঁহারই দশটি শাখার মধ্যে রাহূগণ সপ্তম শাখা। বৌধায়ন গোতমকাণ্ডে (২ অঃ) রহূগণ ঋষিকেও গোতম-

১। জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তয়া দিশাঽ-
সিংচন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে।
আগচ্ছংতমবসা চিত্রভানবঃ
কামং বিপ্রস্য তর্পয়ংত ধামভিঃ॥ ১ ম; ১৪অ; ৮৫সূক্ত। ১১।

সায়ণভাষ্য।—মরুতো"ঽবতং" উদ্ধৃতং কূপং যস্যাং দিশি ঋষির্ব্বসতি "তয়া দিশা" "জিহ্মং" বক্রং তির্য্যঞ্চং "নুনুদ্রে" প্রেরিতবন্তঃ। এবং কূপং নীত্বা ঋষ্যাশ্রমেঽবস্থাপ্য "তৃষ্ণজে" তৃষিতায় "গোতমায়" তদর্থং "উৎসং" জলপ্রবাহং কূপাদুদ্ধৃত্য "অসিঞ্চন্" আহাবেঽবানয়ন্। এবং কৃত্বা "ঈম্" এনং স্তোতারং ঋষিং "চিত্রভানবো" বিচিত্রদীপ্তয়স্তে মরুতো "ঽবসা" ঈদৃশেন রক্ষণেন সহ "আগচ্ছন্তি" তৎসমীপং প্রাপ্নুবন্তি। প্রাপ্য চ "বিপ্রস্য" মেধাবিনো গোতমস্য "কামং" অভিলাষং "ধামভিঃ" আয়ুষো ধারকৈরুদকৈ"স্তর্পয়ন্ত" অতর্পয়ন্।

২। বিদেঘো হ মাথবোঽগ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতমো রাহূগণঋষিঃ পুরোহিত আস। ৪অ০। ১ব্রা০।

গণের মধ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং রাহূগণ ঋষি গোত্রপ্রবর্ত্তক মূল পুরুষ গোতমের অপত্য হওয়ায় তিনি গৌতম। ফলকথা, রাহূগণ যে গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম নহেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই ("নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থের গোত্রপ্রবর-নির্ণয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তিনি সূক্তদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া গোতম-বংশে তাঁহার প্রাধান্য নিবন্ধন বেদে মূল পুরুষ গোতম নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হয়। পূর্ব্বকালে মূল পুরুষের নামেও প্রধান ব্যক্তির নাম ব্যবহার ছিল। জনক রাজার পূর্ব্বপুরুষ নিমিরাজার পৌত্র জনক প্রথম জনক রাজা ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই রাজর্ষি জনক জনক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহা বাল্মীকি রামায়ণের কথায় বুঝা যায় (আদিকাণ্ড, ৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য)। গোত্রকারী সপ্তর্ষি বসিষ্ঠাদিও পূর্ব্ববর্ত্তী বসিষ্ঠাদির অপত্য বলিয়া গোত্র হইয়াছেন অর্থাৎ বসিষ্ঠাদির অপত্যও বসিষ্ঠাদি নামে গোত্র হইয়াছেন, ইহাও "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থে কথিত হইয়াছে[১]। এখন যদি রাহূগণ, গোতমবংশীয় হইয়াও পূর্ব্বোক্ত কারণে বেদে গোতম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীহর্ষও ঐ প্রসিদ্ধি অনুসারে এবং বৈদিক প্রয়োগানুসারে তাঁহাকে গোতম বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। নচেৎ গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম মুনি অথবা অন্য কোন গোতম মুনি ন্যায়শাস্ত্রবক্তা, এ বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় শ্রীহর্ষ তাহা কিরূপে বলিবেন ? স্কন্দপুরাণে যখন অহল্যাপতি গৌতম মুনিরই অক্ষপাদ নাম পাওয়া যাইতেছে এবং মিথিলা প্রদেশে অহল্যাপতি মুনিই ন্যায়সূত্র রচনা করেন, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কারও তদ্দেশীয় এবং এতদ্দেশীয় বহু পণ্ডিতের আছে, তখন অন্য বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন গোতম বা গৌতম মুনিকে ন্যায়সূত্রকার বলা যাইতে পারে না। মহামনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাচস্পত্য অভিধানে অহল্যাপতি মুনিকে গোতমই বলিয়াছেন। তিনি স্কন্দপুরাণের বচনের উল্লেখ করেন নাই। তিনি শ্বেতবারাহ কল্পে ব্রহ্মার মানস পুত্র গোতমের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষপাদ নামের বা ন্যায়সূত্র-কর্ত্তৃত্বের কোন প্রমাণ দেন নাই। পরে পূর্ব্বোক্ত শ্রীহর্ষের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শ্রীহর্ষের শ্লোকানুসারেই ন্যায়সূত্রকারকে অহল্যাপতি গোতম বলেন নাই, ইহা বুঝা যায়। বিশ্বকোষেও তাঁহারই কথার অনুবাদ করা হইয়াছে। শ্রীহর্ষের শ্লোকে আরও অনেকেই নির্ভর করিয়াছেন। আমিও তদনুসারে এই গ্রন্থে ন্যায়সূত্রকারকে বহু স্থলে গোতম নামে উল্লেখ করিয়াছি। যে কারণেই হউক, শ্রীহর্ষ যখন ন্যায়সূত্রকারকে গোতম বলিয়াছেন, তখন তদনুসারে ন্যায়সূত্রকারকে গোতম বলা যাইতে পারে। তবে শ্রীহর্ষের ঐরূপ উল্লেখের পূর্ব্বোক্ত প্রকার কারণ বুঝিলে সামঞ্জস্য হয়; অহল্যাপতি মহর্ষির গৌতম নামেরও অপলাপ করিতে হয় না, লোকপ্রসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করিতে হয় না। যাহাতে সর্ব্বসামঞ্জস্য হয়, সেইরূপ চিন্তা না করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চিন্তাই কর্ত্তব্য নহে।*

১। যদ্যপি বসিষ্ঠাদীনাং ন গোত্রত্বং যুক্তং তেষাং সপ্তর্ষিত্বেন তদপত্যত্বাভাবাৎ তথাপি তৎপূর্ব্বভাবি-বসিষ্ঠাদ্যপত্যত্বেন গোত্রত্বং যুক্তং।—অতএব পুর্ব্বেষাং পরেষাঞ্চ এতদ্গোত্রং। নির্ণয়সিন্ধু, ২০২ পৃষ্ঠা।

* পরে দেবীপুরাণের কোন বচনে পাইয়াছি, "গবা বাচা তময়তি খেদয়তি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে

গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গৌতমের শিষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এক সময়ে গৌতমের মতের নিন্দা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর এ চক্ষুর দ্বারা উঁহার মুখ দর্শন করিব না। শেষে বেদব্যাস স্তুতির দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ যোগবলে নিজ চরণে চক্ষুঃ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদব্যাসকে দর্শন করেন। তখন বেদব্যাস অক্ষপাদ নামোল্লেখে তাঁহার স্তুতি করায় তিনি তখন হইতে অক্ষপাদ নামে অভিহিত হন। এই প্রবাদের মূলে ঐরূপ ঘটনা আছে কি না বা থাকিতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও বাচস্পত্য অভিধানে (অক্ষপাদ শব্দে) পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা পৌরাণিক কথা। কিন্তু অশেষ-শাস্ত্রদর্শী তর্কবাচস্পতি মহাশয় অন্যান্য স্থলে পুরাণাদি গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিয়াও ঐ স্থলে ঐ কথা কোন্ পুরাণে আছে, তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনিও পূর্ব্বোক্ত প্রবাদানুসারে ঐ কথা কোন পুরাণে আছে, ইহা বিশ্বাস করিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রবাদই একেবারে নির্মূল হয় না। ঐতিহ্য বা জনশ্রুতির নিরপেক্ষ প্রামাণ্য না থাকিলেও উহার মূল একটা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, দেবীপুরাণের শুম্ভ-নিশুম্ভ-মথন-পাদে গৌতমের অক্ষপাদ নাম ও ন্যায়দর্শন রচনার কারণাদি বর্ণিত আছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, রজিপুত্রগণের মোহনের জন্য এক সময়ে নাস্তিক্য মতের প্রচার হয়; তাহার ফলে যাগযজ্ঞাদি বিলুপ্ত হইতে থাকে। তখন দেবগণ শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার আদেশে গৌতমের শরণাপন্ন হন। গৌতম তখন নাস্তিক্য মত নিরাসের জন্য যাত্রা করিলে, শিব শিশুরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নাস্তিক্য মতের অনুকূল তর্ক করিতে থাকেন। সপ্তাহ কাল বিচারে কাহারও পরাজয় না হওয়ায় গৌতম চিন্তিত হইয়া মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন শিব গৌতমকে উপহাস করিয়া বলেন যে,[১] হে বেদধর্ম্মজ্ঞ মুনে! মেধাবিন্! তুমি এই ক্ষুদ্র নাস্তিক বালক আমাকে পরাজিত না করিয়া কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ? তুমি কিরূপে সেই বৃদ্ধ, লোক-সম্মত, বিদ্বান্ নাস্তিকগণকে মহাযুদ্ধে নিরস্ত করিবে? অতএব শীঘ্র পলায়ন কর। তখন গৌতম মুনি তাঁহাকে

ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদ "গোতম" নামে এবং গোতমের বংশজাত বলিয়া "গৌতম" নামেও অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থে অক্ষপাদ "গোতম" নামে অভিহিত হইলেও কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। সে বচনটি এই—

গৌর্ব্বাক্ তয়ৈব তময়ন্ পরান্ গোতম উচ্যতে।
গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ॥

—শুম্ভনিশুম্ভমথনপাদ, ১৩ অঃ

১। ভো মুনে বেদধর্ম্মজ্ঞ কিং তুষ্ণীমাস্যতে চিরং।
মামনির্জ্জিত্য মেধাবিন্ ক্ষুদ্রনাস্তিকবালকং॥
কথন্তু বিদুষো বৃদ্ধান্ নাস্তিকান্ লোকসম্মতান্।
বিজেষ্যসি মহাযুদ্ধে তৎ পলায়স্ব মাচিরং॥

শিব বলিয়া বুঝিয়া তাঁহার স্তব করিলে শিব তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে বৃষবাহনরূপ দর্শন করাইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া[১] বলিলেন যে, তুমি তর্কে কুশল, তুমি ভিন্ন বাদ-যুদ্ধের দ্বারা আর কে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে? আমি তোমার এই বাদের জন্য সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমার নাম ধারণ করিব, তুমি ত্রিনেত্র হইবে। শিব যখন এই সকল কথা বলেন,[২] তখন তাঁহার বাহন বৃষ, নিজ দন্ত-লিখিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থকে প্রদর্শন করতঃ জৃম্ভণ করেন। পশ্চাৎ শিবের কৃপা লাভ করিয়া গৌতম মুনি ঐ ষোড়শ পদার্থের ঈক্ষা অর্থাৎ দর্শন করায় তিনি "আন্বীক্ষিকী" নামে বিদ্যা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন এবং শিবের আদেশবশতঃ তিনি নাস্তিক্য-মত-নাশিনী ঐ বিদ্যাকে দশ দিনে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করান। তাহার কিছু কাল পরে[৩] বেদব্যাস

১। সাধু গৌতম! ভদ্রন্তে তর্কেষু কুশলো হ্যসি।
ত্বামৃতে বাদযুদ্ধেন কো মাং তোষয়িতুং ক্ষমঃ॥
অনেন তব বাদেন তোষিতোঽহং মহামুনে।
ত্বন্নাম ধারয়িষ্যামি ত্বং ত্রিনেত্রো ভবিষ্যসি॥

২। ইত্যেবং ব্রুবতঃ শম্ভোর্জজৃম্ভে বাহনো বৃষঃ।
দর্শয়ন্ দন্তলিখিতান্ প্রমাণাদীংশ্চ ষোড়শ॥
শম্ভোঃ কৃপামনুপ্রাপ্য যদীক্ষামকরোন্মুনিঃ।
তেন চান্বীক্ষিকীসংজ্ঞাং বিদ্যাং প্রাবর্ত্তয়ৎ ক্ষিতৌ॥
আদেশেন শিবস্যৈব স শিষ্যান্ দশভির্দ্দিনৈঃ।
পাঠয়ামাস তাং বিদ্যাং নাস্তিক্যমতনাশিনীং॥

৩। ততঃ কালেন কিয়তা ব্যাসো গুরুনিদেশতঃ।
সমাবৃত্তো গৃহস্থোঽভূদ্‌বেদব্যাখ্যানকোবিদঃ॥
স তর্কং নিন্দয়ামাস ব্রহ্মসূত্রোপদেশকঃ।
তচ্ছ্রুত্বা গৌতমঃ ক্রুদ্ধো বেদব্যাসং প্রতি স্থিতঃ॥
প্রতিজজ্ঞে চ নৈতাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং পশ্যামি তন্মুখং।
যঃ শিষ্যো দ্বেষ্টি বৈ তর্কং চিরায় গুরুসম্মতং॥
ব্যাসোঽপি ভগবাংস্তস্য গুরোঃ কোপং বিমৃশ্য চ।
আযযৌ ত্বরিতস্তত্র যত্রাভূদ্‌গৌতমো মুনিঃ॥
অসকৃদ্দণ্ডবদ্‌ভূত্বা পাদয়োঃ প্রণিপত্য চ।
প্রসাদয়ামাস গুরুং কুতর্কো নিন্দিতো ময়া॥
প্রসন্নো গৌতমো ব্যাসে প্রতিজ্ঞাং স্বাঞ্চ সংস্মরন্।
পাদেঽক্ষি স্ফোটয়ামাস সোঽক্ষপাদস্ততোঽভবৎ॥"

—দেবীপুরাণ, শুম্ভনিশুম্ভমথনপাদ, ১৬ অঃ।

দেবীপুরাণের এই অংশ মুদ্রিত হয় নাই। নিখিল-শাস্ত্রদর্শী, নানা শাস্ত্রগ্রন্থকার, অক্ষপাদগৌতমবংশধর, স্বনামখ্যাত পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে আমি গৌতমের অক্ষপাদ নামের প্রবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রাচীন পুস্তক হইতে এই বচনগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি ইহা তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি, অন্যত্র পাই নাই। এ জন্য তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।• তাঁহার মতেও ন্যায়সূত্রকার অহল্যাপতি গৌতম।

গুরু গৌতমের আজ্ঞানুসারে সমাবর্ত্তনের পরে গৃহস্থ হইয়া ব্রহ্মসূত্রে তর্কের নিন্দা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া গৌতম, বেদব্যাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই চক্ষুর দ্বারা তাহার মুখ দেখিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। বেদব্যাসও গুরু গৌতমের ক্রোধবার্ত্তা পাইয়া শীঘ্র গৌতমের নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া বলেন যে, আমি কুতর্কের নিন্দা করিয়াছি। তখন গৌতম মুনি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ নিজ চরণে চক্ষু স্ফুটিত করেন, তজ্জন্য তিনি অক্ষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বচনগুলির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাই যে গৌতমের অক্ষপাদ নামাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রবাদের মূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং ঐ প্রাচীন প্রবাদের মূল পূর্ব্বোক্ত বচনগুলি যে আধুনিক নহে, ইহা বুঝা যায়।* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শিববাক্যে পাওয়া যায়,[১] "সপ্তবিংশ দ্বাপরে জাতূকর্ণ্য যে সময়ে ব্যাস হইবেন, সে সময়েও আমি প্রভাসতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া লোকবিশ্রুত যোগাত্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্ম্মা হইব। সেখানেও আমার সেই তপোধন পুত্রগণ (চারি শিষ্য) হইবে"। (১) অক্ষপাদ, (২) কণাদ বা কুমার, (৩ উলূক, (৪) বৎস। বায়ুপুরাণেও (পূর্ব্বখণ্ড, ২৩ অঃ) ঐ কথা আছে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণে অক্ষপাদ প্রভৃতি চারি শিষ্যকেই পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, লিঙ্গপুরাণে (২৪ অঃ) অক্ষপাদ প্রভৃতিকে সোমশর্ম্মার শিষ্য বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। তবে লিঙ্গপুরাণে "কণাদ" স্থলে "কুমার" আছে। অনেকে ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণেও "অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ" ইহাই প্রকৃত পাঠ বলেন। সে যাহা হউক, অক্ষপাদনামা তপোধন যে সপ্তবিংশ দ্বাপর যুগের শেষে প্রভাস তীর্থে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণের দ্বারা জানিতে পারি। পুরাণবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, চতুর্দ্দশ দ্বাপর বা কলিতে[২] সুরক্ষণ ব্যাসের আবির্ভাব হইলে যে গৌতম শিবের অবতাররূপে যোগের উপদেশ করেন, তিনিই আবার সপ্তবিংশ দ্বাপরের শেষে অক্ষপাদ নামে শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে জগতে জ্ঞান প্রচার করেন। বস্তুতঃ স্কন্দপুরাণে অহল্যাপতি গৌতম মুনিই অক্ষপাদ ও মহাযোগী বলিয়া কথিত। কূর্ম্মপুরাণে তিনি শিবের অবতার বলিয়া কথিত। স্কন্দপুরাণে বহু স্থলে তাঁহার পরম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

* গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী জয়ন্তভট্টও ন্যায়মঞ্জরীর শেষে অক্ষপাদ যে বাদে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা লিখিয়াছেন।

১। সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে। জাতূকর্ণো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ ॥ ১৪৯ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ। প্রভাসতীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫০ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ। অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥ ১৫১ ॥
—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অনুষঙ্গপাদ, ২৩ অঃ।

২। যদা ব্যাসঃ সুরক্ষণঃ পর্য্যায়ে তু চতুর্দ্দশে। তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥
বংশে ত্বঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম যোগবিৎ। তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনং ॥
—ব্রহ্মাণ্ড, অনুষঙ্গ, ২৩ অঃ।

মহাভারতে অহল্যাপতি গৌতমের বহু সহস্র শিষ্যের কথা, প্রিয়তম শিষ্য উতঙ্কের উপাখ্যান ও অহল্যার কুণ্ডলানয়ন-বার্ত্তা বর্ণিত আছে (অশ্বমেধপর্ব্ব, ৫৬ অঃ দ্রষ্টব্য)। সোমশর্ম্মার শিষ্যরূপে অক্ষপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত, ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদির দ্বারা বলা যায়। তবে তিনি কোন্ সময়ে ন্যায়সূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি সোমশর্ম্মার শিষ্য হইয়া প্রভাস তীর্থেই ন্যায়সূত্র রচনা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। অক্ষপাদ গৌতম দীর্ঘতপা, সুদীর্ঘজীবী, মহাযোগী। স্কন্দ-পুরাণে তাঁহার নানা স্থানে ভ্রমণাদি ও গৌতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। তবে মিথিলাতেই সর্ব্বাগ্রে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চারম্ভ ও নানা ন্যায়গ্রন্থ নির্ম্মাণ হইয়াছে। মিথিলাবাসী গৌতম মিথিলার আশ্রমেই ন্যায়সূত্র রচনা করেন, ইহা পণ্ডিত-সমাজের ধারণা। মৈথিল পণ্ডিত-গণও তাহাই বলেন। কিন্তু যেখানে গৌতম পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই ন্যায়সূত্রের রচনা হইয়াছে, ইহাও অনেকের ধারণা। এ সকল বিষয়ে যে এখন প্রকৃত তত্ত্বে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে, তাহা মনে হয় না।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্যোতকর

ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের প্রকৃত পরিচয় সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা এখন অতি দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজে ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, মুনি, এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কার ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য-প্রকরণের শেষে বর্ণিত মুনিগণের মধ্যে বাৎস্যায়ন নামে মুনিবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেকে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে পক্ষিল স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তার্কিকরক্ষার প্রারম্ভে বরদরাজের কথা ও টীকাকার মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের অপর নাম পক্ষিল এবং তিনিও ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদের ন্যায় মুনি[১]। বাচস্পত্য অভিধানে মহামনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও "পক্ষিল" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—গৌতম সূত্রভাষ্যকার মুনিবিশেষ। তাঁহার প্রকাশিত বাৎস্যায়ন ভাষ্যকেও তিনি "বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য" বলিয়া লিখিয়াছেন। দয়ানন্দ স্বামী তাঁহার "ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা" গ্রন্থে ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকারকে বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৬ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকের শেষে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে "অক্ষপাদপ্রতিম" বলিয়াছেন[২]। ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র উপমানসূত্র (১।৬) ভাষ্য-ব্যাখ্যায় এবং তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ উপমান ব্যাখ্যায় নিজের ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্য ভগবান্

১। অক্ষচরণপক্ষিলমুনিপ্রভৃতয়ো বর্ণয়ন্তি।—তার্কিকরক্ষা।
অক্ষচরণ-পক্ষিলৌ সূত্রভাষ্যকারৌ।—মল্লিনাথ টীকা।

২। যদক্ষপাদপ্রতিমো ভাষ্যং বাৎস্যায়নো জগৌ।
অকারি মহতস্তস্য ভারদ্বাজেন বার্ত্তিকং॥

ভাষ্যকার বলিয়া বাৎস্যায়নের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তার্কিকরক্ষার টীকায় মহামনীষী মল্লিনাথ সেখানে লিখিয়াছেন যে, বরদরাজ ভাষ্যকারের প্রামাণ্য সূচনার জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ সূত্রকার অক্ষপাদ এ কথা না বলিলেও ভগবান্ ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের কথায় সূত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। ফলকথা, উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কথায় ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, অক্ষপাদপ্রতিম ভগবান্ পক্ষিল মুনি ও পক্ষিল স্বামী, ইহা আমরা পাইতেছি। এখন বিশেষ বক্তব্য এই যে, বহুশ্রুত প্রাচীন মহামনীষী শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্র যাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন; তিনি যে বিশেষ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন, ইহা স্বীকার্য্য। উদ্যোতকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত আস্তিক-শিরোমণি মহামনীষিগণকে বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ঋষি বা আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র যাঁহাকে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতে পারেন না, এমন কোন ব্যক্তিকে কেহ ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সে সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথাকে উপেক্ষা করা যায় না।

এতদ্দেশীয় অনেক বিজ্ঞতম ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যই ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার। তাঁহারই অপর নাম বাৎস্যায়ন ও পক্ষিলস্বামী। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনে প্রথম কথা এই যে, হেমচন্দ্রসূরি অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে[১] বাৎস্যায়নের যে আটটি নাম বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কৌটিল্য, চণকাত্মজ, পক্ষিলস্বামী ও বিষ্ণুগুপ্ত, এই চারিটি নামের দ্বারা বুঝা যায়, কৌটিল্যই পক্ষিলস্বামী ও বাৎস্যায়ন। পক্ষিলস্বামীই যে ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক আচার্য্যই লিখিয়াছেন। পক্ষিলস্বামী ও বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের নামান্তর হইলে তিনিই ন্যায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বুঝা যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে "বিদ্যাসমুদ্দেশ" প্রকরণে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রশংসা করিতে শেষে যে শ্লোকটি[২] বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের প্রথম চরণত্রয় ন্যায়দর্শনভাষ্যেও দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যে তাঁহার অর্থশাস্ত্রোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ পরিবর্ত্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণ বলা হইয়াছে, "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা"। ঐ চতুর্থ চরণের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে,—কৌটিল্য ন্যায়ভাষ্যে বলিয়াছেন,—আমি "বিদ্যোদ্দেশে" অর্থাৎ আমার কৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের বিদ্যাসমুদ্দেশপ্রকরণে এই আন্বীক্ষিকীকে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। তৃতীয় কথা এই যে, অর্থশাস্ত্রের শেষে কৌটিল্য শাস্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন, ইহা বর্ণিত

১। বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহঙ্গুলশ্চ সঃ ॥—মর্ত্ত্যকাণ্ড। ৫১৮

২। প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা ॥—অর্থশাস্ত্র।

আছে[১]। তাহার দ্বারা তিনি ন্যায়সূত্রের উদ্ধার করিয়াছেন, ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, হেমচন্দ্রসূরির শ্লোকের দ্বারা কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার, ইহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, নামের ঐক্যে ব্যক্তির ঐক্য সিদ্ধ হয় না। ন্যায়ভাষ্যকারের ন্যায় কৌটিল্যেরও বাৎস্যায়ন ও পক্ষিলস্বামী, এই নামদ্বয় থাকিতে পারে। পরন্তু তার্কিকরক্ষায় বরদ-রাজের কথা ও মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের নামান্তর পক্ষিল। সুতরাং "স্বামী" তাঁহার উপনাম ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। ন্যায়কন্দলীর প্রারম্ভে "পক্ষিল-শবরস্বামিনৌ" এই প্রয়োগের দ্বারাও তাহা মনে হয়। তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি 'পক্ষিল' এই নামের পরে স্বামী এই উপনামের যোগে বাৎস্যায়নকে পক্ষিলস্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পক্ষিলস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির কথায় বুঝা যায়। কিন্তু যদি কৌটিল্যের নামান্তর "পক্ষিলস্বামী" এবং ন্যায়ভাষ্যকারের নামান্তর "পক্ষিল," ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ নামের দ্বারা ন্যায়ভাষ্যকারকে কৌটিল্য বলিয়া গ্রহণ করাও যায় না। বাৎস্যায়ন নামের দ্বারাও কৌটিল্যকে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বাৎস্যায়ন এই নাম যদি গোত্রনিমিত্তক নাম হয়, তাহা হইলে অন্যেরও ঐ নাম হইতে পারে। এ সব কথা যাহাই হউক, কৌটিল্যই ন্যায়-ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে পূর্ব্বোক্ত হেমচন্দ্র সূরির শ্লোক অথবা ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তমদেবের শ্লোক প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য।

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও ন্যায়ভাষ্যকার ও অর্থশাস্ত্রকার অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, মঙ্গলাচরণ-শ্লোক প্রভৃতি কোন কোন শ্লোকবিশেষ ব্যতীত ঐরূপ শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থকারের অভেদ সিদ্ধ হয় না। এক গ্রন্থকার কোন উদ্দেশ্যে অপর গ্রন্থ-কারের শ্লোকের আংশিক উল্লেখও করিতে পারেন। পরন্তু কৌটিল্য ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীর কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেন, তাহা হইলে ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণে "অর্থশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতা" এইরূপ কথাই বলিতেন। অর্থশাস্ত্রের "বিদ্যাসমুদ্দেশ" নামক প্রকরণকে বিদ্যোদ্দেশ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, অতি অস্পষ্টভাবে নিজ বক্তব্য কেন বলিবেন ? আর যদি "বিদ্যোদ্দেশ" বলিলেই অর্থ-শাস্ত্রের ঐ প্রকরণটি বুঝা যায়, তাহা হইলে কৌটিল্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তিও ন্যায়ভাষ্যে ঐ কথার দ্বারা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপে এই আন্বীক্ষিকীর প্রশংসা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ ন্যায়ভাষ্যকার প্রথমে "সেয়মান্বীক্ষিকী" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" এই কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, "বিদ্যোদ্দেশে" অর্থাৎ শাস্ত্রে ত্রয়ী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিদ্যার যেখানে উদ্দেশ অর্থাৎ নামকথন হইয়াছে, সেখানে এই

[১] যেন শাস্ত্রঞ্চ শস্ত্রঞ্চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতং॥—অর্থশাস্ত্রের শেষ।

আন্বীক্ষিকীর কীর্ত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ বিদ্যার অন্তর্গত চতুর্থী বিদ্যা, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের কথাতেও এই ভাব পাওয়া যায়। জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণ "বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা"। জয়ন্তভট্টের উল্লিখিত পাঠে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, পরীক্ষিত বা অবধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই ন্যায়বিদ্যাই যে চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, ইহা নিশ্চিত। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বে ন্যায়বিদ্যাকে চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার যে, কোন একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ ঐরূপ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থশাস্ত্রের শেষে কৌটিল্যের যে শাস্ত্রের উদ্ধার, শস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের কথা আছে, তদ্দ্বারা তিনি যে ন্যায়সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তিনি নানা শাস্ত্র হইতে যে রাজনীতি-সমুচ্চয়ের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই শস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের সহিত ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু ঐ শ্লোকের দ্বারা কৌটিল্য শাস্ত্রোদ্ধারাদির পরে অর্থশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং তিনি অর্থশাস্ত্র রচনার পূর্ব্বে ন্যায়ভাষ্যে "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" এই কথা কোন্ অর্থে বলিতে পারেন, তাহাও চিন্তা করা উচিত। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য নামের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুগুপ্ত নামে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে[১]। বিষ্ণুগুপ্তই কৌটিল্যের মুখ্য নাম ছিল, ইহা অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। মুদ্রারাক্ষস নাটকে কবি বিশাখদত্তের রচনার দ্বারাও তাহা বুঝা যায় (৭ম অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্য ন্যায়ভাষ্য রচনা করিলে তিনি অর্থশাস্ত্রের ন্যায় বিষ্ণুগুপ্ত নামে অথবা সুপ্রসিদ্ধ কৌটিল্য বা চাণক্য নামে কেন গ্রন্থকার-পরিচয় দিবেন না এবং উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহই তাঁহার প্রসিদ্ধ কোন নামের কেন উল্লেখ করিবেন না, ইহাও বুঝি না। ন্যায়ভাষ্যের শেষে বাৎস্যায়ন নামে গ্রন্থকার-পরিচয় আছে[২]। কামসূত্র গ্রন্থেও বাৎস্যায়ন নামে গ্রন্থকার-পরিচয় পাওয়া যায়। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর, কামসূত্রকার বাৎস্যায়নের বাৎস্যায়ন ও মল্লনাগ, এই দুইটি নাম বলিয়াছেন। বাৎস্যায়ন তাঁহার গোত্রনিমিত্তক নাম, মল্লনাগ তাঁহার সাংস্কারিক নাম[৩]। কৌটিল্যই কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। কিন্তু কামসূত্রের টীকাকার যশোধর, বিষ্ণুগুপ্ত নামের উল্লেখ না করিয়া মল্লনাগ নামকেই কামসূত্রকার বাৎস্যায়নের সাংস্কারিক নাম বলিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে

১। দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাং।
স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রঞ্চ ভাষ্যঞ্চ।—অর্থশাস্ত্রের শেষ।

২। যোহক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদ্‌বদতাং বরং।
তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ॥

৩। বাৎস্যায়ন ইতি গোত্রনিমিত্তা সংজ্ঞা, মল্লনাগ ইতি সাংস্কারিকী। ১ অধি. ২ অঃ – ১৯ সূত্র-টীকা।

পক্ষিলস্বামী বলিয়াও উল্লেখ করেন নাই। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য স্বমতের উল্লেখ করিতে কৌটিল্য নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কামসূত্রে গ্রন্থকারের স্বমতের উল্লেখ করিতে বাৎস্যায়ন নামের উল্লেখ দেখা যায়। অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্রের ভাষারও অনেক বৈষম্য বুঝা যায়। ন্যায়ভাষ্য ও কামসূত্রের ভাষা ও গ্রন্থারম্ভপ্রণালীও একরূপ নহে। কামসূত্রের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ আছে, ন্যায়ভাষ্যের প্রারম্ভে তাহা নাই। ফলকথা, কামসূত্রকার বাৎস্যায়নই ন্যায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ বক্তব্য এই যে, ন্যায়ভাষ্যকার সাংখ্যশাস্ত্রকেও যে চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী বলিতেন, ইহা বুঝিতে পারি না। অর্থশাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রও চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যে আন্বীক্ষিকী শব্দের বিশেষ ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া তদনুসারে ন্যায়বিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ বিবরণ করা হইয়াছে এবং সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রস্থান বলা হইয়াছে। উদ্যোতকর ঐ প্রস্থানভেদ-বর্ণনায় "সংশয়াদিভেদানুবিধায়িনী আন্বীক্ষিকী" এই কথা বলিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যার স্বরূপও বলিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যকারও প্রথমে ন্যায়বিদ্যাকেই চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া, শেষে "সেয়মান্বীক্ষিকী" ইত্যাদি কথা বলিয়া, "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা" এই কথার দ্বারা ন্যায়বিদ্যাই শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কথার পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। ফলকথা, ন্যায়ভাষ্য ও অর্থশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়ে মতবৈষম্য নাই, ইহা কোনরূপেই বুঝিতে পারি নাই। বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ যে ন্যায়বিদ্যা ভিন্ন সাংখ্যাদি শাস্ত্রকেও চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী বলিতেন, তাহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে কিছুতেই মনে হয় না। এখন যদি ন্যায়ভাষ্য ও অর্থশাস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়েই মতবৈষম্য থাকে, তাহা হইলে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করা যায় না। ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে উভয় গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মতবৈষম্য আছে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝা আবশ্যক। সুধীগণ উভয় গ্রন্থের কথাগুলি দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কৌটিল্য যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখই করেন নাই, এই মতও স্বীকার করিতে পারি নাই। অর্থশাস্ত্রে "আন্বীক্ষকী" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে কৌটিল্য চিরপ্রসিদ্ধ "আন্বীক্ষিকী" শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই এবং বাৎস্যায়ন প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ কৌটিল্যের ন্যায় "আন্বীক্ষকী" শব্দের প্রয়োগ কেন করেন নাই, ইহাও চিন্তনীয়। কৌটিল্য পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত বর্ণন করিতেও বলিয়াছেন—"আন্বীক্ষকী"।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং অনেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সময় বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী কৌটিল্য যে ন্যায়ভাষ্যকার হইতেই পারেন না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী অতিপ্রাচীন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ভাষা পর্য্যালোচনা

করিলেও উহা যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী অতি প্রাচীন, ইহা মনে হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিকসূত্রের পরে বাৎস্যায়ন ভাষ্য রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিবার কোন প্রমাণ পাই নাই। উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের ন্যায় বাৎস্যায়ন ভাষ্যে কোন বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ নাই। যে সকল বৌদ্ধমতের আলোচনা আছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই আলোচিত হইতেছে। উপনিষদেও পূর্ব্বপক্ষরূপে ঐ সকল মতের সূচনা আছে। ন্যায়সূত্রেও ঐ সকল মতের আলোচনা ও খণ্ডন আছে। ঐ সকল মত বা কোন শব্দবিশেষ দেখিয়া ঐ সমস্ত ন্যায়সূত্র অনেক পরে রচিত হইয়াছে, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, কোন মতবিশেষের আলোচনা দেখিয়া ঐরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। ঐ সকল মত যে শাক্য বুদ্ধের পূর্ব্বে কখনও কেহ উদ্ভাবন করিতে পারেন না, ইহা নিশ্চয় করিবার কি প্রমাণ আছে, জানি না। দর্শনকার ঋষিগণ উপনিষদে পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচিত নাস্তিক-মতের বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া ঐরূপে উপনিষদের পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের দর্শন শাস্ত্র রচনার ইহাও একটি মহান্ উদ্দেশ্য। তাঁহারা অনেক পূর্ব্বপক্ষের উদ্‌ভাবন করিয়াও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদায় ঐ সকল পূর্ব্ব-পক্ষের অনেক পূর্ব্বপক্ষকেও সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করায় উহা বৌদ্ধ মত বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সমর্থিত মত মাত্রকেই তাঁহাদিগেরই আবিষ্কৃত মত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। ন্যায়সূত্রে আলোচিত বৌদ্ধ মত যে উপনিষদেও আছে, তাহা যথাস্থানে দেখাইব। মূলকথা, বাৎস্যায়ন ভাষ্যে এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা উহা লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিকসূত্রের পরে রচিত বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে। যে সাধ্য-সাধনে যে হেতু সন্দিগ্ধ বা হেতুই হয় না, তদ্‌দ্বারা কোন সাধ্যের যথার্থ অনুমান হইতে পারে না। হেতুর দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে হইলে, তাহা সেই স্থলে প্রকৃত হেতু বা হেত্বাভাস, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিচার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পরন্তু বাৎস্যায়ন লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিকসূত্রের পরে ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিলে ন্যায়ভাষ্যে ঐ সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের অসাধারণ পারিভাষিক শব্দ (প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতি) অবশ্যই পাওয়া যাইত এবং মাধ্যমিক সূত্রে সমর্থিত বৌদ্ধ মতের বিশেষরূপ সমালোচনা পাওয়া যাইত। বাৎস্যায়নভাষ্যে বৌদ্ধ মতের আলোচনায় পরবর্ত্তী কালের প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সূক্ষ্ম বিচারাদির কোনই আলোচনা পাওয়া যায় না। সংক্ষেপেই বৌদ্ধ মতের নিরাস পাওয়া যায় এবং বাৎস্যায়নভাষ্যে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সমর্থিত প্রধান বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের বিশেষরূপ আলোচনাও পাওয়া যায় না। বাৎস্যায়ন প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের অভ্যুদয়ের সময়ে ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদিগকেই লক্ষ্য করিয়া "নাস্তিক", "অনাত্মবাদী", "ক্ষণিকবাদী" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। যদিও মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় ইহাও স্বীকার করেন নাই; তিনি বাৎস্যায়নকে বৌদ্ধ-যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষি বলিয়াছেন এবং বিশ্বকোষেও লিখিত হইয়াছে যে, বাৎস্যায়নভাষ্যে কোথায়ও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাৎস্যায়ন ও বাচস্পতি মিশ্রের কথার দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিক-

গণের অভ্যুদয়ের পরে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার ও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের নবম সূত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথায় স্পষ্টই পাওয়া যায় যে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বেও ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা হইয়াছে। ভাষ্যকার এক ভাষার দ্বারাই স্বমত ও পরমতে কালাতীত নামক হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরমতেই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কোন বৌদ্ধবিশেষ অন্যরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ভাষ্যকার সেই সূত্রার্থ প্রকৃতার্থ নহে বলিয়া সেই দোষের নিরাস করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক স্থলে অনেক কথার দ্বারা ন্যায়ভাষ্য বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের অভ্যুদয় হইলে রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সর্ব্বত্রই বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্য-ব্যাখ্যায় বৌদ্ধমতের কথা বলিয়া ব্যাখ্যা-কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না।

শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে উদ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যদিও ভাষ্যকার ন্যায়শাস্ত্র বুঝাইয়া গিয়াছেন, তথাপি অর্ব্বাচীন দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি কুতর্কান্ধকারের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্র আচ্ছাদিত করায়, এই শাস্ত্র-তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছিল, তাই ঐ অন্ধকার অপনয়ন করিতে উদ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনা। বাচস্পতি মিশ্র "অর্ব্বাচীন" শব্দ প্রয়োগ করিয়া দিঙ্‌নাগ প্রভৃতিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নব্য সম্প্রদায় বলিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ রাজা অশোকেরও বহু পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু দিঙ্‌নাগের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা, প্রমাণকাণ্ডে বিশেষ আলোচনা ও বৌদ্ধ ন্যায়ের নানা গ্রন্থ নির্ম্মাণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে যেমন প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের অনেক কাল ব্যবধান এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতিই প্রমাণকাণ্ডে বিশেষরূপে নূতন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যেও প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় এবং তাঁহাদিগের অনেক কাল ব্যবধান বুঝা যায়। অল্প কাল ব্যবধানে প্রাচীন ও নব্য, এইরূপ সংজ্ঞাভেদ হয় না। বাচস্পতি মিশ্র দিঙ্‌নাগ প্রভৃতিকে অর্ব্বাচীন বলায় এবং তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে কুতর্কান্ধকারে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, এই জন্যই উদ্যোতকরের বার্ত্তিক-রচনা, নচেৎ ভাষ্যকার ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপাদন করায় আর কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট ছিল না, এই কথা প্রকাশ করায়, বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের সময়ে ন্যায়দর্শনের প্রকৃতার্থ বুঝাইতে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বাৎস্যায়ন করিয়াছিলেন; তখন আর কিছু কর্ত্তব্য ছিল ন ; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নব্য বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি প্রমাণকাণ্ডে বিশেষ আলোচনা ও তর্কের ভূরি চর্চ্চা করিয়া প্রমাণসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা ন্যায়সূত্র ও ভাষ্যের প্রচুর প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদিগের কুতর্কান্ধকারে ন্যায়শাস্ত্র আচ্ছাদিত হইয়া যায়; তাই উদ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনা কর্ত্তব্য হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে প্রমাণকাণ্ডে বৌদ্ধ মতের বিশেষ আলোচনা নাই। বাৎস্যায়ন দিঙ্‌নাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তাঁহার ভাষ্যে প্রমাণ-কাণ্ডে বৌদ্ধ মতের বিশেষ আলোচনা থাকা খুব সম্ভব ছিল।. ফলকথা, বাৎস্যায়ন দিঙ্‌নাগের

বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। বাৎস্যায়ন পাণিনিসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন (২।২। ১৬ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। পাণিনি গৌতম বুদ্ধেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস। কথা-সরিৎসাগরের উপাখ্যান প্রমাণ নহে। বাৎস্যায়ন (৫।২।১০ সূত্র-ভাষ্যে) মহাভাষ্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত নহে। কারণ, এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা সুচির কাল হইতে উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য বহু গ্রন্থকারই উল্লেখ করিতেছেন। ঐ বাক্যের প্রথম বক্তা কে, তাহা সর্ব্বত্র নিশ্চয় করা যায় না। পরন্তু বাৎস্যায়নভাষ্যে মহাভাষ্যের ঐ বাক্যও যথাযথ দেখা যায় না। উভয় গ্রন্থে কোন অংশে পাঠভেদ থাকায় বাৎস্যায়ন, মহাভাষ্যের বাক্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। ("বৃদ্ধিরাদৈচ্" এই সূত্রের মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত। কিন্তু দিঙ্নাগের সময় নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত নহে। বিশ্বকোষে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী দিঙ্নাগের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু বহুদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বৌদ্ধন্যায়" প্রবন্ধে[১] প্রমাণসমুচ্চয়কার দিঙ্নাগকে কালিদাসের সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষবর্ত্তী বলিয়াছেন এবং উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্ম-কীর্ত্তি ও বিনীতদেবের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া উদ্যোতকরকে ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতদেবের সমসাময়িক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্ত্তী বলিয়াছেন। বিশ্বকোষে উদ্যোতকরকে আরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলা হইয়াছে। জর্ম্মান পণ্ডিত জেকবির প্রবন্ধে বাৎস্যায়নের সময় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং উদ্যোতকরের সময় ষষ্ঠ শতাব্দী নির্দ্ধারিত হইয়াছে জানিয়াছি।* বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ ঐ সকল মতভেদের বিচার করিবেন। আমাদিগের বিশ্বাস, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনি দিঙ্নাগের বেশী পরবর্ত্তী নহেন। এই বিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে "অতিজরতীনাং" এই কথার দ্বারা উদ্যোতকরের বার্ত্তিককে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[২]। ন্যায়-

১। ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* বাৎস্যায়ন সম্বন্ধে জার্ম্মান্ পণ্ডিত জেকবির মত—The results of our researches into the age of the Philosophical Sutras may be summarised as follows :—"Nayadarsan" and "Brahma Sutra" were composed between 200 and 450 A. D. During that period lived the old commentators :—Vatsyayana, Upavarsa, the Vrittikara (Bodha Yana ?) and probably Sabaraswamin.

উদ্যোতকর সম্বন্ধে—He (Uddyotakara) may therefore have flourished in the early part of the Sixth century or still earlier (The dates of the Philosophical Sutras of the Brahmans by Herman Jacobi.

1911 Vol. 31, Journal of the American Oriental Society).

২। ইচ্ছামঃ কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধ-পঙ্কমগ্নানাং।
উদ্যোতকর-গবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ॥

বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিতে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের কথাগুলির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়[১], উদ্যোতকরের বার্ত্তিক বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের বহু টীকা হইয়াছিল। কিন্তু কালবশে উদ্যোতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় সেই সকল টীকা বা নিবন্ধ 'কুনিবন্ধ' হইয়াছিল। অর্থাৎ উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের সে সমস্ত টীকা যথার্থ টীকা হইতে পারিয়াছিল না। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ত্রিলোচন-নামা অধ্যাপকের নিকটে উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের রহস্যবোধক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা নামে টীকা করিয়া, ঐ বার্ত্তিক গ্রন্থের উদ্ধার করেন। বাচস্পতি মিশ্র যে ত্রিলোচন গুরুর উপদেশ পাইয়া, তদনুসারে ভাষ্য ও বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকায় (প্রত্যক্ষ সূত্রে) তাঁহার নিজের কথাতেও পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়সূচীনিবন্ধের শেষোক্ত শ্লোকে[২] পাওয়া যায় যে তিনি ৮৯৮ বৎসরে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ "বৎসর" শব্দের দ্বারা বৈক্রম সংবৎ বুঝিলে ৮৪১ . খৃষ্টাব্দে এবং শকাব্দ বুঝিলে ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। শেষোক্ত পক্ষই বহুসম্মত। মনে হয়, বাচস্পতি মিশ্র সর্ব্বশেষে ন্যায়সূচী-নিবন্ধ রচনা করায়, ঐ গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষে তাঁহার সময়ের (৯০৬ শকাব্দ) উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। উদয়নের কিরণাবলী গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটি লক্ষণাবলীর শেষেও দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য, শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য পাঠে জানা যায়। এখন বক্তব্য এই যে, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্ত্তী হইলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্র, উদ্যোতকরের বার্ত্তিককে "অতিজরতীনাং" এই কথার দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থ বলিবেন এবং উদয়নাচার্য্য উদ্যোতকরের সম্প্রদায় লোপ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথা বলিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। এখনও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির ন্যায়গ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয় না। উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের আলোচনায় মনে হয়, তিনি ভট্ট কুমারিল ও ভর্ত্তৃহরিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ন্যায়বার্ত্তিকে ভর্ত্তৃহরির মতের কোন আলোচনা বা ভর্ত্তৃহরির কোন কথা এবং মীমাংসক মতের

১। ননু চিরন্তনেঽস্মিন্ নিবন্ধে মহাজনপরিগৃহীতে বহবো নিবন্ধাঃ সন্তীতি কৃতমনেনেত্যত আহ ইচ্ছামি ইতি। নমু যদি গ্রন্থকারসম্প্রদায়াবিচ্ছেদেন তে নিবন্ধাঃ কথং কুনিবন্ধাঃ ? অথ সম্প্রদায়ো বিচ্ছিন্নঃ ? কথং তবাপীয়ং বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়া তাৎপর্য্যটীকা সুনিবন্ধ ইত্যত আহ অতিজরতীনামিতি। উদ্যোতকর-সম্প্রদায়ো হ্যমূষাং গৌবনং তচ্চ কালবশাদ্‌গলিতমিব, কিন্নামাত্র ত্রিলোচনগুরোঃ সকাশাদুপদেশ-রসায়নমাসাদিতমমূষাং পুনর্নবীভাবায় দীয়ত ইতি যুজ্যতে। ন চ কুনিবন্ধ-পঙ্কমগ্নানাং তদ্দাতুমুচিতমিতি তস্মাদুৎকৃষ্য স্বনিবন্ধস্থলে সন্নিবেশনরূপ-সমুদ্ধরণমেব সাম্প্রত-মিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি, ৯ পৃষ্ঠা।

২। ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসু (৮৯৮) বৎসরে॥

৩। তর্কাম্বরাঙ্ক(৯০৬) প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীং॥

আলোচনায় ভট্ট কুমারিলের কথা বা মতের আলোচনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। উদ্যোতকরের উত্থাপিত মীমাংসক মতকে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র জরন্মীমাংসক মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্লোকবার্ত্তিকে অনুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে কুমারিল নিজ মতের সমর্থনপূর্ব্বক অন্যের মত বলিয়া ঐ বিষয়ে উদ্যোতকরের সমর্থিত মতটিরও উল্লেখ করিয়াছেন (শ্লোকবার্ত্তিক, অনুমান পরিচ্ছেদ, ৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেখানে টীকাকার পার্থসারথি মিশ্র ঐ মতকে নৈয়ায়িকের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিল কোন অপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মতের উল্লেখ ও সমর্থন করিতে পারেন না। ঐ মতটি কুমারিলের পূর্ব্বে হইতেই সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। বাৎস্যায়ন যে ঐ মতাবলম্বী নহেন, তাহা বহু স্থলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। উদ্যোতকরই অনুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে অন্যান্য মত ও দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন পূর্ব্বক ঐ নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি (১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভট্ট কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে অনুমান পরিচ্ছেদে দিঙ্‌নাগের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। পরন্তু কবি বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হর্ষচরিতে প্রথমে যে বাসবদত্তা কাব্যের অতি প্রশংসা করিয়াছেন, উহা কবি সুবন্ধু-রচিত প্রসিদ্ধ বাসবদত্তা কাব্য, ইহাই পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ বাসবদত্তা কাব্য বাণভট্টের পূর্ব্বেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা স্বীকার্য্য। সুবন্ধু ঐ বাসবদত্তা কাব্যে উদ্যোতকরের নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়[১]। তাহা হইলে উদ্যোতকর যে সুবন্ধুর পূর্ব্ব হইতেই দেশে ন্যায়মত-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও সুবন্ধুর কথায় বুঝিতে পারা যায়। এ সব কথা উপেক্ষা করিলেও বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহারা উদ্যোতকরের বার্ত্তিককে যেরূপ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উদ্যোতকর যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "অতিজরতীনাং" এই কথা বলিয়া যে বার্ত্তিকের প্রাচীনত্বের ঘোষণা ও তাহার উদ্ধারের প্রয়োজন সূচনা করিয়াছেন এবং যাহার উদ্ধারের জন্য তিনি ত্রিলোচন গুরুর উপাসনা করিয়াছেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিক গ্রন্থের প্রাচীনত্ব বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য ভ্রান্ত ছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

উদ্যোতকর প্রতিজ্ঞা-সূত্রবার্ত্তিকে "বাদবিধি" ও "বাদবিধানটীকা" নামে বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মকীর্ত্তির "বাদন্যায়" নামক গ্রন্থকেই "বাদবিধি" নামে এবং বিনীতদেবের "বাদন্যায়ব্যাখ্যা" নামক গ্রন্থকেই "বাদবিধানটীকা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ঐ সকল মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রকৃত নাম ত্যাগ করিয়া কল্পিত নামে উল্লেখেরও কোন কারণ বুঝি না। উদ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতদেবের সমসাময়িক হইলে তাঁহার ঐরূপ নাম-ভ্রমেরও কোন কারণ বুঝি না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রচুর

১। ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোতকরস্বরূপাং।—বাসবদত্তা, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সদৃশ নামেও অনেক গ্রন্থ ছিল ও আছে। বিভিন্ন গ্রন্থকারের বিভিন্ন গ্রন্থে বিষয়বিশেষের বিচারে সদৃশ ভাষারও প্রয়োগ হইয়াছে ও হইয়া থাকে। উদ্যোতকরের উদ্ধৃত বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ-সন্দর্ভ দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথায় উদ্যোতকর, দিঙ্‌নাগ ও সুবন্ধুর গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট পাওয়া যায়। উদ্যোতকরের কথিত "বাদবিধানটীকা" সুবন্ধুরচিত কোন গ্রন্থের টীকা, ইহা মনে হয়। বাচস্পতি মিশ্র ঐ স্থলে পূর্ব্বে উদ্যোতকরের উল্লিখিত কোন লক্ষণকে সুবন্ধুর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি ঐ মত সমর্থন করিয়া তাঁহার "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থে উদ্যোতকরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু উদ্যোতকর যে ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন গ্রন্থের উল্লেখাদি করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি নাই। মূল গ্রন্থ না পাইলে অথবা কোন প্রামাণিক প্রাচীন সংবাদ না পাইলে তাহা বুঝা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। উদ্যোতকর আরও বহু স্থলে বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে "সর্ব্বাভিসময়সূত্র" নামে কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ঐ সকল গ্রন্থের কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। বহু স্থলে কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের পরিচয়ও দিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থ যে তাঁহার বিশেষ অধিগত ছিল, তাহার পরিচয় ভামতী ও তাৎপর্য্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। দিঙ্‌নাগের সমসাময়িক বসুবন্ধু নামে যে প্রধান বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের বার্ত্তা পাওয়া যায়, বাচস্পতি মিশ্র তাঁহাকেই সুবন্ধু নামে বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সে যাহাই হউক, মূল কথা, উদ্যোতকর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ভগবান্ বাৎস্যায়ন খৃষ্ট-পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। এখানে নিজের বিশ্বাসানুসারেই এ সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম। প্রধান ঐতিহাসিকগণের কথা এবং অনুসন্ধান দ্বারা ফলে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা গ্রন্থশেষে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি পাঠ ও অনুসন্ধানাদি করিয়াছি, তাহাতে নানা মতভেদই পাইয়াছি; কোন নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত পাই নাই। মতভেদ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের টিপ্পনীর মধ্যেও কোন কোন কথা বলিয়াছি।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও কোন নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। বাৎস্যায়ন দাক্ষিণাত্য, ইহা অনেকে সমর্থন করেন। বাৎস্যায়ন ও উদ্যোতকর উভয়েই মৈথিল, ইহাও অনেকে বলেন। ভাষ্য ও বার্ত্তিকের দ্বারা এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করা যায় না। কোন কোন কথার দ্বারা যাহা কল্পনা করা যায় এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহার আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থশেষেও পুনরায় এ সকল বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে।

———o———

নিবেদন

ভগবানের কৃপায় বঙ্গভাষায় অনুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীর সহিত বাৎস্যায়ন ভাষ্য সমেত ন্যায়-দর্শনের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হইল। বাৎস্যায়ন ভাষ্য যেরূপ অতি দুর্ব্বোধ গ্রন্থ, তাহা সুধী-সমাজের অবিদিত নহে। মাদৃশ ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রকৃত ব্যাখ্যাদি কার্য্যে অযোগ্য। তথাপি কতিপয় বিদ্যোৎসাহী সুশিক্ষিত সুহৃৎ ব্যক্তির আন্তরিক উৎসাহের বলেই অতি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুধীগণ এই গ্রন্থে আমার প্রচুর ভ্রম-প্রমাদের পরিচয় পাইবেন এবং এই অতি দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে আমি কাহারও পন্থা অনুসরণ করিতে না পারায় পদে পদে আমার পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী, ইহা জানিয়াও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার গুরুতর পরিশ্রমের ফলে যদি বাৎস্যায়ন-ভাষ্য-পাঠার্থীদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য হয়, পরিশ্রমের লাঘব হয়, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

নানা কারণে বহু স্থলে বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য হইয়াছে। পরন্তু প্রচলিত ভাষ্য পুস্তকে যেরূপে ভাষ্য-সন্দর্ভ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষ্যের সংগতি এবং পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ-সন্দর্ভ এবং প্রশ্ন ও উত্তর-সন্দর্ভের নির্ণয় করাও সর্ব্বত্র সহজে সম্ভব হয় না। এই সমস্ত কারণে বাৎস্যায়ন ভাষ্য আরও অতি দুর্ব্বোধ হইয়াছে। এ জন্য এই গ্রন্থে ভাষ্য-সন্দর্ভগুলি পৃথক্‌ভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে যথামতি চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে মূল ভাষ্য অপেক্ষাকৃত সুবোধ হইবে, আশা করা যায়। উদ্যোতকরের বার্ত্তিক ও বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ ও নানা পাঠভেদের যথামতি পর্য্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থে ভাষ্য-পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির সম্মত ভাষ্য-পাঠ নির্ণয় করিতে না পারায় প্রচলিত পাঠই গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

প্রাচীন বাৎস্যায়ন ভাষ্যে যে প্রণালীতে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় ঐ প্রণালীতে বাক্যপ্রয়োগ হয় না। তথাপি মূলানুযায়ী অনুবাদের অনুরোধে ভাষ্যের প্রণালীতেই ভাষ্যের অনুবাদ করিতে হইয়াছে। স্বাধীন ভাষায় মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণন করিলে তাহা মূলের অনুবাদ হয় না; তদ্দ্বারা মূলের পদ পদার্থ বুঝিয়া, প্রতিপাদ্য বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয় না। বাৎস্যায়ন ভাষ্যের তাৎপর্য্যবোধের ন্যায় বহু স্থলেই শব্দার্থ-বোধও অতি সুকঠিন। এ জন্য অনেক স্থলে অনুবাদে ভাষ্যের শব্দই উল্লেখ করিয়া পরে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং সর্ব্বত্রই যাহাতে অনুবাদের দ্বারা মূল ভাষ্যের বাক্যার্থ-বোধে সহায়তা হইতে পারে, যথাশক্তি সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছি। ভাষ্যকার সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা প্রথমে তাঁহার বক্তব্যটি বলিয়া, পরে আবার নিজেই সেই নিজ বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা ভাষ্যগ্রন্থের লক্ষণ। উহার নাম স্বপদ-বর্ণন। ভাষ্যের ঐ সকল অংশের অনুবাদের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র "বিশদার্থ" বলিয়া ঐ সকল ভাষ্য-সন্দর্ভের অনুবাদ করিয়াছি। ঐ সকল ভাষ্যসন্দর্ভকে ভাষ্যকারের স্ববাক্য-

বর্ণন-ভাষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষ্যের ন্যায় অনুবাদেও বহু স্থলে ভাষ্যের প্রণালীতে স্ববাক্যবর্ণন বা পূর্ব্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা করিয়াছি; অনেক স্থলে ভাষ্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছি। বহু স্থলে যথাশক্তি সরল ভাষায় অনুবাদের পরে "বিবৃতি"র দ্বারা মূলের প্রতিপাদ্য বিষয়টি বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছি। দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের কেবল অনুবাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অনেক স্থলে নানাবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াও প্রকৃতার্থ-বোধে প্রতিবন্ধক হয়। বিশেষতঃ বাৎস্যায়নভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্যার্থবোধ বা তাৎপর্য্যবোধ নানা কারণে অতি সুকঠিন, এই বিশ্বাসে সর্ব্বত্র সংস্কৃত টীকার প্রণালীতে বঙ্গভাষায় একটি টিপ্পনী প্রকাশ করিয়াছি। টিপ্পনীতে সর্ব্বত্রই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝাইতে এবং বাৎস্যায়ন ভাষ্য বুঝিতে গেলে যে সকল জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তাহারও যথামতি যথাসম্ভব আলোচনা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর, বাৎস্যায়নভাষ্যের যে বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ন্যায়সূত্রেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উহা ন্যায়বার্ত্তিক নামে প্রসিদ্ধ। উদ্দ্যোতকর বার্ত্তিক গ্রন্থের লক্ষণানুসারে স্বাধীন সমালোচনার দ্বারা বহু স্থলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও মতের খণ্ডন করিয়াছেন এবং নিজে অন্যরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা নামে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকেরই টীকা করিয়া উদ্দ্যোতকরের মত সমর্থন করিতে ভাষ্যকারের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের ঐ টীকারই ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি নামে টীকা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কিয়দংশ-মাত্র মুদ্রিত হওয়ায় সর্ব্বাংশ দেখিতে পাই নাই। ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর এবং তাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতি মিশ্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যের যে যে স্থলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগের নামোল্লেখে সে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছি। অন্যান্য স্থলে আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র চিন্তার দ্বারা যেমন বুঝিয়াছি, অগত্যা সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছি। বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদের সঙ্গে ন্যায়-বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার অনেক অংশের অনুবাদ করাও কর্ত্তব্য মনে করিয়া টিপ্পনীতে তাহাও যথামতি করিয়াছি। সে জন্যও টিপ্পনী অনেক স্থলে বিস্তৃত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র যে যে স্থলে বাৎস্যায়নের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, আমি সেই সেই স্থলে বাৎস্যায়নের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি এবং অনেক স্থলে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি গুরুপাদগণের কথা বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যার্থীর ন্যায় সুধীসমাজের নিকটে অসংকোচে আমার সংশয় জ্ঞাপন এবং অনেক স্থলে সিদ্ধান্তের ভাবে আমার পূর্ব্বপক্ষেরই নিবেদন ও সমর্থন করিয়াছি। প্রাচীন গুরুপাদগণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে; মাদৃশ ব্যক্তি তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। আমি প্রাচীনগণের কথা বুঝিতে না পারিয়াই আমার সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া বিদ্যার্থীর ন্যায় সুধীসমাজে নিবেদন করিয়াছি। সুধীসমাজ ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিবেন, দেশে প্রাচীন ন্যায় গ্রন্থের প্রচুর আলোচনা হইবে, বাৎস্যায়নের মতের এবং তাঁহার ভাষ্যের বিশেষ আলোচনা হইবে, ইহাই আমার আশা ও উদ্দেশ্য। এ জন্য অনেক স্থলে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকগণের মতভেদেরও যথামতি

আলোচনা করিয়াছি। অনেক স্থলে বাৎস্যায়নভাষ্যে ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থব্যাখ্যা করিতেও টিপ্পনীতে আবশ্যক বোধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গভাষায় বিবিধ বিষয়ে অনেক আলোচনার ফলে যদি পাঠকগণের কোন অংশে কোন বিষয়ে কিছু উপকার হয়, ইহাও আমার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত বিবিধ আলোচনা করিতে যাইয়া মাদৃশ ব্যক্তির বহু অজ্ঞতা ও ভ্রমের পরিচয় দিতে হইবে জানিয়াও পূর্ব্বোক্তরূপ নানা উদ্দেশ্যে আমি অসংকোচে নানা আলোচনা করিয়াছি। পরন্তু দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্র বঙ্গভাষায় বুঝাইতে হইলে সংক্ষেপে তাহা বুঝান অসম্ভব। বিশেষতঃ বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ন্যায় অতি দুরূহ মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সকল কথা বিশেষরূপে বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলা আবশ্যক হয়। এ জন্যও টিপ্পনীতে বহু কথা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু দুরূহ সংস্কৃত টীকার ন্যায় অনেকে এই গ্রন্থের টিপ্পনীরও সর্ব্বাংশ না পড়িয়া কেবল ব্যাখ্যাংশমাত্রও পড়িতে পারেন। অনেক স্থলে মূল ভাষ্য ও অনুবাদ না পড়িয়াও কেবল টিপ্পনী পড়িলেও এবং অনেক স্থলে কেবল অনুবাদ ও বিবৃতি পড়িলেও যাহাতে ভাষ্যের প্রতিপাদ্য বুঝা যায়, সেইরূপ চেষ্টাও যথাশক্তি করিয়াছি। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি যথাশক্তি এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও নানা কথার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, বঙ্গভাষায় ন্যায়-দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য বুঝাইতে আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিলেও যাঁহারা এই সকল বিষয়ের কোনরূপ আলোচনা করিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই, তাঁহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কোন অজ্ঞাত দুর্ব্বোধ বিষয় প্রথমে সহজে কেহই বুঝিতে পারেন না। বঙ্গভাষায় ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেও বিষয়ের দুর্ব্বোধত্ববশতঃ সে ব্যাখ্যাও সর্ব্বত্র সুবোধ হইতে পারে না। সরল ভাষায়, স্বাধীন ভাষায় সহজে ন্যায়শাস্ত্র বুঝাইবার অনুরোধে জ্ঞানপূর্ব্বক প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ বা পরিত্যাগ করা যায় না। পারিভাষিক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুপ্রসিদ্ধ শব্দের দ্বারা ঐ সকল পারিভাষিক শব্দার্থ প্রকাশও অসম্ভব। এইরূপ নানা কারণে এবং সর্ব্বোপরি আমার অক্ষমতাবশতঃ অনেক স্থলে অনুবাদাদি ইচ্ছা সত্ত্বেও সুবোধ করিতে পারি নাই। মূলানুযায়ী অনুবাদ করিতে অনুবাদের ভাষার পূর্ণতা বা সৌষ্ঠব-সাধনেও স্বাধীন ভাবে যত্ন করিতে পারি নাই। পরন্তু এই প্রথম অধ্যায় বিশেষ দুর্ব্বোধ বলিয়া এবং এই অধ্যায়ে কর্ত্তব্যবোধে অনেক কথার আলোচনা করায় অনেক স্থলে এই গ্রন্থ অনেক পাঠকের নিকটে সম্ভবতঃ অতি দুর্ব্বোধ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। আমার প্রথম চেষ্টায় এই প্রথম খণ্ডে আরও অনেক প্রকার ত্রুটি ও ভাষাদোষ প্রভৃতি ঘটিয়াছে, ইহা আমিও বুঝিতেছি। অন্যান্য খণ্ডে ভাষাসংযমের দিকে বিশেষ মনোযোগী আছি। আর তিন খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা এই যে, সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাকে নিজ নিজ অভিমত জানাইবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরমবিদ্যোৎসাহিতার ফলে যে মহান্ উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই গ্রন্থের সৌষ্ঠবসাধন আমার পরম কর্ত্তব্য হইয়াছে, তজ্জন্য আমি সকলেরই অভিমত ও

উপদেশ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক। পাঠকগণ এই গ্রন্থকে নিজের গ্রন্থ মনে করিয়া ইহার সৌষ্ঠবসাধনের জন্য আমাকে উপদেশ করিলে, তদনুসারে অন্য খণ্ডে এবং গ্রন্থশেষে আমি দোষ সংশোধনে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আর যদি পাঠকগণের উৎসাহের ফলে আমার জীবনে কখনও এই গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ হয়, তবে তখন আমি ইহার সৌষ্ঠবসম্পাদনে বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে পারিব। আমার আর যাহা যাহা বলিবার আছে, তাহা গ্রন্থশেষেই বক্তব্য। ইতি।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪
২৭শে শ্রাবণ
পাবনা

শ্রীফণিভূষণ শর্ম্মা

—০—

সূত্র ও ভাষ্য-বর্ণিত বিশেষ বিষয়ের সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

দ্বিতীয় আহ্নিক

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

—o—

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়নভাষ্য

ভাষ্য। প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ
প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।

অনুবাদ। প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে প্রবৃত্তির সফলতা হয়, অতএব প্রমাণ ঐ পদার্থের অব্যভিচারী (এবং) সর্ব্বাপেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যেহেতু গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকে প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সেই প্রবৃত্তিই সফল হয়, অতএব বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থকে যাহা এবং যেরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেইরূপই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না এবং সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণেরই প্রয়োজন অধিক।

বিবৃতি। জীব তাহার গ্রাহ্য পদার্থের প্রাপ্তি এবং ত্যাজ্য পদার্থের পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল পদার্থকে যথার্থরূপে না বুঝিয়া অর্থাৎ এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া অথবা এক প্রকার পদার্থকে অন্য প্রকার পদার্থ বলিয়া ভুল বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই সফল হয় না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। জলার্থী ব্যক্তি তৈলকে জল বুঝিয়া তাহার প্রাপ্তিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা জলকে তৈল বুঝিয়া তাহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কি সফল হয়? সেখানে কি তাহার বস্তুতঃ জলের প্রাপ্তি এবং তৈলের পরিত্যাগ হয়? তাহা কখনই হয় না। যে কোনরূপে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই এখানে প্রবৃত্তির সফলতা নহে, তাহা ভুল বুঝিয়াও হইতে পারে। কূপের জলকে গঙ্গাজল বুঝিয়া পান করিলেও পিপাসা নিবৃত্তি হয়, কিন্তু গঙ্গাজল বুঝিয়া গঙ্গাজল-লাভের যে প্রবৃত্তি, তাহা সেখানে সফল হয় না। কোন স্থলে ভুল বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইয়া আশাতীত ফললাভও হইতে পারে, কিন্তু সেখানে যাহা বুঝিয়া যাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ-বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সে প্রবৃত্তি কিন্তু সফল হয় না, কারণ, সেই প্রবৃত্তির বিষয় সেই পদার্থ অথবা সেইরূপ পদার্থ সেখানে থাকে না, তাহা থাকিলে সে বোধ যথার্থই হইত। পদার্থের যথার্থ বোধ হইলেই তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ-বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইয়া থাকে। সুতরাং যে বোধ সফল

প্রবৃত্তির জনক, তাহাকেই যথার্থ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। ঐ যথার্থ বোধ আবার প্রমাণ ব্যতীত হয় না। উহা প্রমাণেরই ব্যাপার, সুতরাং উহার দ্বারা প্রমাণও সফল প্রবৃত্তির জনক। সুতরাং বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ প্রমাণের প্রামাণ্য আছে, তাহা না হইলে প্রমাণ কখনই সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না। ফলকথা, এইরূপ অনুমানের দ্বারা সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। এবং প্রমাণ ব্যতীত যখন কোন পদার্থেরই যথার্থ বোধ হয় না, যথার্থ বোধ না হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি সফল হয় না, সুতরাং প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক, প্রমাণ যথার্থ অনুভূতির সাধন; অতএব বুঝা যায়, প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, সর্ব্বাগ্রে প্রমাণেরই অধিক প্রয়োজন, এ জন্য মহর্ষি গোতম সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

টিপ্পনী। ন্যায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রের দ্বারা "প্রমাণ", "প্রমেয়" প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সলাভে আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানসাধনের জন্য তাঁহার এই ন্যায়দর্শন আবশ্যক। নিঃশ্রেয়সলাভে গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক কেন? ইহা পরে ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি গোতমের ঐ কথায় এক সময়ে শূন্যবাদী ও সংশয়বাদী বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমাণের দ্বারাই যখন সকল পদার্থের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তখন প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। প্রামাণ্যই প্রমাণের তত্ত্ব, কিন্তু সেই প্রামাণ্য নিশ্চয়ের কোনই উপায় নাই। যাহা "প্রমাণ" নামে অভিহিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করিব কিরূপে? অনুভূতির সাধন হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, যাহা বস্তুতঃ প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া দার্শনিকগণ যাহাকে বলিয়াছেন "প্রমাণাভাস",—ভ্রমসাধন সেই প্রমাণাভাসের দ্বারাও অসংখ্য অনুভূতি হইতেছে। যাহা যথার্থ অনুভূতির সাধন, তাহাকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই অনুভূতি যথার্থ হইল কি না, ইহা নিশ্চয় করিবার উপায় যখন কিছুই নাই, তখন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় কোনরূপেই হইতে পারে না। প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া যথার্থরূপে বুঝিতে না পারিলেও তাহার দ্বারা অন্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব, সুতরাং অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া গোতমের এই শাস্ত্র অনর্থক। আর এক কথা, গোতম আত্মা প্রভৃতি "প্রমেয়" পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের চরম কারণরূপে দ্বিতীয় সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতে আত্মা প্রভৃতি "প্রমেয়" পদার্থগুলিই প্রধান মোক্ষোপযোগী, তাহা হইলে ঐ "প্রমেয়" পদার্থের সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ না করিয়া "প্রমাণ" পদার্থেরই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা তাঁহার উচিত হয় নাই। এই সমস্ত আপত্তি নিরাসের জন্য গৌতমমতপ্রতিষ্ঠাকামী ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ভাষ্যারম্ভে বলিয়াছেন;—

"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং"

ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের উপায় আছে ; অনুমান প্রমাণের দ্বারাই তাহা নিশ্চয় করা যায়। অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী। "প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী" এই কথা বলিলে কি বুঝিতে হইবে ? বুঝিতে হইবে, প্রমাণ যে পদার্থকে যাহা এবং যে প্রকার বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেই প্রকারই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না, অন্যথা হইলে বুঝিবে, তাহা প্রমাণ নহে—"প্রমাণাভাস"। "প্রমাণাভাস" তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে। কারণ, প্রমাণাভাসের প্রতিপাদ্য পদার্থ বস্তুতঃ তাহা নহে অথবা সেই প্রকার নহে। "প্রমাণাভাস" রজ্জুকে "সর্প" বলিয়া প্রতিপন্ন করে, কিন্তু রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে তখন বুঝা যায়, উহা সর্প নহে। প্রমাণাভাস আত্মাকে বিনাশী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, কিন্তু আত্মার তত্ত্ব বুঝিলে তখন বুঝা যায়, আত্মা সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী, আত্মা নিত্য। সুতরাং বুঝা যায়, প্রমাণাভাস তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী। প্রতিপাদ্য পদার্থের এই অব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য। এই অব্যভিচারিতার অনুমানই প্রমাণের প্রামাণ্যের অনুমান। ভাষ্যকার "প্রমাণং অর্থবৎ" এই কথার দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই অনুমানে হেতু বলিয়াছেন "প্রবৃত্তিসামর্থ্য"। "সামর্থ্য" শব্দটি প্রাচীন কালে ফলসম্বন্ধ বা সফলতা অর্থেও প্রযুক্ত হইত। প্রাচীনগণ সফল প্রবৃত্তিকে "সমর্থপ্রবৃত্তি" বলিতেন। যে প্রবৃত্তির "অর্থ" কি না বিষয় সম্যক্, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহাই "সমর্থপ্রবৃত্তি," তদ্ভিন্ন প্রবৃত্তি ব্যর্থপ্রবৃত্তি, নিষ্ফল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির সামর্থ্য বলিতে প্রবৃত্তির সফলতা।* ভাষ্যকারের ঐ কথার ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে—সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব। ভাষ্যকার ঐ হেতুর দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, প্রমাণ যখন সফল প্রবৃত্তির জনক, তখন বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী, অর্থাৎ তাহার প্রামাণ্য আছে। প্রমাণ যদি প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী না হইত, তাহা হইলে কখনই সফলপ্রবৃত্তি জন্মাইত না। যাহা প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী নহে, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন "প্রমাণাভাস"। প্রমাণাভাসের দ্বারা বুঝিয়া সেই বস্তুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই সফল হইতে পারে না, কারণ, প্রমাণাভাসের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, বস্তুতঃ তাহা অথবা সেই প্রকার বস্তু সেখানে থাকে না। তাহা না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ কিরূপে হইবে? তাহা কোন-

* "অর্থবদিতি নিত্যযোগে মতুপ্। নিত্যতা চাব্যভিচারিতা, তেনার্থাব্যভিচারীত্যর্থঃ। ইয়মেব চার্থাব্যভিচারিতা প্রমাণস্য, যদ্দেশকালান্তরাবস্থান্তরাবিসংবাদোঽর্থস্বরূপপ্রকারয়োস্তদুপদর্শিতয়োঃ। অত্র হেতুঃ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যদি পুনরেতদর্থবন্নাভবিষ্যন্ন সমর্থাং প্রবৃত্তিমকরিষ্যৎ যথা প্রমাণাভাস ইতি ব্যতিরেকী হেতুঃ, অন্বয়ব্যতিরেকী বা অনুমানস্য স্বতঃপ্রমাণতয়াঽন্বয়স্যাপি সম্ভবাৎ"।—ন্যায়বার্ত্তিক, তাৎপর্য্যটীকা।

রূপেই হইতে পারে না। ফলতঃ এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমানের দ্বারা সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে, ইহাই ভাষ্যকারের প্রথম কথা। "অর্থ" শব্দের দ্বারা বস্তুমাত্র বুঝা গেলেও ভাষ্যকার গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকেই এখানে "অর্থ" শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাষ্যকার নিজেই পরে তাহা বলিয়াছেন। ফলকথা, যাহা গ্রাহ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, কিন্তু উপেক্ষণীয়, তাহা পদার্থ হইলেও এখানে "অর্থ" শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। কারণ, উপেক্ষণীয় পদার্থে কোন প্রবৃত্তিই হয় না; প্রবৃত্তির সফলতার কথা সেখানে বলা যায় না।

সূক্ষ্মদর্শীর আপত্তি হইতে পারে যে, যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ভাষ্যকার সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই অনুমানের প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইবে? তাহার জন্য আবার অন্য অনুমান উপস্থিত করিলে তাহারই বা প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইবে? এইরূপে কোন দিনই প্রমাণের প্রামাণ্য-সন্দেহ নিবৃত্ত হইবে না, তবে আর প্রামাণ্য নিশ্চয় করা গেল কৈ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অনুমান মাত্রেই প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। এই যে ঘড়ি দেখিয়া সময়ের অনুমান করিয়া তদনুসারে এখন সর্ব্বদেশে অসংখ্য কার্য্য চলিতেছে, লিপিপাঠে অনুমানের দ্বারা কত কত প্রত্নবার্ত্তার নির্ণয় হইতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত দুরূহ তত্ত্বের অনুমান করিয়া তদনুসারে কত কত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তুলাদণ্ডের সাহায্যে দ্রব্যের গুরুত্ববিশেষের অনুমান করিয়া সুচিরকাল হইতে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, ভূয়োদর্শনসিদ্ধ অবিসংবাদী সংস্কারসমূহের মহিমায় আরও কত কত অনুমান করিয়া সুচিরকাল হইতে জীবকুল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, এই সকল অনুমানে কি বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই প্রামাণ্য-সংশয় হইয়াছে ও হইয়া থাকে? তাহা হইলে কি সংসার চলিত? অবশ্য অনেক স্থলে প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় এবং জ্ঞানে যথার্থতা-সংশয় হইয়া থাকে, এ জন্য ন্যায়াচার্য্যগণ অন্য দার্শনিকের ন্যায় একেবারে "স্বতঃপ্রামাণ্য" পক্ষ স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা "পরতঃপ্রামাণ্য"বাদী। অর্থাৎ ইঁহাদিগের মতে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হয়, কারণ, "এই জ্ঞান যথার্থ কি না, ইহা প্রমাণ কি না", এইরূপ সংশয় বহু স্থলে হইয়া থাকে। প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ্য হইলে এইরূপ সংশয় কখনও হইত না। কিন্তু অনেক প্রমাণবিশেষের স্বতঃপ্রামাণ্য ন্যায়াচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, তাহা সত্য, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে, সেই সকল প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয়ই হয় না। কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাইয়া এবং কোন নামশূন্য পত্রাদি পাইয়া তাহার অবশ্য একজন লেখক ছিল বা আছে, এই বিষয়ে যে অনুমান হয়, তাহাতে কি কখনও প্রামাণ্য-সংশয় হইয়া থাকে? সংশয়বাদী ইহাতেও সংশয় করিলে পদে পদে সত্যের অপলাপ করিয়া বিনষ্ট হইবেন ("সংশয়াত্মা বিনশ্যতি")।

পরন্তু সংশয়বাদী ইহা স্বীকার না করিলে স্বপক্ষ সমর্থনই করিতে পারেন না। সর্ব্বত্র সংশয়ই তাঁহার স্বপক্ষ। তিনি যুক্তির দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিবেন, নচেৎ তাঁহার কথা কে মানিবে? কেবল "সংশয় সংশয়" বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও কেহ তাহা শুনিবে না, কেন

সংশয়, তাহার যুক্তি বলিতে হইবে। "যুক্তি" বলিয়া স্বতন্ত্র কোন একটা পদার্থ নাই। অনুমান প্রমাণ এবং তাহার সহকারী "তর্কে"র প্রচলিত নামই "যুক্তি"। অনুমান মাত্রেই প্রামাণ্য-সংশয় করিলে তাহার দ্বারা সংশয়বাদীর পক্ষও নির্ণীত হইবে না। ঐ সংশয়েও সংশয়, আবার তাহাতেও সংশয়, এইরূপই বলিয়া যাইতে হইবে। যুক্তির দ্বারা কিছু স্থির হয় না, সর্ব্বত্র সংশয় থাকে, কোন যুক্তিই প্রতিষ্ঠিত নহে, এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ, ঐ কথাগুলিও যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিয়াই বলা হইতেছে। পরন্তু সংশয় মনোগ্রাহ্য। সংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যায়। সে মানস প্রত্যক্ষে মনঃ স্বতঃপ্রমাণ। সুতরাং কোন বিষয়ে সংশয় হইলে সংশয় হইয়াছে কি না, এইরূপ সংশয় কাহারই হয় না। সর্ব্বত্র প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যাইত। যে সকল প্রমাণে বস্তুতঃ প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তাহাতে ভাষ্যোক্ত প্রকারে প্রামাণ্যের অনুমান করিতে হইবে। সেই হেতুতে ব্যভিচার-সংশয় হইলে অনুকূল তর্কের দ্বারা তাহা দূর করিতে হইবে। তাহাতেও ঐরূপ সংশয় হইলে অন্যরূপ অনুমানের দ্বারা এবং অন্যরূপ তর্কের দ্বারা তাহা দূর করিবে। এইরূপে স্বতঃপ্রমাণ অনুমান আসিয়া পড়িলে তখন আর কেহ প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলিতে পারিবেন না। প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলিতে গেলেও তাহার কারণ বলিতে হইবে। বিনা কারণে সংশয় হইতে পারে না। সে কারণও প্রমাণসিদ্ধ করিয়া দেখাইতে হইবে। প্রমাণমাত্রে প্রামাণ্য-সংশয় করিলে কিছুই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা চলিবে না। ফলতঃ যাহা অনুভবসিদ্ধ, তাহা স্বীকার না করিলে, প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিলে সংশয়বাদীরও নিস্তার নাই। শূন্যবাদীর কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। মূল কথা, কোন স্থলে স্বতঃ, কোন স্থলে অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। ভাষ্যকার যে অনুমানের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের কথা বলিয়াছেন, ঐ অনুমান স্বতঃপ্রমাণ। উহাতে আর প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। যাহা সফল প্রবৃত্তির জনক, তাহা অবশ্য প্রমাণ। তাহা প্রমাণ না হইলে কখনই সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না, ইহা বুঝিলে এই অনুমানের উপরে আর প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। কারণ, এই অনুমানের হেতু নির্দ্দোষ বলিয়াই নিশ্চিত। অবশ্য প্রমাণ স্বতঃই সফল প্রবৃত্তির জনক নহে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ", অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য পদার্থের জ্ঞান হইলে যদি ঐ পদার্থ উপকারী বলিয়া মনে হয়, তবে সংসারীর তাহা পাইতে ইচ্ছা হয় এবং অপকারী বলিয়া মনে হইলে তাহার পরিহারে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাবশতঃ তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য কারণ সত্ত্বে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার হইয়া থাকে। সুতরাং সেখানে সেই প্রবৃত্তি সফল হয়। এই ভাবে প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক। "প্রমাণাভাস" সফল প্রবৃত্তির জনক নহে। কারণ, প্রমাণাভাসজন্য জ্ঞান ভ্রম। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহা পাইতে অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ হইতে পারে না। বস্তু না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার কিরূপ হইবে? সুতরাং সেখানে

প্রবৃত্তি সফল হয় না। যথার্থ জ্ঞানই সফল প্রবৃত্তির জনক। ঐ যথার্থ জ্ঞান প্রমাণ ব্যতীত হয় না। উহা প্রমাণেরই ব্যাপার। সুতরাং ঐ যথার্থজ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা প্রমাণও সফল প্রবৃত্তির জনক। সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুঝিলে যেমন প্রমাণজন্য জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয় হয়, তদ্রূপ সেখানে প্রমাণেরও ঐ হেতুর সাহায্যে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। তাহা হইলে প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থবর্গের তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব নহে এবং অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া মহর্ষি গোতমের এই ন্যায়শাস্ত্র অনর্থকও নহে।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুঝিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তির সফলতার পূর্ব্বে প্রমাণকে সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া নিশ্চয় করা গেল না। সুতরাং তখন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ও হইল না। প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও পদার্থ-নিশ্চয় হইল না। পদার্থ-নিশ্চয় না হইলেও প্রবৃত্তি হইল না। প্রবৃত্তি না হইলে প্রবৃত্তির সফলতা অলীক। সুতরাং কোন কালেই প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের আশা থাকিল না। আপত্তিটা আপাততঃ একটা গুরুতর কিছু মনে হইলেও ইহা গুরুতর কিছু নহে। কারণ, প্রবৃত্তিতে পদার্থ-নিশ্চয় নিয়ত কারণ নহে। পদার্থ-সন্দেহ স্থলেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে এবং পূর্ব্বে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলেও প্রমাণজন্য জ্ঞান হইবার কোন বাধা নাই। প্রমাণের দ্বারা পদার্থ-বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইচ্ছাবিশেষপ্রযুক্ত প্রবৃত্ত হইয়া যখন ঐ প্রবৃত্তির সফলত্ব নিশ্চয় করে, তখনই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। পদার্থজ্ঞান এবং প্রবৃত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক হয় না। উদয়নাচার্য্য "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"তে এ কথাটা আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ। ঐহিক ফলের জন্য এবং পারলৌকিক ফলের জন্য। পারলৌকিক ফলের জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্ব্বে প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক। কিন্তু ঐহিক ফলের জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহাতে পদার্থ-নিশ্চয়ও অপেক্ষা করে না এবং প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় দূরে থাকুক, প্রামাণ্য কি, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন সময়ে পূর্ব্বেও প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইয়া পড়ে, তাহাও সে স্থলে প্রবৃত্তির কারণ নহে। ইহা স্বীকার না করিলে যিনি জয়লাভের ইচ্ছায় প্রামাণ্য খণ্ডন করিবার জন্য বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহার এ প্রবৃত্তি কেন হইতেছে? তাঁহারও ত জয়লাভ একান্ত নিশ্চিত নহে। সুতরাং পদার্থ নিশ্চয় না হইলেও প্রবৃত্তি হয়, ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য এবং সত্য।

যেখানে একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থ-জ্ঞান হইতেছে, যেমন আমাদিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ কত প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেখানে প্রথম প্রমাণকে সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুঝিলে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া যায়। শেষে তজ্জাতীয় প্রমাণ মাত্রেই "ইহা যখন তজ্জাতীয় অর্থাৎ সফল প্রবৃত্তিজনক প্রমাণের সজাতীয়," তখন ইহা অবশ্য প্রমাণ, এইরূপে প্রামাণ্যের নিশ্চয় পূর্ব্বেও হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। প্রমাণমূলক প্রচলিত

ব্যবহারে এইরূপ স্থল প্রচুর। অদৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও এইরূপে পূর্ব্বেই হইয়া থাকে; সুতরাং অদৃষ্টফলক পারলৌকিক কার্য্যকলাপে প্রবৃত্তি হওয়ার বাধা নাই। বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চয়ের কথা এবং প্রমাণ সম্বন্ধে অন্যান্য আপত্তি ও সমাধান মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। যথা-স্থানেই তাহার বিশদ প্রকাশ হইবে।

মহর্ষি সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত আদি-ভাষ্যের দ্বারা ইহারও উত্তর দিয়া গিয়াছেন। সে পক্ষে "অর্থবৎ" এই স্থলে "অর্থ" শব্দের অর্থ প্রয়োজন এবং ঐ স্থলে "অতিশায়ন" অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় বিহিত। তাহা হইলে "প্রমাণং অর্থবৎ" এই কথার দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষে বুঝা যায়, প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তিসামর্থ্য"ই হেতু। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বুঝিয়া প্রবৃত্তি হইলেই যখন প্রবৃত্তি সফল হয় এবং প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থেরই যথার্থ বোধ হয় না, প্রমাণই সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক, "প্রমেয়" প্রভৃতি যাবৎ পদার্থ ই প্রমাণের মুখাপেক্ষী, তখন বুঝা গেল, প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ষি সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার যে অনুমানের দ্বারা প্রমাণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন, উহাও স্বতঃপ্রমাণ। সকল পদার্থসিদ্ধি যাহার অধীন এবং যাহাই যথার্থ বোধ জন্মাইয়া তদ্দ্বারা জীবের প্রবৃত্তিকে সফল করে, তাহার যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, এ বিষয়ে প্রতিবাদ হইতে পারে না। এইরূপ অনুমানে প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। এইরূপ অনেক প্রমাণের "স্বতঃপ্রামাণ্য" পরতঃপ্রামাণ্যবাদী ন্যায়াচার্য্যগণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার সংবাদ দিতেছে।

"প্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ জ্ঞান। কেবল প্রতিপত্তি বলিলে প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানও বুঝা যায়, কিন্তু তাহা কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মায় না এবং প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইলেও উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে উপেক্ষাই করে, সেখানে গ্রহণও নাই, ত্যাগও নাই, সুতরাং সেখানে তদ্বিষয়ে কোন অনুষ্ঠান নাই, সেখানে প্রবৃত্তির সফলতার কথা বলা চলে না। তাই কেবল প্রতিপত্তি না বলিয়া বলিয়াছেন "অর্থপ্রতিপত্তি"। "অর্থ" শব্দের দ্বারা যে এখানে গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থই লক্ষ্য অর্থাৎ সুখ এবং সুখের কারণ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ পদার্থবর্গই যে ভাষ্যকারের এখানে "অর্থ" শব্দের অর্থ, এ কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। পরে অনেক বার ভাষ্যকার ঐ অর্থে "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার জন্য এবং ভাষ্যের পূর্ব্বাপর সংগতির জন্য কেবল "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে পূর্ব্বোক্ত "অর্থ"ই তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে।

প্রমাণাভাসের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত অর্থপ্রতিপত্তি হয়, কিন্তু সেখানে প্রবৃত্তির সফলতা হয় না। তাই বলিয়াছেন 'প্রমাণতঃ'। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা এবং প্রমাণ হেতুক। ভাষ্যকার "প্রমাণেন" অথবা "প্রমাণাৎ" এইরূপ কোন প্রয়োগ না করিয়া "প্রমাণতঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন

কেন? উহাতে কি কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে? আমরা এখন এ সব কথার চিন্তা না করিলেও উদ্দ্যোতকর ইহার চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ইহার মধ্যে তিনি ভাষ্যকারের অনেক অভিসন্ধি দেখিয়াছিলেন। এই কথায় উদ্দ্যোতকর এখানে যাহা বলিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে কথাগুলির বিশদ মর্ম্ম এই যে, "প্রমাণতঃ" এই পদটি তৃতীয়া বিভক্তির সকল বচনেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং উহার দ্বারা বিভিন্ন বিভক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এক একটি করিয়া বহু অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কোন স্থলে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা, কোন স্থলে দুই বা বহু প্রমাণের দ্বারা পদার্থবোধ হয়, এ সিদ্ধান্ত ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন। এখানেও তদনুসারে "প্রমাণতঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার দ্বারা একমাত্র প্রমাণের দ্বারা অথবা দুই প্রমাণের দ্বারা অথবা বহু প্রমাণের দ্বারা, এই তিনটি অর্থই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু "প্রমাণেন" অথবা "প্রমাণাভ্যাং" অথবা "প্রমাণৈঃ" ইহার কোন একটি বাক্য প্রয়োগ করিলে ঐরূপ অর্থ বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই এবং পক্ষান্তরে পঞ্চমী বিভক্তির সকল বচনেও "প্রমাণতঃ" এই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। হেত্বর্থে পঞ্চমী হইলে উহার দ্বারা বুঝা যাইবে, প্রমাণ অর্থপ্রতিপত্তির হেতু। পক্ষান্তরে ভাষ্যকারের ইহাও বিবক্ষিত ছিল। উদ্দ্যোতকরের এই কথার সমর্থনের জন্য তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণের দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি হয়, এই কথা বলিলেও প্রমাণ অর্থপ্রতিপত্তির হেতু, ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলেও হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা উহা প্রকাশ করিলে উহা শীঘ্র বুঝা যায়। তাহাতে প্রমাণ ও তজ্জন্য অর্থপ্রতিপত্তি যে একই পদার্থ নহে, ভিন্ন পদার্থ, ইহাও শীঘ্র স্পষ্ট বুঝা যায়। হেতু বলিয়া বুঝিলে তাহার ফলকে হেতু হইতে ভিন্ন বলিয়াই শীঘ্র বুঝা যায়। ভাষ্যকার ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া তাহাও বুঝাইয়াছেন এবং যথার্থ বোধের অন্যান্য কারক হইতে তাহার করণকারক প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহার উল্লেখ এবং প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত, ইহা দেখাইবার জন্য এক পক্ষে করণে তৃতীয়া বিভক্তি-সিদ্ধ "প্রমাণতঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলকথা, প্রয়োগ-চতুর ভাষ্যকার যেমন "অর্থবৎ" এই স্থলে অনেকার্থ "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া দুইটি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ "প্রমাণতঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন। অন্যরূপ প্রয়োগে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত সকল অর্থ প্রকটিত হয় না। *

কোন পুস্তকে ভাষ্যারম্ভে "ওঁ নমঃ প্রমাণায়" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ঐ পাঠ কল্পিত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের মঙ্গলাচরণের কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু বঙ্গদেশের প্রাচীন মহাদার্শনিক শ্রীধর ভট্ট তাঁহার 'ন্যায়-কন্দলী'র প্রারম্ভে মঙ্গল-বিচারপ্রসঙ্গে ন্যায়-ভাষ্যকার পক্ষিলস্বামী ভাষ্যারম্ভে মঙ্গলবাক্য নিবদ্ধ

* মহর্ষি গোতমও বলিয়াছেন—প্রমাণতশ্চার্থপ্রতিপত্তেঃ— ন্যায়সূত্র ৪।২।২৯।

করেন নাই, ইহা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার মঙ্গল-বাক্য নিবদ্ধ না করিলেও তিনি গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীধরভট্ট অনুমান করিয়াছেন। শ্রীধরভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি যে ৯১৩ শাকাব্দে "ন্যায়কন্দলী" রচনা করেন, ইহা "ন্যায়কন্দলী"র শেষভাগে তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।*

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ মহর্ষি গোতমের মঙ্গলাচরণ বিষয়ে বিচার করিয়া শেষে নিজের মত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রে সর্ব্বপ্রথম "প্রমাণ" শব্দের উচ্চারণ করাতেই তাঁহার মঙ্গলাচরণ হইয়াছে। কারণ, "প্রমাণ" বিষ্ণুর একটি নাম। বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে আছে "প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ"। আমরা ভাষ্যকারের মঙ্গলাচার বিষয়ে বৃত্তিকারের ঐ কথাটিও বলিতে পারি। কারণ, ভাষ্যকারও সর্ব্বাগ্রে "প্রমাণ" শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। অন্য উদ্দেশ্যে এবং অন্য তাৎপর্য্যে উচ্চারণ করিলেও বৃত্তিকার মনে করেন, নামের মহিমা যাইবে কোথায়?

ভাষ্য। প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ, নার্থপ্রতিপত্তিমন্তরেণ প্রবৃত্তিসামর্থ্যং। প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতাঽর্থমুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা। তস্যেপ্সা জিহাসাপ্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে। সামর্থ্যং পুনরস্যাঃ ফলেনাভিসম্বন্ধঃ। সমীহমানস্তমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা তমর্থমাপ্নোতি জহাতি বা। অর্থস্তু সুখং সুখহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ। সোঽয়ং প্রমাণার্থোঽপরিসংখ্যেয়ঃ, প্রাণভৃদ্‌ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ।

অনুবাদ। প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থবোধ হয় না। অর্থের যথার্থবোধ ব্যতীতও প্রবৃত্তির সফলতা হয় না। এই জ্ঞাতা ব্যক্তি অর্থাৎ সংসারী জীব প্রমাণের দ্বারাই অর্থকে উপলব্ধি করিয়া, সেই অর্থকে পাইতে ইচ্ছা করে অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। প্রাপ্তির ইচ্ছা অথবা ত্যাগের ইচ্ছায় প্রণোদিত সেই জীবের সমীহা অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ে যে প্রযত্নবিশেষ, তাহা "প্রবৃত্তি" এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় অর্থাৎ তাহাকেই প্রবৃত্তি বলে। এই প্রবৃত্তির "সামর্থ্য" কিন্তু ফলের সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে "প্রবৃত্তিসামর্থ্য" শব্দের দ্বারা প্রবৃত্তির সফলতা বুঝিতে

* "অসত্যপি নমস্কারে ন্যায়মীমাংসাভাষ্যয়োঃ পরিসমাপ্তত্বাৎ"। "ন চ ন্যায়মীমাংসাভাষ্যকারাভ্যাং ন কৃতো নমস্কারঃ কিন্তু তত্রানুপনিবদ্ধঃ"। "যদিমৌ পরমাস্তিকৌ পক্ষিলশবরস্বামিনৌ নানুতিষ্ঠেত ইত্যসম্ভাবনমিদং"—(ন্যায়কন্দলী)

"আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ"।
"ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশাকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা"।

হইবে। সমীহমান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তমান জীব সেই অর্থকে (পূর্ব্বোক্ত অর্থকে) পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ সেই অর্থকে প্রাপ্ত হয় অথবা ত্যাগ করে। "অর্থ" কিন্তু সুখ ও সুখের কারণ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে "অর্থ" শব্দের দ্বারা সুখ ও সুখের কারণ-রূপ গ্রাহ্য পদার্থ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণরূপ ত্যাজ্য পদার্থই বুঝিতে হইবে। যাহা গ্রাহ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, কিন্তু উপেক্ষণীয় পদার্থ, তাহা ঐ "অর্থ" শব্দের দ্বারা ধরা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিগণের অথবা প্রাণিবৈচিত্র্যের নিয়ম না থাকায় অর্থাৎ যাহা একের সুখ বা সুখের কারণ হয় অথবা দুঃখ বা দুঃখের কারণ হয়, তাহা অন্য সকল প্রাণীরও সেইরূপই হয়, এমন নিয়ম না থাকায়, সেই এই "প্রমাণার্থ" অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত সুখদুঃখাদি অনিয়ম্য, (তাহার নিয়ম করা যায় না) অর্থাৎ যাহা সুখের কারণ, তাহা সকলেরই সুখের কারণ, ইত্যাদি প্রকার নিয়ম নাই। প্রমাণের প্রয়োজন সুখদুঃখাদি কোন নিয়মবদ্ধ নহে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার ভাষ্যলক্ষণানুসারে এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যের পদবর্ণন করিয়াছেন। নিজের কথার নিজের ব্যাখ্যা করাই স্বপদবর্ণন। উহা ভাষ্যের একটা লক্ষণ। ভাষ্য কাহাকে বলে, এ জন্য প্রাচীনগণ বলিয়া গিয়াছেন,—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ"॥

পরাশরপুরাণে ১৮ অধ্যায়ে এইরূপ ভাষ্যলক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা কোন পুস্তকে দেখা যায়। সূত্রের ভাষ্য হইলে সেখানে সূত্রানুসারী পদসমূহের দ্বারা সূত্রার্থ-বর্ণন থাকিবেই এবং স্বপদ-বর্ণনও থাকিবে। কিন্তু আদিভাষ্যে কেবল স্বপদ-বর্ণনরূপ ভাষ্য-লক্ষণই সম্ভব। তাহাতেই আদিভাষ্যের ভাষ্যত্ব নিষ্পত্তি হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত সন্দর্ভকে "আদিভাষ্য" নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

"প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ" অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত অর্থপ্রতিপত্তি হয় না, এখানে 'প্রমাণ' শব্দ আছে বলিয়া অর্থের যথার্থ বোধ হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম-জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু যথার্থ বোধ প্রমাণের দ্বারাই হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা তাঁহার আদিভাষ্যের "প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ" এই কথার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথার্থ বোধ প্রবৃত্তিকে সফল করে, ভ্রম-জ্ঞান তাহা করে না। ঐ যথার্থ বোধ যখন প্রমাণেরই কার্য্য এবং প্রবৃত্তির সফলতা সম্পাদনে প্রমাণেরই ব্যাপার, তখন উহার দ্বারা প্রমাণ সফল প্রবৃত্তিজনক। সুতরাং প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী এবং নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহাই ভাষ্যকারের

তাৎপর্য্য এবং ঐ কথাটি না বলিলে প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের বিশেষ বলা হয় না। তাহা না বলিলেও প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন হয় না।

"সোঽয়ং প্রমাণার্থঃ" ইত্যাদি ভাষ্য পড়িলে বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণার্থ অর্থাৎ ভাষ্যকার যাহাকে "অর্থ" বলিয়াছেন, সেই সুখ-দুঃখাদি অসংখ্য; কারণ, প্রাণিগণ অসংখ্য। তাৎপর্য্য-টীকাকারের কথায় বুঝা যায়, উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বে বা সমকালে কেহ কেহ ঐ ভাষ্যের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিতেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ঐ ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি "অর্থ" এক একটি গণনায় অসংখ্য হইলেও ভাষ্যকার সুখ, সুখহেতু এবং দুঃখ ও দুঃখহেতু, এই চারি প্রকারে তাহার বিভাগ করিয়া সংখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং "প্রমাণার্থ অসংখ্য"—ইহা ভাষ্যার্থ নহে। পরন্তু ঐ অর্থে ভাষ্যকারের হেতুটিও সঙ্গত হয় না, ঐ কথা বলিবারও কোন প্রয়োজন নাই। তবে ভাষ্যার্থ কি? উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—প্রমাণের প্রয়োজন সুখ-দুঃখাদি অনিয়ম্য, ইহাই ভাষ্যার্থ। ভাষ্যে "প্রমাণার্থঃ" এই স্থানে "অর্থ" শব্দের অর্থ প্রয়োজন। চন্দনবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন বা ফল সুখ, কণ্টকবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন বা ফল দুঃখ। ইহার নিয়ম নাই, কোন প্রাণীর পক্ষে ইহার বিপরীত। উষ্ট্র কণ্টক প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া সুখ ভোগই করে। মনুষ্যাদি তাহাতে দুঃখানুভবই করে। যাহা একের সুখহেতু, তাহা অন্যের দুঃখহেতু। সুখ দুঃখ কাহারও স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে সকল পদার্থই সকলের সুখকর হইত। অস্বাভাবিক হইলে তাহা কাল্পনিক পদার্থ হইয়া পড়ে, তাহা প্রমাণের প্রয়োজন হইতে পারে না, এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই ভাষ্যকার "সোঽয়ং প্রমাণার্থঃ" ইত্যাদি ভাষ্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ স্বাভাবিক না হইলেও কাল্পনিক নহে; উহা নৈমিত্তিক। নিমিত্তের ভেদ ও বৈচিত্র্যবশতঃ তাহার ভেদ ও বৈচিত্র্য হয়। জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসমূহের বৈচিত্র্যবশতঃ যাহা একের সুখ বা সুখের কারণ, তাহা অন্যের দুঃখ বা দুঃখের কারণ হইতেছে। তাই হেতু দেখাইয়াছেন—"প্রাণভৃদ্‌ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ"। ভাষ্যে "অপরিসংখ্যেয়" বলিতে এখানে অসংখ্য নহে; উহার অর্থ অনিয়ম্য। "প্রাণভৃদ্‌ভেদস্য" এই কথার দ্বারা প্রাণিগণের যে ভেদ অর্থাৎ বৈচিত্র্য, ইহাও ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ প্রাণিগণের যে ভেদ, কি না—বৈচিত্র্য, তাহার নিয়ম না থাকায় সুখ-দুঃখাদি অনিয়ত। যাহা অনিয়তকারণ-জন্য, তাহা সমস্তই অনিয়ত, এইরূপ সামান্যানুমানের দ্বারা ইহা নিশ্চিত আছে।

ভাষ্য। অর্থবতি চ প্রমাণে প্রমাতা-প্রমেয়ং-প্রমিতিরিত্যর্থবন্তি ভবন্তি। কস্মাৎ? অন্যতমাপায়েঽর্থস্যানুপপত্তেঃ। তত্র যস্যেপ্সাজিহাসা-প্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা। স যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং। যোঽর্থঃ প্রমীয়তে তৎ প্রমেয়ম্। যদর্থবিজ্ঞানং সা প্রমিতিঃ। চতসৃষ্বেবম্বিধাসু তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে।

অনুবাদ। প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি ইহারা সমীচীনার্থ হয়। অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে— প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই "প্রমাতা," "প্রমেয়", "প্রমিতি", ইহারা সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। [প্রশ্ন] কেন ? [উত্তর] যে হেতু প্রমাণের অভাবে অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া যাহার প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির যথার্থ বোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে "প্রমাতা" বলে। সেই প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে, তাহাকে "প্রমাণ" বলে। যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাকে "প্রমেয়" বলে। পদার্থবিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাকে "প্রমিতি" বলে। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের অব্যভিচারী চারিটি প্রকার [প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি] থাকাতে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তাহা গ্রাহ্য মনে হইলে গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্য্যবসান হইতেছে।

বিবৃতি। প্রমাণ পদার্থের অব্যভিচারী, ইহা বলিলে কি বুঝিতে হইবে ? বুঝিতে হইবে, প্রমাণ যে পদার্থকে যেরূপে, যে প্রকারে প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ ঠিক্ সেইরূপ, সেই প্রকারই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না। প্রমাণাভাসের দ্বারা পদার্থ বোধ হইলে সেখানে এইরূপ হয় না। প্রমাণ যখন পদার্থের অব্যভিচারী, তখন "প্রমাণে"র দ্বারা যে ব্যক্তির বোধ হইয়াছে, সেই "প্রমাতা" ব্যক্তি এবং সেই বোধের বিষয় "প্রমেয়" পদার্থ এবং সেই যথার্থ বোধরূপ "প্রমিতি"—এই তিনটিও প্রমাণের ন্যায় পদার্থের অব্যভিচারী। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কখনই প্রমিতি হয় না। প্রমাণ দ্বারা প্রমিতি হইলে সেখানে প্রমাতা এবং প্রমেয়ও থাকিবে। তাহা হইলে প্রমাণ পদার্থের অব্যভিচারী বলিয়াই "প্রমাতা", "প্রমেয়" এবং "প্রমিতি"ও পূর্ব্বোক্তরূপে পদার্থের অব্যভিচারী এবং ঐ চারিটি প্রকার ঐরূপ বলিয়াই তত্ত্ববোধ হইতেছে। নচেৎ তত্ত্ববোধ কোনরূপে হইত না। যে পদার্থ যেরূপ এবং যে প্রকার, তাহাকে ঠিক সেইরূপে এবং সেই প্রকার বুঝিলেই তত্ত্ব বুঝা হয় এবং শেষে গ্রহণ অথবা ত্যাগ অথবা উপেক্ষার দ্বারাই সেই তত্ত্বের পর্য্যবসান হয়। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া হয় গ্রহণ করে, না হয় ত্যাগ করে, না হয় উপেক্ষা করে। জগতে এই পর্য্যন্তই তত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণের কার্য্য চলিতেছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার আদিভাষ্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারের যুক্তি অনুসারে "প্রমাতা", "প্রমেয়" এবং "প্রমিতি" এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন ? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অর্থবতি চ প্রমাণে" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণ

অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াই প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি ইহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়; কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের যথার্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা যথার্থ বোধ হইলেই সেখানে "প্রমাতা", "প্রমেয়" এবং "প্রমিতি" থাকে। এ জন্য তাহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে প্রমাণই প্রধান, তাই তাহাকেই আদিভাষ্যে অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই "প্রমাতা", "প্রমেয়" ও "প্রমিতি"কে প্রমাণের ন্যায় অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "অর্থবন্তি" এই স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় নিত্যযোগ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন, ঐ স্থলে প্রাশস্ত্যার্থে "মতুপ্" প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি অর্থবান্ হয়, কি না—সমীচীনার্থ হয়। ইহাতেও ফলে অর্থের অব্যভিচারী হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ হইবে। আদিভাষ্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ নিরতিশয়প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা হইয়াছে, সে পক্ষেও এখানে "অর্থবন্তি" এই স্থলেও "অর্থ" শব্দের প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে এবং অতিশায়নার্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। সে পক্ষের ভাষ্যার্থও "পক্ষান্তরে" বলিয়া অনুবাদে বলা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ তত্ত্বজ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা জীবের প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতে প্রমাতা প্রভৃতিও নিরতিশয়-প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতিও প্রয়োজন বিষয়ে প্রমাণের ন্যায়ই সমর্থ।

ভাষ্যে "অন্যতমাপায়ে" এই স্থলে "অন্যতম" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি চারিটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণানুসারে এখানে উহার দ্বারা প্রথমোক্ত "অন্যতম" প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। প্রমাণের প্রাধান্য সমর্থনের জন্যই ভাষ্যকার ঐ হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং "অন্যতম" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "প্রমাণ"রূপ বিশেষ অর্থই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ।

প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তাহা যদি সুখসাধন বলিয়া বুঝে, তবে গ্রহণ করে; কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ গ্রহণ করিতে না পারিলেও গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। দুঃখ-সাধন বলিয়া মনে হইলে তাহা ত্যাগ করে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাতে ত্যাগের যোগ্যতা থাকে এবং সুখসাধনও নহে, দুঃখসাধনও নহে, ইহা বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তত্ত্বের এই পর্য্যন্তই হয়। সুতরাং গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্যতা এবং ত্যাগ বা ত্যাগযোগ্যতা এবং উপেক্ষাই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি, উহাই তত্ত্বের পর্য্যবসান। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম বোধ হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রহণাদি হয় বটে, কিন্তু সে গ্রহণাদি তত্ত্বের পর্য্যবসান নহে। প্রমাণাভাসের দ্বারা তত্ত্বের বোধ হয় না; সুতরাং সেখানে তত্ত্বের গ্রহণাদি হয় না। তত্ত্বের গ্রহণাদিতে "প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি" আবশ্যক। ঐ চারিটি থাকাতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার তত্ত্ব পরিসমাপ্তি হইতেছে। জীব-জগতে প্রমাণাভাসের আধিপত্য প্রচুর হইলেও প্রমাণ একেবারে নির্ব্বাসিত হয় নাই। প্রমাণের দ্বারা চিরকালই বহু বহু তত্ত্ববোধ এবং ঐ তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত

পরিসমাপ্তি হইতেছে এবং হইবে। অনেক ভাষ্য-পুস্তকেই "অর্থতত্ত্বং পরিসমাপ্যতে" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী প্রশ্নভাষ্য দেখিয়া এবং বার্ত্তিকাদি দেখিয়া এখানে "তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই আছে। জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতেও "তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে" এইরূপ কথাই দেখা যায়। ভাষ্যে "অর্থবতি চ" এই স্থলে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ। "অর্থবতি চ" এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা "অর্থবত্যেব"। অবধারণ অর্থ এবং হেতু অর্থে "চ" শব্দের প্রয়োগ বহু স্থানে দেখা যায়। এই ভাষ্যেও বহু স্থানে ঐরূপ প্রয়োগ আছে। সেগুলি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

ভাষ্য। **কিং পুনস্তত্ত্বং ? সতশ্চ সদ্‌ভাবোঽসতশ্চাসদ্‌ভাবঃ। সৎ সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।**

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তত্ত্ব কি ? অর্থাৎ পূর্ব্বে যে তত্ত্ব পরিসমাপ্তির কথা বলা হইল, সে তত্ত্বটি কি ? (উত্তর) সৎ পদার্থের অর্থাৎ ভাব পদার্থের সদ্ভাব এবং অসৎ পদার্থের অর্থাৎ অভাব পদার্থের অসদ্ভাব। বিশদার্থ এই যে, "সৎ" অর্থাৎ ভাব পদার্থ "সৎ" এইরূপে অর্থাৎ "ভাব" এইরূপে, যথাভূত, কি না— অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়। এবং 'অসৎ' অর্থাৎ অভাব পদার্থ অসৎ এইরূপে অর্থাৎ অভাব এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়।

বিবৃতি। যে পদার্থ যাহা এবং যে প্রকার, ঠিক সেইরূপে সেই প্রকারে জ্ঞায়মান সেই পদার্থকে "তত্ত্ব" বলে। পদার্থ দ্বিবিধ, ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থকে অভাব বলিয়া এবং অভাব পদার্থকে ভাব বলিয়া বুঝিলে সেখানে তাহা তত্ত্ব হইবে না। সুতরাং সেখানে তত্ত্ব বুঝাও হইবে না। ফলতঃ কোন পদার্থই তাহার বিপরীত ভাবে বুঝিলে তাহা সেখানে তত্ত্ব হয় না।

টিপ্পনী। শ্রোতৃবর্গের অবধান এবং বিশদবোধের জন্য স্বয়ং প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তর দেওয়াই প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বকথিত তত্ত্ব কি, ইহা বলিবার জন্য নিজেই এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন।

"তস্য ভাবঃ" এই অর্থে "তত্ত্ব" শব্দটি নিষ্পন্ন। ঐ তত্ত্ব শব্দের অন্তর্গত "তৎ" শব্দটির প্রতিপাদ্য "সৎ" ও "অসৎ" পদার্থ। "সৎ" বলিতে ভাব পদার্থ, "অসৎ" বলিতে সৎ ভিন্ন অর্থাৎ ভাব ভিন্ন পদার্থ। ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বলে। "নাস্তি" এইরূপে বোধের বিষয় হয় বলিয়াই অভাব পদার্থকে "অসৎ" পদার্থ বলা হয়। "অসৎ" বলিতে এখানে অলীক নহে। যাহার কোন সত্তাই নাই, যাহা অলীক, তাহা পদার্থ হইতে পারে না। যাহা প্রমাণ-

সিদ্ধ, তাহাই পদার্থ। তাহা "ভাব" ও "অভাব" এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রমাণ যাহাকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই ভাব পদার্থ। যাহাকে অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহা অভাব পদার্থ। ভাব পদার্থে যে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, তাহাই উহার "সদ্ভাব" বা ভাবত্ব। অভাব পদার্থে যে অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, তাহাই উহার "অসদ্ভাব" বা অভাবত্ব। ঐ "সদ্ভাব"ই সৎপদার্থের তত্ত্ব এবং ঐ "অসদ্ভাব"ই অসৎ পদার্থের তত্ত্ব এবং উহাই যথাক্রমে ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ। উহার বিপরীত-রূপে ভাব ও অভাব বুঝিলে সেখানে ভাব ও অভাবের তত্ত্ব বুঝা হয় না। ভাষ্যে "সৎ ইতি" এবং "অসৎ ইতি" এই দুই স্থলে "ইতি" শব্দের প্রকার অর্থ। অর্থাৎ সৎ পদার্থকে "সৎ" এই প্রকারে এবং অসৎ পদার্থকে "অসৎ" এই প্রকারে বুঝিলেই তত্ত্ব বুঝা হয়। ফল কথা, যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহাই তাহার তত্ত্ব, সেইরূপে সেই পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেই পদার্থকেও তত্ত্ব বলা হয়; প্রাচীনগণ তাহাও বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার প্রথমতঃ ভাব ও অভাব পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ত্ব বলিয়া শেষে ঐ ভাব ও অভাব পদার্থকেও "তত্ত্ব" বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ভাবত্ব ও অভাবত্ব রূপ প্রকৃত ধর্ম্মরূপে জ্ঞায়মান হইলেই ভাব ও অভাব সেখানে তত্ত্ব হইবে। অভাবত্বরূপে ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে অথবা ভাবত্বরূপে অভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেখানে উহা তত্ত্ব হইবে না, এই কথা বলিবার জন্যই প্রথমতঃ ভাষ্যকার ভাব ও অভাবের প্রকৃত ধর্ম্মরূপ তত্ত্বটি বলিয়াছেন। ঐরূপ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ভাব পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ অভাব পদার্থেরও যাহার যেটি প্রমাণসিদ্ধ প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইরূপে তাহারা জ্ঞায়মান হইলেই তত্ত্ব হইবে, ইহা ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। ফলকথা, যে পদার্থের যেটি তত্ত্ব, সেইরূপে জ্ঞায়মান সেই পদার্থকেও ভাষ্যকার এখানে "তত্ত্ব" বলিয়াছেন। ভাষ্যে "সতশ্চ" এবং "অসতশ্চ" এই দুই স্থলে দুইটি "চ" শব্দের দ্বারা পদার্থত্বরূপে ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থই প্রধান, ইহা সূচিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ অপ্রধান নহে। ভাব পদার্থের ন্যায় অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। পরে ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

"যথাভূতমবিপরীতং" এই স্থলে "অবিপরীতং" এই কথাটি "যথাভূতং" এই পূর্ব্ব-কথারই ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থে এইরূপ স্বপদবর্ণন এবং অনুব্যাখ্যা আছে। স্বপদবর্ণন ভাষ্যের একটি লক্ষণ। বিশদ বোধের জন্যই প্রাচীনগণ ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই ন্যায়ভাষ্যে বহু স্থানেই এইরূপ ভাষা আছে। সুতরাং অনুবাদের ভাষাও সেখানে ঐ প্রণালীতে হইবে। এ কথাটা মনে রাখিলে আর পুনরুক্তি-দোষের কথা মনে আসিবে না।

ভাষ্য। কথমুত্তরস্য প্রমাণেনোপলব্ধিরিতি,—সত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপবৎ। যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহ্যমাণে তদিব যন্ন গৃহ্যতে তন্নাস্তি, যদ্যভবিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞাস্যত বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি। এবং প্রমাণেন সতি গৃহ্যমাণে তদিব যন্ন গৃহ্যতে তন্নাস্তি, যদ্যভবিষ্যদিদমিব

ব্যজ্ঞাস্যত বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি। তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তীতি। সচ্চ খলু ষোড়শধা ব্যূঢ়মুপদেক্ষ্যতে।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) উত্তরটির অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে যে দ্বিবিধ তত্ত্ব বলা হইল, তন্মধ্যে পরবর্ত্তী অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে? (উত্তর) যে হেতু যেমন প্রদীপের দ্বারা সৎ পদার্থ অর্থাৎ কোন ভাব পদার্থ উপলভ্যমান হইলে তাহার অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থটি সেখানে নাই, সেই পদার্থটির উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে—যেমন কোন দর্শক কর্ত্তৃক প্রদীপের দ্বারা দৃশ্য পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার ন্যায় যাহা অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থ জ্ঞায়মান হইতেছে না, তাহা নাই, যদি থাকিত, (তাহা হইলে) ইহার ন্যায় অর্থাৎ এই দৃশ্যমান পদার্থের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত,তদ্বিষয়ে জ্ঞান না হওয়াতে (তাহা) নাই, অর্থাৎ দর্শক ব্যক্তি প্রদীপের সাহায্যে এইরূপে অভাবের উপলব্ধি করে। এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার ন্যায় যে পদার্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, তাহা নাই। যদি থাকিত, (তাহা হইলে) ইহার ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞায়মান ভাব পদার্থটির ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত,জ্ঞান না হওয়াতে (তাহা) নাই,অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণের দ্বারা অভাবেরও উপলব্ধি করে। অতএব এইরূপে (প্রদীপের ন্যায়) ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণ অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে। ভাবপদার্থও (মহর্ষি গোতম প্রথম সূত্রে) ষোড়শ প্রকারেই সংক্ষেপে বলিবেন।

টিপ্পনী। যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাকে পদার্থ বা তত্ত্ব বলা যায় না। অভাবকে তত্ত্ব বলিলে তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে হইবে। কিন্তু অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হইবে কিরূপে? যাহা অভাব, তাহার কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে? অনেক সম্প্রদায় তাহা মানেন নাই। এ জন্য ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্নপূর্ব্বক প্রমাণের দ্বারা যে অভাবেরও উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, অভাব প্রমাণসিদ্ধ। যে প্রমাণ ভাব পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রমাণ বা তজ্জাতীয় প্রমাণই অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে। অভাব বুঝিতে আর কোন উপায়ান্তর আবশ্যক হয় না। অভাব সকলেই বুঝে। ভাবিয়া দেখিলে এবং তর্কের অনুরোধে সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে প্রদীপকে প্রমাণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, প্রদীপ সর্ব্বলোকসিদ্ধ। সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ন্যায় অভাবেরও নির্ণয় করে; গৃহ হইতে তস্কর বহির্গত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোন্‌টি আছে এবং কোন্‌টি নাই, ইহা বুঝিয়া থাকে। যাহা থাকে, তাহাই দেখে. যাহা থাকে না, তাহা

দেখে না,তখন তাহা "নাই" বলিয়াই বুঝে। এই "নাই" বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের বোধ। এ বোধ সকলেরই হইতেছে। সুতরাং এই বোধের অবশ্য বিষয় .আছে। ঐ বোধের যাহা বিষয়, তাহারই নাম অভাব পদার্থ। যাহা যথার্থ বোধের বিষয়, তাহাকে পদার্থ বলিতেই হইবে, প্রমাণসিদ্ধ বলিতেই হইবে। "নাই" বলিয়া যত বোধ হয়, সবগুলিই ভ্রম বলা যাইবে না। বাসগৃহে "সর্প নাই," শয্যায় "বিষ্ঠা নাই" ইত্যাদি প্রকার অভাব বোধগুলি কি সর্ব্বত্রই ভ্রম? বস্তুতঃ ভাবের ন্যায় অভাবেরও বোধ হইতেছে। তবে অভাব ভাবপরতন্ত্র, সুতরাং ভাষ্যোক্ত প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা ঘটাদি ভাব পদার্থ দেখিয়া সেখানে তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমাদিগের ঐরূপ পরিচিত অন্য পদার্থ না দেখিলেই বুঝি, এখানে তাহা নাই, থাকিলে অবশ্যই দেখিতাম। কারণ, দেখিবার অন্য কোন কারণের এখানে অভাব নাই। ফলকথা, প্রদীপের ন্যায় ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণই সেখানে অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে।—অভাব প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং অভাবকে "তত্ত্ব" বলিতেই হইবে।

অভাব প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব হইলে পদার্থ-গণনায় মহর্ষি গোতম কেন তাহার উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ত "অভাব" নাই? এই আশঙ্কা হইতে পারে। এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—"সচ্চ খলু ষোড়শধা ব্যূঢ়মুপদেক্ষ্যতে"। ভাষ্যকারের কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থগুলিকে সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারে বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বক্তব্য; তাহার মধ্যে অর্থাৎ ঐ ভাব পদার্থগুলি বলিতে যাইয়া তিনি মোক্ষোপযোগী অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্যোতকর এখানে প্রথমে বলিয়াছেন যে, "তত্র স্বাতন্ত্র্যেণাসদ্‌ভেদা ন প্রকাশন্তে ইতি নোচ্যন্তে"। অর্থাৎ অভাবের স্বতন্ত্র ভাবে (ভাব ব্যতিরেকে) জ্ঞান হইতে পারে না। যাহার অভাব এবং যে অধিকরণে অভাব, তাহার জ্ঞান ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে অভাবের জ্ঞান হয় না, এই জন্য মহর্ষি অভাবকে পৃথক্‌ভাবে বলেন নাই। ভাব পদার্থ বলাতেই তাঁহার অভাব পদার্থ বলা হইয়াছে। এ পক্ষে ভাষ্যে "সচ্চ খলু" এই স্থলে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ। "খলু" শব্দের দ্বারা আবার ঐ অবধারণ স্পষ্ট করা হইয়াছে। "সচ্চ খলু" এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা "সদেব খলু"। অর্থাৎ ভাবপদার্থই বলিয়াছেন।

ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য সংগত হয় না বুঝিয়া উদ্যোতকর পরে যাহা বলিয়াছেন, তাৎপর্য্য-টীকাকার তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন—"অথবা কথিতা এব যেষাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপযোগি, যে তু ন তথা ন তেষাং প্রপঞ্চোঽনুপযুক্তভাবপ্রপঞ্চ ইব বক্তব্যঃ"। অর্থাৎ মহর্ষি অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই সকল পদার্থই তিনি বলিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সের অনুপযোগী অনেক ভাবপদার্থও তিনি যেমন বলেন নাই, তদ্রূপ নিঃশ্রেয়সের অনুপযোগী অভাব পদার্থও তিনি বলেন নাই। এ পক্ষে "সচ্চ খলু ষোড়শধা" এই ভাষ্যে "চ" শব্দের অর্থ সমুচ্চয়, "খলু" শব্দের অর্থ অবধারণ।

"সচ্চ" সদপি "ষোড়শধা খলু" ষোড়শধৈব—এইরূপে ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায়, সৎপদার্থও অর্থাৎ ভাবপদার্থও সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন। "সচ্চ" এই স্থলে "চ" শব্দের দ্বারা অভাবেরও সমুচ্চয় হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহর্ষি ভাবপদার্থ বলিতে যাইয়া অভাব পদার্থও বলিয়াছেন, ভাবপদার্থও সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে বলা অসম্ভব। সবগুলি মোক্ষোপযোগীও নহে, এ জন্য ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সেই ষোড়শ পদার্থের বিশেষ বিভাগে নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অভাব পদার্থগুলিও তিনি বলিয়াছেন। যেমন প্রমেয়ের মধ্যে "অপবর্গ" অভাবপদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে দুঃখাভাব অভাব পদার্থ। এইরূপ আরও অনেক অভাব পদার্থ বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি"তে তাহা বিশদ বুঝাইয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রাচীনদিগের এখানে মীমাংসা এই যে, মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলিই বলিয়াছেন, মোক্ষের অনুপযোগী ভাবপদার্থগুলির ন্যায় ঐরূপ অভাব পদার্থগুলিও তাঁহার বক্তব্য নহে, তাই তিনি সেগুলি বলেন নাই। সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থও সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন, তাঁহার কোন কোন পদার্থের বিশেষ বিভাগে মোক্ষোপ-যোগী অভাব পদার্থেরও উল্লেখ হইয়াছে। যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মোক্ষলাভে আবশ্যক, সেই সকল পদার্থকেই প্রাচীনগণ মোক্ষোপযোগী বলিয়াছেন। কণাদোক্ত পদার্থগুলি মহর্ষি গোতমের সম্মত হইলেও তন্মধ্যে যেগুলি অতি পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, মহর্ষি গোতম সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। কণাদোক্ত প্রমেয়গুলিও যে গোতমের সম্মত, ইহা ভাষ্যকার ও উদ্যোতকরও বলিয়াছেন (৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ অভাব পদার্থ মহর্ষি গোতমের সম্মত, ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে তাঁহার নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। মহর্ষি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অভাব পদার্থকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী পদার্থের উল্লেখ করিলে ঈশ্বর প্রভৃতি মোক্ষোপযোগী পদার্থের ষোড়শ পদার্থের মধ্যে কেন উল্লেখ করেন নাই? প্রাচীনগণ এ সকল কথার কোন অবতারণা করেন নাই। গোতমোক্ত পদার্থগুলির পরিচয়ের পরে এ সকল কথা বুঝিতে হইবে। তবে এখানে এইটুকু বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, মহর্ষি গোতম তাঁহার ন্যায়বিদ্যায় জগতের সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ করিবেন, ইহার কোন কারণ নাই। তিনি যে ভাবে যে সকল অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষোপায়ের যে সকল অংশের বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায়বিদ্যার "প্রস্থান" অনুসারে সেই ভাবে যে সকল পদার্থ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, তিনি সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ করিবেন। সুতরাং তিনি তাহাই করিয়াছেন। যথাস্থানে ক্রমে ইহা পরিস্ফুট হইবে। (দ্বিতীয় সূত্রভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যে "ব্যূঢ়ং" এই কথার ব্যাখ্যা "সংক্ষেপতঃ"।

ভাষ্য। তাসাং খল্বাসাং সদ্বিধানাং

সূত্র। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। ১।

অনুবাদ। সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব পদার্থেরই প্রকার—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান, ইহাদিগের অর্থাৎ এই ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

টিপ্পনী। যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই ভাবপদার্থের ষোলটি প্রকার মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্ব-ভাষ্যে এই ষোড়শ প্রকার ভাব পদার্থের উপদেশের কথাই বলিয়াছেন। এখন মহর্ষিসূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক তাহা দেখাইবার জন্য "তাসাং খল্বাসাং সদ্বিধানাং" এই সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রস্থ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বাক্যের যোজনা করিতে হইবে। তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। এইরূপ বহু স্থলেই ভাষ্যসন্দর্ভের সহিত সূত্রের যোজনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত আছে। সূত্রস্থ প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থ "সদ্‌বিধা" অর্থাৎ ভাব পদার্থের প্রকার। এবং ঐ প্রকারগুলি সকলেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী। "তাসাং খলু" এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন। "তাসাং খলু" এই কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা "তাসামেব"। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে মোক্ষোপযোগী ভাব-পদার্থ ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবেন বলিয়াছি, সেই মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থের প্রকারগুলিই এই। এখানেই সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক সেইগুলি দেখাইয়াছেন, তাই আবার বলিয়াছেন—"আসাং"। ফল কথা, এইগুলির তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, ইহাই মহর্ষি প্রথম সূত্রে বলিয়াছেন; কেন হয়, কেমন করিয়া হয়, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। এবং এই ষোড়শ পদার্থের সামান্য ও বিশেষ পরিচয় মহর্ষি নিজেই বলিবেন।

ভাষ্য। নির্দ্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ। সর্ব্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ। প্রমাণাদীনাং তত্ত্বমিতি শৈষিকী ষষ্ঠী। তত্ত্বস্য জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্যাধিগম ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যৌ। ত এতাবন্তো বিদ্যমানার্থাঃ। এষামবিপরীত-জ্ঞানার্থমিহোপদেশঃ। সোঽয়মনবয়বেন তন্ত্রার্থ উদ্দিষ্টো বেদিতব্যঃ।

অনুবাদ। নির্দ্দেশে অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ সূত্র ও বিভাগ-সূত্রে যেরূপ বচন (একবচন, বহুবচন) আছে, তদনুসারে (এই সূত্রে) বিগ্রহ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। (এবং) সর্ব্ব পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস। প্রমাণাদির তত্ত্ব এই স্থলে শৈষিকী ষষ্ঠী অর্থাৎ সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তত্ত্বের জ্ঞান, নিঃশ্রেয়সের অধিগম, এই দুই স্থলে দুই ষষ্ঠী কর্ম্মে বিহিত। সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থ এতগুলি অর্থাৎ ষোড়শ প্রকার, ইহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞানের জন্য এই শাস্ত্রে উপদেশ হইয়াছে। সেই এই তন্ত্রার্থ অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রপ্রতি-পাদ্য মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলি এই সূত্রে সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ নামোল্লেখে কীর্ত্তিত হইয়াছে জানিবে।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রের অর্থ বুঝিতে প্রথমতঃ কি সমাস, তাহা বুঝিতে হইবে। "প্রমাণের যে প্রমেয়, তাহার যে প্রয়োজন," ইত্যাদিরূপে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বুঝিব? অথবা "প্রমাণ হইয়াছে প্রমেয় যাহার" ইত্যাদিরূপে বহুব্রীহি বা অন্য কোন সমাস বুঝিব? ভাষ্যকার বলিয়াছেন—দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিবে, অন্য সমাস বুঝিলে প্রকৃতার্থ বোধ হইবে না। এবং দ্বন্দ্ব সমাস সকল সমাস হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কেন, তাই বলিয়াছেন—"সর্ব্বপদার্থপ্রধানঃ"। দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে সকল পদার্থই প্রধান থাকে। অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সবগুলি পদার্থই প্রধানরূপে বুদ্ধির বিষয় হয়। এখানে বহুব্রীহি বা কর্ম্মধারয় হইলে অর্থসিদ্ধি হয় না। ষষ্ঠীতৎপুরুষ হইলেও হয় না। পরন্তু তাহাতে সর্ব্বশেষবর্ত্তী "নিগ্রহস্থানে"রই প্রাধান্য হয়; সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসই এখানে বুঝিতে হইবে।

দ্বন্দ্ব সমাস হইলে তাহার ব্যাসবাক্য কিরূপ হইবে? "প্রমাণানি চ প্রমেয়াণি চ" ইত্যাদি প্রকারে হইবে, অথবা "প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ঞ্চ" ইত্যাদি প্রকারে হইবে, এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণাদি-পদার্থের নির্দ্দেশসূত্রে অর্থাৎ যে সকল সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ অথবা বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সূত্রে যেরূপ বচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ করিয়াই ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। প্রমাণ-বিভাগসূত্রে (তৃতীয় সূত্রে) "প্রমাণানি" এইরূপ প্রয়োগ আছে, সুতরাং এই সূত্রে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে "প্রমাণানি" এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং প্রমেয়-বিভাগসূত্রে (নবম সূত্রে) "প্রমেয়ং" এইরূপ প্রয়োগ থাকায় ব্যাসবাক্যে ঐরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ "সংশয়সূত্র" প্রভৃতি লক্ষণসূত্রে যেখানে একবচন আছে, ব্যাসবাক্যে সেই সব স্থলে একবচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্যত্রও ঐরূপ বচনই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাষ্যকারের কথায় ইহাই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি এইরূপ বুঝেন নাই। তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিতে উদয়ন বলিয়াছেন যে, "নির্দ্দেশ" বলিতে কেবল বিভাগ। কোন্ পদার্থ কত প্রকার, ইহার নাম "নির্দ্দেশ"। কোন সূত্রে তাহা সংখ্যাবোধক শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। কোন সূত্রে তাহা না বলিলেও অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা ঐ বিভাগ বুঝা গিয়াছে। সেইগুলি "অর্থনির্দ্দেশ"। তদনুসারে সেখানে

বচন গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাসবাক্যে সেই বচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সংশয়সূত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া সংশয় ত্রিবিধ বা পঞ্চবিধ, ইহা বুঝা গিয়াছে, সুতরাং সেখানে সূত্রে "সংশয়ঃ" এইরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ থাকিলেও ব্যাসবাক্যে "সংশয়াঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগই করিতে হইবে। এবং "দৃষ্টান্ত" লক্ষণসূত্রে "দৃষ্টান্তঃ" এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ বলিয়া ব্যাসবাক্যে "দৃষ্টান্তৌ" এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে "নির্দ্দেশ নাই", সেখানে লক্ষণসূত্রে যে বচন প্রযুক্ত আছে, তদনুসারেই ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। উদয়ন তাঁহার মতের যুক্তিও বলিয়াছেন। নবীন বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রাচীনদিগের এই বচন-কলহে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যাসবাক্যে বচন লইয়া মারামারি কেন? ব্যাস বাক্যের বচনের দ্বারাই কি প্রমাণাদি পদার্থের বহুত্বাদি নির্ণয় হইবে? এখানে সর্ব্বত্র প্রথম উপস্থিত একবচনের প্রয়োগ করিয়াই দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য করিতে হইবে, তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের স্বাধীন মত—নবীন মত।

প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোলটি পদার্থের যে তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এইরূপই সূত্রার্থ। সুতরাং "প্রমাণ……নিগ্রহস্থানানাং" এই স্থলের ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধ। তত্ত্বের সহিত উহার অন্বয়। এই সম্বন্ধার্থ ষষ্ঠীকেই "শৈষিকী ষষ্ঠী" বলে। "উক্তাদন্যৎ শেষঃ" ইহাই শেষের লক্ষণ। অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি কারকার্থ ভিন্ন সম্বন্ধ অর্থকেই ব্যাকরণে "শেষ" বলা হইয়াছে। এই শেষার্থে বিহিত ষষ্ঠীকে "শৈষিকী" বলা যায়। ঐ ষষ্ঠ্যর্থ সম্বন্ধের সহিত সমাসের একদেশার্থের অন্বয় হইতে পারে। যেমন "চৈত্রস্য দাসভার্য্যা", "রামস্য নামমহিমা" ইত্যাদি। "তত্ত্বজ্ঞান" এবং "নিঃশ্রেয়সাধিগম" এই দুইটি বাক্য ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। সুতরাং উহার ব্যাসবাক্যে দুই স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐ ষষ্ঠী "কৃৎপ্রত্যয়" যোগে কর্ম্মে বিহিত হইবে। উহার অর্থ কর্ম্মত্ব, সুতরাং উহা "শেষ" নহে, এ জন্য উহা "শৈষিকী ষষ্ঠী" নহে। তত্ত্বকে জানাই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সকে লাভ করাই "নিঃশ্রেয়সাধিগম"। সুতরাং জ্ঞানের কর্ম্মকারক "তত্ত্ব"। "অধিগম" অর্থাৎ লাভের কর্ম্মকারক "নিঃশ্রেয়স"। নিঃশ্রেয়স জন্মিলে তাহা লাভ করিতে আর প্রযত্নান্তর আবশ্যক হয় না। যাহা নিঃশ্রেয়সের সাধন, তাহাই নিঃশ্রেয়স লাভের সাধন, ইহা সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি কেবল নিঃশ্রেয়স না বলিয়া "নিঃশ্রেয়সাধিগম" বলিয়াছেন। এই কথাটি বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা।

প্রচলিত বাৎস্যায়নভাষ্য পুস্তকে "চার্থে দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু পরম-প্রাচীন উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র "সর্ব্বপদার্থপ্রধানঃ" এইরূপ পাঠের উল্লেখ করায় মূলে সেই পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "চার্থে" অর্থাৎ চকারের অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস, ইহাই পূর্ব্বোক্ত পাঠের অর্থ। চকারের অর্থ ভেদ। এখানে প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থবর্গের মধ্যে অনেকগুলি ফলতঃ অভিন্ন পদার্থ থাকিলেও প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের ভেদ থাকায় দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। ঐরূপ ধর্ম্মীর ভেদ না থাকিলেও ধর্ম্মের ভেদ থাকিলে দ্বন্দ্ব

সমাস হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। যেমন "হরিহরৌ"। হরি ও হরে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও হরিত্ব ও হরত্ব-ধর্ম্মের ভেদ থাকাতেই ঐরূপ দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। ভাষ্যে "অনবয়বেন" এই স্থলে "অবয়ব" শব্দের অর্থ অংশ। "অনবয়বেন" ইহার ব্যাখ্যা "সাকল্যেন"।

ভাষ্য। আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ, তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণানূদ্যত ইতি। হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং, হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপায়োঽধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যক্ বুদ্ধ্বা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি।

অনুবাদ। আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়েরই তত্ত্বজ্ঞান জন্য মোক্ষ লাভ হয় অর্থাৎ মহর্ষি গোতম আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে "প্রমেয়" বলিয়াছেন, তাহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ (চরম কারণ)। সেই এই কথাও পরবর্ত্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা (মহর্ষি) পশ্চাৎ বলিয়াছেন। (১) "হেয়" অর্থাৎ দুঃখ, সেই দুঃখের নিষ্পাদক অর্থাৎ হেতু অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রভৃতি, (২) "আত্যন্তিক" হান অর্থাৎ সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান, (৩) তাহার "উপায়" অর্থাৎ ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শাস্ত্র, (৪) "অধিগন্তব্য" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লভ্য মোক্ষ, এই চারিটি (হেয়, হান, উপায়, অধিগন্তব্য) "অর্থপদ" অর্থাৎ পুরুষার্থস্থান সম্যক্ বুঝিয়া মোক্ষ লাভ করে।

টিপ্পনী। অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি যে ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির তত্ত্বজ্ঞানই কি মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ? তাহা কিরূপে হয়? "জল্প," "বিতণ্ডা," "ছল" প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার এই প্রশ্ন মনে করিয়া মহর্ষির প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মা প্রভৃতি যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে মহর্ষি "প্রমেয়" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঐগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। অন্যগুলির তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নিষ্পাদক, এ জন্য তাহা মোক্ষের পরম্পরা কারণ, অর্থাৎ কোন কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ, কোন কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরায় মোক্ষলাভে আবশ্যক এবং পরোক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতে কতকগুলি পদার্থের সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত মোক্ষলাভে আবশ্যক, এ জন্য মহর্ষি প্রথম সূত্রে এক কথায় প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে "প্রমেয়" নামক পদার্থগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ। কারণ, তাহাই মোক্ষপ্রতিবন্ধক মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ সাধন করে। মহর্ষি

গোতমের এই সিদ্ধান্ত বা এই তাৎপর্য্য কিরূপে বুঝা যায় ? প্রথম স্থত্রে ত এরূপ কথা কিছু নাই ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি দ্বিতীয় স্থত্রের দ্বারা ইহা অনুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদ করিয়াছেন অর্থাৎ পশ্চাৎ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং তাৎপর্য্যটীকাকার "তচ্চৈতৎ" ইত্যাদি ভাষ্যের অবতারণায় বলিয়াছেন যে, আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানের কি কোন অদৃষ্ট শক্তি আছে ? যাহার দ্বারা তাহা মোক্ষ জন্মাইবে ? এইরূপ প্রশ্ন নিরাসের জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা দ্বিতীয় স্থত্রে পশ্চাৎ বলিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্ব সাক্ষাৎকার কেমন করিয়া মোক্ষ সাধন করে, ইহার যুক্তি দ্বিতীয় স্থত্রে স্থচিত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যোক্ত "অনূদ্যতে" এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার কেবল পশ্চাৎকথন বলিলেও মহর্ষি কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে "অনুবাদ" বলিয়াছেন। ঐরূপ শব্দ পুনরুক্তি ও অর্থ পুনরুক্তি—এই উভয়েই "অনুবাদ"। ঐরূপ সপ্রয়োজন পুনরুক্তি দোষ নহে, পরন্তু উহা আবশ্যক হইয়া থাকে। মনে হয়, ভাষ্যকার এই অনুবাদের কথাই এখানে বলিয়াছেন। প্রথম স্থত্রের দ্বারা যখন আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানকেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় বলা হইয়াছে, তখন দ্বিতীয় স্থত্রে আবার তাহার স্থচনা কেন ? এত-দুত্তরে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত সপ্রয়োজন পুনরুক্তিরূপ অনুবাদের কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ মহর্ষি প্রয়োজনবশতঃই ঐরূপ পুনরুক্তি করিয়াছেন, উহা তাঁহার অনুবাদ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মা প্রভৃতি "প্রমেয়" পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা বলাই সেখানে মহর্ষির প্রয়োজন। উহা বলা নিতান্ত আবশ্যক ; এ জন্যই পুনরায় প্রকারান্তরে বিশেষ করিয়া উহা বলিয়াছেন।

মহর্ষি যে দ্বিতীয় স্থত্রে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণরূপে স্থচনা করিয়াছেন, উহা কেবল মহর্ষি গোতমেরই কথা নহে, মোক্ষবাদী আচার্য্য মাত্রেরই উহা সম্মত, এই কথা বলিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন— "হেয়ং" ইত্যাদি। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথা-গুলির ঐরূপই মূল তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই সকল অধ্যাত্ম-বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন। সর্ব্বমতে দুঃখই "হেয়"। স্থতরাং যেগুলি ঐ দুঃখের হেতু, তাহাও "হেয়"। দুঃখের হেতু পরিত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখকে কখনই ত্যাগ করা যায় না। স্থতরাং সেগুলিও হেয় এবং দুঃখের হেতু বলিয়া সেগুলিকেও বিবেচক জ্ঞানিগণ দুঃখমধ্যেই গণ্য করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই দুঃখের হেতুগুলিকে দুঃখ বলিয়া ধরিয়া লইয়া একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিয়াছেন। ঐ একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হইল। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম যে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়" পদার্থ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শরীর হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত দশটিই হেয়। তন্মধ্যে শরীরাদি নয়টি দুঃখের হেতু বলিয়া হেয়। যাহা হেয়, মুমুক্ষুর তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইবে, এ কথা মোক্ষবাদী সকল আচার্য্যই স্বীকার করেন। হেয়কে যথার্থরূপে না বুঝিলে তাহার পরিত্যাগ অসম্ভব। যদি কেহ হেয়কে গ্রাহ্য বলিয়া

বুঝে, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে কি তাহার প্রবৃত্তি হয়? ঐরূপ হেয়কে উপাদেয় বলিয়া বুঝাতেই ত যত অনর্থ ঘটিতেছে। ফল কথা, "হেয়" পদার্থগুলিকে যথার্থরূপে না বুঝিলে মোক্ষের আশা নাই। মহর্ষি তাহাদিগকে শরীর প্রভৃতি দশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তাহার পরে মুমুক্ষুর "অধিগন্তব্য" অর্থাৎ লভ্য মোক্ষ। আত্মা উহা লাভ করিবেন। মহর্ষি-কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে এই দুইটি উপাদেয়। আত্মার উচ্ছেদ কাহারই কাম্য নহে। সেরূপ মুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না এবং তাহা সম্ভবও নহে এবং মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, এই জন্য আত্মা ও মোক্ষ এই দুইটি উপাদেয় পদার্থ। ফলতঃ "হেয়" এবং "উপাদেয়"-ভেদে মহর্ষি দ্বাদশপ্রকার প্রমেয় পদার্থ বলিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষ অসম্ভব, মোক্ষবাদী কোন আচার্য্যেরই ইহাতে বিবাদ নাই। শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ ঐ সিদ্ধান্তে পণ্ডিতের বিবাদ থাকিতেই পারে না। ঐরূপ "অধিগন্তব্য" মোক্ষ এবং হেয় শরীরাদি দশ প্রকার প্রমেয়কেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সম্যক্ বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে। মোক্ষ বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা সুদূর-পরাহত। এবং পূর্ব্বোক্ত দুঃখের কিসের দ্বারা নিবৃত্তি হয়, আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, তাহাকেও সম্যক্ বুঝিতে হইবে, তাহাকেই বলিয়াছেন "আত্যন্তিক হান"। "হীয়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যাহার দ্বারা দুঃখাদি ত্যাগ করা যায়, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে বলা হইয়াছে "হান"। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে বলিবার জন্যই বলা হইয়াছে "আত্যন্তিক হান"। সেই তত্ত্বজ্ঞানের "উপায়" শাস্ত্র। তাহাকেও সম্যক্ বুঝিতে হইবে। যাহা মোক্ষের সাধন, সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা করা যায় না। ফল কথা, নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইলে "হেয়", "হান", "উপায়" ও "অধিগন্তব্য" বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহা সকল আচার্য্যেরই স্বীকার্য্য। এবং অন্যান্য বিদ্যাসাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইলেও "হেয়", "হান", "উপায়" ও "অধিগন্তব্য" এই চারিটিকে সম্যক্ বুঝিতে হয়। উহা সকল বিদ্যাতেই আছে। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত চারিটিকে "অর্থপদ" বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি"[১] পুরুষের যাহা প্রয়োজন, তাহা পুরুষার্থ, তাহা পূর্ব্বোক্ত ঐ চারিটিতেই অবস্থিত। ঐ চারিটিকে সম্যক্ না বুঝিলে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। ফল কথা, ঐ কথাগুলির দ্বারা ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রের মর্ম্মার্থই সূচনা করিয়াছেন। "হেয়", "হান", "উপায়" ও "অধিগন্তব্য" এই চারিটি "অর্থপদ"কে সম্যক্ বুঝিলে মহর্ষি-কথিত প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানই হইবে। উহাদিগের ব্যাখ্যা উদ্যোতকরের ব্যাখ্যানুসারেই লিখিত হইল।

মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে

১। অনুসন্ধিৎসু এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি" দেখিবেন। প্রচলিত তাৎপর্য্যটীকাগ্রন্থে এখানে অনেক অংশ মুদ্রিত হয় নাই।

এবং এ স্থানের অন্যান্য কথা দ্বিতীয় সূত্রব্যাখ্যাতেই দ্রষ্টব্য। এখন এই সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অর্থ কি, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যদিও "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা ইষ্ট মাত্রই বুঝা যায় এবং প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সেরই সাধন হয়, তথাপি মহর্ষিসূত্রে যখন আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানের কথা রহিয়াছে, তখন অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্গই এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত। দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স তাঁহার অভিপ্রেত হইলে তিনি অন্যান্য সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথাও বলিতেন। কারণ, সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই কোন না কোন দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের সাধন হইয়াই থাকে। ফলকথা, তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের এইরূপ তাৎপর্য্যই বর্ণন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিতে উদয়নাচার্য্যও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন উদ্যোতকরের যথাশ্রুত বার্ত্তিকের দ্বারা কিন্তু এখানে এইরূপ তাৎপর্য্য নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান-জন্যই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্গ লাভ হয়। প্রমাণাদি অন্য পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান-জন্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। অবশ্য প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞানের ফলে আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞান হইবে, ইহা তিনিও বলিয়াছেন। এবং অপবর্গ ভিন্ন ইষ্ট মাত্রই তাঁহার মতে দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স, সুতরাং অপবর্গ-সাধন তত্ত্বজ্ঞানাদিকেও কেবল তিনি দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলিয়া এখানে বলিতে পারেন। মহর্ষি সর্ব্ববিধ এবং সমস্ত নিঃশ্রেয়সই প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন, এ কথা উদ্যোতকরও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া বরং ইহার বিরুদ্ধ কথাই বলিয়াছেন। প্রাচীন গুরুপাদগণ যাহাই বলুন, আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, মহর্ষি গোতম তাঁহার ন্যায়বিদ্যায় প্রথম সূত্রে সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সকেই "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে "অচতুরাদি" সূত্রে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দটি ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এই "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অপবর্গ অর্থে ভূরি প্রয়োগ থাকিলেও কল্যাণ মাত্র অর্থেও[১] মহাভারতাদি গ্রন্থে অনেক প্রয়োগ দেখা যায়। "নিঃশ্রেয়স" শব্দ অভীষ্ট মাত্রেরই বোধক, এ কথা তাৎপর্য্যটীকাকারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিঃশ্রেয়সের কথা বলিয়া অপবর্গ ভিন্ন অন্যান্য কল্যাণকেও "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছেন। "ত্রয়ী", "বার্ত্তা" ও "দণ্ডনীতি" বিদ্যার নিঃশ্রেয়স কি, তাহা উদ্যোতকর সেখানে বলিয়াছেন। এখন "নিঃশ্রেয়স" শব্দ যদি অভীষ্ট মাত্রের বোধক হয় এবং বিশেষতঃ অপবর্গের বোধক হয়, তাহা হইলে মহর্ষি-সূত্রস্থ "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা পরম-প্রয়োজন অপবর্গও বুঝিব, আবার গৌণ প্রয়োজন কল্যাণমাত্রও বুঝিব, তাহা হইলে প্রমাণাদি

১। "কচ্চিৎ সহস্রৈর্ম্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥"
—মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৫।৩৫।

ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গ-লাভের উপায় এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভেরও উপায়, ইহাই মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারি। অন্যান্য বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়সলাভে যে ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক, প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে সকল বিদ্যার ফল-লাভেই আবশ্যক, এ কথা ভাষ্যকার প্রভৃতিও বলিয়াছেন। ন্যায়বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায়, সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার প্রমাণাদি পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়স-লাভেই উপায় বলেন নাই কি ? তবে যে সেখানে ভাষ্যকার ন্যায়বিদ্যায় অপবর্গকেই "নিঃশ্রেয়স" বলিয়াছেন, তাহা এই ন্যায়বিদ্যার অধ্যাত্ম অংশ ধরিয়া ; এ জন্যই সেখানে ন্যায়বিদ্যাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, এ কথাও ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকারের মতেও ন্যায়বিদ্যার দুইটি অংশ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তন্মধ্যে অধ্যাত্ম অংশ ধরিলে তাহার ফল অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স। অন্য অংশ ধরিলে অন্যান্য সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিদ্যার ফল। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, তজ্জন্য ঐ প্রমেয় পদার্থগুলির যথাশাস্ত্র মনন করিতে হইবে এবং সেই অপরিপক্ব তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিতে হইবে। এ জন্য প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান তাহাতে আবশ্যক। তাহা হইলে বলা যায়, সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মহর্ষি অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বলিয়াছেন। আবার প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্ববিদ্যা-সাধ্য, সর্ব্বকর্ম্মসাধ্য, সর্ব্ববিধ দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বা অভীষ্ট লাভের উপায়, এ কথাও মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন, নচেৎ ন্যায়বিদ্যা সর্ব্ব-বিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায়, এ কথা ভাষ্যকার কোথায় পাইলেন ? এবং তিনি উহা বলেন কিরূপে ? ফলকথা, মহর্ষি নানার্থ "নিঃশ্রেয়স" শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিভিন্নার্থের সূচনা করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। আরও মনে হয়, মহর্ষির "নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" এই স্থলে "অধিগম" শব্দের "লাভ" অর্থের ন্যায় "জ্ঞান" অর্থও এক পক্ষে মহর্ষির বিবক্ষিত। "অধিগম" শব্দের লাভ অর্থের ন্যায় জ্ঞানও অর্থ আছে,[১] সে অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায়, প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নিজের এবং দেশের ও দশের "নিঃশ্রেয়স" অর্থাৎ কল্যাণকে বুঝিয়া লওয়া যায়। সেও ত ঠিক কথা। মহর্ষি যে এক পক্ষে তাহাও বলেন নাই, ইহাই বা কি করিয়া বুঝিব ?

যদি তিনি এখানে কেবল অপবর্গের কথাই বলিতেন, তাহা হইলে "অপবর্গ" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই কেন ? এবং "অধিগম" শব্দেরই বা প্রয়োজন কি ? মহর্ষি অপবর্গ বুঝাইতে অন্যান্য সকল সূত্রেই "অপবর্গ" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, "নিঃশ্রেয়স" শব্দটি আর কোথাও প্রয়োগ করেন নাই এবং অপবর্গের কথায় আর কোথাও অপবর্গের অধিগম বলেন নাই,

---

১। দার্শনিক ঋষিসূত্রে জ্ঞান অর্থেও "অধিগম" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ"।—যোগসূত্র ১।২৯।

কেবল অপবর্গ শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" বলিয়া পরেই আবার দ্বিতীয় সূত্রেই বলিয়াছেন "অপবর্গঃ"; ইহার কি কোন গূঢ় অভিসন্ধি নাই? যদি বলা যায়, প্রথম সূত্রে সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সের কথা এবং নিঃশ্রেয়সজ্ঞানের কথা, আর দ্বিতীয় সূত্রে কেবল অপবর্গেরই কথা, তাহা হইলে ঐরূপ প্রয়োগ যথার্থ সার্থক হইতে পারে। কারণ, ঐরূপ নানার্থ প্রকাশ করিতে হইলে "নিঃশ্রেয়সাধিগম" এইরূপ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই। কেবল অপবর্গ বুঝাইতে মহর্ষি মুক্তি প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগও করিতে পারিতেন। ফলতঃ ভাষ্যকার যেমন আদিভাষ্যের দ্বারা নানার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সূত্রকারও প্রথম সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার নানার্থ সূচনা করিয়াছেন, ইহা বলিতে কোন বাধক দেখি না, বরং সাধকই দেখিতে পাই। সূত্রে নানার্থের সূচনা থাকে, এ কথা প্রাচীনগণও বলিয়া গিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি গুরুবর্গ নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা যে অপবর্গ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, সেই অংশেই প্রথম সূত্রের সহিত দ্বিতীয় সূত্রের সম্বন্ধ এবং অপবর্গই ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন এবং তাহাতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় আবশ্যক, ইহাও মহর্ষির কথা। পরন্তু অন্যান্য নিঃশ্রেয়সের লাভে এবং তাহার জ্ঞানেও প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এইটিও মহর্ষির প্রথম সূত্রে নিজের কথা, ইহাই বলিতে চাই।

তাৎপর্য্যটীকাকার যে বলিয়াছেন, মহর্ষি সূত্রে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থগুলির উল্লেখ করায় এবং আরও অন্যান্য সকল পদার্থের উল্লেখ না করায় মহর্ষিসূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা কেবল অপবর্গই বুঝিতে হইবে, এ কথাটা বুঝি নাই। কারণ, কেবল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিদ্যার ফল বলিতেছি না, অপবর্গই ইহার মুখ্য প্রয়োজন। ইহা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা, এ কথা ভাষ্যকারও বলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং মোক্ষ ইহার মুখ্য প্রয়োজন হইবেই, ইহাতে মোক্ষোপযোগী পদার্থেরই উল্লেখ করিতে হইবে, দৃষ্টমাত্র নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অর্থাৎ মোক্ষের অনুপযোগী পদার্থের উল্লেখ ইহাতে করা যাইবে না, সুতরাং মহর্ষি মোক্ষোপযোগী পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এ কথা ত পূর্ব্বে তাৎপর্য্যটীকাকারও বলিয়াছেন। সেই মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্ববিধ দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হয়, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। কারণ, সর্ব্ববিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়সলাভেই এই ন্যায়বিদ্যা নিতান্ত আবশ্যক, সুতরাং সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথা না বলাতে মহর্ষি "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সকে লক্ষ্য করেন নাই, অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স অপবর্গই তাঁহার অভিপ্রেত, ইহা কি করিয়া বুঝা যায়? আর আত্মা প্রভৃতি পদার্থের উল্লেখ থাকাতেই যে আর ইহার মোক্ষ ভিন্ন কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই বা কি করিয়া বুঝা যায়? অবশ্য মুখ্য প্রয়োজন আর কিছু নাই, অধ্যাত্মবিদ্যায় অপবর্গ ভিন্ন আর কোন মুখ্য প্রয়োজন হইতেই পারে না, কিন্তু ন্যায়বিদ্যা ত উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে? মূল কথা, প্রমাণাদি পদার্থের যথাসম্ভব জ্ঞান সংসারীর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যথাসম্ভব ইষ্ট সাধন করিতেছে এবং অনিষ্ট নিবারণ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যে

সুচিরকাল হইতে (১) প্রমাণের দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বদেশে (২) প্রমেয় বুঝা হইতেছে এবং অভিলষিত প্রমেয় সাধনের জন্য প্রমাণের অন্বেষণে ছুটাছুটি হইতেছে, (৩) "সংশয়" হওয়ায় বিচারের (৪) "প্রয়োজন" হইতেছে, আবার কোন্‌টি প্রয়োজন, কোন্‌টি প্রয়োজন নহে, ইহা বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা হইতেছে, (৫)দৃষ্টান্ত দেখিয়া (৬) সিদ্ধান্ত বুঝা হইতেছে এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কত সিদ্ধান্ত সমর্থন করা হইতেছে,প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রভৃতি (৭) (অবয়ব) প্রয়োগ পূর্ব্বক পরের নিকটে প্রকৃত বক্তব্যটির প্রকাশ ও সমর্থন হইতেছে, অনেকে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির নাম না জানিয়াও উহার প্রয়োগ করিতেছেন, বিশুদ্ধ (৮) তর্কের সাহায্যে (৯) নির্ণয় হইতেছে, সভা-সমিতি রাজধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতিতে, কোথায়ও কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে (১০) বাদ এবং অনেক স্থানে জিগীষাবশতঃ (১১) জল্প ও (১২) বিতণ্ডা করা হইতেছে, অপর পক্ষের যুক্তি খণ্ডনকালে "এ হেতু হেতুই নহে, ইহা দুষ্ট হেতু," অথবা "এই হেতুতে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না" ইত্যাদি কথা বলিয়া (১৩) "হেত্বাভাস" প্রদর্শন করিতেছে, প্রকৃত কথা প্রকাশের জন্য অথবা দুরভিসন্ধিযুক্ত বাদীকে নিরস্ত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কত (১৪) ছল করা হইতেছে, বাদিনিরাস প্রয়োজন হওয়ায় আরও কত অসদুত্তর (১৫) (জাতি) করা হইতেছে, আবার অসদুত্তর জানিয়া তাহার উপেক্ষাও করা হইতেছে, (১৬) নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন করিয়া পরাজয় ঘোষণা হইতেছে, পরাজয়ে অনেক সময়ে তত্ত্ব নিশ্চয়ও হইতেছে। এ সবগুলি কি গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের প্রকাণ্ড গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই হইতেছে না? কোন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি কি এই ষোড়শ পদার্থের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া এক দিনও জীবন যাপন করিতে পারেন ? এবং উহাদিগের দ্বারা কি সমাজের কোন কার্য্যই হইতেছে না ? ভাবিয়া বুঝিলে এবং সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে, উহারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রমাণাদি পদার্থের যথাসম্ভব তত্ত্বজ্ঞান তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তির সর্ব্বদাই যথাসম্ভব উপকার করিতেছে, যাঁহার মুক্তি কামনা নাই, মুক্তির কথা যিনি ভাবিতেও পারেন না, তাঁহারও অভিলষিত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের জন্য ঐ জ্ঞান সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়। ভগবান্ মনু এই জন্যই অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্ববিধ কল্যাণ-লাভেই আবশ্যক এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত কল্যাণ কি, দেশের ও দশের কল্যাণ কি এবং তাহা কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লওয়া যায় এবং বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা যায়, এই জন্য রাজাকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, রাজার যে বিচার করিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া, তদনুসারে বিধান করিতে হইবে, দেশের ও দশের কল্যাণ বুঝিতে হইবে, তাহার উপায় বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ফলকথা, গোতমোক্ত প্রমাণাদি পদার্থবর্গের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা বহু বহু দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ করে এবং উহার সাহায্যে শ্রুতিবোধিত আত্মাদি পদার্থের মনন সম্পাদন করিয়া মোক্ষ-মন্দিরের তৃতীয় সোপান নিদিধ্যাসনে বসিয়া আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্ব সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স পরম প্রয়োজন অপবর্গ লাভ করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে— করিতে পারে।

ভাষ্য। তত্র সংশয়াদীনাং পৃথগ্‌বচনমনর্থকং ? সংশয়াদয়ো হি যথা-সম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তো ন ব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতৎ, ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ প্রাণভৃতামনুগ্রহায়োপদিশ্যন্তে, যাসাং চতুর্থীয়মান্বীক্ষিকী বিদ্যা, তস্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ, তেষাং পৃথগ্‌বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ং স্যাৎ যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্ প্রস্থাপ্যতে।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তন্মধ্যে অথবা সেই পূর্ব্বোক্ত সূত্রে সংশয় প্রভৃতি পদার্থের অর্থাৎ "সংশয়" হইতে "নিগ্রহস্থান" পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া উল্লেখ নিরর্থক ? কারণ, সংশয় প্রভৃতি (সূত্রোক্ত চতুর্দ্দশ পদার্থ) যথাসম্ভব "প্রমাণ"সমূহ এবং "প্রমেয়"সমূহে অন্তর্ভূত থাকায় (প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে) অতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ নহে। (উত্তর) এ কথা সত্য, কিন্তু "পৃথক্‌প্রস্থান" অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট এই চারিটি বিদ্যা ("ত্রয়ী," "দণ্ডনীতি," "বার্ত্তা," "আন্বীক্ষিকী") প্রাণীদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, যে চারিটি বিদ্যার মধ্যে এই "আন্বীক্ষিকী" (ন্যায়বিদ্যা) চতুর্থী। সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত "সংশয়" প্রভৃতি "নিগ্রহস্থান" পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পদার্থ সেই ন্যায়বিদ্যার "পৃথক্‌প্রস্থান" অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ ব্যতীত এই ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। সেই জন্য (মহর্ষি গোতম) সংশয় প্রভৃতি পদার্থবর্গের দ্বারা (এই ন্যায়বিদ্যাকে) পৃথক্ প্রস্থাপিত অর্থাৎ অন্য বিদ্যা হইতে বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট করিয়াছেন।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে "প্রমাণ" পদার্থ থাকিলেও প্রমাণস্বরূপে প্রমাণের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, প্রমাণতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান হইতেই পারে না, এ জন্য প্রমাণের পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক, কিন্তু সংশয় প্রভৃতি সূত্রোক্ত চতুর্দ্দশ পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন কি ? মহর্ষি "প্রমাণ" এবং "প্রমেয়" পদার্থ বলিয়াছেন, তাঁহার পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়" ভিন্ন আরও অনেক প্রমেয় আছে, সে সমস্ত প্রমেয়ও তিনি মানেন, সুতরাং সংশয়াদি পদার্থগুলি ঐ সকল প্রমাণ ও প্রমেয়েই অন্তর্ভূত থাকায় অর্থাৎ তাহারাও যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ হওয়াতে ঐ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে কোন অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ নহে, তবে আবার তাহাদিগের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন ? অবশ্য সংশয়াদি পদার্থকে কেবল "প্রমেয়ে" অন্তর্ভূত বলিলেও প্রকৃত স্থলে কোন ক্ষতি ছিল

না। ভাষ্যকার পরে আর প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলেনও নাই, কিন্তু এখানে এক সঙ্গে সংশয়াদি সকল পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলিতে যাইয়া নিজ বাক্যের ন্যূনতা পরিহারের জন্য প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন। উহাদিগের মধ্যে কোন পদার্থ যদি প্রমাণেও অন্তর্ভূত থাকে, তবে তাহা না বলিলে নিজ বাক্যের ন্যূনতা হয়। কোন্ পদার্থ প্রমাণেও অন্তর্ভূত আছে, প্রাচীনগণ ইহার বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে উদ্যোতকর "নির্ণয়" পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের কারণ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"অন্যান্তর্ভাবঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েষু বা"। ভাষ্যকারের মতেও "নির্ণয়" পদার্থ যেমন "প্রমেয়," তদ্রূপ "প্রমিতি", তদ্রূপ "প্রমাণ"ও হয় (তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভাষ্যকার "নির্ণয়" পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াও প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলিতে পারেন। "অবয়ব" শব্দপ্রমাণ হইলে তাহাকেও প্রমেয়ের ন্যায় প্রমাণেও যথাসম্ভব অন্তর্ভূত বলা যায়। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই তাহা বলেন নাই। সংশয়াদি পদার্থগুলি প্রত্যেকেই মহর্ষি-কথিত প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তর্ভূত নহে, তাই বলিয়াছেন—"যথাসম্ভবং"। যথাস্থানে এই অন্তর্ভাবের কথা বুঝিতে হইবে।

উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, এ কথা সত্য ; কিন্তু ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা ও আন্বীক্ষিকী এই চারিটি বিদ্যা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ মনু রাজার শিক্ষণীয় বলিয়াও এই চারিটি বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

"ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥" ।৭।৪৩।

মনুক্ত এই চারিটি বিদ্যার পৃথক্ পৃথক্ "প্রস্থান" আছে। তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন—"প্রস্থানং ব্যাপারঃ," অর্থাৎ এখানে প্রস্থান শব্দের অর্থ ব্যাপার। প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যুৎপাদন বা বোধ-সম্পাদনই বিদ্যার ব্যাপার, তাহাকে বলে বিদ্যার প্রস্থান। আবার প্রস্থান শব্দটি কর্ম্মপ্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইলে অর্থাৎ বিদ্যা যাহাকে প্রস্থিত বা বোধিত করে, এই অর্থে নিষ্পন্ন হইলে, ঐ প্রস্থান শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—বিদ্যার—সেই অসাধারণ প্রতিপাদ্য। কারণ, বিদ্যা সেই প্রতিপাদ্যেরই ব্যুৎপাদন বা বোধ সম্পাদন করে। "পৃথক্প্রস্থানবিদ্যা" বলিলে সেখানে "প্রস্থান" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার বুঝিতে হইবে। কোন পদার্থকে "প্রস্থান" বলিলে সেখানে "প্রস্থান" শব্দের দ্বারা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত চারিটি বিদ্যার এই প্রস্থান-ভেদেই ভেদ হইয়াছে। তন্মধ্যে "ত্রয়ী"র প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য অগ্নিহোত্র হোমাদি। "দণ্ডনীতি"র প্রস্থান স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি। "বার্ত্তা"র প্রস্থান হলশকটাদি। "আন্বীক্ষিকী"র প্রস্থান সংশয়াদি পদার্থ। যদি এই আন্বীক্ষিকীতে সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিদ্যা হইতে পারে না। ইহাকে "ত্রয়ী"র মধ্যে গণ্য করিতে হয়, "বার্ত্তা" বা "দণ্ডনীতি"র মধ্যে গণ্য করা অসম্ভব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা চারিটি হয় না, উহারা তিনটি হইয়া পড়ে। তাই

বলিয়াছেন—"অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ং স্যাৎ"। ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে "আত্মবিদ্যা" "আন্বীক্ষিকী"রই বিশেষণ। প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি চরমকল্পে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তাহাই বলিয়াছেন, কিন্তু ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন না বলিয়া পারেন না। ফলকথা "ত্রয়ী" প্রভৃতি অন্য বিদ্যার প্রস্থান হইতে ন্যায়বিদ্যার প্রস্থান-ভেদ থাকায় ইহা ঐ অন্য বিদ্যা হইতে ভিন্ন, ইহা ত্রয়ী নহে, ইহা চতুর্থী বিদ্যা, ইহা জানাইবার জন্য এবং ঐ সংশয়াদি পৃথক্ প্রস্থানগুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জন্য মহর্ষি উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থগুলির পৃথক্ উল্লেখ না করিলে তাহার পৃথক্‌ভাবে ব্যুৎপাদন কিরূপে হইবে? ন্যায়াঙ্গ সংশয়াদি পদার্থের ব্যুৎপাদনই যে ন্যায়বিদ্যার ব্যাপার; এই ব্যাপার-ভেদেই ন্যায়বিদ্যার অন্য বিদ্যা হইতে ভেদ হইয়াছে এবং ভেদ বুঝা গিয়াছে। সুতরাং মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থবর্গের দ্বারা ন্যায়বিদ্যাকে পৃথক্ ব্যাপারবিশিষ্ট করায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, উহা অনর্থক হয় নাই। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। তত্র নানুপলব্ধে ন নির্ণীতেঽর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে, কিং তর্হি? সংশয়িতেঽর্থে। যথোক্তং "বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়" ইতি। বিমর্শঃ সংশয়ঃ, পক্ষপ্রতিপক্ষৌ ন্যায়প্রবৃত্তিঃ, অর্থাব-ধারণং নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানমিতি। স চায়ং কিং স্বিদিতি বস্তুবিমর্শমাত্রমনব-ধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ প্রমেয়েঽন্তর্ভবন্নেবমর্থং পৃথগুচ্যতে।

অনুবাদ। তন্মধ্যে—অজ্ঞাত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না, নিশ্চিত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) সন্দিগ্ধ পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। যথা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন—"সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণ নির্ণয়"। (১ অঃ, ৪১ সূত্র)। "বিমর্শ" বলিতে সংশয়, (সেই সূত্রে) পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে ন্যায়প্রবৃত্তি। অর্থাবধারণ বলিতে নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান। ইহাই কি? অথবা ইহা নহে? এইরূপে পদার্থের বিমর্শ মাত্র কি না—অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সেই এই (ন্যায়াঙ্গ) সংশয় "প্রমেয়ে" অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানপদার্থে অন্তর্ভূত হইয়াও এই জন্য অর্থাৎ ন্যায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি। যে পদার্থে কাহারও কোনরূপ সংশয় হয় নাই, তাহা লইয়া কাহারও বিবাদ হয় না। তাহা লইয়া বিবাদ করিলে মধ্যস্থ ব্যক্তিরা তাহা শুনেন না। নিরর্থক পাণ্ডিত্য প্রকাশ নিরপেক্ষ মধ্যস্থ-সমাজে কখনও আদৃত হয় না। বিভিন্নবাদীর কথা শুনিয়া মধ্যস্থ-

গণের সংশয় হইলে তাঁহারা কোন পক্ষেরই অনুমোদন করিতে পারেন না, সুতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় নিরাসের উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ ইহাকেই বলে ন্যায়প্রবৃত্তি। সংশয় ব্যতীত ইহা ঘটে না। সুতরাং সংশয় ইহার মূল, এ জন্য ন্যায়বিদ্যায় সংশয় পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সংশয় প্রভৃতি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পদার্থ ন্যায়বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান, অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। এ জন্য ন্যায়বিদ্যায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক, নচেৎ ন্যায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ সংশয়াদি পদার্থ ন্যায়বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য কেন হইয়াছে, ন্যায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাই কেন নহে, ইহা বুঝাইতে হইবে। এ জন্য ভাষ্যকার এখন হইতে ঐ সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের যথাক্রমে প্রত্যেকটিকে ধরিয়া এবং প্রকৃত বক্তব্য সমর্থনের জন্য উহাদিগের অনেকের স্বরূপ বর্ণন করিয়া ন্যায়বিদ্যায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংশয়ের কথাই প্রথম বক্তব্য। কারণ, সংশয়ই উহাদিগের মধ্যে প্রথম। তাই "তত্র" এই কথার দ্বারা সংশয়কেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ তন্মধ্যে সংশয় এইরূপ। পরবর্ত্তী "সংশয়" শব্দের সহিত উহার যোগ করিতে হইবে।

যে পদার্থ একেবারে অজ্ঞাত, তাহাতেও ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না, যাহা নির্ণীত, তাহাতেও ন্যায়-প্রবৃত্তি হয় না। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যাহা সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত, তাহাতেই ন্যায়প্রবৃত্তি হয়। পর্ব্বতকে জানি, কিন্তু তাহাতে বহ্নি আছে কি না, এইরূপ সংশয় হইতেছে, সুতরাং সামান্যতঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে। যেরূপে যাহা অনির্ণীত, সেইরূপেই তাহাতে সংশয় হয়। সেইরূপে সন্দিগ্ধ সেই পদার্থেই ন্যায়প্রবৃত্তি হয়, সংশয় না হইলে তাহা হয় না, সুতরাং সংশয় ন্যায়ের অঙ্গ। এ কথা মহর্ষি নিজেও বলিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্য ভাষ্যকার মহর্ষির নির্ণয়লক্ষণ সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সূত্রে "বিমৃশ্য" এই কথার দ্বারা সংশয় পাওয়া গিয়াছে। কারণ, সংশয়কেই মহর্ষি "বিমর্শ" বলিয়াছেন এবং ঐ সূত্রে যে "পক্ষ"ও "প্রতিপক্ষ" শব্দ আছে, উহার দ্বারা সেখানে ন্যায়প্রবৃত্তিই বুঝিতে হইবে, উহাই সেখানে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ মহর্ষির নির্ণয়-সূত্রের দ্বারাও সংশয় ন্যায়প্রবৃত্তির মূল, ইহা প্রকটিত আছে, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য। সংশয়ের পরে ন্যায়প্রবৃত্তি, তাহার দ্বারা পদার্থের অবধারণ, ইহাই সূত্রার্থ। বিপরীতভাবে পদার্থাবধারণ মহর্ষির "নির্ণয়" পদার্থ নহে, তাই ভাষ্যকার ঐ নির্ণয়ের পুনর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তত্ত্বজ্ঞান"। এখন মূল কথা এই যে, সংশয় জ্ঞানপদার্থ, মহর্ষি-কথিত দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ থাকায় জ্ঞানস্বরূপে সংশয়েরও উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সংশয়ের বিশেষ জ্ঞান হয় না। সংশয় ন্যায়প্রবৃত্তির মূল, সুতরাং ন্যায়াঙ্গ, ন্যায়ে উহার বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, সেই জন্যই আবার বিশেষ করিয়া, পৃথক্ করিয়া ন্যায়বিদ্যায় সংশয় পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য নির্ণয় মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক নহে, মধ্যস্থহীন "বাদ"

বিচারেও নির্ণয় হয়, সেখানে কাহারও পূর্ব্বে সংশয় নাই, মহর্ষির নির্ণয়সূত্রেও নির্ণয় মাত্রে পূর্ব্বে সংশয়ের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু নির্ণয়মাত্র সংশয়পূর্ব্বক না হইলেও বিচার সংশয়পূর্ব্বকই। ভাষ্যকারও এখানে সেই তাৎপর্য্যে সংশয়কে ন্যায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়াছেন। যথাস্থানে এ সকল কথার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। অথ প্রয়োজনং, যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনং, যমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা কর্ম্মারভতে। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ। তদাশ্রয়শ্চ ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সংশয়ের পরে প্রয়োজন (পৃথক্ উক্ত হইয়াছে) যাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ কর্ম্ম আরম্ভ করে (তাহাই প্রয়োজন)। সেই এই প্রয়োজন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্ব-কর্ম্ম এবং সর্ব্ববিদ্যা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনশূন্য কিছুই নাই। এবং "তদাশ্রয়" হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজনের আশ্রিত হইয়া "ন্যায়" প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ প্রয়োজন 'জ্ঞান' ব্যতীত কোথায়ও ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না।

টিপ্পনী। "সংশয়ের" পরে "প্রয়োজন" পৃথক্ উক্ত হইয়াছে কেন, এতদুত্তরে ভাষ্যকার "প্রয়োজনে"র স্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সমস্তই প্রয়োজনব্যাপ্ত, প্রয়োজনশূন্য কিছুই নাই; সর্ব্ববিদ্যা এবং সর্ব্ব কর্ম্ম যখন প্রয়োজনব্যাপ্ত, তখন সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্ব কর্ম্মের উপায় এই ন্যায়বিদ্যায় "প্রয়োজন" বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য। পরন্তু "প্রয়োজন"ও সংশয়ের ন্যায় "ন্যায়ে"র অঙ্গ। প্রয়োজন না বুঝিলে ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং ন্যায়বিদ্যায় প্রয়োজন বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য, তাই তাহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। ভাষ্যে "তদাশ্রয়শ্চ" এখানে "তৎপ্রয়োজনং আশ্রয়ো যস্য" এইরূপে বহুব্রীহি সমাসে উহার অর্থ "তদাশ্রিত"। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—"যেমন পণ্ডিত রাজাশ্রিত, তদ্রূপ ন্যায় প্রয়োজনের আশ্রিত। প্রয়োজনের আশ্রয়ত্ব বলিয়াছেন—উপকারকত্ব। প্রয়োজন ন্যায়ের আশ্রয় অর্থাৎ উপকারক কেন? এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ন্যায়ের দ্বারা বস্তু পরীক্ষার মূলই প্রয়োজন। "প্রযুজ্যতেঽনেন', এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বুঝা যায়, যাহা জীবের প্রবৃত্তির প্রযোজক, তাহাই প্রয়োজন। ভাষ্যকার প্রথমতঃ "প্রয়োজন" শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তি সূচনার সহিত প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহারই ফলিতার্থ বর্ণন করিয়া পুনর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে প্রাপ্য পদার্থের ন্যায় ত্যাজ্য পদার্থও "প্রয়োজন"। কারণ, ত্যাজ্য পদার্থকে ত্যাগ করিবার জন্যও জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, সুতরাং প্রাপ্য পদার্থের ন্যায় ত্যাজ্য পদার্থও কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রযোজক। এইরূপ প্রবৃত্তির প্রযোজককেই তিনি প্রয়োজন বলিয়াছেন। কারণ, "প্রয়োজন" শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। এই

জন্যই ভাষ্যকার আদিভাষ্যে ত্যাজ্য পদার্থকেও "অর্থ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। ত্যাজ্য পদার্থও "ত্যাগ" করিবার জন্য অর্থ্যমান হয়, সুতরাং তাহাও "অর্থ"।

মহর্ষি-কথিত আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়ে"র মধ্যে অনেক "প্রয়োজন" পদার্থ বলা হইয়াছে, পরম প্রয়োজন "অপবর্গ"ও তাহার মধ্যে বলা হইয়াছে। সুখ প্রভৃতি প্রয়োজন পদার্থ বিশেষ কারণে তাহার মধ্যে বলা না হইলেও সেগুলিও প্রয়োজন বলিয়া মহর্ষির স্বীকৃত। সুতরাং সামান্য প্রমেয়ের মধ্যে সেগুলি থাকায় সামান্যতঃ প্রয়োজন পদার্থ প্রমেয়ে অন্তর্ভূত, ইহা বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে ঐ অন্তর্ভাব ও পৃথক্ উক্তিবোধক কোন সন্দর্ভ না বলিলেও তাঁহার বক্তব্য চিন্তা করিয়া তাহা এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, এখানে ভাষ্যকারের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পৃথক্ উক্তিবোধক সন্দর্ভ ছিল। সে পাঠ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুধীগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন।

ভাষ্য। কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ ? প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং, সাঽন্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণমন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রং। যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ স ইতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই ন্যায় কি ? অর্থাৎ পূর্ব্বে সংশয় ও প্রয়োজনকে যে ন্যায়ের অঙ্গ বলা হইয়াছে, সে ন্যায় কাহাকে বলে ? (উত্তর) সমস্ত প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণমূলক প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের অর্থাৎ সাধ্য সাধন হেতুপদার্থের পরীক্ষা ন্যায়। ফলিতার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী অনুমান প্রমাণ, অর্থাৎ ঐরূপ অনুমান প্রমাণই পূর্ব্বে "ন্যায়" নামে কথিত হইয়াছে। তাহা "অন্বীক্ষা," অর্থাৎ ঐরূপ অনুমানকেই অন্বীক্ষা বলে। প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের অন্বীক্ষণ অন্বীক্ষা, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থকে বুঝিয়া পরে যে অনুমানের দ্বারা আবার তাহাকে বুঝা হয়, সেই অনুমানপ্রমাণকে "অন্বীক্ষা" বলা যায়। সেই অন্বীক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বর্ণনার জন্য প্রবৃত্ত (প্রকাশিত) হইয়াছে, এ জন্য "আন্বীক্ষিকী" "ন্যায়বিদ্যা," "ন্যায়শাস্ত্র," অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অন্বীক্ষা বা ন্যায়ের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই এই বিদ্যাকে "আন্বীক্ষিকী" বলে, "ন্যায়বিদ্যা" বলে, "ন্যায়শাস্ত্র" বলে। যাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ অথবা শব্দপ্রমাণের বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা ন্যায়াভাস (অর্থাৎ তাহা ন্যায় নহে)।

টিপ্পনী। অনুমান প্রমাণ সামান্যতঃ দ্বিবিধ; স্বার্থ এবং পরার্থ;—যেখানে নিজে বুঝিবার জন্য অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, সেই অনুমান স্বার্থ; যেখানে প্রতিবাদীকে নিজের মতটি

বুঝাইবার জন্য অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, সেই অনুমান পরার্থ। এই পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা নিজের মতের প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে। যেমন কোন বাদী পর্ব্বতে বহ্নি আছে, ইহা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিবাদীকে বুঝাইতে গেলে প্রথমে বলিবেন—(১) "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" অর্থাৎ পর্ব্বতে বহ্নি আছে, বাদীর এই বাক্যের নাম "প্রতিজ্ঞা"। তাহার পরে ঐ বাক্যার্থ সমর্থনের জন্য হেতুবাক্য বলিবেন (২) "ধূমাৎ" অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূম ইহার হেতু। বাদীর এই বাক্যের নাম "হেতু"। তাহার পরে বিশিষ্ট ধূম থাকিলেই যে সেখানে বহ্নি থাকে, ইহা বুঝাইতে তৃতীয় বাক্য বলিবেন (৩) "যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসং" অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকে, যেমন পাকগৃহ। বাদীর এই বাক্যটির নাম "উদাহরণ"। তাহার পরে ঐরূপ ধূম যে পর্ব্বতে আছে, ইহা বুঝাইবার জন্য বাদী চতুর্থ বাক্য বলিবেন (৪) "তথাচ ধূমবান্ পর্ব্বতঃ" অর্থাৎ পর্ব্বত সেই প্রকার ধূমবিশিষ্ট। বাদীর এই বাক্যটির নাম "উপনয়"। তাহার পরে উপসংহারের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সকল বাক্যের ফলিতার্থ বুঝাইবার জন্য বাদী পঞ্চম বাক্য বলিবেন--(৫) "তস্মাৎ ধূমাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্" অর্থাৎ অতএব ধূম হেতুক পর্ব্বতে বহ্নি আছে ;—বাদীর এই বাক্যের নাম "নিগমন"। (অবয়ব প্রকরণে ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

স্বার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি বাক্য-প্রয়োগ নাই। এবং গুরুশিষ্য প্রভৃতির 'বাদ'-বিচারেও সর্ব্বত্র উহাদিগের প্রয়োগ নাই। ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হইতে পারে (বাদসূত্র দ্রষ্টব্য)। যথাক্রমে প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যসমষ্টিকেও "ন্যায়" বলা হইয়াছে। পরে ভাষ্যকারও তাহা বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য ঐ ন্যায়বাক্যের এক একটি অংশ, এ জন্য উহাদিগকে ন্যায়ের 'অবয়ব' বলা হইয়াছে। মহর্ষি গোতম এই ন্যায়ের পাঁচটি 'অবয়ব' বলিয়াছেন, এ জন্য গোতমোক্ত ন্যায়কে "পঞ্চাবয়ব" ন্যায় বলে। ভাষ্যকার পূর্ব্বে সংশয় ও প্রয়োজনকে ন্যায়ের অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ ন্যায় বলিতে কি বুঝিব? এইরূপ প্রশ্ন হইবেই ;—এ জন্য ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা হেতু-পরীক্ষাই এখানে ন্যায়। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য নিজে প্রমাণ না হইলেও উহাদিগের মূলে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ আছে। কেন আছে, কিরূপে আছে, ইহা যথাস্থানে (নিগমনসূত্র-ভাষ্যে) দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার এখানে "প্রমাণৈঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত প্রমাণ শব্দের দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া যে অনুমান প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, তাহাই হেতুর পরীক্ষা। যে হেতুর দ্বারা কোন সাধ্য সাধন করা হয়, সেই হেতুটি পরীক্ষিত হইলেই তাহার দ্বারা সেখানে সাধ্যসিদ্ধি হইয়া যায়। পঞ্চাবয়বের দ্বারা সাধ্যের পরীক্ষা অর্থাৎ সাধ্যসিদ্ধিকে ন্যায় বলিলে ফলকেই ন্যায় বলা হয়, তাহাতে সাধ্য-সিদ্ধি ন্যায়ের ফল হয় না। বস্তুতঃ উহা ন্যায়েরই ফল হইবে, এ জন্য তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যোক্ত'অর্থ' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন হেতু। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের, কি না—হেতু পদার্থের পরীক্ষাই ন্যায়। সাধ্যসিদ্ধি তাহার ফল। কোন সাধ্য সাধনের জন্য

কোন হেতু পদার্থ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলে ঐ হেতু পরীক্ষিত হয়। সুতরাং ঐ অনুমান-প্রমাণই হেতুপরীক্ষা এবং উহাই এখানে ন্যায় অর্থাৎ অনুমান প্রমাণরূপ ন্যায়ই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের উত্তরের তাৎপর্য্যার্থ। সে কিরূপ অনুমানপ্রমাণ ? ইহা বলিতে বহুবচনান্ত "প্রমাণ" শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কথা বলিয়া ভাষ্যকার জানাইয়াছেন যে, যে অনুমানপ্রমাণ বাধিত হয় না, এমন অনুমানই ন্যায়। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব দ্বারা অনুমান প্রদর্শন করিলে সে অনুমান কখনও বাধিত হয় না। কারণ, ঐ পঞ্চাবয়বের মূলে সর্ব্বপ্রমাণ থাকে, সুতরাং সেই স্থলীয় অনুমান-প্রমাণ অন্যান্য প্রমাণের অবিরুদ্ধ হইবেই। তাহা হইলে ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে অনুমান অন্য প্রমাণের অবিরুদ্ধ, তাহাই ন্যায়। যে অনুমানে পঞ্চাবয়ব প্রযুক্ত হয়, তাহাই ন্যায়, ইহা বুঝিতে হইবে না, তাহা হইলে গুরুশিষ্যাদির বাদবিচারে যেখানে পঞ্চাবয়বপ্রয়োগ হয় নাই, সেই স্থলীয় অনুমান ন্যায় হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরেই তাঁহার পূর্ব্বকথার এই ফলিতার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ নিজেই বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমান ন্যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুপরীক্ষা বলিতে অনুমান-প্রমাণ বুঝিবে এবং "পঞ্চাবয়বের" দ্বারা এই কথা হইতে প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বুঝিবে। "প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত" ইহার অর্থ—প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের অবিরোধী। উদ্যোতকরও ঐ কথার ঐ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ন্যায়কে "অন্বীক্ষা"ও বলে। ("অনু" শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। যাহার দ্বারা পশ্চাৎ ঈক্ষণ কি না—জ্ঞান হয়, তাহাকে "অন্বীক্ষা" বলা যায়।) যেখানে প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া শেষে বিশেষ জ্ঞানের জন্য অথবা দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্য অথবা প্রতিবাদীকে মানাইতে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্তির জন্য অনুমান-প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়, সেখানে ঐ অনুমানকে "অন্বীক্ষা" বলা যায়। বস্তুতঃ ভাষ্যকার "অন্বীক্ষা" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে, "অন্বীক্ষা" হইলে তাহা প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অনুমানই হইবে, সুতরাং "অন্বীক্ষা" শব্দের অর্থও "ন্যায়"। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সর্ব্বত্র থাকে না; কিন্তু তাহার ব্যুৎপত্তি পর্য্যালোচনার দ্বারা প্রকৃতার্থ নির্ণয় করা যায় এবং করিতে হয়। পরন্তু প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মূলে সর্ব্ব প্রমাণ থাকে, ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্তানুসারেও ভাষ্যকার এখানে "অন্বীক্ষা" শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে পারেন এবং তদনুসারে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "ন্যায়"কে "অন্বীক্ষা" বলিতে পারেন। সর্ব্বত্র অনুমেয় পদার্থটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বে বুঝিতে হইবে; নচেৎ সেখানে অনুমান "অন্বীক্ষা" হইবে না, ইহা কিন্তু ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নহে। ঐ কথার দ্বারাও তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে যে, যাহা প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অনুমান, অর্থাৎ যাহাকে পূর্ব্বে "ন্যায়" বলিয়াছি, তাহাকেই "অন্বীক্ষা" বলে। ভাষ্যকার "আন্বীক্ষিকী" শব্দের দ্বারা যে এই ন্যায়-বিদ্যাকে বুঝা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে, ইহা বলিবার জন্যই শেষে "অন্বীক্ষার" কথা তুলিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত ন্যায়কেই "অন্বীক্ষা" বলিয়াছেন, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের ব্যাখ্যা

করিয়া "অন্বীক্ষা" শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "ন্যায়"ই ভাষ্যকারের মতে "অন্বীক্ষা" শব্দের প্রকৃতার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা "ন্যায়", তাহাই "অন্বীক্ষা" এবং তাহাই "পরীক্ষা" বা হেতুপরীক্ষা, এখানে এ সবগুলিই একার্থ, ইহাই ভাষ্যকারের কথা। পূর্ব্বোক্ত অনুমানরূপ ন্যায়কেই "অন্বীক্ষা" বলে এবং ঐ অন্বীক্ষার নির্ব্বাহক শাস্ত্র বলিয়াই ন্যায়শাস্ত্রকে "আন্বীক্ষিকী" বলে, "ন্যায়বিদ্যা" বলে। কোষকার অমর সিংহও বলিয়াছেন—"আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা"। "তর্ক" শব্দও পূর্ব্বোক্ত "ন্যায়" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যকার যে প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণের অবিরুদ্ধ অনুমানকেই পূর্ব্বে "ন্যায়" বলিয়াছেন, "অন্বীক্ষা" বলিয়াছেন, ইহা তিনি শেষে সুস্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষ কথাটি এই যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ, তাহা "ন্যায়াভাস"। যাহা "ন্যায়" নহে, কিন্তু ন্যায়সদৃশ, ন্যায়ের মত প্রতীত হয়, তাহাই "ন্যায়াভাস" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অনুমানই "ন্যায়াভাস"। সেখানেও ভ্রম অনুমিতি হয়, এ জন্য তাহাতেও "অনুমান" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা যথার্থ অনুমিতি জন্মায় না, এ জন্য তাহা প্রমাণ নহে, সুতরাং তাহা "ন্যায়"ও হইবে না, তাহার নাম "ন্যায়াভাস"। ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারা তিনি যে প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমানকেই পূর্ব্বে "ন্যায়" বলিয়াছেন, ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরোধ নিজে বুঝিলে বা কেহ বুঝাইয়া দিলে "ন্যায়াভাস" স্থলে আর অনুমিতিই জন্মে না, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভ্রম অনুমিতি হইয়া থাকে, তখনও সেই অনুমান "ন্যায়াভাস"। বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা সকল অবস্থাতেই "ন্যায়াভাস"। বাদী ও প্রতিবাদীর অনুমানদ্বয়ের মধ্যে একটি হইবে "ন্যায়", অপরটি হইবে "ন্যায়াভাস"। দুইটি অনুমানই কখনও প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ হইয়া একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। কারণ, দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনও একাধারে প্রমাণসিদ্ধ হইবে না, সুতরাং উভয় পক্ষের অনুমানের মধ্যে একটি বস্তুতঃ "ন্যায়াভাস"ই হইবে, একটি ন্যায় হইবে ; প্রকৃত মধ্যস্থ তাহা বুঝাইয়া দিবেন। মধ্যস্থের মতানুসারেই সেখানে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে। বাদ-বিচারে মধ্যস্থ আবশ্যক হয় না। সেখানে গুরুপ্রভৃতি বিচারকই উহা বুঝাইয়া দিবেন। মূল কথা, কেহ বুঝাইয়া না দিলেও এবং নিজে বুঝিতে না পারিলেও বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা কোন দিনই "ন্যায়" হইবে না, তাহা "ন্যায়াভাস"। এখন এই "ন্যায়াভাসের" উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কেহ অগ্নিকে অনুষ্ণ বলিয়া বুঝাইবার জন্য যদি বলেন—"বহ্নিরনুষ্ণঃ কার্য্যত্বাৎ" অর্থাৎ অগ্নি যখন কার্য্য, তখন তাহা উষ্ণ নহে, যাহা যাহা কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ, সে সমস্তই অনুষ্ণ, যেমন জলাদি, সুতরাং অগ্নিও কার্য্য বলিয়া উষ্ণ নহে—অনুষ্ণ। এখানে এই অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলিয়া "ন্যায়াভাস"। অগ্নির উষ্ণতা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে সমস্ত কারণে ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই দূরত্বাদি কোন দোষ ঐ স্থলে নাই। সুতরাং ঐ স্থলে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্নির উষ্ণতা-বিষয়ে যথার্থ প্রত্যক্ষই জন্মে, প্রতিবাদীও ইহা

অস্বীকার করিতে পারেন না, অগ্নিস্পর্শে হস্তদাহ তাঁহারও হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলীয় অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ। সুতরাং উহা "ন্যায়" নহে—উহা "ন্যায়াভাস"। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমান হইতে প্রবল বলিয়া অনুমানকে ব্যাহত করে। আপত্তি হইতে পারে যে, কোন স্থলে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও ত প্রত্যক্ষ বাধিত হয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অনুমান হইতে প্রবল বলা যায় কিরূপে ? যেমন আমরা আকাশে চন্দ্রের যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ করি, গণিতের সাহায্যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, চন্দ্রের পরিমাণ ঐরূপ নহে, চন্দ্রের পরিমাণ উহা হইতে অনেক বড় ; সুতরাং ঐ স্থলে প্রত্যক্ষই অনুমানের দ্বারা বাধিত হয়, প্রাচীনগণও গ্রন্থান্তরে এইরূপ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, দূরত্ব-দোষবশতঃ চন্দ্রের পরিমাণ-বিষয়ে আমাদিগের যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না ; সুতরাং সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না। চন্দ্রের একটা পরিমাণ আছে, এই প্রত্যক্ষ যথার্থই হয়, কিন্তু আমরা তাহা দূরত্ববশতঃ যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভ্রমই করি। দূরত্বাদি দোষবশতঃ প্রত্যক্ষ ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বসম্মত। সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায়—অনুমান প্রবল হইবেই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকটে অনুমান চিরকালই দুর্ব্বল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমানকে চিরকালই ব্যাহত করে, সর্ব্বত্রই ব্যাহত করে, এই কথাই বলা হইয়াছে। আমরা দেহকে আত্মা বলিয়া যে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভ্রম। কেন ভ্রম, তাহা বুঝিবার অনেক উপায় আছে, সুতরাং ঐ স্থলে অনুমানাদি প্রমাণ প্রবল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলে তাহা অনুমানাদি হইতে প্রবল। বহ্নিতে উষ্ণতার প্রত্যক্ষ উভয় মতেই যথার্থ, সুতরাং ঐ স্থলে অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় "ন্যায়াভাস" হইবে। এখানে আর একটি আপত্তি এই যে, বাদী অগ্নিতে অনুষ্ণতার অনুমান করিতে হেতু বলিয়াছেন—কার্য্যত্ব। কার্য্যত্ব অনুষ্ণতার ব্যভিচারী অর্থাৎ কার্য্যত্ব থাকিলেই তাহা অনুষ্ণ হইবে, এমন নিয়ম নাই ; সুতরাং বাদী ঐরূপ অনুমান বলিতেই পারেন না, উহাতে প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষ প্রদর্শন অনাবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি এই কথা লইয়া বহু বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শেষ কথা এই যে, যদিও এখানে কার্য্যত্ব হেতু ব্যভিচারী, কারণ, অগ্নি বা ঐরূপ তেজঃপদার্থে কার্য্যত্ব থাকিলেও অনুষ্ণতা নাই—ইহা সত্য ; কিন্তু যত বেলা ঐ প্রত্যক্ষ-বিরোধ প্রদর্শন না করা যাইবে, তত বেলা বাদীকে ঐ ব্যভিচার মানান যাইবে না। বাদী বলিবেন—আমি অগ্নি ও ঐরূপ তেজঃ-পদার্থে অনুষ্ণতা স্বীকারই করি, ব্যভিচার কোথায় ? সুতরাং প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষই প্রথমে দেখাইতে হইবে। অর্থাৎ ঐ কার্য্যত্ব হেতু ঐ স্থলে হেতু নহে, উহা "বাধিত" নামক হেত্বাভাস, ইহাই প্রথমে বলিতে হইবে, তাহার দ্বারাই ঐ অনুমান দূষিত হইলে আর শেষে ব্যভিচার প্রদর্শন করা অনাবশ্যক, এ জন্য তাহা আর করা হয় না, প্রত্যক্ষ-বিরোধই দেখান হয়। উদয়নাচার্য্য এই সকল কথার উপসংহারে "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"তে বলিয়াছেন—"নহি মৃতোঽপি মার্য্যতে"। প্রত্যক্ষ বিরোধের দ্বারাই যে অনুমান ব্যাহত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার ব্যভিচার প্রদর্শন অনাবশ্যক। মৃতকেও আবার কে মারিতে যায় ?

সুবিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ ঠিক হয় না বলিয়া অন্য একটি উদাহরণ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"অশ্রাবণঃ শব্দঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ" অর্থাৎ কেহ যদি অনুমান করেন যে, শব্দ অশ্রাব্য, যেহেতু শব্দ কার্য্য, যেমন ঘটাদি, তাহা হইলে ঐ স্থলীয় অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। দিঙ্‌নাগের অভিপ্রায় এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; যিনি ঐরূপ অনুমান করিবেন, তিনিও শব্দ শ্রবণ করেন, তিনিও প্রতিবাদীর কথা এবং নিজের কথাগুলি তখনও শুনিতেছেন, সুতরাং শব্দকে অশ্রাব্য বলিয়া অনুমান করিতে তিনি পারেন না, ঐ স্থলীয় অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর এবং "শ্লোকবার্ত্তিকে" ভট্ট কুমারিল দিঙ্‌নাগের প্রদর্শিত এই উদাহরণকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও তাহার শ্রাব্যতা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে ? শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধবিশেষই শব্দের শ্রাব্যতা, ঐ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ শ্রাব্যতার প্রত্যক্ষ হয় না। শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ না হইলে অশ্রাব্যতার অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাকে অনুমান করা হইবে, তাহারই অভাব যদি সেখানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয়, তবেই সেই স্থলায় অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলা যায়। দিঙ্‌নাগের প্রদর্শিত স্থলে শব্দের অভাব অনুমেয় নহে। সুতরাং শব্দ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও শব্দের অশ্রাব্যতার অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না, উহা অন্য প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইবে। বহ্নিতে উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং তাহাতে উষ্ণত্বের অভাব অনুমান করিতে গেলে, তাহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমান হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সেই স্থলীয় অনুমানই প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের উদাহরণ; ঐরূপ অন্য স্থলেও উহার উদাহরণ দেখিবে। দিঙ্‌নাগের প্রদশিত উদাহরণ ভ্রম-কল্পিত, উহা ঠিক নহে।

মনে হয়, দিঙ্‌নাগ শ্রাব্যতাকে প্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়াই ঐরূপ উদাহরণ বলিয়াছিলেন। শব্দগত "জাতি"বিশেষই শ্রাব্যতা, অথবা ঐরূপ জাতি না মানিলে শ্রবণেন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রবণই শ্রাব্যতা, "শব্দকে শ্রবণ করিতেছি" এইরূপে ঐ শ্রবণ মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ নহে। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার কাত্যায়নের সূত্র[১] উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, "শ্রাব্যতা" বলিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয়, তখন তাহার সম্বন্ধও অতীন্দ্রিয় হইবে, সুতরাং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধরূপ শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে,—এই অভিপ্রায়েই উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতীন্দ্রিয়, অতএব ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ শ্রাব্যতা প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে। এখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দরূপ বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষকেই উদ্যোতকর ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলিয়াছেন।

শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমান, যথা—

কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন—"নরশিরঃ কপালং শুচি, প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ, শঙ্খবৎ", অর্থাৎ মরা

১। কৃত্তদ্ধিতসমাসেষু সম্বন্ধাভিধানং ত্বতল্ভ্যাং।

—তাৎপর্য্যটীকাকারের উদ্ধৃত কাত্যায়ন-সূত্র।

মানুষের মাথার খুলি পবিত্র, যেহেতু তাহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ। কাপালিকের তাৎপর্য্য এই যে, শঙ্খ যেমন মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইয়াও সর্ব্বমতেই শুচি, তদ্রূপ মরা মানুষের মাথার খুলিও শুচি। কারণ, তাহাও প্রাণীর অঙ্গ। উদ্যোতকরের পূর্ব্ব হইতেই কাপালিক সম্প্রদায় এইরূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন, তাঁহারাও নিজ মতানুসারে প্রমাণাদি অবলম্বনে বিচারপটু ছিলেন, ইহা উদ্যোতকরের কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

ঘৃণাশূন্য কাপালিকের মরা মানুষের মাথার খুলিকে শুচি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এত আগ্রহ কেন? তাহার শুচিত্ব বিষয়ে এত দৃঢ় বিশ্বাসই বা কেন? এতদুত্তরে কাপালিকগণ যাহা বলিতেন, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কাপালিকগণ বৈদিক সম্প্রদায়কে বলিতেন যে, কেবল শাস্ত্র হইতেই ধর্ম্মাদি নির্ণয় হয় না, অনিন্দিত আচার হইতেও ধর্ম্মাদি নির্ণয় হয়, ইহা তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক। তোমাদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যদিগের যেমন "আহ্নেনৈবুক" প্রভৃতি কর্ম্ম অনিন্দিত আচার বলিয়া শ্রেয়স্কররূপে অনুষ্ঠিত হয়, উহা তাঁহাদিগের অনিন্দিত আচার বলিয়াই ধর্ম্ম বলা হয়, তদ্রূপ আমাদিগেরও মরা মানুষের মাথার খুলিতে পান-ভোজনাদি ব্যবহার-পরম্পরা অনিন্দিত আচার বলিয়া উহাতে আমরা প্রত্যবায় মনে করি না, পরন্তু উহা আমাদিগের ধর্ম্ম। উদয়নাচার্য্য "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"তে এখানে বলিয়াছেন যে, যদি বৈদিক সম্প্রদায় বলেন যে, যাহা সার্ব্বত্রিক ব্যবহার, তাহা প্রমাণ হইতে পারে—যেমন কন্যাবিবাহে পুরস্ত্রীগণের আচার। কিন্তু দেশবিশেষে তোমাদিগের অনুষ্ঠিত আচার প্রমাণ হইবে কেন? এই জন্যই কাপালিকগণ দাক্ষিণাত্যদিগের আচারকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচার যেমন সার্ব্বত্রিক না হইয়াও অনিন্দিত আচার বলিয়া ধর্ম্ম, তদ্রূপ আমাদিগের ঐ আচারও অনিন্দিত বলিয়া ধর্ম্ম। আমাদিগের আচারকে নিন্দিত বলিলে দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচারকেও আমরা নিন্দিত বলিব, উহা নিন্দিত বলে, এমন লোক আরও খুঁজিলে মিলিবে, সুতরাং আমাদিগের আচারকে নিন্দিত বলিতে যাইয়া লাভ হইবে না। দাক্ষিণাত্যদিগের "আহ্নেনৈবুক" কর্ম্ম কি? এ সম্বন্ধে "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র "প্রকাশ" টীকাকার বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—"কেহ বলেন, গোময়ময়ী দেবতা গঠন করিয়া দূর্ব্বাদির দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহাতে জ্ঞাতিত্ব কল্পনাই দাক্ষিণাত্যদিগের "আহ্নেনৈবুক"। কেহ বলেন,—মঙ্গল বারে দধি মন্থন। কেহ বলেন,—এক মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া তণ্ডুল কোন ভাণ্ডে তুলিয়া রাখিয়া মাসান্তে তদ্দ্বারা ঘৃতযোগে একখানা পিষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা দেবতার পূজা করাই দাক্ষিণাত্যদিগের "আহ্নেনৈবুক"। ফল কথা, মৈথিল বৰ্দ্ধমানও দাক্ষিণাত্যদিগের ঐ আচারটা কি, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া যাইতে পারেন নাই। "জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরে" "হোলাকাধিকরণে" পাওয়া যায় যে, করঞ্জক প্রভৃতি স্থাবর দেবতার পূজাই "আহ্নেনৈবুক"। এই সব কথাগুলি চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসুর ভাবিবার বিষয় বলিয়াই লিখিত হইল।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, কাপালিকগণের পূর্ব্বোক্ত অনুমান শ্রুতিমূলক মন্বাদিস্মৃতি[১] রূপ শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া "ন্যায়াভাস"। মরা মানুষের মাথার খুলির অশুচিত্বই শাস্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারাই তাহার শুচিত্বের অনুমান হইবে না। কেহ উহাতে অনুমান প্রদর্শন করিলে তাহা হইবে "ন্যায়াভাস"। কাপালিকগণ বলিতেন যে, আমরা শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি কোন প্রমাণ মানি না, আমরা আমাদিগের শাস্ত্রকেই প্রমাণ বলিয়া মানি। এতদুত্তরে বৈদিক সম্প্রদায় কাপালিকদিগের শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থন এবং শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতেন। উদ্দ্যোতকর এখানে শেষে বলিয়াছেন যে, মরা মানুষের মাথার খুলিকে যদি তোমরা শুচি বল, তবে অশুচি বলিবে কাহাকে? বিষ্ঠা প্রভৃতির অশুচিত্ব ত আমাদিগের শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধ, তোমরা ত সে সকল শাস্ত্র মান না। যদি বল, অশুচি কিছুই নাই, আমরা সবই শুচি বলি, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি বলিবে? যদি অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সমস্ত পদার্থের শুচিত্ব সাধন কর, তবে দৃষ্টান্ত বলিবে কাহাকে? গোময়, শঙ্খ প্রভৃতিকে দৃষ্টান্ত বলিতে পার না, কারণ, তাহাদিগের শুচিত্ব বিষয়ে প্রমাণ দিতে হইবে। তদ্বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি যাহা প্রমাণ আছে, তাহা ত তোমরা মান না। ফলকথা, সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া অনুমান করিতে গেলে তৎপূর্ব্বে কোন পদার্থ শুচি বলিয়া উভয় পক্ষের সিদ্ধ থাকে না; কারণ, তুমি যাহা শুচি বলিবে, আমি তাহা অশুচি বলিয়া বসিব। দৃষ্টান্তটি অনুমানের পূর্ব্বে উভয়বাদীর নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ প্রতিবাদীর নিকটে অনুমান প্রদর্শন করা যায় না। কাপালিকগণ যেমন শ্রুতি-স্মৃতি মানেন না, বৈদিক সম্প্রদায় সেইরূপ কাপালিকের শাস্ত্র মানেন না; সুতরাং অনুমানের দ্বারা সমস্ত পদার্থের শুচিত্ব সাধন করিতে গেলে তৎপূর্ব্বে কোন পদার্থই শুচি বলিয়া উভয়বাদীর নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ না থাকায়, কাপালিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার অনুমান প্রদর্শন অসম্ভব।

গঙ্গেশের "তত্ত্বচিন্তামণি"র হেত্বাভাস-সামান্য নিরুক্তির "দীধিতি"তে রঘুনাথ শিরোমণি পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে ঐরূপ অনুমান হইতেই পারে না। কারণ, ঐ স্থলে ঐ অনুমান অপেক্ষায় বিরোধী শাস্ত্র-প্রমাণ বলবত্তর। বলবত্তর কেন? ইহা বুঝাইতে সেখানে দীধিতির টীকাকার জগদীশ বলিয়াছেন যে, ঐ অনুমানে শুচিত্বরূপ সাধ্য-প্রসিদ্ধি প্রভৃতি একমাত্র শাস্ত্রের অধীন। সুতরাং ঐ অনুমানটি শাস্ত্রাধীন। তাহা হইলে ঐ অনুমান হইতে শাস্ত্রই সেখানে বলবৎ প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনুমানকারী যে শঙ্খকে শুচি বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রকেই তিনি প্রথমে আশ্রয় করিয়াছেন। শঙ্খের শুচিত্ব তিনি প্রতিবাদীকে শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন্ প্রমাণের দ্বারা বুঝাইবেন? প্রতি-বাদী যদি বলিয়া বসেন যে, শঙ্খও মৃত প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া অশুচি, তাহা হইলে অনুমানকারী শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হইবেন। তাহা হইলে শাস্ত্রই তাঁহার ঐ অনুমানের মূলভূত। সুতরাং তিনি

১। "নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা॥—মনুসংহিতা, ৫।৭।

ঐ স্থলে শাস্ত্রকে বলবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। যদিও অনুমান অপেক্ষায় আপ্তবাক্য-রূপ শব্দ-প্রমাণ সর্ব্বত্রই প্রবল, কারণ, তাহাতে ভ্রমের সম্ভাবনাই নাই, অনুমানে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে, তথাপি যিনি তাহা মানেন না, তিনিও পূর্ব্বোক্ত অনুমানে শঙ্খকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতে যখন শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিবেন, তখন তজ্জাতীয় শাস্ত্রান্তরকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার ঐ অনুমানের মূলভূত শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া মরা মানুষের মাথার খুলির অশুচিত্ববোধক শাস্ত্র তাঁহার মতেও বলবত্তর, সুতরাং সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ অনুমান হইতেই পারে না। এইরূপ অন্যপ্রকার শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমানও ন্যায়াভাস হইবে। প্রত্যক্ষের ন্যায় শব্দ-প্রমাণও অনুমান অপেক্ষায় প্রবল বলিয়া তদ্বিরুদ্ধ অনুমান কখনও ন্যায় হইবে না।

অনুমান-বিরুদ্ধ অনুমানকে ভাষ্যকার ন্যায়াভাস বলেন নাই কেন? এতদুত্তরে উদ্দ্যোত-কর বলিয়াছেন যে, একত্র দুইটি বিরুদ্ধ অনুমানের সমাবেশ হইতে পারে না, এ জন্য অনুমান অনুমানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একই সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি বিরুদ্ধ অনুমান হইতে পারে না। কারণ, দুইটি অনুমানই যদি তুল্যশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহার কোনটিই অনুমিতি জন্মাইতে পারে না, সেখানে উভয় পক্ষের সাধ্য ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়ই জন্মে। সেখানে দুইটি অনুমানই তুল্যশক্তি বলিয়া একটি অপরটিকে বাধা দিয়া অনুমিতি জন্মাইতে পারে না। একটি দুর্ব্বল এবং অপরটি প্রবল হইলেই প্রবলটি দুর্ব্বলটিকে বাধা দিতে পারে। যেমন প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণ অনুমান অপেক্ষায় প্রবল বলিয়া অনুমানকে ব্যাহত করে, সুতরাং সেই স্থলেই অনুমানকে ন্যায়াভাস বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদি কোন অনুমান পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য অনুমানকে অপেক্ষা করিয়াই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে অনুমান বিরুদ্ধ হইয়াও ন্যায়াভাস হইতে পারে। যেমন কেহ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে গেলে পূর্ব্বে তাহাকে ঈশ্বর-সাধক অনুমান-প্রমাণকে আশ্রয় করিতে হইবে, নচেৎ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান বলা যাইবে না। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মী অসিদ্ধ হইলে তাহাতে অনুমান হইতে পারে না। কেহ আকাশ-কুসুমে গন্ধের অনুমান করিতে পারেন কি? সুতরাং ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমানকারীকে বলিতে হইবে যে, আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন, ইহাই আমার সাধ্য। তাহা হইলে ঐ অনুমান অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া ন্যায়াভাস হইবে। কারণ, ঐ অনুমানকারী ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে পূর্ব্বে ঈশ্বর-সাধক যে অনুমানকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই অনুমান ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছে। ঈশ্বরসাধক অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং ঈশ্বর মানিয়া তাহাতে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমানে সেই কর্ত্তৃত্বসাধক অনুমান অপেক্ষিত হওয়ায়, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অনুমান প্রবল, সুতরাং পরবর্ত্তী কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান তাহার দ্বারা ব্যাহত হইবে। উহা অনুমানবিরুদ্ধ অনুমান হইয়া

ন্যায়াভাস হইবে। ভাষ্যকার কিন্তু ইহা বলেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় ইহাই বলা যায় যে, যদিও ঐরূপ কোন স্থল হয়, তাহা হইলে সেখানে শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়াই ন্যায়াভাস হইবে, অনুমান-বিরুদ্ধ বলিয়া আবার অন্য প্রকার ন্যায়াভাস বলিবার কোন প্রয়োজনই নাই। যেমন তাৎপর্য্যটীকাকারের প্রদর্শিত ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়াতেই ন্যায়াভাস হইতে পারিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা," সুতরাং ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাব শ্রুতি-বাধিত। উহার অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ।

উপমান প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়াও ন্যায়াভাস হইতে পারে, তবে সেখানে উপমান প্রমাণের মূলীভূত শব্দ-প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতেই ন্যায়াভাস হইবে। উপমান-বিরুদ্ধ বলিয়া আর পৃথক্ কোন ন্যায়াভাস বলিবার প্রয়োজন না থাকায় ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। ন্যায়াভাস হইলেই হেত্বাভাস সেখানে হইবেই, এ জন্য মহর্ষি হেত্বাভাসের কথাই কেবল বলিয়াছেন, ন্যায়াভাস নাম করিয়া কিছু বলেন নাই। (হেত্বাভাস-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। তত্র বাদজল্পৌ সপ্রয়োজনৌ বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে। বিতণ্ডয়া প্রবর্ত্তমানো বৈতণ্ডিকঃ। স প্রয়োজনমনুযুক্তো যদি প্রতিপদ্যতে, সোঽস্য পক্ষঃ সোঽস্য সিদ্ধান্ত ইতি বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপদ্যতে নায়ং লৌকিকো ন পরীক্ষক ইত্যাপদ্যতে।

অনুবাদ। সেই (পূর্ব্বোক্ত) ন্যায়াভাসে বাদ ও জল্প (বাদ নামক এবং জল্প নামক বক্ষ্যমাণলক্ষণ দ্বিবিধ বিচার) সপ্রয়োজন, অর্থাৎ বাদ ও জল্পের প্রয়োজন সর্ব্বসিদ্ধ। কিন্তু বিতণ্ডাকে (বিতণ্ডা নামক বক্ষ্যমাণলক্ষণ-বিচারকে) পরীক্ষা করিতেছি ;—অর্থাৎ বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকায় বিতণ্ডা সপ্রয়োজন, কি নিষ্প্রয়োজন, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করিতেছি।

বিতণ্ডার দ্বারা প্রবর্ত্তমান ব্যক্তি বৈতণ্ডিক, অর্থাৎ যিনি বিতণ্ডা নামক বিচার করেন, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলে। সেই বৈতণ্ডিক যদি (তাঁহার বিতণ্ডার) প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইটি ইহার পক্ষ, সেইটি ইহার সিদ্ধান্ত, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে (নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর মতে) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ নাই, সুতরাং বিতণ্ডায় স্বপক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, বিতণ্ডা কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডনমাত্র, তাঁহাদিগের মতে যে বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের পক্ষ স্বীকার করেন অর্থাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা নিজেই বলেন, তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না।

আর যদি স্বীকার না করেন অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়াও তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইনি লৌকিকও নহেন, পরীক্ষকও নহেন অর্থাৎ বোদ্ধাও নহেন, বোধয়িতাও নহেন, ইহা আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ যাঁহার স্বপক্ষ নাই, সুতরাং স্বপক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলিলে সভ্য-সমাজে উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষিত হইয়া পড়েন।

টিপ্পনী। সংশয়ের পরে প্রয়োজনের কথাই চলিতেছে। প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সূত্রোক্ত পদার্থগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাষ্যকার বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার কথা তুলিলেন কেন? ভ্রমবশতঃ এখানে এইরূপ একটা গোল উপস্থিত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। ভাষ্যকার প্রয়োজন ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়াছেন যে, সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব বিদ্যা প্রয়োজনব্যাপ্ত, অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন কিছুই নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের পূর্ব্বে বা সমকালে এক সম্প্রদায় বিতণ্ডাকে নিষ্প্রয়োজন বলিতেন। যদি বিতণ্ডা বস্তুতঃ নিষ্প্রয়োজনই হয়, তাহা হইলে সমস্তই সপ্রয়োজন—ভাষ্যকারের এই পূর্ব্বকথা মিথ্যা হয়। এ জন্য ভাষ্যকার এখানে বিতণ্ডার নিষ্প্রয়োজনত্ব পক্ষের অসম্ভব দেখাইয়া তাঁহার সপ্রয়োজনত্ব পক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। ফলকথা, "তত্র বাদজল্পৌ" ইত্যাদি ভাষ্য পূর্ব্বোক্ত "প্রয়োজন" ব্যাখ্যারই অঙ্গ। বাদ ও জল্পের প্রয়োজন পরীক্ষা না করিয়া বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা কেন? এই প্রশ্ন নিরাসের জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব সর্ব্বসম্মত, তদ্বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ আছে, সুতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় নিবৃত্তির জন্য তাহার পরীক্ষা করিতেছি। কেবল তত্ত্ব জিজ্ঞাসাবশতঃ গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, তাহার নাম বাদ। জিগীষাবশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপনাদি করিয়া যে বিচার করেন, তাহার নাম জল্প। জিগীষু আত্মপক্ষের সংস্থাপন না করিয়া কেবল পরপক্ষ সংস্থাপনের খণ্ডন করিলে, সেই বিচারের নাম বিতণ্ডা। যথাস্থানে ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিতণ্ডায় যখন বৈতণ্ডিকের আত্মপক্ষের সংস্থাপন নাই, তখন বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষই নাই, পক্ষ থাকিলে বৈতণ্ডিক অবশ্য তাহার স্থাপনা করিতেন। যাহার স্থাপন করা হয় না, তাহাকে পক্ষ বলা যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই, বিতণ্ডা কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন মাত্র। বৈতণ্ডিকের যদি স্বপক্ষ না থাকে, তাহা হইলে বিতণ্ডার স্বপক্ষ-সিদ্ধিরূপ প্রয়োজন অসম্ভব। তত্ত্ব-নির্ণয় বিতণ্ডার প্রয়োজন হইতে পারে না। কারণ, তত্ত্ব নির্ণয় উদ্দেশ্যে বিতণ্ডা করা হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত। বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ না থাকিলে পর-পরাজয়ও বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, স্বপক্ষ রক্ষার জন্যই পর-পরাজয় আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তাহা করিতে হয়; নিরর্থক বিদ্বেষ-বশতঃ পরপরাজয় বিচারকের প্রয়োজন বলিয়া সভ্য-সমাজ কোন দিনই অনুমোদন করেন না। কেহ নিজের কোন মতসিদ্ধি উদ্দেশ্য না রাখিয়া কেবল পর-পরাজয় বা তর্ক-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি বা প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য বিচার করিলে মধ্যস্থগণ "এ নিরর্থক বিচার," এই কথাই বলিয়া

থাকেন। সুতরাং যিনি বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষই নাই বলেন, তিনি বাধ্য হইয়া বিতণ্ডাকে নিষ্প্রয়োজন বলিবেন, প্রাচীন কালে এক সম্প্রদায় তাহাই বলিতেন, এ কথা উদ্যোতকরও লিখিয়া গিয়াছেন।

আবার বিতণ্ডা শব্দের ("বিতণ্ড্যতে ব্যাহন্যতে পরপক্ষসাধনমনয়া" এইরূপ) ব্যুৎপত্তি চিন্তা করিলে বিতণ্ডা শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, পরপক্ষ সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বৈতণ্ডিকের বিতণ্ডার প্রয়োজন। এইরূপ অন্যান্য যুক্তিতে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা অন্য সম্প্রদায় বলিতেন। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবশতঃ বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব সন্দিগ্ধ। এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে"। বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্বে কোন বিবাদ নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষার আবশ্যকতা হয় না। বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশয় বুঝিয়া ভাষ্যকার এখানে তাহার পরীক্ষা করিয়া সপ্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এখানে তাহা না করিলে অর্থাৎ বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন নহে, ইহা প্রতিপন্ন না করিলে, সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্ববিদ্যা সপ্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজন কিছুই নাই, তাঁহার এই পূর্ব্বকথায় আপত্তি থাকিয়া যায়—মধ্যস্থগণের সংশয় থাকিয়া যায়।

ভাষ্যের প্রথমে "তত্র" এই কথার ব্যাখ্যায় উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—"তস্মিন্ ন্যায়াভাসে"। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অব্যবহিত পূর্ব্বে ন্যায়াভাসের কথা থাকাতেই বার্ত্তিককার ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্যায়েও বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন। বাদ ও জল্প স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর একজনের ন্যায়াভাস হইবেই। কারণ, পরস্পর-বিরুদ্ধ দুইটি পদার্থ একই আধারে কখনই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং উভয় বাদীর স্থাপনার মধ্যে একটি হইবে ন্যায়, একটি হইবে ন্যায়াভাস ; সুতরাং ন্যায়াভাসে বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন, ইহা বলিলে, ন্যায়েও বাদ ও জল্পকে সপ্রয়োজন বলা হয়। তাহা হইলে উদ্যোতকরের ঐ ব্যাখ্যায় ফলতঃ কোন দোষও হয় নাই।

যাঁহারা বিতণ্ডাকে নিষ্প্রয়োজন বলিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে, বিতণ্ডা শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারাও স্বপক্ষসিদ্ধি বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিলেই স্বপক্ষসিদ্ধি হয় না। কেহ ধূম হেতুর দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নি সাধন করিতে গেলে যদি প্রতিবাদী পর্ব্বতে ধূম নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষ অর্থাৎ পর্ব্বতে বহ্নির অভাব তাহাতে সিদ্ধ হয় না। কারণ, ধূম না থাকিলেও পর্ব্বতে বহ্নি থাকিতে পারে। এইরূপ এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তির দ্বারা যাঁহারা বিতণ্ডার নিষ্প্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিতেন, তাৎপর্য্যটীকাকার তাঁহাদিগকে "নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী"—এইরূপ আখ্যার দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত আছে, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর মতে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। কারণ, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই ; সুতরাং বিতণ্ডার স্বপক্ষ-

সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই ত তাঁহাদিগের মত। বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষহীন বিচারকেই তাঁহারা বিতণ্ডা বলেন, সুতরাং যে বৈতণ্ডিক স্বপক্ষ স্বীকার করেন, তিনি আর তাঁহাদিগের মতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না। যদি বল, তিনি ত অবশ্যই বৈতণ্ডিক হইবেন না, স্বপক্ষ থাকিলে কি আর তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলা যায়? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বৈতণ্ডিক হইবেন কে? যিনি স্বপক্ষ স্বীকার করেন না, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহার স্বপক্ষ না থাকিলে তিনি নিরর্থক বাক্যবিন্যাস করিবেন কেন? যিনি তাহা করেন, তাঁহাকে বোদ্ধা বা বোধয়িতা কিছুই বলা যায় না। যিনি নিষ্প্রয়োজনে কথা বলেন, তাঁহাকে কোন বিচারকের সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে না, তিনি সভ্য-সমাজে উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৈতণ্ডিকগণ যখন ঐরূপে উপেক্ষিত নহেন, তাঁহারা বিচারকের আসনে বসিয়া সসম্মানে বিচার করিয়া থাকেন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাঁহারা নিষ্প্রয়োজনে কথা বলেন না, তাঁহাদিগের গূঢ়ভাবে স্বপক্ষ আছেই, ঐ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন এবং সেই স্বপক্ষ রক্ষার জন্যই তাঁহাদিগের পরপরাজয় প্রয়োজন। স্বপক্ষ-সিদ্ধি হউক বা না হউক, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই বৈতণ্ডিক কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডনই করেন, স্বপক্ষের সাধন অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা নিজসিদ্ধান্তটির সংস্থাপন করেন না। সংস্থাপন না করিলে তাহাকে স্বপক্ষ বলা যায় না—এ কথা নির্যুক্তিক; সংস্থাপন না করিলেও যাহা সংস্থাপনের যোগ্য, তাহা স্বপক্ষ হইতে পারে। সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কি কোন বাদীর পক্ষটিকে তাঁহার স্বপক্ষ বলা হয় না? মূল কথা, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, স্বপক্ষ-সিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন নহে। যাঁহারা বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ নাই বলিতেন, উদ্যোতকরও তাঁহাদিগের মতের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—

"ন দূষণমাত্রং বিতণ্ডা, কিন্তু অভ্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি স বৈতণ্ডিক উচ্যতে"।

ভাষ্যে "সোঽস্য সিদ্ধান্তঃ" এই অংশ "সোঽস্য পক্ষঃ" এই পূর্ব্বকথারই বিবরণ। অর্থাৎ ঐ স্থলে "পক্ষ" শব্দের দ্বারা সিদ্ধান্তই অভিপ্রেত।

ভাষ্য। অথাপি পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রয়োজনং ব্রবীতি, এতদপি তাদৃগেব। যো জ্ঞাপয়তি যো জানাতি, যেন জ্ঞাপ্যতে যচ্চ, প্রতিপদ্যতে যদি, তদা বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপদ্যতে, পরপক্ষপ্রতিষেধ-জ্ঞাপনং প্রয়োজনমিত্যেতদস্য বাক্যমনর্থকং ভবতি।

বাক্যসমূহশ্চ স্থাপনাহীনো বিতণ্ডা, তস্য যদ্যভিধেয়ং প্রতিপদ্যতে সোঽস্য পক্ষঃ স্থাপনীয়ো ভবতি, অথ ন প্রতিপদ্যতে প্রলাপমাত্রমনর্থকং ভবতি বিতণ্ডাত্বং নিবর্ত্তত ইতি।

অনুবাদ। আর যদি (বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া) পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনকে অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের দোষ প্রদর্শনকে প্রয়োজন বলেন, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার দোষ অপরিহার্য্য। (কেন, তাহা বুঝাইতেছেন) যিনি বুঝাইবেন, যিনি বুঝিবেন, যাঁহার দ্বারা বুঝাইবেন (এবং) যাহা বুঝাইবেন অর্থাৎ জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি যদি স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে (সেই শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ ঐগুলি স্বীকার করিলে তিনি স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া বসিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজ মতানুসারে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে আর বৈতণ্ডিক বলা গেল না।

আর যদি (তিনি পূর্ব্বোক্ত চারিটি) স্বীকার না করেন, (তাহা হইলে) ইহার অর্থাৎ শূন্যবাদী বৈতণ্ডিকের 'পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপন প্রয়োজন,' এই কথা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ শূন্যবাদী যদি কিছুই না মানেন, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপন করিবেন কিরূপে ? তিনি যে 'প্রতিষেধ' বলিয়া কোন পদার্থও মানেন না, তবে তিনি কিসের জ্ঞাপন করিবেন ? যাহা নাই, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শূন্যবাদীর ঐ কথা কেবল কথামাত্র, তাঁহার নিজ মতে ঐ কথার কোন অর্থ হয় না—উহা অনর্থক।

পরন্তু স্থাপনাহীন অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপনশূন্য বাক্যসমূহ "বিতণ্ডা"। (শূন্যবাদী) যদি সেই বিতণ্ডা-বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করেন, (তাহা হইলে) সেই প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহার (শূন্যবাদীর) "পক্ষ" অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হওয়ায় স্থাপনীয় হয়। অর্থাৎ বিতণ্ডাবাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ বা নিজ সিদ্ধান্ত বলিতেই হইবে। প্রতিবাদী তাহা না মানিলে বৈতণ্ডিককে তাহার সংস্থাপনও করিতে হইবে, সুতরাং শূন্যবাদী তাঁহার বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করিলে স্বপক্ষ স্বীকার করায় তাঁহার নিজের মতে তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না।

আর যদি (তিনি বিতণ্ডা-বাক্যের প্রতিপাদ্য) স্বীকার না করেন, (তাহা হইলে তাঁহার কথা) প্রলাপমাত্র অনর্থক হয়, (তাঁহার কথাগুলির) বিতণ্ডাত্ব নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাহার কোন প্রতিপাদ্যই নাই, তাহা বাক্যই হয় না, বাক্য না হইলেও তাহা বিতণ্ডা হইতে পারে না, প্রতিপাদ্যহীন কথা প্রলাপমাত্র, তাহার কোন অর্থ নাই।

টিপ্পনী। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শূন্যবাদী নামে এক সম্প্রদায় ছিলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে মাধ্যমিক শূন্যবাদের উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং উহাই বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত বলিয়া পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। বুদ্ধদেবের শূন্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম যাহাই হউক, ভট্ট কুমারিল, বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধমতবিধ্বংসী আচার্য্য-গণ মাধ্যমিকের শূন্যবাদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহাকে প্রমেয় বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ নাই। কারণ, কোন পদার্থকেই সৎ বলা যায় না। কারণ, যদি সৎ হইত, তাহা হইলে চিরকালই থাকিত, একরূপই থাকিত। আবার অসৎও বলা যায় না, কারণ, প্রতীতি হইতেছে, অসতের প্রতীতি হইতে পারে না। আবার সৎও বটে, অসৎও বটে—ইহাও অর্থাৎ সৎ ও অসৎ এই উভয় প্রকারও বলা যায় না। কারণ, ঐ উভয় রূপ বিরুদ্ধ। সৎ হইলে তাহা অসৎ হইতে পারে না, অসৎ হইলেও সৎ হইতে পারে না। আবার সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার, ইহাও বলা যায় না। কারণ, সৎ না হইলে অসৎ হইবে, অসৎ না হইলে সৎ হইবে। সৎও নহে, অসৎও নহে—এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রতীতিও হইতে পারিত না। ফলতঃ এই চতুর্ব্বিধ প্রকারই বিচারসহ নহে। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকারও নাই। সুতরাং যখন অপর সম্প্রদায়-সম্মত প্রমেয় সর্ব্বপ্রকারেই বিচারসহ নহে অর্থাৎ বিচারে টিকে না, তখন প্রমেয় নাই। এতাদৃশ শূন্যবাদীর কোন পক্ষও নাই, স্থাপনাও নাই। কারণ, তিনি কিছুই মানেন নাই, তিনি পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপনের জন্যই বিচার করিয়াছেন। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা ভিন্ন আর কোনরূপ বিচার অন্য সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। কেহ বিচার করিতে আসিলে এই ত্রিবিধ বিচারের কোন বিচারই করিতে হইবে, নচেৎ প্রাচীন কালে বিচার গ্রাহ্য হইত না। সুতরাং শূন্যবাদী নিজেকে বৈতণ্ডিক বলিয়া পরিচয় দিয়াই বিচার করিতে আসিতেন এবং স্বপক্ষহীন বিচারকেই বিতণ্ডা বলিতেন। বিতণ্ডায় স্বপক্ষ থাকা প্রয়োজন হইলে, শূন্যবাদীর বিচার বিতণ্ডা হইতে পারে না, বাদ ও জল্প হওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। এ জন্য শূন্যবাদী অন্য সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতণ্ডিকরূপে গৃহীত হইবার জন্য বিতণ্ডার লক্ষণ ঐরূপই প্রতিপন্ন করিতেন। মহর্ষি গোতমের বিতণ্ডা-লক্ষণসূত্রেও স্থাপনা শব্দ নিরর্থক বলিতেন। (১ অঃ, ২আঃ, ৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ফলকথা, শূন্যবাদী বলিতেন যে, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই, সুতরাং স্বপক্ষ-সিদ্ধি বিতণ্ডার প্রয়োজন হইতেই পারে না। তবে নিষ্প্রয়োজন কিছুই নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করি; পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন। পরের পক্ষটি প্রতিষিদ্ধ, পর-পক্ষের সাধন দূষিত, ইহা পরকে এবং মধ্যস্থদিগকে বুঝানই বৈতণ্ডিকের উদ্দেশ্য।

ভাষ্যকার এই শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ কথা ঠিক পূর্ব্বের কথা না হইলেও সেইরূপই হইয়াছে। কারণ, শূন্যবাদী যদি পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপনের জন্য বিতণ্ডা করেন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি

এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি মানিবেন কি না ? তাহা মানিলে ঐগুলি তাঁহার স্বপক্ষ বা স্বসিদ্ধান্ত-রূপে গণ্য হইল, পরপক্ষ-প্রতিষেধ যাহা তাঁহার জ্ঞাপ্য, তাহা জানাইতে আর যাহা আবশ্যক, তাহাও স্বসিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত হওয়ায় পক্ষমধ্যে গণ্য হইল ; সুতরাং তিনি তাঁহার নিজমতে বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন। "বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন" বলিতে তাঁহাতে তাঁহার নিজসম্মত বৈতণ্ডিকের লক্ষণ থাকিল না ; কারণ, বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ থাকিলে শূন্যবাদী তাহাকে ত বৈতণ্ডিক বলেন না, তিনি নিজে স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া বসিলে আর বৈতণ্ডিক হইবেন কিরূপে ? এবং তাঁহার শূন্যবাদই বা থাকিবে কিরূপে ?

আর যদি শূন্যবাদী পূর্ব্বোক্ত দোষ-ভয়ে বলেন যে, আমি জ্ঞাপক প্রভৃতি স্বীকার করি না, আমি কিছুই মানি না, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপনই তাঁহার প্রয়োজন, এ কথা তিনি বলিতে পারেন না, ঐ কথা উন্মত্তপ্রলাপ হইয়া পড়ে। কারণ, প্রথমতঃ কোন বাদী বৈতণ্ডিকের নিকটে 'এই সাধ্য, এই পঞ্চাবয়ব বাক্যের দ্বারা আমি জ্ঞাপন করিতেছি,' এই ভাবে জ্ঞাপন করিলে, বৈতণ্ডিক সেই জ্ঞাপক ব্যক্তি এবং তাঁহার জ্ঞাপ্য পদার্থ এবং জ্ঞাপনের সাধন পঞ্চাবয়ব প্রভৃতি বুঝিয়াই তাহার খণ্ডন করিয়া থাকেন। বৈতণ্ডিক সেখানে ঐগুলি না বুঝিলে অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা না হইলে পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপন তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে না। আবার তাঁহার নিজের জ্ঞাপ্য যে পরপক্ষ-প্রতিষেধ, তাহাও যদি তিনি না মানেন, তবে তিনি কিসের জ্ঞাপন করিবেন ? যাহা নাই, তাহার কি জ্ঞাপন হইতে পারে ? এবং জ্ঞাপক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাপনের সাধন না থাকিলে কি কিছুর জ্ঞাপন হইতে পারে ? ফলতঃ যিনি ঐ সমস্ত কিছুই মানেন না, তিনি পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপন আমার প্রয়োজন, ইহা কখনই বলিতে পারেন না, তাঁহার ঐ কথার কোন অর্থ নাই—উহা অনর্থক। বিপক্ষের সম্মত জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্থ অবলম্বন করিয়া বিপক্ষের মতানুসারেও তিনি বিপক্ষকে কিছু জ্ঞাপন করিতে পারেন না। কারণ, বিপক্ষ যাহাকে প্রমাণ বলেন, শূন্যবাদী তাহা অবলম্বন করেন না। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া বিপক্ষের নিকটে উল্লেখ করেন, বিপক্ষ তাহা প্রমাণ বলেন না, তাহা মানেন না, তিনি নিজেও তাহা মানেন না। অন্ততঃ পরপক্ষ-প্রতিষেধ—যাহা তাঁহার জ্ঞাপনীয়, যাহার জ্ঞাপন তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার বিপক্ষের অসম্মত পদার্থ, তিনিও তাহাকে একটা পদার্থ বলিয়া মানেন না, তিনি যে শূন্যবাদী, তিনি যে কোন পদার্থই মানেন না, সুতরাং যাহা বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয় পক্ষেরই অসম্মত অর্থাৎ যাহা কেহই মানেন না, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে পারে না। সুতরাং পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এ কথা শূন্যবাদী কিছুতেই বলিতে পারেন না ; তিনি ঐরূপ বলিলে উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষিত হইবেন ; সুতরাং তাঁহার স্বপক্ষ স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, নীরব থাকিতে হইবে।

ফলতঃ শূন্যবাদীর বিচার করিতে হইলে তাঁহার জ্ঞাপনীয় পদার্থ তাঁহাকে মানিতেই হইবে, সুতরাং ঐটি তাঁহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে এবং জ্ঞাপনের জন্য জ্ঞাপক প্রভৃতি

পদার্থও যাহা যাহা আবশ্যক, সেগুলিও তাঁহার সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইবে। তাহা হইলে বিতণ্ডায় স্বপক্ষ স্বীকার করিতে হইল এবং ঐ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই পরিশেষে বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহাও আসিয়া পড়িল। সুতরাং শূন্যবাদীর নিজ মত টিকিল না, তিনি তাঁহার মতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিলেন না। তাহা হইলে শূন্যবাদীর কথাও পূর্ব্বের ন্যায়ই হইল, শূন্যবাদী বিতণ্ডার প্রয়োজন স্বীকার করায় পূর্ব্বোক্ত "নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী"র মতের সহিত তাঁহার মত ঠিক এক না হইলেও ফলে উহা একরূপই হইল। কারণ, তাঁহার মতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অপরিহার্য্য, তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন--"এতদপি তাদৃগেব"।

শূন্যবাদী বৈতণ্ডিককে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার আরও একটি দোষ বলিয়াছেন যে, শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক তাঁহার বিতণ্ডা নামক বাক্যসমূহের অবশ্য প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। কারণ, প্রতিপাদ্যহীন উক্তি প্রলাপমাত্র, উহা বাক্যই হয় না, সুতরাং বিতণ্ডা হইতে পারে না। যে উক্তির কোন প্রতিপাদ্যই নাই, তাহা প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইবে? উহা অনর্থক, শূন্যবাদী ঐরূপ প্রলাপ বলিলে তাহা কেহ শুনিবে না, সভ্য-সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে না। সুতরাং শূন্যবাদী তাঁহার বিতণ্ডাবাক্যের অবশ্য প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। শূন্যবাদী বিতণ্ডাবাক্যের দ্বারা তাঁহার বিপক্ষের হেতুকে অসিদ্ধ, অব্যভিচারী, অথবা বিরুদ্ধ—ইত্যাদিরূপে দুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, সুতরাং বিপক্ষের হেতুর অসিদ্ধত্ব প্রভৃতি দোষই শূন্যবাদীর বাক্যের প্রতিপাদ্য। তিনি ঐ প্রতিপাদ্য স্বীকার করিলে ঐগুলি তাঁহার স্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে, এবং বিতণ্ডা-বাক্যের দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিলে ফলতঃ উহার সংস্থাপন করাই হইবে, এবং অসিদ্ধত্ব প্রভৃতি যে হেতুর দোষ, ইহাও তাঁহাকে মানিতে হইবে, এবং তাহাও প্রমাণাদির দ্বারা সাধন করিতে হইলে স্বপক্ষের স্থাপনা আসিয়া পড়িবে। ফলতঃ যে ভাবেই হউক, স্বপক্ষের স্বীকার এবং সংস্থাপন আসিয়া পড়ায় শূন্যবাদীর বিচার বিতণ্ডা হইতে পারে না, শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না; সুতরাং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বিতণ্ডায় বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ-স্বীকার আছে। কিন্তু বৈতণ্ডিক বিচারস্থলে প্রমাণাদির দ্বারা তাহার সংস্থাপন করেন না, তিনি কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডনই করেন। ফলে স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক বা না হউক, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই তিনি কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করেন। পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই ঐ বিতণ্ডার প্রয়োজন। মূলকথা, বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন নহে, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্ববিদ্যা প্রয়োজন-ব্যাপ্ত, এই পূর্ব্বকথা ঠিকই বলা হইয়াছে।

বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষায় স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য শেষে ভাষ্যকার শূন্যবাদীর কথাও তুলিয়াছেন। কারণ, শূন্যবাদী স্বপক্ষ-সিদ্ধিকে বিতণ্ডার প্রয়োজন বলেন নাই, তাঁহার মত খণ্ডন না করিলে ভাষ্যকারের বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, স্বপক্ষসিদ্ধিই যে বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তে শূন্যবাদীর প্রতিবাদ থাকিয়া যায়, তাই পরে শূন্যবাদীর মতানুসারে তাঁহার বিচারের বিতণ্ডাত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বে

প্রমাণাদিপদার্থবাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা নিষ্প্রয়োজন-বিতণ্ডাবাদী ছিলেন, তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র প্রকাশ-টীকাকার বর্দ্ধমান এই কথা স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাতেও সেই ভাবই পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের ভাবেও ইহা বুঝা যায়। উদ্যোতকর এবং উদয়নের সন্দর্ভের দ্বারা একই শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার সব কথা বলিয়াছেন, ইহাও মনে আসে। সুধীগণ ঐ সকল গ্রন্থের সর্ব্বাংশ দেখিয়া ইহার সমালোচনা করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সন্দর্ভের ন্যায় ঐ সকল গ্রন্থ-সন্দর্ভও অতি দুরূহ ভাবগর্ভ, বহু পরিশ্রম ও বহু চিন্তা করিয়া তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে।

ভাষ্যে 'যেন জ্ঞাপ্যতে যচ্চ'—এই স্থলে 'যচ্চ' এই কথার 'জ্ঞাপ্যতে' এই কথার সহিতই যোজনা বুঝিতে হইবে। সর্ব্বত্র "যৎ" শব্দের প্রয়োগ থাকায় শেষে "তৎ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া "তানি প্রতিপদ্যতে যদি" এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে। "প্রতি"পূর্ব্বক "পদ" ধাতুর অর্থ এখানে স্বীকার। এখানে অনেক পাঠান্তরও দেখা যায়। অনেক পুস্তকে 'যচ্চ জ্ঞাপ্যতে, এতচ্চ প্রতিপদ্যতে যদি', এইরূপ পাঠ আছে। এ পাঠে সহজেই অর্থ বোধ হয়। ভাষ্যের শেষ-বর্ত্তী 'ইতি' শব্দটি 'প্রয়োজন' পদার্থ ব্যাখ্যার সমাপ্তিসূচক। এইরূপ বাক্যসমাপ্তি সূচনার জন্যও ভাষ্যকার প্রায় সর্ব্বত্র 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এগুলি অনুবাদে গৃহীত হইবে না।

ভাষ্য। **অথ দৃষ্টান্তঃ, প্রত্যক্ষবিষয়োঽর্থো দৃষ্টান্তঃ, যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাণাং দর্শনং ন ব্যাহন্যতে। স চ প্রমেয়ং, তস্য পৃথগ্‌বচনঞ্চ—তদাশ্রয়াবনুমানাগমৌ, তস্মিন্ সতি স্যাতামনুমানাগমাবসতি চ ন স্যাতাং। তদাশ্রয়া চ ন্যায়প্রবৃত্তিঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন চ পরপক্ষপ্রতিষেধো বচনীয়ো ভবতি, দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষঃ সাধনীয়ো ভবতি। নাস্তিকশ্চ দৃষ্টান্ত-মভ্যুপগচ্ছন্নাস্তিকত্বং জহাতি, অনভ্যুপগচ্ছন্ কিং সাধনঃ পরমুপালভে-তেতি। নিরুক্তেন চ দৃষ্টান্তেন শক্যমভিধাতুং 'সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং,' 'তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীত'মিতি।**

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্ত, প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে—যে পদার্থে লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের জ্ঞান অব্যাহত হয় অর্থাৎ যে পদার্থে বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, (তাহা দৃষ্টান্ত)। তাহাও প্রমেয়, সেই দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, অনুমান-প্রমাণ ও শব্দপ্রমাণ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত

তাহাদিগের নিমিত্ত। বিশদার্থ এই যে—সেই দৃষ্টান্ত থাকিলে অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ থাকিতে পারে, না থাকিলে থাকিতে পারে না, এবং ন্যায়প্রবৃত্তি অর্থাৎ পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ ন্যায়ের প্রকাশ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত তাহার মূল। এবং দৃষ্টান্তের বিরোধের দ্বারা পরপক্ষ-প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের প্রতিষেধ বচনায় হয় অর্থাৎ বলিতে পারা যায় অথবা দূষিত করিতে পারা যায়, এবং দৃষ্টান্তের সমাধির দ্বারা অর্থাৎ অবিরোধের দ্বারা স্বপক্ষ সাধনীয় হয়, (সাধন করা যায়) এবং নাস্তিক অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় যাঁহারা পদার্থ-মাত্রকেই যে ক্ষণে উৎপন্ন, তাহার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয় বলেন, তাঁহারা দৃষ্টান্ত স্বীকার করিলেই নাস্তিকত্ব ত্যাগ করেন অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট কোন পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলেই এবং সে জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই তাঁহাদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ ত্যাগ করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বীকার না করিলে (নাস্তিক) কোন্ সাধনবিশিষ্ট হইয়া পরকে অর্থাৎ পরপক্ষের সাধনকে প্রতি-ষেধ করিবেন ?

এবং নিরুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার লক্ষণ বলিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা (মহর্ষি) "সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং," "তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং" (এই দুইটি সূত্র ১অঃ, ৩৬।৩৭) বলিতে পারিবেন, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলে মহর্ষি পরে যে উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, দৃষ্টান্ত না বুঝিলে সে লক্ষণ বুঝা যায় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহার পৃথক্ উল্লেখের কারণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ-দৃষ্টান্ত—ভাষ্যকারের এই প্রথম কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, দৃষ্টান্তবিষয়ে মূল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ, দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক, এই জন্যই উহার নাম দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষ পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহা উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে না। কারণ, অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থকেও মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও শেষে বলিয়াছেন যে, 'প্রত্যক্ষমূলত্বাদ্বা প্রত্যক্ষো দৃষ্টান্তঃ'। দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যক্ষ স্থলে যেমন দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ দৃষ্টান্তেরও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের ন্যায় নির্ব্বিবাদ; সেরূপ না হইলে তাহা দৃষ্টান্তই হয় না; এই সকল কথা সূচনার জন্যই ভাষ্যকার প্রথমে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন এবং উহারই ফলিতার্থ বর্ণনপূর্ব্বক শেষে মহর্ষি সূত্রানুসারে দৃষ্টান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ নহেন, প্রাচীনগণ তাঁহাকে সেই বিষয়ে বলিতেন 'লৌকিক'। যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ, তাঁহাকে সেই

বিষয়ে বলিতেন 'পরীক্ষক'। যিনি বস্তু বিচারপূর্ব্বক অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনিই ত পরীক্ষক। আর যিনি পরীক্ষকের নিকট হইতে বুঝেন, তিনিই লৌকিক। ফলকথা, লৌকিক বলিতে বোদ্ধা, পরীক্ষক বলিতে বোধয়িতা। এক পক্ষ লৌকিক, অপর পক্ষ পরীক্ষক—এই উভয় ব্যক্তির যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হইবে, তাহাই দৃষ্টান্ত পদার্থ, ইহাই সূত্রকারের তাৎপর্য্যার্থ নহে। কারণ, অনেক পণ্ডিতমাত্র-বেদ্য পদার্থকেও (মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য, পরমাণুর শ্যামরূপের অনিত্যতা প্রভৃতি) সূত্রকার মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল পদার্থ যিনি বুঝেন, তাহাতে যাঁহার বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে লৌকিক বলা যায় না। ঐ সকল পদার্থ কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কোন স্থলে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের এবং কোন স্থলে কেবল লৌকিকদিগের এবং কোন স্থলে পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থ বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির অবিরোধের হেতু অর্থাৎ যে পদার্থের উল্লেখ করিলে উভয় পক্ষের মত-বৈষম্য যাইয়া মতের সাম্যই উপস্থিত হইতে পারে, এইরূপ পদার্থ 'দৃষ্টান্ত। এইরূপ পদার্থমাত্রই দৃষ্টান্ত—ইহা বুঝিতে হইবে না, দৃষ্টান্ত হইলে তাহা এইরূপই হইবে, ঐরূপ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। (দৃষ্টান্ত-সূত্র দ্রষ্টব্য)।

এই দৃষ্টান্ত পদার্থকে ভাষ্যকার প্রমেয় বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত প্রমেয় কিরূপে? মহর্ষি-কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা যায় না? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। মনে হয়, উদ্যোতকর ইহা মনে করিয়াই এখানে বলিয়াছেন—'সোঽয়ং দৃষ্টান্তঃ প্রমেয়মুপলব্ধি-বিষয়ত্বাৎ'। উদ্যোতকরের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর্ষি গোতম তাঁহার পরিভাষিত আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয়ের মধ্যে যখন বুদ্ধি বা উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ বুদ্ধির বিষয় পদার্থমাত্রই সামান্য প্রমেয় বলিয়া তাঁহারও সম্মত। যাহা প্রমাণ-জন্য উপলব্ধির বিষয়, সামান্যতঃ তাহাকেই প্রমেয় বলা হয়। মহর্ষি বিশেষ কারণে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিলেও সামান্য প্রমেয় আরও অসংখ্য আছে, সেগুলিকে তিনিও প্রমেয় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। উদ্যোতকর 'নবমসূত্রভাষ্য-বার্ত্তিকে' এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারও মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয় ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রমেয় পদার্থ আছে, এ কথা বলিয়াছেন (নবম সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখন যদি উপলব্ধির বিষয় পদার্থ বলিয়া দৃষ্টান্ত পদার্থও মহর্ষি-সম্মত প্রমেয় হয় এবং মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যেও অনেক দৃষ্টান্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত পদার্থের আর পৃথক্ উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন? এতদুত্তরেই ভাষ্যকার দৃষ্টান্তস্বরূপে দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন। সমস্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ মহর্ষির পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যেই আছে; সুতরাং উহা প্রমেয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নহে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও তাহা বুঝা যায় না। তাহা

হইলে উদ্যোতকর দৃষ্টান্তের প্রমেয়ত্ববিষয়ে উপলব্ধিবিষয়ত্বকে হেতু বলিতে যাইবেন কেন? বস্তুতঃ সুখাদি 'প্রয়োজন' এবং অনেক 'দৃষ্টান্ত', 'সিদ্ধান্ত' ও 'হেত্বাভাস' মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যে নাই, সুতরাং মহর্ষি-কথিত বিশেষ প্রমেয়গুলিতেই সংশয়াদি সকল পদার্থ অন্তর্ভূত আছে, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যেই সে সকল পদার্থ আছে, উহাদিগকে বলাতেই সংশয়াদি সমস্ত পদার্থ বলা হইয়াছে, এ কথা ভাষ্যকার বলিতে পারেন না। কিন্তু ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শনকালে বলিয়া আসিয়াছেন যে, 'সংশয়াদি পদার্থগুলি যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয়-সমূহে অন্তর্ভূত থাকায় উহারা অতিরিক্ত পদার্থ নহে,' সুতরাং বুঝিতে হইবে, ভাষ্যকার সেখানে মহর্ষি-কথিত বিশেষ প্রমেয়গুলিকেই কেবল লক্ষ্য করেন নাই, মহর্ষির সম্মত উপলব্ধির বিষয় সামান্য প্রমেয়গুলিকেও তিনি সেখানে প্রমেয় শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়, সেই জন্যই ভাষ্যকার সেখানে 'প্রমেয়েষু' এইরূপ বহুবচনান্ত "প্রমেয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষির পরিভাষিত বিশেষ প্রমেয়গুলিই তাঁহার ঐ প্রমেয় শব্দের প্রতিপাদ্য হইলে তিনি একবচনান্ত প্রমেয় শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন। মহর্ষি প্রমেয়সূত্রে (নবম সূত্রে) একবচনান্ত প্রমেয় শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, তদনুসারে ভাষ্যকারও সেইরূপ করেন নাই কেন? ইহাও ভাবিতে হইবে। ভাষ্যকার মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়বিশেষে অন্তর্ভাবের কথা বলিতে অন্যত্র একবচনান্ত প্রমেয় শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তকে প্রমেয় বলিতে একবচনান্ত প্রমেয় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সে সব স্থলে তাহাই করিতে হইবে। সামান্য প্রমেয় বলিয়া বুঝাইতেও ক্লীবলিঙ্গ একবচনান্ত প্রমেয় শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হয়। অবশ্য একবচন বহুবচনাদি প্রয়োগের দ্বারা সর্ব্বত্র বক্তার তাৎপর্য্য নির্ণয় না হইলেও ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত 'প্রমেয়েষু' এই স্থলে বহুবচনের দ্বারা সামান্য, বিশেষ সর্ব্ববিধ প্রমেয়ই ভাষ্যকারের ঐ স্থলে প্রমেয় শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহা বুঝিতে পারি; তাহাতে বহুবচনের প্রকৃত সার্থকতাও হয়। তবে ঐরূপ বুঝিবার পক্ষে প্রকৃত কারণ এই যে, সংশয়াদি পদার্থগুলি প্রত্যেকেই মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যে নাই; সুতরাং ভাষ্যকার তাহা বলিতে পারেন না। যেগুলি ঐ প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হয় নাই, তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ কর্ত্তব্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে অন্য কারণ প্রদর্শন সঙ্গত হয় না। আর যদি পূর্ব্বপক্ষ ভাষ্যে বহুবচনান্ত প্রমেয় শব্দের দ্বারা মহর্ষির কণ্ঠোক্ত বিশেষ প্রমেয়গুলি এবং বুদ্ধিরূপ প্রমেয়ের বিষয় বলিয়া সূচিত স্বীকৃত সামান্য প্রমেয়গুলিকে ভাষ্যকার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সংশয়াদি পদার্থগুলি সমস্তই যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তর্ভূত, এ কথা বলিতে পারেন, অর্থাৎ তাহা হইলে সংশয়াদি পদার্থের কতকগুলি বিশেষ প্রমেয়ে এবং কতকগুলি সামান্য প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হওয়ায় উহারা প্রমেয়সমূহে অন্তর্ভূত, এ কথা বলা যায়। মনে হয়, এই তাৎপর্য্যেও ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন—"যথাসম্ভবম্"। অর্থাৎ যে প্রকারে অন্তর্ভাব সম্ভব হয়, সেই প্রকারেই অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। এবং সামান্য প্রমেয়ে

অন্তর্ভূত দৃষ্টান্তাদির পক্ষে পৃথক্ উল্লেখ বলিতে বুঝিতে হইবে—বিশেষ করিয়া উল্লেখ। অর্থাৎ সেগুলিও যখন সামান্য প্রমেয়ের মধ্যে স্বীকৃত এবং সূচিত, তখন আবার তাহাদিগের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন ? আরও কত কত সামান্য প্রমেয় আছে, মহর্ষি ত তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই ? ইহাই তাৎপর্য্য।

আরও দেখিতে হইবে, ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তকে কেবল প্রমেয় বলিয়াছেন, প্রমেয়ে অন্তর্ভূত,এরূপ কথা এখানে বলেন নাই। কিন্তু "সংশয়","অবয়ব","তর্ক" প্রভৃতির কথায় সেখানে বলিয়াছেন—প্রমেয়ে অন্তর্ভূত। কারণ, সেগুলি মহর্ষি-কথিত প্রমেয়পদার্থের মধ্যেই আছে, পূর্ব্বে সামান্য প্রমেয় ধরিয়া দৃষ্টান্ত প্রভৃতিকেও প্রমেয়ে অন্তর্ভূত বলিলেও এখানে তত দূর বলেন নাই। দৃষ্টান্তের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রমেয়, কতকগুলি সামান্য প্রমেয়, এই তাৎপর্য্যে দৃষ্টান্তকে কেবল প্রমেয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পদার্থ সংশয়, তর্ক, অবয়ব প্রভৃতির ন্যায় মহর্ষি-কথিত প্রমেয় "পদার্থে" অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিলে ভাষ্যকার সংশয় প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্টান্তকে প্রমেয়ে অন্তর্ভূত, এইরূপ বলেন নাই কেন ? উদ্যোতকরই বা দৃষ্টান্ত, প্রমেয় কেন—ইহা বুঝাইতে 'উপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ' এইরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? সুধীগণ এই সকল কথাগুলি ভাবিয়া ইহার সমালোচনা করিবেন।

দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ উল্লেখ কেন হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার কতকগুলি কারণ বলিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টান্ত অনুমান-প্রমাণের একটা নিমিত্ত, দৃষ্টান্ত ব্যতীত অনুমান-প্রমাণ থাকিতেই পারে না। যে হেতুর দ্বারা যে পদার্থের অনুমান করিতে হইবে, সেই হেতুতে সেই অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্য অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই অনুমেয় পদার্থটি থাকে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার জন্য দৃষ্টান্ত আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হওয়ায় অনুমান হইতে পারে না। এইরূপ শব্দ-প্রমাণেও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয়। কারণ, সর্ব্বপ্রথম কোন শব্দ শ্রবণ করিলেও শাব্দ বোধ হয় না। শাব্দ বোধে শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে দৃষ্টান্ত আবশ্যক। কারণ, লোক সমস্ত পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থকেই অপর ব্যক্তিকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে; সুতরাং পূর্ব্ব বোধানু-সারে দৃষ্টান্তের সাহায্যেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, নচেৎ প্রথম শব্দ শুনিয়াই শাব্দ বোধ হইত। যে শব্দের যে অর্থ যে কোন উপায়ে পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, তদনুসারেই আমরা শব্দ প্রয়োগ করি এবং পূর্ব্বদৃষ্টান্তে পূর্ব্ববৎ তাহার অর্থবোধ করি; সুতরাং দৃষ্টান্ত না থাকিলে শব্দপ্রমাণও থাকিতে পারে না এবং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায় দৃষ্টান্তমূলক, দৃষ্টান্ত ব্যতীত ঐ ন্যায় প্রয়োগ হইতেই পারে না, ন্যায়ের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বাক্য দৃষ্টান্ত ব্যতীত বলা যায় না। ভাষ্যকার প্রথমে অনুমান-প্রমাণকে দৃষ্টান্তমূলক বলিয়াছেন; সুতরাং পরবর্ত্তী ন্যায় শব্দের দ্বারা পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্য-রূপ ন্যায়ই বুঝিতে হইবে। অনুমানরূপ ন্যায়কে পুনরায় দৃষ্টান্তমূলক বলিলে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে, সুতরাং পরবর্ত্তী ন্যায় শব্দ পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ ন্যায় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন। এবং স্বপক্ষ সমর্থন এবং পরপক্ষ সাধনের

প্রতিষেধে অর্থাৎ খণ্ডনে দৃষ্টান্ত নিতান্ত আবশ্যক। এবং দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ক্ষণভঙ্গবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করা যায়। কারণ, ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বস্তু-মাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ এক ক্ষণের অধিক কাল কোন পদার্থই স্থায়ী নহে, সুতরাং তিনি কোন বস্তুকেই দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিতে পারেন না। তিনি যাহাকে দৃষ্টান্ত বলিবেন, তাহা তাঁহার বলিবার পূর্ব্বে বিনষ্ট হওয়ায়, সে পদার্থ তখন আর থাকে না। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলিয়া বুঝান যায় না। দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিলেও ক্ষণভঙ্গবাদী পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত দেখাইতে গেলেও আস্তিকের স্থিরবাদ স্বীকার করিয়া নাস্তিকত্ব ত্যাগ করিতে হয় (১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ফল কথা, দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিতে পারা যায়। তাহাকে নিরস্ত করাও আস্তিকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের আরও একটি হেতু আছে, তাহা অন্য প্রকার ; এ জন্য সেই হেতুটিকে শেষে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই শেষোক্ত হেতুটি এই যে, মহর্ষি ন্যায়ের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্যের যে দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, ঐ লক্ষণ দৃষ্টান্ত-ঘটিত, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত না বুঝিলে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত কি, তাহা মহর্ষির পূর্ব্বে বলিতে হয়, তাহা বলিতে হইলেই দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ করিতে হয়। কারণ, উদ্দেশ ব্যতীত লক্ষণ বলা যায় না, সুতরাং দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার লক্ষণ বলিয়া মহর্ষি উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং বলিতে পারিয়াছেন। ঐ দুইটি লক্ষণ-সূত্র ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাদিগের অর্থ যথাস্থানেই বিবৃত হইবে। কোন পুস্তকে 'নিরুক্তে চ দৃষ্টান্তে', এইরূপ পাঠ আছে। দৃষ্টান্ত নিরুক্ত অর্থাৎ নিরূপিত হইলেই মহর্ষি উক্ত সূত্রদ্বয় বলিতে পারেন, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে ভাষ্যার্থ।

ভাষ্যে 'তস্য পৃথগ্‌বচনঞ্চ',—এই স্থলে 'চ' শব্দের অর্থ হেতু। পৃথক্‌বচনের হেতুগুলি উহার পরেই বলা হইয়াছে। উদয়নের "কুসুমাঞ্জলিকারিকা" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই হেতু অর্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অনেক প্রবীণ টীকাকার "চো হেতৌ" এইরূপ কথা অনেক স্থলে লিখিয়াছেন। এই ভাষ্যে অনেক স্থলে 'চ' শব্দ এবং 'খলু' শব্দ হেতু অর্থে প্রযুক্ত আছে। আবার অবধারণ অর্থেও 'চ' শব্দ, 'খলু' শব্দ অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অব্যয়ের দ্বারা অনেক স্থলে অনেক গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়, সে অর্থগুলি না বুঝিলে বাক্যার্থবোধ ঠিক হয় না। এ জন্য ঐ সকল শব্দের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখানে দৃষ্টান্তের পৃথক্ উল্লেখের হেতু উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার শেষে যে 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐ ইতি শব্দের দ্বারাও হেতু অর্থ বুঝা যাইতে পারে, তাহা বুঝিলেও এখানে ক্ষতি নাই। 'ইতি' শব্দের 'হেতু' অর্থ কোষে কথিত আছে। এবং অনেক স্থানে এই ভাষ্যেও হেতু অর্থে "ইতি" শব্দের প্রয়োগ আছে। তবে শেষবর্ত্তী "ইতি" শব্দ সমাপ্তিসূচকই প্রায় দেখা যায়।

ভাষ্য। অস্ত্যয়মিত্যনুজ্ঞায়মানোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চ প্রমেয়ং, তস্য পৃথগ্‌বচনং সৎসু সিদ্ধান্তভেদেষু বাদজল্পবিতণ্ডাঃ প্রবর্ত্তন্তে নাতোঽন্যথেতি।

অনুবাদ। "এই পদার্থ আছে" এই প্রকারে অর্থাৎ "ইহা" এবং "এইপ্রকার" এইরূপে যে পদার্থ স্বীকার করা হয়, সেই স্বীক্রিয়মাণ পদার্থ "সিদ্ধান্ত"। সেই সিদ্ধান্তও প্রমেয়। সিদ্ধান্তের ভেদগুলি (মহর্ষি-কথিত চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্ত) থাকিলে "বাদ", "জল্প" ও "বিতণ্ডা" প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্যথায় অর্থাৎ সিদ্ধান্তের ভেদগুলি না থাকিলে প্রবৃত্ত হয় না, এই জন্য সেই সিদ্ধান্তের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে।

টিপ্পনী। নিশ্চিত শাস্ত্রার্থকে "সিদ্ধান্ত" বলে। উদ্দ্যোতকর শাস্ত্রার্থনিশ্চয়কে "সিদ্ধান্ত" বলায় উহা "বুদ্ধি" পদার্থ বলিয়া মহর্ষি-পরিভাষিত "প্রমেয়ে"ই উহার অন্তর্ভাব হইয়াছে, এ জন্য উদ্দ্যোতকর এখানে সিদ্ধান্তকে "প্রমেয়ে অন্তর্ভূত" এই কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার-স্বীকৃত পদার্থকে সিদ্ধান্ত বলায় তিনি এখানে দৃষ্টান্ত পদার্থের ন্যায় "সিদ্ধান্তকে"ও কেবল "প্রমেয়" ইহাই বলিয়াছেন। "দৃষ্টান্ত" পদার্থকে যে ভাবে ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শনকালে প্রমেয়ে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, "সিদ্ধান্ত" পদার্থকেও সেই ভাবে প্রমেয়ে অন্তর্ভূত বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তমাত্রই যেমন মহর্ষি-পরিভাষিত "প্রমেয়ে"র মধ্যে নাই, সিদ্ধান্ত মাত্রও তদ্রূপ মহর্ষি-পরিভাষিত "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে নাই। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, কিন্তু তিনি গোতম পরিভাষিত "প্রমেয়" পদার্থগুলির মধ্যে নাই। ঐরূপ আরও বহু বহু সিদ্ধান্ত ঐ প্রমেয়ের মধ্যে নাই, সুতরাং "দৃষ্টান্ত" পদার্থের ন্যায় "সিদ্ধান্ত" পদার্থও সামান্য প্রমেয় ও বিশেষ প্রমেয়ে যথাসম্ভব অন্তর্ভূত আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা দৃষ্টান্তের স্থলেই বলা হইয়াছে।

মহর্ষি "সিদ্ধান্ত"কে চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন। সেই চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্ত না থাকিলে কোন বিচারই হইতে পারে না। তন্মধ্যে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত, মহর্ষি যাহাকে "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" বলিয়াছেন, তাহা না থাকিলে অর্থাৎ তাহা একেবারেই না মানিলে কিরূপে বিচার হইবে? যদি ধর্ম্মীতে কোন বিবাদ না থাকে, তবে তাহা নিত্য, কি অনিত্য, দ্রব্য, কি গুণ, "পরিণাম", কি "বিবর্ত্ত," এইরূপে তাহার ধর্ম্মবিচার হইতে পারে। এবং যাহা কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, মহর্ষি যাহাকে "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত" বলিয়াছেন, তাহা না থাকিলে এবং তাহা না জানিলে কিরূপে বিচার হইবে? সকলেই একমত হইলে অথবা কেহ বিরুদ্ধ মত না জানিলে বিচার হইতে পারে না। এইরূপ বিচারে চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তেরই বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, তজ্জন্য মহর্ষি সিদ্ধান্তের বিশেষ করিয়া উল্লেখ এবং তাহার প্রকার-ভেদের উল্লেখ * করিয়াছেন।

এবং বিশেষরূপে না হইলেও সিদ্ধান্তস্বরূপে ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থেরও তাহাতে উল্লেখ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য কথা "সিদ্ধান্ত" প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। সাধনীয়ার্থস্য যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে তস্য পঞ্চাবয়বাঃ প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তেষু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা, হেতুরনুমানং, উদাহরণং প্রত্যক্ষং, উপমানমুপনয়ঃ, সর্ব্বেষামেকার্থসমবায়ে সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি। সোঽয়ং পরমো ন্যায় ইতি। এতেন বাদজল্পবিতণ্ডাঃ প্রবর্ত্তন্তে, নাতোঽন্যথেতি। তদাশ্রয়া চ তত্ত্বব্যবস্থা। তে চৈতেঽবয়বাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ প্রমেয়েঽন্তর্ভূতা এবমর্থং পৃথগুচ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। যতগুলি শব্দসমূহে (বাক্যসমূহে) সাধনীয় পদার্থের সিদ্ধি অর্থাৎ বাস্তব ধর্ম্ম পরিসমাপ্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, সেই বাক্য-সমষ্টির প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অর্থাৎ "প্রতিজ্ঞা", "হেতু", "উদাহরণ", "উপনয়", "নিগমন",—এই পাঁচটি অবয়ব, "সমূহ"কে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া "অবয়ব" বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ পঞ্চ বাক্যসমষ্টির এক একটি অংশ বা ব ষ্টি প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য, এ জন্য তাহাদিগকে "অবয়ব" বলা হইয়াছে।

সেই পঞ্চাবয়বে প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণেরই মেলন আছে। (কিরূপে আছে, তাহা বলিতেছেন) "প্রতিজ্ঞা" শব্দপ্রমাণ, "হেতু" অনুমান-প্রমাণ, "উদাহরণ" প্রত্যক্ষ প্রমাণ, "উপনয়" উপমান প্রমাণ,—সকলের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি অবয়বের এবং তাহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের একার্থসমবায়ে অর্থাৎ একটি প্রতিপাদ্যের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে অথবা উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধিতে সামর্থ্য প্রদর্শন অর্থাৎ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষতার প্রদর্শক বাক্য "নিগমন"। ইহা সেই পরম "ন্যায়", অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি সর্ব্বপ্রমাণমূলক বলিয়া ইহাকে পরম অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধবাদীর প্রতিপাদক "ন্যায়" বলে। এই ন্যায়ের দ্বারা বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা (ত্রিবিধ বিচার) প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্যথায় হয় না, অর্থাৎ আর কোনও প্রকারে ঐ বিচার হয় না, কদাচিৎ বাদ-বিচার হইলেও জল্প ও বিতণ্ডা কখনই হয় না এবং তত্ত্বের ব্যবস্থা অর্থাৎ ইহাই তত্ত্ব, অন্যটি তত্ত্ব নহে, এইরূপ নিয়ম বা নির্ণয় সেই ন্যায়ের আশ্রিত (ন্যায়ের অধীন)।

সেই এই অবয়বগুলি (প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব) শব্দবিশেষ বলিয়া প্রমেয়ে (মহর্ষি-কথিত প্রমেয় পদার্থে) অন্তর্ভূত হইয়াও এই নিমিত্ত অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে সমস্ত প্রমাণ আছে,—ইহারা একবাক্য ভাবে মিলিত হইয়া বিরুদ্ধবাদীকে তত্ত্বপ্রতিপাদন করে, তত্ত্বব্যবস্থা ইহাদিগের অধীন, ইত্যাদি কারণে পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। যেমন পরার্থানুমানকে "ন্যায়" বলে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে তাহাই বলিয়া আসিয়াছেন, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমানে "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি "নিগমন" পর্য্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, যথাক্রমে প্রযুক্ত ঐ বাক্য-সমষ্টিকেও "ন্যায়" বলে। ভাষ্যকারও এখানে তাহাকে "পরম ন্যায়" বলিয়া সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের লক্ষণ মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। পরার্থানুমান স্থলে ঐ "ন্যায়" নামক বাক্যসমূহে সাধ্যসিদ্ধি পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারই এক একটি অংশ "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পাঁচটী বাক্যের দ্বারা সাধনীয় পদার্থের বাস্তব ধর্ম্মবিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়া যায়। ভাষ্যে "সিদ্ধি" শব্দের দ্বারা বাস্তব ধর্ম্ম এবং "পরিসমাপ্তি" বলিতে তাহার নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মটি সাধন করিতে ইচ্ছা হইবে, ঐ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই এখানে সাধনীয় পদার্থ, ঐ ধর্ম্মীতে ঐ ধর্ম্মটী বস্তুতঃ থাকিলেই তাহা ঐ ধর্ম্মীর বাস্তব ধর্ম্ম হয়; ঐ বাস্তব ধর্ম্মের নিশ্চয় অর্থাৎ ধর্ম্মীকে সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়ই ন্যায়ের পরিসমাপ্তি বা চরম ফল।

সমষ্টি থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যষ্টি থাকে; ব্যষ্টি ব্যতীত সমষ্টি হয় না। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্যের প্রত্যেকটী পূর্ব্বোক্ত "ন্যায়" নামক বাক্য-সমষ্টির অপেক্ষায় ব্যষ্টি। তাই ঐ সমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতিকে "অবয়ব" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি, ঐ পঞ্চ বাক্য-সমষ্টির এক একটী ব্যষ্টি বা অংশ, এ জন্য উহাদিগকে ঐ বাক্যসমষ্টিরূপ ন্যায়েরই অবয়ব বলা হইয়াছে। "অবয়ব" শব্দের দ্বারা একদেশ বা অংশ বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের উপাদান-কারণকেই "অবয়ব" বলে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্য ন্যায়-বাক্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, কিন্তু উপাদান-কারণ অবয়বগুলি মিলিত হইয়া যেমন একটী অবয়বী দ্রব্যকে ধারণ করে, তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী বাক্য মিলিত হইয়া "ন্যায়" বাক্যের প্রতিপাদ্য, একটী বিবক্ষিতার্থের প্রতিপাদন করে, তাই উহারা অবয়ব সদৃশ বলিয়া "অবয়ব" নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐগুলি অবয়ব সদৃশ বলিয়াই উহাতে "অবয়ব" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বে সকল প্রমাণ আছে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার "প্রতিজ্ঞা"কে শব্দপ্রমাণ, "হেতু"-বাক্যকে অনুমাণ-প্রমান, "উদাহরণ"-বাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এবং "উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি বাক্যচতুষ্টয়ই যে প্রমাণ, তাহা নহে, ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের মূলে চারিটী প্রমাণ আছে, সেই মূলীভূত প্রমাণ-

চতুষ্টয়কে প্রকাশ করিয়াই, ঐ প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বস্তুপরীক্ষায় উপযোগী হয়, উহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্তু-পরীক্ষায় উপযোগী হয় না, হইতে পারে না; কারণ, ঐরূপ কতকগুলি বাক্যমাত্র কোন তত্ত্বনির্ণয় জন্মাইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে, ঐ বাক্যচতুষ্টয় উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়েরই ব্যাপার, সেই প্রমাণগুলিই ঐরূপ বাক্যের উত্থাপক হইয়া তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদন করে এবং সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যকে "পরম ন্যায়" বলা হয়। ফলতঃ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলিই যে প্রমাণ, তাহা নহে। উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াই উহাদিগকে প্রমাণ বলা হইয়াছে। এবং ঐ পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যসমষ্টিকেই বহুবচনান্ত 'প্রমাণ' শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছেন—"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ।" মূলকথা, 'প্রতিজ্ঞা' প্রভৃতি বাক্যে 'আগম' প্রভৃতি প্রমাণবোধক শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াই ভাষ্যকার ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্যচতুষ্টয়ের মূলে যখন প্রমাণচতুষ্টয় আছে, তখন পঞ্চাবয়ব থাকিলেই সেখানে প্রমাণচতুষ্টয় বা সর্ব্বপ্রমাণ থাকিল, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। এইরূপ গৌণ প্রয়োগ চিরকাল হইতেই আছে। ভাষ্যকারও গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞাদি বাক্যই বস্তুতঃ চারিটী প্রমাণ নহে, ইহা ভাষ্যকারের পূর্ব্বকথাতেও ব্যক্ত আছে। কারণ, প্রথমতঃ তিনিও "তেষু প্রমাণসমবায়ঃ" এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। 'প্রতিজ্ঞা' প্রভৃতির মূলে 'আগম' প্রভৃতি প্রমাণ আছে কিরূপে? যে জন্য প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্য বস্তুতঃ আগম প্রভৃতি প্রমাণ না হইলেও একেবারে তাহাদিগকে আগম প্রভৃতি প্রমাণই বলা হইয়াছে? ভাষ্যকার এ প্রশ্নের কোন উত্তর এখানে দেন নাই। নিগমনসূত্রে (৩৯ সূত্রে) ইহার হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই ইহার বিস্তৃত প্রকাশ দ্রষ্টব্য। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটী অবয়ব (যাহাদিগকে সর্ব্বপ্রমাণরূপে ধরা হইয়াছে) একবাক্য না হইলে তাহাদিগের একার্থপ্রতিপাদকতা হয় না, তাই উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধি চাই। পরস্পর সাকাঙ্ক্ষতাই একবাক্যতা এবং ঐ সাকাঙ্ক্ষতাই প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-চতুষ্টয়ের এবং তাহার মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের 'সামর্থ্য' বলিয়া ভাষ্যে কথিত হইয়াছে। ঐ 'সামর্থ্য' বা সাকাঙ্ক্ষতার বোধের জন্য 'নিগমন'-বাক্যকে পঞ্চম 'অবয়ব'রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নিগমন-সূত্রে এ কথারও বিশদ প্রকাশ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ 'ন্যায়'কে ভাষ্যকার 'পরম' বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কোন একটী প্রমাণ সর্ব্বত্র বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, তাহাকে মানাইতে পারে না, কিন্তু বাক্য-ভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রমাণ মিলিত হইলে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকেও মানাইতে পারে, সুতরাং 'ন্যায়ে'র দ্বারা বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপাদন করা যায়, এ জন্য ন্যায় পরম। পরম—কি না বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তির প্রতিপাদক। তাৎপর্য্যটীকাকার এই কথার সমর্থনে বলিয়াছেন যে, যদিও লৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কোন একটী প্রমাণও বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে মানাইতে

পারে, কিন্তু আত্মনিত্যত্ব, বেদপ্রামাণ্য প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ে পারে না ; এ জন্য তাহা মানাইতে সর্ব্বপ্রমাণমূলক ন্যায়কেই আশ্রয় করিতে হয় এবং সেইগুলি প্রতিপাদন করাই ন্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং ন্যায়কে 'পরম' বলা ঠিকই হইয়াছে।

অবয়বগুলি বাক্য, সুতরাং শব্দ। মহর্ষি-কথিত প্রমেয়ের মধ্যে 'অর্থ' বা ইন্দ্রিয়ার্থ আছে, তাহার মধ্যে শব্দ আছে, সুতরাং 'অবয়ব' মহর্ষি-কথিত প্রমেয়েই অন্তর্ভূত হইয়াছে, তবুও তাহার পৃথক্ উল্লেখ কেন ? তাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যে "শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ" এখানে হেত্বর্থে শতৃ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণান্তরং, প্রমাণানামনুগ্রাহকস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে। তস্যোদাহরণং, কিমিদং জন্ম কৃতকেন হেতুনা নির্ব্বর্ত্ত্যতে ? আহোস্বিদকৃতকেন ? অথাকস্মিকমিতি। এবমবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্ত্যা ঊহঃ প্রবর্ত্ততে, যদি কৃতকেন হেতুনা নির্ব্বর্ত্ত্যতে হেতূচ্ছেদাদুপপন্নোঽয়ং জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকৃতকেন হেতুনা, ততো হেতূচ্ছেদস্যাশক্যত্বাদনুপপন্নো জন্মোচ্ছেদঃ। অথাকস্মিকমতোঽকস্মান্নির্ব্বর্ত্ত্যমানং ন পুনর্নির্ব্বর্ৎস্যতীতি নিবৃত্তিকারণং নোপপদ্যতে, তেন জন্মানুচ্ছেদ ইতি। এতস্মিংস্তর্কবিষয়ে কর্ম্মনিমিত্তং জন্মেতি প্রমাণানি প্রবর্ত্তমানানি তর্কেনানুগৃহ্যন্তে। তত্ত্বজ্ঞানবিষয়স্য বিভাগাৎ তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্ক ইতি। সোঽয়মিত্থম্ভূতস্তর্কঃ প্রমাণসহিতো বাদে সাধনায়োপালম্ভায় চার্থস্য ভবতীত্যেবমর্থং পৃথগুচ্যতে প্রমেয়ান্তর্ভূতোঽপীতি।

অনুবাদ। তর্ক প্রমাণসংগৃহীত অর্থাৎ কথিত চারিটী প্রমাণের অন্যতম নহে, প্রমাণান্তরও নহে, প্রমাণগুলির অনুগ্রাহক (সহকারী) হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়। সেই তর্কের উদাহরণ—এই জন্ম কি অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে ? অথবা নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে ? অথবা আকস্মিক অর্থাৎ বিনা কারণে আপনা আপনিই হইতেছে ? এইরূপে অনিশ্চিততত্ত্বপদার্থে কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবহেতুক তর্ক প্রবৃত্ত হয়। (সে কিরূপ তর্ক, তাহা দেখাইতেছেন) যদি (এই জন্ম) অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, (তাহা হইলে) হেতুর অর্থাৎ সেই নশ্বর হেতুর উচ্ছেদবশতঃ এই জন্মোচ্ছেদ উপপন্ন হয়। আর যদি নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে থাকে,

তাহা হইলে হেতুর (সেই নিত্যকারণের) উচ্ছেদ অশক্য বলিয়া জন্মের উচ্ছেদ উপপন্ন হয় না। আর যদি (জন্ম) আকস্মিক হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ (বিনা কারণে) উৎপদ্যমান জন্ম আর নিবৃত্ত হইবে না। নিবৃত্তির কারণ উপপন্ন হয় না, সুতরাং জন্মের উচ্ছেদ নাই। এই তর্ক বিষয়ে—জন্ম কর্ম্ম-নিমিত্তক অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য ; এইরূপে প্রবর্ত্তমান প্রমাণগুলি তর্ক কর্ত্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ অযুক্ত নিষেধের দ্বারা যুক্ত বিষয়ে অনুজ্ঞাত হয়। তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ের বিভাগ অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত বিচার করে বলিয়া, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়। সেই এই এবম্ভূত তর্ক, প্রমাণ সহিত হইয়া 'বাদে' পদার্থের সাধন এবং উপালম্ভ অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনের নিমিত্ত হয়। এই জন্য প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। 'প্রমাণ' শব্দের দ্বারা যে চারিটী প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, 'তর্ক' তাহার মধ্যে কেহ নহে, নূতন কোন প্রমাণও নহে। কারণ, 'তর্ক' তত্ত্বনিশ্চায়ক নহে ; তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য প্রমাণই প্রযুক্ত হয়। ঐ প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইলে তর্ক, যুক্ততত্ত্বে প্রবর্ত্তমান প্রমাণকে অনুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করে। এই তত্ত্বেই প্রমাণ সম্ভব, ইহাই যুক্ত—এইরূপে প্রমাণ-সম্ভব-প্রযুক্ত তত্ত্ব-বিশেষের অনুমোদনই তর্কের অনুগ্রহ। ঐরূপে তর্কানুগৃহীত হইয়া প্রমাণই তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মায় ; সুতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী, স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে ; প্রমাণের সহকারী হইয়াই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায়।

জন্মের কারণ অনিত্য হইলে ঐ কারণের বিনাশ হইতে পারে ; সুতরাং মুক্তির আশা আছে। জন্মের কারণ নিত্য হইলে তাহার বিনাশ অসম্ভব ; সুতরাং জন্মের উচ্ছেদ অসম্ভব। কারণ, জন্মের কারণ চিরকালই থাকিবে, জন্ম-প্রবাহও চিরকাল চলিবে, মুক্তির আশা নাই। জন্ম আকস্মিক হইলেও তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির কারণ না থাকায় মুক্তির আশা থাকে না।—এই তর্ক বিষয়ে "জন্ম-কর্ম্ম-নিমিত্তকং বৈচিত্র্যাৎ" ইত্যাদি প্রকারে প্রমাণগুলি প্রবৃত্ত হইলে তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। প্রমাণের দ্বারা বুঝা গেল, জন্ম কর্ম্মজন্য অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল—ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিমিত্তক,—কারণ, জন্ম বিচিত্র। ইহাতে সংশয় হইলে তর্ক তাহা নিবৃত্তি করে। তর্ক বুঝাইয়া দেয়—জন্ম কর্ম্ম-নিমিত্তক, ইহাই যুক্ত। ইহাতেই প্রমাণ সম্ভব। কারণ, উত্তম মধ্যম অধম, স্ত্রীপুরুষ, সকল বিকল প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা-বিশিষ্ট জন্ম একরূপ কোন কারণজন্য অথবা কাহারও স্বেচ্ছাকৃত হইতে পারে না, বিনা কারণেও হইতে পারে না। কার্য্য বিচিত্র হইলে তাহার কারণও বিচিত্র হইবে। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম এই বিচিত্র জন্মপ্রবাহের কারণ। বিভিন্ন বিজাতীয় কর্ম্মফলেই এই বিচিত্র জন্মপ্রবাহ নিষ্পন্ন হইতেছে। ঐ কর্ম্মফল জন্য, উহার নাশ আছে। তত্ত্বজ্ঞানাদির দ্বারা উহার একেবারে উচ্ছেদ হইলে জন্মের উচ্ছেদ হইবেই। সুতরাং মুক্তির

আশা সকলেরই আছে। এইরূপে তর্ক, যুক্ত তত্ত্বে প্রবর্ত্তমান পূর্ব্বোক্ত প্রমাণকে অনুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করিল, তখন ঐ তর্কানুগৃহীত ঐ প্রমাণই জন্মকর্ম্মনিমিত্তক এই তত্ত্বনিশ্চয় সম্পাদন করিল। আর সংশয় থাকিল না। মহর্ষির দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, সুতরাং তর্ক তাহাতেই অন্তর্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য অনেক সময়ে প্রমাণের সহকারী তর্কের বড় প্রয়োজন হয়,—তাহার বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। তাই বিশেষ করিয়া তাহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। (তর্কসূত্র দ্রষ্টব্য)

ভাষ্য। নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণানাং ফলং, তদবসানো বাদঃ। তস্য পালনার্থং জল্পবিতণ্ডে। তাবেতৌ তর্কনির্ণয়ৌ লোকযাত্রাং বহত ইতি। সোঽয়ং নির্ণয়ঃ প্রমেয়ান্তর্ভূত এবমর্থং পৃথগুদ্দিষ্ট ইতি।

অনুবাদ। প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের ফল তত্ত্ব-জ্ঞানকে 'নির্ণয়' বলে। বাদ (তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কথা) সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ নির্ণয় পর্য্যন্ত। সেই নির্ণয়ের রক্ষার জন্য 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' (আবশ্যক হয়)। সেই এই তর্ক ও নির্ণয় (মহর্ষি-কথিত পদার্থদ্বয়) লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সেই এই নির্ণয় প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও এই জন্য পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

টিপ্পনী। তত্ত্বজ্ঞানমাত্রকে নির্ণয় বলিলে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধজন্য প্রত্যক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞানও নির্ণয় হইয়া পড়ে। তাই বলিয়াছেন—"প্রমাণানাং ফলম্"। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, "প্রমাণানাং" এই বহুবচনান্ত বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যই লক্ষিত হইয়াছে;— কারণ, তাহাতেই তর্কযুক্ত প্রমাণসমূহের মেলন আছে। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্ব্বক তত্ত্বনিশ্চয়ই "নির্ণয়" পদার্থ। তর্ক সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ফলও নির্ণয় হইবে। মূল কথা—তর্কপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান না হইলে তাহা নির্ণয় পদার্থ নহে, ইহাই "প্রমণানাং ফলং" এই কথার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। মহর্ষিও তর্কের পরই নির্ণয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য)। বাদি-নিরাস হইলেই "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র নিবৃত্তি হয়। কিন্তু নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত "বাদ"-বিচারের নিবৃত্তি নাই। কারণ, "নির্ণয়"ই বাদের উদ্দেশ্য। "জল্প" ও "বিতণ্ডা" এই নির্ণয়কে রক্ষা করিবার জন্যই আবশ্যক হয়। পূর্ব্বোক্ত "তর্ক" ও "নির্ণয়" লোকযাত্রার নির্ব্বাহক। কারণ, লোক সমস্ত বুঝিয়া বুঝিয়া প্রবর্ত্তমান হইয়া তর্ক ও নির্ণয়ের দ্বারা ত্যাজ্য ত্যাগ করে, গ্রাহ্য গ্রহণ করে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই "লোক" বলিতে পরীক্ষা-সমর্থ লোকই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরীক্ষক ভিন্ন সাধারণ লোক তর্ক করিতে পারে না। এই নির্ণয় জ্ঞান-পদার্থ। সুতরাং প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞান-পদার্থ উল্লিখিত হওয়ায় উহা প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইয়াছে। ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, উহা প্রমাণেও অন্তর্ভূত হইয়াছে। কারণ, ঐ নির্ণয় যখন কোন পদার্থ-বিশেষের নিশ্চায়করূপে

উপস্থিত হইবে, তখন উহা প্রমাণ হইবে ; তাহা না হইলে উহা প্রমাণের ফলই থাকিবে। প্রমাণত্ব ও প্রমাণ-ফলত্ব এবং প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব অবস্থা-ভেদে এক পদার্থে থাকিতে পারে, ইহা পরে (দ্বিতীয়াধ্যায়ে) মহর্ষিসূত্রেই ব্যক্ত হইবে। নির্ণয়ের পৃথক্ উদ্দেশের কারণ ভাষ্যেই পরিস্ফুট রহিয়াছে।

ভাষ্য। বাদঃ খলু নানাপ্রবক্তৃকঃ প্রত্যধিকরণসাধনোঽন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানো বাক্যসমূহঃ পৃথগুদ্দিষ্ট উপলক্ষণার্থং। উপলক্ষিতেন ব্যবহারস্তত্ত্বজ্ঞানায় ভবতীতি। তদ্বিশেষৌ জল্পবিতণ্ডে তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থমিত্যুক্তম্।

অনুবাদ। অনেক-বক্তৃক অর্থাৎ যাহাতে বক্তা একের অধিক, প্রত্যেক সাধ্যে সাধনবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে উভয় পক্ষই স্ব স্ব সাধ্যে হেতু প্রয়োগ করেন, একতর সাধ্যের নির্ণয়াবসান অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যের মধ্যে যে কোন সাধ্য নির্ণয়ই যাহার শেষফল, এমন বাক্যসমূহরূপ বাদ উপলক্ষণের জন্য অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের জন্য পৃথক্ উদ্দিস্ট হইয়াছে। উপলক্ষিতের দ্বারা অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত সেই বাদের দ্বারা ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হয়। তদ্বিশেষ অর্থাৎ সেই বাদ হইতে বিশিস্ট (কোন কোন অংশে ভিন্ন) জল্প ও বিতণ্ডা তত্ত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণের জন্য পৃথক্ উদ্দিস্ট হইয়াছে, ইহা উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। এক জন বক্তার অথবা শাস্ত্রকর্ত্তার পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর-পক্ষ, দূষণ-সমাধান, প্রতিপাদক বাক্যসমূহ "বাদ" নহে ; তাই বলিয়াছেন—"নানাপ্রবক্তৃকঃ"। বিতণ্ডায় প্রতিবাদী স্বসাধ্যে হেতু-প্রয়োগ করেন না ; সুতরাং তাহা "বাদ" হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন—"প্রত্যধিকরণসাধনঃ"। যে কোনরূপে এক পক্ষ নিরস্ত হইলেই "জল্প" কথার সমাপ্তি হয় ; কিন্তু একতর সাধ্যের নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত "বাদ' কথার সমাপ্তি হয় না। তাই বলিয়াছেন—"অন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানঃ"। সাধ্যকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ উদ্দেশ্য করিয়া হেতু প্রয়োগ করা হয় ; এ জন্য "অধিকরণ শব্দের দ্বারা ("অধিক্রিয়তে উদ্দিশ্যতে যৎ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) সাধ্য বুঝা যায়। তাই পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে সাধ্য বুঝাইবার জন্য "অধিকরণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্য-সমূহরূপ "বাদ" শব্দপদার্থ বলিয়া মহর্ষি কথিত "প্রমেয়" পদার্থেই অন্তর্ভূত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে বাদের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় বলিয়া বাদের বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন ; তাই মহর্ষি তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার "বাদে"র পরে এক সঙ্গেই "জল্প" ও "বিতণ্ডার" কথা বলিয়াছেন। "বিশিষ্যেতে ভিদ্যেতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে এখানে "বিশেষ"শব্দের অর্থ বিশিষ্ট। "জল্প" ও "বিতণ্ডা,"

সংশয় প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় বাদ হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন নহে। কিন্তু বাদ হইতে বিশিষ্ট। কারণ, উহারা "কথা"রই দুইটী বিশিষ্ট প্রকার মাত্র। "কথাত্ব"রূপে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার অভেদই আছে, ইহা সূচনা করিবার জন্যই "তদ্ভিন্নৌ" না বলিয়া বলিয়াছেন,—"তদ্বিশেষৌ"। জল্প ও বিতণ্ডায় বাদ হইতে বিশেষ কি? এতদুত্তরে ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন,—"অঙ্গাধিক্যমঙ্গহানিশ্চ"। "বাদে" ছল, জাতি ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, কিন্তু জল্পে তাহা আছে; সুতরাং বাদ হইতে জল্পে অঙ্গাধিক্য আছে। জল্পের ন্যায় বাদেও উভয় পক্ষের স্থাপনা আছে; কিন্তু বিতণ্ডায় স্বপক্ষ-স্থাপনা না থাকায়, বাদ হইতে অঙ্গহানি আছে। জল্প ও বিতণ্ডা তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য আবশ্যক, ইহা চতুর্থাধ্যায়ের শেষে মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। সুতরাং জল্প ও বিতণ্ডার পৃথক্ উল্লেখের কারণ তাহাতেই উক্ত হইয়াছে; তাই বলিয়াছেন—"ইত্যুক্তং"অর্থাৎ এ কথা মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। কেহ বলেন—নির্ণয় পদার্থ-ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকারই এ কথা বলিয়া আসিয়াছেন; তাই বলিয়াছেন—"ইত্যুক্তম্"। 'জল্পবিতণ্ডে' এই স্থলে 'পৃথগুদ্দিষ্টে' এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাক্যের লিঙ্গ বচন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অনুষঙ্গ করিয়া বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। নিগ্রহস্থানেভ্যঃ পৃথগুদ্দিষ্টা হেত্বাভাসা বাদে চোদনীয়া ভবিষ্যন্তীতি। জল্পবিতণ্ডয়োস্তু নিগ্রহস্থানানীতি।

অনুবাদ। হেত্বাভাসগুলি বাদে অর্থাৎ বাদ নামক বিচারে উদ্ভাবনীয় হইবে, এ জন্য (নিগ্রহস্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইলেও) নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। জল্প ও বিতণ্ডাতে কিন্তু (যথাসম্ভব) সকল নিগ্রহস্থানই উদ্ভাবনীয় হইবে।

টিপ্পনী। যাহা ব্যভিচার প্রভৃতি কোন দোষযুক্ত বলিয়া প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। মহর্ষি গোতমের মতে এই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। ন্যায়ের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করিতে এই হেত্বাভাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং ন্যায়বিদ্যায় হেত্বাভাস অবশ্য উল্লেখ্য। কিন্তু মহর্ষি যখন তাঁহার ষোড়শ পদার্থ নিগ্রহ-স্থানের বিভাগে হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আর হেত্বাভাসের পৃথক্ উদ্দেশের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাব্যতা সূচনার জন্যই হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। জল্প ও বিতণ্ডায় পরাজয়-সূচনার জন্য সম্ভব হইলে, সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায় এবং করিতে হয়। কিন্তু বাদবিচারে সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নিষিদ্ধ। তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরু প্রভৃতির সহিত তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশ্যে বাদবিচার করেন। জিগীষা না থাকায় তিনি গুরু প্রভৃতি বক্তার অপ্রতিভাদি দোষের উদ্ভাবন করেন না, করিলে সে বিচারের বাদত্ব থাকে না। কিন্তু গুরু প্রভৃতি বক্তা ভ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ দুষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্য সাধন করিলে, অথবা কোন অপসিদ্ধান্ত বলিলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য অবশ্য তাহার উদ্ভাবন করিবেন। যাহা সেই

স্থলে তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রতিকূল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য কখনই তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। (বাদসূত্র দ্রষ্টব্য)। আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহ-স্থানেরও পৃথক্ উল্লেখ করা উচিত? কারণ, তাহারাও হেত্বাভাসের ন্যায় বাদবিচারে উদ্ভাব্য। এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখে বাদ বিচারে কেবল হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহ-স্থানই উদ্ভাব্য, ইহা সূচিত হয় নাই। উহার দ্বারা অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহ-স্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, যে যুক্তিতে হেত্বাভাসের বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝা যায়, সেই যুক্তিতে অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝা যায়। সুতরাং সেগুলির আর পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখেই সেগুলির পৃথক্ উল্লেখের ফল সিদ্ধ হইয়াছে। মূলকথা, যে সমস্ত নিগ্রহ-স্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারে তত্ত্বনির্ণয়েরই ব্যাঘাত হয়, বাদবিচারে তাহারাই উদ্ভাব্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া মহর্ষি ইহাই সূচনা করিয়াছেন। প্রথম সূত্রেই ইহা সূচনা করিবার ফল কি? ন্যায়-বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"বিদ্যা প্রস্থান-ভেদজ্ঞাপনার্থত্বাৎ।" তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী বলিয়া বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডাও বিদ্যা; তাহাদিগের প্রস্থানের অর্থাৎ ব্যাপারের ভেদ বুঝাইবার জন্য ঐরূপ সূচনা আবশ্যক। এই জন্যই "জল্পবিতণ্ডয়োস্তু নিগ্রহস্থানানি" এই অংশের দ্বারা ভাষ্যকার জল্প ও বিতণ্ডাবিদ্যায় বাদবিদ্যার বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছেন। জল্প ও বিতণ্ডার ভেদ সূত্রকার নিজেই দেখাইবেন। অহঙ্কারী জিগীষু অপ্রতিভা প্রভৃতি যে কোন প্রকার নিগ্রহ-স্থানের দ্বারা পরাস্ত হইলে অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবে; তখন তাহাকে বাদবিচারের দ্বারা তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। সুতরাং জল্প ও বিতণ্ডায় সর্ব্ববিধ নিগ্রহ-স্থানই উদ্ভাব্য।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাষ্য ও বার্ত্তিকের উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং 'হেত্বাভাস' নিগ্রহস্থান নহে, হেত্বাভাস প্রয়োগই নিগ্রহস্থান, এইরূপ নিজ মত প্রকাশ করিয়া সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বাচস্পতি মিশ্র যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্তিকারের প্রতিবাদ হইতেই পারে না।

ভাষ্য। ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং পৃথগুপদেশ উপলক্ষণার্থ ইতি। উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবর্জ্জনং ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং পরবাক্যে পর্য্যনুযোগঃ। জাতেশ্চ পরেণ প্রযুজ্যমানায়াঃ সুলভঃ সমাধিঃ। স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগ ইতি।

অনুবাদ। ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের পৃথক্ উল্লেখ উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত। (পরিজ্ঞানের ফল দেখাইতেছেন) উপলক্ষিত অর্থাৎ

পরিজ্ঞাত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিজের বাক্যে পরিবর্জ্জন (অপ্রয়োগ), পরবাক্যে পর্য্যনুযোগ অর্থাৎ উদ্‌ভাবন হয়। এবং পরকর্ত্তৃক প্রযুজ্যমান জাতির (জাতি নামক অসদুত্তরের) সমাধি (সম্যক্ উত্তর) সুলভ হয় এবং স্বয়ংপ্রয়োগ সুকর হয়।

টিপ্পনী। ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের পরিজ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান প্রয়োজন। এ জন্য তাহারা প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের লক্ষণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। উহাদিগের পরিজ্ঞান ব্যতীত ঐগুলি নিজের বাক্যে প্রয়োগ করিবে না, পরের বাক্যে উদ্ভাবন করিবে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। এবং 'জাতি'নামক অসদুত্তরের পরিজ্ঞান থাকিলেই পরপ্রযুক্ত 'জাত্যুত্তরে'র সম্যক্ উত্তর করিতে পারা যায় এবং স্বয়ং ঐ জাতির প্রয়োগ সুকর হয়। যদিও স্ববাক্যে জাতির প্রয়োগ নাই, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাহা হইলেও যেখানে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিতেছে, বাদী সভ্যদিগকে সেই কথা বলিলেন, সভ্যগণ প্রশ্ন করিলেন—"কেন? কি প্রকারে ইহা জাত্যুত্তর হইল? চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে ইহা কোন্‌টি?" সভ্যগণের এই প্রশ্ন নিরাকরণের জন্য তখন বাদী ঐ 'জাতি'র প্রয়োগ করিবেন। জাতির পরিজ্ঞান থাকিলেই ঐ স্থলে তাঁহার জাতি প্রয়োগ সুকর হয়। তিনি নিজ বাক্যে জাতি প্রয়োগ করিবেন না, ইহা স্থিরই আছে। সুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধ হয় নাই। ফলতঃ জাত্যভিজ্ঞ ব্যক্তিই সভ্যদিগের ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রতিবাদী অসদুত্তর করিতেছেন, ইহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং জাতিরও পরিজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। মূলকথা, সংশয় প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলির ন্যায় ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানও ন্যায়বিদ্যা সাধ্য তত্ত্বজ্ঞানে উপযোগী। সুতরাং ইহারাও সংশয়াদির ন্যায় ন্যায়বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য। ভাষ্যকার সংশয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পদার্থের ন্যায়বিদ্যায় উপযোগিতা বর্ণন করিয়া, ইহারা ন্যায়বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য, ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। এখন এই অসাধারণ প্রতিপাদ্যরূপ প্রস্থান-ভেদ জ্ঞাপনের জন্য সংশয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ভাষ্যকারের এই প্রথম কথা স্মরণ করিতে হইবে। কারণ, তাহাই মূলকথা। পরের কথাগুলি তাহারই সমর্থনের জন্য বিশেষ করিয়া অভিহিত হইয়াছে। ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের কথা যথাস্থানেই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা—প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥ তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যং। ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গপ্রাপ্তি-রিতি। ১।

অনুবাদ। প্রমাণাদি পদার্থ কর্ত্তৃক বিভজ্যমান (পৃথক্ ক্রিয়মাণ) অর্থাৎ প্রমাণাদি পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পদার্থ যে বিদ্যাকে অন্য বিদ্যা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, সেই এই আন্বীক্ষিকী (ন্যায়বিদ্যা) বিদ্যার উদ্দেশে অর্থাৎ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপরূপে, সর্ব্বকর্ম্মের উপায়রূপে, সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়রূপে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সলাভ বিদ্যানুসারে বুঝিতে হইবে। এই অধ্যাত্মবিদ্যাতে কিন্তু আত্মাদিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়সলাভ অপবর্গপ্রাপ্তি, অর্থাৎ অন্য বিদ্যা হইতে এই ন্যায়বিদ্যায় তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সে বিশেষ আছে। ইতি।

টিপ্পনী। উপসংহারে ভাষ্যকার ন্যায়বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, এমন কোন পুরুষার্থ নাই, যাহাতে এই ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক নহে। এই ন্যায়বিদ্যা-ব্যুৎপাদিত প্রমাণাদিকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য বিদ্যা স্ব স্ব প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যেই সর্ব্ববিদ্যাগর্ভস্থ গূঢ় তত্ত্ব দর্শন করা যায়। তাই সর্ব্ববিদ্যার প্রকাশক বলিয়া ইহা সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ। ইহা সর্ব্বকর্ম্মের উপায়; কারণ, এই ন্যায়বিদ্যা-পরিশোধিত প্রমাণাদির দ্বারাই সর্ব্ববিদ্যার প্রতিপাদ্য কর্ম্মগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। সাম-দানাদি, কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে এই ন্যায়বিদ্যাই মূল। ইহা সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ-প্রবর্ত্তনা অর্থাৎ লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা সর্ব্ববিদ্যার ধর্ম্ম। সেগুলিও এই ন্যায়বিদ্যার অধীন। এই বিদ্যার সাহায্য লইয়াই অন্য বিদ্যা পুরুষ-প্রবর্ত্তনা করেন। বিমৃশ্যকারী চিন্তাশীল পুরুষগণ এই ন্যায়বিদ্যার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিয়াই ক্লেশসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার যেরূপ বলিয়াছেন, বিদ্যার পরিগণনাস্থলে ন্যায়বিদ্যা এইরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। ন্যায়বিদ্যা বেদের উপাঙ্গ বলিয়া পুরাণে কীর্ত্তিত। "মোক্ষধর্ম্মে" ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়া গিয়াছেন যে, "গরীয়সী আন্বীক্ষিকীকে আশ্রয় করিয়া আমি উপনিষদের সারোদ্ধার করিতেছি"। ভাষ্যকারোক্ত শ্লোকটীর চতুর্থ পাদে "বিদ্যোদ্দেশে গরীয়সী" এবং "বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা" এইরূপ পাঠভেদও দৃষ্ট হয়। মহামতি চাণক্য-প্রণীত "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থেও এই শ্লোকটী দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে চতুর্থ পাদে "শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা" এইরূপ পাঠ আছে। চাণক্যই এই ন্যায়ভাষ্যের কর্ত্তা, বাৎস্যায়ন তাঁহারই নামান্তর—এই মত সমর্থনে চাণক্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের ঐ শ্লোকটীও উল্লিখিত হইয়া থাকে।

যদি সর্ব্ববিদ্যার উপযোগী "প্রমাণ" প্রভৃতি পদার্থগুলিই এই শাস্ত্রের ব্যুৎপাদ্য হইল, তাহা হইলে সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা মোক্ষকে এই শাস্ত্রের ফল বলিয়া বুঝা যায় না; কারণ, ব্যুৎপাদ্য প্রমাণাদি পদার্থের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায়, ইহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানে ভিন্ন

ভিন্ন বিদ্যাসাধ্য সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই লাভ করা যায়। ন্যায়বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়সের অন্য বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়স হইতে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কা মনে করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন -"তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সকল বিদ্যাতেই "তত্ত্বজ্ঞান" এবং "নিঃশ্রেয়স" আছে। অন্য বিদ্যা সাধ্য সেই সমস্ত নিঃশ্রেয়স হইতে ন্যায়বিদ্যার মুখ্য ফল নিঃশ্রেয়স যে বিভিন্ন হইবে, ইহা সেই সমস্ত বিদ্যা ও তাহার ফল তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। মনূক্ত ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এবং আন্বীক্ষিকী, এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যার মধ্যে বেদবিদ্যার নাম "ত্রয়ী," যাগাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, স্বর্গপ্রাপ্তিই সেখানে নিঃশ্রেয়স। কৃষ্যাদি জীবিকা-শাস্ত্রের নাম বার্ত্তা, ভূম্যাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, কৃষি-বাণিজ্যাদি লাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সাম, দান, ভেদ দণ্ডাদি প্রয়োগ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, রাজ্যাদিলাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। এই সমস্ত বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়াছেন— "যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্।" এবং যদিও প্রমাণাদি পদার্থগুলি সর্ব্ববিদ্যার উপযোগী বলিয়া সর্ব্ববিদ্যা-সাধারণ, কিন্তু আত্মা প্রভৃতি"প্রমেয়"রূপ অসাধারণ পদার্থের উল্লেখ থাকায়, ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা। তাই বলিয়াছেন—"ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়াং" ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্ব্ববিদ্যাসাধারণ প্রমাণাদি পদার্থের ব্যুৎপাদক বলিয়া, সর্ব্ববিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভের সহায় হইলেও এবং সংশয়াদি প্রস্থান ভেদবশতঃ উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া এবং আত্মনিরূপণরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বলিয়া, এই ন্যায়বিদ্যা যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন ইহাতে আত্মাদি বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেয়স লাভ বুঝিতে হইবে।

এখানে স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার ন্যায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন এবং এখানেও প্রথমে ন্যায়বিদ্যাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ এবং সর্ব্বকর্ম্মের উপায় এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় বলিতে আমরা সর্ব্বধর্ম্মের রক্ষক বুঝি; উদ্যোতকর ও বাচস্পতি অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তিনি যে সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকারও ভাষ্যকারের ঐ কথার অবতারণায় বলিয়াছেন যে, সূত্রকার মোক্ষকে ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন বলিয়াছেন, কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এমন কোন প্রয়োজন নাই, যাহাতে ন্যায়বিদ্যা নিমিত্ত নহে—আবশ্যক নহে। সেখানে তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে উদয়ন বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারোক্ত অন্য প্রয়োজনগুলি সূত্রকারোক্ত প্রয়োজনের বিরোধী নহে, পরন্তু অনুকূল। ইহা দেখাইতেই বাচস্পতি সূত্রকারোক্ত প্রয়োজনের অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ভাষ্যকার অন্যান্য বিদ্যার ফল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলিকেও ন্যায়বিদ্যার ফল বলিয়াছেন এবং তাহা সত্য, এ কথা তাৎপর্য্যটীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। উদয়নও

এই বিষয়ের উপসংহারে বাচস্পতির তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় মোক্ষকে প্রধান বলিয়া অন্য বিদ্যার দৃষ্ট ফলগুলিকে ন্যায়বিদ্যার গৌণ ফল বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কেহ না বলিয়া পারেন না। তবে অন্য বিদ্যাসাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলিই কেবল ন্যায়বিদ্যার ফল নহে, ন্যায়বিদ্যা যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন তাহার অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স ফল রহিয়াছে এবং তাহাই প্রধান ফল; সুতরাং ফলাংশেও অন্য বিদ্যা হইতে ন্যায়বিদ্যার ভেদ আছে। পরন্তু যে বিদ্যার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, তাহাকেই সেই বিদ্যায় "নিঃশ্রেয়স" বলা হয় এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধনকেই সেই বিদ্যায় "তত্ত্বজ্ঞান" বলা হয়। ন্যায়বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া তাহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধন আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞান, সুতরাং ভাষ্যকার অপবর্গকে ন্যায়বিদ্যায় "নিঃশ্রেয়স" বলিয়াছেন এবং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য নিঃশ্রেয়স ন্যায়বিদ্যার ফলই নহে, এ কথা বলা হয় নাই। অধ্যাত্ম অংশ লইয়া ন্যায়-বিদ্যার যাহা মুখ্য ফল, সেই ফলাংশে অন্যান্য দৃষ্টফলক বিদ্যা হইতে ন্যায়বিদ্যার ভেদ দেখাইতেই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। উপনিষদের ন্যায় "ন্যায়বিদ্যা" যদি কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইত এবং মোক্ষ ভিন্ন আর কোন ফল তাহার না থাকিত, তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ কথার কোন প্রয়োজনও ছিল না। অন্য বিদ্যার ফল দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সগুলি ন্যায়বিদ্যার ফল বলিয়াই সেই সকল বিদ্যার ফলের সহিত ন্যায়বিদ্যার ফলের সম্পূর্ণ অভেদের আপত্তি হয়। এ জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ন্যায়বিদ্যা যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন অপবর্গরূপ মুখ্য ফল থাকায় সে আপত্তি হইবে না; কারণ, সে ফলটী ত আর দৃষ্টফলক অন্য বিদ্যায় নাই? তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, "ন্যায়বিদ্যা" বেদের কর্ম্মকাণ্ড, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি-বিদ্যার ন্যায় কেবল দৃষ্ট-ফলক বিদ্যাও নহে, আবার উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাও নহে; কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা, অপবর্গই ইহার মুখ্য প্রয়োজন, অন্যান্য সমস্ত নিঃশ্রেয়স ইহার গৌণ প্রয়োজন; কারণ, তাহা লাভ করিতেও এই ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক। তাহা হইলে ন্যায়বিদ্যা অন্য সমস্ত বিদ্যা হইতে বিশিষ্ট, এই বিশিষ্ট বিশেষটী আর কোন বিদ্যাতেই নাই। মহর্ষি প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই সূচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। ন্যায়বিদ্যা মুখ্য ও গৌণ সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই সম্পাদন করে—ইহা যখন সত্যকথা, সর্ব্বস্বীকৃত কথা, তখন মহর্ষি নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা তাহা না বলিবেন কেন? তাহা বলিলে এবং তাহা বুঝিলে অন্য কোন অনুপপত্তিও দেখা যায় না এবং ভাষ্যকারও যে সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই গ্রহণ করেন নাই, ইহাও বুঝা যায় না। পরন্তু তিনি যখন সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সেই ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক বলিয়াছেন, তখন সূত্রকারের কথার দ্বারাও তিনি ইহা সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝা যায়—ইহা বলা যায়। তবে তিনি অনেক স্থলে যে 'অপবর্গ' অর্থেই নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রতিপাদ্য মুখ্য নিঃশ্রেয়স অপবর্গের কথা বলিবার জন্য, তাহাতে সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা তিনি কেবল অপবর্গই বুঝিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকার

সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা কেবল অপবর্গের ব্যাখ্যা করিলেও এবং উদয়ন প্রভৃতি তাহার সমর্থন করিলেও ভাষ্যকার যে সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সেই ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক বলিয়াছেন এবং অন্যান্য বিদ্যার নিঃশ্রেয়সগুলিও ন্যায়বিদ্যার ফল বলিয়াছেন এবং তাহা সত্যই বলিয়াছেন— এ কথা ত তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতিও বলিয়াছেন; তবে আর তাঁহাদিগের সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়সের ব্যাখ্যায় অন্যান্য সকল নিঃশ্রেয়সকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অদৃষ্ট-নিঃশ্রেয়স অপবর্গের প্রতি এত পক্ষপাত কেন? সুধীগণ উপেক্ষা না করিয়া ইহার মীমাংসা করিবেন এবং মহর্ষি অন্যত্র অপবর্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াও কেবল প্রথম সূত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তা করিবেন। মোক্ষ শব্দের বা অপবর্গ শব্দের প্রয়োগ করিলেও জীবন্মুক্তি ও পরা মুক্তি তাহার দ্বারা বুঝা যাইত। কেবল জীবন্মুক্তিও যদি প্রথম সূত্রে মহর্ষির বক্তব্য হয়, তাহা হইলেও নিঃশ্রেয়স শব্দপ্রয়োগ সার্থক হয় না; কারণ, উহার দ্বারা পরা মুক্তিও বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-কল্পনার দ্বারা জীবন্মুক্তিমাত্রই যদি বুঝিতে হয়, তবে তাহা মোক্ষ প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে। কণাদসূত্রেও প্রথমে নিঃশ্রেয়স শব্দই দেখা যায়। টীকাকারগণ তাহার মোক্ষমাত্র অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও সূত্রকার স্বল্পাক্ষর মোক্ষ প্রভৃতি কোন শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; কেন, তাহা ভাবা উচিত। স্বল্পাক্ষর শব্দ প্রয়োগই সূত্রে করিতে হয়, ইহা সূত্রের লক্ষণে পাওয়ায়[১] সুধীগণ এ সকল কথাও চিন্তা করিয়া মহর্ষির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। এখন একবার স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার ভাষ্যারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমেই সামান্যতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের অনুমান দেখাইয়াছেন। তাহার পরে প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি— এই চারিটীর স্বরূপ বলিয়া ঐ চারিটী থাকাতেই তত্ত্বপরিসমাপ্তি হইতেছে, এই কথা বলিয়াছেন। শেষে ঐ তত্ত্ব কি, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাব ও অভাবরূপ দুইটী তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং অভাবরূপ তত্ত্বও যে প্রমাণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা বলিয়াছেন। শেষে মহর্ষি ভাব পদার্থের ষোলটী প্রকার সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এই কথা বলিয়া মহর্ষির কথিত সেই ষোড়শ পদার্থ প্রদর্শনের জন্য মহর্ষির প্রথম সূত্রের অবতারণা করিয়া তাহার সমাস ও বিগ্রহবাক্য এবং ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশপূর্ব্বক সংক্ষেপে সূত্রের বক্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়াছেন।

শেষে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন, ইহা বলিয়া, তাহা কিরূপে বুঝা যায়, ইহা বলিবার জন্য দ্বিতীয় সূত্রের কথা বলিয়াছেন এবং তাহা বলিবার জন্যই হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য—এই চারিটীকে 'অর্থপদ' বলিয়া তাহাদিগের সম্যক্ জ্ঞানে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়, এ কথা বলিয়াছেন।

তাহার পরে সূত্রে সংশয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন হইয়াছে,

১। স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥—পরাশরোপপুরাণ, ১৮ অঃ।

এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক সংশয় প্রভৃতি পদার্থ ন্যায়বিদ্যার পৃথক্ ‘প্রস্থান’ অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য উহাদিগের ব্যুৎপাদন বা বিশেষরূপে বোধ সম্পাদন করাই ন্যায়বিদ্যার অসাধারণ ব্যাপার, তাহা না করিলে ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে; সুতরাং সংশয়াদি পদার্থগুলির বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে ইত্যাদি কথার দ্বারা সামান্যতঃ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে বিশেষ করিয়া সংশয় ন্যায়-বিদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য কেন, এ বিষয়ে কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সংশয়ের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে প্রয়োজন পদার্থের স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহারও পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে ‘ন্যায়’ কি, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহাতে ন্যায়ের স্বরূপ বলিয়াছেন, ন্যায়কেই অন্বীক্ষা বলে, এই কথা বলিয়া ন্যায়বিদ্যাকেই আন্বীক্ষিকী বলে, ইহা বুঝাইয়াছেন। ন্যায়ের কথায় ন্যায়াভাস কাহাকে বলে, তাহা বলিয়াছেন। তাহার পরে বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা করিয়া বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন নহে এবং স্বপক্ষসিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইয়াছেন, নিষ্প্রয়োজন-বিতণ্ডাবাদী ও শূন্যবাদীর মত খণ্ডন করিয়া বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে যথাক্রমে দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডার সংক্ষেপে স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে নিগ্রহস্থানের মধ্যে হেত্বাভাসের উল্লেখ থাকিলেও আবার পৃথক্ করিয়া হেত্বাভাসের উল্লেখের দ্বারা মহর্ষি কি সূচনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন। তাহার পরে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়া শেষে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন এবং যদিও সর্ব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রয়োজন,—আন্বীক্ষিকীর সাহায্য ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় না, তথাপি আন্বীক্ষিকী—অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া ইহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানই ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান। ঐ তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐ অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স ইহার মুখ্য ফল বলিয়া ফলাংশেও অন্য বিদ্যা হইতে এই ন্যায়বিদ্যা বিশিষ্ট এবং অন্যান্য বিদ্যা-সাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সও এই ন্যায়বিদ্যার গৌণ ফল বলিয়া ইহা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেও বিশিষ্ট। ভাষ্যকার এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রথম সূত্র-ভাষ্যের সমাপ্তি করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষে সমাপ্তিসূচক ‘ইতি’ শব্দ কোন পুস্তকে দেখা না গেলেও ভাষ্যকার নিশ্চয়ই ইতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। তিনি বাক্যসমাপ্তি সূচনার জন্যও প্রায় সর্ব্বত্র ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রথম সূত্রভাষ্য-বার্ত্তিকের শেষে ইতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন—“ইতি সূত্রসমাপ্তৌ।” এখানে উদ্যোতকরের পাঠানুসারে ভাষ্যকারের পাঠ স্থির করিয়া প্রচলিত কোন কোন পাঠ পরিত্যক্ত হইয়াছে। উদ্যোতকর অনেক স্থলে ভাষ্যকারের পাঠও উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং স্থলবিশেষে উদ্যোত-করের পাঠকেও প্রকৃত ভাষ্যপাঠ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়,—ঐরূপ প্রাচীন সংবাদ ব্যতীত ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের উপায়ই বা কি আছে?

মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্রার্থ না বুঝিয়া প্রাচীন কালে কোন বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, গোতমোক্ত "বাদ" হইতে "নিগ্রহস্থান" পর্য্যন্ত পদার্থগুলির জ্ঞান মোক্ষের কারণ হইতেই পারে না। যাহা পর-পরাভবের উপায়, যাহাতে অপরকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহা অহঙ্কারাদির কারণ হইয়া মোক্ষের প্রতিবন্ধকই হয়। যাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহাকে কি মোক্ষের কারণ বলা যায়? সুতরাং গোতমের প্রথম সূত্রে যখন "বাদ," "জল্প," "বিতণ্ডা" প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের কারণরূপে বলা হইয়াছে, তখন ঐ সূত্রার্থ নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ্য। এইরূপ মত প্রকাশ এখনও অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা পুরাতন কথা। উদ্যোতকর মহর্ষি গোতমের প্রথম সূত্র ব্যাখ্যার উপসংহারে পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, সূত্রার্থ না বুঝিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা আত্মাদি "প্রমেয়" তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে এবং প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরায় তাহাতে আবশ্যক, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "জল্প," "বিতণ্ডা" প্রভৃতির জ্ঞানে মুমুক্ষুর অহঙ্কার জন্মে না। কিন্তু উহার দ্বারা মোক্ষ-সাধনের প্রতিবন্ধক অন্য ব্যক্তির অহঙ্কার নিবৃত্তি করা যায়, তজ্জন্য অনেক অবস্থায় মুমুক্ষুর উহা আবশ্যক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের পরিপন্থী নহে, পরন্তু উহা মোক্ষের অনুকূল।

উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী "বাদ," "জল্প," "বিতণ্ডা" প্রভৃতির জ্ঞানকে যে অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়াছেন, তাহাও ঠিক বলা হয় নাই। কারণ, যাহাদিগের ঐ সকল পদার্থের কোনই জ্ঞান নাই, তাহাদিগেরও অহঙ্কারাদির উদ্‌ভব দেখা যায়, আবার তত্ত্বজ্ঞানী প্রকৃত পণ্ডিতের ঐ সকল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অহঙ্কারাদির উদ্‌ভব দেখা যায় না, তবে আর ঐ সকল জ্ঞানকে অহঙ্কারাদির কারণ বলা যায় কিরূপে?

বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধির উপায়ের অনুষ্ঠান থাকিলে বিদ্যা বা তর্ক-কুশলতা প্রভৃতির ফলে কাহারও অহঙ্কারাদি বাড়ে না, উহার ফলে যাহার অহঙ্কারাদি বাড়ে, বিবাদপ্রিয়তা জন্মে, জিগীষার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সে ত মুমুক্ষুই নহে, প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তির উহা দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না, পরন্তু ইষ্টই হয়। আমরা কি কোন তর্ক-কুশল ব্যক্তিকেই ধীর, স্থির, শান্ত দেখিতে পাই না? তর্ক-কুশল হইলেই কি তাহার আর কোন উপায়েই চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না? অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বস্তুতঃ বিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই অহঙ্কারের বীজ বপন করেন না, সকলকে লক্ষ্য করিয়াই "বিদ্যা বিবাদায়" বলা হয় নাই, তাহা হইলে মহাজনগণ, মুমুক্ষুগণ, ভক্তগণ কোন দিনই বিদ্যার আলোচনা করিতেন না। ভক্তের গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতেও আমরা উত্তমাধি-কারীর মধ্যে "শাস্ত্রযুক্তিসুনিপুণ"[১] ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। ফল কথা, শাস্ত্রযুক্তিনিপুণতা প্রকৃত অধিকারীর কোন অনিষ্ট ত করেই না, পরন্তু তাহার অধিকারের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া

১। শাস্ত্রযুক্তিসুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার।—চৈ চঃ, মধ্যলীলা, ২২ পঃ। মহাপ্রভুর নিজের উক্তি।

তাহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, তাহার লক্ষ্যের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে, তাহার শ্রদ্ধাকে সর্ব্বদা দৃঢ় করিয়া রাখে, সুতরাং প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নানা ভাবেই মোক্ষের সহায় হয়। তন্মধ্যে আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ এবং আত্মাদি পদার্থের শ্রবণমননাদিরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান তাহাতে পূর্ব্বে আবশ্যক, তাহাতে আবার প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এই ভাবে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মহর্ষি এক সঙ্গে নিঃশ্রেয়সের উপায় বলিয়াছেন। উহার দ্বারা প্রমাণাদি সমস্ত পদার্থের যে কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে না। যাহা পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের সাধন, তাহাও ঋষিগণ নিঃশ্রেয়সকর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। গীতায় আছে,—

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ" ॥ ৫।২।

এখানে "সন্ন্যাস" ও "কর্ম্মযোগ" কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মোক্ষসাধন বলা হইয়াছে? তাহা কি হইতে পারে? সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদন করে বলিয়াই তাহাকে নিঃশ্রেয়সকর বলা হইয়াছে। ঐরূপ অতি পরম্পরায়ও যাহা মোক্ষে সহায়তা করে, এমন অনেক কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া "ইহা করিলে আর ভবদর্শন হয় না, ইহা করিলে আর জননী-জঠরে আসিতে হয় না," এইরূপ কথা বলিতে ব্রহ্মবাদী বাদরায়ণও বিরত হন নাই। ফলকথা, প্রথম সূত্রে "বাদ," "জল্প" প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন বলা হয় নাই। ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কি ভাবে কেন মোক্ষসাধন, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া দ্বিতীয় সূত্রে কিছু দেখুন। ১ ॥

ভাষ্য। তচ্চ খলু বৈ নিঃশ্রেয়সং কিং তত্ত্বজ্ঞানানন্তরমেব ভবতি? নেত্যুচ্যতে, কিং তর্হি? তত্ত্বজ্ঞানাৎ।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ন্যায়বিদ্যার মুখ্য ফল অপবর্গ কি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয়? (উত্তর) ইহা বলা হয় নাই, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরেই মুখ্য ফল নির্ব্বাণ লাভ হয়, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞান হইতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত (দ্বিতীয় সূত্রোক্তক্রমে নির্ব্বাণ লাভ হয়)।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, প্রয়োজন এবং তাহা-দিগের পরস্পর সম্বন্ধের সূচনা করতঃ প্রমাণাদি পদার্থের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহারই নাম "উদ্দেশ"। ঐ পদার্থগুলির "লক্ষণ" বলিয়া শেষে "পরীক্ষা" করিবেন। কারণ, পদার্থের পরীক্ষা ব্যতীত তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব নহে। কিন্তু পদার্থের "প্রয়োজন" ও সম্বন্ধের নির্ণয় না হইলেও তাহার লক্ষণ ও পরীক্ষার অবসর উপস্থিত হয় না। "পরীক্ষা" ব্যতীত আবার ঐ প্রয়োজন ও সম্বন্ধের নির্ণয় হইতে পারে না, এ জন্য মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ঐ প্রয়োজন ও সম্বন্ধের পরীক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সূত্রটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ ব্যতীত সিদ্ধান্ত কখন সম্ভব হয় না, এ জন্য ভাষ্যকার একটি পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াই দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নির্ব্বাণরূপ অপবর্গই মুখ্য নিঃশ্রেয়স। তাহা তাহার কারণ তত্ত্বজ্ঞান-বিশেষের পরেই জন্মিবে। ইহা অস্বীকার করিলে মহর্ষির প্রথম সূত্রের ঐ কথা মিথ্যা হইয়া যায়। মহর্ষি প্রথম সূত্রে যে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে মুখ্য নিঃশ্রেয়স অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণরূপে সূচনা করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরেই যদি তাহার কার্য্য অপবর্গ না হয়, তাহা হইলে মহর্ষি তাহাকে সাক্ষাৎ কারণ বলিতে পারেন না, সাক্ষাৎ কারণের পরেই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। মহর্ষি প্রথম সূত্রে অবশ্য কোন তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ বলিয়া সূচনা করিয়াছেন, ঐ চরম কারণ তত্ত্বজ্ঞানবিশেষ জন্মিলে অপবর্গ লাভে আর বিলম্ব হইবে কেন? যদি তাহাই হইল, যদি তত্ত্বদর্শনের পরক্ষণেই নির্ব্বাণ লাভ হইয়া গেল, তাহা হইলে তত্ত্বদর্শীর নিকটে তাঁহার দৃষ্ট তত্ত্ববিষয়ে কোন উপদেশ পাওয়া সম্ভব হইল না, তিনি তত্ত্ব দর্শনের পরক্ষণেই নির্ব্বাণ লাভ করায়, আর কাহাকেও কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না। সুতরাং শাস্ত্র-বাক্যগুলি তত্ত্বদর্শীর বাক্য হওয়া অসম্ভব। তত্ত্বদর্শী ব্যতীত আর সকলেই ভ্রান্ত, আর কাহারও উপদেশ শাস্ত্র বলিয়া মানা যায় না, সুতরাং শাস্ত্র নামে প্রচলিত বাক্যগুলি ভ্রান্তের বাক্য বলিয়া বস্তুতঃ শাস্ত্র নহে, তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের আশা করা অসম্ভব। যিনি তত্ত্বদর্শী, অথচ জীবিত থাকিয়া তত্ত্বের উপদেশ করিবেন, এমন ব্যক্তি কোথায় মিলিবে? তত্ত্বদর্শনের পরক্ষণেই যে নির্ব্বাণলাভ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার "তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এই কথার যোগ করিয়া, দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণার দ্বারা তাঁহার উত্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর জানাইয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ কথার সহিত দ্বিতীয় সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে।

উত্তরপক্ষের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তি দ্বিবিধ,—পরা ও অপরা; নির্ব্বাণ মুক্তিকেই পরা মুক্তি বলে। তাহা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেই হয় না, তাহা যে ক্রমে হয়, মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সেই ক্রম বলিয়াছেন। অপরা মুক্তি তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরেই জন্মে, তাহাকেই বলে "জীবন্মুক্তি"। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের মহিমায় মুমুক্ষুর পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু "প্রারব্ধ" ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম থাকে, ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয় নাই। সুতরাং জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রারব্ধ ভোগের জন্য যত দিন দেহ ভোগ করেন, তত দিন তাঁহার নির্ব্বাণ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তাবদেবাস্য চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"। মুমুক্ষু আত্মাদি বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট করিবার জন্য প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্র হইতে আত্মাদির প্রকৃত স্বরূপের শাব্দ বোধ করেন, ইহারই নাম শ্রবণ। তাহার পরে যুক্তির দ্বারা সেই শ্রুত তত্ত্বের পরীক্ষা করেন, ইহারই নাম মনন; ইহা এই ন্যায়বিদ্যার অধীন, এই ন্যায়বিদ্যা "প্রমাণের" তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য "সংশয়" প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য-ভেদে ব্যবস্থিত "প্রমেয়" পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞাপনের জন্যই আবার প্রমাণের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। প্রমাণের দ্বারা বিচার করিলে বুঝা যাইবে—আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে "আত্মা" ও

"অপবর্গই" গ্রাহ্য, আর দশটি ত্যাজ্য, ঐ দশটি দুঃখের হেতু এবং দুঃখ, এ জন্য "হেয়"। ন্যায়-বিদ্যার সাহায্যে মননের দ্বারা আত্মাদি "প্রমেয়ের" তত্ত্বাবধারণ হইলেও মিথ্যা জ্ঞানজন্য সংস্কার থাকায়, আবারও পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রম সাক্ষাৎকার করে। দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তির সহস্র অনুমানের দ্বারাও পূর্ব্বসংস্কার যায় না। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই মিথ্যা সাক্ষাৎকার বা বিপরীত সাক্ষাৎকার নিবৃত্ত হইতে পারে এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকারজন্য সংস্কারই বিপরীত সংস্কারকে দূর করিতে পারে, ইহা লোকসিদ্ধ, অর্থাৎ লৌকিক ভ্রম স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। যে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার রজ্জুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভ্রম একেবারে যায় না, অন্য কোন আপ্ত ব্যক্তি "ইহা সর্প নহে" বলিয়া দিলেও এবং উপযুক্ত হেতুর সাহায্যে "ইহা সর্প নহে" এরূপ অনুমান হইলেও, আবার অনেক পরে নিকটে গেলে সেই সর্পবুদ্ধি তখনই উপস্থিত হয়; কিন্তু রজ্জুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া গেলে আর সে ভ্রম হয় না। সেইরূপ আত্মাদি বিষয়ে জীবের ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক, বৈদান্তিক সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত কোন মহাবাক্যজন্য পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানে উহা যাইতে পারে না, উহা নাশ করিতে হইলে ঐ আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে, সুতরাং তাহার জন্য মননের পরে ঐ আত্মা প্রভৃতির শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ স্বরূপের ধ্যান-ধারণাদি করিতে হইবে, তাহাতে যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় আশ্রয় করিতে হইবে, তাহাতে ঈশ্বর-প্রণিধানও আবশ্যক হইবে। ঐ ধ্যান-ধারণাদি জন্য যে যথার্থ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিবে, তাহাই পরে কালবিশেষে আত্মাদির তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মাইবে, উহাই আত্মাদি বিষয়ে চতুর্থ বিশেষ জ্ঞান। উহা হইলে আর তখন মিথ্যা জ্ঞানজন্য সংস্কারের লেশ মাত্র থাকিবে না। ঐ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মিয়া গেলে আর তাঁহাকে বদ্ধ বলা যায় না, তিনি তখন মুক্ত, তবে সহসা তিনি তখন দেহাদিবিযুক্ত হন না, প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের জন্য তিনি জীবিত থাকেন। সেই তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাই শাস্ত্রবক্তা, তাঁহাদিগের উপদেশই শাস্ত্র। তাঁহাদিগের উপদেশেই শাস্ত্র-সম্প্রদায় রক্ষা ও লোকশিক্ষা অব্যাহত আছে। ফলতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয় না, জীবন্মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হইয়া থাকে, সুতরাং কোন দিকেই বিরোধ নাই এবং তত্ত্বদর্শী মুক্ত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্বের উপদেশ পাওয়াও অসম্ভব হইল না। শাস্ত্র এবং এই সকল যুক্তির দ্বারাই মুক্তির পূর্ব্বোক্ত দ্বৈবিধ্য বুঝা গিয়াছে। মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পরা মুক্তির ক্রম বলিয়াছেন, তাহাতে এবং প্রথম সূত্রের কথাতে অপরা মুক্তির কথাও পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও দ্বিতীয় সূত্রে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সূত্র। দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানা-মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম), দোষ (রাগ ও দ্বেষ) এবং মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজ্ঞান, ইহাদিগের পরপরটির বিনাশে (কারণনাশে কার্য্যনাশক্রমে) "তদনন্তর"গুলির অর্থাৎ ঐ

মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পরপরটির অব্যবহিত পূর্ব্বগুলির অভাব প্রযুক্ত অপবর্গ হয় (নির্ব্বাণ লাভ হয়) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়, মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়, জন্মের নিবৃত্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি।

বিবৃতি। বদ্ধ জীবমাত্রেরই দুঃখনিবৃত্তির জন্য ইচ্ছা স্বাভাবিক, একেবারে সংসার ছাড়িয়া দুঃখমুক্ত হইতে সকলের ইচ্ছা না হইলেও দুঃখ কেহ চায় না, আমার দুঃখ না হউক, আমি কষ্ট না পাই, এরূপ ইচ্ছা সকলেরই স্বাভাবিক এবং সে জন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও রুচি অনুসারে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। দুঃখ কাহারই ভাল লাগে না। 'যাহা প্রতিকূল ভাবে অর্থাৎ স্বভাবতঃই অপ্রিয় ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা দুঃখ।' দুঃখের সহিত সকলেরই সুচিরকাল হইতে পরিচয় আছে, সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, ভাষায় তাহার পরিচয় দেওয়াও সহজ নহে। দুঃখের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা দুঃখ এবং তাহার ভোগ অতি সহজ। 'অনাদি কাল হইতে সকলেই দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং তাহার শান্তির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে।' মূলের খবর লইলে কাহারই প্রাণে শান্তি নাই। দুঃখনিবৃত্তির জন্য সকলেরই ইচ্ছা, সকলেরই চেষ্টা, ইহা অস্বীকার করিলে জোর করিয়া সত্যের অপলাপ করা হয়। দুঃখ বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে তাহার সহিত অনাদি কাল হইতে নিরন্তর জীবকুলের কখনই এত সংগ্রাম চলিত না। কিন্তু নিরন্তর নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও, দুঃখের সহিত বহু বহু সংগ্রাম করিয়াও যত দিন জন্ম আছে, তত দিন কেহই দুঃখের হস্ত হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে পারিতেছে না। জন্মিলেই দুঃখ, জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি যত বড়ই হউন না কেন, দুঃখকে কেহই একেবারে তাড়াইয়া দিতে পারেন না। দুঃখভোগ সকলকেই করিতে হয়, এ সত্য চিন্তাশীলের অজ্ঞাত নহে। জন্ম হইলে দুঃখভোগ কেন অনিবার্য্য, সংসারী সর্ব্বদাই দুঃখের গৃহে কেন বাস করেন, ইহাও চিন্তাশীলদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ফল কথা, বদ্ধ জীব দুঃখের কারাগারে নিয়ত বাস করিতেছে, জন্মই তাহাকে দুঃখের সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছে, ইহা ভাবিয়া বুঝিলে অবশ্যই বুঝা যাইবে। মূলকথা, জন্ম দুঃখের কারণ। এই জন্মের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল সুখভোগ ও দুঃখভোগ করিবার জন্যই জীবকে বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মফলানুসারে বিশিষ্ট শরীরাদি-সম্বন্ধই জন্ম। শরীরাদি ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ হওয়া একেবারে অসম্ভব, সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম (যাহা শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি-(কর্ম্ম)সাধ্য বলিয়া 'প্রবৃত্তি' শব্দের দ্বারাও কথিত হইয়াছে) জীবের শরীরাদি সম্বন্ধরূপ জন্ম সম্পাদন করিয়াই সুখভোগ ও দুঃখভোগ জন্মায়। এই "প্রবৃত্তি"র অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ "দোষ"। দোষ বলিতে এখানে "রাগ" অর্থাৎ বিষয়ে অভিলাষ বা আসক্তি এবং "দ্বেষ"। এই রাগ ও দ্বেষবশতঃই জীব শুভ ও অশুভ

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যিনি রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত, যাঁহার ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই তুল্য, যিনি গীতার ভাষায় "নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি," তিনি ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিহারের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না, তিনি আসক্তির প্রেরণায় কোন সৎ বা অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত হন না, তিনি বিদ্বেষ-বিষের জ্বালায় কাহারও কোন অনিষ্ট সাধন করিতে যান না। এক কথায় তিনি কায়িক, বাচিক, মানসিক কোন শুভ বা অশুভ কর্ম্মে আসক্ত নহেন, রাগ ও দ্বেষ না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ ঘটিতেই পারে না এবং তিনি কোন কর্ম্ম করিলেও তজ্জন্য তাঁহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয় না। মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যার অধিকারে থাকা পর্য্যন্তই কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সঞ্চয় হয়। এই রাগ ও দ্বেষের কারণ "মিথ্যাজ্ঞান"।, অনাদিকাল হইতে আত্মা ও শরীরাদি বিষয়ে জীবকুলের যে নানাপ্রকার ভ্রম জ্ঞান আছে, তাহার ফলেই তাহাদিগের রাগ ও দ্বেষ জন্মে। যাঁহার ঐ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়াছে, যিনি প্রকৃত সত্যের দেখা পাইয়াছেন, তাঁহার আর রাগ ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না, কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না, মিথ্যাজ্ঞান যাহার কারণ, তাহা মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে কিরূপে হইবে? অনাদিকাল হইতে জীবের নিজ শরীরাদি বিষয়ে অহঙ্কাররূপ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। ঐ শরীরাদি বিষয়ে আমিত্ব-বুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের ফলেই তাহার ইষ্ট বিষয়ে আসক্তি এবং অনিষ্ট বিষয়ে বিদ্বেষ জন্মিতেছে এবং আরও বহু বহু প্রকার মিথ্যাজ্ঞান জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে বদ্ধ করিতেছে। এই সকল সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের মহিমায় জীবের রাগ ও দ্বেষ জন্মে। রাগ ও দ্বেষবশতঃই শুভ ও অশুভ কর্ম্ম করিয়া জীব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহার ফলভোগের জন্য আবার জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ অনিবার্য্য। সুতরাং বুঝা যায়, যে দুঃখের ভাবী আক্রমণ নিবারণ জন্য জীবগণের এত ইচ্ছা, এত চেষ্টা, এত সংগ্রাম, তাহার মূলই "মিথ্যা-জ্ঞান"। সত্যজ্ঞান ব্যতীত এ মিথ্যাজ্ঞান কখনই যাইতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞানের সুদৃঢ় সুসংস্কার ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের কুসংস্কার আর কিছুতেই যাইতে পারে না। রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন উপায়েই তাহাতে সর্পভ্রম বিনষ্ট হয় না—হইতে পারে না। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি করিতে হইলে, চিরকালের জন্য দুঃখভয় হইতে মুক্ত হইতে হইলে তাহার মূল "মিথ্যাজ্ঞান"কে একেবারে বিনষ্ট করিতে হইবে। রোগের নিদান একেবারে উচ্ছিন্ন না হইলে রোগের আক্রমণ একেবারে রুদ্ধ হয় না, সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে।—সুতরাং সত্যজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞান বিনষ্ট করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। যে বিষয়ে যেরূপ মিথ্যাজ্ঞান আছে, সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত জ্ঞানই "তত্ত্বজ্ঞান"। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে উহা লাভ করিলে পরক্ষণেই মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইবে। তত্ত্বজ্ঞানজন্য সংস্কারে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই অর্থাৎ তজ্জন্য সংস্কারের উচ্ছেদ হইলেই কারণের অভাবে রাগ ও দ্বেষ আর জন্মিল না। রাগ ও দ্বেষ না থাকায় আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মিল না, তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া গেল, ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাবে আর জন্ম হইতে পারিল না, জন্ম না হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনাই থাকিল না, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগান্তে বর্ত্তমান জন্মটা নষ্ট হইয়া গেলেই সব গেল, তখনই নির্ব্বাণ, তখনই সর্ব্ব দুঃখের চিরশান্তি।

ভাষ্য। তত্র আত্মাদ্যপবর্গপর্য্যন্তপ্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারকং বর্ত্ততে। আত্মনি তাবন্নাস্তীতি। অনাত্মন্যাত্মেতি, দুঃখে সুখমিতি, অনিত্যে নিত্যমিতি, অত্রাণে ত্রাণমিতি, সভয়ে নির্ভয়মিতি, জুগুপ্সিতেঽভিমতমিতি, হাতব্যেঽপ্রতিহাতব্যমিতি। প্রবৃত্তৌ—নাস্তি কর্ম্ম, নাস্তি কর্ম্মফলমিতি। দোষেষু—নায়ং দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে—নাস্তি জন্তুর্জ্জীবো বা সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেয়াৎ প্রেত্য চ ভবেদিতি। অনিমিত্তং জন্ম, অনিমিত্তো জন্মোপরম ইত্যাদিমান্ প্রেত্যভাবোঽনন্তশ্চেতি। নৈমিত্তিকঃ সন্নকর্ম্মনিমিত্তঃ প্রেত্যভাব ইতি। দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনা-সন্তানোচ্ছেদ-প্রতিসন্ধানাভ্যাং নিরাত্মকঃ প্রেত্যভাব ইতি। অপবর্গে—ভীষ্মঃ খল্বয়ং সর্ব্বকার্য্যোপরমঃ সর্ব্ববিপ্রয়োগেঽপবর্গে বহু ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্ব্বসুখোচ্ছেদমচৈতন্যমমুমপবর্গং রোচয়েদিতি।

অনুবাদ। * সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত "প্রমেয়" বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান অনেক প্রকার আছে। (তন্মধ্যে কতকগুলি দেখাইতেছেন।) আত্মবিষয়ে "নাই" অর্থাৎ আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে) "আত্মা" এইরূপ জ্ঞান। (এখন শরীর হইতে মনঃ পর্য্যন্ত "প্রমেয়" বিষয়ে সামান্যতঃ কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতেছেন)।—দুঃখে—সুখ, এইরূপ জ্ঞান। অনিত্যে—নিত্য, এইরূপ জ্ঞান। অত্রাণে—ত্রাণ, এইরূপ জ্ঞান। সভয়ে—নির্ভয়, এইরূপ জ্ঞান। নিন্দিতে—অভিমত, এইরূপ জ্ঞান। ত্যাজ্যে—অত্যাজ্য, এইরূপ জ্ঞান। (এখন "প্রবৃত্তি" প্রভৃতি "অপবর্গ" পর্য্যন্ত প্রমেয়ে বিশেষ করিয়া কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতেছেন)।—প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে—কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, এইরূপ জ্ঞান। দোষ অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বিষয়ে—এই সংসার-দোষ নিমিত্তক অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-জন্য নহে, এইরূপ জ্ঞান। "প্রেত্যভাব" বিষয়ে (পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে)—যিনি মরিবেন এবং মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব নাই, সত্ত্ব বা আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান।

* আত্মা, শরীর, ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়, রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ, এই দ্বাদশবিধ পদার্থকে মহর্ষি প্রমেয় নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। ঐ প্রমেয় বিষয়ে বহুবিধ মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান এবং ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান। ভাষ্যকার সেই মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা করিয়াছেন।

জন্ম কারণশূন্য,—জন্মের নিবৃত্তি কারণশূন্য ; অতএব প্রেত্যভাব সাদি এবং অনন্ত, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব নিমিত্ত-জন্য হইলেও কর্ম্মনিমিত্তক নহে, এইরূপ জ্ঞান। * 'দেহ', 'ইন্দ্রিয়', 'বুদ্ধি', 'বেদনা' অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, ইহাদিগের যে সন্তান অর্থাৎ সঙ্ঘাত বা সমষ্টি, তাহার উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান বশতঃ অর্থাৎ ঐ দেহাদির এক সমষ্টির নাশের পরে তজ্জাতীয় অন্য এক সমষ্টির উৎপত্তি হয় বলিয়া, "প্রেত্যভাব" নিরাত্মক অর্থাৎ তাহাতে আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ-বিষয়ে—সর্ব্বকার্য্যোপরতি অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্বকার্য্যের নিবৃত্তি হয়, এমন, এই অপবর্গ ভয়ানক। সর্ব্ববিপ্রয়োগ অর্থাৎ যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিচ্ছেদ হয়, এমন অপবর্গে বহু শুভ নষ্ট হয়, সুতরাং কেমন করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাহাতে সকল সুখের উচ্ছেদ হয় এবং যাহাতে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, এমন, এই অপবর্গকে ভালবাসিবে ? এইরূপ জ্ঞান (মিথ্যাজ্ঞান)।

ভাষ্য। এতস্মান্মিথ্যাজ্ঞানাদনুকূলেষু রাগঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ। রাগদ্বেষাধিকারাচ্চাসত্যের্ষ্যামায়ালোভাদয়ো দোষা ভবন্তি। দোষৈঃ প্রযুক্তঃ শরীরেণ প্রবর্ত্তমানো হিংসাস্তেয়প্রতিষিদ্ধমৈথুনান্যাচরতি। বাচাঽনৃতপরুষসূচনাসম্বদ্ধানি। মনসা পরদ্রোহং পরদ্রব্যাভীপ্সাং নাস্তিক্যঞ্চেতি। সেয়ং পাপাত্মিকা প্রবৃত্তিরধর্ম্মায়। অথ শুভা—শরীরেণ দানং পরিত্রাণং পরিচরণঞ্চ। বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঞ্চেতি। মনসা দয়ামস্পৃহাং শ্রদ্ধাঞ্চেতি। সেয়ং ধর্ম্মায়। অত্র প্রবৃত্তিসাধনৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ "প্রবৃত্তি"শব্দেনোক্তৌ। যথা অন্নসাধনাঃ প্রাণাঃ—"অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ" ইতি। সেয়ং প্রবৃত্তিঃ কুৎসিতস্যাভিপূজিতস্য চ জন্মনঃ কারণং। জন্ম পুনঃ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধীনাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ। তস্মিন্ সতি দুঃখং। তৎ পুনঃ প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধনা পীড়া তাপ ইতি। ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধর্ম্মা অবিচ্ছেদেনৈব প্রবর্ত্তমানাঃ সংসার ইতি। যদা তু তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে

* দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং সুখ-দুঃখ, ইহাদিগের সমষ্টি-বিশেষই জীব। উহা ছাড়া অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে নৈরাত্ম্য-বাদী বলে। তাঁহাদিগের জ্ঞান এই যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখের এক সমষ্টির উচ্ছেদ হইলে, আর একটি পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সমষ্টির উৎপত্তি হয়, এই ভাবেই সংসার হইতেছে —ইহার মধ্যে নিত্য আত্মা কেহ নাই। কোন নিত্য আত্মাই যে ঐরূপ দেহাদি সমষ্টি লাভ করিতেছেন, তাহা নহে, সুতরাং প্রেত্যভাব নিরাত্মক। ভাষ্যকার এই জ্ঞানকে প্রেত্যভাব বিষয়ে এক প্রকার মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াছেন।

দোষা অপযন্তি। দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি। প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি। জন্মাপায়ে দুঃখমপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোঽপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি।

অনুবাদ। (ভাষ্যকার সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া এখন সূত্রোক্ত "মিথ্যাজ্ঞান," "দোষ," "প্রবৃত্তি," "জন্ম," "দুঃখ," এই কয়েকটি পদার্থের কার্য্য-কারণ-ভাব এবং ঐ "দোষ," "প্রবৃত্তি," "জন্ম" এবং "দুঃখের" স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন।) এই মিথ্যাজ্ঞান (পূর্ব্ববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞান) বশতঃ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। রাগ ও দ্বেষের অধিকারবশতঃ অসত্য, ঈর্ষ্যা, কপটতা, লোভ প্রভৃতি দোষ জন্মে। দোষকর্ত্তৃক প্রেরিত জীব প্রবর্ত্তমান হইয়া শরীরের দ্বারা হিংসা, চৌর্য্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ করে। বাক্যের দ্বারা মিথ্যা, পরুষ (কটূক্তি), সূচনা (পর-দোষ-প্রকাশ), অসম্বদ্ধ (প্রলাপাদি) আচরণ করে। মনের দ্বারা পরদ্রোহ, পর-দ্রব্যের প্রাপ্তি কামনা এবং নাস্তিকতা আচরণ করে। সেই এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি অধর্ম্মের নিমিত্ত হয়। অনন্তর শুভা প্রবৃত্তি (বলিতেছি)। শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ এবং পরিচর্য্যা আচরণ করে। বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় এবং স্বাধ্যায় (বেদ-পাঠাদি) আচরণ করে। মনের দ্বারা দয়া নিস্পৃহতা এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে। সেই এই শুভা প্রবৃত্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত হয়। এই সূত্রে প্রবৃত্তি-সাধন অর্থাৎ প্রবৃত্তি যাহাদিগের সাধন, এমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যেমন প্রাণ অন্ন-সাধন অর্থাৎ অন্ন-সাধ্য। (বেদ বলিয়াছেন) "অন্ন প্রাণীর প্রাণ" (অর্থাৎ যেমন প্রাণের সাধন অন্নকে শ্রুতি প্রাণ বলিয়াছেন, তদ্রূপ মহর্ষি এই সূত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মের সাধন প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থে প্রবৃত্তি শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন।) সেই এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ। "জন্ম" বলিতে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির নিকায়বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ উহাদিগের সংঘাতভাবে (মিলিত ভাবে) উৎপত্তি। সেই জন্ম থাকিলে দুঃখ থাকে। সেই "দুঃখ" বলিতে প্রতিকূল-বেদনীয় * বাধনা, পীড়া, তাপ। অবিচ্ছেদেই প্রবর্ত্তমান অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে যাহা কার্য্য-কারণ-ভাবেই উৎপন্ন হইতেছে, এমন সেই এই

* "প্রতিকূল-বেদনীয়"—অর্থাৎ যাহা প্রতিকূল ভাবে, অর্থাৎ ভাল লাগে না—এই ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়। "বাধনা", "পীড়া", "তাপ", এই তিনটি দুঃখবোধক পর্য্যায় শব্দ। ভাষ্যকার "দুঃখ"কে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য ঐ তিনটি পর্য্যায় শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহাকে "বাধনা", "পীড়া" ও "তাপ" বলে, তাহাই দুঃখ।

মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি (পূর্ব্বোক্ত) দুঃখ-পর্য্যন্ত ধর্ম্মই সংসার। যে সময়ে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-হেতুক মিথ্যাজ্ঞান অপগত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে (তাহার কার্য্য) দোষগুলি অপগত হয়। দোষের নিবৃত্তি হইলে "প্রবৃত্তি" (ধর্ম্মাধর্ম্ম) অপগত হয়। প্রবৃত্তির অপায় হইলে "জন্ম" অপগত হয়। জন্মের নিবৃত্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্ত হয়। দুঃখের নিবৃত্তি (আত্যন্তিক অভাব) হইলে, আত্যন্তিক অপবর্গরূপ অর্থাৎ পরা মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয়।

ভাষ্য। তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যাতং। আত্মনি তাবদস্তীতি অনাত্মন্যনাত্মেতি। এবং দুঃখে নিত্যে ত্রাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যম্। প্রবৃত্তৌ—অস্তি কর্ম্ম, অস্তি কর্ম্মফলমিতি। দোষেষু—দোষনিমিত্তোঽয়ং সংসার ইতি। প্রেত্য-ভাবে খল্বস্তি জন্তুর্জীবঃ সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেত্য ভবেদিতি। নিমিত্তবজ্জন্ম, নিমিত্তবান্ জন্মোপরম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোঽপবর্গান্ত ইতি। নৈমিত্তিকঃ সন্ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত্ত ইতি। সাত্মকঃ সন্ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধি-বেদনা-সন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি। অপবর্গে—শান্তঃ খল্বয়ং সর্ব্ববিপ্রয়োগঃ সর্ব্বোপরমোঽপবর্গঃ, বহু চ কৃচ্ছ্রং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্ব্বদুঃখোচ্ছেদং সর্ব্বদুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি। তদ্‌যথা—মধুবিষ-সম্পৃক্তান্নমনাদেয়মিতি, এবং সুখং দুঃখানুষক্তমনাদেয়মিতি। ২।

অনুবাদ। তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (সে কিরূপ, তাহা নিজেই স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেছেন।) আত্মবিষয়ে "আছে" অর্থাৎ আত্মা আছে, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে) অনাত্মা (আত্মা নহে), এইরূপ জ্ঞান। এইরূপ (পূর্ব্বোক্ত) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণে, সভয়ে, নিন্দিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিষয়ানুসারে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিবে। (দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি)। প্রবৃত্তি বিষয়ে—কর্ম্ম আছে, কর্ম্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান। দোষ বিষয়ে—এই সংসার দোষজন্য, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব বিষয়ে—যিনি মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব আছেন, সত্ত্ব বা * আত্মা আছেন, এইরূপ

* "জন্তু" বলিয়া শেষে আবার জীব বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। "সত্ত্ব" বলিয়া শেষে আবার "আত্মা" বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। ঐ সকল শব্দ প্রাচীন কালে এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বিশদ

জ্ঞান। জন্ম কারণজন্য, জন্মের নিবৃত্তি কারণজন্য; সুতরাং প্রেত্যভাব অনাদি মোক্ষ-পর্য্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব কারণ-জন্য হইয়া প্রবৃত্তি-জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জন্য, এইরূপ জ্ঞান। "সাত্মক" হইয়াই অর্থাৎ প্রেত্যভাব দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ বিষয়ে—যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্ব্বকার্য্যের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ শান্ত (ভয়ানক নহে) এবং (ইহাতে) বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়; সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্ব্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসিবেন না, এইরূপ জ্ঞান। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ্য, তদ্রূপ দুঃখানুষক্ত সুখ অগ্রাহ্য, * এইরূপ জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান)।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এই কথা বলায় নিঃশ্রেয়সই তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রয়োজন-জ্ঞান ব্যতীত তাহার চর্চ্চায় কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, এ জন্য শাস্ত্রকারগণ প্রথমেই শাস্ত্রের প্রয়োজন সূচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রয়োজন কিরূপে সেই শাস্ত্র-সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ কোন্ যুক্তিতে সেই প্রয়োজনটি সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহা না বলিলে সেই প্রয়োজন সূচনার কোন ফল হয় না। সুতরাং শাস্ত্রকারের যুক্তির দ্বারা প্রয়োজন পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে যুক্তিতে শাস্ত্রকারোক্ত প্রয়োজনটি তাঁহার শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায়, সেই যুক্তির সূচনাই প্রয়োজনের পরীক্ষা।

অপবর্গ ভিন্ন অন্যান্য দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন হইলেও, সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। সেগুলি ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন কিরূপে হয়, তাহাতে ন্যায়বিদ্যার আবশ্যকতা কি, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকারও ন্যায়বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায় এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়রূপে বিদ্যার পরিগণনাস্থলে কীর্ত্তিত আছে, এই কথা বলিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যারূপ ন্যায়বিদ্যার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, প্রথম সূত্রে "নিঃশ্রেয়স" শব্দের দ্বারা মহর্ষি

বোধনের জন্যই প্রাচীনগণ ঐরূপ একার্থ শব্দের দ্বারা বিবরণ করিয়াছেন। এই ভাষ্যে বহু স্থলেই ঐরূপ বিবরণ আছে। স্বপদবর্ণনও ভাষ্যের একটি লক্ষণ।

* সুখ দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গযুক্ত। এই অনুষঙ্গব্যাখ্যা বার্ত্তিককার চারি প্রকার বলিয়াছেন। ১। অনুষঙ্গ অর্থাৎ অবিনাভাব সম্বন্ধ। যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখ এবং যেখানে দুঃখ, সেখানে সুখ। ইহাই সুখ-দুঃখের অবিনাভাব। ২। অথবা সমান-নিমিত্ততাই অনুষঙ্গ। যাহা যাহা সুখের সাধন, তাহাই দুঃখের সাধন। ৩। অথবা সমানাধারতাই অনুষঙ্গ; যে আধারে সুখ আছে, সেই আধারেই দুঃখ আছে। ৪। অথবা সমানোপ-লভ্যতাই অনুষঙ্গ। যিনি সুখের উপলব্ধি করেন, তিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন। ভাষ্যের সর্ব্বশেষবর্ত্তী ইতি শব্দটি সূত্রের সমাপ্তিবোধক।

যাহাকে মুখ্য প্রয়োজনরূপে সূচনা করিয়াছেন, তাহা কিরূপে এই ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন হয়, ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কেমন করিয়া অপবর্গরূপ অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের সাধন হয়, ইহা সহজে বুঝা যায় না ; ইহা বুঝাইয়া না দিলে ঐ অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজন কেহ বুঝিয়া লইতে পারে না, তাহা না বুঝিলেও উহা ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন, এ কথা বলিয়াও কোন ফল হয় না। এই জন্য মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা করিয়াছেন। অপবর্গরূপ প্রধান প্রয়োজনই মহর্ষির প্রধান লক্ষ্য, সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রেই সেই কথা বলিয়াছেন, তাহাতে পরা মুক্তির ক্রম প্রতিপাদন হইয়াছে এবং আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এইরূপ অনেক তত্ত্বই সূচিত হইয়াছে। সূচনার জন্যই সূত্র। এক সূত্রের দ্বারা অনেক স্থলে বহু তত্ত্বই সূচিত হইয়াছে। সূত্রগ্রন্থের উহা একটি বিশেষত্ব। মহর্ষির দ্বিতীয় সূত্রে সূচিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই মোক্ষসাধন নহে, মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই উহা মোক্ষসাধন হয়। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আর কিছুতেই থাকিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। সুতরাং এই সর্ব্বসিদ্ধ যুক্তিতে বুঝা যায়, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নাশক। তাহা হইলে যে সকল মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেগুলি বিনষ্ট হইলে অবশ্য মোক্ষ হইবে। সংসারের নিদান উচ্ছিন্ন হইলে আর সংসার হইতে পারে না, সুতরাং সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেই তত্ত্বজ্ঞানে যখন ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক, তখন অপবর্গকে ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এই ভাবে দ্বিতীয় সূত্রে প্রথম সূত্রোক্ত মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা হইয়াছে।

এই সূত্রে "তত্ত্বজ্ঞান" শব্দ না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির কথা থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের কথা পাওয়া গিয়াছে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি আর কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। * মিথ্যাজ্ঞান বলিতে অসত্য জ্ঞান, যাহা "তাহা" নয়, তাহাকে "তাহা" বলিয়া জ্ঞান ; তাহা হইলে বুঝা গেল, বিপরীত ভ্রম জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞান কোন্ বিষয়ে কি প্রকার, তাহা বুঝিতে হইবে। দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞানই এই সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে দোষের নিবৃত্তি হয়, এ কথা এই সূত্রে বলা হইয়াছে। কারণের নিবৃত্তিতেই কার্য্যের নিবৃত্তি বলা যায়, মহর্ষিও এই সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং চতুর্থাধ্যায়ে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে "দোষ" বলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে মোহই সকলের মূল, মোহই সকল অনর্থের নিদান বলিয়া দোষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ; কারণ, মোহ ব্যতীত রাগ ও দ্বেষ জন্মে না, এ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং সেই মোহই এই সূত্রে "মিথ্যাজ্ঞান," ইহা বুঝা যায় এবং মিথ্যাজ্ঞানের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় তাহার কার্য্য রাগ ও দ্বেষই এই সূত্রে "দোষ" শব্দের দ্বারা

* পরে মহর্ষিসূত্রেও এ কথা পাওয়া যায়—"মিথ্যোপলব্ধিবিনাশস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ"—ইত্যাদি সূত্র ।৪।২।৩৫ ।

উক্ত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়; ভাষ্যকার প্রভৃতিও তাহাই বুঝিয়াছেন। অবশ্য মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন "সংশয়" প্রভৃতি আরও মোহ আছে, মোহের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারও তাহা বলিয়াছেন, সেগুলিও রাগ ও দ্বেষ জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেগুলিরও নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এখানে বিপরীত নিশ্চয়রূপ মিথ্যা জ্ঞানই মহর্ষির বক্তব্য; কারণ, তাহাই সংসারের নিদান। এখানে মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তাহা তত্ত্বনিশ্চয়। নিশ্চয়াত্মক মোহের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে। সুতরাং "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত নিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞানের নাশকরূপে সূচিত করিবার জন্য মহর্ষি অন্যত্র স্বল্পাক্ষর "মোহ" শব্দের প্রয়োগ করিলেও এই সূত্রে "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও "বিপর্য্যয়" বৃত্তির ব্যাখ্যায় "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ("বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং"—যোগসূত্র। ৮) ভাষ্যকার অন্যত্র মিথ্যাজ্ঞান অর্থে "মোহ" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও করা যাইতে পারে। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানও মোহ এবং মোহের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানরূপ নিশ্চয়াত্মক মোহই প্রধান।

সূত্রে যখন "মিথ্যাজ্ঞানে"র নিবৃত্তিতে রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দোষের নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষলাভের কথা বলা হইয়াছে, তখন যে সকল বিষয়ে যেরূপ মিথ্যাজ্ঞান অনাদিকাল হইতে জীবের রাগ-দ্বেষাদির নিদান হইয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত মিথ্যাজ্ঞান, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন—"দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তিঃ" (৪।২।১)। অর্থাৎ যে সকল পদার্থ পূর্ব্বোক্ত দোষের নিমিত্ত, তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। শরীরাদি পদার্থে জীবের যে আত্মবোধ বা আমিত্ব-বুদ্ধি আছে, তাহাই অহঙ্কার। জীব মাত্রেরই উহা আজন্মসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমের মতে উহাই উপনিষদুক্ত "হৃদয়গ্রন্থি"। উহার নিবৃত্তি করিতে হইলে আত্মা শরীরাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার আবশ্যক। আর কিছুতেই ঐ অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে না। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান হইয়াছে, সেই বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত ঐ মিথ্যাজ্ঞান আর কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না, ইহা লোকসিদ্ধ—সর্ব্বসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমোক্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে শরীরাদি দশ প্রকার পদার্থ পূর্ব্বোক্ত দোষের নিমিত্ত; এ জন্য উহাদিগকে "হেয়" বলা হয়। দুঃখই হেয় এবং দুঃখের নিমিত্তগুলিও হেয়। শরীরাদি দশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে একটি দুঃখ এবং আর নয়টি দুঃখের হেতু; সুতরাং ঐ দশটি হেয় এবং মোক্ষটি আত্মার "অধিগন্তব্য" অর্থাৎ লভ্য, জীবাত্মা উহা লাভ করিবেন। এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই মহর্ষি গোতম "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। ইহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। কারণ, এই সকল পদার্থ-বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত জীবের রাগদ্বেষ থাকিবেই। তন্মধ্যে শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান যাহা সকল জীবের আজন্মসিদ্ধ এবং যাহা সকল মিথ্যাজ্ঞানের মূল, সেই অহঙ্কাররূপ মিথ্যা জ্ঞানবশতঃ জীব নিজের শরীরাদির উচ্ছেদকেই নিজের আত্মার উচ্ছেদ মনে করে। মুখে যিনি যাহাই বলুন, আত্মার উচ্ছেদ কাহারই

কাম্য নহে। পরন্তু জীব মাত্রই আত্মার উচ্ছেদভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ করে। এইরূপ নানাবিধ রাগ-দ্বেষের ফলে জীব নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া আবারও শরীর গ্রহণ করে। এইরূপ ভাবে অনাদি কাল হইতে জীবের জন্ম-মরণ-প্রবাহ চলিতেছে। ঐ প্রবাহ একেবারে রুদ্ধ করা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। উহা রুদ্ধ করিতে হইলেও উহার মূল অহঙ্কারকে একেবারে রুদ্ধ করিতে, বিনষ্ট করিতে হইবে এবং জীবের আরও কতকগুলি মিথ্যা জ্ঞান আছে, যাহা আজন্মসিদ্ধ না হইলেও সময়ে উপস্থিত হইয়া জীবের মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয়। পুনর্জ্জন্ম নাই, মোক্ষ নাই, ইত্যাদি প্রকার অনেক মিথ্যা জ্ঞান জীবকে মোক্ষসাধনে অনেক পশ্চাৎ-পদ করিয়া এবং আরও বিবিধ রাগদ্বেষের উৎপাদন করিয়া সংসারের নিদান হয়। সুতরাং সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। এ জন্য মহর্ষি গোতম যে সকল পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান, সেই সকল পদার্থকেই দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। এই সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষের কথা বলায়, সেই আত্মাদি "প্রমেয়"বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই তাঁহার বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং ঐ প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই যখন সংসারের নিদান, তখন প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থ সাক্ষাৎকার তাহা নিবৃত্ত করিতে পারে না। এক বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান অন্য বিষয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কখনই নষ্ট হয় না। সুতরাং মহর্ষি-কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বুঝা গেল। "হেয়," "হান," "উপায়," "অধিগন্তব্য"—এই চারিটিকে "অর্থপদ" বলে। ইহাদিগের তত্ত্বসাক্ষাৎকার মোক্ষে আবশ্যক এবং দ্বিতীয় সূত্রে তাহা ব্যক্ত আছে, এ কথা ভাষ্যকারও পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন। হেয় কি, তাহা সম্যক্ না বুঝিলে, তাহার একেবারে ত্যাগ হইতে পারে না এবং যাহা "অধিগন্তব্য", তদ্বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকিলেও তাহা পাওয়া যায় না। সকল মিথ্যা-জ্ঞানের মূল অহঙ্কার নিবৃত্তি করিতে না পারিলেও শরীরাদি হেয় পদার্থকে ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যোক্ত চারিটি "অর্থপদকে" সম্যক্ বুঝিতে গেলে আত্মাদি দ্বাদশ "প্রমেয়" সাক্ষাৎকারই করিতে হইবে, ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, মহর্ষির সকল কথা (চতুর্থাধ্যায় দ্রষ্টব্য) পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি আত্মাদি "প্রমেয়"বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকেই সংসারের নিদান বলিয়া ঐ "প্রমেয়" তত্ত্বসাক্ষাৎকারকেই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণও তাহাই বুঝিয়া গিয়াছেন। এ জন্য ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-কথিত আত্মাদি দ্বাদশ "প্রমেয়" বিষয়েই মিথ্যাজ্ঞানের প্রকার বর্ণনা করিয়া সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানগুলির প্রকার দেখাইয়া প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানের আকার দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখানে একটি বিশেষ প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি গোতম যে প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণরূপে স্থচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কেন? ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান কি মোক্ষের কারণ নহে? ঈশ্বর কি মুমুক্ষুর প্রমেয় নহেন? কেবল গোতমোক্ত প্রমেয় পদার্থের মধ্যেই নহে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যেই ঈশ্বর নাই, ইহার গূঢ় কারণ কি? মহর্ষি গোতম কি নিরীশ্বরবাদী? অথবা ঈশ্বর মানিয়াও মোক্ষে ঈশ্বরজ্ঞানের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন না? ভাষ্যকার প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ এ প্রশ্নের কোন অবতারণাই করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বর প্রসঙ্গে (৪।১।১৯।২০।২১সূত্রে) ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঈশ্বর সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু গোতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই কেন, ইত্যাদি কথার কোন অবতারণাই করেন নাই।

ন্যায়বিদ্যার যথামতি পর্য্যালোচনার দ্বারা আমার যাহা বোধ হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার কিছু আভাস দিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি "হেয়", "অধিগন্তব্য" এবং "অধিগন্তা" এইগুলি ধরিয়াই দ্বাদশপ্রকার প্রমেয় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে মোক্ষ "অধিগন্তব্য", জীবাত্মা তাহার "অধিগন্তা", অর্থাৎ জীবাত্মাই মোক্ষলাভ করেন। শরীরাদি আর দশটি "হেয়"। যাহা দুঃখ, তাহাই ত মুমুক্ষুর হেয় (ত্যাজ্য)। দুঃখের হেতুগুলিও সেই জন্য হেয়। ঈশ্বর হেয় নহেন, ইহা সর্ব্বসম্মত। গোতম মতে ঈশ্বর মুমুক্ষুর "অধিগন্তব্য"ও নহেন, মোক্ষের "অধিগন্তা" অর্থাৎ জীবাত্মাও নহেন। যাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বর্ণনার জন্য এবং সেই সিদ্ধান্তানুসারে মোক্ষের উপায় বর্ণনার জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই মুমুক্ষুর "অধিগন্তব্য" বলিয়াছেন এবং বলিতে পারেন। শুদ্ধাদ্বৈত মতে মোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, জীবাত্মা ও ব্রহ্মে বাস্তব কোন ভেদ নাই, সুতরাং সে মতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবাত্মসাক্ষাৎকার। সে মতে ব্রহ্মের কথা আর জীবাত্মার কথা ফলে একই কথা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই সে মতে জীবাত্মসাক্ষাৎকার হইল, সর্ব্বসাক্ষাৎকারই হইল। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে ব্রহ্মের কথাই প্রধানরূপে—বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই সেই সকল শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য। কারণ, সে মতে ব্রহ্মের প্রতিপাদনেই জীবাত্মা ও মোক্ষের স্বরূপ প্রতিপাদন হয়। সে মতেও জীবাত্ম-সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, তবে ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকারই চরম কর্ত্তব্য, এ জন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারই মোক্ষের চরম কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার বাস্তব অত্যন্ত ভেদ পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ বলিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মতে মোক্ষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং ব্রহ্ম মুমুক্ষুর অধিগন্তব্য নহেন। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মোক্ষই মুমুক্ষুর অধিগন্তব্য অর্থাৎ লভ্য এবং তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্ম সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া অধিগন্তব্য হইতেও পারেন না। কারণ, সিদ্ধ পদার্থে ইচ্ছা হয় না। যাহা অসিদ্ধ, উপায়লভ্য, তাহাই ইচ্ছার বিষয় হইয়া অধিগন্তব্য হইতে পারে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অসিদ্ধ বলিয়া, উপায়লভ্য বলিয়া অধিগন্তব্য হইতে পারে। ঐ মোক্ষপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হয়। বস্তুতঃ উহা ছাড়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর কিছু নাই—যাহা নিত্য-সিদ্ধ, বিশ্বব্যাপী পদার্থ,

তাহার অপ্রাপ্তি অসম্ভব, এ জন্য ব্রহ্মকে "অধিগন্তব্য" বা প্রাপ্য বলা যায় না। মোক্ষবাদী সকল সম্প্রদায়ই মোক্ষকেই জীবের "অধিগন্তব্য" বলিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় মোক্ষকে ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই "অধিগন্তব্য" বলিয়াছেন। সেই মোক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্ম উপাস্ত, ব্রহ্ম ধ্যেয়, ব্রহ্ম জ্ঞেয়, কিন্তু ব্রহ্ম "অধিগন্তব্য" নহেন। ব্রহ্ম অসিদ্ধ নহেন বলিয়াও মোক্ষের উপায়ের দ্বারা লভ্য নহেন। মহর্ষি গোতম দ্বৈত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বলিয়াছেন এবং ন্যায়বিদ্যার "প্রস্থানা"নুসারে মোক্ষোপায়ের কোন অংশবিশেষই বিশেষরূপে বলিয়াছেন, এ জন্য তিনি "প্রমেয়"মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। জীবাত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই তিনি "প্রমেয়" বলিয়াছেন অর্থাৎ "হেয়", "অধিগন্তব্য" এবং "অধিগন্তা" অর্থাৎ যিনি মোক্ষলাভ করিবেন, এই গুলিকেই তিনি "প্রমেয়" বলিয়াছেন। উহাদিগের মিথ্যাজ্ঞানই তাঁহার মতে সংসারের নিদান। তাঁহার মতে জীবাত্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান আর ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান একই পদার্থ নহে। কারণ, জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানকে তিনি অদ্বৈতবাদীর ন্যায় সংসারের নিদান বলিতে পারেন না। ব্রহ্মবিষয়ে আমিত্ব-বুদ্ধিরূপ অহঙ্কারও জীবের আজন্ম-সিদ্ধ নহে। পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে ভেদবুদ্ধিই অসংখ্য জীবের বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু শরীরাদি পদার্থে আমিত্ব-বুদ্ধি সকল জীবেরই আজন্মসিদ্ধ। যে সকল জীবের ঈশ্বর বিষয়ে কোন জ্ঞানই নাই, তাহাদিগেরও জন্মাবধি শরীরাদি পদার্থে আমিত্ব-বুদ্ধি বা ঐরূপ সংস্কার বদ্ধমূল বলিয়া সর্ব্ব-সম্মত। সুতরাং ঐরূপ অহঙ্কারই প্রধানতঃ সংসারের নিদান এবং ভাষ্যোক্ত আরও কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞানও জীবের মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হইয়া সংসারের নিদান হইয়া পড়ে। ঈশ্বর-বিষয়ে ঐরূপ কোন মিথ্যাজ্ঞান কাহারও হইলেও যদি তাহার গোতমোক্ত দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়" পদার্থে মিথ্যাজ্ঞান প্রবল না থাকে, তবে উহা মোক্ষসাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয় না। ঈশ্বর না মানিয়াও আস্তিক হওয়া যায়, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য প্রভৃতি আস্তিক সম্প্রদায়ও মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অনুষ্ঠানের ফলে শেষে তাঁহাদিগেরও কোন কালে ঐ মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারাও ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া ঐ মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়াছেন, ইহা কিন্তু আমার বিশ্বাস। যাঁহারা শুভ অনুষ্ঠান করেন, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম দূর করিয়া থাকেন। ফলকথা, ঈশ্বর বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানকে সংসারের নিদান বলা অনাবশ্যক এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উহা সংসারের নিদান হইতেও পারে না। এ জন্য মহর্ষি গোতম ঈশ্বরকে "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। জীবাত্মাকেই প্রমেয় পদার্থের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। জীবাত্মারই মোক্ষ হইবে এবং শরীরাদি পদার্থে জীবাত্মার অহঙ্কার বা আমিত্ব-বুদ্ধিই মুমুক্ষুর চরমে বিনষ্ট করিতে হইবে। আমি আমার ঐ অহঙ্কার বিনষ্ট করিতে না পারিলে কিছুতেই সংসারমুক্ত হইতে পারিব না। জীবাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবাত্মসাক্ষাৎকার নহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জীবাত্মসাক্ষাৎকারের জন্য পূর্ব্বে আবশ্যক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নহে। জীবাত্মসাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, এ জন্য মহর্ষি গোতম তাঁহার "প্রমেয়"-পদার্থের মধ্যে জীবাত্মারই উল্লেখ

করিয়াছেন, ঈশ্বর বা পরমাত্মার উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, দ্বৈত পক্ষে যে আত্মার তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, মহর্ষি গোতম সেই জীবাত্মাকেই "প্রমেয়"মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। গোতমের পরিভাষিত "প্রমেয়" ভিন্ন আরও অনেক প্রমেয় আছে, সে সকল প্রমেয়ও মহর্ষি গোতমের সম্মত। ঈশ্বরও তাঁহার সম্মত। তবে তিনি যে ভাবে মোক্ষোপযোগী পদার্থের গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থ মোক্ষোপযোগী হইলেও সে ভাবে সে দিক্ দিয়া মোক্ষোপযোগী নহে। মহর্ষি গোতমোক্ত "প্রমেয়"-পদার্থগুলির তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত মানস প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইতে পারে না। জীব মনের দ্বারাই শরীরাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া বুঝিতেছে, সুতরাং মনের দ্বারাই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে ("মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং")। সুতরাং মনকে সাধনের দ্বারা ঐ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্য করিতে হইবে, ঈশ্বর-প্রণিধানাদি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ;- সে সবগুলি ন্যায়বিদ্যার "প্রস্থান" নহে ; কারণ, ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, ইহা গীতার ন্যায় "ব্রহ্মবিদ্যা" বা "যোগশাস্ত্র" নহে। "প্রস্থান"-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ। এক শাস্ত্রের "প্রস্থান" অন্য শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইলে শাস্ত্রভেদ হইতে পারে না। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রেও ন্যায়বিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিদ্যার "প্রস্থান"গুলি বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই, তাহাতে সেই সকল শাস্ত্রের কোন অসম্পূর্ণতাও হয় নাই। যে শাস্ত্রের যেগুলি "প্রস্থান", সেইগুলিই তাহার বিশেষ প্রতিপাদ্য, অসাধারণ প্রতিপাদ্য। তাহাতে শাস্ত্রান্তরের "প্রস্থান"গুলি বিশেষরূপে বলা হয় নাই, তাহা বলাই উচিত নহে। অন্য শাস্ত্র হইতেই সেগুলি জানিতে হইবে। ঋষিগণ এই প্রণালীতেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াছেন। প্রস্থানভেদে এবং অধিকার-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে, উপদেশের ভেদ হইয়াছে। মহর্ষি গোতমোক্ত "প্রমেয়"-তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য পূর্ব্বে ঐ প্রমেয়গুলির শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। সেই প্রমেয় মননের জন্য মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে মুমুক্ষু প্রমেয় পদার্থগুলির মনন করিবেন। মহর্ষি প্রমেয়-পরীক্ষার দ্বারা (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে) সেই মননের প্রণালী দেখাইয়াছেন। মুমুক্ষু ঐ প্রণালীতে আত্মাদি পদার্থের মনন করিবেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত লোকসঙ্গ অপরিহার্য্য থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক প্রভৃতির সহিত বাধ্য হইয়া বিচার করিয়া নিজের শ্রবণ-মনন-লব্ধ তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিবেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে কখনও ঐরূপ জল্প বিতণ্ডা করিবেন না। গুরু প্রভৃতির সহিত "বাদ" পর্য্যন্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থগুলি প্রমেয়-বিচারের অঙ্গ, উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে প্রমেয়গুলির মনন এবং নিজের যথার্থ বিশ্বাস রক্ষা করাই মুমুক্ষুর কার্য্য। বিরুদ্ধবাদীদিগের দৌরাত্ম্যে বৈদিক সিদ্ধান্তে সুচির কাল হইতেই আঘাত পড়িতেছে, অনেক বিচারশক্তিশূন্য ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট হইতেছে, নাস্তিকতা উপস্থিত হইতেছে এবং ঐ দৌরাত্ম্যের আশঙ্কা চিরকালই আছে ও থাকিবে। এ জন্য ন্যায়বিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি বিচারাঙ্গ "প্রমাণা"দি পদার্থের তত্ত্ব জানিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং আত্মরক্ষার

জন্য, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, আস্তিকতা রক্ষার জন্য "জল্প", "বিতণ্ডা", "ছল", "জাতি" প্রভৃতিরও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। শেষে তিনি * স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, যেমন কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রক্ষার জন্য লোকে কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ করিয়া রাখে, তদ্রূপ নিজের আয়াস-লব্ধ তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে "জল্প" ও "বিতণ্ডা"ও করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রমাণাদি পদার্থের ন্যায় "প্রমেয়"-মননোপযোগী বিচারাঙ্গ পদার্থ নহেন, এ জন্য প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের মধ্যেও বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তবে বিচারে সিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরের যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহা মহর্ষি-কথিত "সিদ্ধান্ত" পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেই হইবে। ঈশ্বর যখন সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, তখন সিদ্ধান্তের তত্ত্ব বুঝিতে বলাতেই ঈশ্বরকে সিদ্ধান্তরূপে বুঝিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু প্রমেয়-মননের জন্য অথবা বাদিনিরাস করিয়া নিজের আয়াসলব্ধ তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিবার জন্য প্রমাণাদি পদার্থের ন্যায় এবং জল্প-বিতণ্ডা প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক হয় না, তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক হয় না। তজ্জন্যই মহর্ষি ঐ সকল পদার্থের মধ্যেও ঈশ্বরের বিশেষ উল্লেখ বা সংশয়াদি পদার্থের ন্যায় পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সকল পদার্থ মোক্ষোপযোগী, মহর্ষি তাহাদিগেরই ষোড়শ প্রকারে বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ভাবে যাহারা মোক্ষের উপযোগী নহে, তাহারা অন্য ভাবে মোক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও মহর্ষি সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। কারণ, সেগুলি তাঁহার ন্যায়বিদ্যায় বক্তব্য নহে। মোক্ষে কত পদার্থ, কত কর্ম্ম উপযোগী অর্থাৎ আবশ্যক আছে, মোক্ষবাদী সকলেই কি তাহার সবগুলির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন? নিজ শাস্ত্রের প্রস্থানানুসারেই সকলে প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাত্ম অংশে মনন-শাস্ত্র। শ্রুতির "মন্তব্যঃ" এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়াই এই ন্যায়শাস্ত্রের গঠন। ইহার সাহায্যে মুমুক্ষু "প্রমেয়" মনন করিবেন এবং সেই অপরিপক্ক তত্ত্বনিশ্চয়কে বিরুদ্ধবাদীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন, এই পর্য্যন্তই অধ্যাত্ম অংশে এই ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য ব্যাপার। শেষে মুমুক্ষুর আর যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিশেষ বিবরণ অন্য শাস্ত্রে আছে। মহর্ষি গোতমও আবশ্যক বোধে সেগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চতুর্থাধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে, মোক্ষলাভের জন্য এই পর্য্যন্তই চরম অনুষ্ঠান নহে, ইহার জন্য যোগাভ্যাস করিতে হইবে; যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং মহর্ষি গোতম ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সহিত ন্যায়দর্শনের মুক্তির কিছুমাত্র সংস্রব নাই, এ কথাও জোর করিয়া সিদ্ধান্তরূপে বলা যায় না।

মূলকথা, এই ন্যায়বিদ্যা মুমুক্ষুকে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের মনন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে—"যাও, তুমি এখন নিদিধ্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়া বসিয়া পড়, এখন তোমার

---

* "তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ।"—ন্যায়সূত্র, ৪।২।৫০।

সে অধিকার জন্মিয়াছে। প্রমেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য তোমাকে এখন ঐ "প্রমেয়" পদার্থের ধ্যান, ধারণা ও সমাধি করিতে হইবে। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা প্রথম হইতেই করিতেছ, এখন প্রমেয়তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য ঈশ্বরে তোমার প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবশ্যক হইবে। তাহার পরে ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাহারও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। ভক্তির পরিপাকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হইবে। তাহার পরে তোমার নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হইবে,—প্রমেয়তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইবে। সেই প্রমেয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই তোমার মোক্ষের চরম কারণ, তাহার জন্যই ঈশ্বরসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত আর সমস্ত সাধন আবশ্যক। আমি তোমাকে "প্রমেয়" পদার্থের "মনন" পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম, এখন তোমার আর যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র আছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু আছেন, তুমি সেখানে যাও। আমি এত দিনে তোমার যে বিশ্বাস জন্মাইয়াছি, তাহা রক্ষা করিব, তুমি যাহাতে যে কোন ব্যক্তির নিকটে প্রতারিত না হও, প্রতারিত হইয়া যাহাতে অভীষ্ট-লাভে আবার অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া না পড়, তোমার স্থিরীকৃত সাধনপ্রণালী হইতে, সিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট না হও, তোমার গুরূপদিষ্ট তত্ত্বে পদে পদে সন্দিহান হইয়া, পুনঃ পুনঃ গুরুর অনুসন্ধানেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত না কর, আমি সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিব। তুমি আমাকে ভুলিও না, আমাকে তোমার অনেক সময়েই আবশ্যক হইবে, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার অনেক অন্তরায় দূর করিব, যোগশাস্ত্রোক্ত অনেক "অন্তরায়" দূর করিতে তুমি আমাকে আশ্রয় করিও। যাও, এখন তুমি নিদিধ্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়া বসিয়া পড়। চতুর্থাধ্যায়ে যথাস্থানে এ সকল কথার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। এখানে আর বেশী বলা যায় না। সকল কথা বিশদ করাও এখানে সম্ভব নহে।

কেহ বলেন, আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই সূত্রে 'মিথ্যাজ্ঞান' শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। উহা ছাড়া আর যে সকল মিথ্যাজ্ঞান আছে, পূর্ব্বোক্ত আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নাশেই সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সূত্রস্থ "দোষ" শব্দের দ্বারা আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন সমস্ত "মোহ" এবং "রাগ" ও "দ্বেষ" বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মহর্ষিও পরে চতুর্থাধ্যায়ে অহঙ্কারনিবৃত্তির কথাই বলিয়াছেন। শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিই অহঙ্কার। আত্মবিষয়ক ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞান-বিশেষকেই মহর্ষি "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দের দ্বারা এখানে লক্ষ্য করিতে পারেন এবং এ জন্য তিনি স্বল্পাক্ষর "মোহ" শব্দ ত্যাগ করিয়াও "মিথ্যাজ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মবিষয়ক মিথ্যা-জ্ঞানের নাশে অর্থাৎ আত্মার তত্ত্বজ্ঞানে অন্যবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইতে পারে না। যে বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করিতে হইবে, সেই বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। তবে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ঐ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের নিষ্পাদক হয় বটে, কিন্তু যে মিথ্যাজ্ঞানটি নষ্ট হইবে, ঠিক্ তাহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানটি জন্মিলেই তাহা নষ্ট হইবে, এ জন্যই ভাষ্যকার আত্মা প্রভৃতি সকল "প্রমেয়ে"ই মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, তাহাদিগের সকলেরই তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন আর একটি কথা এই যে, মিথ্যাজ্ঞান পূর্ব্বজাত এবং তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে কি করিয়া বাধা দিবে ? যেমন তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্মিতেই পারিবে না বলা হইতেছে, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞান যাহা পূর্ব্বেই জন্মিয়াছে এবং যাহা তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের বাধক, তাহা থাকিতে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে না বলিতে পারি ? যে দুইটি জ্ঞান পরস্পর বিরোধী, তাহাদিগের মধ্যে যেটি প্রথমে জন্মিয়াছে, সেইটিই প্রবল হয় ; যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান পরস্পর বিরোধী হইলে, সেখানে পূর্ব্বজাত প্রত্যক্ষই প্রবল, এ জন্য সেখানে প্রত্যক্ষের বিরোধিতাবশতঃ অনুমান হইতেই পারে না। উদ্যোতকর এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সহায়শূন্য বলিয়া দুর্ব্বল, তত্ত্বজ্ঞান সহায়যুক্ত বলিয়া প্রবল, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বাধা দিবে। তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত তত্ত্বকে বিষয় করিয়া জন্মে, তাহা যথার্থ জ্ঞান, সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ব বা প্রকৃত অর্থই তত্ত্বজ্ঞানের সহায়। প্রকৃত পদার্থটি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়া তাহাকে প্রবল করে। মিথ্যাজ্ঞান সেরূপ না হওয়ায় তদপেক্ষা দুর্ব্বল ; সুতরাং তাহা পূর্ব্বজাত হইলেও পরজাত প্রবলের দ্বারা বাধিত হইতে পারে এবং তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষ বিশেষ প্রমাণের সাহায্য রহিয়াছে। প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান করিতে হইলে শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা প্রথমে প্রমেয়বিষয়ক "শ্রবণ" করিতে হইবে। তাহার পরে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ বিষয়ে "মনন" করিতে হইবে। শেষে ঐ বিষয়ে ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিতে হইবে। তাহার পরে প্রমেয়-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে। সুতরাং এই প্রমেয়-তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান আগমাদি প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইয়া দৃঢ়মূল হওয়ায়, ইহা পরজাত হইলেও পূর্ব্বজাত দুর্ব্বল মিথ্যাজ্ঞানকে বাধা দিয়া থাকে এবং দিতে পারে এবং মিথ্যাজ্ঞান পূর্ব্বে জন্মিলেও এবং বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেও প্রবল তত্ত্বজ্ঞান পরে জন্মিতে পারে। প্রবল হইলে সে পূর্ব্বে বদ্ধমূল দুর্ব্বলকে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থল অধিকার করিতে পারে ও করিয়া থাকে। এ কথারও যথাস্থানে পুনরালোচনা দ্রষ্টব্য। পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞানের মধ্যে পরজাত জ্ঞানের প্রাবল্য বিষয়ে ভট্ট কুমারিলও "তন্ত্রবার্ত্তিকে" অনেক কথা বলিয়াছেন।

সূত্রে 'দুঃখ' প্রভৃতি শব্দ যে ক্রমে পঠিত, তদনুসারে "দুঃখ"ই সর্ব্বপ্রথম। 'জন্ম', 'প্রবৃত্তি', 'দোষ', 'মিথ্যাজ্ঞান', এই চারিটি উত্তর। ফলে ঐ চারিটি কারণ উহাদিগের প্রত্যেকের পূর্ব্বটি প্রত্যেকের কার্য্য। 'উত্তরোত্তরাপায়ে' ইহার অর্থ কারণগুলির অপায়ে। 'তদনন্তরাপায়াৎ' ইহার অর্থ তাহাদিগের কার্য্যগুলির অপায়বশতঃ। কারণের অনন্তরই কার্য্য হয়, এ জন্য প্রাচীনগণ কার্য্য অর্থে 'শেষ' শব্দ এবং 'অনন্তর' শব্দের প্রয়োগ করিতেন। আবার যাহার অন্তর নাই অর্থাৎ ব্যবধান নাই, অর্থাৎ যাহা অব্যবহিত, তাহাও অনন্তর শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। যাহা অব্যবহিত পূর্ব্ব, তাহাকেও ঐ অর্থে 'অনন্তর' বলা যায়। মহর্ষি সেই অর্থেই এখানে অনন্তর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ; ইহা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে "তদনন্তরাপায়াৎ" ইহার অর্থ 'তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের অপায়বশতঃ'। এ পক্ষেও

ফলে 'কার্য্যগুলির অপায়বশতঃ' এই অর্থই বলা হয়। কারণ, সূত্রের পাঠক্রমানুসারে কার্য্যগুলিই পরপরটির পূর্ব্ব। এখন দেখুন,—

(পূর্ব্ব) দুঃখ, (উত্তর) জন্ম।
(পূর্ব্ব) জন্ম, (উত্তর) প্রবৃত্তি।
(পূর্ব্ব) প্রবৃত্তি, (উত্তর) দোষ।
(পূর্ব্ব) দোষ, (উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান।

উত্তরগুলি কারণ, পূর্ব্বগুলি তাহার কার্য্য; কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায় হইয়া থাকে, যেমন কফনিমিত্তক জ্বর হইলে সেখানে কফের অপায়ে জ্বরের অপায় হয়। এখানেও সূত্রোক্ত দুঃখাদি পদার্থগুলির ঐরূপ নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি উত্তরের অপায়ে তৎপূর্ব্বটির অর্থাৎ তাহার কার্য্য পূর্ব্বটির অপায় হইবে। 'মিথ্যাজ্ঞানে'র অপায়ে তাহার কার্য্য দোষের অপায় হইবে। দোষের অপায় হইলে তাহার কার্য্য প্রবৃত্তির অপায় হইবে। প্রবৃত্তির অপায় হইলে জন্মের অপায় হইবে। জন্মের অপায় হইলে দুঃখের অপায় হইবে। জন্ম না হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। তখন আর দুঃখের হেতু কিছুই থাকে না। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহারা মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বক, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আবার দুঃখাদিপূর্ব্বক। পূর্ব্বে দুঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, অথবা পূর্ব্বে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, পরে দুঃখাদি, ইহা বলা যাইবে না। উহারা অনাদি। অনাদি কাল হইতে ঐ পদার্থগুলির কার্য্য-কারণ ভাবই সংসার। উহাদিগের অনাদিত্ব সূচনার জন্যই সূত্রকার দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও ভাষ্যকার সূত্রকারের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছেন,—"ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।" ন্যায়বার্ত্তিককার আবার ঐ অনাদিত্বকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য ভাষ্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ত ইমে দুঃখাদয়ঃ।"

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সূত্রের "তদনন্তরাপায়াৎ" এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"তদনন্তরস্য তৎসন্নিহিতস্য পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাপায়াৎ।" শেষে বলিয়াছেন যে, দুঃখের অপায়ই যখন অপবর্গ, তখন অপবর্গকে দুঃখের অপায় প্রযুক্ত বলা যায় না, সুতরাং সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, ইহা মনে করিয়া আবার শেষে বলিয়াছেন যে, সূত্রে অপবর্গ শব্দের দ্বারা অপবর্গব্যবহার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ দুঃখের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ ব্যবহার অর্থাৎ অন্য লোকে যে 'অমুকের অপবর্গ হইয়াছে' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগাদি করে, তাহা দুঃখের অপায়প্রযুক্ত। কেহ বলিয়াছেন, সূত্রে 'অপবর্গ' শব্দের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবক্ষিত। সুতরাং পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি নাই। মনে হয়, এই পঞ্চমী বিভক্তির গোলযোগ মনে করিয়াই শারীরক ভাষ্যের "রত্নপ্রভা" টীকাকার শ্রীগোবিন্দ এই সূত্র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'তস্য প্রবৃত্তি-রূপহেতোরনন্তরস্য জন্মনোঽপায়াৎ দুঃখধ্বংসরূপোঽপবর্গো ভবতীত্যর্থঃ।'—(বেদান্তদর্শন, চতুর্থ সূত্র, শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ তিনি সূত্রস্থ "তৎ" শব্দের দ্বারা কেবল "প্রবৃত্তি"কে

ধরিয়া "তদনন্তর" অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তির কার্য্য এবং প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে উল্লিখিত "জন্মের" অপায়বশতঃ দুঃখের ধ্বংসরূপ অপবর্গ হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রস্থ "তৎ" শব্দের দ্বারা তাহার পূর্ব্বে একযোগে কথিত "জন্ম", "প্রবৃত্তি," "দোষ" ও "মিথ্যাজ্ঞান" এই চারিটিই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ঐ চারিটিই "উত্তরোত্তর" শব্দের প্রতিপাদ্য। সুতরাং মহর্ষি ঐ চারিটিকেই "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। উহার মধ্যে একমাত্র "প্রবৃত্তি"ই "তৎ" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা কিছুতেই মনে আসে না। তাহার পরে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থও সঙ্গত হয় না। এক দুঃখাপায়ের সহিত অপবর্গের অভেদ খাটিলেও জন্মের অপায় প্রভৃতির সহিত খাটে না। কারণ, সেগুলি অপবর্গ-স্বরূপ নহে। একই পঞ্চমী বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে মহর্ষি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। বৃত্তিকার তাহাই মনে করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছেন। শেষে তিনিও ঐ পক্ষ ত্যাগ করিয়া "অপবর্গ" শব্দে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি অপবর্গ-ব্যবহারের প্রয়োজক বলেন নাই। পরা মুক্তির ক্রম প্রদর্শনের অন্য অপবর্গেরই প্রয়োজক বলিয়াছেন। ফল কথা, মহর্ষি অপবর্গ ব্যবহার বুঝাইতেই "অপবর্গ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে আসে না। মহর্ষি-সূত্রের "অপবর্গ" শব্দে ঐরূপ আধুনিক লক্ষণা অনুমোদন করা যায় না।

বস্তুতঃ সূত্রে "তদনন্তরাপায়" শব্দের প্রতিপাদ্য কেবল দুঃখের অপায় নহে, কেবল জন্মের অপায়ও নহে; দোষের অপায়, প্রবৃত্তির অপায়, জন্মের অপায় এবং দুঃখের অপায়, এই চারিটি অপায়ই উহার প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে দুঃখের অপায় স্বয়ং অপবর্গ-স্বরূপ হইলেও আর তিনটি অপায় ঐ অপবর্গের প্রয়োজক। উহাদিগের ঐ প্রয়োজকত্ব পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে। অথচ দুঃখাপায়ের কথাটাও উহার মধ্যে বলিতে হইবে। কারণ-নাশক্রমে কার্য্যনাশ হইয়া শেষে দুঃখ পর্য্যন্ত নষ্ট হইলেই পরা মুক্তি হয়, এই ক্রম প্রদর্শনও করিতে হইবে। 'তদনন্তর' শব্দের দ্বারা দুঃখও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের অপায় অপবর্গ প্রয়োজক নহে, এ জন্য ঐ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাটে না। কিন্তু আর তিনটি অপায়ে অপবর্গের প্রয়োজকত্ব থাকায় সেই তিন স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাটে এবং পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। একের বেলায় না খাটিলেও বহুর অনুরোধে সর্ব্বত্র একরূপ ব্যবস্থা ঋষিগণ করিয়াছেন; তাই মনে হয়, এখানেও মহর্ষি গোতম বহুর অনুরোধে একেবারে "তদনন্তরাপায়াৎ" এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার মধ্যে দুঃখাপায়ের সহিত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থের কোন সম্বন্ধ বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ হেতুত্ব বা প্রয়োজকত্ব এখানে সম্ভব হয় না। আর তিনটি অপায়ে সম্ভব হয় এবং তাহাদিগকেই প্রয়োজক বলিতে হইবে, মহর্ষির তাহাই বিবক্ষিত। এ জন্য মহর্ষি ঐরূপে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ "দুঃখাপায়াদপবর্গঃ" এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইলেও "তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ, উহার মধ্যে দুঃখের অপায় অপবর্গ প্রয়োজক না হইলেও আর তিনটি অপায় অপবর্গের প্রয়োজক, সেই তিনটিকেই অপবর্গের প্রয়োজক বলিবার জন্য বহুর অনুরোধে মহর্ষি একবারে

"তদনন্তরাপায়াৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋষিগণ এইরূপ প্রয়োগ করিতে আমাদিগের ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেন না। মহর্ষি গোতমের অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। তাই মনে হয়, মহর্ষি এখানেও বহুর অনুরোধে একরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই যেন প্রকৃত কথা। সুধীগণ এখানে বৃত্তিকার প্রভৃতির পঞ্চমী বিভক্তির সঙ্গতি ব্যাখ্যার সংগতি চিন্তা করিয়া এবং অন্য কোনরূপ সংগতির চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমাধানের সমালোচনা করিবেন। আর চিন্তা করিবেন, বৃত্তিকারের ন্যায় প্রাচীনগণ এখানে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি দেখাইতে যান নাই কেন ?

কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাগ ও দ্বেষ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ নহে। ইচ্ছা ব্যতীতও গঙ্গা-স্নানাদি কার্য্যের দ্বারা কর্ম্মশক্তিতে যখন ধর্ম্ম হয় এবং দ্বেষ ব্যতীতও হিংসাদি ঘটিয়া গেলে যখন তজ্জন্য অধর্ম্ম হয়, আবার জীবন্মুক্ত ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ থাকিলেও যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে না, তখন রাগ ও দ্বেষ ধর্ম্ম অধর্ম্মের কারণ বলা যায় না। সূত্রে "দোষ" শব্দের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান-জন্য সংস্কারই বিবক্ষিত। উহাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উহা না থাকাতেই রাগ ও দ্বেষবশতঃ কর্ম্ম করিলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয় না।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমের পরিভাষানুসারে "দোষ" শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংস্কার বুঝা যায় না। মহর্ষি ঐরূপ অর্থে কোথায়ও দোষ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। পরন্তু এখানে মিথ্যাজ্ঞানের নাশে যখন দোষের নাশ বলিয়াছেন, তখন এখানে দোষ বলিতে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বুঝাও যায় না। কারণ, জ্ঞানের নাশে ঐ জ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হয়, এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলেও তজ্জন্য সংস্কার থাকিয়া যায়। জ্ঞানের নাশ ঐ জ্ঞানজন্য সংস্কারের নাশক হয় না; তাহা হইলে ঐ সংস্কার কোন দিনই স্থায়ী হইতে পারিত না। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মহর্ষি ত তাহা বলেন নাই। মহর্ষির সূত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে, মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, তজ্জন্য দোষের অপায় হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, এ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মিতে পারে না এবং তত্ত্বজ্ঞান যে সংস্কার উৎপন্ন করে, ঐ সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে ঐরূপে বিনষ্ট করে বলা যায়। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হইয়া গেলে সেই সংস্কারজন্য স্মরণরূপ মিথ্যাজ্ঞানও আর জন্মিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকায় জীবন্মুক্তের আর উৎকট রাগদ্বেষও জন্মিতে পারে না। যেরূপ দ্বেষ কর্ম্মে আসক্ত করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ হয়, জীবন্মুক্তের তাহা জন্মিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মে না। সূত্রে "দোষ" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণরূপে সেইরূপ রাগ-দ্বেষই উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, ঐরূপ দোষই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ। জীবন্মুক্তের রাগ-দ্বেষ সেরূপ নহে। আর যাঁহাদিগের স্থলবিশেষে নিজের রাগ বা দ্বেষ না থাকিলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মিতেছে, তাঁহারা কিন্তু জীবন্মুক্তের ন্যায় ঐ সকল কার্য্য করিতেছেন না। তাঁহাদিগের কর্ম্মে আসক্তি আছে,

ধর্ম্মজন্য সুখে আকাঙ্ক্ষা আছে, অধর্ম্মজন্য দুঃখে বিদ্বেষ আছে। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকায় তাঁহাদিগের সেখানেও রাগ ও দ্বেষের যোগ্যতা আছে এবং সেই কর্ম্মে না হইলেও কর্ম্মান্তরে তখনও রাগ বা দ্বেষ আছে। তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারসহিত রাগ ও দ্বেষ যাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি কারণরূপে মহর্ষি বলিয়াছেন, তাহা অসংগত হয় নাই। অবশ্য মহর্ষি রাগ ও দ্বেষকে ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষাৎ কারণ বলেন নাই। শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারাই উহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ। ঐ সঙ্গে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার প্রভৃতিও তাহার কারণ। ফল কথা, মহর্ষিসূত্রস্থ "দোষ" শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করার কারণ নাই। তবে ভাষ্যকার যে এখানে মহর্ষি-সূত্রস্থ "প্রবৃত্তি" শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। মহর্ষি তাঁহার "প্রমেয়" পদার্থের অন্তর্গত "প্রবৃত্তিকে" কায়িক, বাচিক এবং মানসিক শুভাশুভ কর্ম্ম বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সেখানে "প্রবৃত্তিকে" প্রযত্নবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি তাহা বলেন নাই। বস্তুতঃ "প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ" (১।১।১৭) এই সূত্রে "আরম্ভ" শব্দের দ্বারা কর্ম্মকেই মহর্ষি-কথিত প্রবৃত্তি বলিয়া বুঝা যায়। এই কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তিকে" কারণরূপ "প্রবৃত্তি" বলা হইয়া থাকে। এই কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকেও ঐ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিসাধ্য বলিয়া "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মহর্ষিও কোন কোন স্থলে তাহা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তিকে" কার্য্যরূপ প্রবৃত্তি বলা হয়। অবশ্য ইহা "প্রবৃত্তি" শব্দের মুখ্যার্থ নহে, মহর্ষির প্রবৃত্তির লক্ষণোক্ত কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিও নহে। কিন্তু এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিই জন্মের সাক্ষাৎ কারণ। কর্ম্ম জন্মের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকে না, কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম থাকে। সূত্রে প্রবৃত্তির অপায়ে জন্মের অপায় বলা হইয়াছে, সুতরাং জন্মের সাক্ষাৎ কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তিই" মহর্ষির এখানে বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই নষ্ট হইয়া যায়। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" এই ভগবদ্গীতাবাক্যেও কর্ম্মের ফল ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থেই "কর্ম্মন্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, যাগ, দান, হিংসা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত কর্ম্ম চিরস্থায়ী নহে, তাহা কর্ম্মান্তেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাহার নাশ বলা যায় না। সেই কর্ম্মের ফল সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। এইরূপ শাস্ত্রে "কর্ম্মন্" শব্দ ও "প্রবৃত্তি" শব্দ কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থেও প্রযুক্ত আছে। ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ বেদেও আছে। যেমন প্রাণ অন্ন না হইলেও বেদ প্রাণকে "অন্ন" বলিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ন ব্যতীত প্রাণীদিগের প্রাণ থাকে না, অন্ন প্রাণের সাধন, অন্ন থাকিলেই প্রাণ থাকে, সুতরাং প্রাণকে অন্ন বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে "অন্ন" শব্দে লক্ষণার দ্বারা বুঝিতে হইবে—অন্নসাধ্য। ঐরূপ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্মকে "প্রবৃত্তি" বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা করা যাইতে পারে; কারণ, ঐ প্রকার লাক্ষণিক প্রয়োগ পূর্ব্ব হইতেই হইয়া আসিতেছে; উহা আধুনিক প্রয়োগ নহে। ভাষ্যে "প্রবৃত্তিসাধন" এই কথার দ্বারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম যাহার সাধন, এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার এই সূত্রভাষ্যে শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির নিকায়বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাবকে জন্ম বলিয়াছেন। কিন্তু প্রেত্যভাব-সূত্রে (১৯ সূত্রে) দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত আত্মার পুনঃ সম্বন্ধকে পুনর্জ্জন্ম বলিয়াছেন। এখানেও প্রেত্যভাব বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বুদ্ধির পরে বেদনারও উল্লেখ করিয়াছেন। আরও অনেক স্থলে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকরও (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে) অপূর্ব্ব দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত সম্বন্ধবিশেষকে জন্ম বলিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্রও (ঈশ্বরকৃষ্ণের অষ্টাদশ-কারিকায়) জন্মের ব্যাখ্যায় বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয়, ভাষ্যকার এখানে জন্মের ব্যাখ্যায় বুদ্ধির পরে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বেদনা শব্দটি এখানে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে উহা পাওয়া যায় না। দেহাদির নিকায়-বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাবকেই ভাষ্যকার এখানে জন্ম বলিয়াছেন। নিকায় শব্দের অর্থ সমানধর্ম্মী প্রাণিসমূহ। (সধর্ম্মিণাং স্যান্নিকায়ঃ ইত্যমরঃ)। ভাষ্যকার (১৯ সূত্রে) প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যায় এই অর্থেই নিকায় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিতে হয়। কারণ, "নিকায়" শব্দের ঐ অর্থ সেখানে সংগত হইতে পারে। কিন্তু এখানে দেহাদির "নিকায়বিশিষ্ট" প্রাদুর্ভাবকে জন্ম বলিয়াছেন। প্রচলিত পাঠে তাহাই পাওয়া যায়। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে জন্মের ব্যাখ্যায় দেহাদিকেই "নিকায়বিশিষ্ট" বলা হইয়াছে। মিলিত পদার্থের সমুচ্চয় অর্থেও "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করা যায়। কারণ, সে অর্থও অভিধানে পাওয়া যায় (শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। সুতরাং "নিকায়বিশিষ্ট" বলিতে পরস্পর মিলিত বা মিলিত-ভাবাপন্ন, এইরূপ অর্থও বুঝা যায়। এখানে অনুবাদে ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মিলিত দেহাদির সহিত সম্বন্ধবিশেষই আত্মার জন্ম। আত্মা নিত্য, তাহার উৎপত্তিরূপ জন্ম হইতে পারে না। প্রাচীনগণ জন্মের ব্যাখ্যায় জন্মের বিশদ পরিচয়ের জন্যই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনেক পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। জন্মের লক্ষণ বলিতে ঐ সকল পদার্থের উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য, উহার সবগুলিকে না বলিলে জন্মের লক্ষণ নির্দ্দোষ হয় না, ইহা মনে হয় না। প্রাচীনগণ ঐ পদার্থগুলির প্রত্যেকটির উল্লেখের কোন প্রয়োজন বর্ণন করেন নাই। ঐগুলির প্রত্যেকের উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে মনে হয়, তাৎপর্য্যটীকাকার অবশ্যই তাহা বলিয়া যাইতেন। কারণ, তিনি ঐরূপ প্রয়োজন অনেক স্থলেই বলিয়া গিয়াছেন। আধুনিক টীকাকারগণ প্রাচীন-গণের পরিচায়ক বাক্যকেও লক্ষণ-বাক্য ধরিয়া লইয়া, তাহার প্রত্যেক শব্দের প্রয়োজন প্রদর্শনের জন্য নানা কল্পনা, নানা কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও অনেক স্থলে ইষ্টসিদ্ধি হয় নাই, কেবল পুথি বাড়িয়াছে।

ভাষ্যে "বেদনা" শব্দের অর্থ কি? ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। বেদনা শব্দের দুঃখ এবং জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকগণ পারিভাষিক অর্থেও বেদনা শব্দের প্রয়োগ করিতেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর "পূর্ণিমা" টীকাকার সেই পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিতে "বেদনা"কে সংস্কার বলিয়াছেন। তিনিই আবার বৈশেষিকের "উপস্কারের" টীকায় জন্মের ব্যাখ্যাতেই বেদনাকে "প্রাণসংহতি" বলিয়াছেন। শেষে তাহা সংগত বোধ না হওয়ায় পরিশেষে

আবার সেখানে বেদনা শব্দের 'জ্ঞান' অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাকারও বেদনাকে সংস্কার বলিয়াছেন, কেহ বা "অনুভব" বলিয়াছেন। কিন্তু পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিতে তাঁহারা কেহই কোন প্রকৃত প্রমাণ বা প্রাচীন সংবাদ প্রদর্শন করেন নাই।

বৌদ্ধসম্প্রদায় এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ বুঝাইতে বেদনা শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবিতেন, সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া ভাবিতেন। "দুঃখং দুঃখং" ইত্যাদি তাঁহাদিগের মন্ত্র। মনে হয়, এই জন্যই তাঁহারা দুঃখবোধক বেদনা শব্দের দ্বারা এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ উভয়কেই প্রকাশ করিতেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও সুখকে দুঃখরূপে ভাবিবার কথা বলিয়া, মহর্ষি গোতম দ্বাদশপ্রকার প্রমেয়ের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, কেবল দুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়াছেন (নবম সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের "বেদনাস্কন্ধ" হইতে "সংস্কারস্কন্ধ" পৃথক্। উদ্দ্যোতকরও বৌদ্ধমত-খণ্ডনে (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে) "বেদনা" ও "সংস্কার"কে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন এবং (৪।২।৩৩ সূত্রভাষ্য বার্ত্তিকে) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতখণ্ডনে এক স্থলে বেদনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বেদনা সুখ-দুঃখে"। শারীরকভাষ্যেও জীবের কথায় বেদনার কথা পাওয়া যায়। সেখানে "রত্নপ্রভা"য় শ্রীগোবিন্দ লিখিয়াছেন—"বেদনা হর্ষশোকাদিঃ"। তিনি আবার "আদি" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (বেদান্তদর্শন, ১ অধ্যায়, ৩ পাদ, দহরাধিকরণের ১৯ সূত্রের শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এই সকল দেখিয়া অনুবাদে বেদনার ব্যাখ্যায় সুখদুঃখরূপ পারিভাষিক অর্থেরই গ্রহণ করা হইয়াছে। জন্ম হইলেই আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান এবং সুখদুঃখাদির সহিত সম্বন্ধ হয়। এই জন্য ঐরূপ সম্বন্ধবিশেষকে জন্ম বলা যায়। ভাষ্যের প্রচলিত পাঠে কোন স্থলে "সুখ" শব্দের উল্লেখ করিয়াও তাহার পরে "বেদনা" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে বেদনা শব্দের কেবল দুঃখরূপ প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝিতে হয়।

"প্রতিসন্ধান" শব্দটি দার্শনিক ভাষায় প্রত্যভিজ্ঞা অর্থেই অধিক প্রযুক্ত দেখা যায়। স্থল-বিশেষে জ্ঞানমাত্র অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়। কিন্তু এখানে "উচ্ছেদ" শব্দের পরবর্ত্তী "প্রতিসন্ধান" শব্দের ঐরূপ অর্থ সংগত হয় না। এখানে উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে উৎপত্তি। দেহাদি একটি সমষ্টির উচ্ছেদ হইলে পুনরায় আর একটি দেহাদিসমষ্টির "প্রতিসন্ধান" বা সংযোজন অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। মহর্ষিসূত্রেও পুনরুৎপত্তি অর্থে "প্রতিসন্ধান" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশস্য" (৪।১।৬৪)। সেখানে ভাষ্যকারও সূত্রোক্ত প্রতিসন্ধানকে 'প্রতিসন্ধি' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া, উহার পুনর্জ্জন্ম অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রে "উত্তরোত্তরাপায়ে" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা প্রযোজকত্ব বুঝিতে হইবে। পরপরটির অপায়[১] হইলে অর্থাৎ পরপরটির অপায়প্রযুক্ত। যেমন জল পান করিলে পিপাসার

১। সতি সপ্তমীর প্রযোজকত্ব অর্থ অনেক স্থলে দেখা যায়। যথা—"পীতে পাথসি তৃষ্ণাশান্তিঃ।" অনুমিতি

শান্তি হয়, এই কথা বলিলে পিপাসার শান্তি জলপানপ্রযুক্ত—ইহা বুঝা যায়, তদ্রূপ এখানেও ঐরূপ বুঝা যাইবে।

প্রচলিত অনেক ভাষ্য-পুস্তক ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" প্রভৃতি পুস্তকে দ্বিতীয় সূত্রে "তদনন্তরাভাবাৎ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু এখানে "তদনন্তরাপায়াৎ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি দুই স্থলেই "অপায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দেখিলেও তাহাই মনে আসে। উদ্যোতকর, শঙ্করাচার্য্য এবং "ভামতী"তে বাচস্পতি মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও "তদনন্তরাপায়াৎ' এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। স্মরণ করিতে হইবে, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা কি কি তত্ত্বের সূচনা করিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই মোক্ষসাধন হয় না, উহা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করে বলিয়াই মোক্ষসাধন হয় এবং সেই যুক্তিতেই তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে। এই জন্য মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই তত্ত্বজ্ঞানের ফল বলিতে, ঐ অংশ ধরিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও (বেদান্তদর্শন, চতুর্থ সূত্রভাষ্যে) স্বসিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটিকে "আচার্য্য-প্রণীত" এবং 'যুক্তিযুক্ত' বলিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের সাধন কেন, ইহার যুক্তি সূচিত হওয়ায় এই সূত্রের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা এবং প্রমাণাদি পদার্থ, তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরীক্ষা হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়বিদ্যার সহিত তাহার পরমপ্রয়োজন অপবর্গের সম্বন্ধও পরীক্ষিত হইয়াছে। মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞানে যখন ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক, তখন মোক্ষের সহিতও ন্যায়বিদ্যার সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। এবং মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন হয় বলাতে আত্মাদি প্রমেয়তত্ত্বসাক্ষাৎকারই যে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা সূচিত হইয়াছে। কারণ, তাহাই আত্মাদি "প্রমেয়" বিষয়ে সংসারের নিদান মিথ্যা জ্ঞানগুলিকে নিবৃত্ত করিতে পারে। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানে আবশ্যক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের প্রযোজক, সাক্ষাৎকারণ নহে। এবং এই সূত্রে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে অপবর্গের কথা বলায় এবং প্রথম সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের কারণ বলায় সূচিত হইয়াছে যে, কোন মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরেই জন্মে, কোন মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানবিশেষের পরে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে কালবিশেষে জন্মে। তাহা হইলে সূচিত হইয়াছে—মুক্তি দ্বিবিধ। অপরা মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের পরেই জন্মে, সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই শাস্ত্রবক্তা। সুতরাং শাস্ত্রের উপদেশ ভ্রান্তের উপদেশ নহে। পরা মুক্তি নির্ব্বাণ, উহা তত্ত্বজ্ঞানের পরেই জন্মে না। উহা জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ ভোগান্তে গৃহীত জন্মের অর্থাৎ গৃহীত দেহাদির উচ্ছেদ হইলেই জন্মে। এইরূপ বহু তত্ত্বই মহর্ষি-সূত্রে সূচিত হইয়া থাকে। বুঝিয়া লইতে পারিলে ঋষিসূত্রের দ্বারা অনেক বুঝা যায়। অন্যান্য কথা চতুর্থাধ্যায়ে মোক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

অভিধেয়সম্বন্ধপ্রয়োজনপ্রকরণ সমাপ্ত। ১।

দীধিতির টীকায় গদাধর ভট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"সত্তিসপ্তম্যাঃ প্রযোজকত্বমর্থঃ।" (মূলোক্তলক্ষণব্যাখ্যারম্ভে দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরুদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি। তত্র নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানমুদ্দেশঃ,—তত্রোদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্ম্মো লক্ষণং,লক্ষিতস্য যথালক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা। তত্রোদ্দিষ্টস্য প্রবিভক্তস্য লক্ষণমুচ্যতে, যথা প্রমাণানাং প্রমেয়স্য চ। উদ্দিষ্টস্য লক্ষিতস্য চ বিভাগবচনং, যথা ছলস্য, "বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং"—"তৎ ত্রিবিধ"মিতি।

অনুবাদ। এই শাস্ত্রের (ন্যায়দর্শনের) প্রবৃত্তি অর্থাৎ উপদেশ ব্যাপার ত্রিবিধ, (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ এবং (৩) পরীক্ষা। তন্মধ্যে নামের দ্বারা পদার্থমাত্রের উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থগুলির নামমাত্র কথন "উদ্দেশ"। তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট পদার্থের অর্থাৎ যাহার নাম বলা হইয়াছে, তাহার অতত্ত্বব্যবচ্ছেদক ধর্ম্ম অর্থাৎ সেই পদার্থ যে তদ্ভিন্ন পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহার বোধক (ইতরব্যাবর্ত্তক) অসাধারণ ধর্ম্ম "লক্ষণ", (এই লক্ষণকথনই এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় উপদেশ ব্যাপার)। লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পরে যাহার লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই পদার্থের লক্ষণানুসারে (ঐ পদার্থ) উপপন্ন হয় কি না, এ জন্য অর্থাৎ ঐ সংশয় নিবৃত্তির জন্য প্রমাণসমূহের দ্বারা (প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা) অবধারণ অর্থাৎ ঐ লক্ষিত পদার্থের লক্ষণানুসারে বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয়--"পরীক্ষা।"

তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া বিভক্ত পদার্থের অর্থাৎ যে সকল পদার্থের সামান্য না। কথনরূপ সামান্য উদ্দেশের পরে পৃথক্ সূত্রের দ্বারা তাহাদিগের লক্ষণ না বলিয়াই বিশেষ বিশেষ নামকথনরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাদিগের লক্ষণ (বিশেষ লক্ষণ) বলা হইয়াছে, যেমন "প্রমাণে"র এবং প্রমেয়ের। এবং উদ্দিষ্ট হইয়া লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ যে সকল পদার্থের সামান্য নামকথনরূপ উদ্দেশ করিয়া পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার বিভাগবচন অর্থাৎ বিভাগসূত্র বলা হইয়াছে। যেমন "ছলে"র—"বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং" (এই সামান্য লক্ষণ-সূত্র বলিয়া) "তৎ ত্রিবিধং" ইত্যাদি (বিভাগসূত্র)১।২।১০।১১।)।

টিপ্পনী। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়, এ কথা প্রথম সূত্রে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ষোড়শ পদার্থের নামমাত্র জ্ঞানে উহাদিগের কোন প্রকার তত্ত্বজ্ঞানই হইতে পারে না। উহাদিগের লক্ষণকথন এবং পরীক্ষা তাহাতে আবশ্যক, সুতরাং সে জন্য মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রসমূহ আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি গোতমের পরবর্ত্তী সূত্রসমূহের প্রয়োজন ব্যাখ্যার জন্য এখানে বলিয়াছেন যে, এই ন্যায়শাস্ত্রের উপদেশ-ব্যাপার ত্রিবিধ। প্রথমতঃ

পদার্থগুলির উদ্দেশ অর্থাৎ নামকথন, তাহার পরে তাহাদিগের লক্ষণকথন, তাহার পরে বিবিধ বিচারপূর্ব্বক পদার্থের পরীক্ষা, সুতরাং মহর্ষি গোতমের পরবর্ত্তী সূত্রসমূহগুলি আবশ্যক হইয়াছে। 'উদ্দেশ', 'লক্ষণ' এবং 'পরীক্ষা' এই ত্রিবিধ ব্যাপারেই ন্যায়শাস্ত্রের সমাপ্তি হইয়াছে এবং এই প্রণালীতে উপদেশই ন্যায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য। পদার্থের বিভাগও উদ্দেশের মধ্যে গণ্য।

পদার্থের বিভাগের পূর্ব্বে তাহার সামান্য লক্ষণ বক্তব্য। কারণ, সামান্য লক্ষণ না বলিলে পদার্থের সামান্য জ্ঞান হয় না। সামান্য জ্ঞান না হইলে বিশেষ জ্ঞানের জন্য পদার্থের বিভাগ করা যায় না। কিন্তু সূত্রকার মহর্ষি অনেক পদার্থের সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগ করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর সূচনার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন—"তত্রোদ্দিষ্টস্য" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি উদ্দিষ্ট পদার্থের বিভাগ দুই প্রকারে করিয়াছেন।—(১) পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়া বিভাগ এবং (২) পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিভাগ। যেমন "প্রমাণ" ও "প্রমেয়ে"র পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই, বিভাগ করিয়া, ঐ বিভক্ত বিশেষ "প্রমাণ" ও বিশেষ "প্রমেয়"-গুলির লক্ষণ বলিয়াছেন। আবার "ছলে"র পৃথক্ সূত্রের দ্বারা, সামান্য লক্ষণ বলিয়াই বিভাগ করিয়া শেষে ঐ বিভক্ত ত্রিবিধ "ছলের"ই লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যে "প্রমাণ," "প্রমেয়" ও "ছলে"র কথা প্রদর্শন মাত্র। ঐরূপ অন্য পদার্থেরও বিভাগাদি বুঝিতে হইবে। যথাস্থানে এ সব কথা বুঝা যাইবে। যে সকল পদার্থের পৃথক্ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগসূত্র বলিয়াছেন, তাহাদিগের ঐ বিভাগ-সূত্রের দ্বারাই সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, ইহাও পরে বুঝা যাইবে।

ভাষ্য। অথোদ্দিষ্টস্য বিভাগবচনং।

অনুবাদ। অনন্তর উদ্দিষ্টের অর্থাৎ প্রথম উদ্দিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগবচন (বিভাগ-সূত্র)।

সূত্র। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।৩।

অনুবাদ। (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শব্দ, (এই চারিটি) প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণ চতুর্ব্বিধ।

টিপ্পনী। মহর্ষির প্রথম উদ্দিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগের জন্য এই তৃতীয় সূত্রের উল্লেখ। পদার্থের বিশেষ নামের কীর্ত্তনকে বিভাগ বলে, সুতরাং বিভাগও উদ্দেশ। অতএব পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষারূপ ত্রিবিধ ব্যাপার হইতে বিভাগ কোন অতিরিক্ত ব্যাপার নহে।

মহর্ষি পরে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের লক্ষণ বলিলেও ইহাদিগের অতিরিক্ত কোন প্রমাণ তাঁহার স্বীকৃত কি না? আপাততঃ এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কারণ, লক্ষণের দ্বারা কোন পদার্থের সংখ্যা নিয়ম নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। লক্ষণের প্রয়োজন অন্যরূপ। সুতরাং ঐ সংশয়

নিবৃত্তির জন্য প্রমাণের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ উচিত বলিয়া মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রমাণ এই চতুর্ব্বিধই। ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার প্রমাণ নাই। ইহা উদ্যোতকরের কথা।

মহর্ষি পৃথক্ সূত্রের দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলেন নাই। এই বিভাগসূত্রে "প্রমাণ" শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। প্রমাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝিলেই "প্রমাণে"র সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়। (প্রমীয়তেঽনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) প্রমাণ শব্দটি প্র পূর্ব্বক মা ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনট্ প্রত্যয়সিদ্ধ। মা ধাতুর অর্থ জ্ঞান। প্র শব্দের অর্থ প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট। যথার্থ জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। সেই জ্ঞান অনুভূতিরূপ হইলে আরও প্রকৃষ্ট হয়। অনুভূতিজনিত স্মৃতিরূপ জ্ঞান অনুভূতির অধীন বলিয়া অনুভূতি হইতে নিকৃষ্ট। ফলকথা, যথার্থ অনুভূতিই এখানে প্র পূর্ব্বক মা ধাতুর দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাহার পরে করণার্থ অনট্ প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝা যায় করণ। তাহা হইলে প্রমাণ শব্দের দ্বারা বুঝা গেল, যথার্থ অনুভূতির করণ। সুতরাং যথার্থ অনুভূতির করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। সূত্রে "প্রমাণ" শব্দের দ্বারাই তাহা সূচিত হইয়াছে। "প্রমাণের" ফল "প্রমাই" যথার্থ অনুভূতি। সেই "প্রমার" অর্থাৎ যথার্থ অনুভূতির কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা করিলে "প্রমাতা" ও "প্রমেয়" প্রভৃতিও প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সেগুলি প্রমাণ হইতে ভিন্ন। যাহা যথার্থ অনুভূতির করণ, তাহাই প্রমাণ। ঐ অনুভূতির কর্ত্তা ও কর্ম্ম প্রভৃতি প্রমাণ নহে। তবে প্র পূর্ব্বক "মা"ধাতুর উত্তর করণ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে অনট্ প্রত্যয় করিয়া প্রমাতা প্রভৃতিতেও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সেরূপ প্রয়োগ স্থলবিশেষে দেখাও যায়। প্রমাতা ব্যক্তিকেও প্রমাণ পুরুষ বলা হয়। আবার "প্রমা"কেও অর্থাৎ যথার্থ অনুভূতিকেও প্রমাণ বলা হয়। প্রমা অর্থে "প্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ নব্যগণও করিয়াছেন। প্রাচীন মতে প্রমাও প্রমাণ হয়। অর্থাৎ মহর্ষি-সূত্রোক্ত প্রমাকরণরূপ প্রমাণও হয়। ক্রমে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

এখন বুঝিতে হইবে, "করণ" কাহাকে বলে। নব্যগণ বলিয়াছেন—কারণের মধ্যে যেটি অসাধারণ কারণ, তাহাই "করণ"। ইহার ফলিতার্থ বলিয়াছেন যে, যে কারণটি কোন একটি ব্যাপারের দ্বারা কার্য্যজনক হয় অর্থাৎ যাহার ব্যাপারের অনন্তরই কার্য্য হয়, তাহাই করণ। যেমন কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে কাষ্ঠের সহিত কুঠারের যে বিলক্ষণ সংযোগ আবশ্যক হয়, তাহা কুঠারের ব্যাপার। ঐ ব্যাপার দ্বারাই কুঠার কাষ্ঠ ছেদনের কারণ। ঐ ব্যাপারটি না হইলে কুঠার কাষ্ঠছেদনকার্য্য জন্মাইতে পারে না, সুতরাং ঐ ছেদনকার্য্যে কুঠার করণ। ঐ বিলক্ষণ সংযোগ তাহার ব্যাপার। কুঠার ঐ স্থলে করণ বলিয়াই "কুঠারেণ ছিনত্তি" অর্থাৎ কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে পদার্থটি করণ কারক হইবে, ঐ পদার্থ তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে ঐ কার্য্যের অনুকূল যে ধর্ম্মটিকে অপেক্ষা করে, সেই ধর্ম্মকেই ঐ করণকারকের ব্যাপার বলে। ব্যাপারহীন পদার্থ করণ হইতে পারে না এবং ব্যাপারের দ্বারা যাহা কার্য্যজনক, তাহাই করণ; ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। নব্যমতে করণত্বকে কারক

বলা হইলেও করণ পদার্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকারই বলা হইয়াছে। ব্যাপার দ্বারা কার্য্যজনক পদার্থই করণ। এই মতে যথার্থ অনুভূতির করণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ই হইবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষরূপ ব্যাপার দ্বারা ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের জনক, সুতরাং প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই করণ। প্রত্যক্ষটি যথার্থ হইলে সেখানে ঐ যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জলে চক্ষুঃসংযোগ হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় ঐ সংযোগ-সম্বন্ধরূপ ব্যাপার দ্বারা জলের প্রত্যক্ষ জন্মায়, সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয় করণ, ঐ সংযোগ তাহার ব্যাপার। ঐ স্থলে চক্ষুই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইরূপ অনুমানাদি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাহা যেখানে যথার্থ অনুভূতির করণ হইবে, তাহাই সেখানে প্রমাণ হইবে। নব্য মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান প্রমাণ। পদজ্ঞান শব্দ প্রমাণ। এ বিষয়ে নব্যগণের মধ্যেও মতভেদ আছে। পরে যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের লক্ষণ যথাক্রমে মহর্ষি-সূত্রেই সূচিত হইয়াছে। সূত্রে কেবল সূচনাই থাকে। সূচনা থাকে বলিয়াই তাহার নাম সূত্র। ব্যাখ্যার দ্বারা, বিচারের দ্বারা সেই সূচিত অর্থ বুঝিতে হয়। ব্যাখ্যার ভেদে, বুদ্ধির ভেদে সূত্রার্থবোধের ভেদ হওয়ায় সূত্রসিদ্ধান্তে মতভেদ হইয়াছে। তাহা চিরকালই হইবে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীনদিগের কথায় বুঝা যায়, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকেই মুখ্য করণ পদার্থ বলিতেন। সুতরাং ঐ ব্যাপারই তাঁহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ। এই জন্যই ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রস্থ "প্রত্যক্ষ" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে অব্যয়ীভাব সমাসের অর্থ প্রকাশ করতঃ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ফলকথা, যাহা চরম কারণ, অর্থাৎ যাহা উপস্থিত হইলে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, সেই ব্যাপারই প্রাচীন মতে মুখ্য করণ পদার্থ। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও চরম কারণ ব্যাপারকে করণ বলিতেন। গঙ্গেশের শব্দচিন্তামণির প্রারম্ভে টীকাকার মথুরানাথের কথায় ইহা পাওয়া যায়। সেখানে টীকাকার মথুরানাথ বৌদ্ধমতানুসারে করণের লক্ষণ বলিয়াছেন। সে লক্ষণানুসারে কেবল চরম কারণ ব্যাপারই করণ হয়। বাৎস্যায়ন ও উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ চরম কারণরূপ ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপারের দ্বারা যে পদার্থ কার্য্যজনক হইয়া থাকে, তাহাকেও করণ বলিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ও করণ হওয়ায় প্রমাণ হইবে। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ না বলিলে "চক্ষুষা পশ্যতি" অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে চরম কারণ না হওয়ায় মুখ্য করণ নহে। মহর্ষি পাণিনি বলিয়াছেন—"সাধকতমং করণং।" কোষকার অমরসিংহও ঐ কথা লইয়া বলিয়াছেন— "করণং সাধকতমং"। এই সাধকতম কাহাকে বলে, ইহা লইয়াই করণ বিষয়ে নানা মত হইয়াছে। যাহা সাধক অর্থাৎ কারণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধকতম। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। যাঁহারা ব্যাপারকে করণ বলেন নাই, চরম কারণরূপ ব্যাপার ব্যাপারশূন্য বলিয়া করণ হইতেই পারে না বলিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেন যে, যাহার ব্যাপারের পরেই কার্য্য হয়, ব্যাপার-বিশিষ্ট হইলেই যাহা অবশ্য কার্য্য জন্মায়, তাহাই কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহাই

করণ। প্রাচীনগণ বলিতেন যে, ঐরূপ পদার্থ ঐ ভাবে সাধকতম হইলেও এবং পাণিনি প্রভৃতি প্রয়োগ সাধনের জন্য ঐ ভাবে ঐরূপ পদার্থকে সাধকতম বলিলেও বস্তুতঃ ঐ স্থলে উহাদিগের ব্যাপারই চরম কারণ। ঐ ব্যাপার না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা কার্য্য সাধন করিতে পারে না। সংযোগ না হইলে কুঠার ছেদন জন্মাইতে পারে কি? সুতরাং করণ কারক কার্য্য সাধন করিতে যে ব্যাপারকে নিয়ত অপেক্ষা করে, সেই চরম কারণ ব্যাপারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া বস্তুতঃ তাহাই সাধকতম। সুতরাং তাহা করণ। তবে ঐ ব্যাপারের সাহায্যে যে পদার্থ কার্য্যজনক, তাহাও অন্য কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঐ ভাবে তাহাকেও "সাধকতম" বলা হইয়াছে। যেমন কুঠার কাষ্ঠের সহিত বিলক্ষণ সংযোগরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হইলে ছেদনকার্য্য অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য ঐরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট কুঠারকে কারণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া "সাধকতম" বলা যায়। পাণিনি প্রভৃতি সেই ভাবেই কুঠার প্রভৃতি করণ কারককে সাধকতম বলিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে ব্যাপারটি যে পদার্থজন্য, সেই পদার্থ না থাকিলেও ব্যাপারের দ্বারা তাহাকেও কার্য্যজনক বলা হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বানুভূতি না থাকিলেও তজ্জন্য সংস্কাররূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা স্মরণ জন্মাইয়া থাকে। যাগাদি ক্রিয়া না থাকিলেও তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা স্বর্গাদি জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপারেরই প্রাধান্য স্বীকার্য্য এবং ব্যাপারই যে চরম কারণ, এ বিষয়েও কোন বিবাদ নাই। সুতরাং ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিতে হইবে। উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকের প্রথমে প্রমাতা প্রভৃতিও প্রমিতির কারণ, প্রমাণও প্রমিতির কারণ, তবে আর প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ কি? এতদুত্তরে প্রমাণকে "সাধকতম" বলিয়া প্রমাতা প্রভৃতি হইতে তাহার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রমাণ "সাধকতম" কেন, ইহার অনেক হেতু দেখাইয়াছেন। তাহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি করণ-কারকের ব্যাপারকে "সাধকতম" বলিয়া করণ বলিয়াছেন, নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে তিনি প্রমাণ বলিবেন কিরূপে? এ সকল কথা ক্রমে আরও পরিস্ফুট হইবে। ফলকথা, প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে করণ বলিয়া প্রমাণ বলিলেও ঐ ব্যাপারজনক ইন্দ্রিয়াদিও তাঁহাদিগের মতে প্রমাণ। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথাতেও ইহা পাওয়া যায়।[১] তাহা হইলে বুঝা গেল যে, চরম কারণই প্রাচীন মতে প্রধান করণ এবং যাহা সেই চরম কারণরূপ ব্যাপারের দ্বারা কার্য্যজনক হয়, তাহা অপ্রধান করণ। নব্যগণ তাহাকেই করণ বলিয়াছেন এবং বৈয়াকরণগণ প্রয়োগ সাধনের জন্য এই অপ্রধান করণকেই করণ কারক বলিয়াছেন এবং ঐ করণকারকত্ব বক্তার বিবক্ষাধীন, বক্তার বিবক্ষানুসারে কর্ত্তা ও অধিকরণ কারক প্রভৃতিও করণ কারকরূপে ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এ কথা স্বীকার করিতে বৈয়াকরণগণও বাধ্য হইয়াছেন।

১। "ইন্দ্রিয়াদিনা প্রমাণেন প্রমায়াং ফলে প্রবৃত্তেন তদুৎপাদনানুকূলঃ সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা চরমভাবী ধর্ম্ম-ভেদোঽপেক্ষ্যত ইতি ভবতি ব্যাপারঃ স এব বৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।"—তাৎপর্য্যটীকা। "ন দ্রব্যাদীনামেব করণত্বং অপি তু ব্যাপারস্যাপি, অন্যথা কর্ম্মনামধেয়েষূদ্ভিদাদিশব্দেষু ন করণবিভক্তিঃ শ্রূয়েত। উদ্ভিদা যজেত দর্শপৌর্ণ-মাসাভ্যাং যজেতেত্যাদি। সম্ভবতি তস্যাপি সিদ্ধস্য ফলভাবনায়াং নিমিত্তত্বং" (তাৎপর্য্যটীকা। (অনুমান-সূত্র)।

ফলতঃ বৈয়াকরণ-সম্মত করণের মধ্যেও মুখ্য গৌণ ভেদ আছে। প্রাচীন মতে ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণ হইলেও তাঁহারা মুখ্য প্রমাণকে বলিবার জন্যই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রে "প্রত্যক্ষ" শব্দটি অব্যয়ীভাব সমাস হইলেই তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার বুঝা যায়, তাই বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অন্যত্র "প্রত্যক্ষ" -শব্দটি "প্রাদি সমাস" হইলেও সূত্রে 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি অব্যয়ীভাব সমাস। কারণ, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণই "প্রত্যক্ষ" শব্দের প্রতিপাদ্য। অব্যয়ীভাব সমাস ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার দ্বারা বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বুঝিলে ইন্দ্রিয়কেও সেই সঙ্গে বুঝা যাইবে। কারণ, ইন্দ্রিয় ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, সুতরাং ব্যাপার দ্বারা পরম্পরায় ইন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, ইহাও তাহাতে বুঝা যায়। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই সূত্রস্থ "প্রত্যক্ষ" শব্দের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। আবার শব্দ প্রমাণের ব্যাখ্যায় শব্দকেই প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষি-সূত্রে তাহাই আছে (৭।৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।) সেখানেও শাব্দ বোধের চরম কারণরূপ করণই প্রাচীন মতে মুখ্য শব্দ প্রমাণ বুঝিতে হইবে। সেই চরম কারণ যাহার ব্যাপার, সেই জ্ঞায়মান শব্দকেও প্রাচীনগণ শাব্দ বোধের করণ বলিয়া স্বীকার করায় তাহাও শব্দপ্রমাণ হইবে। মহর্ষি সেই অভিপ্রায়েই শব্দবিশেষকেই শব্দ-প্রমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার এই সূত্রে প্রত্যক্ষাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণ বলেন নাই। যথার্থ প্রত্যক্ষের করণত্বই প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ যথার্থ অনুমিতির করণত্বই অনুমানপ্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ যথার্থ উপমিতির করণত্বই উপমান-প্রমাণের লক্ষণ। এইরূপ যথার্থ শাব্দ বোধের করণত্বই শব্দপ্রমাণের লক্ষণ। মহর্ষি-সূত্রে পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে প্রাচীনগণ চরম কারণকেই মুখ্য করণ বলায় প্রাচীন মতে প্রত্যক্ষাদি যথার্থ অনুভূতির চরম কারণই মুখ্য প্রমাণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

এখানে আর একটি কথা বুঝিয়া মনে রাখিতে হইবে। প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে "প্রমা" এবং "প্রমিতি" বলে। প্রাচীন মতে এই "প্রমিতি"ও প্রমাণ হয়। তাহার ফলকে অর্থাৎ ঐ "প্রমিতি"রূপ প্রমাণজন্য যে জ্ঞানরূপ ফল হয়, তাহাকে প্রাচীনগণ বলিতেন—"হানাদিবুদ্ধি"। "হানাদিবুদ্ধি" বলিতে—"হানবুদ্ধি", "উপাদানবুদ্ধি" এবং "উপেক্ষাবুদ্ধি"। "হা" ধাতুর উত্তর করণ অর্থে "অনট্" প্রত্যয় যোগে এই "হান" শব্দটি সিদ্ধ। "হা" ধাতুর অর্থ ত্যাগ। "হীয়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যাহার দ্বারা ত্যাগ করা হয়, তাহাই এখানে "হান" শব্দের অর্থ। "হান" এমন যে "বুদ্ধি", তাহাই "হানবুদ্ধি"। অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা হেয়ত্ব বোধ করিয়া ত্যাগ করা হয়, তাহাই "হান বুদ্ধি।" এইরূপ যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ হয় এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ঐ স্থলে যথাক্রমে "উপাদান" ও "উপেক্ষা" শব্দটি সিদ্ধ। এখন ইহার উদাহরণ বুঝিতে পারিলেই এ সকল কথা বুঝা যাইবে। জীবের বস্তুবোধ হইলে ঐ বস্তু গ্রহণ করে, অথবা ত্যাগ করে, অথবা উপেক্ষা

করে। পরিজ্ঞাত বস্তু উপকারী বলিয়া মনে হইলে তাহা গ্রহণ করে, অপকারী বলিয়া বুঝিলে ত্যাগ করে; উপকারীও নহে, অপকারীও নহে, এমন বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। এই পর্য্যন্তই জীবের বস্তুবোধের কার্য্য। এই যে গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষা করে, তাহার পূর্ব্বে জীবের সেই বস্তুতে গ্রাহ্যতা প্রভৃতির বোধ জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। গ্রাহ্য বলিয়া না বুঝিলে জীব কখনই তাহা গ্রহণ করে না। কিন্তু ঐ গ্রাহ্যতা বোধ কিরূপে হইবে? আমি জল দেখিয়া যখন গ্রহণ করি, তখন তৎপূর্ব্বে "এই জল গ্রাহ্য" এইরূপ একটা বোধ আমার অবশ্যই হয় এবং ত্যাগ বা উপেক্ষা করিলেও তৎপূর্ব্বে "এই জল ত্যাজ্য" অথবা "এই জল উপেক্ষ্য" এইরূপ বোধ অবশ্যই জন্মে। কিন্তু ঐ বোধকে সেখানে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। কারণ, সেই জলের গ্রহণ প্রভৃতি তখন হয় নাই। সেই গ্রহণাদি সেখানে ভাবী। ভাবী বিষয়ে লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান বিষয়েই হয়। সুতরাং "এই জল গ্রাহ্য", এইরূপ বোধ যাহা জন্মে, তাহা গ্রহণরূপ ভাবী পদার্থবিষয়ক হওয়ায় উহা প্রত্যক্ষ নহে, উহা অনুমিতি। ঐ অনুমিতিরূপ বোধবশতঃই সেখানে জল গ্রহণ করে। এইরূপ "এই জল হেয়," অথবা "উপেক্ষ্য," এইরূপ বোধও অনুমিতি, তাহার ফলে জলের ত্যাগ বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। এখন যদি "এই জল গ্রাহ্য" ইত্যাদি প্রকার বোধকে অনুমিতি বলিতে হইল, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে তাহার কারণও দেখাইতে হইবে। তৎপূর্ব্বে এমন কোন বুদ্ধি জন্মে, যাহার ফলে "এই জল গ্রাহ্য" ইত্যাদি প্রকার অনুমিতি হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীনগণ তাহাকেই বলিয়াছেন "হানাদিবুদ্ধি"। সে কিরূপ বুদ্ধি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বোধ হইলে সেখানে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের পরেই যে বোধটি জন্মে, তাহাকে "নির্ব্বিকল্পক" প্রত্যক্ষ বলে। যেমন জলে চক্ষুঃ-সংযোগের পরেই জল ও জলত্ব-বিষয়ে একটা "আলোচন" হয়। "জলত্ববিশিষ্ট জল" এইরূপ বোধ না হইয়া কেবল পৃথক্‌ভাবে জল ও জলত্ববিষয়ে যে একটি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই প্রাচীনগণ "আলোচন" জ্ঞান এবং "নির্ব্বিকল্পক" জ্ঞান বলিয়াছেন। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষও বলা হয়। ঐ "নির্ব্বিকল্পক" বা অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষের পরেই "জলত্ববিশিষ্ট জল" এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের নাম "সবিকল্পক প্রত্যক্ষ"। পদার্থকে বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিলে সে জ্ঞানে "বিকল্প" অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকিল, এ জন্য সেই জ্ঞানকে বলে "সবিকল্পক"। আর যে জ্ঞানে পদার্থদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বোধ হয় না, তাহা নির্ব্বিকল্পক। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যখন "জলত্ববিশিষ্ট জল" এইরূপ "সবিকল্পক" প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন পূর্ব্বানুভূত জল বিষয়ে যে সংস্কার থাকে, তাহার উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে একটি বিশিষ্ট স্মৃতি জন্মে। জলদর্শী পূর্ব্বে জল দেখিয়াছিল, সেই জল পান করিয়া তাহার পিপাসা-নিবৃত্তিও হইয়াছিল। সুতরাং সেই জল পিপাসানিবর্ত্তক, এ বিষয়ে তাহার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। এবং "তজ্জাতীয় জল মাত্রই পিপাসানিবর্ত্তক," এইরূপ একটা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় তজ্জন্য ঐরূপ সংস্কারও তাহার রহিয়াছে। পুনরায় তজ্জাতীয় জল দেখিলে পরেই তাহার ঐ সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে

পূর্ব্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, তাহার পরেই "এই জল তজ্জাতীয়," এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মে। উহা সেখানে প্রত্যক্ষাত্মক এবং "পরামর্শ" নামক অনুমানপ্রমাণ এবং ইহাই ঐ স্থলে "উপাদানবুদ্ধি"। কারণ, ঐ বুদ্ধির দ্বারা পরক্ষণেই "এই জল গ্রাহ্য" এইরূপ অনুমিতি জন্মে, তাহার ফলে সেই জলের উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে। এইরূপ জলদর্শী ব্যক্তি যদি তাহার পরিদৃষ্ট জলে তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট এবং পরিত্যক্ত জলের সাদৃশ্য দেখিয়া "এই জল তজ্জাতীয়," এইরূপ বোধ করে, অথবা পূর্ব্বদৃষ্ট উপেক্ষিত জলের সাদৃশ্য দেখিয়া "এই জল তজ্জাতীয়" এইরূপ বোধ করে, তাহা হইলে ঐ দুইটি বুদ্ধি তাহার যথাক্রমে "হানবুদ্ধি" এবং "উপেক্ষাবুদ্ধি" হইবে। উহার দ্বারা "এই জল হেয়" এবং "এই জল উপেক্ষ্য," এইরূপ অনুমান করিয়া সেই জলের ত্যাগ বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার "হানাদিবুদ্ধি" প্রত্যক্ষ-প্রমিতি। এই পর্য্যন্তই ঐ স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জলের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধরূপ সন্নিকর্ষজন্য ঐ পর্য্যন্ত বুদ্ধি হয়। সুতরাং উহাতেও ঐ সন্নিকর্ষ কারণ। তবে ঐ "হানাদিবুদ্ধি"র পূর্ব্বে যে "নির্ব্বিকল্পক" বা "সবিকল্পক" প্রত্যক্ষ-প্রমিতি জন্মে, তাহা ঐ হানাদি বুদ্ধির কারণ হওয়ায়, ঐ হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে পূর্ব্বজাত ঐ প্রত্যক্ষ-প্রমিতিকেও প্রাচীনগণ প্রমাণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনগণ চরম কারণ অর্থাৎ যে কারণটি উপস্থিত হইলে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, তাহাকেই মুখ্য করণ বলিতেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমিতি হানাদি বুদ্ধির প্রতি চরম কারণ হওয়ায় তাঁহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ হয়, এ জন্য তাঁহারা প্রমিতিবিশেষকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত হানাদি বুদ্ধির প্রতি ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ চরম কারণ না হওয়ায় মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্য প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া এবং সেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য প্রমিতিকেও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বলিয়া হানাদি বুদ্ধির প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু হানাদি বুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না। কারণ, তাহার ফল অনুমিতি।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে জলের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ-সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের প্রথম ব্যাপার। তাহার পরেই জল ও জলত্ব বিষয়ে "আলোচন" বা নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে এবং তাহার পরেই "জলত্ববিশিষ্ট জল" এইরূপ "সবিকল্পক" প্রত্যক্ষ জন্মে। একই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে বলিয়া প্রাচীনগণ ঐ দ্বিবিধ প্রত্যক্ষকেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের ফল বলিয়াছেন এবং ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকেই তাহার প্রতি মুখ্য করণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন এবং ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের কারণ ইন্দ্রিয়ও তাহাতে করণ বলিয়া তাহাকেও ঐ স্থলে প্রমাণ বলিয়াছেন। অন্যান্য অনেক পদার্থ ঐ দ্বিবিধ প্রত্যক্ষে কারণ হইলেও করণ না হওয়ায় সেগুলি ঐ স্থলে প্রমাণ নহে। পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের পরে যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার "হানাদিবুদ্ধি" জন্মে, প্রাচীনগণ তাহাকে পূর্ব্বজাত জ্ঞানেরই ফল বলিয়া ঐ জ্ঞানকেই তাহার প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। ঐ জ্ঞানের সাধন পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ এবং ইন্দ্রিয়ও ঐ

হানাদি বুদ্ধির প্রতি পরম্পরায় করণ হওয়ায় তাহাকেও উহার প্রতি প্রমাণ বলিয়াছেন। অন্যান্য কারণগুলি করণ না হওয়ায় তাহা ঐ স্থলে প্রমাণ হইবে না। মুখ্য ও গৌণ করণের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাঁহারা ব্যাপারের দ্বারা কার্য্যজনক না হইলে করণ বলেন না, অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার চরম কারণকে করণই বলেন না, তাঁহারা নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষকে এবং হানাদি বুদ্ধিতে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে করণ বলিতে পারেন। তাহা হইলে প্রাচীনদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ এবং তজ্জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিতে হয়; কিন্তু নব্যগণ তাহা বলেন নাই, কেহ বলিলেও ব্যাখ্যাকারগণ তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই; প্রাচীনগণ উহা কেন বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ প্রচুর। জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে বহু মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমিতির কর্ত্তা, কর্ম্ম ও সাধারণ কারণ ভিন্ন যে সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমূহ, তাহাই প্রমাণ। ফলকথা, তিনিও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ এবং তজ্জন্য জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। যাহা চরম কারণ অর্থাৎ যাহা উপস্থিত হইলে কার্য্য না হওয়া আর ঘটিবে না, এমন পদার্থই মুখ্য করণ; এই মত জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতেও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বহু মতভেদ ও প্রতিবাদ থাকিলেও প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও উদ্যোতকরের মতে প্রমাণের ফল "প্রমিতি"ও পূর্ব্বোক্ত "হানাদি বুদ্ধি"র প্রতি প্রমাণ। অনুমানাদি স্থলেও ঐরূপ হইবে অর্থাৎ অনুমিতিরূপ প্রমিতি ও হানাদি বুদ্ধিরূপ অনুমিতির প্রতি অনুমান প্রমাণ হইবে। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। এই সকল প্রাচীন মতের সকল কথা বুঝিতে হইলে অনুসন্ধিৎসু সুধী "তাৎপর্য্যটীকা" প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন, কিন্তু বড় সাবধান হইয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং। বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা। যদা সন্নিকর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং।

অনুবাদ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি (ব্যাপার) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। "বৃত্তি" কিন্তু সন্নিকর্ষ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ), অথবা জ্ঞান (নির্ব্বিকল্পক বা সবিকল্পক জ্ঞান)। যে সময়ে সন্নিকর্ষ (ব্যাপার হইবে), তখন জ্ঞানরূপ প্রমিতি (প্রমাণের) ফল হইবে। যে সময়ে জ্ঞান (ব্যাপার হইবে), তখন হানবুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে), উপাদানবুদ্ধি (যে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করে) এবং উপেক্ষা-বুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা করে), (প্রমাণের) ফল হইবে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার এই সূত্রভাষ্যে সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবোধক চারিটি সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদিগের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ মহর্ষিসূত্রে পরে ব্যক্ত হইবে।

"প্রতিগতমক্ষং" এইরূপ বিগ্রহে প্রাদি সমাস করিলে প্রতিগত অর্থাৎ বিষয়-সন্নিকৃষ্ট "অক্ষ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা পরিস্ফুট হয় না এবং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানরূপ বৃত্তিও যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, তাহা বুঝা যায় না। "অক্ষমক্ষং প্রতিবর্ত্ততে" এইরূপ বিগ্রহে অব্যয়ীভাব সমাসসিদ্ধ "প্রত্যক্ষ" শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণত্ব বোধ না হইলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার "অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ"—এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অব্যয়ীভাব সমাসের বিগ্রহ-বাক্যের সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্য পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহবাক্যের ফলিতার্থকথন মাত্র। উহা অব্যয়ীভাব সমাসের বিগ্রহবাক্য নহে। তাহা হইলে "অক্ষস্য অক্ষস্য" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইত না।

অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহ-বাক্যের দ্বারা যে "বৃত্তি" অর্থ প্রতীত হইয়াছে, ভাষ্যকার এখানে তাহাকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ, প্রমাণ-বোধক "প্রত্যক্ষ" শব্দের উক্ত ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহাই বুঝা গিয়াছে। "বৃত্তি" বলিতে ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ যেমন ইন্দ্রিয়-জন্য এবং ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-জন্য যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও ইন্দ্রিয়-জন্য চরম ফল হানাদি-বুদ্ধির জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইবে। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণের মতে চরম কারণরূপ ব্যাপারই মুখ্য করণ। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ও তজ্জন্য জ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রমিতির মুখ্য করণ বলিয়া মুখ্য প্রমাণ বলা যায়। পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে তাহাই বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষরূপ প্রমাণের ফল নির্ব্বিকল্পক বা সবিকল্পক জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল হানাদি-বুদ্ধি। ন্যায়বার্ত্তিক-কারও এখানে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"উভয়ং পরিচ্ছেদকং সন্নিকর্ষো জ্ঞানঞ্চ।" যাঁহারা কেবল ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উদাহরণ বুঝিয়া কথাগুলি বুঝিতে হইবে। আমি আমার মনঃপূত পানীয় জলের অন্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে আমার জলে চক্ষুঃসংযোগ হইল, এইটিই আমার বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। তাহার পরক্ষণেই আমার জল ও জলত্ব বিষয়ে পৃথক্‌ভাবে একটি অবিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল। এই জ্ঞানটির নাম "নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ।" তাহার পরক্ষণেই "জলত্ববিশিষ্ট জল" এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল; এই জ্ঞানটির নাম "সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।" পূর্ব্বে জলত্ব প্রত্যক্ষ ব্যতীত "জলত্ববিশিষ্ট" এইরূপ প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না,—কারণ, বিশিষ্ট বুদ্ধি মাত্রেই পূর্ব্বে বিশেষণ জ্ঞান থাকা চাই। যে সর্প দেখে নাই, তাহার "এই স্থান সর্পবিশিষ্ট", এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং "জলত্ববিশিষ্ট" এইরূপ প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে একটি জলত্ব প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ প্রত্যক্ষের নাম নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, উহা ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য এবং উহার পরজাত "জলত্ববিশিষ্ট জল" এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষটিও পূর্ব্বজাত সেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ দুই প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ প্রমাণ। ঐ প্রত্যক্ষের পরে তজ্জাতীয় অন্য জলের পিপাসা-নিবর্ত্তকত্ব বিষয়ে আমার

যে সংস্কার আছে, ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া আমার পূর্ব্বানুভূত জলের পিপাসা-নিবর্ত্তকত্বের স্মরণ জন্মাইল, শেষে "এই জল তজ্জাতীয়" এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মাইল; ইহারই নাম "উপাদান-বুদ্ধি।" ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহা অনুমিতির কারণ জ্ঞান, এই জ্ঞান জন্য শেষে আমার "ইহা গ্রাহ্য" এইরূপ অনুমিতি জন্মিল, আমি তখন পানের জন্য ঐ জল গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যে উপাদানবিষয়ক বুদ্ধিকেই উপাদান-বুদ্ধি বলা হয় নাই। "উপাদীয়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যে বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করিয়া উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে, তাহাই উপাদান-বুদ্ধি এবং ঐরূপে যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাজ্য বলিয়া অনুমান করিয়া ত্যাগ করে, তাহাই "হানবুদ্ধি" এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্য বলিয়া অনুমান করিয়া উপেক্ষা করে তাহাই "উপেক্ষা-বুদ্ধি।" প্রত্যক্ষ-স্থলে পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি বুদ্ধি প্রত্যক্ষাত্মক। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের পরে যে নির্ব্বিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইয়া পূর্ব্বোক্ত ঐ "হানাদি বুদ্ধি"রূপ ফল জন্মায়। এ জন্য ঐ হানাদি বুদ্ধির পক্ষে পূর্ব্বজাত সেই জ্ঞানই প্রমাণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের ন্যায় তজ্জন্য যে প্রত্যক্ষ প্রমিতি জন্মে, তাহাকেও পরভাবী হানাদিবুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতির পক্ষে প্রমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্য। মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোঽর্থস্য পশ্চান্মানমনুমানং। উপমানং সামীপ্যজ্ঞানং যথা—গৌরেবং গবয় ইতি। সামীপ্যন্তু সামান্যযোগঃ। শব্দঃ শব্দ্যতেঽনেনার্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে। উপলব্ধিসাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্যানির্ব্বচনসামর্থ্যাদ্‌বোদ্ধব্যম্। প্রমীয়তেঽনেনেতি করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ। তদ্বিশেষসমাখ্যায়া অপি তথৈব ব্যাখ্যানম্।

অনুবাদ। মিত অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞাত হেতুর দ্বারা লিঙ্গী অর্থের অর্থাৎ যে পদার্থে হেতু আছে, সেই অর্থের (সাধ্যের) পশ্চাৎ জ্ঞান (যাহার দ্বারা হয়, তাহা) অনুমান। "উপমান" বলিতে যেমন গো, এইরূপ গবয়, এইরূপে সামীপ্য জ্ঞান। সামীপ্য কিন্তু সাদৃশ্য-সম্বন্ধ। ইহার দ্বারা পদার্থ শব্দিত হয়, অভিহিত হয়, জ্ঞাপিত হয়, এ জন্য "শব্দ" (প্রমাণ)। উপলব্ধির সাধনগুলি প্রমাণ, ইহা সমাখ্যার অর্থাৎ "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নির্ব্বচন-সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিবশতঃ বুঝা যায়। কারণ, "প্রমীয়তেঽনেন" এই ব্যুৎপত্তিতে (অর্থাৎ ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত হয়, এই অর্থে) প্রমাণ শব্দটি করণার্থবোধক; (সুতরাং) সেই প্রমাণের বিশেষ সমাখ্যারও ("প্রত্যক্ষ," "অনুমান", "উপমান", "শব্দ," এই চারিটি বিশেষ সংজ্ঞারও) সেইরূপই (যেরূপে করণার্থ বুঝা যায়) ব্যাখ্যা (বুঝিতে হইবে)।

টিপ্পনী। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, মান শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাহা হইলে অনুমান শব্দের দ্বারা বুঝা যায় পশ্চাৎ জ্ঞান। অনুমানের হেতুকে "লিঙ্গ" বলে। লিঙ্গ-জ্ঞানের পরে অনুমান হয়, তাই উহার নাম "অনুমান"। সন্দিগ্ধ বা বিপরীতভাবে জ্ঞাত লিঙ্গের দ্বারা জ্ঞান, প্রকৃত অনুমান নহে; তাই বলিয়াছেন যে, লিঙ্গটি "মিত" অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞাত হওয়া চাই। শাব্দ বোধ যথার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা হয়—কিন্তু সেখানে শব্দ লিঙ্গ হয় না, এ জন্য তাহা অনুমান হইতে পারিবে না। যে ধর্ম্মীতে অনুমান হইবে, সেখানে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু পদার্থ থাকা চাই, এ জন্য বলিয়াছেন—"লিঙ্গী অর্থের পশ্চাৎ জ্ঞান"। ধর্ম্মী লিঙ্গবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে "লিঙ্গী" বলা যায়। কেবল ধর্ম্মীর অনুমান হয় না; কারণ, তাহা সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু একটি অসিদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপেই ধর্ম্মীর অনুমান হয়, এ জন্য বলিয়াছেন—"লিঙ্গী অর্থের অনুমান"। অর্থ বলিতে এখানে সাধ্য। কেবল ধর্ম্মী সাধ্য নহে। অনুমেয় ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে ধর্ম্মী সাধ্য হইতে পারে। ভাষ্যোক্ত অনুমান ব্যাখ্যা যদিও অনুমিতিরূপ ফলের ব্যাখ্যা, তাহা হইলেও ("যতঃ" এই কথার অধ্যাহার করিয়া) যাহার দ্বারা ঐ অনুমিতি জন্মে, তাহাই অনুমান প্রমাণ—এই পর্য্যন্তই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, যখন অনুমিতিরূপ ফলও হানাদি বুদ্ধির পক্ষে প্রমাণ হইবে, তখন "যতঃ" এই কথার অধ্যাহার না করিলেও ভাষ্যার্থের অসংগতি নাই।

"উপ" শব্দের অর্থ সামীপ্য, "মান" শব্দের অর্থ জ্ঞান। সামীপ্য এখানে সাদৃশ্য, ইহা ভাষ্যকারই বলিয়াছেন। সুতরাং উপমান শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সাদৃশ্য-জ্ঞান। গবয়-নামক গো-সদৃশ একপ্রকার পশু আছে। "যথা গোরেবং গবয়ঃ" এই কথা যিনি শুনিয়াছেন, তিনি কখনও গো-সদৃশ ঐ পশুকে দেখিলে, গবয়ে গো-সাদৃশ্য দেখিয়া, "গবয় গবয় শব্দের বাচ্য" এইরূপে গবয়মাত্রে গবয়-শব্দবাচ্যত্ব বুঝিয়া থাকেন। ইহা ঐ সাদৃশ্য-জ্ঞানরূপ উপমান-প্রমাণের ফল। "শব্দ্যতেঽনেনার্থঃ"—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে "শব্দ" শব্দটি সিদ্ধ। সুতরাং জ্ঞায়মান পদ অথবা পদজ্ঞানই শব্দপ্রমাণ বলিয়া উহা দ্বারা বুঝা যাইবে। ভাষ্যে "শব্দ্যতে" ইহার বিবরণ অভিধীয়তে—তাহার বিবরণ জ্ঞাপ্যতে। লক্ষণাজ্ঞান পূর্ব্বক পদার্থের উপস্থিতি প্রযুক্তও শাব্দ বোধ হয়; সেখানে পদার্থ অভিধা-বোধিত না হইলেও জ্ঞাপিত হয়। তাই "জ্ঞাপ্যতে" বলিয়া উহারই পুনর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ যাহার দ্বারা পদার্থ জ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ পদার্থবিষয়ক শাব্দ বোধ হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ।

"প্রমাণ" বলিতে যথার্থ অনুভূতির সাধন। ইহা প্রমাণ শব্দের ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিতেই বুঝা যায়। প্রমাণ-সামান্যবোধক 'প্রমাণ' শব্দটি যখন করণার্থবোধক, তখন তাহার বিশেষ নামগুলিও করণার্থবোধক, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং সেগুলিরও সেইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। প্রমাণবোধক প্রত্যক্ষাদি শব্দের ব্যুৎপত্তিমাত্রই এই ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণ নহে। সুতরাং প্রমাণাভাসে অতিব্যাপ্তি-দোষের আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ প্রমাণাভাসে নাই।

ভাষ্য। কিং পুনঃ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংপ্লবন্তেঽথ প্রতিপ্রমেয়ং ব্যবতিষ্ঠন্ত ইতি। উভয়থাদর্শনং। অস্ত্যাত্মেত্যাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে। তত্রানুমানং—"ইচ্ছা-দ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গ"মিতি। প্রত্যক্ষং যুঞ্জানস্য যোগসমাধিজমাত্মমনসোঃ সংযোগ-বিশেষাদাত্মা প্রত্যক্ষ ইতি। অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে অত্রাগ্নিরিতি। প্রত্যাসীদতা ধূমদর্শনেনানুমীয়তে। প্রত্যাসন্নেন চ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে।

অনুবাদ। প্রমাণগুলি কি প্রমেয়কে অভিসংপ্লব করে? অথবা প্রতিপ্রমেয়ে ব্যবস্থিত? (অর্থাৎ এক একটি প্রমেয়ে কি বহু প্রমাণের ব্যাপার হয়? অথবা কোন একটি বিশেষ প্রমাণেরই ব্যাপার হয়?)। (উত্তর)—দুই প্রকারই দেখা যায়। (এক প্রমেয়ে বহু প্রমাণের ব্যাপাররূপ প্রমাণসংপ্লবের উদাহরণ দেখাইতেছেন) আত্মা আছে, ইহা শব্দপ্রমাণ হইতে বুঝা যায়। তদ্বিষয়ে (আত্মবিষয়ে) অনুমান উক্ত হইয়াছে, "ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গং" এই সূত্র (১অঃ, ১আঃ, ১০সূত্র)। তদ্বিষয়ে যুঞ্জান ব্যক্তির (যোগিবিশেষের) যোগসমাধিজাত প্রত্যক্ষ আছে। আত্মা এবং মনের সংযোগ-বিশেষ প্রযুক্ত যথার্থরূপে আত্মা প্রত্যক্ষ হয়। (লৌকিক বিষয়েও প্রমাণ-সংপ্লবের উদাহরণ দেখাইতেছেন) "এখানে অগ্নি আছে," এইরূপ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নি প্রতীত হয়। নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে তৎকর্ত্তৃক ধূম দর্শনের দ্বারা (ঐ অগ্নি) অনুমিত হয় এবং নিকটবর্ত্তী হইলে তৎকর্ত্তৃক (ঐ অগ্নি) প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ হয়।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং প্রমাণের চতুর্ব্বিধ বিভাগ উপপন্ন হয় না, এ কথা যাঁহারা বলিবেন, ভাষ্যকার তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রমাণ-সংপ্লব এবং প্রমাণ-ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন। যে বিষয়ে বহু প্রমাণের ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে প্রমাতা তাঁহার যথার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃ বহু প্রমাণের দ্বারাই তাহাকে যথার্থরূপে বুঝিয়া থাকেন; সুতরাং এক বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকররূপ প্রমাণ-সংপ্লব আছে এবং উহা ব্যর্থ নহে। যথার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃই সম্ভবস্থলে বহু প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়। এই প্রমাণ-সংপ্লবের উদাহরণ অলৌকিক আত্মবিষয়ে এবং লৌকিক অগ্নি-বিষয়ে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। উহা প্রদর্শন মাত্র। ঐরূপ বহু স্থলেই প্রমাণ-সংপ্লব আছে। যেখানে একমাত্র প্রমাণের ব্যাপার অর্থাৎ যে পদার্থ কোন একটি প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণান্তরের বিষয়ই নহে, অথবা যেখানে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হইলে তাহাতে প্রমাতার আর জিজ্ঞাসা থাকে না, সেখানে প্রমাণের ব্যবস্থা। এই প্রমাণ-ব্যবস্থার উদাহরণ ভাষ্যকার (অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে) ইহার পরেই দেখাইতেছেন। সেগুলিও প্রদর্শন মাত্র। সেইরূপ বহু স্থলেই প্রমাণের ব্যবস্থা আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। ব্যবস্থা পুন"রগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম" ইতি। লৌকিকস্য স্বর্গে ন লিঙ্গদর্শনং ন প্রত্যক্ষম্। স্তনয়িত্নুশব্দে শ্রূয়মাণে শব্দহেতোরনুমানম্। তত্র ন প্রত্যক্ষং নাগমঃ। পাণৌ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানে নানুমানং নাগম ইতি। সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা। জিজ্ঞাসিতমর্থমাপ্তোপদেশাৎ প্রতিপদ্যমানো লিঙ্গদর্শনেনাপি বুভুৎসতে, লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ্চ প্রত্যক্ষতো দিদৃক্ষতে, প্রত্যক্ষত উপলব্ধেঽর্থে জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। পূর্ব্বোক্তমুদাহরণং অগ্নিরিতি। প্রমাতুঃ প্রমাতব্যেঽর্থে প্রমাণানাং সংকরোঽভিসংপ্লবঃ, অসংকরো ব্যবস্থেতি। ইতি ত্রিসূত্রী-ভাষ্যম্। ৩।

অনুবাদ। ব্যবস্থা (অর্থাৎ প্রমাণের অসংকর), কিন্তু "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" এই স্থলে। লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গবিষয়ে হেতুদর্শন অর্থাৎ অনুমান নাই, প্রত্যক্ষও নাই; (অর্থাৎ যিনি স্বর্গপদার্থ প্রত্যক্ষ করেন নাই, অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও বুঝিতে পারেন নাই, সেই লৌকিক ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরূপ প্রমেয়ে একমাত্র শ্রুতি-প্রমাণই ব্যবস্থিত। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারাই তাঁহার স্বর্গবিষয়ক প্রমিতি হইয়া থাকে)। (লৌকিক বিষয়েও প্রমাণের ব্যবস্থা দেখাইতেছেন) মেঘের শব্দ শ্রূয়মাণ হইলে (সেই শব্দের দ্বারা) শব্দহেতুর (মেঘের) অনুমান হয়। তদ্বিষয়ে (তখন) প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দ-প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলভ্যমান (দৃশ্যমান) হস্তে (তখন) অনুমান-প্রমাণ নাই, আগম-প্রমাণও নাই। সেই এই প্রমিতি (প্রমাণ-সংপ্লব স্থলে প্রমাণের ফল যথার্থ জ্ঞান) প্রত্যক্ষপরা অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রধানা। (কেন? তাহা বুঝাইতেছেন) জিজ্ঞাসিত পদার্থকে শব্দ-প্রমাণ হইতে বোধ করতঃ লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাও বুঝিতে ইচ্ছা করে। লিঙ্গদর্শনের দ্বারা অনুমিত পদার্থকে আবার প্রত্যক্ষের দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ পদার্থে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। (এ বিষয়ে) অগ্নি উদাহরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রমাতার প্রমেয় বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকরকে "অভিসংপ্লব" বলে, অসংকরকে "ব্যবস্থা" বলে। তিন সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত হইল। ৩।

টিপ্পনী। প্রমাণ-সংপ্লবস্থলে যে সমস্ত প্রমিতি হয়, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ, প্রত্যক্ষ হইলে আর তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না। "অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে", ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ভাষ্যকার অগ্নিকে ইহার লৌকিক উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নিকে জানিলেও অনুমানের দ্বারা আবার জানিতে ইচ্ছা হয়। ঐ ইচ্ছাবশতঃ কিছু নিকটে যাইয়া ধূম দর্শনের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করে। তখন তাহার দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান-জন্য সংস্কার দৃঢ় হয়। কিন্তু তখনও অগ্নিকে প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা থাকে। তাই একেবারে নিকটবর্ত্তী হইয়া ঐ অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করে। তখন আর ঐ অগ্নি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না; কারণ, প্রত্যক্ষের বড় আর কোন প্রমাণ নাই। তাই ঐ স্থলের প্রমিতির মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ। প্রমাণের ব্যবস্থাস্থলে এই প্রাধান্য-বিচার নাই। কারণ, সেখানে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা একমাত্র প্রমিতিই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার যাহাকে প্রমাণের "অভিসংপ্লব" বলিয়াছেন, তাহা "প্রমাণসংপ্লব" শব্দের দ্বারাও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম তিন সূত্রের দ্বারা ন্যায়দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য এবং তাহার ব্যবস্থাপক প্রমাণ সূচিত হইয়াছে। তাই বেদান্ত-দর্শনের চতুঃসূত্রীর ন্যায় ন্যায়দর্শনের "ত্রিসূত্রী" মহর্ষি গোতমের একটা বিশেষ প্রবন্ধ; ইহা সূচনা করিবার জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"ইতি ত্রিসূত্রীভাষ্যম্"। ঐ স্থলে "ইতি" শব্দের অর্থ সমাপ্তি। ন্যায়বার্ত্তিককার এবং তাৎপর্য্যটীকাকার এবং তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিকারও এই ত্রিসূত্রী ব্যাখ্যার পরে স্ব স্ব প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন। ৩।

ভাষ্য। অথ বিভক্তানাং লক্ষণবচনম্।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রমাণের বিভাগের পরে বিভক্ত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। (তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বপ্রথম উদ্দিষ্ট হওয়ায় তদনুসারে সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই লক্ষণ বলিয়াছেন)।

সূত্র। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্য-মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। ৪।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং "অব্যপদেশ্য" অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের সংজ্ঞাবিষয়ক নহে বলিয়া শাব্দ নহে এবং "অব্যভিচারী" অর্থাৎ যে জ্ঞান বিপরীত-নিশ্চয়রূপ ভ্রম নহে এবং "ব্যবসায়াত্মক" অর্থাৎ যে জ্ঞান সংশয়াত্মক নহে—নিশ্চয়াত্মক, এমন জ্ঞানবিশেষ যাহার দ্বারা জন্মে, অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম "উদ্দেশ", "লক্ষণ" এবং "পরীক্ষা"র দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমোক্ত পদার্থ "প্রমাণ"। তাহার সামান্য উদ্দেশ প্রথম সূত্রের দ্বারা করিয়াছেন এবং তৃতীয় সূত্রের দ্বারা তাহার বিশেষ উদ্দেশ অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছেন। তৃতীয় সূত্রে "প্রমাণ" শব্দের দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষাদি বিশেষ প্রমাণ-চতুষ্টয়ের লক্ষণ বলিতে হইবে, তাই মহর্ষি তন্মধ্যে এই সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত

প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার লক্ষণ বুঝা আবশ্যক। লক্ষণের দ্বারাই পদার্থ তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পদার্থের লক্ষণ না বুঝিলে ঐ বিশিষ্টতা বা বিশেষ বুঝা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিলে তদ্দ্বারা উহা তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যাইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ-জ্ঞান তাহার একপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থের বিশেষ জ্ঞাপনই সর্ব্বত্র লক্ষণের প্রয়োজন। মহর্ষির লক্ষণ-সূত্রগুলিরও উহাই প্রয়োজন। প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব জানাইতে তাহাদিগের লক্ষণ বলিতে হয়,—এ জন্য মহর্ষি তাহাদিগের লক্ষণ-সূত্রগুলি বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইবে, উহা তাহার সজাতীয় অনুমানাদি প্রমাণ এবং তাহার বিজাতীয় প্রত্যক্ষাভাস এবং প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থবর্গ নহে, উহা তাহা হইতে বিশিষ্ট, তাহা হইতে ভিন্ন। এইরূপ বোধ উহার একপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ সর্ব্বত্রই লক্ষণের ইহাই প্রয়োজন বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রে "প্রত্যক্ষ" শব্দের দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "প্রত্যক্ষ" শব্দের অন্যান্য অর্থ থাকিলেও এখানে উহার অর্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই এই সূত্রে মহর্ষির বক্তব্য। সূত্রের অন্য অংশের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ জ্ঞানবিশেষ যাহার দ্বারা জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থাৎ সূত্রে "যতঃ" এই কথার অধ্যাহার করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকারও ইহাই বলিয়াছেন। নচেৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণ বলা হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই যে মহর্ষির এই সূত্রে বক্তব্য। যদিও প্রত্যক্ষ প্রমিতিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় বটে, কিন্তু সেই প্রমিতি মাত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না। হানাদি বুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতি অনুমিতির করণ হওয়ায় অনুমান-প্রমাণই হইবে এবং ইন্দ্রিয় এবং তাহার সন্নিকর্ষবিশেষও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। সুতরাং সূত্রে "যতঃ" এই কথার অধ্যাহার ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণমাত্রের লক্ষণ বলা হয় না। ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির যখন এই সূত্রে বক্তব্য, তখন তাঁহার তাৎপর্য্য ঐ পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে এবং সূত্রস্থ "প্রত্যক্ষ" শব্দটি প্রত্যক্ষ প্রমাণবোধক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পরন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে তাহার ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। একই স্বল্পাক্ষর সূত্রের দ্বারা অনেক তত্ত্বসূচনা করাই সূত্রকার মহর্ষিদিগের কৌশল। স্থলবিশেষে অন্য বাক্যের অধ্যাহার করিয়া মহর্ষি-সূত্রের সেই সকল অর্থ বুঝিতে হয়। ঐরূপ অধ্যাহার সূত্রকারদিগের অভিপ্রেতই থাকে। এ জন্যই ভাষ্যকারগণ সূত্রার্থবর্ণনায় অনেক কথার পূরণ করিয়া সূত্রের অবতারণা করেন এবং ঐরূপ করিয়া ব্যাখ্যাও করেন। মূলকথা, যাহার দ্বারা এই সূত্রোক্ত জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এই পর্য্যন্তই এখানে সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। সে কিরূপ জ্ঞান? তাই প্রথমেই বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান।" ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়। ইহা ছাড়া আর একটি ইন্দ্রিয় আছে,

তাহা অন্তরিন্দ্রিয়, তাহার নাম মন। এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মিত বিষয় আছে। সকল পদার্থই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। আবার কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, এমনও বহু পদার্থ আছে। সেগুলিকে বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থ। যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, সেই পদার্থের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ-হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাই "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান," তাহাকেই বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ভাষ্যকার সূত্রার্থ-বর্ণনায় সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতেও এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহার দ্বারা হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই পর্য্যন্তই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষকেই "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" বলে। উদ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ এই "সন্নিকর্ষ"কে ছয় প্রকার বলিয়াছেন। যথা—(১) "সংযোগ," (২) "সংযুক্ত সমবায়," (৩) "সংযুক্তসমবেত সমবায়," (৪) "সমবায়", (৫) "সমবেতসমবায়," (৬) "বিশেষণতা"। ইহাদিগের মধ্যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধই "সন্নিকর্ষ" এবং দ্রব্যগত গুণ, ক্রিয়া ও জাতির প্রত্যক্ষে "সংযুক্তসমবায়-সম্বন্ধ"ই "সন্নিকর্ষ"। যেমন বৃক্ষের গুণ, ক্রিয়া এবং বৃক্ষত্ব প্রভৃতি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে বৃক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে বৃক্ষ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হয়। ঐ বৃক্ষের সহিত তাহার গুণ, ক্রিয়া ও জাতির "সমবায়" নামক সম্বন্ধ থাকায় সেই সকল পদার্থে ইন্দ্রিয়-সংযুক্তের সমবায় সম্বন্ধ আছে। এই জন্য সেখানে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধকে "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ" বলা হইয়াছে। এইরূপ দ্রব্যগত গুণ ও ক্রিয়াতে যে জাতি আছে, তাহার প্রত্যক্ষে "সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়" সম্বন্ধই সনিকর্ষ। যেমন শুক্ল রূপের শুক্লত্ব ধর্ম্মটি শুক্লরূপগত "জাতি"। ঐ শুক্ল রূপ গুণপদার্থ। উহা যে দ্রব্যে আছে, তাহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ হইলে সেই দ্রব্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইল। সেই দ্রব্যের সহিত তাহার শুক্ল রূপের "সমবায়" নামক সম্বন্ধ থাকায় ঐ শুক্ল রূপ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দ্রব্যে সমবেত অর্থাৎ সমবায় নামক সম্বন্ধে অবস্থিত। সেই শুক্ল রূপে শুক্লত্ব-জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঐ শুক্লত্বের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের "সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়" নামক সম্বন্ধ থাকিল। উহাই ঐ শুক্লত্ব জাতির সহিত সেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ। আকাশের সহিত শব্দের "সমবায়" নামক সম্বন্ধই ন্যায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত। সুতরাং শব্দপ্রত্যক্ষে "সমবায়"ই "সন্নিকর্ষ"। শব্দগত শব্দত্ব প্রভৃতি জাতিরও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে "সমবেত-সমবায়" সম্বন্ধই সন্নিকর্ষ। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত অর্থাৎ "সমবায়"-সম্বন্ধে অবস্থিত, সেই শব্দে শব্দত্ব প্রভৃতি জাতিও সমবায় সম্বন্ধেই অবস্থিত, সুতরাং শব্দত্ব প্রভৃতি জাতির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের "সমবেত-সমবায়" নামক সম্বন্ধ আছে, উহাই সেখানে শব্দত্ব প্রভৃতির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের "সন্নিকর্ষ"। অনেক অভাব পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, যেখানে ভূতলে চক্ষুঃসংযোগের দ্বারাই "এখানে সর্প নাই" এইরূপ বোধ হয়, সেখানে উহা সর্পাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। সেখানে ভূতল চক্ষুঃসংযুক্ত। ভূতলের সহিত সর্পাভাবের "স্বরূপ-

সম্বন্ধ" কল্পনা করা হইয়াছে এবং ঐ সম্বন্ধের নাম বলা হইয়াছে "বিশেষণতা"। তাহা হইলে ভূতলগত সর্পাভাবের সহিত সেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের "সংযুক্তবিশেষণতা" সম্বন্ধ আছে। এইরূপ অন্যরূপেও অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের "বিশেষণতা"-সম্বন্ধ ("সংযুক্তসমবেত-বিশেষণতা." "সমবেত-বিশেষণতা" প্রভৃতি) হয়, এ জন্য অভাব প্রত্যক্ষে "বিশেষণতা" নামে সর্ব্ববিধ বিশেষণতা ধরিয়া এক প্রকারই সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে এবং এই জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষে পূর্ব্বোক্ত "সন্নিকর্ষ" ছয় প্রকারেই পরিগণিত হইয়াছে। এবং এই "সন্নিকর্ষ"গুলি লৌকিক প্রত্যক্ষের সাধন বলিয়া ইহাদিগকে "লৌকিক সন্নিকর্ষ" বলা হইয়াছে। এই "সন্নিকর্ষে"র কথা এবং দূরস্থ চক্ষুর সহিত দ্রষ্টব্য দ্রব্যের সংযোগ কিরূপে হয়, ইত্যাদি কথা তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। এই সূত্রে মহর্ষি "সন্নিকর্ষ" শব্দের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধবিশেষের সূচনা করিয়াছেন। "সন্নিকর্ষ" না বলিয়া সংযোগ বা অন্য কোন সম্বন্ধবিশেষের নাম করিলে উহা বুঝা যাইত না। সূত্রে "উৎপন্ন" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক, তাহাই এখানে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন ভিত্তিতে চক্ষুঃসংযোগ হইলেও ভিত্তির ব্যবহিত অথচ ভিত্তিসংযুক্ত বস্ত্রাদির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু সেখানেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঐ বস্ত্রের সহিত "সংযুক্ত-সংযোগ" সম্বন্ধ আছে ; তাহা হইলে ফলানুসারে কল্পনা করিয়া বুঝা যায়, ঐরূপ "সংযুক্ত-সংযোগ" সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের উৎপাদক নহে, সুতরাং সূত্রে ঐরূপ সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই এবং সূত্রে ঐ স্থলে "অর্থ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের "অর্থ" অর্থাৎ গ্রাহ্য (গ্রহণযোগ্য), তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক। আকাশ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সংযোগ হইলেও তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঐরূপ "সন্নিকর্ষ" সূত্রে গৃহীত হয় নাই। এই জন্যই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না বলিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ"। যথাস্থানে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সন্নিকর্ষ হেতুক সুখ-দুঃখও উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, সুতরাং কেবল "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন" বলিলে সুখ-দুঃখবিশেষও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এ জন্য মহর্ষি "জ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুখ-দুঃখ জ্ঞান পদার্থ নহে, সুতরাং তাহা কোন স্থলে "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন" হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইবে না। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সূত্রোক্ত "জ্ঞান" শব্দের এইরূপ প্রয়োজনই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে, সূত্রে যখন "ব্যবসায়াত্মক" শব্দ রহিয়াছে, তখন তাহাতেই "জ্ঞান" পাওয়া গিয়াছে। কারণ, "ব্যব-সায়াত্মক" শব্দের অর্থ নিশ্চয়াত্মক ; তাহা হইলে বুঝা গেল, নিশ্চয় নামক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইবে কিরূপে ? সেগুলি ত আর নিশ্চয় নামক জ্ঞানবিশেষ নহে ? জয়ন্তভট্ট এ কথা লইয়া বহু বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, সূত্রে "জ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ না করিলে বিশেষ্যবোধক কোন শব্দপ্রয়োগ হয় না, কেবল বিশেষণবোধক

শব্দগুলিই বলা হয়, তাহাতে সূত্রবাক্যের অসম্পূর্ণতা হয়। এ জন্য মহর্ষি বিশেষ্যবোধক "জ্ঞান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা ছাড়া উহার আর কিছু প্রয়োজন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতির মতে সূত্রে "অব্যপদেশ্য" এবং "ব্যবসায়াত্মক" এই দুইটি কথার দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ, ইহাই সূচিত হইয়াছে। সুতরাং "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ বলা হয় নাই। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িলে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা সে দোষ বারণ করা যাইতে পারে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সূত্রোক্ত "জ্ঞান" শব্দের তাহাই প্রয়োজন বলিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিত্য, সুতরাং উহা প্রমাণের ফল নহে। মহর্ষি প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্য প্রত্যক্ষপ্রমিতির কথাই বলিবেন, তাই সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন না হওয়ায় মহর্ষির এই সূত্রের কোন দোষ হয় নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কোন পূর্ব্বাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্রের দ্বারা যাহাতে নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের লক্ষণই বুঝা যায়, সেই ভাবে শেষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা সহজে সে অর্থ কিছুতেই বুঝা যায় না। এইরূপ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনও নাই। মহর্ষি এমন কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষের কথা বলিবেন, যাহার সাধন বা করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। ঈশ্বর-প্রত্যক্ষের যখন কিছু সাধন নাই, তাহা নিত্য, তখন মহর্ষি তাহার কথা বলিবেন কেন? তবে ঈশ্বরকে এবং তাঁহার জ্ঞানকে যে প্রমাণ বলা হয়, সেখানে "প্রমাণ" শব্দের অর্থ অন্যরূপ। যাহা অভ্রান্ত জ্ঞান, অথবা যিনি অভ্রান্ত পুরুষ, তাঁহাকে "প্রমাণ" বলা হয়। কিন্তু মহর্ষি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধন। সুতরাং তাহার লক্ষণ বলিতে প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষের কথাই মহর্ষির বক্তব্য। তাই বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন"[১]। সাংখ্যসূত্রেও প্রত্যক্ষের লক্ষণে এইরূপে ঈশ্বরের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষের কথাই সূত্রকার বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষপ্রমাণের কথা বলিতে তাহাই বক্তব্য, এইরূপ কথা বলিলে সেখানে ঈশ্বর লইয়া মারামারি হয় না। তবে অন্য উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের অসিদ্ধি সমর্থনের জন্য সূত্রকার সেখানে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বুঝিতে হয় এবং বলিতে হয়।

প্রাচীন মতে "নির্ব্বিকল্পক" এবং "সবিকল্পক" প্রত্যক্ষ এবং তাহার পরজাত "হানাদি-বুদ্ধি"রূপ প্রত্যক্ষ—এগুলি সমস্তই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান; সুতরাং উহাদিগের করণগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। তবে ঐ সকল প্রত্যক্ষ সংশয়াত্মক হইলে তাহার করণ প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্য বলা হইয়াছে—"ব্যবসায়াত্মক" অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক হওয়া চাই। "ব্যবসায়" শব্দের দ্বারা নিশ্চয় অর্থ বুঝা যায়। আবার বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম প্রভৃতি) করণও প্রমাণ হইতে পারে না, এ জন্য বলা হইয়াছে

১। উদয়নাচার্য্য ঈশ্বর ও তাঁহার নিত্য জ্ঞানের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে মহর্ষি-সূত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্বস্ত চ লৌকিকমাত্রবিষয়ত্বাৎ"। সেখানে বর্দ্ধমান বলিয়াছেন,—"যথাশ্রুতং সূত্রন্তু লৌকিকপ্রত্যক্ষবিষয়মিত্যাহ।"—(ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ৪ স্তবক, ৫ কারিকা)।

"অব্যভিচারী।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষটা যথার্থ হওয়া চাই। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সূত্রে "অব্যপদেশ্য" শব্দ কেন এবং উহার অর্থ কি, এ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মতভেদ ছিল। সে মতভেদগুলি এবং তাহার সমর্থন জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য, ইহা সূচনা করিতেই মহর্ষি সূত্রে "অব্যপদেশ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "অব্যপদেশ্য" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে "নির্ব্বিকল্পক।" তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যেরও সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাষ্যকারেরও উহাই তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারেই সেখানে অনুবাদে ভাষ্যার্থ বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যা এবং প্রত্যক্ষ-সূত্রের অন্যান্য কথা পরবর্ত্তী ভাষ্য-ব্যাখ্যাতেই দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যজ্জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ন তর্হীদানীমিদং ভবতি, আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি। নেদং কারণাবধারণমেতাবৎপ্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি। যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টকারণং তদুচ্যতে, যত্তু সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্ত্ত্যত ইতি। মনসস্তর্হীন্দ্রিয়েণ সংযোগো বক্তব্যঃ, ভিদ্যমানস্য প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য নায়ং ভিদ্যত ইতি সমানত্বান্নোক্ত ইতি।

অনুবাদ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ (সংযোগাদি সম্বন্ধ) হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। (পূর্ব্বপক্ষ)—তাহা হইলে (কেবল বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধই প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে) এখন ইহা হইল না—(কি হইল না, তাহা বলিতেছেন) আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয় অর্থের (বিষয়ের) সহিত সংযুক্ত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ন্যায় আত্মমনঃসংযোগ এবং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগও কারণ; মহর্ষি পরে নিজেও তাহা বলিয়াছেন। এখন যাহা বলিলেন, তাহাতে ত সে কথা হইল না; কারণ, এখানে প্রত্যক্ষে কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই কারণ বলিলেন)।

(উত্তর)—ইহা ("ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন" এই সূত্রবাক্য) এতাবন্মাত্র প্রত্যক্ষে কারণ, এইরূপে কারণাবধারণ নহে অর্থাৎ কারণান্তর বারণ নহে। কিন্তু বিশিষ্ট কারণ বচন। বিশদার্থ এই যে, যেটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশিষ্ট কারণ (অসাধারণ কারণ), তাহাই উক্ত হইয়াছে। যাহা কিন্তু অনুমানাদি জ্ঞানের সম্বন্ধে সমান

(সাধারণ কারণ), তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। (পূর্ব্বপক্ষ)—তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও (প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে) বলিতে হয় ? (অর্থাৎ অসাধারণ কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ বক্তব্য হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ বলিয়া তাহাও প্রত্যক্ষলক্ষণে বলিতে হয় ?)

(উত্তর)—ভিদ্যমান অর্থাৎ রূপজ্ঞান অথবা চাক্ষুষ জ্ঞান এইরূপ সংজ্ঞার দ্বারা জ্ঞানান্তর হইতে বিশিষ্যমাণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (রূপ-প্রত্যক্ষের) সম্বন্ধে ইহা (ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ) (আত্মমনঃসংযোগরূপ সাধারণ কারণ হইতে) বিশিষ্ট হয় না; সুতরাং (আত্মমনঃসংযোগের) সমান বলিয়া (প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে এই সূত্রে) উক্ত হয় নাই।

টিপ্পনী। আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতি সাধারণ কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিতে হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের আধার যে ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়, তাহার দ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষের (রূপজ্ঞান, চাক্ষুষ জ্ঞান ইত্যাদিরূপে) ব্যপদেশ (নামকরণ) হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের আধার মনের দ্বারা ঐ রূপাদি-প্রত্যক্ষের কোন ব্যপদেশ হয় না। সুতরাং ঐ অংশে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ (প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ হইলেও) আত্মমনঃসংযোগের সমান। তাই মহর্ষি প্রত্যক্ষলক্ষণে আত্মমনঃসংযোগের ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করেন নাই, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ, তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ, অর্থসম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ। তত্রেদমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপন্নমর্থজ্ঞানং রূপমিতি বা রস ইত্যেবং বা ভবতি। রূপরসশব্দাশ্চ বিষয়নামধেয়ম্। তেন ব্যপদিশ্যতে জ্ঞানং রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে। নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যমানং সৎ শাব্দং প্রসজ্যতে অত আহ অব্যপদেশ্যমিতি।

অনুবাদ। যতগুলি পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে। সেই সংজ্ঞাশব্দগুলির সহিত অর্থের (বিষয়ের) সম্প্রত্যয় (সমধিক প্রতীতি) হয়। অর্থসম্প্রত্যয়বশতঃ (বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানবশতঃই) ব্যবহার হয়। (প্রকৃতস্থলে ইহার সংগতি করিতেছেন) তাহা হইলে এই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ-হেতুক উৎপন্ন বিষয়জ্ঞান "রূপ" এই প্রকারে অথবা "রস" এই প্রকারে (রূপাদি বিষয়ের সহিত রূপাদি সংজ্ঞার অভিন্নত্বরূপে) হয়। (তাহাতে কি হইল, তাহা বুঝাইতেছেন) রূপ, রস প্রভৃতি শব্দগুলি বিষয়ের সংজ্ঞা। (তাহাতেই বা কি হইল, তাহা বলিতে-

ছেন) সেই সংজ্ঞাদ্বারা "রূপ" ইহা জানিতেছে, "রস" ইহা জানিতেছে। (এইরূপে) জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যপদিশ্যমান অর্থাৎ বিশিষ্যমাণ হইয়া (এই জ্ঞান) শাব্দ (শব্দবিষয়ক হওয়ায় শব্দ জন্য) হইয়া পড়ে, এ জন্য মহর্ষি (সূত্রে) "অব্যপদেশ্যং" এই কথাটি বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। "নির্ব্বিকল্পক"ও "সবিকল্পক" নামে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ মহর্ষির লক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত হইলেও ঐ প্রকারভেদে বিপ্রতিপত্তি থাকায়, মহর্ষি "অব্যপদেশ্যং" ও "ব্যবসায়াত্মকং"—এই দুইটি কথার দ্বারা স্পষ্টরূপে ঐ প্রকারভেদের কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ দুইটি কথা প্রত্যক্ষের লক্ষণের অন্তর্গত নহে। যে প্রত্যক্ষে বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব নাই, তাহাকে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। মহর্ষি "অব্যপদেশ্য" শব্দের দ্বারা এই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্যপদেশ বলিতে বিশেষণ বা উপলক্ষণ, নাম ও জাতি প্রভৃতি। ঐ নাম, জাতি প্রভৃতি ব্যপদেশ-যুক্তকেই ব্যপদেশ্য বলা যায়। ফলতঃ ব্যপদেশ্য বলিতে বিশেষ্যই বুঝা যায়। যে জ্ঞানে ব্যপদেশ্য অর্থাৎ বিশেষ্য নাই, তাহাই "অব্যপদেশ্য।" নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে নাম, জাতি প্রভৃতি কেহ বিশেষণ হয় না; সুতরাং সে জ্ঞানে কোন বিশেষ্যও হয় না। কেবল পদার্থের স্বরূপমাত্রই তাহাতে বিষয় হয়। তাই "অব্যপদেশ্য" শব্দের দ্বারা উক্ত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বুঝা যাইতে পারে। যাঁহারা এইরূপ প্রত্যক্ষ মানেন না, উহা অসম্ভব বলেন, তাঁহাদিগের মত নিরাকরণের জন্য ভাষ্যকার প্রথমতঃ "যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ" ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহাদিগের স্বপক্ষ-সমর্থনের যুক্তি দেখাইতেছেন। সে যুক্তির মর্ম্ম এই যে, পদার্থমাত্রেরই নাম আছে, নামশূন্য কোন পদার্থ নাই; ঐ নাম ও পদার্থ বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণ, "গো এই পদার্থ," "অশ্ব এই পদার্থ" ইত্যাদিরূপে নাম ও পদার্থ অভিন্নরূপেই প্রতীত হয়। ভাষ্যকার "যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ"—এই অংশের দ্বারা বিরুদ্ধবাদি-সম্মত নাম ও পদার্থের পূর্ব্বোক্ত অভিন্নতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে হেতু বলিয়াছেন—"তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ," অর্থাৎ যেহেতু সংজ্ঞা শব্দের সহিত অভিন্নভাবেই (গো এই পদার্থ, অশ্ব এই পদার্থ ইত্যাদিরূপে) পদার্থের সম্প্রত্যয় হয়, অতএব নাম ও পদার্থ অভিন্ন। পরন্তু সংজ্ঞা শব্দের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ পদার্থ-প্রতীতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, সংজ্ঞাশব্দ ও তৎপ্রতিপাদ্য পদার্থ অভিন্ন। কারণ, জ্ঞাতব্যের উৎকর্ষই জ্ঞানের উৎকর্ষের মূল। সংজ্ঞা শব্দ জ্ঞাতব্য পদার্থ হইতে অভিন্ন না হইলে তাহার উৎকর্ষে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইবে কেন? তাই বলিয়াছেন,—"সম্প্রত্যয়"। উহার অর্থ, সমধিক প্রত্যয়। "সং" শব্দের দ্বারা প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) উৎকর্ষ সূচনাপূর্ব্বক বিরুদ্ধবাদিগণের পূর্ব্বোক্ত যুক্ত্যন্তরই সূচনা করিয়াছেন। অভিন্নত্বরূপে প্রতীতি হইলেই বা বস্তুতঃ অভিন্ন হইবে কেন?—অনেক স্থলে ভিন্ন পদার্থেও ঐরূপ ভ্রম প্রতীতি হইয়া থাকে। তাই বলিয়াছেন, "অর্থসম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ"—অর্থাৎ সংজ্ঞা ও পদার্থের ঐরূপ অভিন্নভাবে প্রতীতিবশতঃ যখন ব্যবহার চলিতেছে, তখন ঐ প্রতীতিকে ভ্রম বলা যায় না, উহা যথার্থ। সুতরাং উহা দ্বারা

সংজ্ঞা ও পদার্থ যে অভিন্ন, তাহা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। পদার্থ ও তাহার নাম অভিন্ন হইলে পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান-মাত্রই নামবিষয়ক হইল। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই নামের দ্বারা ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষ জ্ঞানও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে নাম-বিষয়ক হওয়ায় নামবিশিষ্ট। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামাত্মক শব্দ-বিষয়ক হওয়ায় শব্দজন্য হইয়া পড়িল। কারণ, প্রত্যক্ষে তাহার বিষয়গুলি কারণ। নাম প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে প্রত্যক্ষমাত্রই নামজন্য হইবে। নাম-বিষয়ক হইলে আবার নাম-বিশিষ্ট হইবেই; সুতরাং নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অর্থাৎ নাম-রহিত অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ (যাহাকে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে) একটা হইতেই পারে না, উহা অসিদ্ধান্ত। ভাষ্যে "যাবদর্থং বৈ" এখানে "বৈ" শব্দটি অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত। 'যাবদর্থং বৈ'—ইহার ব্যাখ্যা যাবদর্থমেব।

ভাষ্য। যদিদমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেঽর্থজ্ঞানং তন্ন নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যতে। গৃহীতেঽপি চ শব্দার্থসম্বন্ধেঽস্যার্থস্যায়ং শব্দো নামধেয়মিতি। যদা তু সোঽর্থো গৃহ্যতে তদা তৎপূর্ব্বস্মাদর্থজ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে, তদর্থবিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি। তস্য ত্বর্থজ্ঞানস্যান্যঃ সমাখ্যাশব্দো নাস্তি যেন প্রতীয়মানং ব্যবহারায় কল্পেত। ন চাপ্রতীয়মানেন ব্যবহারঃ, তস্মাজ্‌জ্ঞেয়স্যার্থস্য সংজ্ঞাশব্দেনেতিকরণযুক্তেন নির্দ্দিশ্যতে রূপমিতি-জ্ঞানং রস ইতি জ্ঞানমিতি। তদেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো ব্যাপ্রিয়তে ব্যবহারকালে তু ব্যাপ্রিয়তে। তস্মাদশাব্দমর্থজ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নমিতি।

অনুবাদ। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত অর্থাৎ অগৃহীত হইলে (যখন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান নাই, সেই অবস্থাতে) এই যে অর্থজ্ঞান (বালক ও মূক প্রভৃতির রূপাদিপ্রত্যক্ষ), তাহা সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা বিশিষ্ট হয় না। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও (যখন শব্দার্থ-সম্বন্ধ-জ্ঞান আছে, সেই অবস্থাতেও) এই পদার্থের এই শব্দটি নাম, ইহাই জ্ঞান হয়। কিন্তু যে সময়ে সেই পদার্থ গৃহীত হয় (নামস্মরণের পূর্ব্বেই নির্ব্বিকল্পকের দ্বারা নাম-রহিত সেই পদার্থ জ্ঞাত হয়), তখন সেই জ্ঞান পূর্ব্বতন অর্থজ্ঞান হইতে (অব্যুৎপন্নাবস্থার অর্থজ্ঞান হইতে) বিশিষ্ট হয় না। সুতরাং সেই অর্থজ্ঞান সেইরূপই (পূর্ব্বতন অর্থজ্ঞান সদৃশই) হয়। সেই অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধে কিন্তু অন্য (অর্থ ভিন্ন) সংজ্ঞা শব্দ নাই, যাহার দ্বারা প্রতীয়মান অর্থাৎ পরকর্ত্তৃক জ্ঞায়মান হইয়া (অর্থজ্ঞান) ব্যবহারের নিমিত্ত সমর্থ হইবে। অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারাও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞেয় পদার্থের

ইতিকরণযুক্ত অর্থাৎ ইতিশব্দযুক্ত (রূপমিতি রস ইতি) সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা "রূপ" এই জ্ঞান, "রস" এই জ্ঞান এই ভাবে (অর্থজ্ঞানকে) নির্দ্দেশ করা হয়। সুতরাং এইরূপ অর্থজ্ঞানকালে সেই সংজ্ঞাশব্দ (প্রতীয়মান হইয়া) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যবহারকালে অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার সময়ে (কারণ হইয়া) ব্যাপারবিশিষ্ট হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শাব্দ নহে—অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ায় শব্দজন্য নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি "অব্যপদেশ্যং" এই কথার দ্বারা নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব সূচনা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা মানেন না, তাঁহাদিগের যুক্তি ইতঃপূর্ব্বেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। এখন ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, শব্দার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলেও বালকের রূপ প্রত্যক্ষ হয়। আবার শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তিহীন মূক প্রভৃতি ব্যক্তিরও কত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং শব্দরহিত প্রত্যক্ষ নাই, এ কথা বলা যায় না। আবার কেবল যে বালক মূক প্রভৃতিরই শব্দরহিত প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে। যাঁহারা ব্যুৎপন্ন অর্থাৎ অমুক শব্দ অমুক অর্থের বোধক, ইহা জানেন এবং শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারাও সেই শব্দ ও অর্থকে অভিন্ন বলিয়া বুঝেন না। তাঁহাদিগেরও এই শব্দটি এই পদার্থের নাম, এইরূপই জ্ঞান হয়। সুতরাং তাঁহাদিগেরও নামরহিত প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রথমতঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার পরে ঐ পদার্থ দর্শনজন্য ঐ পদার্থের সংজ্ঞা স্মরণ হয়, সুতরাং বালক মূকাদিভিন্ন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগেরও ঐ সংজ্ঞা স্মরণের জন্য পূর্ব্বে নামরহিত বিষয়-জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই নামরহিত বিষয়জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। বালক মূকাদির বিষয়জ্ঞান হইতে সে জ্ঞানের কোন বিশেষ নাই। ফলতঃ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সেই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সেইরূপই হয়, অর্থাৎ তাহাও তখন কোন নামের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তাহাতে শব্দ-সম্বন্ধ নাই। বালক মূকাদির জ্ঞানের ন্যায় সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রথমজাত প্রত্যক্ষকে "নির্ব্বিকল্পক" প্রত্যক্ষ বলিতেই হইবে। তাহাই পরে "সবিকল্পক" প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশেষণবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন পরকে বুঝাইবার জন্য জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে গেলে পদার্থের নামের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিতে হয়, তখন বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান পদার্থাকার এবং সংজ্ঞাকার। পদার্থ এবং তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন না হইলে ঐ ভাবে জ্ঞান পদার্থাকার হইবে কেন? সুতরাং পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই আশঙ্কানিরাসের জন্য বলিয়াছেন,—"তস্য তু" ইত্যাদি। সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য প্রকারে পদার্থজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়াই অর্থাকারে তাহার পরিচয় দিতে হয়; সেই পদার্থজ্ঞানে পদার্থের সংজ্ঞাশব্দ বিষয় হয় না। পদার্থজ্ঞানকালে সংজ্ঞাশব্দের কোন ব্যাপার নাই। পরকে বুঝাইবার সময়

সংজ্ঞাশব্দ আবশ্যক। সে সময়ে তাহার ব্যাপার আছে—কিন্তু তাহাতে পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞা অভিন্ন, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। *

ভাষ্য। গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোষ্মণা সংস্পৃষ্টাঃ স্পন্দমানা দূরস্থস্য চক্ষুষা সন্নিকৃষ্যন্তে তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুদকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ অব্যভিচারীতি। যদতস্মিংস্তদিতি তদ্ব্যভিচারি। যত্তু তস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি। দূরাচ্চক্ষুষা হ্যয়মর্থং পশ্যন্নাবধারয়তি ধূম ইতি বা রেণুরিতি বা, তদেতদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নমনবধারণজ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ "ব্যবসায়াত্মক"মিতি।

অনুবাদ। গ্রীষ্মকালে পার্থিব উষ্মার সহিত সংস্পৃষ্ট স্পন্দমান (ক্রিয়াবিশিষ্ট) সৌর-কিরণসমূহ দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষুর সহিত সন্নিকৃষ্ট (সংযুক্ত) হয়। সেই সূর্য্য-কিরণে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য "উদক" এই জ্ঞান জন্মে। তাহাও (সেই বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্ঞানও) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এ জন্য মহর্ষি (সূত্রে) "অব্যভিচারি" এই কথাটি বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পদার্থে অর্থাৎ যাহা তাহা নহে, এমন পদার্থে যে "তাহা" এরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারী। যাহা কিন্তু সেই পদার্থে "সেই" এইরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। এই ব্যক্তি (দ্রষ্টা ব্যক্তি) দূর হইতে (দূরত্ব-দোষবশতঃ) চক্ষুর দ্বারাই পদার্থ দর্শন করতঃ "ধূম এই" বা "রেণু এই" বা (এইরূপে) অবধারণ করিতেছে না, অর্থাৎ অনবধারণ (সংশয়) করিতেছে, সেই এই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন অনবধারণ জ্ঞান (সংশয়) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এই জন্য মহর্ষি (সূত্রে) "ব্যবসায়াত্মকং" এই কথাটি বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। ভ্রমপ্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই সূত্রে যথার্থ প্রত্যক্ষই লক্ষ্য। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের জন্যই সূত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ প্রত্যক্ষের করণই প্রত্যক্ষ

---

* প্রত্যক্ষমাত্রই সবিকল্পক। কারণ, জ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয় বিষয়ের সংজ্ঞাবিশিষ্ট পদার্থবিষয়ক হইয়া থাকে, সুতরাং অবিশিষ্ট নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না, এই মতটি অতি প্রাচীন শাব্দিক মত। শাব্দিকশিরোমণি ভর্তৃহরি এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এই মতের সমর্থন ও খণ্ডনের দ্বারাই এখানে ভাষ্য-তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারেই ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইল। শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন, ইহা শাব্দিক মত বলিয়া কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া গেলেও মহাভাষ্যে কিন্তু এই মত পাওয়া যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নাই, এই মতের উল্লেখ করিয়া এখানে ভর্তৃহরির কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গম্যতে।"—বাক্যপদীয়।

প্রমাণ। সূত্রে "যতঃ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া, যাহার দ্বারা এই প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই শেষে সূত্রার্থ বুঝিত হইবে। এখন যদি ভ্রমও মহর্ষির প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ভ্রমের করণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়া পড়িবে। তাই মহর্ষি 'অব্যভিচারি' শব্দের দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন। "অব্যভিচারী" বলিতে যথার্থ। মরীচিকাতে জলভ্রম হয়, কিন্তু ঐ ভ্রমের বিষয় জল সেখানে নাই; সুতরাং ভ্রম, বিষয়ের ব্যভিচারী। যথার্থ জ্ঞান তাহার বিষয়ের অব্যভিচারী। মরীচিকাতে জলভ্রমস্থলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবশতঃ যে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম নহে। পরে চক্ষুর দোষে অথবা দূরত্বাদিদোষে তাহাতে যে "ইহা জল" এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই ভ্রম। সেই ভ্রমের করণ প্রমাণ নহে, উহা প্রমাণাভাস। সেখানেও জলার্থীর প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু সে প্রবৃত্তি সফল হয় না। যদিও প্রমাণের সামান্য লক্ষণের দ্বারাই ভ্রম-প্রত্যক্ষের করণের প্রামাণ্য নিরস্ত হয়;—কারণ, বিশেষ লক্ষণও সামান্য লক্ষণাক্রান্ত হওয়া চাই,—ভ্রমের করণের প্রমাণত্বই নাই। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণত্ব সম্ভবই নহে। বিশেষ লক্ষণেও ঐরূপ বিশেষণ বক্তব্য হইলে অনুমানাদি প্রমাণের লক্ষণসূত্রেও "অব্যভিচারি"-শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়,—তথাপি সকল জ্ঞানই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় প্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যক্ষের অব্যভিচার বশতঃই অনুমানাদির অব্যভিচার। প্রত্যক্ষ ব্যভিচারী হইলে তন্মূলক অনুমানাদি অব্যভিচারী হইতে পারে না। এই বিশেষ-বোধের জন্যই মহর্ষি প্রত্যক্ষসূত্রে অতিরিক্ত "অব্যভিচারি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার সূত্রস্থ "অব্যভিচারি" শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিপর্য্যয় জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষতা নিবারিত হইয়াছে,—সংশয়-জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা নিবারিত হয় নাই; কারণ, সংশয়-জ্ঞান ত যাহা তাহা নহে, এমন পদার্থে "সেই" এইরূপ "ব্যভিচারি" জ্ঞান নহে। সংশয়-জ্ঞান ব্যভিচারী না হইলে তাহাও সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাহা হইলে সংশয়-জ্ঞানের করণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সংশয়জ্ঞানের করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কারণ, প্রমাণের ফল নিশ্চয়ই হইবে। প্রমাণ কখনও সংশয় জন্মাইবে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণের জন্যই মহর্ষি-সূত্রে "ব্যবসায়াত্মকং" বলিয়াছেন। "ব্যবসায়" শব্দের অর্থ নিশ্চয়। "ব্যবসায়াত্মক" বলিতে নিশ্চয়াত্মক। সংশয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন এবং অব্যভিচারী হইলেও নিশ্চয়াত্মক নহে। তাই উহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইল না।

তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রত্যক্ষসূত্রে "অব্যপদেশ্যম্" এবং "ব্যবসায়াত্মকম্"—এই দুইটি কথা প্রত্যক্ষলক্ষণের জন্য নহে। তিনি বলেন,—"অব্যপদেশ্যং" এই কথার দ্বারা মহর্ষি, নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, উহা মানিতেই হইবে, এই তত্ত্বটি সূচনা করিয়াছেন। এবং "ব্যবসায়াত্মকম্" এই কথাটির দ্বারা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য-স্বীকার্য্য, এই তত্ত্বটি সূচনা করিয়াছেন। সূত্রস্থ "অব্যভিচারী" শব্দের অর্থ ভ্রমভিন্ন। সংশয়জ্ঞান ভ্রম। সুতরাং "অব্যভিচারি"

শব্দের দ্বারাই সংশয়জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা নিরস্ত হইয়াছে। উহার জন্য "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। "নিশ্চয়," "বিকল্প," "ব্যবসায়"—এই তিনটি একার্থবোধক শব্দ। সুতরাং "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের দ্বারা বিকল্প বা সবিকল্পক জ্ঞান অবশ্য বুঝা যাইতে পারে। "অব্যপদেশ্য" শব্দের দ্বারা যেরূপে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বুঝা যায়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ফলতঃ বৌদ্ধযুগে এই নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ লইয়া বড় বিবাদ ছিল। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য ধর্ম্মকীর্ত্তি, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এখানে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র বলিতে চাহেন যে, বহু পূর্ব্বেই আমাদিগের মহর্ষি গোতম এই বিবাদের চিন্তা করিয়া তাঁহার সূত্রমধ্যে "ব্যবসায়াত্মকং" বলিয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। মিশ্র মহোদয় মহর্ষি-সূত্রকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ দেখা যায়, আমাদিগের দর্শন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণ দার্শনিক ঋষি-সূত্রের দ্বারাই পরবর্ত্তী বৌদ্ধ প্রভৃতি মত-বিশেষের নিরাকরণে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শারীরক-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধমত-খণ্ডন-প্রণালী দেখিলে ইহা আরও হৃদয়ঙ্গম হইবে। মিশ্র মহোদয় পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, সূত্রে "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা যাহা করিলাম, ইহা অতি স্পষ্ট, শিষ্যগণ নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে। এ জন্যই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণই সূত্রে "ব্যবসায়াত্মক" শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। উহা সূত্রকারের উদ্দেশ্য না হইলেও অসংগত বা অসম্ভব নহে। "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের দ্বারা সংশয়ের প্রত্যক্ষতা নিবারিত হইতে পারে; তাই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ঐরূপ বলিয়াছেন। প্রাচীনগণ ইহারই নাম বলিয়াছেন—"অন্বাচয়"। যেটি প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, তাহার সংগ্রহের নাম অন্বাচয়। মিশ্র মহোদয় এই ভাবে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, "অস্মাভিঃ—

ত্রিলোচনগুরূন্নীতমার্গানুগমনোন্মুখৈঃ।
যথামানং যথাবস্তু ব্যাখ্যাতমিদমীদৃশম্॥"

অর্থাৎ তিনি ত্রিলোচন গুরুর উপদেশানুসারেই এখানে যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্রিলোচন গুরুর উপদেশ পাইয়াই বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের উদ্ধার করেন, এ কথা তৎপর্য্য-পরিশুদ্ধির প্রথমে উদয়নের কথাতেও পাওয়া যায়। "ত্রিলোচন" বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ছিলেন, ইহা সেখানে প্রকাশ টীকাকার বর্দ্ধমানও লিখিয়াছেন।

ভাষ্য। ন চৈতন্মন্তব্যং আত্মমনঃ সন্নিকর্ষজমেবানবধারণজ্ঞানমিতি। চক্ষুষা হ্যয়মর্থং পশ্যন্নাবধারয়তি, যথা চেন্দ্রিয়েণোপলব্ধমর্থং মনসোপ-লভতে, এবমিন্দ্রিয়েণানবধারয়ন্ মনসা নাবধারয়তি। যচ্চ তদিন্দ্রিয়া-নবধারণপূর্ব্বকং মনসানবধারণং তদ্বিশেষাপেক্ষং বিমর্শমাত্রং সংশয়ো ন

পূর্ব্বমিতি। সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিন্দ্রিয়েণ ব্যবসায়ঃ, উপহতেন্দ্রিয়াণামনুব্যবসায়াভাবাদিতি।

অনুবাদ। অনবধারণ-জ্ঞান অর্থাৎ সংশয় আত্মমনঃ-সন্নিকর্ষ জন্যই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য নহে, ইহা মনে করিও না; যেহেতু এই ব্যক্তি (দ্রষ্টা ব্যক্তি) চক্ষুর দ্বারা পদার্থ-বিশেষকে (সমান-ধর্ম্মা ধর্ম্মীকে) দর্শন করতঃ অনবধারণ করে অর্থাৎ সেই পদার্থে বিশেষরূপে সংশয় করে। এবং যেরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ (ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট) পদার্থকে মনের দ্বারা অর্থাৎ নেত্র-সহায় মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ (সংশয়) করে। সেই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপূর্ব্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-পূর্ব্বক মনের দ্বারা অনবধারণ, সেই বিশেষাপেক্ষ (যাহাতে বিশেষ-জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থাকে) বিমর্শ-ই অর্থাৎ একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞানই সংশয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় সংশয়। পূর্ব্বটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃ-সংযোগ জন্য যে মানস-সংশয় দৃষ্টান্তরূপে আপত্তি-কারীর মনে আছে, সেই সংশয় নহে, (প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় সংশয় নহে)। সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাতার (আত্মার) ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ব্যবসায় (বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান) হয়; কারণ, বিনষ্টেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের অনুব্যবসায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয় না।

টিপ্পনী। আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয়জ্ঞান মানস, উহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্যই নহে; সুতরাং সংশয় মহর্ষির প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হইতেই পারে না। সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণের জন্য সূত্রে "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার কি করিয়া বলেন? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ন চৈতন্মন্তব্যম্" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, সংশয় মাত্রেই মন কারণ হইলেও সংশয়মাত্রই মানস নহে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল মনোজন্য হইলেই সেই জ্ঞানকে মানস বলে। যেখানে চক্ষুর দ্বারা পদার্থ দর্শন করতঃ সংশয় করে, তাহাকে চাক্ষুষ সংশয় বলিতেই হইবে। তাহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও সেই সংশয়-বিষয়ের সন্নিকর্ষও কারণ,সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্য সংশয় জ্ঞান সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষতা বারণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃ-সংযোগ জন্য যে মানস সংশয় হয়, তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া সংশয় মাত্রই মানস, ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, যে সংশয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কারণ, তাহা কোন মতেই মানস হইতে পারে না; তাহাকে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য বলিতেই হইবে। সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য চাক্ষুষাদি সংশয়কে মনে করিয়াই অর্থাৎ তাহার সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষতা নিবারণের অভিপ্রায়েই সূত্রে "ব্যবসায়াত্মক" শব্দের প্রয়োগ করা

হইয়াছে অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য সংশয়ই এখানে বুদ্ধিস্থ; পূর্ব্বটি অর্থাৎ আপত্তিকারী যাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া সংশয় মাত্রই মানস বলিতে চাহেন, সেই মানস-সংশয় এখানে বুদ্ধিস্থ নহে। দৃষ্টান্ততাবশতঃ ঐ সংশয়কে ভাষ্যকার "পূর্ব্ব" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তটি পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে "পূর্ব্ব" বলা যায়।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয়-মাত্রই মানস। মনই বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া বাহ্য পদার্থে প্রবৃত্ত হয়। অন্যথা 'আমি ঘট জানিতেছি' ইত্যাদি রূপে যে জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ঘটাদি বাহ্য পদার্থ বিষয় হইতে পারে না; সুতরাং বলিতে হইবে, বাহ্য পদার্থেও মনের প্রবৃত্তি হয়। তাহা হইলে সর্ব্বত্র সংশয়কে মানসই বলা যায়। এই জন্য বলিয়াছেন—সর্ব্বত্র ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্থলে সর্ব্বত্রই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান হয়। পরে তাহার অনুব্যবসায় অর্থাৎ 'আমি চক্ষু দ্বারা ঘট জানিতেছি' ইত্যাদিরূপে ঐ জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয়। বিনষ্টেন্দ্রিয় অন্ধ, বধির প্রভৃতির মন থাকিলেও ঐরূপ অনুব্যবসায় হয় না; কারণ, তাহাদিগের সেই সেই ইন্দ্রিয় না থাকায় তত্তদিন্দ্রিয়-জন্য ব্যবসায়ই হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ অনুব্যবসায়ের মূলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে অনুব্যবসায়ের দৃষ্টান্তে সংশয়ে বহিরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনই করণ, ইহা বলা যাইবে না। মূল কথা, প্রত্যক্ষের মানস-প্রত্যক্ষে বাহ্য পদার্থ বিষয় হয় বলিয়া সেই দৃষ্টান্তে বাহ্য পদার্থের বহিরিন্দ্রিয়জন্য সংশয়কেও মানস বলা যায় না। কারণ, সেখানে বহিরিন্দ্রিয়-জন্য ব্যবসায়ের বিষয় বাহ্য পদার্থই অনুব্যবসায়ে বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ বাহ্য পদার্থের চাক্ষুষাদি সংশয়ও কেবল মনোজন্য নহে। উহা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন; সুতরাং উহাকে মানস বলা যায় না।

ভাষ্য। আত্মাদিষু সুখাদিষু চ প্রত্যক্ষলক্ষণং বক্তব্যমনিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজং হি তদিতি। ইন্দ্রিয়স্য বৈ সতো মনস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথগুপদেশো ধর্ম্মভেদাৎ। ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি নিয়তবিষয়াণি, সগুণানাঞ্চৈষামিন্দ্রিয়ভাব ইতি। মনস্ত্বভৌতিকং সর্ব্ববিষয়ঞ্চ, নাস্য সগুণস্যেন্দ্রিয়ভাব ইতি। সতি চেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে সন্নিধিমসন্নিধিঞ্চাস্য যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি। মনসশ্চেন্দ্রিয়ভাবান্ন বাচ্যং লক্ষণান্তরমিতি। তন্ত্রান্তরসমাচারাচ্চৈতৎ প্রত্যেতব্যমিতি। পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ। ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) আত্মা প্রভৃতি এবং সুখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষের লক্ষণ (প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর) বলিতে হয়? কারণ, তাহা (আত্মাদি এবং সুখাদির প্রত্যক্ষ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য নহে। (উত্তর) ইন্দ্রিয়রূপেই বিদ্যমান

মনের ধর্ম্মভেদবশতঃ (ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধর্ম্ম্যবশতঃ) ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে পৃথক্ উপদেশ হইয়াছে। (যে ধর্ম্মভেদবশতঃ মনের পৃথক্ উপদেশ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মভেদগুলি ক্রমশঃ দেখাইতেছেন)। ইন্দ্রিয়গুলি (ইন্দ্রিয়সূত্রে পঠিত ঘ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়) ভৌতিক, (ভূত-জন্য বা ভূতাত্মক) নিয়ত বিষয়, (যাহাদিগের বিষয়ের নিয়ম আছে) এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াই ইহাদিগের (ঘ্রাণাদির) ইন্দ্রিয়ত্ব। মন কিন্তু অভৌতিক এবং সর্ব্ববিষয়, গুণবিশিষ্ট হইয়া ইহার ইন্দ্রিয়ত্ব নাই এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকিলে ইহার (মনের) সন্নিধি ও অসন্নিধি অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধই যুগপৎজ্ঞানানুৎপত্তির অর্থাৎ এক সময়ে বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ না হওয়ার কারণ (প্রয়োজক) বলিব। ফলকথা, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে বলিয়াই (আত্মাদি ও সুখাদি প্রত্যক্ষের) লক্ষণান্তর বলিতে হইবে না। তন্ত্রান্তর অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরের সমাচার (সংবাদ) বশতঃও ইহা (গোতম-সম্মত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব) বুঝা যায়। কারণ, অপ্রতিষিদ্ধ (অখণ্ডিত) পরের মত অনুমত অর্থাৎ নিজ সম্মত,—ইহাকে "তন্ত্রযুক্তি" বলে। প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যাত হইল।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি ইন্দ্রিয়সূত্রে মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয় নহে। আত্মাদি এবং সুখাদিরও প্রত্যক্ষ হয়, উহা মানস প্রত্যক্ষ। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব না থাকায় ঐ প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য বলা যায় না। সুতরাং মহর্ষির এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঐ মানস-প্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত হইল। উহাকে এই লক্ষণের লক্ষ্য না বলিলে উহার জন্য আবার পৃথক্ প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিতে হয়। উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষির সম্মত। মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃই আত্মাদির মানস-প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং মহর্ষির এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণই তাহাতে অব্যাহত আছে, তাহার জন্য আর পৃথক্ কোন লক্ষণ বলিবার প্রয়োজন নাই। মন ইন্দ্রিয় হইলেও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহার উল্লেখ না করিয়া যে পৃথক্ উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ ধর্ম্মভেদ। অর্থাৎ মন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধর্ম্ম্য বা বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াই ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে মন ইন্দ্রিয় নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভৌতিক, মন অভৌতিক। মন ক্ষিত্যাদি কোন ভূতজন্য নহে, ভূতাত্মকও নহে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, রূপাদির গ্রাহক নহে; চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপের গ্রাহক, গন্ধাদির গ্রাহক নহে, ইত্যাদিরূপে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিয়ত। মনের বিষয় নিয়ম নাই, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানেই মন আবশ্যক; সুতরাং সকল পদার্থই মনের বিষয় এবং ঘ্রাণাদি গন্ধাদিগুণবিশিষ্ট হইয়াই ইন্দ্রিয়, মন তদ্রূপ ইন্দ্রিয় নহে। অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় যেমন স্ব স্ব গুণ গন্ধাদির দ্বারা

বাহ্য গন্ধাদির গ্রহণ করায়, তাহারা যে যে গুণের গ্রাহক, সেই সেই গুণ তাহাদিগেরও আছে, মন তদ্রূপ নহে। মনে গন্ধ প্রভৃতি কোন বিশেষ গুণ নাই। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ভাষ্যোক্ত বৈধর্ম্ম্যগুলির মধ্যে সর্ব্ববিষয়ত্ব ও অসর্ব্ববিষয়ত্বই মনের পৃথক্ উপদেশের প্রকৃত হেতু। অন্যগুলি সংগত হয় না। "মনঃ সর্ব্ববিষয়ং স্মৃতিকারণসংযোগাধারত্বাৎ আত্মবৎ, সুখগ্রাহকসংযোগাধিকরণত্বাৎ সমস্তেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ", এই প্রকারে বার্ত্তিককার মনের সর্ব্ববিষয়ত্ব সাধন করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত অন্য বৈধর্ম্ম্যগুলি তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে,—মনের পৃথক্ উপদেশই বা কোথায়? মহর্ষি-সূত্রে তাহাও ত দেখি না? এতদুত্তরে বলিয়াছেন—"সতি চ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে" ইত্যাদি। অর্থাৎ "যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্" (১।১।১৬) এই সূত্রের দ্বারাই মহর্ষি মনের উপদেশ করিয়াছেন। এক সময়ে চাক্ষুষ প্রভৃতি বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা অনেকের অনুভব-সিদ্ধ। এই অনুভব মানিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন, মন অতি সূক্ষ্ম। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ কারণ। এক সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ে অতি সূক্ষ্ম মনের সংযোগ অসম্ভব, তাই এক সময়ে বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মন সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষই হয়। যে ইন্দ্রিয়ের সহিত তখন মনের সংযোগ থাকে না, সেই ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন যে, এক ইন্দ্রিয়ে মনের সন্নিধি এবং অন্য ইন্দ্রিয়ে অসন্নিধিই ঐ স্থলে ঐরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়ার মূল, তাই ঐ উভয়কেই উহাতে প্রযোজক বলিব। ভাষ্যোক্ত "কারণ" শব্দের অর্থ এখানে প্রযোজক। যথাস্থানে এ কথা বিশদরূপে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি গোতম মনের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ত মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কোথায়ও বলেন নাই, তবে আর কি করিয়া তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয়, ইহা ধরিয়া লইব? এতদুত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "তন্ত্রান্তর-সমাচার" অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরসংবাদ হইতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বুঝা যায়। মহর্ষি সেই পরমত খণ্ডন করেন নাই, সুতরাং উহা তাঁহার অনুমত, ইহা বুঝা যায়। পরের মত খণ্ডন না করিলে অনুমত হয়, ইহাকে "তন্ত্রযুক্তি" বলে।[১] এই তন্ত্রযুক্তির দ্বারাও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি গোতমের সম্মত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং ভাষ্যোক্ত "তন্ত্র" শব্দের অর্থ ("তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) বলিয়াছেন শাস্ত্র। কিন্তু কোন্ শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি কথা কিছুই বলেন নাই। গোতম মুনি খণ্ডন করিলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রমতই খণ্ডন করিতেন, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত "তন্ত্র" শব্দের দ্বারা গোতমের পূর্ব্ববর্ত্তী "তন্ত্র"ই বুঝিতে হইবে। মনুস্মৃতিতে আছে,—

১। সুশ্রুত গ্রন্থের উত্তরতন্ত্রে তন্ত্রযুক্তি অধ্যায়ে ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম "অনুমত"। "পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতং ভবতি যথান্যো ব্রূয়াৎ সপ্তরসা ইতি"।—সুশ্রুত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষেও ঐরূপে তন্ত্রযুক্তিগুলির উল্লেখ দেখা যায়।

"একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ। একাদশং মনো জ্ঞেয়ম্"। (২অঃ—৮৯।৯২।) এখানে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে ধরিয়া মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। এবং ইহা যে অতি পূর্ব্ববর্ত্তী মত, ইহাও বলা হইয়াছে। "তন্ত্র" বলিতে কোন দর্শনশাস্ত্র ধরিলেও সাংখ্য-সূত্রে আছে,— "উভয়াত্মকং মনঃ"। প্রচলিত সাংখ্যসূত্র কপিল-প্রণীত নহে, এই মত প্রবল হইলেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে কপিল-তন্ত্র-সম্মত, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। সাংখ্যের প্রামাণিক গ্রন্থ ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকাতেও পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রের ন্যায় "উভয়াত্মকমত্র মনঃ" (২৭) এইরূপ কথাই রহিয়াছে। পূর্ব্বে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়া শেষে বলা হইয়াছে,—"মন উভয়াত্মক"। অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মহর্ষি গোতম কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। "বাক্," "পাণি," "পাদ," "পায়ু," "উপস্থ" এই পাঁচটি (যাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে) তিনি বলেন নাই। ভাষ্যকার যেরূপ "তন্ত্রযুক্তির" কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ও গোতমের অনুমত, ইহা বলিতে হয়। কারণ, গোতম মুনি ঐ মতের খণ্ডনও করেন নাই। আমার মনে হয়, ভাষ্যকার যে "তন্ত্রযুক্তি"র কথা বলিয়াছেন, উহাই মনের ইন্দ্রিয়ত্বে গোতমসম্মতি বিষয়ে তাঁহার মুখ্য যুক্তি নহে। এ জন্য তিনি "তন্ত্রান্তর-সমাচারাচ্চ" এই স্থানে "চ" শব্দের দ্বারা ঐ যুক্তির অপ্রাধান্য সূচনা করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গোতম মুনি যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রান্তরোক্ত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মতকে খণ্ডন করেন নাই, মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, তখন তাহাতেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গৌতম মত বলিয়া বুঝা যায়। ফলতঃ ইহাই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে গৌতম-সম্মতি নির্ণয়ে একমাত্র অথবা মুখ্য যুক্তি নহে। তাহা হইলে যে শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মত কথিত আছে, তাহাতে "বাক্," "পাণি" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটিকেও কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া বলা হইয়াছে, সেগুলিকেও গোতমের অনুমত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি তাহা স্বীকৃতই হয়, তবে ভাষ্যকার প্রভৃতি মনের ইন্দ্রিয়ত্বের ন্যায় সেগুলির ইন্দ্রিয়ত্ব বলেন নাই কেন? কোন ন্যায়াচার্য্যই ত তাহা বলেন নাই। বস্তুতঃ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি-সূত্রেই সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি গোতম মানস প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর বলেন নাই কেন? মন যখন ইন্দ্রিয় নহে অর্থাৎ তিনি যখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, তখন তাঁহার মতে মানস প্রত্যক্ষকে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান" বলা যায় না, সুতরাং মানস প্রত্যক্ষের একটি পৃথক্ লক্ষণ তাঁহার বলা উচিত ছিল। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানের জন্যই ভাষ্যকার মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গোতমের মত, ইহা বুঝাইয়াছেন। সেখানে বলিতে পারি যে, মহর্ষি যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়াছেন এবং মানস প্রত্যক্ষের আর কোন পৃথক্ লক্ষণ বলেন নাই, তখন মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাই মনও যে তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়, ইহা সূচিত হইয়াছে এবং ঐরূপে উহা বুঝা গিয়াছে। সূত্রে এই ভাবে সূচনা থাকে। তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত "তন্ত্রযুক্তি"র কথাটাও শেষে গৌণভাবে বলা যায়। ভাষ্যকার নিজের বক্তব্য সমর্থনে আর যেটুকু বলিতে পারেন, তাহা এখানে বলিতে ছাড়িবেন কেন? মনে হয়, সেই ভাবেই ভাষ্যকার এখানে "তন্ত্রযুক্তি"র কথাটাও শেষে বলিয়াছেন। "তন্ত্রযুক্তি"র

কথাটা মুখ্যরূপে বলিলে অর্থাৎ তন্ত্রযুক্তির দ্বারাই যদি সর্ব্বত্র গ্রন্থকারের মত নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে গোল উপস্থিত হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি কেহই এখানে সে সব কথার কোনই অবতারণা করেন নাই। এবং ভাষ্যকারোক্ত "তন্ত্র-যুক্তি" অনুসারে শাস্ত্রান্তরোক্ত অন্যান্য মতকেও গোতমের মতের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করেন নাই। সুধীগণ এখানে এ সকল কথার চিন্তা করিবেন। অবশ্য শাস্ত্রান্তরোক্ত বিভিন্ন মতের অনেকগুলিকেই ভাষ্যকারোক্ত "তন্ত্রযুক্তি" অনুসারে গোতমের সম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। ন্যায়সূত্র অনেক প্রাচীন মতেরই বিরুদ্ধ নহে, ইহা আমরা ভিন্ন স্থানে আলোচনা করিব।

মূল কথা, ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায়, তিনি মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তই বলিতেন। ভাষ্যে "ইন্দ্রিয়স্য বৈ" এখানে "বৈ" শব্দের অর্থ অবধারণ। "ইন্দ্রিয়স্য বৈ" ইহার ব্যাখ্যা "ইন্দ্রিয়স্যৈব"। উপনিষদে এবং ঋষিসূত্রে বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনের বিশেষ প্রদর্শনের জন্যই মনের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব শ্রুতিমূলক স্মৃতি-প্রমাণসিদ্ধ। উহাতে কাহারও বিবাদ হইতে পারে না—বিবাদ করিলে তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবাদ হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের চরম কথার চরম তাৎপর্য্য। ইহাই ভাষ্যকারোক্ত "তন্ত্রযুক্তি"র গূঢ় তাৎপর্য্য।

পরবর্ত্তী কালে "বেদান্তপরিভাষা"কার ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র মনের ইন্দ্রিয়ত্বে বিবাদ করিয়াছেন—তিনি উপনিষদে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ দেখাইয়া শেষে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ইন্দ্রিয়াধিকরণে কিন্তু (২ অঃ, ৪ পাদ, ১৭ সূত্র) মনের ইন্দ্রিয়ত্বের কথা পাওয়া যায়। সেখানে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক মনকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে "ভামতী"তে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক শাস্ত্রে অনেক স্থলে যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ আছে, তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায়ই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় ভগবদ্বাক্যও রহিয়াছে—"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি"। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন, এ কথা বলিলে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্টই প্রকটিত হয়। বেদান্তপরিভাষাকার গীতার "মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" এই কথাটির উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজ মতের বিরোধ ভঞ্জন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" এই কথাটির কোন উল্লেখ করেন নাই; কেন করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। কোন আধুনিক টীকাকার "ইন্দ্রিয়াণাং" এই স্থলে সম্বন্ধে ষষ্ঠীর ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে আমি মন" ইহাই ঐ ভগবদ্‌বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকারের মত রক্ষা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা যে ঐ স্থলে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, ইহা সুধীগণ অবশ্য বুঝিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্করও সেখানে ঐ ভাবের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শারীরকভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এখানে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন কেন? বেদান্ত-পরিভাষাকার এই সকল দেখিয়াও বেদান্তগ্রন্থে—শঙ্করের মতসমর্থক গ্রন্থে মনের ইন্দ্রিয়ত্ববাদ খণ্ডনে এত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন কেন, ইহা চিন্তনীয়। ভগবান্ শঙ্কর শ্রুতিমূলক স্মৃতির মতানুসারে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মানিয়া লইয়া উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, আর ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাহা

মানিলেন না, নূতন মতের সৃষ্টি করিলেন, ইহা তাঁহার প্রৌঢ়িবাদ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে, সুধীগণের ইহা চিন্তা করা উচিত।

ভাষ্যকার যে "তন্ত্রযুক্তি"র কথা বলিয়াছেন,তাহাতে ভাষ্যকারের প্রতিবাদী বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ তাঁহার "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—

"ন সুখাদিপ্রমেয়ং বা মনো বাঽস্তীন্দ্রিয়ান্তরম্।
অনিষেধাদুপাত্তঞ্চেদন্যেন্দ্রিয়রুতং বৃথা॥"

দিঙ্‌নাগের কথা এই যে, যদি গোতম মুনি মনের ইন্দ্রিয়ত্বের নিষেধ না করাতেই উহা তাঁহার মত বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তিনি যে ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা না বলিলেও চলিত, তাহা বলিলেন না এবং নিষেধও করিলেন না, এইরূপ করিলেই ত মনের ইন্দ্রিয়ত্বের ন্যায় ঘ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটিরও ইন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার মত বলিয়া বুঝা যাইত। যে কোনরূপে নিজের মত স্থাপনই ত তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা যদি ঐ রূপেই হইয়া যায়, তাহা হইলে আর ঘ্রাণাদি পাঁচটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা কেন? দিঙ্‌নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, দিঙ্‌নাগ ভাষ্যকারোক্ত "তন্ত্রযুক্তি" না বুঝিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন। যেখানে নিজের মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেখানে পরের কোন একটি মত যদি ঐ মতের অবিরুদ্ধ হয় এবং গ্রন্থকার কর্তৃক খণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে সেখানেই ঐ পরের মতটি অনুমত হয়। ইহাই ভাষ্যকারোক্ত "তন্ত্রযুক্তি"। গোতম মুনি যদি ইন্দ্রিয়ের কথা একেবারেই না বলিতেন, তাহা হইলে এই "তন্ত্রযুক্তি"র কোন স্থলই হইত না। যেখানে নিজের কোন মতই নাই, সেখানে "পরের মত—অনুমত হইয়াছে" এ কথা বলা যায় না। কোন বিষয়ে একেবারে নীরব থাকিলে তদ্বিষয়ে কোন্‌টি নিজ মত, আর কোন্‌টি পর-মত, তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? সুতরাং নিজের মতটি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজ মত ও পর-মত বুঝিয়া তন্ত্রযুক্তির কথা বুঝা যাইতে পারে। উদ্যোতকর এই ভাবে দিঙ্‌নাগের প্রতিবাদ করিয়া শেষে দিঙ্‌নাগের প্রত্যক্ষ লক্ষণ[১] বিশেষ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে জৈমিনির এবং বার্ষগণ্যের প্রত্যক্ষ লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যক্ষ-সূত্রভাষ্য-বার্ত্তিক সমাপ্ত করিয়াছেন। সুধীগণ ন্যায়বার্ত্তিকে সে সকল কথা দেখিতে পাইবেন।

ভাষ্যকারের তন্ত্রযুক্তির কথা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে দিঙ্‌নাগের আপত্তি গ্রাহ্যই হয় না। কারণ, ভাষ্যকারের "তন্ত্রযুক্তি" মুখ্য যুক্তি নহে। পরন্তু মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ উল্লেখ না করিলে তাঁহার মতে মুমুক্ষুর দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়ে"র মধ্যে "ইন্দ্রিয়" একপ্রকার "প্রমেয়", ইহা বলা হয় না। তন্মধ্যে মন আবার বহিরিন্দ্রিয় হইতে বিশেষরূপে "প্রমেয়," এই জন্য মনের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, প্রমেয়-মধ্যে মনের পৃথক্ উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়াও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সুধীগণ ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ৪।

১। "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নামজাত্যাদ্যসংযুতম্।"—দিঙ্‌নাগকৃত প্রমাণসমুচ্চয়ম্—১ম পরিচ্ছেদ।

সূত্র। অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্বব-
চ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ। ৫।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরে (অনুমান নিরূপণ করিতেছি)। "তৎপূর্ব্বক" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষমূলক জ্ঞান—অনুমান-প্রমাণ। (তাহা) ত্রিবিধ। (১) "পূর্ব্ববৎ," (২) "শেষবৎ," (৩) "সামান্যতো দৃষ্ট"।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষবিশেষমূলক এক প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে বলে "অনুমিতি"। আবার ইহাকে "অনুমান"ও বলা হয়। "অনু" পূর্ব্বক "মা" ধাতুর উত্তর ভাব অর্থে "অনট্" প্রত্যয় যোগে "অনুমান"শব্দটি সিদ্ধ হইলে "অনুমান" বলিতে অনুমিতিই বুঝা যায়। ঐরূপে অনুমিতি অর্থে "অনুমান" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণের বিভাগানুসারে এই সূত্রে যখন অনুমান-প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য, তখন এই সূত্রে "অনুমান" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে অনুমান-প্রমাণ। এই অর্থে "অনুমান" শব্দটি "অনু" পূর্ব্বক "মা" ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনট্ প্রত্যয়-সিদ্ধ। অর্থাৎ যাহা যথার্থ অনুমিতির করণ, তাহাই অনুমান-প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির ন্যায় তাহাও প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞান। সে কিরূপ জ্ঞান, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

অনুমান মাত্রেই দুইটি পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান আবশ্যক। একটি পদার্থ ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত, আর একটি পদার্থ তাহার ব্যাপক। ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত বলিলে বুঝা যায়—যাহাকে কেহ ব্যাপিয়া থাকে। ব্যাপিয়া থাকে বলিলে বুঝা যায়, সেই পদার্থটির সমস্ত আধারেই সম্বন্ধ যুক্ত থাকে। ব্যাপক বলিলে বুঝা যায়, যে পদার্থটি ব্যাপিয়া থাকে। অর্থাৎ কোন পদার্থের সমস্ত আধারেই যাহার সম্বন্ধ আছে। যেমন বিশিষ্ট ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি তাহার ব্যাপক। বহ্নি বিশিষ্ট ধূমকে ব্যাপিয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সকল স্থানেই বহ্নি থাকে,—বহ্নিশূন্য কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধূম থাকে না, থাকিতেই পারে না; কারণ, বহ্নি ধূমের কারণ, বহ্নি ব্যতীত ধূম জন্মিতেই পারে না। তাহা হইলে বিশিষ্ট ধূমের সকল আধারেই বহ্নির সম্বন্ধ থাকে বলিয়া বিশিষ্ট ধূমকে বহ্নির ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত বলা যায়। এবং বহ্নিকে বিশিষ্ট ধূমের ব্যাপক বলা যায়। বিশিষ্ট ধূমে বহ্নির ঐরূপ সম্বন্ধকে "ব্যাপ্তি" বলা হইয়াছে। সর্ব্বত্র সম্বন্ধের নামই ত "ব্যাপ্তি"। এই অর্থে প্রচলিত ভাষাতেও "ব্যাপ্তি" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। উহা নব্য নৈয়ায়িকদিগের আবিষ্কৃত কোন নূতন শব্দ নহে। নব্য নৈয়ায়িকগণ ঐ ব্যাপ্তি পদার্থের স্বরূপ বর্ণনায় সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিশ্রম করিয়াছেন মাত্র। অনুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়ই এই ব্যাপ্তি পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন (২ আ০,—৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। মূল কথা, অনুমান মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবরূপ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান আবশ্যক। ঐ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান হইলে যেখানে ব্যাপক পদার্থটি প্রত্যক্ষ হইতেছে না, কিন্তু তাহার ব্যাপ্য পদার্থটির প্রত্যক্ষ বা অন্যরূপ জ্ঞান হইল, সেখানে ঐ ব্যাপ্য পদার্থের

জ্ঞানবিশেষ প্রযুক্ত তাহার ব্যাপক পদার্থটির যে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাই অনুমিতি। ব্যাপ্য পদার্থটিই অনুমানে হেতু-পদার্থরূপে গৃহীত হয় ; এ জন্য ব্যাপ্য পদার্থকে "লিঙ্গ" বলে, ব্যাপক পদার্থটিকে "লিঙ্গী" বলে। "লিঙ্গ" ও "লিঙ্গী"র সম্বন্ধ বলিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ। কোন স্থানে বিশিষ্ট ধূম দেখিলেই এই স্থানে বহ্নি আছে, এইরূপ জ্ঞান অনেকেরই হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আবার ধূমবিশেষ দেখিয়া অথবা শব্দবিশেষ শুনিয়া রেল বা ষ্টীমারের শীঘ্র আগমনের অনুমান করিয়া অনেকেই আশ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন এমন হয় ? দূর হইতে বৃক্ষের স্পন্দন দেখিয়া অথবা কাহারও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া রেল বা ষ্টীমারের শীঘ্র আগমনের নিশ্চয় করিয়া কোন বিজ্ঞ লোক আশ্বস্ত হন না কেন ? তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ স্থলে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্য পদার্থটির জ্ঞান হয় নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্যাপ্য পদার্থের জ্ঞান-প্রযুক্তই তাহার ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাহাকেই বলে অনুমিতি। আরও বলিতে হইবে, সকল পদার্থই সকল পদার্থের ব্যাপ্য নহে, অর্থাৎ যে কোন পদার্থই যে কোন পদার্থের ব্যাপ্য হয় না এবং কোন্ পদার্থ কাহার ব্যাপ্য, তাহা না বুঝিলেও অনুমিতি হয় না। অনুমিতি মাত্রেই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতুর ও সাধ্য ধর্ম্মের) ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক। বিশিষ্ট ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকে, ইহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ বিষয়ে একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কোন স্থানে বিশিষ্ট ধূম দেখিলে বা অন্য প্রমাণের দ্বারা জানিলে সামান্যতঃ বিশিষ্ট ধূমমাত্রেই তাঁহাদিগের পূর্ব্বজ্ঞাত যে বহ্নিব্যাপ্যতা বা বহ্নির ব্যাপ্তি, তাহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূম থাকিলেই সেখানে বহ্নি থাকিবে, ইহা তাঁহাদিগের মনে পড়ে। তাহার পরে "এই স্থান বহ্নিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধূমযুক্ত," এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপ জ্ঞানকেই "লিঙ্গ-পরামর্শ" বলা হইয়াছে। ইহার পরেই "এই স্থান বহ্নিযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান জন্মে। এইরূপ জ্ঞানই অনুমিতি। পূর্ব্বোক্ত "লিঙ্গপরামর্শ" এই অনুমিতির চরম কারণ, এ জন্য উদ্যোতকর উহাকেই মুখ্য অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। সূত্রকার ও ভাষ্যকারের কথাতেও উহা অনুমান-প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায়। অনুমানের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মতভেদ থাকিলেও উদ্যোতকর সেগুলির উল্লেখ করিয়া[১] বলিয়াছেন যে, লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তি স্মরণ এবং চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শ, ইহারা সকলেই অনুমান-প্রমাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শই প্রধান। অনেক স্থলে ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই প্রধান প্রমাণকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন—(তৃতীয় সূত্র-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

১। "বয়ন্তু পশ্যামঃ সর্ব্বমনুমানমনুমিতেস্তদ্রান্তরীয়কত্বাৎ প্রধানোপসর্জ্জনতাবিবক্ষায়াং লিঙ্গপরামর্শ ইতি ন্যায্যং, কঃ পুনরত্র ন্যায়ঃ ? আনন্তর্য্যপ্রতিপত্তিঃ যস্মাল্লিঙ্গপরামর্শাদনন্তরং শেষার্থপ্রতিপত্তিরিতি তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শো ন্যায্য ইতি স্মৃতির্ন প্রধানম্" ইত্যাদি।—(ন্যায়বার্ত্তিক, ৫ সূত্র।)

ভট্ট[1] কুমারিল ধূম, ধূমজ্ঞান এবং বহ্নি ধূমের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধের স্মরণকে অনুমান-প্রমাণ বলিয়া কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ কুমারিলও একটিমাত্রকে অনুমান-প্রমাণ বলেন নাই; সুতরাং তাঁহার মতেও অনুমান-প্রমাণের মুখ্য গৌণ ভাব আছে বলিয়াই বুঝিতে হয়। নব্য নৈয়ায়িক একমাত্র ব্যাপ্তিজ্ঞানবিশেষকেই অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। লিঙ্গপরামর্শ তাহার ব্যাপার। লিঙ্গপরামর্শের পরেই অনুমিতি জন্মে; সুতরাং উহা কোন ব্যাপার দ্বারা অনুমিতি জন্মায় না; এ জন্য অনুমিতির করণ না হওয়ায় অনুমান-প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই তাঁহাদিগের যুক্তি। এ বিষয়ে প্রাচীন মতের যুক্তি (তৃতীয় সূত্রে) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নব্য ন্যায়ের মূল আচার্য্য গঙ্গেশ কিন্তু[2] "লিঙ্গপরামর্শ" শব্দের দ্বারাই অনুমান-প্রমাণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গঙ্গেশ বহু স্থলেই উদ্যোতকরের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুমানত্ববিষয়ে তাঁহার মত ও সমর্থন থাকিলেও উদ্যোতকরের মতানুসারে তিনিও "লিঙ্গপরামর্শ"কে প্রধান অনুমান-প্রমাণ বলিতে পারেন। টীকাকারগণ তাহা না বলিলেও গঙ্গেশ প্রথমে "লিঙ্গপরামর্শ"শব্দের দ্বারা অনুমান-প্রমাণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? ইহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। পরবর্ত্তী প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "হেতু"কে অনুমানপ্রমাণ বলিলেও ফলতঃ তাঁহার মতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার "লিঙ্গপরামর্শ"ও অনুমান-প্রমাণ বলিতে হইবে। কারণ, "হেতু" থাকিলেই অনুমিতি জন্মে না। বিশিষ্ট ধূম পর্ব্বতে থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহাকে বহ্নির ব্যাপ্য বলিয়া জানে না, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূম থাকিলেই সেখানে বহ্নি থাকিবেই, ইহা যাহার জানা নাই এবং বহ্নির ব্যাপ্যবিশিষ্ট ধূম পর্ব্বতে আছে, ইহা যে ব্যক্তি জানিতে পারে নাই, তাহার পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি জন্মে না, এ জন্য ঐরূপে জ্ঞায়মান বিশিষ্ট ধূমকেই উদয়ন ঐ স্থলে অনুমিতির করণ বলিয়া অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু চরম কারণকে "করণ" বলিলে ঐ স্থলে যে জ্ঞানটির পরেই অনুমিতি জন্মে, সেই "লিঙ্গপরামর্শ"নামক জ্ঞানকেও অনুমান-প্রমাণ বলিতে হয়। বস্তুতঃ উদয়ন তাহাও বলিতেন। "লিঙ্গপরামর্শে"র বিষয় "লিঙ্গ"কে অনুমান-প্রমাণ বলিলে ঐ "লিঙ্গপরামর্শ"কেও ফলতঃ অনুমান-প্রমাণ বলা হয়। উদয়নের "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"র টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও অনুমানরূপ "ন্যায়"কে "লিঙ্গপরামর্শ" স্বরূপ বলিয়াছেন। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও লিখিয়াছেন,—"লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানমিত্যাচার্য্যাঃ"। সেখানে প্রখ্যাতনামা টীকাকার মল্লিনাথও লিখিয়াছেন যে, প্রকারান্তরে উদয়নাচার্য্যও "লিঙ্গপরামর্শ"কে অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যেখানে অতীত অথবা ভাবী হেতুর জ্ঞানপূর্ব্বক অনুমিতি জন্মে, সেখানে ঐ হেতুকে অনুমিতির করণ বলা যায় না। যাহা কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে না, তাহা কারণই হইতে পারে না। অতীত এবং ভাবী পদার্থ যে কারণই হইতে পারে না, এ কথা উদয়নও তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে অন্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন। সুতরাং অতীত ও ভাবী পদার্থ হেতু হইলে সেখানে উদয়নও "লিঙ্গপরামর্শ"কে অথবা তৎপূর্ব্বজাত "ব্যাপ্তিস্মরণ"কে অনুমান-প্রমাণ বলিতেন। তাহা হইলে নব্য নৈয়ায়িকগণ যে অতীত ও ভাবী

১। "ধূমতজ্জ্ঞানসম্বন্ধস্মৃতিপ্রামাণ্যকল্পনে।"—(শ্লোকবার্ত্তিক, অনুমান-পরিচ্ছেদ, ৫২।)

২। "তৎকরণমনুমানং তচ্চ লিঙ্গপরামর্শো ন তু পরামৃশ্যমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে।"—(অনুমানচিন্তামণি, ১ম খণ্ড।)

হেতুস্থলে হেতু পূর্ব্বে না থাকায় অনুমিতির করণ অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণ হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া উদয়নের মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দোষও থাকে না। কারণ, উদয়ন সর্ব্বত্র হেতুকেই অনুমান-প্রমাণ বলেন নাই। তবে সাধ্যসাধন হেতুপদার্থ অসিদ্ধ হইলে—যথার্থ অনুমিতির সম্ভাবনাই নাই, প্রকৃত হেতুই—অনুমানকারীর অনুমান-কার্য্যে মূল অবলম্বন, এই অভিপ্রায়ে হেতুকে প্রধানরূপে বিবক্ষা করিয়া তিনি প্রধানতঃ জ্ঞায়মান হেতুকে অনুমান-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীনগণও ঐ অভিপ্রায়েই অনুমান-প্রমাণ অর্থে কোন কোন স্থলে "হেতু" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞায়মান হেতুই অনুমান-প্রমাণ, এই মতটি জৈন ন্যায়-গ্রন্থেও দেখা যায়। জৈন ন্যায়ের "শ্লোকবার্ত্তিক" গ্রন্থে আছে,—"সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানমনুমানং বিদুর্ব্বুধাঃ"। সেখানে ন্যায়দীপিকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জ্ঞায়মান হেতু হইতে সাধ্যের জ্ঞানই অনুমিতি। অর্থাৎ জ্ঞায়মান হেতুকেই তাঁহারা অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকগণ যে "লিঙ্গপরামর্শ"কে অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা ভ্রম-কল্পিত, এ কথাও বলিয়াছেন। এই মতাবলম্বিগণ যাহাই বলুন, পূর্ব্বোক্ত প্রকার "লিঙ্গপরামর্শ" না হইলে যখন কোনমতেই অনুমিতি হয় না এবং উহাই অনুমিতির চরম কারণ—প্রধান কারণ এবং হেতু পদার্থ অতীত অথবা ভাবী হইলেও ঐ লিঙ্গপরামর্শের দ্বারাই যখন অনুমিতি জন্মে, তখন ঐ প্রধান কারণ "লিঙ্গ-পরামর্শ"কে প্রধান অনুমান-প্রমাণ বলিতেই হইবে। উহার পূর্ব্বজাত লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন প্রভৃতিকেও অনুমান-প্রমাণ বলিতে হইবে। মহর্ষি-সূত্র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও তাহাই পাওয়া যায়। উদ্দ্যোতকরও তাহাই মীমাংসা করিয়াছেন। তবে যাঁহারা চরম কারণকে করণই বলেন না, সেই নব্য মতে লিঙ্গপরামর্শ অনুমান-প্রমাণ হইবে না। তাঁহাদিগের মতে ঐ পরামর্শের জনক তৎপূর্ব্বজাত ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান-প্রমাণ।

অনুমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে যেমন বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ অনুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়েও ততোঽধিক মতভেদ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ তাঁহার "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেই অনুমেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ পর্ব্বতে বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া যেখানে অনুমিতি হয়, সেখানে কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, পর্ব্বতে বহ্নিরূপ ধর্ম্মান্তরের অনুমিতি হয়; কোন সম্প্রদায় বলিতেন, পর্ব্বতরূপ ধর্ম্মী এবং বহ্নি-রূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধের অনুমিতি হয়। দিঙ্‌নাগ এই মতদ্বয় খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ স্থলে বহ্নিরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট পর্ব্বতরূপ ধর্ম্মীরই অনুমিতি হয়[১]। পর্ব্বতরূপ ধর্ম্মী এবং বহ্নিরূপ

১। কেচিদ্ধর্ম্মান্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্যভিচারতঃ।
সম্বন্ধং কেচিদিচ্ছন্তি সিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ॥
লিঙ্গং ধর্ম্মে প্রসিদ্ধঞ্চেৎ কিমন্যৎ তেন মীয়তে।
অথ ধর্ম্মিণি তস্যৈব কিমর্থং নানুমেয়তা॥
সম্বন্ধেঽপি দ্বয়ং নাস্তি ষষ্ঠী শ্রূয়েত তদ্বতি।
অবাচ্যোঽনুগৃহীতত্বান্ন চাসৌ লিঙ্গসংগতঃ॥

ধর্ম্ম পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ হইলেও বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত পূর্ব্বে অসিদ্ধ থাকায় অনুমান-প্রমাণের দ্বারা তাহাই সিদ্ধ করা হয়। যাহা সিদ্ধ, তাহা সাধ্য হইতে পারে না। ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মী অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য হইতে পারে। ভট্ট কুমারিলও শ্লোকবার্ত্তিকে এই বিষয়ে বহু মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়া শেষে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেই অনুমেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন[১]।

দিঙ্‌নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে" বহু বিচারপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগের মত এবং অন্যান্য মতের প্রতিবাদ করিয়া গত্যন্তর নাই বলিয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হেতুকে সাধ্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়াই অনুমিতি হয়। অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া যেখানে বহ্নির অনুমিতি হয়, সেখানে "এই ধূমবিশেষ বহ্নিবিশিষ্ট" এইরূপই অনুমিতি হয়। ভট্ট কুমারিলও শেষে উদ্যোতকরের এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই মতে ধূমবিশেষই অগ্নিবিশিষ্ট বলিয়া সাধ্যমান হয় এবং ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মই হেতু হয়, এই কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন (৩৬ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন যে, সাধ্য দ্বিবিধ—(১) ধর্ম্মিবিশিষ্ট ধর্ম্ম এবং (২) ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী। এবং তৃতীয় সূত্রভাষ্যে লিঙ্গী অর্থের অনুমান হয়, এই কথা বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারোক্ত লিঙ্গীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—হেতুবিশিষ্ট ধর্ম্মী। ভাষ্যকার কিন্তু এই সূত্রভাষ্যে সাধ্য ধর্ম্ম অর্থেই "লিঙ্গিন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাপ্য হেতুকে "লিঙ্গ" বলে। ঐ লিঙ্গটি যাহার সাধন হইয়া যাহার "লিঙ্গ" হয়, তাহাকে "লিঙ্গী" বলা যায়। এই "লিঙ্গ" ও "লিঙ্গী"র সম্বন্ধ বলিতে হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধ। যাঁহারা সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেই অনুমেয় বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে হেতু পদার্থটি অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্য হয় না। যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত থাকে না, সুতরাং বিশিষ্ট ধূম বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতের অনুমিতি হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বাদিগণ বিশিষ্ট ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধ-জ্ঞানের ফলেই বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতের অনুমিতি হয় বলিয়াছেন। জৈন ন্যায়গ্রন্থে এই মত পরিস্ফুট দেখা যায়। জৈন ন্যায়-গ্রন্থ "পরীক্ষা-মুখসূত্রে" আছে—"ব্যাপ্তৌ তু সাধ্যং ধর্ম্ম এব" (৩২ সূত্র)। অর্থাৎ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের সময়ে ধর্ম্মরূপ সাধ্যই গ্রাহ্য। কারণ, ধর্ম্মীরূপ সাধ্যের ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে না। ফলতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয়কালে ধর্ম্মরূপ সাধ্যই যে গ্রাহ্য, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। নব্যগণ বলিয়াছেন যে, যখন সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় বশতঃই অনুমিতি হয়, তখন সাধ্য ধর্ম্মেরই অনুমিতি হয়। হেতুকে যাহার ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিয়া অনুমিতি হয়, সেই পদার্থই অনুমিতির বিধেয়[২] এবং পর্ব্বতে

লিঙ্গস্যাব্যভিচারস্তু ধর্ম্মেণান্যত্র দৃশ্যতে।
তত্র প্রসিদ্ধং তদ্যুক্তং ধর্ম্মিণং গময়িষ্যতি।—প্রমাণসমুচ্চয়, ২য় পরিচ্ছেদ।

১। "তস্মাদ্ধর্ম্মবিশিষ্টস্য ধর্ম্মিণঃ স্যাৎ প্রমেয়তা। সাদেশস্যাগ্নিযুক্তস্য।"—
মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক, অনুমান পরিচ্ছেদ।

২। "যদ্ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানজন্যত্বমনুমিতৌ তদংশ এব বিধেয়তাখ্যবিষয়তাস্বীকারাৎ"—(পক্ষতাবিচারে জাগদীশী)।

বহ্নিকে অনুমান করিতেছি, এইরূপই শেষে মানস অনুভব হওয়ায় পর্ব্বত ধর্ম্মীতে বহ্নিরূপ ধর্ম্মই অনুমেয়, সুতরাং উহাই সাধ্য। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেও "সাধ্য" বলিয়াছেন। কারণ, মহর্ষি-সূত্রে ঐ অর্থেও "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ আছে। এ সকল কথা যথাস্থানে (অবয়ব প্রকরণে) দ্রষ্টব্য। উদ্দ্যোতকর যে হেতুকেই সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অনুমেয় বলিয়াছেন অর্থাৎ "এই ধূমবিশেষ বহ্নিযুক্ত" এইরূপই অনুমিতি হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা কিন্তু সূত্রকার ও ভাষ্যকারের কথায় কোথায়ও পাওয়া যায় না। এবং এই মত লোক-বিরুদ্ধ বলিয়া উদ্দ্যোতকরও আপত্তির উত্থাপন পূর্ব্বক তাহারও সমাধান করিতে গিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশিষ্ট ধূমের দ্বারা পর্ব্বতাদি স্থানে বহ্নিরই অনুমিতি হয়, এই নব্য মতই লোকসিদ্ধ ও অনুভব-সিদ্ধ। অনুমিতির পূর্ব্বে বহ্নি অন্যত্র সিদ্ধ হইলেও পর্ব্বতাদি ধর্ম্মীতে অসিদ্ধ থাকায় ঐ সকল স্থানে বহ্নি অনুমানের সাধ্য হইতে পারে, ইহাই নব্য নৈয়ায়িকদিগের কথা। ভাষ্যকারও কএক স্থানে সাধ্যধর্ম্মরূপ লিঙ্গীরই অনুমানের কথা বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ অনুমানের মূল; সুতরাং প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরেই অনুমান নিরূপণ সংগত। এই সংগতি সূচনার জন্যই সূত্রে "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "অনুমান-চিন্তামণি"র প্রারম্ভে উপাধ্যায় গঙ্গেশ মহর্ষি-সূচিত এই সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সেখানে দীধিতিকার রঘুনাথ ও তাহার টীকাকার গদাধর এই সংগতির বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই সংগতি বিষয়ে কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সূত্রে "অনুমানং" এই অংশের দ্বারা লক্ষ্যনির্দ্দেশ হইয়াছে। "তৎপূর্ব্বকং" এই অংশের দ্বারা অনুমান প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। অন্য অংশের দ্বারা অনুমান প্রমাণের বিভাগ করা হইয়াছে।

ভাষ্য। তৎপূর্ব্বকমিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গ-দর্শনঞ্চাভিসম্বধ্যতে। লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বদ্ধয়োর্দ্দর্শনেন লিঙ্গস্মৃতিরভি-সম্বধ্যতে। স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোঽর্থোঽনুমীয়তে।

অনুবাদ। "তৎপূর্ব্বক" এই কথার দ্বারা অর্থাৎ সূত্রস্থ "তৎপূর্ব্বকং" এই কথার আদিস্থিত "তৎ" শব্দটির দ্বারা "লিঙ্গ"ও "লিঙ্গী"র (হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের) সম্বন্ধ দর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গদর্শন (হেতুর প্রত্যক্ষ) অভিসম্বদ্ধ অর্থাৎ সূত্রকারের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত হইয়াছে। সম্বদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতু ও সাধ্য-ধর্ম্মের) দর্শনের দ্বারা লিঙ্গস্মৃতি অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া হেতুর স্মরণ অভিসম্বদ্ধ (সূত্রকারের অভিপ্রেত) হইয়াছে। স্মৃতির দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গস্মৃতির দ্বারা এবং লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ "এই হেতু এই সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য" এইরূপে হেতু স্মরণের পরে "এই স্থানে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতু আছে", এইরূপে

যে তৃতীয় লিঙ্গদর্শন হয়, সেই "লিঙ্গপরামর্শ" নামক জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অনুমিত হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতিরও স্বরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমিতিকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেখানে পূর্ব্বে কোন পদার্থ বলিয়া শেষে "তৎ" শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেখানে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পদার্থ বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পদার্থমাত্রই "তৎ" শব্দের বাচ্য নহে। যে পদার্থ বক্তার বুদ্ধিস্থ, "তৎ" শব্দের দ্বারা সেখানে সেই পদার্থকেই বুঝিতে হইবে। কোন্ পদার্থ বক্তার বুদ্ধিস্থ, তাহাও বুঝিয়া লইতে হইবে। বক্তা মহর্ষি পূর্ব্ব-সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমিতি মাত্রকেই বলিয়াছেন, কিন্তু অনুমানপ্রমাণ যখন প্রত্যক্ষমাত্রপূর্ব্বক নহে, তখন এই সূত্রে "তৎপূর্ব্বকং" এই কথার আদিস্থিত "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ সামান্যই গ্রহণ করা যায় না। তাহা সম্ভব নহে বলিয়া মহর্ষির এখানে বুদ্ধিস্থ নহে। অনুমান প্রমাণ যেরূপ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যক্ষবিশেষকেই মহর্ষি এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। যে কোন প্রত্যক্ষপূর্ব্বক জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিলে শব্দ শ্রবণাদিরূপ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক শাব্দ বোধ প্রভৃতি জ্ঞান ও অনুমান-প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষ প্রত্যক্ষই মহর্ষি এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই বিশেষ প্রত্যক্ষ কি? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ।" শাব্দ বোধ প্রভৃতি জ্ঞান ঐ বিশেষ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক নহে, তাই অনুমান নহে। ঐ দুইটি বিশেষ প্রত্যক্ষজন্য যে সংস্কার হয়, তাহাও ঐ প্রত্যক্ষ-বিশেষপূর্ব্বক বলিয়া অনুমান-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাই পূর্ব্বসূত্র হইতে "জ্ঞানং" এই কথাটির অনুবৃত্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে ("তৎপূর্ব্বকং জ্ঞানং"), তৎপূর্ব্বক জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। সংস্কার জ্ঞানপদার্থ নহে; সুতরাং তাহা অনুমান-লক্ষণাক্রান্ত হইল না। অনুমাপক হেতুকে "লিঙ্গ" বলে। তাহা যে পদার্থের "লিঙ্গ", সেই সাধ্যধর্ম্মটিকে "লিঙ্গী" বলে। যেমন বহ্নি "লিঙ্গী", বিশিষ্ট ধূম তাহার "লিঙ্গ"। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ, তাহাই অনুমানের অঙ্গ; সুতরাং ভাষ্যে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কথার দ্বারা ঐ সম্বন্ধবিশেষই উক্ত হইয়াছে। সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকিয়া সাধ্যশূন্য স্থানে হেতুর অবর্ত্তমানতা বা না থাকাই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিবিশিষ্টকে "ব্যাপ্য" বলে। সেটি যাহার ব্যাপ্য, তাহাকে "ব্যাপক" বলে। যেমন বিশিষ্ট ধূম (লিঙ্গ) "ব্যাপ্য",—বহ্নি (লিঙ্গী) তাহার "ব্যাপক।" বহ্নিশূন্য কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধূম অর্থাৎ যে ধূম তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে একেবারে বিচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে যায় নাই, তাহা থাকে না, থাকিতেই পারে না; সুতরাং তাহা বহ্নির ব্যাপ্য, বহ্নি তাহার ব্যাপক। বিশিষ্ট ধূম ও বহ্নির এই ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রথমতঃ রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সঙ্গে বিশিষ্ট ধূমের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রথম লিঙ্গদর্শন (হেতু প্রত্যক্ষ)

স্থানে বিশিষ্ট ধূম দর্শন হইলে তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গ-দর্শন। এই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনই ভাষ্যে "লিঙ্গদর্শনঞ্চ" এই কথার দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। বিশিষ্ট ধূম ও বহ্নির পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ দর্শন এবং পর্ব্বতাদিতে দ্বিতীয় বিশিষ্ট ধূম দর্শন, এই দুইটি প্রত্যক্ষবশতঃ শেষে পর্ব্বতাদিতে 'বহ্নিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধূমবান্ পর্ব্বত' ইত্যাদি প্রকারে পুনরায় লিঙ্গদর্শন হয়, ইহাই তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। এবং ইহাই "তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ", "লিঙ্গপরামর্শ" ও "পরামর্শ" নামে অভিহিত হয়। ঐ পরামর্শ নামক জ্ঞানের পরেই "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদি প্রকারে পর্ব্বতাদি স্থানে বহ্নির অনুমিতি হয়; সুতরাং উহাই ঐ অনুমিতির চরম কারণ। প্রাচীন মতে চরম কারণই মুখ্য করণ-পদার্থ (তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তাই পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে অনুমিতির চরম-কারণ পরামর্শকেই মুখ্য "অনুমান প্রমাণ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিককারের শেষ সিদ্ধান্তও এই। বস্তুতঃ ঐ তৃতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষরূপ পরামর্শ নামক জ্ঞান পূর্ব্বোৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়-জনিত। সুতরাং উহাই সূত্রোক্ত "তৎপূর্ব্বক জ্ঞান", তাই সূত্রানুসারেও উহা অনুমানপ্রমাণ হইবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব সম্বন্ধ-দর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন, পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের পূর্ব্বেই বিনষ্ট হয়; সুতরাং সেই প্রত্যক্ষদ্বয় ঐ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের কারণ হইতে পারে না। তাই বলিয়াছেন—"লিঙ্গস্মৃতিরভিসম্বধ্যতে।" অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষদ্বয় পূর্ব্বে বিনিষ্ট হইলেও তজ্জন্য যে সংস্কার থাকে, তাহাই উদ্বুদ্ধ হইয়া তখন "বহ্নিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধূম" ইত্যাদিরূপে লিঙ্গস্মৃতি জন্মায়। ঐ লিঙ্গস্মৃতির সাহায্যে 'বহ্নিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাদি প্রকার তৃতীয় লিঙ্গ প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং ঐ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমান প্রমাণ সূত্রোক্ত "তৎপূর্ব্বক জ্ঞান" হইতে পারে অর্থাৎ এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি তাহাকে "তৎপূর্ব্বক জ্ঞান" বলিয়াছেন। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব্ব, তাই কারণার্থে "পূর্ব্ব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যাহা পরম্পরায় বা অতি পরম্পরায় আবশ্যক, তাহাকেও কারণের কারণ বলিয়া "পূর্ব্ব" বলা হইয়া থাকে। ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, 'তানি পূর্ব্বাণি যস্য', 'তে পূর্ব্বে যস্য', 'তৎ পূর্ব্বং যস্য'—এই ত্রিবিধ বিগ্রহসিদ্ধ "তৎপূর্ব্বক" শব্দের তিন বার আবৃত্তি করিয়া উহার দ্বারা ত্রিবিধ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। 'তানি পূর্ব্বাণি যস্য' এই বিগ্রহ পক্ষে "তৎ" শব্দের দ্বারা তৃতীয় সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণই গ্রাহ্য। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি পূর্ব্বক যে কোন প্রমাণ জন্য লিঙ্গ-পরামর্শও অনুমান-প্রমাণ, ইহাও "তৎ পূর্ব্বক" শব্দের দ্বারা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অনুমানাদি পূর্ব্বক অনুমান-প্রমাণেও মহর্ষির এই অনুমান-প্রমাণের লক্ষণ অব্যাহত আছে, তবে পরম্পরায় সকল অনুমান-প্রমাণই প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, অনুমানের মূলে প্রত্যক্ষ আছেই, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার কেবল প্রত্যক্ষবিশেষপূর্ব্বক জ্ঞান বলিয়াই অনুমান-প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হয় নাই। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, "তে পূর্ব্বে যস্য"; এই বিগ্রহ পক্ষেও "তৎ" শব্দের দ্বারা অনুমানাদিও বুঝিতে হইবে। ন্যায়বার্ত্তিকে "তে দ্বে প্রত্যক্ষে পূর্ব্বে যস্য" এই বাক্যে প্রত্যক্ষ শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা যে কোনরূপে যথার্থ লিঙ্গপরামর্শ হইলেই তাহা যথার্থ অনুমিতি

জন্মাইয়া থাকে ; সুতরাং তাহা অনুমান-প্রমাণ। "তৎপূর্ব্বং যস্য" এই বিগ্রহপক্ষে "তৎ" শব্দের দ্বারা ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার লিঙ্গস্মৃতি এই তিনটিকে এক সঙ্গে ধরিয়া তজ্জনিত লিঙ্গপরামর্শ ই অনুমান-প্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। ঐ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইলেও উহাদিগের ভেদ বিবক্ষা না করিয়াই "তৎ" শব্দের দ্বারা এক সঙ্গে ঐ তিনটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাষ্য। পূর্ব্ববদিতি যত্র কারণেন কার্য্যমনুমীয়তে যথা মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি। "শেষবৎ" তৎ যত্র কার্য্যেণ কারণমনুমীয়তে, পূর্ব্বোদকবিপরীতমুদকং নদ্যাঃ পূর্ণত্বং শীঘ্রত্বঞ্চ দৃষ্ট্বা স্রোতসোঽনুমীয়তে ভূতা বৃষ্টিরিতি। "সামান্যতো দৃষ্টং" ব্রজ্যাপূর্ব্বকমন্যত্রদৃষ্টস্যান্যত্র দর্শনমিতি তথা চাদিত্যস্য, তস্মাদস্ত্যপ্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যস্য ব্রজ্যেতি।

অনুবাদ। যে স্থলে (যে অনুমানস্থলে) কারণের দ্বারা (কারণবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা) কার্য্য (সেই কারণের ব্যাপক কার্য্য) অনুমিত হইয়া থাকে, সেই অনুমান "পূর্ব্ববৎ" এই নামে কথিত। (উদাহরণ) যেমন মেঘের উন্নতি-বিশেষের দ্বারা (তাহার জ্ঞানের দ্বারা) বৃষ্টি হইবে, ইহা অনুমিত হয়। যে স্থলে কার্য্যের দ্বারা (কার্য্যবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা) কারণ (সেই কার্য্যের ব্যাপক কারণ) অনুমিত হইয়া থাকে, সেই অনুমান "শেষবৎ"। (উদাহরণ) যেমন নদীর পূর্ব্বস্থিত জলের বিপরীত জলরূপ পূর্ণতা এবং স্রোতের প্রখরতা-বিশেষ দেখিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয়। অন্যত্র দৃষ্ট পদার্থের অন্যত্র অর্থাৎ অপর স্থানে দর্শন ব্রজ্যাপূর্ব্বক, অর্থাৎ তাহার গতিপূর্ব্বক হয় ; সূর্য্যেরও তদ্রূপ, অর্থাৎ এক স্থানে দৃষ্ট সূর্য্যের স্থানান্তরে দর্শন হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও অর্থাৎ সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষ না হইলেও সূর্য্যের গতি আছে, এই প্রকার অনুমান "সামান্যতো দৃষ্ট"।

টিপ্পনী। অনুমান-প্রমাণের "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি সূত্রোক্ত প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতেছেন। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কারণটি "পূর্ব্ব", কার্য্যটি "শেষ", তাই "পূর্ব্ব" শব্দ কারণার্থে এবং "শেষ" শব্দ কার্য্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "পূর্ব্ববৎ" ও "শেষবৎ" এই দুই স্থলে অস্ত্যর্থে "মতুপ্" প্রত্যয় বিহিত হইলে "পূর্ব্ব" অর্থাৎ কারণ যাহাতে বিষয়রূপে বিদ্যমান এবং "শেষ" অর্থাৎ কার্য্য যাহাতে বিষয়রূপে বিদ্যমান, এইরূপ অর্থ যথাক্রমে ঐ দুইটি শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে "পূর্ব্ববৎ" বলিতে কারণ-বিষয়ক জ্ঞান এবং "শেষবৎ" বলিতে কার্য্য-বিষয়ক জ্ঞান, ইহা বুঝা যায়। কারণহেতুক অনুমান কারণবিষয়ক জ্ঞানবিশেষ এবং কার্য্যহেতুক অনুমান কার্য্যবিষয়ক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং এ পক্ষে কারণহেতুক অনুমান ও কার্য্যহেতুক

অনুমানই যথাক্রমে "পূর্ব্ববৎ" ও "শেষবৎ" এই দুইটি নামের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কার্য্যমাত্রই কারণের অনুমাপক নহে। ধূমমাত্রই বহ্নির কার্য্য হইলেও যে কোন ধূমজ্ঞানে বহ্নির অনুমান হয় না। কারণ, বহ্নি ধূমমাত্রের ব্যাপক নহে, বিশিষ্ট ধূমেরই ব্যাপক। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও 'হেত্বাভাসসামান্যনিরুক্তিদীধিতি' গ্রন্থে বিশিষ্ট ধূমকেই বহ্নির অনুমানে "সৎ হেতু" বলিয়াছেন। ফলতঃ কার্য্যবিশেষই তাহার ব্যাপক কারণের অনুমাপক এবং কারণ-বিশেষই তাহার ব্যাপক কার্য্যের অনুমাপক। এবং ঐ কার্য্যবিশেষ এবং কারণ-বিশেষের জ্ঞানের দ্বারাই অনুমিতি হয়। কার্য্য ও কারণ পদার্থের দ্বারা অনুমিতি হয় না। সুতরাং—"যত্র কারণেন কার্য্যমনুমীয়তে" এবং "যত্র কার্য্যেণ কারণমনুমীয়তে," এই ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা সেইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। মেঘের উন্নতি-বিশেষ বৃষ্টির কারণ এবং নদীর পূর্ণতা-বিশেষ ও স্রোতের প্রখরতা-বিশেষ বৃষ্টির কার্য্য। ভাষ্যে "পূর্ব্ববদিতি" এই স্থলের "ইতি" শব্দটি নামব্যঞ্জক। যেখানে প্রকৃতসাধ্য ব্যক্তি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন হেতুতেই তাহার ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়-বশতঃ তাহার অনুমিতি হয়—সেই স্থলীয় অনুমানের নাম "সামান্যতো দৃষ্ট।" সূর্য্যের গতি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং তাহার ব্যাপ্তিনিশ্চয় কোনও পদার্থেই সম্ভব নহে। কিন্তু সামান্যতঃ দেখা যায়, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের অন্য স্থানে দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না। এক স্থানে দৃষ্ট সূর্য্যের অন্য স্থানে দর্শন হইতেছে, সুতরাং সূর্য্য গতিমান্। এইরূপ অনুমান সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়-জন্য। ন্যায়বার্ত্তিককার ভাষ্যকারের এই অনুমানে দোষ প্রদর্শন করিয়া প্রকারান্তরে অনুমান-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও ইহার পরেই কল্পান্তরে অন্যরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাষ্য। অথবা পূর্ব্ববদিতি যত্র যথাপূর্ব্বং প্রত্যক্ষভূতয়োরন্যতর-দর্শনেনান্যতরস্যাপ্রত্যক্ষস্যানুমানং, যথা ধূমেনাগ্নিরিতি।

অনুবাদ। অথবা যে স্থলে (যে অনুমান স্থলে) যথাপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ভূতপদার্থ-দ্বয়ের—অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে যে দুইটি পদার্থ যেরূপে প্রত্যক্ষ বা প্রমাণা-ন্তরের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছিল, ব্যাপ্যব্যাপকভাব-সম্বন্ধযুক্ত সেই দুইটি পদার্থের একতর পদার্থ দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ কোন স্থানে সেই পূর্ব্বজ্ঞাত ব্যাপ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থটির সেইরূপে প্রত্যক্ষ বা যে কোন প্রমাণ-জন্য জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ (অনুমিতি স্থানে অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত) অপর পদার্থটীর অনুমিতি হয় অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে ব্যাপক পদার্থটি যেরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, সেইরূপে তাহার সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হয়; সেই অনুমান "পূর্ব্ববৎ" এই নামে কথিত। (উদাহরণ) যেমন ধূমের দ্বারা অর্থাৎ রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের

সজাতীয় পর্ব্বতাদিগত বিশিষ্ট-ধূমের বিশিষ্ট ধূমত্বরূপে জ্ঞানের দ্বারা অগ্নি (রন্ধন-শালা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট অগ্নির সজাতীয় পর্ব্বতাদিস্থিত বহ্নি) অনুমিত হয় (অর্থাৎ রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকত্বজ্ঞানকালে বহ্নি যে প্রকারে ব্যাপক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল, সেই বহ্নিত্ব প্রকারেই তাহা পর্ব্বতাদি স্থানে অনুমিত হয়)।

টিপ্পনী। "পূর্ব্ববৎ" শব্দটি অস্ত্যর্থে "মতুপ্" প্রত্যয় ও ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে "বতি" প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। "বতি" প্রত্যয়পক্ষে "পূর্ব্ববৎ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বতুল্য। ভাষ্যকার কল্পান্তরে সূত্রোক্ত "পূর্ব্ববৎ" শব্দের এই অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—যে স্থলে পূর্ব্বে অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ জ্ঞানকালে হেতু ও সাধ্য যেরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, সেইরূপে সেই পূর্ব্বজ্ঞাত হেতুর তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের কোন স্থানে সেইরূপে জ্ঞান হইলে সেই পূর্ব্বজ্ঞাত সাধ্যের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের সেইরূপে অনুমিতি হয়, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণ পূর্ব্বতুল্য বলিয়া "পূর্ব্ববৎ" নামে কথিত। রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে যে ধূম ও যে বহ্নি দেখিয়া বিশিষ্ট ধূম মাত্রেই বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে, পর্ব্বতের ধূম ও বহ্নি সে ধূম ও সেই বহ্নি নহে। কিন্তু বিশিষ্ট ধূমত্বরূপে পর্ব্বতের ধূম সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের তুল্য বা সজাতীয়। এবং বহ্নিত্বরূপে পর্ব্বতের বহ্নি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বহ্নির তুল্য বা সজাতীয়। সুতরাং পর্ব্বতে পূর্ব্বজ্ঞাত বিশিষ্ট ধূমের সজাতীয় বিশিষ্ট ধূমের জ্ঞানবশতঃ যখন পূর্ব্বজ্ঞাত বহ্নির সজাতীয় বহ্নির সেই বহ্নিত্ব-রূপেই অনুমিতি হয়, তখন সেই স্থলের "লিঙ্গপরামর্শ"রূপ অনুমান "পূর্ব্ববৎ"। রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে ধূমদর্শন এবং পর্ব্বতে ধূমদর্শন, একপদার্থবিষয়ক না হইলেও তুল্য বা সজাতীয় পদার্থবিষয়ক ; সুতরাং ঐ উভয় দর্শন-ক্রিয়াতেও তুল্যতা আছে। এ জন্য পূর্ব্বোক্ত "পরামর্শ"রূপ অনুমানপ্রমাণ ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে "বতি"প্রত্যয়ান্ত "পূর্ব্ববৎ"শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে। ভাষ্যে "যথাপূর্ব্বং প্রত্যক্ষভূতয়োঃ" এই স্থলে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষভূত" কথাটা প্রদর্শন মাত্র। যে কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের এবং অনুমিতির আশ্রয়ে পূর্ব্বজ্ঞাত ব্যাপ্য পদার্থটির সজাতীয় পদার্থের অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞান হইলেও "পূর্ব্ববৎ" অনুমান হইতে পারে। পূর্ব্বে যেরূপে ব্যাপ্যতা ও ব্যাপকতার জ্ঞান হইয়াছিল, সেইরূপে ব্যাপ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের জ্ঞানবশতঃ সেইরূপে ব্যাপক পদার্থটির সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হইলেই "পূর্ব্ববৎ" অনুমান হয়।

ভাষ্য। শেষবন্নাম পরিশেষঃ, স চ প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ—যথা "সদনিত্যমিত্যেবমাদিনা দ্রব্যগুণকর্ম্মণা-মবিশেষেণ সামান্যবিশেষসমবায়েভ্যো নির্ভক্তস্য, শব্দস্য তস্মিন্ দ্রব্যকর্ম্ম-গুণসংশয়ে ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম্ম, শব্দান্তরহেতুত্বাৎ, যস্তু শিষ্যতে সোঽয়মিতি শব্দস্য গুণত্বপ্রতিপত্তিঃ।

অনুবাদ। "পরিশেষ" অনুমানের নাম "শেষবৎ"। সেই "পরিশেষ" বলিতে প্রসক্তের অর্থাৎ যে পদার্থ কোন স্থানে সন্দেহের বিষয় বা আপত্তির বিষয় হয়, এমন পদার্থের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা সে স্থানে তাহার অভাব নিশ্চয় হইলে অন্যত্র অপ্রসঙ্গবশতঃ অর্থাৎ যে পদার্থ প্রসক্ত হয় না, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তিবিষয়তা না থাকায়, শিষ্যমাণ পদার্থে অর্থাৎ প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে যেটি অবশিষ্ট থাকে, প্রতিষিদ্ধ হয় না, এমন পদার্থ বিষয়ে "সম্প্রত্যয়"—অর্থাৎ সম্যক্ প্রতীতির (যথার্থ অনুমিতির) সাধন। (উদাহরণস্থল দেখাইতেছেন) যেমন—সত্তা ও অনিত্যত্ব ইত্যাদি প্রকার দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের অবিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মনামক কণাদসূত্রোক্ত পদার্থত্রয়ের "সদনিত্যং" ইত্যাদি কণাদসূত্র (বৈশেষিক দর্শন, ৮ম সূত্র) বর্ণিত সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা জাতি, বিশেষ ও সমবায় হইতে (কণাদোক্ত জাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য ভাব-পদার্থ হইতে) "নির্ভক্ত" অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত শব্দের—(শব্দের কি, তাহা বলিতেছেন) তাহাতে অর্থাৎ শব্দে (পূর্ব্বোক্ত সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানবশতঃ) দ্রব্যকর্ম্মগুণ সংশয় হইলে অর্থাৎ শব্দ দ্রব্য কি না ? কর্ম্ম কি না ? গুণ কি না ? এইরূপে শব্দে দ্রব্যত্ব, কর্ম্মত্ব ও গুণত্বের সংশয় হইলে শব্দ—একদ্রব্যত্ব-হেতুক অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য আকাশের ধর্ম্ম বলিয়া দ্রব্য নহে; শব্দ—শব্দান্তরের কারণত্ব-হেতুক অর্থাৎ সজাতীয়ের উৎপাদক বলিয়া কর্ম্ম নহে; যাহা কিন্তু অর্থাৎ দ্রব্য, কর্ম্ম ও গুণের মধ্যে যে পদার্থটি অবশিষ্ট থাকিল, এই শব্দ তাহা অর্থাৎ গুণ, এইরূপে ("শেষবৎ" অনুমানের দ্বারা) শব্দের গুণত্ব প্রতিপত্তি অর্থাৎ গুণত্ব সিদ্ধি হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। 'শিষ্যতে অবশিষ্যতে' এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ প্রসক্তের মধ্যে যেটি কোন প্রমাণের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হয় না, এমন পদার্থকে "শেষ" বলা যায়। "শেষঃ অস্তি অস্য অনুমানস্য প্রতিপাদ্যতয়া" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পূর্ব্বোক্ত "শেষ" পদার্থটি যে অনুমানের প্রতিপাদ্য, তাহাকে "শেষবৎ" অনুমান বলা যায়। ভাষ্যকার এই কল্পে সূত্রোক্ত "শেষবৎ" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই শেষবৎ অনুমানের আর একটি প্রসিদ্ধ নাম "পরিশেষ।" তাই বলিয়াছেন—"শেষবন্নাম পরিশেষঃ"। ঐ "পরিশেষ" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিলেই 'শেষবৎ' অনুমানকে বুঝা যাইবে। তাই বলিয়াছেন—'স চ প্রসক্তপ্রতিষেধে' ইত্যাদি। "পরিশেষ" অনুমানের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া—"যথা সদনিত্যং" ইত্যাদি "নির্ভক্তস্য শব্দস্য" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের গুণত্ব-সাধক অনুমানকে তাহার উদাহরণরূপে সূচনা করিয়াছেন। "তস্মিন্ দ্রব্যকর্ম্মগুণসংশয়ে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই গুণত্ব-সাধক "শেষবৎ" অনুমানের প্রণালী

প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ উদাহরণটি বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায়, এই যে ছয়টি ভাব-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার মতে শব্দ গুণপদার্থ, ইহা "শেষবৎ" অনুমানের দ্বারাই বুঝা যায়। কারণ, মহর্ষি কণাদ "সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিতি দ্রব্যগুণ-কর্ম্মণামবিশেষঃ" (৮ম সূত্র) এই সূত্রটির দ্বারা সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের অবিশেষ অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য বলিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মগুলি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মপদার্থেই থাকে, জাতি, বিশেষ, সমবায় এই তিন পদার্থে থাকে না। ঐ ধর্ম্মগুলি ঐ জাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্ম্য। সুতরাং ঐ সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যগুলি যে পদার্থে আছে, ইহা যথার্থরূপে বুঝা যাইবে, সে পদার্থে জাতিত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্বের প্রসক্তিই হইবে না, অর্থাৎ ঐ পদার্থটি জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিতই থাকিবে। শব্দ নানাজাতীয় সংপদার্থ, এবং তাহার অনিত্যত্ব প্রভৃতিও কণাদের সমর্থিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সত্তা অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্যগুলি যখন কণাদের মতে শব্দে আছে, তখন শব্দ জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু শব্দে পূর্ব্বোক্ত সত্তা, অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য থাকায়, তাহাতে দ্রব্যত্ব, কর্ম্মত্ব ও গুণত্ব "প্রসক্ত" হইতেছে। অর্থাৎ শব্দে পূর্ব্বোক্ত সত্তা, অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধারণধর্ম্মের জ্ঞানবশতঃ শব্দ দ্রব্য কি না? শব্দ কর্ম্ম কি না? শব্দ গুণ কি না? এইরূপে শব্দে দ্রব্যত্ব, কর্ম্মত্ব ও গুণত্বের সংশয় হইতেছে। এখন যদি শব্দ দ্রব্য নহে এবং কর্ম্ম নহে, ইহা যথার্থরূপে বুঝা যায়, তাহা হইলে শব্দ গুণপদার্থ, ইহা নিশ্চিত হইয়া যায়। ফলতঃ তাহাই হইতেছে। কারণ, শব্দ আকাশে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আকাশই শব্দের উপাদান কারণ, ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। আকাশ দ্রব্যপদার্থ এবং এক। সুতরাং শব্দ একমাত্র দ্রব্যসমবেত। অর্থাৎ আকাশনামক একটিমাত্র দ্রব্যই শব্দের উপাদান কারণ; সুতরাং বুঝা গেল, শব্দ দ্রব্যপদার্থ নহে। কারণ, দ্রব্য-পদার্থের উপাদান কারণ একটিমাত্র দ্রব্য হইতে পারে না, একাধিক দ্রব্যেই জন্য-দ্রব্যগুলি গঠিত হয়। ভাষ্যে "একদ্রব্যত্বাৎ" এই স্থলে "একং দ্রব্যং (সমবায়িতয়া) যস্য" এইরূপ বিগ্রহে "একদ্রব্যত্ব" কথার দ্বারা একমাত্র দ্রব্যসমবেতত্ব অর্থই বুঝিতে হইবে। এবং শব্দ কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়াপদার্থও নহে। কারণ, শব্দ শব্দান্তরের উৎপাদক। ভাষ্যে "শব্দান্তরহেতুত্বাৎ" এই কথার দ্বারা সজাতীয় পদার্থের উৎপাদকত্ব হেতুই সূচিত হইয়াছে। উদ্যোতকর প্রভৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। কারণ, সজাতীয়োৎপাদকত্ব-হেতুই শব্দে কর্ম্মত্বাভাবের অনুমাপক হয়। প্রথম উৎপন্ন শব্দ তাহার সজাতীয় শব্দান্তর জন্মায়, সেই দ্বিতীয় শব্দটি আবার তাহার সজাতীয় শব্দান্তর জন্মায়, এইরূপে বীচিতরঙ্গের ন্যায় শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তানুসারে শব্দ সজাতীয়ের উৎপাদক। এই সজাতীয়োৎপাদকত্ব কর্ম্মপদার্থে নাই। কারণ, কণাদের মতে উহা দ্রব্য ও গুণপদার্থেরই সাধর্ম্ম্য। কণাদ বলিয়াছেন,—"দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্"। "দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্"। "কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং

ন বিদ্যতে"। ৯।১০।১১ সূত্র। কর্ম্মকে কর্ম্মান্তরের উৎপাদক বলা যায় না। কারণ, ক্রিয়া-মাত্রই বিভাগজনক। বিভাগ না জন্মাইলে তাহাকে কর্ম্ম বলা যায় না। যখন প্রথম ক্রিয়াই বিভাগ জন্মাইয়াছে. তখন ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় ক্রিয়া স্বীকার করিলে তাহা আবার কিসের সহিত বিভাগ জন্মাইবে ? সংযুক্ত পদার্থেরই বিভাগ হইয়া থাকে, বিভক্তের আবার বিভাগ কি ? এই যুক্তি অনুসারে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন,—কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের উৎপাদক নহে। সুতরাং সজাতীয়োৎ-পাদকত্ব কর্ম্মে নাই। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে শব্দে উহা আছে ; সুতরাং শব্দ কর্ম্ম নহে। শব্দ কর্ম্ম হইলে সজাতীয় শব্দান্তর জন্মাইত না। এইরূপে অনুমানের দ্বারা শব্দে "প্রসক্ত" দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্বের "প্রতিষেধ" অর্থাৎ অভাব নিশ্চয় হইলে "অন্যত্র" অর্থাৎ জাতিত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্বে "অপ্রসঙ্গ"-বশতঃ অর্থাৎ প্রসক্তি না থাকায় প্রসক্ত দ্রব্যত্ব, কর্ম্মত্ব ও গুণত্বের মধ্যে কেবল গুণত্বই "শিষ্যমাণ" অর্থাৎ "শেষ" থাকিল। শব্দের গুণত্ব-প্রতিষেধক কোন প্রমাণও নাই, সুতরাং শব্দ গুণপদার্থ, ইহা যথার্থরূপে বুঝা গেল। এইরূপে শব্দে গুণত্বরূপ "শেষ" পদার্থ-বিষয়ক যে অনুমিতি, তাহার করণ লিঙ্গপরামর্শকে "শেষ" পদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া ভাষ্যকার "শেষবৎ" অনুমানের উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, "শেষবৎ" অনুমানের ভাষ্যোক্ত এই উদাহরণ আদরণীয় নহে। কারণ, "শেষবৎ" ও "পরিশেষ" "ব্যতিরেকী" অনুমানেরই নামান্তর। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উদাহরণটি "ব্যতিরেকী" অনুমান নহে ; ঐটি "অন্বয়-ব্যতিরেকী"। তাৎপর্য্য-টীকাকার পরে "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তেও "শেষবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "প্রসক্ত প্রতিষেধে" ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু ভাষ্যকারের এই উদাহরণটি সেখানেও গ্রহণ করেন নাই। "অন্বয়ী", "ব্যতিরেকী" এবং "অন্বয়-ব্যতিরেকী" এই ত্রিবিধ নামেও অনুমান ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই ত্রিবিধ নামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেও ঐ তিনটি নাম তাঁহাদিগেরই আবিষ্কৃত নহে। পরমপ্রাচীন উদ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে" সূত্রোক্ত "ত্রিবিধং" এই কথার ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ "অন্বয়ী ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ" এইরূপ বিভাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের ব্যাখ্যা "অবয়ব" পদার্থের ব্যাখ্যাস্থলে প্রকটিত হইবে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে "পরিশেষ" অনুমানকেই "শেষবৎ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রসক্তের মধ্যে যেটি শেষ থাকে, সেই শেষ পদার্থের প্রতিপাদক অনুমানই "পরিশেষ", তাহাই "শেষবৎ"[১]।

ভাষ্য। সামান্যতো দৃষ্টং নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে কেনচিদর্থেন লিঙ্গস্য সামান্যাদপ্রত্যক্ষো লিঙ্গী গম্যতে, যথেচ্ছাদিভিরাত্মা, ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ, তদ্‌যদেষাং স্থানং স আত্মেতি।

১। "পরিশেষ" শব্দটি মহর্ষি গোতমের সূত্রেও পাওয়া যায়। "পরিশেষাদ্‌যথোক্তহেতূপপত্তেশ্চ"। ৩,২।৪১ সূত্র। এই সূত্রে "পরিশেষ" শব্দের দ্বারা মহর্ষি যে প্রকার অনুমান-প্রমাণ সূচনা করিয়াছেন, ভাষ্যকার সূত্রানুসারে তাহা লক্ষ্য করিয়া এখানে "শেষবৎ" অনুমানের ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা মনে হয়।

অনুবাদ। যে স্থলে (যে অনুমানস্থলে) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (প্রকৃত হেতু ও প্রকৃত সাধ্যের) সম্বন্ধ (পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাপ্যব্যাপকভাবসম্বন্ধ) অপ্রত্যক্ষ হইলে (লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলে) কোন পদার্থের সহিত (ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞায়মান যে কোন পদার্থের সহিত) লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃত হেতুর সমানতা প্রযুক্ত (সেই লিঙ্গের দ্বারা) "অপ্রত্যক্ষ" অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য "লিঙ্গী" (সাধ্য) অনুমিত হয়, সেই অনুমানের নাম "সামান্যতো দৃষ্ট"। (উদাহরণ) যেমন ইচ্ছাদির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। (কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন) ইচ্ছা প্রভৃতি পদার্থ গুণ, (গুণপদার্থ), গুণগুলি আবার দ্রব্যাশ্রিত ; অতএব ইহাদিগের অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের যাহা আশ্রয়, তাহা আত্মা।

টিপ্পনী। "পূর্ব্ববৎ" অনুমানের সাধ্য বহ্নি প্রভৃতি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে; সুতরাং ধূম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্থের সহিত তাহার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু যে পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন পদার্থের সহিতই তাহার ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ;– যেমন ইন্দ্রিয় ও আত্মা প্রভৃতি পদার্থ। দেহাদি হইতে বিভিন্ন আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে; সুতরাং ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও তাহার সহিত ঐ আত্মার ব্যাপ্য ব্যাপকভাব-সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যাহা গুণ-পদার্থ, তাহা দ্রব্যাশ্রিত অর্থাৎ কোন দ্রব্যে থাকে ; এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থের সহিত দ্রব্যাশ্রিতত্বের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। তাহার ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু তাহারা গুণপদার্থ; এইরূপে ইচ্ছাদি পদার্থে দ্রব্যাশ্রিতত্বের অনুমান হয়। তাহার পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কোন দ্রব্যের আশ্রিত নহে, ইহা বুঝিলে উহাদিগের আশ্রয়রূপে দেহাদি হইতে বিভিন্ন লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য যে দ্রব্য-পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম আত্মা। তাহাই পূর্ব্বোক্তরূপে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ন্যায়বার্ত্তিক-কার ও তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই স্থলে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রতা অর্থাৎ পরাশ্রিতত্বই "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের সাধ্য। আত্মা ঐ অনুমানের সাধ্য নহে। ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রতা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। কিন্তু সামান্যতঃ যাহা গুণপদার্থ, তাহা পরতন্ত্র ; এই-রূপে গুণপদার্থে পরতন্ত্রতার ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ ইচ্ছা প্রভৃতি পদার্থেও পরতন্ত্রতা সিদ্ধ হইয়া যায় ; কারণ, তাহারাও গুণপদার্থ। তাহার পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি অন্য কোন দ্রব্যাশ্রিত হইতে পারে না,অর্থাৎ উহারা দেহাশ্রিত নহে,—ইন্দ্রিয়াশ্রিত নহে, ইত্যাদিরূপে অন্যান্য দ্রব্যগুলির আশ্রিত নহে, ইহা বুঝিলে শেষে অতিরিক্ত কোন দ্রব্যাশ্রিত, ইহাই বুঝা যায়। ঐ অতিরিক্ত দ্রব্যই আত্মা। ফলতঃ পূর্ব্বোক্তরূপে ইচ্ছা প্রভৃতির আত্মতন্ত্রতাই শেষে বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার ঐ আত্মতন্ত্রতা-সাধক অনুমানকেই পূর্ব্বোক্ত "শেষবৎ" অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন এবং

ইচ্ছা প্রভৃতির পরতন্ত্রতা-সাধক অনুমানই এখানে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। মহর্ষি কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতিকে আত্মারই লিঙ্গ বলিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যথাস্থানে প্রকটিত হইবে। (১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে—ত্রিবিধবচনং মহতো মহাবিষয়স্য ন্যায়স্য লঘীয়সা সূত্রেণোপদেশাৎ পরং বাক্যলাঘবং মন্যমানস্যান্যস্মিন্ বাক্যলাঘবেঽনাদরঃ। তথা চায়মস্যেত্থম্ভূতেন বাক্যবিকল্পেন প্রবৃত্তঃ সিদ্ধান্তে ছলে শব্দাদিষু চ বহুলং সমাচারঃ শাস্ত্রে ইতি।

অনুবাদ। "ত্রিবিধং" এই বিভাগ-বাক্য হইতেই সিদ্ধ হইলেও (অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ প্রভৃতি তিন প্রকার অনুমান মহর্ষির মত, ইহা বুঝা গেলেও) "ত্রিবিধবচন" অর্থাৎ "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি নামোল্লেখে "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের উক্তি—মহান্ অর্থাৎ ত্রিবিধ এবং মহা বিষয়—অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহার বিষয়, এমন ন্যায়ের (অনুমানের) অতি লঘু একটি সূত্রের দ্বারা ("তৎপূর্ব্বকং" ইত্যাদি ক্ষুদ্র একটিমাত্র সূত্রের দ্বারা) উপদেশ করায়, যিনি অত্যন্ত বাক্যলাঘব মনে করিয়াছেন, তাঁহার (শিষ্যদিগকে ব্যুৎপন্ন করিতে ইচ্ছুক সূত্রকার মহর্ষি গোতমের) অন্য বাক্য-লাঘবে অর্থাৎ ইহার অপেক্ষায় আরও বাক্য সংক্ষেপে "অনাদর"—অর্থাৎ ঐ উক্তি বাক্যসংক্ষেপে অনাদরপ্রযুক্ত। (এই ন্যায়সূত্রে অন্যত্রও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন)। "শাস্ত্রে" (এই ন্যায়দর্শনে) "সিদ্ধান্তে", "ছলে" এবং শব্দ-প্রমাণাদিতে (ঐ সমস্ত পদার্থ-বোধক সূত্রে) ইঁহার অর্থাৎ সূত্রকার মহর্ষি গোতমের সেই প্রকার অর্থাৎ এই সূত্রে "ত্রিবিধ" বচনের ন্যায় এই সমাচার (সূত্রে অত্যন্ত বাক্য-সংক্ষেপ না করিয়া বাক্য-প্রয়োগ) এবম্ভূত বাক্য-বৈচিত্র্যের দ্বারা বহুতর প্রবৃত্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি "অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং" এই পর্য্যন্ত সূত্র বলিলেই "ত্রিবিধং" এই বিভাগ-বাক্যের দ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমান বুঝা যায়; কারণ, অনুমানের প্রকার-ভেদ বিষয়ে চিন্তা করিলে উদাহরণ পর্য্যালোচনার দ্বারা "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি তিনটি প্রকারই বুদ্ধির বিষয় হয়, "পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ"—এই অংশের দ্বারা মহর্ষি বাক্যগৌরব করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার "বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে" এই কথার দ্বারা এই প্রশ্নের সূচনা করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, অনুমান মহান্ ও মহাবিষয়, একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র সূত্রের দ্বারা ইহার উপদেশ করিয়া মহর্ষি অত্যন্ত বাক্যলাঘব মনে করিয়াছেন। সেই একটি সূত্রের মধ্যেও যে আরও বাক্যলাঘব করা, তাহা মহর্ষি কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। তাহা

হইলে এই দুরূহ তত্ত্ব আরও অতি দুরূহ হইয়া পড়ে। মহর্ষি ইহার পরেও "সিদ্ধান্ত", "ছল" ও শব্দপ্রমাণ প্রভৃতির উপদেশ করিতে এইরূপ অত্যন্ত বাক্য-লাঘবের আদর করেন নাই। সেই সব স্থলে স্পষ্ট করিয়াই তাহাদিগের প্রকার-ভেদের কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার সমর্থন করিতেছেন যে, সূত্রগ্রন্থে বাক্যলাঘব কর্ত্তব্য হইলেও ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষি কোন স্থলেই অত্যন্ত বাক্য-লাঘবের আদর করেন নাই। সূত্রবাক্যের এইরূপ গৌরব-সমর্থনে ভাষ্যকারের এইরূপ প্রয়াস দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বকালে ন্যায়-সূত্রের প্রকৃত পাঠ অনেক স্থলে লুপ্ত ও বিকৃত হইয়াছিল, ভাষ্যকার তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। অবশ্য এ অনুমানের অন্য হেতুও আছে। বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়সূচী-নিবন্ধ" রচনার প্রয়োজনও ভাবিবার বিষয়। "বিভাগবচনাদেব" ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলে সূত্রে "ত্রিবিধং" এই কথাটি কেন ? ইহাই মূল প্রশ্ন বলিয়া মনে আসে। কিন্তু 'ত্রিবিধমিতি" এই "ইতি"শব্দ-যুক্ত বাক্যের দ্বারা সূত্রস্থ "ত্রিবিধং" এই বিভাগ-বাক্যটির স্বরূপই বুঝা যায়। উহার দ্বারা ত্রিবিধত্ব সহজে বুঝা যায় না। এবং "ত্রিবিধবচনং" এই কথার দ্বারা ত্রিবিধের বচনই সহজে বুঝা যায়, "ত্রিবিধং" এই বাক্যের বচন বুঝা যায় না। মূল কথা, "ত্রিবিধত্বে সিদ্ধে ত্রিবিধমিতি বচনং" এইরূপ ভাষা থাকিলেই ঐরূপ অর্থ সহজে গ্রহণ করা যায়। মনে হয়, এই সমস্ত কথা মনে করিয়াই ভাষা-প্রবীণ বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন,—"ত্রিবিধমিতি বিভাগবচনাদেব সিদ্ধে", "পূর্ব্ববদাদৌ সিদ্ধে", "ত্রিবিধবচনং ত্রিবিধস্য পূর্ব্ববদাদের্ব্বচনং উক্তিঃ।" অনুবাদে মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। সূত্রকারের "ত্রিবিধবচন" অত্যন্ত বাক্যলাঘবে "অনাদর" প্রযুক্ত। তাই ভাষ্যকার ঐ ত্রিবিধবচনকে বাক্যসংক্ষেপে অনাদর বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। মূর্খতাপ্রযুক্ত কোন কার্য্য হইলে তাহাকে মূর্খতা বলিয়াও বলা হয়। ঐ কার্য্যে মূর্খতাই প্রধান হেতু, ইহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে মূর্খতার সহিত অভিন্নভাবেই উল্লেখ করা হয়, তদ্রূপ মহর্ষির এই সূত্রে যে পূর্ব্ববৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ বচন, তাহার প্রতিও অন্য কোনও হেতু নাই, অত্যন্ত বাক্য-সংক্ষেপে অনাদরই উহার মূল, ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার উহাকে বাক্যলাঘবে অনাদর বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্য। সদ্বিষয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং সদসদ্বিষয়ঞ্চানুমানম্। কস্মাৎ ? ত্রৈকাল্যগ্রহণাৎ, ত্রিকালযুক্তা অর্থা অনুমানেন গৃহ্যন্তে, ভবিষ্যতীত্যনুমীয়তে ভবতীতি চাভূদিতি চ। অসচ্চ খল্বতীতমনাগতঞ্চেতি।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ (লৌকিক প্রত্যক্ষ) সদ্বিষয় অর্থাৎ বর্ত্তমানবিষয়ক। অনুমান সদ্বিষয়ক ও অসদ্বিষয়ক অর্থাৎ বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যদ্বিষয়ক। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) ত্রৈকাল্য গ্রহণ বশতঃ। বিশদার্থ এই যে,—"অনুমানের দ্বারা ত্রিকালযুক্ত অর্থ (বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ) গৃহীত (জ্ঞাত) হইয়া থাকে ;

হইবে ইহা অনুমিত হইয়া থাকে, হইতেছে ইহা এবং হইয়াছে ইহাও অনুমিত হইয়া থাকে। "অসৎ" বলিতে (অর্থাৎ "সদসদ্বিষয়ঞ্চানুমানং" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "অসৎ" শব্দের অর্থ) অতীত এবং ভবিষ্যৎ।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান ভিন্ন, ইহা লক্ষণ ভেদ করিয়াই সূত্রকার মহর্ষি দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ দুইটির বিষয়-ভেদপ্রযুক্তও ভেদ বলিতেছেন। এখানে ভাষ্যে "প্রত্যক্ষ" শব্দ ও "অনুমান" শব্দ প্রমিতি অর্থেই প্রযুক্ত। ভাবার্থে অনট্ প্রত্যয়-সিদ্ধ "অনুমান" শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা অনুমিতিই বুঝা যায়। ঐ প্রত্যক্ষ প্রমিতি এবং অনুমিতিরূপ প্রমিতি তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য-বর্ণিত হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের প্রতি প্রমাণও হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনুমান-প্রমাণের বিষয়-ভেদ বলিলেও বলা যায়। এবং এই স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষই বুঝিতে হইবে; কারণ, সিদ্ধ যোগিগণের অলৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান বিষয়ক নহে, তাহার সহিত অনুমানের ভাষ্যোক্ত বিষয়-ভেদ নাই। লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান-বিষয়ক। অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু অনুমাপক সৎহেতুর সাহায্যে অনুমিতি হইয়া থাকে। ভাষ্যে "ত্রৈকাল্য" শব্দের দ্বারা "ত্রিষু কালেষু স্থিতাঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে কালত্রয়বর্ত্তী অর্থই বুঝিতে হইবে।

অনুমান বুঝিতে হইলে পক্ষ, সাধ্য, সংহেতু, অসৎ হেতু, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তিজ্ঞান, লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শ—এই পদার্থগুলি মনে রাখিতে হইবে। যে স্থানে অনুমিতি হয়, তাহাকে "পক্ষ" বা আশ্রয় বলে। সেই পক্ষে যে ধর্ম্মটির অনুমিতি হয়, তাহাকে সাধ্য ধর্ম্ম বলে। এই সাধ্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট পক্ষরূপ ধর্ম্মীও অনুমানের পূর্ব্বে অসিদ্ধ বলিয়া ন্যায়সূত্রে ও ভাষ্যে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। যে হেতুতে কোন দোষ নাই অর্থাৎ হেত্বাভাস নহে, তাহাকে সৎহেতু বলে। যে হেতু দুষ্ট অর্থাৎ হেত্বাভাস, তাহাকে অসৎ হেতু বলে। হেত্বাভাসের পরিচয় মহর্ষি নিজেই দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মযুক্ত কোন স্থানে থাকিয়া সাধ্যশূন্যস্থানমাত্রে না থাকাকে সাধ্যের "ব্যাপ্তি" বলে। স্থলবিশেষে "ব্যাপ্তির" অন্যরূপ লক্ষণও বলিতে হইবে। ব্যাপ্তি-বিশিষ্টকে "ব্যাপ্য" বলে। সাধ্যের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পদার্থ সাধ্যের ব্যাপ্য। যাহার ব্যাপ্য, তাহাকে "ব্যাপক" বলে। এই হেতু এই সাধ্যের ব্যাপ্য, এইরূপ জ্ঞানকে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান বলে। এই সাধ্য ব্যাপ্য, এই হেতু এই পক্ষে আছে, এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শ বলে। ইহার পরেই "এই পক্ষ এই সাধ্যযুক্ত", এইরূপে যথাস্থানে প্রকৃত সাধ্যের অনুমিতি হয়। তাহার পরে সেই অনুমিত পদার্থের গ্রহণ, ত্যাগ অথবা উপেক্ষা হয়। সুতরাং ঐ অনুমিতির পরেই তৃতীয় সূত্র-ভাষ্য-বর্ণিত হানাদি বুদ্ধিও জন্মে। ঐ "হানাদিবুদ্ধি"রূপ ফলের প্রতি পূর্ব্বজাত অনুমিতিও চরম কারণ বলিয়া প্রমাণ হইবে। ঐ অনুমিতিও সূত্রোক্ত "তৎপূর্ব্বক" জ্ঞান। ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানকাণ্ড অতি দুরূহ। বিচার্য্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্ত নাই। অবয়ব-প্রকরণ, হেত্বাভাস-প্রকরণ এবং অনুমান-পরীক্ষাপ্রকরণে আরও এই বিষয়ে অনেক কথা দ্রষ্টব্য ॥৫॥

ভাষ্য। অথোপমানম্।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ অনুমান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) উপমান (নিরূপণ করিতেছেন)।

সূত্র। প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ ।৬।

অনুবাদ। প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থ-বিশেষের সহিত অদৃষ্ট পদার্থের সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য হইতে যে সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, সেই সাদৃশ্য প্রযুক্ত (সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ বশতঃ) সাধ্যের অর্থাৎ শব্দ-বিশেষের বাচ্যত্ব সম্বন্ধের সাধন (নিশ্চয়) যাহা দ্বারা হয়, তাহা উপমান প্রমাণ।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ প্রজ্ঞাপনীয়স্য প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি। "যথা গৌরেবং গবয়" ইতি। কিং পুনরত্রোপমানেন ক্রিয়তে? যদা খল্বয়ং গবা সমানধর্ম্মং প্রতিপদ্যতে তদা প্রত্যক্ষতস্তমর্থং প্রতিপদ্যত ইতি। সমাখ্যাসম্বন্ধপ্রতিপত্তিরুপমানার্থ ইত্যাহ। "যথা গৌরেবং গবয়" ইত্যুপমানে প্রযুক্তে গবা সমানধর্ম্মাণমর্থমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুপলভমানোঽস্য গবয়শব্দঃ সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যত ইতি। "যথা মুদ্গস্তথা মুদ্গপর্ণী", "যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী"ত্যুপমানে প্রযুক্তে উপমানাৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যমানস্তামোষধীং ভৈষজ্যায়াহরতি। এবমন্যোঽপ্যুপমানস্য লোকে বিষয়ো বুভুৎসিতব্য ইতি।

অনুবাদ। প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত (প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত পদার্থ-বিশেষের সহিত) সমানতা-প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য হইতে পরিজ্ঞাত সাদৃশ্য-প্রযুক্ত (সেই সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষবশতঃ) প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের (সংজ্ঞাবিশেষের বাচ্যত্বরূপে প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থ-বিশেষের অথবা অর্থ-বিশেষে শব্দ-বিশেষের বাচ্যত্ব সম্বন্ধের) প্রজ্ঞাপন "উপমান" (উপমিতি)। (উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য উপমিতির মূল সাদৃশ্য-বোধক প্রসিদ্ধ আপ্তবাক্যটির উল্লেখ করিতেছেন) "যেমন গো এইরূপ গবয়"। (পূর্ব্বপক্ষ) এই স্থলে উপমান প্রমাণ কি করিতেছে? যে সময়ে ব্যক্তি-বিশেষ (গবয় পশুতে) গোর সমান ধর্ম্ম (সাদৃশ্য) জানে (প্রত্যক্ষ করে,) তখন প্রত্যক্ষের দ্বারাই সেই পদার্থকে (গবয়কে) জানে। (অর্থাৎ ঐ স্থলে গবয়-

পশুজ্ঞানের জন্য উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন কি ? গবয়ে গো-সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকালে গবয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। (উত্তর) সমাখ্যার (সংজ্ঞাশব্দবিশেষের) "সম্বন্ধপ্রতিপত্তি" অর্থাৎ অর্থবিশেষে বাচ্যত্বসম্বন্ধ জ্ঞান (শক্তিজ্ঞান) উপমান প্রমাণের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, ইহা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন। (প্রকৃতস্থলে ইহা বিশদ করিয়া বুঝাইতেছেন) "যেমন গো, এইরূপ গবয়" এই উপমান (অর্থাৎ উপমিতির মূল-সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য) "প্রযুক্ত" হইলে অর্থাৎ কোন বোদ্ধা ব্যক্তির নিকটে কথিত হইলে (সে বোদ্ধা ব্যক্তি কোন স্থানে) গোর সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থকে (গো-সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুকে) ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষবশতঃ উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতঃ গবয়শব্দ ইহার (এই দৃশ্যমান পশু-বিশেষের) সংজ্ঞা (নাম)—এইরূপে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ অর্থাৎ গবয় ও "গবয়" শব্দের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকে। (উপমানের আরও একটি স্থল দেখাইতেছেন) (২) "যেমন মুদ্গ, সেইরূপ মুদ্গপর্ণী" (এবং) "যেমন মাষ, সেইরূপ মাষপর্ণী" এই উপমান (উপমিতির মূল-সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য) প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসু বোদ্ধার নিকটে কথিত হইলে (ঐ ব্যক্তি) উপমান প্রমাণ হইতে (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ অর্থাৎ সেই ওষধিবিশেষ ও মুদ্গপর্ণী শব্দের এবং সেই ওষধিবিশেষ ও মাষপর্ণী শব্দের বাচ্যবাচকতা-সম্বন্ধ বোধ করতঃ এই ওষধীকে (মুদ্গপর্ণী নামক এবং মাষপর্ণী নামক ওষধীবিশেষকে) ঔষধের জন্য আহরণ করে। এইরূপ অন্যও অর্থাৎ ইহা ভিন্নও জগতে উপমান প্রমাণের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।

টিপ্পনী। "গবয়" নামে একপ্রকার আরণ্য পশু আছে। যাহাকে দেশবিশেষে "নীলগাই" বলে। নগরবাসী গবয় পশু দেখেন নাই; কিন্তু বিজ্ঞ অরণ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছেন—গবয় পশু দেখিতে গো-পশুর মত। পরে নগরবাসী কোন কারণে অরণ্যে গমন করিয়া এক দিন একটি গবয় পশু দেখিলেন; তখন ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুতে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রজ্ঞাত গো-পশুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইল, তাহার পরেই পূর্ব্বশ্রুত অরণ্যবাসীর সেই বাক্যের অর্থ স্মরণ হইল। তাহার পরেই নগরবাসী নিশ্চয় করিলেন, ইহার নাম গবয়। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়ত্ব-বিশিষ্ট পশুমাত্রই গবয় শব্দের বাচ্য। এইরূপে তিনি গবয় পশু ও গবয় শব্দের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন। তাহার এই সম্বন্ধ-নির্ণয় পূর্ব্বজাত সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষরূপ উপমান প্রমাণের ফল। উহারই নাম "উপমিতি।"

ঐ স্থলে গবয় পশুর প্রত্যক্ষ এবং তাহাতে গো-সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাই

হইতেছে; কিন্তু গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধ নির্ণয় ঐ স্থলে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না। ঐ স্থলে তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণই উপস্থিত নাই। যে প্রমাণের দ্বারা ঐ স্থলে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ নির্ণয় হয়, তাহারই নাম উপমান প্রমাণ। পরীক্ষা-প্রকরণে ঐ সব কথা বিশেষরূপে সমর্থিত হইবে। সূত্রে "প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ" এই স্থলে তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের অভিমত। তাই ভাষ্যকার সূত্রের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ।" সূত্রের "সাধ্যসাধনং" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রজ্ঞাপনীয়স্য প্রজ্ঞাপনম্।" প্রমাণ কর্তৃক প্রমাতা প্রজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রজ্ঞাপন প্রমাণেরই ব্যাপার। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার উপমান প্রমাণের ফল উপমিতিকে "প্রজ্ঞাপন" বলিয়াছেন। পরে সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সম্বন্ধ-নির্ণয়ই উপমানের ফল অর্থাৎ "উপমিতি", ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দ-বিশেষের বাচ্যত্ব সম্বন্ধই উপমান প্রমাণের সাধ্য, অর্থাৎ সাদৃশ্যবোধক বাক্য বক্তার প্রজ্ঞাপনীয়; তাই সূত্রের "সাধ্য" শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। সেই সাধ্যের সাধন অর্থাৎ নিশ্চয় যাহার দ্বারা হয়, তাহা উপমান প্রমাণ। তাৎপর্য্যটীকাকার সূত্রে "যতঃ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রকাশ করিয়াছেন। "সাধ্যসাধন-মুপমানং" এইমাত্র সূত্র বলিলে প্রত্যক্ষাদির সাধন এবং সুখাদির সাধনও উপমান হইয়া পড়ে; তাই বলিয়াছেন—"প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ।" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হওয়া চাই। "প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যমুপমানং" এইরূপ সূত্র বলিলে উপমানাভাসও উপমান-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাই বলিয়াছেন—"সাধ্যসাধনম্।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসাধন হওয়া চাই। প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত পরবর্ত্তী সাদৃশ্য-জ্ঞান (যেমন গবয় পশুতে গো পশুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ) উপমান প্রমাণ। পূর্ব্বশ্রুত আপ্তবাক্যের অর্থ স্মরণ তাহার ব্যাপার। ব্যাপারই মুখ্য করণ, এই প্রাচীন মতে ঐ পূর্ব্বশ্রুত আপ্তবাক্যের অর্থ স্মরণই মুখ্য উপমান প্রমাণ। ফলতঃ কেবল সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষে উপমিতি হয় না। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পরে পূর্ব্বশ্রুত সেই সাদৃশ্যবোধক আপ্তবাক্যের অর্থ স্মরণ আবশ্যক। তাহার পরেই পূর্ব্বোক্ত উপমিতি জন্মে।

(২) "মুদ্গপর্ণী" ও "মাষপর্ণী" নামে একপ্রকার ওষধী-বিশেষ আছে, যাহাকে দেশবিশেষে যথাক্রমে "মুগানি" ও "মাষাণি" বলে। উহা বিষনাশক। যিনি উহা কখনও দেখেন নাই, তিনি দ্রব্য-তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট শুনিলেন—"মুদ্গপর্ণী" মুদ্গের ন্যায় এবং "মাষপর্ণী" মাষের ন্যায়। পরে অরণ্যাদিতে যাইয়া কোন ওষধীবিশেষে মুদ্গের বিলক্ষণ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার পরেই সেই পূর্ব্বশ্রুত চিকিৎসক-বাক্যের অর্থ স্মরণ হইল, তাহার পরেই সেই ওষধী-বিশেষে "মুদ্গপর্ণী" শব্দের বাচ্যত্ব-সম্বন্ধ নির্ণয় হইল। অর্থাৎ তখন তিনি বুঝিলেন, "ইহারই নাম মুদ্গপর্ণী।" এইরূপে "মাষপর্ণী" শব্দেরও মাষসদৃশ ওষধী-বিশেষে বাচ্যত্ব নিশ্চয় হইল। এইরূপে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ এবং সাদৃশ্য-বোধক বাক্যার্থ স্মরণে উদ্ভিদ্‌বিশেষের সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধনির্ণয় অনেক স্থলে অনেকেরই হইয়া থাকে। যাঁহার হইয়াছে, তিনি স্মরণ করুন। তাঁহার ঐ জ্ঞান উপমান প্রমাণের ফল "উপমিতি।"

উপমান ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, সূত্রে "সাধর্ম্ম্য" শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা ধর্ম্মমাত্রই বুঝিতে হইবে। প্রসিদ্ধ বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্তও উপমিতি হয়। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তি "করভ" শব্দ উষ্ট্র অর্থও বুঝায়, ইহা জানেন না; কিন্তু একজন বিজ্ঞতম ব্যক্তির নিকটে শুনিলেন,—"করভ অতি কুশ্রী, তাহার গ্রীবা ও ওষ্ঠ অতি দীর্ঘ, সে অতি কঠোর তীক্ষ্ণ কণ্টক ভক্ষণ করে, সে পশুর মধ্যে অধম।" এই কথাগুলির দ্বারা শ্রোতা করভে অন্য কোন পশুর সাদৃশ্য বুঝিলেন না, কিন্তু করভে অন্য পশুর বৈধর্ম্ম্যই বুঝিলেন। পরে এক দিন কোন স্থানে উষ্ট্র দেখিয়া তাহাতে অতিদীর্ঘ গ্রীবা ও কণ্টক-ভক্ষণ প্রভৃতি অন্য পশুর বৈধর্ম্ম্যগুলির প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পরেই তাঁহার পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ হইল, তাহার পরেই তিনি বুঝিলেন, উষ্ট্র, "করভ" শব্দের বাচ্য। অর্থাৎ করভ শব্দের অর্থ উষ্ট্র। এই বোধ পূর্ব্বজাত বৈধর্ম্ম্য প্রত্যক্ষ এবং পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থ স্মরণজন্য; সুতরাং ইহা বৈধর্ম্ম্যোপমিতি। ইহাকে উপমিতি না বলিলে ইহার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ঐ স্থলে ঐরূপে যে উষ্ট্রে "করভ" শব্দের বাচ্যত্ব নিশ্চয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে হয় না। সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত ঐরূপ জ্ঞান যখন মহর্ষি গোতমের মতে অনুমিতি নহে, তখন বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত ঐরূপ জ্ঞানও তাঁহার মতে অনুমিতি হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার উপমানের অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াও অর্থাৎ আর উদাহরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন না থাকিলেও শেষে বলিয়াছেন,—"এবমন্যোঽপ্যুপমানস্য লোকে বিষয়ো বুভুৎসিতব্যঃ"। অর্থাৎ ইহা ভিন্নও উপমানের বিষয় আছে। জানিতে ইচ্ছা করিয়া অনুসন্ধান করিলে আরও মিলিবে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার কথার দ্বারাও এখানে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের কথাও সূত্রকারের কথার ন্যায় তিনি প্রমাণ মনে করেন এবং ভাষ্যকারও যে শেষে তাঁহার মতেরই সূচনা করিয়া গিয়াছেন ইহাও তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতির দৃঢ় বিশ্বাস। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও মহর্ষি-সূত্রস্থ "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য, এবং ধর্ম্ম এই তিনটিকে গ্রহণ করিয়া উপমিতিকে তিন প্রকার বলিয়াছেন এবং তিনিও ভাষ্যকারকে ভগবান্ বলিয়া ভাষ্যকারের এই কথাটির উল্লেখপূর্ব্বক স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কিন্তু ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখপূর্ব্বক উদাহরণ বলিয়াছেন যে, মুদ্গপর্ণীর ন্যায় একরূপ ওষধী আছে, তাহা বিষনাশক, এই কথা শুনিয়া কোন স্থানে ঐরূপ ওষধী দেখিলে "এই ওষধী বিষ নাশ করে" এইরূপ নিশ্চয়ও উপমান প্রমাণের ফল। অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধনির্ণয় ভিন্ন ঐরূপ তত্ত্বনির্ণয়ও উপমানের দ্বারা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বলিয়া বিশ্বনাথের কথায় বুঝা যায়। কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকই এই মত স্বীকার না করিলেও ভাষ্যকারের উহা মত বলিয়া বুঝিবার কারণ আছে। ভাষ্যকারের উহা মত না হইলে তিনি "উপনয়" বাক্যের মূলে অনুমান প্রমাণ আছে, এ কথা বলেন কিরূপে? (৩৯ সূত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। অথ শব্দঃ।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ উপমান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) "শব্দ" (শব্দপ্রমাণ) (নিরূপণ করিতেছেন)।

সূত্র। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। ৭।

অনুবাদ। আপ্তের অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রতারক ব্যক্তির উপদেশ "শব্দপ্রমাণ"।

ভাষ্য। আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথা দৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ। ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্। তথা চ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি। এবমেভিঃ প্রমাণৈর্দ্দেবমনুষ্যতিরশ্চাং ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে নাতোঽন্যথেতি।

অনুবাদ। "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" (যিনি ধর্ম্ম অর্থাৎ পদার্থকে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন) এবং যথাদৃষ্ট পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ "প্রযুক্ত" অর্থাৎ বাক্য-প্রয়োগে কৃতযত্ন, এইরূপ "উপদেষ্টা" অর্থাৎ উপদেশ-সমর্থ ব্যক্তি,—"আপ্ত"। (আপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন) অর্থের (পদার্থের) সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ "আপ্তি"। তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই আপ্তিবশতঃ (বাক্যপ্রয়োগে) প্রবৃত্ত হন, এ জন্য "আপ্ত"। ঋষিগণ, আর্য্যগণ এবং ম্লেচ্ছগণের সম্বন্ধে "লক্ষণ" (পূর্ব্বোক্ত আপ্তলক্ষণ) "সমান"। সেইরূপ বলিয়াই (বিষয়-বিশেষে আপ্তত্ব সকলেরই সমান বলিয়াই) সকলের (ঋষি হইতে ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তির) ব্যবহার প্রবৃত্ত হইতেছে। এইরূপ এই প্রমাণগুলির দ্বারা (ব্যাখ্যাত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের দ্বারা) দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের ব্যবহার চলিতেছে, ইহার অন্যথা অর্থাৎ এই প্রমাণগুলি ব্যতীত (কাহারও ব্যবহার) চলে না।

টিপ্পনী। সূত্রে "আপ্তোপদেশ" এই স্থলে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকার প্রভৃতির মত। অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকেই মহর্ষি শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন। এখন "আপ্ত" কাহাকে বলে, তাহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমতঃ আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং "আপ্ত" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া প্রদর্শিত লক্ষণের সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন ভাষায় পদার্থমাত্র বুঝাইতে "ধর্ম্ম" শব্দও প্রযুক্ত দেখা যায়। যিনি পদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি "সাক্ষাৎ-

কৃতধর্ম্মা"। ন্যায়-বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, স্বর্গ, অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতি পদার্থগুলি অস্মদাদির লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও সর্ব্বদর্শী সেগুলির অলৌকিক সাক্ষাৎকার করেন; সুতরাং সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বাক্য-বক্তাও সর্ব্বদর্শী বলিয়া "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা"। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সুদৃঢ়প্রমাণেনাবধারিতাঃ সাক্ষাৎকৃতাঃ ধর্ম্মাঃ পদার্থা হিতাহিতপ্রাপ্তি-পরিহারার্থা যেন"। অর্থাৎ তিনি বলেন,—পদার্থের সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণই এখানে ভাষ্যোক্ত পদার্থ-সাক্ষাৎকার। সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ সাক্ষাৎকারের তুল্য, তাই তাহাকে ভাষ্যকার সাক্ষাৎকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে সুদৃঢ় অনুমানের দ্বারা অবধারিত তত্ত্বের প্রতি-পাদক-বাক্য-বক্তাও "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা।" সুতরাং তিনিও "আপ্ত" হইতে পারিবেন। সাক্ষাৎ-কৃতপদার্থ হইয়াও যিনি উপদেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, অথবা মাৎসর্য্যবশতঃ বিপরীত উপদেশ করেন, তিনি "আপ্ত" নহেন; তাই বলিয়াছেন—"যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া"। অর্থাৎ নিজে যেরূপে অবধারণ করিয়াছেন, ঠিক সেই যথার্থরূপে পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা থাকা চাই। কেবল সেইরূপ খ্যাপনেচ্ছা থাকিলেও আলস্যবশতঃ যদি উপদেশ না করেন, তাহা হইলেও তিনি আপ্ত নহেন। তাই বলিয়াছেন—"প্রযুক্তঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ইচ্ছাবশতঃ বাক্য প্রয়োগে কৃতযত্ন হওয়া চাই। কৃতযত্ন হইয়াও ইন্দ্রিয়াদির পটুতা না থাকায় যদি উপদেশসামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তিনি আপ্ত হইবেন না। তাই বলিয়াছেন—"উপদেষ্টা"। অর্থাৎ এই সবগুলি লক্ষণ যাঁহাতে আছে, তিনিই "আপ্ত"। তিনি ঋষি, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, যাহাই হউন, তাঁহার উপদেশই "আপ্তোপদেশ"। তাহাই শব্দ-প্রমাণ। অনাপ্তের উপদেশ শব্দ-প্রমাণ নহে। বিষয়বিশেষে আপ্তত্ব সকলেরই তুল্যভাবে আছে, নচেৎ কাহারও শব্দ-ব্যবহার এবং তন্মূলক অন্যান্য ব্যবহার চলিতেই পারিত না। তবে সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়ে অথবা সাধারণের অচিন্ত্য অলৌকিক তত্ত্বে আর কেহ "আপ্ত" হইতে পারেন না, এই বিশ্বাসে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ব্রহ্ম প্রভৃতি অলৌকিক তত্ত্বে আর্য্যগণ যাহার তাহার কথা বিশ্বাস করেন না। বেদ এবং বেদের অবিরুদ্ধ বেদ-মূলক শাস্ত্র-বাক্যই ঐ সমস্ত তত্ত্বে আপ্তবাক্য বলিয়া আর্য্যগণের চির-বিশ্বাস। বেদ-কর্ত্তা কে? তিনি সর্ব্বজ্ঞ কেন? এ সব কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

সূত্র। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ। ৮।

অনুবাদ। দৃষ্টার্থকত্ব ও অদৃষ্টার্থকত্ব বশতঃ অর্থাৎ দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক-ভেদে তাহা (পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রমাণশব্দ) দ্বিবিধ।

ভাষ্য। যস্যেহ দৃশ্যতেঽর্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্যামুত্র প্রতীয়তে সোঽদৃষ্টার্থঃ। এবমৃষিলৌকিক-বাক্যানাং বিভাগ ইতি। কিমর্থং পুনরিদ-মুচ্যতে? স ন মন্যেত দৃষ্টার্থ এবাপ্তোপদেশঃ প্রমাণম্ অর্থস্যাবধারণা-দিতি। অদৃষ্টার্থোঽপি প্রমাণমর্থস্যানুমানাদিতি। ইতি প্রমাণভাষ্যম্।

অনুবাদ। ইহলোকে যাহার (যে বাক্যের) অর্থ (প্রতিপাদ্য) দৃষ্ট হয়, তাহা (সেই বাক্য) "দৃষ্টার্থ"। পরলোকে যাহার অর্থ প্রতীত হয় (অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় না) তাহা অর্থাৎ সেই বাক্য "অদৃষ্টার্থ"। এইরূপে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের বিভাগ। (পূর্ব্বপক্ষ) কি জন্য আবার ইহা (এই সূত্রটি) বলিতেছেন ?—(উত্তর) তিনি অর্থাৎ নাস্তিক মনে না করেন— অর্থের (প্রতিপাদ্য পদার্থের) অবধারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় দৃষ্টার্থমাত্র আপ্তবাক্যই প্রমাণ—(পরন্তু) অর্থের (বাক্য প্রতিপাদ্য পদার্থের) অনুমান অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যও প্রমাণ। (অর্থাৎ ইহা বলিবার জন্যই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন)। প্রমাণভাষ্য সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। আপ্তবাক্য দ্বিবিধ। সুতরাং প্রমাণ শব্দও দ্বিবিধ। কেবল অদৃষ্টার্থক শাস্ত্রবাক্যই আপ্তবাক্য নহে। লৌকিক বাক্যের মধ্যেও অসংখ্য আপ্তবাক্য আছে। সত্যবাদী বিজ্ঞতম ব্যক্তি কোন স্থানে সর্প দেখিয়া "অমুক স্থানে সর্প আছে" ইহা বলিলে শ্রোতৃগণ সেই বাক্যার্থ-জ্ঞানবশতঃ সাবধান হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতম সত্যবাদী ব্যক্তির কথা শুনিয়া কত কত সত্য নির্ণয় হইয়া থাকে। নচেৎ লৌকিক বিবাদ স্থলে সত্য নির্ণয়ের জন্য প্রকৃত সাক্ষিবাক্যের এত প্রয়োজন হয় কেন ? ফলতঃ লৌকিক বাক্যের একেবারে প্রামাণ্য না থাকিলে মানবের সংসারযাত্রা অসম্ভব হইত, ইহা নির্ব্বিবাদ সত্য। যিনি নাস্তিক অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তিনিও লৌকিক আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; নচেৎ তাঁহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। কিন্তু নাস্তিক অদৃষ্টার্থক বাক্যের প্রামাণ্য একেবারেই স্বীকার করেন না। তাই নাস্তিককে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। অর্থাৎ "অদৃষ্টার্থক আপ্ত বাক্যও প্রমাণ" আস্তিক-দর্শনের এই মূল সিদ্ধান্তটি প্রমাণ প্রস্তাবে প্রথমেই মহর্ষি বলিয়া গিয়াছেন। অদৃষ্টার্থক বেদাদি বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গ, অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতি যখন কাহারও দৃষ্ট পদার্থ নহে, তখন তাহা প্রমাণ হইবে কেন ? এতদুত্তরে ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, যোগপ্রভাবে সেগুলিও মহর্ষিগণের দৃষ্ট পদার্থ। ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন—"অর্থস্যানুমানাৎ" অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক শাস্ত্রবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ ইহলোকে আমাদিগের দৃষ্ট পদার্থ না হইলেও অনুমানসিদ্ধ। শাস্ত্রমাত্র-বোধ্য স্বর্গাদি পদার্থ আমাদিগের অনুমানসিদ্ধ কিরূপে ? তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আপ্ত-প্রণীতত্ব হেতুর দ্বারা বেদের প্রামাণ্য অনুমান-সিদ্ধ অর্থাৎ যেহেতু বেদ আপ্ত ব্যক্তির প্রণীত, অতএব বেদ প্রমাণ। মহর্ষি গোতম নিজেও এ কথা বলিয়াছেন। সুতরাং অনুমানের দ্বারা সিদ্ধপ্রামাণ্য বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গ, দেবতা প্রভৃতিও পরম্পরায় অনুমানসিদ্ধ। অর্থাৎ নাস্তিক যখন অনুমানপ্রমাণ না মানিয়াই পারিবেন না, তাহা হইলে তাঁহার বিচার করাই চলিবে না, তখন অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ-প্রামাণ্য বেদাদি অদৃষ্টার্থক বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ তাঁহাকে মানিতেই হইবে। এই

অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"অর্থস্যানুমানাৎ।" ভাষ্যে "স—ন মন্যেত" এই স্থলে তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে—যে নাস্তিকের কথা অনেক পূর্ব্বে ভাষ্যে বলা হইয়াছে, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্যবশতঃ সেই নাস্তিকই এখানে "তৎ" শব্দের প্রতিপাদ্য, (স নাস্তিকঃ)। ঋষিবাক্য এবং লৌকিক আপ্তবাক্য—এই দ্বিবিধ শব্দপ্রমাণকেই মহর্ষি দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের মত; তাই বলিয়াছেন—"এবমৃষিলৌকিকবাক্যানাং বিভাগঃ"। ভাষ্যকার দৃষ্টার্থক বাক্যের এবং অদৃষ্টার্থক বাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে ঋষিবাক্যের মধ্যেও দৃষ্টার্থক বাক্য আছে। লৌকিক আপ্তবাক্যের মধ্যেও অদৃষ্টার্থক বাক্য আছে। কেহ বলেন যে, যে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তন্মূলক প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারাও বুঝা যায়, সেই বাক্য দৃষ্টার্থক এবং যে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তন্মূলক প্রমাণ-মাত্রগম্য, তাহা অদৃষ্টার্থক। "শব্দচিন্তামণি"র "তাৎপর্য্যবাদ" গ্রন্থে উপাধ্যায় গঙ্গেশ এবং টীকাকার মথুরানাথ ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে স্মরণ করিতে হইবে, যথার্থ শাব্দবোধের করণই শব্দপ্রমাণ। কেবল শব্দের দ্বারাই শাব্দবোধ জন্মে না, ঐ শব্দের জ্ঞান এবং তাহার অর্থজ্ঞান প্রভৃতিও শাব্দবোধে আবশ্যক। শাব্দবোধের অব্যবহিত পূর্ব্বে শব্দ থাকেও না, এই সমস্ত কারণে নব্য নৈয়ায়িকগণ বহু বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দজ্ঞানজন্য সংস্কারবশতঃ শেষে যে ঐ সকল শব্দবিষয়ক একটা স্মৃতি জন্মে, তাহাই শাব্দবোধের করণ এবং তাহার পরে ঐ সকল শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থবিষয়ক যে একটা স্মৃতি জন্মে, তাহাই ঐ করণের ব্যাপার। ঐ ব্যাপারের পরেই ঐ সকল পদার্থের পরস্পর অন্বয়বোধ বা সম্বন্ধবোধ জন্মে। এই অন্বয়বোধই "শাব্দবোধ"। কেবলমাত্র শব্দার্থজ্ঞান শাব্দবোধ নহে। উহা শব্দপ্রমাণের দ্বারাও সর্ব্বত্র হয় না। প্রাচীন মতে চরম কারণরূপ ব্যাপারই মুখ্য করণ পদার্থ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পদার্থ স্মরণই তাঁহাদিগের মতে মুখ্য শব্দপ্রমাণ। কিন্তু ঐ পদার্থ স্মরণ যাহার ব্যাপার, তাহাও তাঁহাদিগের মতে শব্দপ্রমাণ। প্রাচীনগণ চরম কারণ ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপার দ্বারা যাহা কার্য্যজনক, তাহাকেও করণ বলিতেন, এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃত স্থলে অনেক প্রাচীনগণই জ্ঞায়মান শব্দকে পূর্ব্বোক্ত পদার্থস্মরণরূপ ব্যাপারজনক করণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ শব্দজ্ঞানকে করণ না বলিয়া জ্ঞায়মান শব্দকে করণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই মতে শব্দজ্ঞান শব্দপ্রমাণ হইবে না। জ্ঞায়মান শব্দ শব্দপ্রমাণ হইবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই মতের অনেক প্রতিবাদ করিলেও মহর্ষি কিন্তু শব্দজ্ঞানকে শব্দপ্রমাণ বলেন নাই। তিনি আপ্তবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলায় বুঝা যায়, জ্ঞায়মান শব্দকেই শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন এবং ঐ প্রমাণ শব্দকে দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক বলাতে উহা যে শব্দই, শব্দজ্ঞান নহে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। শব্দই দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক হইতে পারে। ভাষ্যকারও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে মহর্ষি-সূত্র প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ হয় নাই। কারণ, প্রাচীনগণ শাব্দবোধের চরম কারণ পদার্থ স্মরণকে শাব্দবোধে মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপারজনক জ্ঞায়মান শব্দও তাঁহাদিগের মতে করণ বলিয়া শব্দপ্রমাণ হইবে। জ্ঞায়মান শব্দের প্রমাণত্ব পক্ষে নব্য নৈয়ায়িকগণের

বহু বিবাদ থাকিলেও নব্য ন্যায়ের মূল আচার্য্য গঙ্গেশ কিন্তু প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হইয়া "শব্দ-চিন্তামণি"র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"শব্দঃ প্রমাণম্"। সেখানে টীকাকার মথুরানাথও[১] জ্ঞায়মান শব্দের প্রমাণত্ব পক্ষ অবলম্বন করিয়াই যে গঙ্গেশ ঐ কথা বলিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি-সূত্রেও তাহাই আছে এবং "শব্দ প্রমাণ" এইরূপ কথাও প্রাচীন কাল হইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। নব্যগণও ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, মহর্ষি কিন্তু জ্ঞায়মান শব্দমাত্রকেই শব্দপ্রমাণ বলেন নাই, যে শব্দ জ্ঞায়মান হইয়া যথার্থ শাব্দবোধ জন্মায়, তাহাই শব্দপ্রমাণ, শব্দমাত্রই শব্দপ্রমাণ নহে; তাই বলিয়াছেন,—"আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ"। প্রমাণ-কাণ্ড অতি দুরূহ। ইহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ গোতমোক্ত এই প্রমাণ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মৈথিল পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি বহু মহামনীষী গঙ্গেশের "তত্ত্বচিন্তামণি"র টীকা করিয়া এই প্রমাণ ব্যাখ্যার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরে বঙ্গের গৌরবস্তম্ভ, প্রতিভার অবতার রঘুনাথ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গঙ্গেশের প্রমাণ ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া ন্যায়বিদ্যায় যুগান্তর আনিয়া গিয়াছেন। যে প্রমাণকাণ্ড লইয়া এত কাণ্ড, তাহার কত কথা একবারে বলা যাইতে পারে—কিরূপে সংক্ষেপে সহজেই বা তাহার সকল কথা বুঝান যাইতে পারে? তবে প্রমাণপরীক্ষা প্রকরণে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও বহু কথা পাওয়া যাইবে। প্রমাণ সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক। প্রমাণের দ্বারাই সকল পদার্থের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, এ জন্যই মহর্ষি সর্ব্বাগ্রে প্রমাণের উদ্দেশ পূর্ব্বক লক্ষণ বলিয়াছেন। এই প্রমাণের ব্যাখ্যা একটি বিশেষ প্রবন্ধ, তাই ভাষ্যকার মহর্ষির সর্ব্বপ্রথমে কথিত প্রমাণ পদার্থের পরিচয়ের জন্য মহর্ষির প্রমাণ-প্রকরণের পাঁচটি সূত্রের ভাষ্য করিয়া "প্রমাণভাষ্য" নামের দ্বারা তাহার সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

প্রমাণলক্ষণপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভাষ্য। কিং পুনরনেন প্রমাণেনার্থজাতং প্রমাতব্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ। এই প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত[২] চারিটি প্রমাণের দ্বারা কোন্ পদার্থসমূহ যথার্থরূপে বুঝিতে হইবে, এ জন্য অর্থাৎ এই প্রশ্নবশতঃ (মহর্ষি) সেই পদার্থগুলি বলিয়াছেন।

সূত্র। আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষ-প্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ ॥ ৯ ॥

১। "এতচ্চ জ্ঞায়মানশব্দস্য প্রমাণত্বপক্ষে, শব্দজ্ঞানস্য প্রমাণত্বপক্ষে তু তাদৃশজন্যবিষয়কজ্ঞানত্বং লক্ষণমবসেয়ং"—(গঙ্গেশের শব্দচিন্তামণি, মাথুরী।) প্রথম খণ্ড।

২। "কিং পুনরনেন প্রমাণেনেতি। জাত্যভিপ্রায়মেকবচনং প্রকৃতে প্রমেয়ে যথাযথং প্রমাণানামুপযোগাৎ" (তাৎপর্য্যটীকা)।

অনুবাদ। (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ, (১২) অপবর্গ— ইহারাই অর্থাৎ এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থই "প্রমেয়" অর্থাৎ "প্রমেয়" নামে প্রথম সূত্রে কথিত "প্রমেয়" পদার্থ।

ভাষ্য। তত্রাত্মা সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য ভোক্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বানুভাবী। তস্য ভোগায়তনং শরীরম্। ভোগসাধনানীন্দ্রিয়াণি। ভোক্তব্যা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ। ভোগো বুদ্ধিঃ। সর্ব্বার্থোপলব্ধৌ নেন্দ্রিয়াণি প্রভবন্তীতি সর্ব্ববিষয়মন্তঃকরণং মনঃ। শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিসুখবেদনানাং নির্ব্বৃত্তিকারণং প্রবৃত্তির্দোষাশ্চ। নাস্যেদং শরীরমপূর্ব্বমনুত্তরঞ্চ। পূর্ব্বশরীরাণামাদির্নাস্তি, উত্তরেষামপবর্গোহন্ত ইতি প্রেত্যভাবঃ। সসাধনসুখদুঃখোপভোগঃ ফলম্। দুঃখমিতি নেদমনুকূলবেদনীয়স্য সুখস্য প্রতীতেঃ প্রত্যাখ্যানম্। কিং তর্হি? জন্মন এবেদং সসুখসাধনস্য দুঃখানুষঙ্গাদ্দুঃখেনাবিপ্রয়োগাদ্‌বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখমিতি সমাধিভাবনমুপদিশ্যতে। সমাহিতো ভাবয়তি, ভাবয়ন্ নির্ব্বিদ্যতে, নির্ব্বিণ্নস্য, বৈরাগ্যং, বিরক্তস্যাপবর্গ ইতি। জন্মমরণপ্রবন্ধোচ্ছেদঃ সর্ব্বদুঃখপ্রহাণমপবর্গ ইতি।

অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ং তদ্‌ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ম্। অস্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণেতি।

অনুবাদ। সেই আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে (১) "আত্মা" সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখকারণের দ্রষ্টা (বোদ্ধা), সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখের ভোক্তা, (সুতরাং) "সর্ব্বজ্ঞ" অর্থাৎ সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখের জ্ঞাতা, (সুতরাং) "সর্ব্বানুভাবী" অর্থাৎ সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখপ্রাপ্ত। সেই আত্মার ভোগের স্থান (২) "শরীর"। ভোগের সাধন (৩) "ইন্দ্রিয়" অর্থাৎ ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ। ভোগ্য (৪) "ইন্দ্রিয়ার্থ"বর্গ, অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। ভোগ (৫) "বুদ্ধি" অর্থাৎ জ্ঞান। বহিরিন্দ্রিয়গুলি সকল পদার্থের উপলব্ধি-কার্য্যে সমর্থ হয় না, এ জন্য সর্ব্ববিষয় অর্থাৎ সকল পদার্থই যাহার বিষয় হয়, এমন অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় (৬) "মন"। শরীর, বহিরিন্দ্রিয়, গন্ধাদি

ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, সুখ এবং বেদনার অর্থাৎ দুঃখের উৎপত্তির কারণ (৭) "প্রবৃত্তি" এবং (৮) "দোষ"বর্গ, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই আত্মার অর্থাৎ সংসারী জীবাত্মার এই শরীর অপূর্ব্ব নহে, অনুত্তরও নহে, অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বশরীর নাই, এমন নহে, ইহার উত্তর-শরীর নাই, এমনও নহে। পূর্ব্বশরীরগুলির আদি নাই, (তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায়) পরবর্ত্তী শরীরগুলির মোক্ষ অন্ত অর্থাৎ মোক্ষই শেষ সীমা, মোক্ষ হইলে আত্মার আর শরীর-সম্বন্ধ হয় না, ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনাদি জন্মমরণ-প্রবাহ (৯) "প্রেত্যভাব।" সাধন সহিত সুখ-দুঃখের উপভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ এবং তাহার সাধন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি (১০) "ফল।" (১১) "দুঃখ" এই কথাটি অর্থাৎ মহর্ষি প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ না বলিয়া যে দুঃখ বলিয়াছেন, ইহা অনুকূলবেদনীয় অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্ব্বজীবের অনুভব-বিষয় সুখের অনুভূতির অপলাপ নহে অর্থাৎ মহর্ষি এখানে সুখ না বলিয়া সর্ব্বানুভবসিদ্ধ সুখ পদার্থের অস্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি ? অর্থাৎ তবে প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ পদার্থ না বলিয়া কি করিয়াছেন ? (উত্তর) সুখসাধন সহিত জন্মেরই দুঃখানুষঙ্গবশতঃ, দুঃখের সহিত অবিচ্ছেদবশতঃ, বিবিধ দুঃখসম্বন্ধবশতঃ "ইহা অর্থাৎ সুখ ও সুখের সাধনসমন্বিত জন্ম, দুঃখ," এইরূপে সমাধিভাবনা অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ভাবনা উপদেশ করিয়াছেন। (মুমুক্ষু) সমাহিত হইয়া ভাবিবেন অর্থাৎ জন্মাদি সুখসাধন সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ভাবনা করতঃ নির্ব্বিণ্ণ হইবেন, অর্থাৎ সমগ্র জগতে উপেক্ষা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, নির্ব্বিণ্ণ মুমুক্ষুর বৈরাগ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুবিষয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে। বিরক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভাবনার ফলে বৈরাগ্যসম্পন্ন আত্মার মোক্ষ হইবে। জন্মমরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ (অর্থাৎ) সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি (১২) "অপবর্গ।"

অন্যও অর্থাৎ এই আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্নও "দ্রব্য", "গুণ", "কর্ম্ম", "সামান্য", "বিশেষ", "সমবায়" (কণাদোক্ত ষট্ পদার্থ) এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ অর্থাৎ ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের অসংখ্য প্রকার-ভেদ থাকায় অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু এই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ অপবর্গ হয়, মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সংসার হয়, এ জন্য এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থ বিশেষ করিয়া (প্রমেয় বলিয়া) কথিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। চতুর্ব্বিধ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের দ্বারা যে সকল পদার্থকে যথার্থরূপে বুঝিলে মোক্ষ হয়, সেই "প্রমেয়" পদার্থ নিরূপণের জন্য মহর্ষি প্রথমে সেই

প্রমেয় পদার্থগুলির বিভাগ অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিভাগসূত্রস্থ "প্রমেয়" শব্দের দ্বারাই মহর্ষি-কথিত "প্রমেয়" পদার্থের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়, তাহাই "প্রমেয়"। এই প্রমেয়বর্গের বিশেষ লক্ষণগুলি মহর্ষি নিজেই পৃথক্ পৃথক্ সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে মহর্ষি-সূত্রোক্ত প্রমেয়গুলির পরিচয় দিয়াছেন।

"প্রমেয়"বর্গের প্রথম পদার্থ জীবাত্মা। ভাষ্যকার তাহাকে বলিয়াছেন—সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বানুভাবী। এখানে "সর্ব্ব" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার সমস্ত সুখদুঃখসাধন এবং সমস্ত সুখ-দুঃখকেই লক্ষ্য করিয়াছেন[১]। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে—"প্রমেয়"বর্গের মধ্যে জীবাত্মা অনাদি কাল হইতে সমস্ত সুখসাধনের জ্ঞাতা এবং সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা। অর্থাৎ যে জীবাত্মার সম্বন্ধে যতগুলি সুখ-দুঃখ ও তাহার কারণ উপস্থিত হয়, সেই জীবাত্মাই সেই সমস্তের জ্ঞাতা, আর কেহ উহার একটিরও জ্ঞাতা নহে। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ জ্ঞাতা হইতেই পারে না। পরন্তু বহিরিন্দ্রিয়গুলির বিষয় নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মবদ্ধ। উহারা জ্ঞাতা হইলে সর্ব্ব-বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্ব বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে এবং আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে জীবাত্মাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন। সুখ-দুঃখ এবং তাহার সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে তাহার জ্ঞাতা হওয়া যায় না, এ জন্য শেষে বলিয়াছেন—"সর্ব্বানুভাবী"। অনু পূর্ব্বক "ভূ" ধাতুর অর্থ এখানে প্রাপ্তি। ভাষ্যকার অন্যত্রও প্রাপ্তি অর্থে "অনুভব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফল কথা, যে পদার্থ সুখ-দুঃখের সমস্ত সাধন ও সমস্ত সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্তের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, সেই পদার্থই জীবাত্মা। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আত্মাকে এইরূপে বুঝিলে বৈরাগ্য জন্মে, এই জন্যই ভাষ্যকার এখানে আত্মাকে ঐরূপ বলিয়াছেন। আত্মা সুখ-দুঃখাদিযুক্তস্বরূপে হেয়, কেবল স্বরূপেই গ্রাহ্য। অর্থাৎ প্রমেয়বর্গের মধ্যে "আত্মা" ও "অপবর্গ" উপাদেয়, আরগুলি হেয়। কিন্তু আত্মাতে বিশেষ এই যে, "আত্মা" ভাষ্যোক্তরূপে হেয়, সুখ-দুঃখাদি-শূন্য কেবলরূপেই উপাদেয় (দ্বিতীয় সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ মাত্রই প্রমেয়। মহর্ষি গোতমের এই সূত্রোক্ত "প্রমেয়" ভিন্ন কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ এবং তাহাদিগের অসংখ্য ভেদে আরও অসংখ্য প্রমেয় আছে। প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া সেগুলিও গোতম-সম্মত প্রমেয়। তবে মহর্ষি গোতম আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই "প্রমেয়" বলিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি এবং মিথ্যাজ্ঞানে সংসার, সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলিকেই বিশেষ করিয়া মহর্ষি গোতম "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়' এই অর্থে মহর্ষি গোতমের এই "প্রমেয়" শব্দটি পারিভাষিক। মহর্ষি গোতম সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলিকেই "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১। "সর্ব্বস্য সুখদুঃখসাধনস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য সুখদুঃখস্য ভোক্তা, যতঃ সুখদুঃখসাধনং সর্ব্বং সর্ব্বঞ্চ সুখদুঃখং জানাতি অতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, ন চাপ্রাপ্যাস্যৈতানি জানাতীত্যত আহ "সর্ব্বানুভাবী"। অনুভবঃ প্রাপ্তিঃ :—তাৎপর্য্যটীকা।

প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি কণাদ যে সকল প্রমেয় পদার্থ পরম্পরায় এবং অতি পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী হয়, তাহাদিগেরও উল্লেখ করিয়া দ্রব্যাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের উপায় বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতম অপেক্ষাকৃত উচ্চাধিকারী শিষ্যদিগকে উপদেশ করায় যে সকল "প্রমেয়" পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান বলিয়া তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, সেই "আত্মা" প্রভৃতি "অপবর্গ" পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই "প্রমেয়" নামে পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন। এই সূত্রের দ্বারা অন্যান্য সামান্য প্রমেয়ের নিষেধ করেন নাই। সে জন্যও এই সূত্রটি বলেন নাই। মহর্ষি গোতম এই সূত্রে "তু" শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, "আত্মা" প্রভৃতি এই পদার্থগুলিই সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী বিশেষ প্রমেয়। এই সকল পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মুমুক্ষুর চরম কর্ত্তব্য, সুতরাং এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই প্রমাণের মুখ্য ফল; এ জন্য "প্রমাণে"র পরে এই সকল পদার্থগুলিই "প্রমেয়" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ফল কথা, এই সকল পদার্থ ভিন্ন আর প্রমেয় নাই, ইহা সূত্রার্থ নহে। সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী প্রমেয় পদার্থ (প্রথম সূত্রে প্রমাণের পরে উল্লিখিত প্রমেয় পদার্থ) এইগুলিই, ইহাই সূত্রার্থ।

উদ্যোতকর এখানে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত "তু" শব্দটি সূত্রোক্ত "প্রমেয়ং" এই কথার পরে যোগ করিয়া অর্থাৎ "প্রমেয়ন্তু প্রমেয়মেব" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলি প্রমেয়ই, অর্থাৎ মুমুক্ষুর যথার্থরূপে জ্ঞাতব্যই, এইরূপ সূত্রার্থও বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে আত্মাদি পদার্থগুলিই কেবল প্রমেয়, এইরূপ সূত্রার্থ না হওয়ায় কোন অনুপপত্তি নাই। উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যা সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, সূত্রকার মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার প্রথম সূত্রে উদ্দিষ্ট "প্রমেয়" পদার্থের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষনামগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রে আত্মাদি পদার্থগুলি মুমুক্ষুর যথার্থরূপে জ্ঞাতব্যই, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য নহে। কোন্ পদার্থগুলি "প্রমেয়"নামে উদ্দিষ্ট, অর্থাৎ তাঁহার কথিত প্রমেয় পদার্থ কি, তাহাই এখানে মহর্ষির বক্তব্য। পরন্তু সূত্রের "তু" শব্দটির অন্যত্র যোগ মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষির যথাস্থানে "তু"শব্দ প্রয়োগ না করার কোন কারণ নাই। সুতরাং উদ্যোতকরের উহা ব্যাখ্যা-কৌশলমাত্র। উদ্যোতকর এখানে আরও ব্যাখ্যাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্যটীকাকারও বলিয়াছেন। মূলকথা, আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলিই "প্রমেয়", অর্থাৎ মহর্ষি গোতমের পরিভাষিত সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী প্রমেয়, ইহাই সূত্রার্থ। এতদ্ভিন্ন সামান্য প্রমেয় আরও অসংখ্য আছে, সেগুলিও মহর্ষি গোতমের সম্মত; সেগুলিকেও মহর্ষি গোতম প্রমেয় বলিতেন। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্য ইহাও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম "প্রমেয়াচ তুলাপ্রামাণ্যবৎ" (২অঃ, ১আঃ, ১৬ সূত্র) এই সূত্রে তুলাদণ্ডকেও প্রমেয় বলিয়াছেন। তুলাদণ্ডের দ্বারা যখন অন্য বস্তুর গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুলাদণ্ড প্রমাণ, আর যখন সেই তুলাদণ্ডেরই গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুলাদণ্ড প্রমেয়। এইরূপে এক পদার্থেও প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব থাকে, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি ঐরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা এই যে,

মহর্ষি যখন তুলাদণ্ডকে প্রমেয় বলিয়াছেন, তখন তাঁহার পরিভাষিত আত্মাদি প্রমেয় ভিন্ন পদার্থগুলিকেও তিনি সামান্যতঃ প্রমেয় বলিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়েই বুঝা যায়। তুলাদণ্ড যখন মহর্ষির কথিত আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তখন ঐ তুলাদণ্ডকে অন্যত্র তিনি "প্রমেয়" বলিলে আর কি বুঝা যাইতে পারে? যাহাতে পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ না হয়, সেইরূপেই ত বুঝিতে হইবে?

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, মহর্ষি গোতম তাঁহার পরিভাষিত বিশেষ "প্রমেয়"গুলির মধ্যে "সুখ" পদার্থের উল্লেখ না করিয়া কেবল "দুঃখ" পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তবে কি উহার দ্বারা "সুখ" বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহাই সূচনা করিয়াছেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা নহে। সুখ পদার্থ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। মহর্ষি সেই সর্ব্বসিদ্ধ সুখানুভূতির অপলাপ করেন নাই। সুখাদি সমস্ত পদার্থকেই দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য হয়, তাহার ফলে মোক্ষ হয়; সুতরাং মুমুক্ষু জন্মাদি সমস্তই দুঃখ বলিয়া ভাবিবেন। "প্রমেয়"-মধ্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া মহর্ষি পূর্ব্বোক্তপ্রকার দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন, সেই সকল পদার্থকেই মহর্ষি গোতম "প্রমেয়" বলিয়াছেন। "প্রমেয়ে"র মধ্যে সুখের উল্লেখ করিলে সেই সুখেরও তত্ত্বজ্ঞান করিতে হয়। সুখকে সুখ বলিয়া না বুঝিয়া অন্যরূপে বুঝিলে সুখের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কিন্তু সুখে বৈরাগ্য ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। সুখ এবং তাহার সাধন জন্মাদিকে দুঃখ বলিয়া একাগ্রচিত্তে ভাবনা বৈরাগ্যের একটি প্রকৃষ্ট উপায়; অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা উহা ঋষিগণের আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত বৈরাগ্যের উপায়। মহর্ষি এই সূত্রে সুখের উল্লেখ না করিয়া বৈরাগ্যের ঐ উপায়টির উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মুমুক্ষু সুখাদি সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভাবিবেন। এই সূত্রে "প্রমেয়" মধ্যে সুখের উল্লেখ করিলে সেই সুখরূপ প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সুখকে সুখ বলিয়াই ভাবিতে হয়। কিন্তু উহা মুমুক্ষুর বৈরাগ্যের বিরোধী। তাই মহর্ষি "প্রমেয়" মধ্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া কেবল "দুঃখের"ই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি সুখ পদার্থের অপলাপ করেন নাই। এই সূত্রের পরবর্ত্তী সূত্রে এবং অন্যান্য সূত্রে মহর্ষি সুখের কথাও বলিয়াছেন।

হরিভদ্র সূরি-বিরচিত "ষড় দর্শনসমুচ্চয়"নামক গ্রন্থে ন্যায়মত বর্ণনায় দেখা যায়,—"প্রমেয়ন্ত্বাত্মদেহাদ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়সুখাদি চ"। এখানে গোতমোক্ত "প্রমেয়" বর্ণনায় সুখের উল্লেখ থাকায় কোন কোন নবীন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে গোতমের প্রমেয়বিভাগসূত্রে "সুখ" শব্দই ছিল, "দুঃখ" শব্দ ছিল না। ফলকথা, গোতম-সম্প্রদায় সর্ব্বাশুভবাদী ছিলেন না, ইহাই তাঁহাদিগের মূল বক্তব্য। ষড় দর্শনসমুচ্চয়ের বহুজ্ঞ টীকাকার গুণরত্ন কিন্তু "আদ্য" শব্দ ও "আদি" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত অপর প্রমেয়গুলির সংগ্রহ বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাত পাঠই গ্রাহ্য। তবে প্রমেয়বর্ণনায় সুখের উল্লেখ আছে কেন? তাহা টীকাকার বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে যে সময়ে ন্যায়সূত্র নানা কারণে

বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন হইতেই গোতমের সূত্র ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নানা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে "দশাবয়ববাদী" নৈয়ায়িক ছিলেন, ইহা বাৎস্যায়নের কথাতেই পাওয়া যায় (৩২ সূত্র-ভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। অনেক আচার্য্য ন্যায়সূত্রের কোন অপেক্ষা না করিয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে ন্যায়মতের বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে গৌতমন্যায়মতের কোন কোন সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া নূতন ন্যায়মতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ "ন্যায়ৈকদেশী" বলিয়া গিয়াছেন। যেমন "তার্কিকরক্ষা" ও "মানসোল্লাস"গ্রন্থে প্রমাণত্রয়বাদী নৈয়ায়িকদিগকে[১] "ন্যায়ৈকদেশী" বলা হইয়াছে। "তার্কিকরক্ষা"র টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়া গিয়াছেন—"ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ"। "ষড় দর্শনসমুচ্চয়ে"র টীকাকার গুণরত্ন ভাসর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত "ন্যায়সার" নামক গ্রন্থের টীকার মধ্যে "ন্যায়ভূষণ"নামে টীকাপ্রধান এই কথা[২] লিখিয়াছেন। এ জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই "ন্যায়ভূষণ" ও প্রমাণত্রয়বাদী ন্যায়ৈকদেশী "ভূষণ" অভিন্ন ব্যক্তি। সে যাহা হউক, "ভূষণে"র ন্যায়-মত বলিয়া যে সকল নূতন মত পাওয়া যায়, তাহা যে প্রচলিত ন্যায়মতের বিরুদ্ধ এবং ন্যায়সূত্রেরও বিরুদ্ধ, এ বিষয়ে সংশয় নাই। "ভূষণের" নূতন ন্যায়মত "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র টীকা "দিনকরী"তেও পাওয়া যায়। এখন কথা এই যে, যেমন কোন আচার্য্য গোতমোক্ত "উপমান" প্রমাণটিকে ছাড়িয়া নূতন ন্যায়মতের প্রচার করিয়াছেন, তদ্রূপ কোন আচার্য্য গোতমোক্ত "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে "দুঃখ"কে ছাড়িয়া দিয়া সেই স্থানে "সুখে"র উল্লেখ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে নূতন ন্যায়মতের সৃষ্টি করিতে পারেন। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরি সেই ন্যায়ৈকদেশীর মতকেই তৎকালে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত দেখিয়া "ষড় দর্শনসমুচ্চয়ে" উল্লেখ করিতে পারেন। তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে কোন মতেরই উল্লেখ করেন নাই। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে ন্যায়সূত্রের প্রকৃত পাঠ স্থির করিতে না পারিয়া কাল্পনিক পাঠানুসারেও কোন কোন নূতন মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। জৈন দার্শনিকগণ ন্যায়সূত্রের পাঠান্তর কল্পনা করিয়াও ন্যায়সূত্রের সাহায্যে নিজ মত সমর্থন করিতেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরি নিজ গ্রন্থে সেই কল্পিত ন্যায়-মতেরও বর্ণন করিতে পারেন। ফল কথা, হরিভদ্র সূরির কথার দ্বারা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতির কথাকে উপেক্ষা করিয়া গোতমের প্রমেয়-সূত্রে "দুঃখ" ছিল না, "সুখ"ই ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

পরন্তু প্রমেয়সূত্রে যদি "দুঃখে"র "উদ্দেশ" না থাকে, তবে প্রমেয়বর্গের যথাক্রমে লক্ষণ ও পরীক্ষাস্থলে দুঃখের "লক্ষণ" ও "পরীক্ষা" থাকিবে কেন? এবং প্রমেয়বর্গের মধ্যে "সুখে"র

১। "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি।
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবম্"।—তার্কিকরক্ষা (প্রমাণ-প্রকরণ)।

২। "ভাসর্ব্বজ্ঞপ্রণীতে ন্যায়সারেঽষ্টাদশটীকাঃ
তাসু মুখ্যা টীকা ন্যায়ভূষণাখ্যা"।—(ষড় দর্শনসমুচ্চয়টীকা)।

উদ্দেশ থাকিলে যথাস্থানে সুখের লক্ষণ ও পরীক্ষা নাই কেন? দুঃখের লক্ষণ ও পরীক্ষা প্রকরণকে কল্পিত বলিলেও যে সুখের জন্য এত কল্পনা, এত আকাঙ্ক্ষা, সেই "সুখে"র লক্ষণ ও পরীক্ষা ন্যায়সূত্রে নাই কেন? মহর্ষি গোতম "প্রমাণ" পদার্থের ন্যায় তাঁহার কথিত "প্রমেয়" পদার্থেরও সবগুলিরই "উদ্দেশ," "লক্ষণ" ও "পরীক্ষা" করিয়াছেন। প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ পদার্থের "উদ্দেশ" করিলে তাহারও "লক্ষণ" ও "পরীক্ষা" করিতেন। পরন্তু যাঁহারা ন্যায়-বিদ্যাকে কেবল "হেতুবিদ্যা" বলিয়া ন্যায়সূত্রের অধ্যাত্ম অংশকে কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে এই প্রমেয়-সূত্রটিও কল্পিত হইবে। কারণ, এই সূত্রে "আত্মা"ও "অপবর্গে"র কথা থাকায় কেবলমাত্র হেতুবিদ্যায় এইরূপ সূত্র থাকিতে পারে না। যদি এই সূত্রটি কল্পিতই হয় অর্থাৎ গোতমের রচিত সূত্রই না হয়, তবে আর গোতমের প্রমেয়-সূত্রে "দুঃখ" ছিল না, "সুখ"ই ছিল, এইরূপ কথা বলা যায় কিরূপে? আর এই সূত্রটি প্রকৃত গোতম সূত্র হইলে দুঃখের লক্ষণ-সূত্র এবং দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণই বা কল্পিত হইবে কেন? এ বিষয়ে অন্যান্য কথা চতুর্থাধ্যায়ে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।৯।

ভাষ্য। তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে, স কিমাপ্তোপদেশ-মাত্রাদেব প্রতিপদ্যতে ইতি? নেত্যুচ্যতে। অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য ইতি। কথম্?

অনুবাদ। তন্মধ্যে আত্মা প্রত্যক্ষ হইতে গৃহীত হয় না অর্থাৎ "প্রমেয়" পদার্থের মধ্যে যে "আত্মা" বলিয়াছেন, তাহাকে লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না। (প্রশ্ন) সেই আত্মা কি কেবল শব্দপ্রমাণ হইতেই গৃহীত হয়? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আত্মাকে কি তবে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে? (উত্তর) ইহা বলা হয় নাই অর্থাৎ আত্মাকে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই, অনুমানপ্রমাণ হইতেও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আপ্তবাক্য হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, ঐ বোধকে সুদৃঢ় করিবার জন্য অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আত্মার মননও করিতে হইবে। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আত্মাকে বুঝা যাইবে কিরূপে? আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অনুমাপক কি? (এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন)।

সূত্র। ইচ্ছাদ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্ ।১০।

অনুবাদ। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, এই পদার্থগুলি আত্মার লিঙ্গ, অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক (এবং লক্ষণ)।

বিবৃতি। "আমি ইচ্ছা করিতেছি," "আমি দ্বেষ করিতেছি," "আমি যত্ন করিতেছি," "আমি বুঝিতেছি," "আমি সুখী," "আমি দুঃখী," ইত্যাদিরূপে সকল জীবই ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানকে নিজের আত্মার ধর্ম্ম বলিয়াই মনের দ্বারা বুঝিয়া থাকে। সর্ব্বজীবের তুল্যভাবে জায়মান পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসংখ্য জ্ঞানকে মহর্ষি গোতম ভ্রম না বলিয়া ঐ ইচ্ছা প্রভৃতিকে জীবাত্মার গুণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণগুলি জীবাত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া জীবাত্মার লক্ষণ। এবং ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলি দেহাদি ভিন্ন জীবাত্মার অনুমাপক। দেহ প্রভৃতি কোন অস্থায়ী পদার্থ জীবাত্মা নহে, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আশ্রয় জীবাত্মা চিরস্থায়ী, ইহা ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, আমি বাল্যকালে যে পদার্থকে দেখিয়া সুখভোগ করিয়াছিলাম, বৃদ্ধকালে সেই আমিই সেই পদার্থ বা তজ্জাতীয় পদার্থ দেখিলে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ঐ পদার্থকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং একই আত্মা দর্শন, সুখানুভব, স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছার কর্ত্তা বা আশ্রয়। একই আত্মা বা আমিই যে সেই পদার্থের বাল্যকালের সেই প্রথম দর্শন হইতে বৃদ্ধকালের পুনর্দ্দর্শন এবং স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা বা আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছি, ইহা আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বুঝিতেছি। কারণ, ঐরূপ স্থলে "যে আমি যে জাতীয় সুখজনক পদার্থকে পূর্ব্বে দেখিয়া এখন তাহাকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই সেই জাতীয় পদার্থকে আজ দেখিতেছি এবং তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি"—এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ আমার জন্মিতেছে। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে "প্রত্যভিজ্ঞা" বলে এবং "প্রতিসন্ধান"ও বলে। "প্রতিসন্ধান" বা "প্রত্যভিজ্ঞা" নামক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ-পদার্থের স্মৃতি আবশ্যক। একের অনুভূত বিষয় অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং যে আত্মা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই আত্মাই দীর্ঘকাল পরে তাহা স্মরণ করিয়া ঐরূপ প্রতিসন্ধান করিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একই আত্মা প্রথম দর্শন, সুখভোগ এবং তাহার পুনর্দ্দর্শন এবং স্মরণ ও গ্রহণের ইচ্ছা করে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। দেহ প্রভৃতি কোন অল্পকালস্থায়ী পদার্থ আত্মা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দর্শনাদি এবং "প্রতিসন্ধান" হইতে পারে না। স্মরণ ব্যতীত যখন "প্রতিসন্ধান" অসম্ভব, তখন স্মরণের উপপত্তির জন্য দর্শন হইতে স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটি আত্মা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার "প্রতিসন্ধান"রূপ যথার্থ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হয়। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঐরূপ আত্মা মানেন নাই। তাঁহাদিগের মতে "অহং অহং" এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের সমষ্টি ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু যখন আত্মার পূর্ব্বোক্ত প্রকার "প্রতিসন্ধান" হইতেছে, তখন আত্মাকে ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী কোন পদার্থ বলা যায় না। আত্মার প্রত্যক্ষ বিষয়ের আবার যখন স্মরণ হইতেছে, তখন স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী আত্মা অবশ্যই আছে। এইরূপে ইচ্ছার দ্বারা এবং দ্বেষ, যত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের দ্বারা দেহাদি ভিন্ন

চিরস্থায়ী আত্মার অনুমান হয়। সুতরাং সূত্রোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক।

ভাষ্য। যজ্জাতীয়স্যার্থস্য সন্নিকর্ষাৎ সুখমাত্মোপলব্ধবান্ তজ্জাতীয়মেবার্থং পশ্যন্নুপাদাতুমিচ্ছতি। সেয়মাদাতুমিচ্ছা একস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্ভবতি লিঙ্গমাত্মনঃ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি। এবমেকস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্দুঃখহেতৌ দ্বেষঃ। যজ্জাতীয়োঽস্যার্থঃ—সুখহেতুঃ প্রসিদ্ধস্তজ্জাতীয়মর্থং পশ্যন্নাদাতুং প্রযততে সোঽয়ং প্রযত্ন একমনেকার্থদর্শিনং দর্শনপ্রতিসন্ধাতারমন্তরেণ ন স্যাৎ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি। এতেন দুঃখহেতৌ প্রযত্নো ব্যাখ্যাতঃ। সুখদুঃখস্মৃত্যা চায়ং তৎসাধনমাদদানঃ সুখমুপলভতে, দুঃখমুপলভতে, সুখদুঃখে বেদয়তে, পূর্ব্বোক্ত এব হেতুঃ। বুভুৎসমানঃ খল্বয়ং বিমৃশতি কিং স্বিদিতি। বিমৃশংশ্চ জানীতে ইদমিতি। তদিদং জ্ঞানং বুভুৎসাবিমর্শাভ্যামভিন্নকর্ত্তৃকং গৃহ্যমাণমাত্মলিঙ্গং, পূর্ব্বোক্ত এব হেতুরিতি। তত্র দেহান্তরবদিতি বিভজ্যতে। যথা অনাত্মবাদিনো দেহান্তরেষু নিয়তবিষয়া বুদ্ধিভেদা ন প্রতিসন্ধীয়ন্তে তথৈকদেহবিষয়া অপি ন প্রতিসন্ধীয়েরন্ অবিশেষাৎ। সোঽয়মেকসত্ত্বস্য সমাচারঃ স্বয়ং দৃষ্টস্য স্মরণং নান্যদৃষ্টস্য নাদৃষ্টস্যেতি। এবং খলু নানাসত্ত্বানাং সমাচারোঽন্যদৃষ্টমন্যো ন স্মরতীতি। তদেতদুভয়মশক্যমনাত্মবাদিনা ব্যবস্থাপয়িতুমিতি এবমুপপন্নমস্ত্যাত্মেতি।

অনুবাদ। যে জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষবশতঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষবশতঃ) আত্মা (অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ) সুখ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তজ্জাতীয় পদার্থকেই দর্শন করতঃ (ঐ আত্মা) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, সেই এই গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা—অনেকার্থদর্শী অর্থাৎ বিভিন্ন-কালীন নানা পদার্থদর্শী এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান হেতুক (অর্থাৎ "যে জাতীয় সুখজনক পদার্থকে পূর্ব্বে দেখিয়া যে আমি এখন তাহাকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিতেছি," এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া) আত্মার (পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী একটি অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থের) লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক

হয়। "নিয়তবিষয়" অর্থাৎ যাহার বিষয় ব্যবস্থিত বা নির্দ্দিষ্ট, এমন "বুদ্ধিভেদমাত্রে" অর্থাৎ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-সম্মত আলয়বিজ্ঞান নামক ক্ষণিক-বুদ্ধি-বিশেষ-মাত্রে দেহান্তরের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে ভিন্ন দেহে যেমন আলয়-বিজ্ঞানের ঐরূপ প্রতিসন্ধান হয় না, তদ্রূপ (একদেহেও পূর্ব্বোক্ত প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না।

(ইচ্ছার পরে দ্বেষের আত্ম-লিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন)। এইরূপ (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপদ্যমান) দুঃখজনক পদার্থ-বিষয়ে দ্বেষ অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির (পূর্ব্বোক্ত প্রকার) দর্শনপ্রতিসন্ধান-হেতুক আত্মার লিঙ্গ হয়। (প্রযত্নের আত্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন) যে জাতীয় পদার্থ এই আত্মার সুখজনক বলিয়া "প্রসিদ্ধ" (জ্ঞাত), তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করতঃ (তিনি) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, সেই এই প্রযত্ন অনেকার্থদর্শী একটি দর্শন-প্রতিসন্ধাতা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ব্যতীত হয় না। নিয়ত বিষয়-বুদ্ধিভেদমাত্রে দেহান্তরের ন্যায় (সেই প্রত্যভিজ্ঞা-বিশেষ) সম্ভব হয় না। (সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রযত্নও পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী আত্মার অনুমাপক হয়)। ইহার দ্বারা (সুখজনক পদার্থের প্রযত্নের ব্যাখ্যার দ্বারা) দুঃখজনক পদার্থে প্রযত্ন ব্যাখ্যাত হইল। (অর্থাৎ সুখজনক পদার্থে প্রযত্ন যে ভাবে আত্মার অনুমাপক বলা হইল, দুঃখ-জনক পদার্থে প্রযত্নও সেই ভাবে (প্রত্যভিজ্ঞার সাহায্যে) আত্মার অনুমাপক বুঝিতে হইবে)।

(সুখ ও দুঃখের এক সঙ্গে আত্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন) সুখ ও দুঃখের স্মৃতিবশতঃ এই আত্মা তাহার সাধনকে (সুখ-সাধন পদার্থ ও দুঃখসাধন পদার্থকে) গ্রহণ করতঃ সুখ উপলব্ধি করেন, দুঃখ উপলব্ধি করেন, সুখ দুঃখ উভয়কে অনুভব করেন ; পূর্ব্বোক্তই হেতু (অর্থাৎ যে আমি পূর্ব্বে সুখ দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই তাহার স্মরণ পূর্ব্বক তাহার সেই সাধন গ্রহণ করতঃ সুখ ও দুঃখ লাভ করিয়া তাহার উপলব্ধি করিতেছি। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধানই ঐ স্থলে সুখদুঃখের প্রথম অনুভব, তাহার স্মরণ ও পুনরায় সুখ-দুঃখানুভবের এক-কর্ত্তৃকত্ব নিশ্চয়ে হেতু। সুতরাং ঐরূপে জায়মান সুখ ও দুঃখও চিরস্থির আত্মার অনুমাপক)।

(জ্ঞানের আত্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন) বুভুৎসমান হইয়া অর্থাৎ কোন পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ এই আত্মা "ইহা কি ?" এইরূপে সংশয় করেন, সংশয়

করতঃ "ইহা" এইরূপ জানেন (নিশ্চয় করেন), সেই এই জ্ঞান (পরবর্ত্তী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) বুঝিবার ইচ্ছা ও সংশয়ের সহিত এককর্ত্তৃক বলিয়া জ্ঞায়মান হইয়া অর্থাৎ যে আমি বুঝিবার ইচ্ছা করিয়া সংশয় করিয়াছিলাম, সেই আমি নিশ্চয় করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-নামক মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া আত্মলিঙ্গ অর্থাৎ চিরস্থির আত্মার অনুমাপক হয়। পূর্ব্বোক্তই হেতু (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাই ঐ স্থলে বুঝিবার ইচ্ছা, সংশয় ও নিশ্চয়ের এক-কর্ত্তৃকত্ব নিশ্চয়ে হেতু)।

তন্মধ্যে (পূর্ব্বোক্ত কথার মধ্যে) "দেহান্তরবৎ" এই কথাটি বিশদরূপে বুঝাইতেছি। যেমন অনাত্মবাদীর অর্থাৎ যাঁহারা "অহং অহং" এই আকারের ক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ মানেন না, সেই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের (মতে) দেহান্তর-সমূহে অর্থাৎ নিজ দেহ হইতে ভিন্ন দেহে "নিয়ত বিষয়" (ক্ষণকাল-মাত্র-স্থায়ী বলিয়া যাহাদিগের প্রত্যেকের বিষয় ব্যবস্থিত বা নিয়মবদ্ধ এমন) বুদ্ধি-ভেদগুলি (আলয়-বিজ্ঞান নামক বুদ্ধি-বিশেষ-গুলি) প্রতিসংহিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় না, তদ্রূপ একদেহগত (নিজ নিজ দেহগত) বুদ্ধিভেদগুলিও (আলয়-বিজ্ঞান নামক অহংজ্ঞানগুলিও) প্রতিসংহিত (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাত) হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ নাই। (অর্থাৎ ভিন্নদেহগত বিজ্ঞানগুলি যেমন ভিন্ন, তদ্রূপ নিজ দেহগত বিজ্ঞানগুলিও পরস্পর ভিন্ন। ভিন্ন আত্মার যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, তখন একদেহগত ভিন্ন আত্মারও পূর্ব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। ভিন্ন দেহগত বিজ্ঞান হইতে এক দেহগত বিজ্ঞানগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপযোগী কোন বিশেষ নাই) সেই এই এক আত্মার সমাচার (সিদ্ধান্ত)— স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয়, অন্যদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (অজ্ঞাত) পদার্থের স্মরণ হয় না। এই রূপই নানা আত্মার সমাচার (সিদ্ধান্ত)—অন্য কর্ত্তৃক দৃষ্ট পদার্থ অন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না (অর্থাৎ প্রতিদেহে এক আত্মাই হউক, আর ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ অসংখ্য আত্মাই হউক, উভয় পক্ষেই স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ, এই দুইটি সিদ্ধান্ত)। সেই এই উভয় (উভয়-পক্ষ-স্বীকৃত স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ) অনাত্মবাদী অর্থাৎ যিনি অহং অহং এই আকারের ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন চিরস্থির আত্মা মানেন না, সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। এইরূপে (কথিত প্রকারে) আত্মা (চিরস্থির অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ) আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। এই শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাত্মারই পরমপুরুষার্থ বলিয়া প্রমেয়বর্গের মধ্যে জীবাত্মাই প্রধান। তাই মহর্ষি প্রমেয়বর্গের মধ্যে জীবাত্মারই প্রথম উদ্দেশ করিয়া তদনুসারে প্রথমতঃ জীবাত্মারই লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। মনোগ্রাহ্য ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, জীবাত্মার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ। অর্থাৎ যাহাতে মনোগ্রাহ্য ঐ ইচ্ছাদি গুণ জন্মে, তাহাই জীবাত্মা। পরন্তু জীবাত্মার যেগুলি লক্ষণ, সেইগুলিই শ্রুতিসিদ্ধ জীবাত্মার সাধক। ইহা বলিবার জন্য মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণেও ইচ্ছাদিকে জীবাত্মার লিঙ্গ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারও এই সূত্রে মহর্ষির ঐ বিশেষ বক্তব্যটি (ইচ্ছাদির আত্ম-লিঙ্গত্ব) ব্যাখ্যা করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন।

নিজ-দেহবর্ত্তী জীবাত্মা সর্ব্বজীবেরই মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমি নাই, ইহা কেহ বুঝে না ; আমি আছি কি না, এরূপ সংশয়ও কাহারও হয় না। পরন্তু "আমি আছি" ইহা মনের দ্বারা নিঃসংশয়ে সকল জীবই বুঝিয়া থাকে। যিনি ইহা বুঝিয়াও সত্যের অপলাপ করিয়া "আমি নাই" ইহা বলিবেন, তিনি নিজের অস্তিত্বের অপলাপ করিয়া উপহাসাস্পদ হইবেন। শূন্যবাদী, আত্মার একেবারে নাস্তিত্ব সাধন করিতে যাইয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার নাস্তিত্ব-সাধক প্রমাণই আত্মার অস্তিত্ব-সাধক হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থে সামান্যতঃ কেহ বিবাদ করিতে পারেন না, বিবাদকারী নিজে না থাকিলে বিবাদ করে কে ? কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন ;—"আত্মা প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে"। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, "আমি" বলিয়া আত্মার যে মানস বোধ, তাহা আত্মার সামান্য জ্ঞান। ইহা প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার নহে। কারণ, উহা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। আমি কে ? ইহা যথার্থরূপে প্রত্যক্ষ না করিলে আত্মার বিশেষ জ্ঞান বা প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। ঐ প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার সমাধি ব্যতীত কাহারই হইতে পারে না। মূলকথা, দেহাদিভিন্নত্বরূপে প্রকৃত আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহেন। তাহা হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য শ্রুতিতে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধি থাকিবে কেন ? এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রমাণসংপ্লবের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেও (তৃতীয় সূত্রভাষ্যে) আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষের কথা না বলিয়া, যোগসমাধি-জাত অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথাই বলিয়াছেন এবং অনুমানভাষ্যে ইচ্ছাদির দ্বারা "অপ্রত্যক্ষ" আত্মার "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। ফলতঃ আত্মা দেহাদিভিন্নত্বরূপে লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, ইহাই ভাষ্যার্থ। প্রথমতঃ শ্রুতি প্রভৃতি আপ্তবাক্য হইতে যথার্থরূপে আত্মার শ্রবণ অর্থাৎ শাব্দবোধ করিতে হইবে। পরে ঐ জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য ঐ আত্মার মনন অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ স্বরূপে অনুমান করিতে হইবে। সে কিরূপে ? তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

ভাষ্যে "যজ্জাতীয়স্য" ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি স্মরণ এবং "তজ্জাতীয়ং পশ্যন্" এই কথার দ্বারা লিঙ্গপরামর্শরূপ অনুমান-প্রমাণই সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রথমজাত পদার্থদর্শন হইতে পরজাত গ্রহণেচ্ছা পর্য্যন্ত সবগুলিই এক-কর্তৃক। ঐরূপে জায়মান ঐ ইচ্ছাই উহাদিগের

সকলের এক-কর্তৃকত্ব সূচনা করিতেছে। একই ব্যক্তি ঐ সবগুলির কর্তা, উহা নিঃসংশয়ে কি করিয়া বুঝিব? তাই হেতু বলিয়াছেন,—"একস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাৎ"। অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই একই ব্যক্তি ঐ সবগুলির কর্তা, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। কারণ, ঐ স্থলে "যে আমি যে জাতীয় সুখজনক পদার্থকে পূর্ব্বে দেখিয়া এখন তাহাকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই সেই জাতীয় পদার্থকে দেখিতেছি," এইরূপ দর্শনবিষয়ক প্রতিসন্ধান অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। উহা সর্ব্ব-সম্মত। ঐ প্রত্যভিজ্ঞাতে পূর্ব্বানুভবজন্য সংস্কার-বশতঃ স্মরণ আবশ্যক। সুতরাং দর্শন হইতে স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটী কর্তা আবশ্যক। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাহার স্মরণ করিতে পারেন। দর্শনের কর্তা একজন, স্মরণের কর্তা অন্য, ইহা কখনই হইতে পারে না। মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত দর্শনাদির একটি কর্তা না হইলে স্মরণের সম্ভাবনা না থাকায়, পূর্ব্বোক্ত প্রকার মানস-প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বসম্মত প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। সুতরাং বুঝা যায়, যিনি ঐ স্থলে দর্শনের কর্তা, স্মরণের কর্তা, অনুমানের কর্তা এবং ইচ্ছার কর্তা, তিনিই আত্মা। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছার দ্বারা চির-স্থির একটি আত্মারই অনুমান হয়, ইহা বলা হইল। শরীর অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে ঐ দর্শন-স্মরণাদির কর্তা বলা যায় না। কারণ, উহারা চির-স্থির নহে। ইহ জন্মেই বাল্যযৌবনাদি কালভেদে পূর্ব্বদেহের বিনাশ ও দেহান্তর-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাল্যদেহের দৃষ্ট পদার্থ বৃদ্ধদেহ কিরূপে স্মরণ করিবে? নেত্রদৃষ্ট পদার্থ নেত্র নষ্ট হইয়া গেলে অন্য ইন্দ্রিয় কি করিয়া স্মরণ করিবে? মন জ্ঞানাদির করণত্বরূপেই সিদ্ধ, তাহা কর্তা হইতে পারে না। এ সকল কথা তৃতীয়াধ্যায়ে আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যথাস্থানেই তাহা বিশদ প্রকাশিত হইবে।

অনেক ভাষ্যগ্রন্থে "ভবন্তী লিঙ্গমাত্মনঃ"—এইরূপ পাঠ আছে। ভাষ্যোক্ত প্রকারে গ্রহণেচ্ছা অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান-প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়। প্রথম পদার্থ দর্শন হইতে তজ্জাতীয় পদার্থের পুনর্দর্শনাদি কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটি আত্মা না থাকিলে ঐরূপে গ্রহণেচ্ছা জন্মিতেই পারে না, সুতরাং ঐ প্রকার ইচ্ছা চির-স্থির আত্মার অনুমাপক, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে তাৎপর্য্য। "ভবন্তী" ইহার ব্যাখ্যা উৎপদ্যমানা। তাৎপর্য্যটীকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে এ পাঠ ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে "অহং" এই আকারের জ্ঞান ভিন্ন চিরস্থির আত্মা নাই। ঐ অহংজ্ঞানের নাম আলয়-বিজ্ঞান। উহা ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণকালমাত্র-স্থায়ী। পূর্ব্ব-জাত "অহংজ্ঞান" পরক্ষণেই আর একটি অহংজ্ঞান জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। এইরূপে নদী-প্রবাহের ন্যায়, দীপশিখার ন্যায়, "অহং অহং অহং" এইরূপ আকারে প্রতিক্ষণ জায়মান আলয়-বিজ্ঞানের প্রবাহই আত্মা। ইহারই নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ। ইহারই নাম চিত্ত। একদেহগত ঐ বিজ্ঞান-প্রবাহ বা চিত্ত সেই দেহের পক্ষেই আত্মা, উহা অন্য দেহের আত্মা নহে। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত প্রকার বুদ্ধি ভিন্ন আত্মা বলিয়া আর কিছু মানেন নাই; তাই তাঁহাদিগকে "বৌদ্ধ"

বলা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রুতি-সম্মত নিত্য আত্মা মানেন নাই; তাই বেদ-প্রামাণ্য-বিশ্বাসী আস্তিকগণ তাঁহাদিগকে "নাস্তিক" এবং "অনাত্মবাদী" বা "নৈরাত্ম্যবাদী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণ কেহ বেদ না মানিলেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেন। মহর্ষি মনুও বেদনিন্দককে নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যিনি পরলোক মানেন না, তিনি "নাস্তিক," ইহাই কিন্তু নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ[1]। ঐ অর্থে বেদ না মানিয়াও আস্তিক হওয়া যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্ববর্ণিত বৌদ্ধসম্মত "আলয়-বিজ্ঞানকে" লক্ষ্য করিয়া এখানে বলিয়াছেন,—"নিয়তবিষয়ে" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্মত "অহং-জ্ঞান"গুলি প্রত্যেকেই ক্ষণকাল-মাত্র স্থায়ী। সুতরাং উহারা নিয়তবিষয় অর্থাৎ উহাদিগের বিষয় নির্দ্দিষ্ট বা ব্যবস্থিত, উহারা কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না। অতএব ঐ "অহংজ্ঞানে" পূর্ব্বোক্ত দর্শন প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। "প্রতিসন্ধান" বলিতে এখানে প্রত্যভিজ্ঞা; উহা প্রত্যক্ষ-বিশেষ। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ ব্যতীত ঐ প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে না। যখন পূর্ব্ববর্ণিত স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দর্শনপ্রতিসন্ধান জন্মে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, (প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না। মানস-প্রত্যক্ষরূপ ঐ প্রত্যভিজ্ঞায় মনঃ স্বতঃ প্রমাণ) তখন ঐ স্থলে আত্মা অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ করিয়া থাকে; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বৌদ্ধসম্মত অহংজ্ঞানরূপ আত্মা যখন ক্ষণমাত্র-স্থায়ী, তখন যে অহংজ্ঞানরূপ আত্মা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হওয়ায়, সে আত্মা আর পরে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। পরজাত অহংজ্ঞানরূপ কোন আত্মাও তাহা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, সেই পরজাত আত্মা পূর্ব্বে সে পদার্থ দেখে নাই, তখন তাহার জন্মই হয় নাই। অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। যিনি দ্রষ্টা, তাঁহাতেই সংস্কার জন্মে; তজ্জন্য তিনিই স্মরণ করেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন, নচেৎ তাঁহাদিগের মতে একদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মা অন্যদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ অন্য আত্মার দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে না কেন? রামের দৃষ্ট বিষয় শ্যাম না দেখিলে শ্যাম তাহা স্মরণ করিতে পারে কি? অতএব বৌদ্ধসম্মত একদেহগত ক্ষণিক "অহংজ্ঞান"গুলিও পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অন্য-দেহগত "অহংজ্ঞান"গুলির ন্যায় একে অন্যের অনুভূত বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণের সম্ভাবনা না থাকায় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাও অসম্ভব। সুতরাং বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক অহংজ্ঞানগুলি কোনরূপেই "আত্মা" হইতে পারে না। ভাষ্যকার "নিয়তবিষয়ে" এই কথার দ্বারা বৌদ্ধ-সম্মত আলয়বিজ্ঞানে প্রত্যভিজ্ঞা কেন সম্ভব নহে, তাহার হেতু সূচনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ক্ষণিক অহংজ্ঞানগুলির কোনটিই এক ক্ষণের অধিক

১। **"অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ" (৪।৪।৬০।—পাণিনিসূত্র। অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ।—নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী)।**

কাল স্থায়ী না হইলেও নির্ব্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ "অহংজ্ঞানে"র প্রবাহ চলিতেই থাকে। ঐ অহংজ্ঞানের প্রবাহই আত্মা। উহার নাম "অহংজ্ঞান-সন্তান"। উহার মধ্যগত এক একটি "অহংজ্ঞানের" নাম "অহংজ্ঞানসন্তানী"। নির্ব্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মার উচ্ছেদ না হওয়ায় তাহাতে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার এই সমাধানের অসারতা সূচনার জন্যই "বুদ্ধিভেদমাত্রে" এই স্থলে "মাত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধ-সম্মত অহংজ্ঞানের প্রবাহ বা সন্তান ঐ অহংজ্ঞানসন্তানী হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। ঐ বুদ্ধিপ্রবাহও কতকগুলি বুদ্ধি-বিশেষ মাত্র। ক্ষণমাত্র-স্থায়ী বলিয়া যখন কোন বুদ্ধিবিশেষেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না, তখন বুদ্ধিপ্রবাহেই বা কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে ? ঐ বুদ্ধিবিশেষ ভিন্ন বুদ্ধিপ্রবাহ ত কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে ? যদি ঐ অহংজ্ঞানের প্রবাহ অতিরিক্ত পদার্থই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণের জন্য তাহাকে চিরস্থির পদার্থই বলিতে হইবে—তাহা হইলে চিরস্থির অতিরিক্ত আত্মা মানাই হইল,—নাম মাত্রে কোন বিবাদ নাই। যে কোন নামে চিরস্থির আত্মা মানিলেই পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে হইবে।

এইরূপে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত প্রতিসন্ধানের দ্বারাই ইচ্ছাদিকে চিরস্থির আত্মার অনুমাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্য-বর্ণিত ঐ ইচ্ছাদি স্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণের সহিত পূর্ব্ব-জাত জ্ঞান ও পরজাত জ্ঞানের একবিষয়ত্বরূপে যে প্রতিসন্ধান হয়, তাহাই চিরস্থির আত্মসিদ্ধিতে ব্যতিরেকী হেতু, সূত্রোক্ত ইচ্ছাদি গুণই বস্তুতঃ হেতু নহে[১]। "পূর্ব্বোক্ত এব হেতুঃ" এই কথার দ্বারাও পরে দুই স্থলে ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রতিসন্ধানরূপ হেতুকেই স্মরণ করাইয়াছেন। ভাষ্য-বর্ণিত ইচ্ছাদি স্থলে ঐরূপ প্রতিসন্ধান জন্মে বলিয়াই সূত্রকার ইচ্ছাদিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন। লিঙ্গ বলিতে এখানে অনুমাপক মাত্র।

ইচ্ছাদিকে আত্মার লক্ষণ বলিবার জন্যও ঐরূপ ভাবে সূত্র বলিতে হইয়াছে। অনুমান-ভাষ্যে ভাষ্যকার যে ভাবে আত্মার "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা এবং সেখানে বার্ত্তিককার প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানেও বার্ত্তিককার চরমকল্পে এই সূত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যান্তর প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্মত আত্মাতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন-প্রদর্শিত অনুপপত্তির উদ্ধারের জন্য দিঙ্-নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ মহামনীষিগণ যেরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে তাহার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় তাহার বিশদ প্রকাশ করিয়াছেন। "শারীরক ভাষ্য", "ভামতী", উদয়নের "বৌদ্ধাধিকার" ও "কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতের বিশদ সমালোচনা ও সমীচীন খণ্ডন হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সে সব কথা এখানে পরিত্যক্ত হইল। বাৎস্যায়ন এই ন্যায়-ভাষ্যে বহু স্থানেই বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

১। "স্মৃতিঃ পূর্ব্বাপরপ্রত্যয়াভ্যামেককর্ত্তৃকা উভাভ্যাং সহ একবিষয়ত্বেন প্রতিসন্ধীয়মানত্বাৎ"—ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা।

ইতঃপূর্ব্বেও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ গিয়াছে। এই সূত্র-ভাষ্যের ন্যায় অন্য সূত্র-ভাষ্যেও স্পষ্ট বৌদ্ধপ্রসঙ্গ প্রচুর আছে—তবুও "বিশ্বকোষে" বাৎস্যায়নের অতি-প্রাচীনত্ব সমর্থনের জন্য লিখিত হইয়াছে,—"বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়াছেন; কিন্তু বাৎস্যায়ন কোথাও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই" ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ, ন্যায় শব্দ—৫০১পৃষ্ঠা)।

ভাষ্য। তস্য ভোগাধিষ্ঠানম্।

অনুবাদ। তাহার (পূর্ব্বসূত্রবর্ণিত জীবাত্মার) ভোগের অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের অধিষ্ঠান (স্থান)।

সূত্র। চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ॥১১॥

অনুবাদ। চেষ্টার আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এবং অর্থের অর্থাৎ সুখ-দুঃখের আশ্রয় শরীর। (অর্থাৎ চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থাশ্রয়ত্ব, এই তিনটি শরীরের লক্ষণ)।

ভাষ্য। কথং চেষ্টাশ্রয়ঃ? ঈপ্সিতং জিহাসিতং বাঽর্থমধিকৃত্য ঈপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপায়ানুষ্ঠানলক্ষণা সমীহা চেষ্টা, সা যত্র বর্ত্ততে তচ্ছরীরম্। কথমিন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ? যস্যানুগ্রহেণানুগৃহীতানি উপঘাতে চোপহতানি স্ববিষয়েষু সাধ্বসাধুষু বর্ত্তন্তে স এষামাশ্রয়স্তচ্ছরীরম্। কথমর্থাশ্রয়ঃ? যস্মিন্নায়তনে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপন্নয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ প্রতিসংবেদনং প্রবর্ত্ততে স এষামাশ্রয়স্তচ্ছরীরমিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) চেষ্টাশ্রয় কিরূপে? (অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ চেষ্টা শরীর ভিন্ন অন্য পদার্থেও থাকে, আবার কোন শরীর-বিশেষেও নাই; সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয়ীভূত অথবা পরিত্যাগের ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাপ্তির ইচ্ছা বা পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ "প্রযুক্ত" অর্থাৎ কৃতযত্ন ব্যক্তির তাহার (প্রাপ্তি বা পরিহারের) উপায়ানুষ্ঠানরূপ সমীহা 'চেষ্টা'; তাহা যেখানে থাকে, তাহা "শরীর"। (পূর্ব্বপক্ষ) "ইন্দ্রিয়াশ্রয়" কিরূপে? (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলেই যদি শরীর হয়, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে ইন্দ্রিয় সংযোগকালে ঘটাদি পদার্থও শরীর হইয়া পড়ে; সুতরাং "ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব" শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) যাহার অনুগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ যাহার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট হইয়া এবং যাহার বিনাশে অবশ্য বিনষ্ট হইবে, এমন বহিরিন্দ্রিয়বর্গ সাধু ও অসাধু স্ববিষয়সমূহে (গন্ধাদি বিষয়সমূহে)

বর্ত্তমান হয়, তাহা ইহাদিগের (ইন্দ্রিয়-বর্গের) আশ্রয়—তাহা শরীর। (পূর্ব্বপক্ষ) অর্থাশ্রয় কিরূপে? অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত গন্ধাদি "অর্থ" ঘটাদি পদার্থেও আছে; সুতরাং "অর্থাশ্রয়ত্ব" শরীরের লক্ষণ বলা যায় না। (উত্তর) যে অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষহেতুক উৎপন্ন সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হয়, তাহা ইহাদিগের (সুখ-দুঃখরূপ অর্থের) আশ্রয়, তাহা শরীর।

টিপ্পনী। "তস্য ভোগাধিষ্ঠানং" এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সূত্র-বাক্যের সহিত ইহার যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভাষ্যকার প্রথমতঃ ঐ কথার দ্বারা শরীর আত্মার ভোগস্থান, শরীর না থাকিলে আত্মার কোন ভোগ হইতে পারে না; সুতরাং শরীরই আত্মার সকল অনর্থের পরম নিদান, এই তত্ত্ব জানাইয়া আত্মার পরে শরীরের কথা বলাই সংগত, ইহাই সূচনা করিয়াছেন। 'চেষ্টাশ্রয়ত্ব', 'ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব', 'অর্থাশ্রয়ত্ব'—এই তিনটি শরীরের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ। চেষ্টা বলিতে ক্রিয়ামাত্র নহে। হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহারের ইচ্ছাবশতঃ যত্নবান্ হইয়া তাহার উপায়ানুষ্ঠানরূপ যে শারীরিক ক্রিয়া, তাহাই চেষ্টা। ঘটাদি পদার্থে তাহা নাই। সমাহিত ব্যক্তির শরীরে এবং পাষাণ-মধ্যবর্ত্তী ভেকাদি-শরীরে তাহা না থাকিলেও তাহার যোগ্যতা আছে। বৃক্ষাদিরও চেষ্টা আছে। বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্‌বর্গের জীবন, চৈতন্য ও সুখদুঃখের সত্তা মন্বাদি শাস্ত্রে কীর্ত্তিত, অনেক দার্শনিক কর্তৃক সমর্থিত এবং কালিদাসাদি কবিগণ কর্ত্তৃক গীত আছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বৃক্ষাদিকে শরীরের লক্ষণের লক্ষ্য বলেন নাই। ইন্দ্রিয়াশ্রয় বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বা ইন্দ্রিয়ের অধিকরণ নহে। শরীর থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকে, শরীর নষ্ট হইলে ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়, এই অর্থে শরীরকে ইন্দ্রিয়াশ্রয় বলা হইয়াছে। ঐ ভাবে ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ হইতে পারে। 'অর্থ' বলিতে এখানে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ নহে। গন্ধাদি প্রত্যক্ষ-জন্য সুখ ও দুঃখই এখানে "অর্থ" শব্দের প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ গন্ধাদি অর্থ-প্রযুক্ত সুখদুঃখের আশ্রয় বলিয়াই শরীরকে অর্থাশ্রয় বলা হইয়াছে। শরীর না থাকিলে ঐ সুখ-দুঃখ হয় না এবং বিশ্বব্যাপী জীবাত্মার শরীর-প্রদেশেই ঐ সুখদুঃখের উৎপত্তি ও অনুভূতি হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "অর্থাশ্রয়ত্ব" শরীরের লক্ষণ হইতে পারে।

ভাষ্য। ভোগসাধনানি পুনঃ।

অনুবাদ। (পূর্ব্বোক্ত আত্মার) ভোগসাধন কিন্তু, অর্থাৎ সুখদুঃখ-ভোগের পরম্পরায় সাধন কিন্তু—

সূত্র। ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। ভূতজন্য অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক ঘ্রাণ, রসন,

চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, (এই পাঁচটি) ইন্দ্রিয়। (অর্থাৎ ঘ্রাণত্ব প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম্ম, ঘ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ)।

ভাষ্য। জিঘ্রত্যনেনেতি ঘ্রাণং, গন্ধং গৃহ্লাতীতি। রসয়ত্যনেনেতি রসনং, রসং গৃহ্লাতীতি। চষ্টেঽনেনেতি চক্ষুঃ, রূপং পশ্যতীতি। ত্বক্স্থানমিন্দ্রিয়ং ত্বক্, তদুপচারঃ স্থানাদিতি। শৃণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং, শব্দং গৃহ্লাতীতি। এবং সমাখ্যানির্ব্বচনসামর্থ্যাদ্বোধ্যং স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণানীন্দ্রিয়াণীতি। ভূতেভ্য ইতি নানাপ্রকৃতীনামেষাং সতাং বিষয়নিয়মো নৈকপ্রকৃতীনাং, সতি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি।

অনুবাদ। ইহার দ্বারা ঘ্রাণ করে, এ জন্য ঘ্রাণ। (ঘ্রাণ করে, ইহার অর্থ) গন্ধ গ্রহণ করে। ইহার দ্বারা আস্বাদ করে, এ জন্য রসন। (আস্বাদ করে, ইহার অর্থ) রস গ্রহণ করে। ইহার দ্বারা দেখে, এ জন্য চক্ষুঃ। (দেখে, ইহার অর্থ) রূপ দর্শন করে। ত্বক্স্থান অর্থাৎ চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয় ত্বক্। স্থান-বশতঃ অর্থাৎ চর্ম্ম ঐ ইন্দ্রিয়ের স্থান বলিয়া তাহাতে (চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়ে) উপচার (চর্ম্মবাচক "ত্বচ্" শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ)। ইহার দ্বারা শ্রবণ করে, এ জন্য শ্রোত্র, (শ্রবণ করে, ইহার অর্থ) শব্দ গ্রহণ করে। এইরূপ সমাখ্যার নির্ব্বচন-সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঘ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি সংজ্ঞার যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইল, সেইরূপ অর্থে সামর্থ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণ, ইহা বুঝিবে। (অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি সাধনত্বই ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ)। ইহারা নানাপ্রকৃতি হইলে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান-সম্ভূত হইলে ইহাদিগের (ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের) বিষয় ব্যবস্থা হয়; একপ্রকৃতি হইলে অর্থাৎ কোন একটি মাত্র উপাদান-সম্ভূত হইলে ইহাদিগের বিষয় ব্যবস্থা হয় না, বিষয় ব্যবস্থা হইলেই ইহাদিগের স্ববিষয়-গ্রহণ-লক্ষণত্ব হয়, এ জন্য 'ভূতেভ্যঃ' এই কথাটি বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণই বক্তব্য। ঐ ইন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ সূচনার জন্যই ভাষ্যকার প্রথমতঃ "ভোগসাধনানি পুনঃ" এই ভাষ্যের দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সূত্রবাক্যের সহিত উহার যোজনা বুঝিতে হইবে। সুখদুঃখের সাক্ষাৎকারের নাম ভোগ। মন তাহার সাক্ষাৎ সাধন হইলেও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় পাঁচটি তাহার পরম্পরায় সাধন। শরীর তাহার অধিষ্ঠান, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গই কিন্তু তাহার পরম্পরায় সাধন। মহর্ষি এই একটি সূত্রের দ্বারাই ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। তাহার দ্বারাও ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। সূত্রে "ইন্দ্রিয়াণি"

এই অংশ লক্ষ্য-নির্দ্দেশ। উহার ব্যাখ্যা "ঘ্রাণাদীনি"। ঘ্রাণাদি শব্দের দ্বারা কেবল ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের বিশেষ উদ্দেশরূপ বিভাগ করা হয় নাই, উহার দ্বারাই পাঁচটি লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার ঐ ঘ্রাণাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থের ব্যাখ্যার দ্বারা ঐ পাঁচটি লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—গন্ধগ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়। রস-গ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় রসনেন্দ্রিয়। রূপ দর্শনের সাধন ইন্দ্রিয় চক্ষুরিন্দ্রিয়। স্পর্শ-গ্রহণের সাধন চর্ম্মস্থিত ইন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয়। শব্দ-গ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় শ্রোত্রেন্দ্রিয়। যেমন "মঞ্চ" শব্দের মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে লাক্ষণিক প্রয়োগ[১] হয়, তদ্রূপ চর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া চর্ম্মবাচক "ত্বচ্" শব্দের স্পর্শগ্রাহক চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়ে লাক্ষণিক প্রয়োগ বশতঃ উহার দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয়-বিশেষই বুঝিতে হইবে। ঘ্রাণাদি সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা গেল, ইহারা স্ব স্ব বিষয়েরই গ্রাহক; -সুতরাং উহার দ্বারা স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি-সাধনত্বই ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

সাংখ্যমতে এক "অহঙ্কার" হইতেই সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। কিন্তু তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়-বর্গের বিষয়-ব্যবস্থা হয় না। অর্থাৎ গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই বিষয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই বিষয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, এইরূপে বহিরিন্দ্রিয়গুলির যে বিষয়-নিয়ম আছে, তাহা অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। ঐ ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষিতি, জল প্রভৃতি বিজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন উপাদানসম্ভূত হইলে ঐ বিষয়-নিয়ম হইতে পারে। মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ে ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ বহিরিন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-ব্যবস্থা রক্ষার জন্যই মহর্ষি সূত্রে "ভূতেভ্যঃ" এই কথার দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে "ভৌতিক" বলিয়া গিয়াছেন। বহিরিন্দ্রিয়-বর্গের বিষয়-নিয়ম থাকাতেই স্ব বিষয় গ্রহণ অর্থাৎ স্ববিষয়-গ্রাহকত্ব বহিরিন্দ্রিয়-বর্গের সামান্য লক্ষণ হইতে পারে। তাই শেষে বলিয়াছেন,—'স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতি'। বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ নামক নিত্য ভূতস্বরূপ বলিয়া ভূতজন্য নহে, তথাপি ঘ্রাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয়কে ভূতজন্য বলিতে যাইয়া বহুর অনুরোধে মহর্ষি "ভূতেভ্যঃ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ও সাংখ্য-সম্মত "অহঙ্কার" হইতে সমুদ্ভূত নহে, উহাও ঘ্রাণাদির ন্যায় ভৌতিক বা ভূতাত্মক, ইহাই সূত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশ এক হইলেও কর্ণগোলকের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ-বিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ-গোলক-সংযোগরূপ উপাধিগুলি জন্য পদার্থ বলিয়া এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়গুলিও জন্য ও ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার-সিদ্ধ। ঐ ব্যবহারিক ভেদ ধরিয়াই মহর্ষি শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষেও "ভূতেভ্যঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশজন্য নহে, উহা আকাশই। ইন্দ্রিয়-সূত্রে মনের উল্লেখ নাই কেন? ইহা প্রত্যক্ষ-সূত্রভাষ্যেই ভাষ্যকার বলিয়া আসিয়াছেন।

ভাষ্য। কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি?

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়-কারণ অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের উপাদান ভূতবর্গ কোন্‌গুলি?

১। ১ অঃ, ২ আঃ, ১৪ সূত্র-ভাষ্য-টিপ্পনী এবং ২ অঃ, ২ আঃ, ৫৯ সূত্র-ভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

সূত্র। পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥১৩॥

অনুবাদ। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এইগুলি (এই পাঁচটি) ভূতবর্গ।

ভাষ্য। সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশো ভূতানাং বিভক্তানাং সুবচং কার্য্যং ভবিষ্যতীতি।

অনুবাদ। বিভক্ত ভূতবর্গের কার্য্য সুবচ হইবে, অর্থাৎ সহজে বলা যাইবে, এ জন্য সংজ্ঞা শব্দগুলির দ্বারা (ভূতবর্গের) পৃথক্ উপদেশ করিয়াছেন।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে ভূতবর্গের উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে ভূতবর্গের বিশেষ সংজ্ঞাগুলি বলা হয় নাই। মহর্ষি পরে ভূতবর্গের বিশেষ বিশেষ কার্য্য যাহা বলিবেন, তাহা সুখবোধ্য করিবার জন্য এই প্রমেয়-লক্ষণ-প্রকরণেও ভূতবর্গের সংজ্ঞাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। ন্যায়-বার্ত্তিককার এই সূত্রের ও ভাষ্যের কোন উল্লেখ না করায় অনেকে বলেন, এইটি সূত্র নহে। "কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার নিজেই তাহার উত্তর-বাক্য লিখিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ অংশ সমস্তই ভাষ্য।

কিন্তু শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" গ্রন্থে এইটিকে সূত্রমধ্যেই গণ্য করিয়া ন্যায়-সূত্রের ৫২৮ সংখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহা সূত্ররূপেই গৃহীত হইল। "সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশঃ" ইত্যাদি ভাষ্যের ভাবেও ভাষ্যকারের মতে এইটি সূত্র বলিয়াই বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এইটিকে সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য। ইমে তু খলু।

অনুবাদ। এইগুলিই কিন্তু—

সূত্র। গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদি-গুণা-স্তদর্থাঃ ॥১৪॥

অনুবাদ। পৃথিব্যাদির গুণ (পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ভূতের গুণ) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, (এই পাঁচটি) "তদর্থ" (ইন্দ্রিয়ার্থ)।

ভাষ্য। পৃথিব্যাদীনাং যথাবিনিযোগং গুণা ইন্দ্রিয়াণাং যথাক্রমমর্থা বিষয়া ইতি।

অনুবাদ। পৃথিবী প্রভৃতির ব্যবস্থানুসারে গুণগুলি অর্থাৎ পঞ্চভূতের মধ্যে যাহার যে গুণ ব্যবস্থিত আছে, সেই গুণগুলি (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) যথাক্রমে ইন্দ্রিয়বর্গের অর্থ—কি না বিষয়।

টিপ্পনী। পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকেই গন্ধাদি সমস্ত গুণ নাই ; তাই বলিয়াছেন,—"যথা-বিনিযোগম্"। অর্থাৎ পরে মহর্ষি যে ভূতের যে গুণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুসারেই এখানে "পৃথিব্যাদিগুণাঃ," এই কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। ঐ গন্ধাদি পাঁচটি গুণই "অর্থ" নামক প্রমেয়। উহারা যথাক্রমে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয়, ইহা জানাইবার জন্যই সূত্রে বলিয়াছেন,—"তদর্থাঃ।" তদর্থত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থত্বই ঐ অর্থ নামক প্রমেয়ের লক্ষণ। তাই ভাষ্যকার ঐ লক্ষণেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াণাং যথাক্রমমর্থা বিষয়াঃ"।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, সূত্রস্থ "পৃথিব্যাদিগুণাঃ" এই স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যাদি-সম্মত। পৃথিব্যাদি গুণী ও তাহার গুণগুলি অভিন্ন পদার্থ নহে ; ইহাই ঐ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসের দ্বারা মহর্ষি জানাইয়াছেন। কিন্তু ন্যায়-বার্ত্তিককার বহু বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ স্থলে দ্বন্দ্ব-সমাসই মহর্ষির অভিপ্রেত। পৃথিব্যাদি বলিতে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই তিনটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্য এবং গুণ বলিতে গন্ধাদি-ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত গুণ-কর্ম্মাদি বুঝিতে হইবে। কারণ, সেগুলি° ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ। কেবল গন্ধাদি পাঁচটি গুণকেই মহর্ষি ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে পারেন না। মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্রে° দর্শন ও স্পর্শনযোগ্য ঘট-পটাদি পদার্থকে "অর্থ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিকব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "পৃথিব্যাদীনাং" এই ভাষ্য ষষ্ঠীতৎপুরুষের জ্ঞাপক নহে। উহা অর্থকথন মাত্র। বস্তুতঃ ভাষ্য পাঠ করিলে এখানে বিশ্বনাথের কথাই মনে আসে। তাৎপর্য্যটীকাকারের নিজের মতেও এখানে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যসম্মত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত "ইমে তু খলু" এই ভাষ্য-ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "তু" শব্দের দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ আরও অনেক থাকিলেও সেগুলিকে মহর্ষি ইন্দ্রিয়ার্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। ইন্দ্রিয়ার্থের মধ্যে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সসাধক এবং উহাদিগেরই মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান ; তাই মহর্ষি ঐ পাঁচটিকেই বিশেষ করিয়া প্রমেয়মধ্যে "অর্থ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিব্যাদি তিনটি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাদি ইন্দ্রিয়ার্থ হইলেও মহর্ষি তাহা বলেন নাই। সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসের দ্বারা তাহাদিগের সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-পরীক্ষাস্থলে গন্ধাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ার্থেরই পরীক্ষা করা হইয়াছে। সেখানে ভাষ্যকারের কথায় "পৃথিব্যাদিগুণাঃ" এই স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বার্ত্তিককারের নিজের মত ভাষ্য-ব্যাখ্যায় গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। অচেতনস্য করণস্য বুদ্ধের্জ্ঞানং বৃত্তিঃ, চেতনস্যাকর্ত্তুরুপলব্ধিরিতি যুক্তিবিরুদ্ধমর্থং প্রত্যাচক্ষাণক ইবেদমাহ।

অনুবাদ। অচেতন, করণ বুদ্ধির অর্থাৎ জড় অন্তঃকরণের বৃত্তি (পরিণাম-বিশেষ) জ্ঞান, অকর্ত্তা চেতনের অর্থাৎ পুরুষের উপলব্ধি, অর্থাৎ অন্তঃকরণের জ্ঞান

হয়, পুরুষের উপলব্ধি হয়, জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ, এই যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারীর ন্যায় (মহর্ষি) এই সূত্রটি বলিয়াছেন।

সূত্র। বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্॥১৫॥

অনুবাদ। বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, ইহারা অর্থাৎ এই তিনটি শব্দ একার্থবোধক—ঐ তিনটি একই পদার্থ।

ভাষ্য। নাচেতনস্য করণস্য বুদ্ধের্জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি, তদ্ধি চেতনং স্যাৎ, একশ্চায়ং চেতনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি। প্রমেয়-লক্ষণার্থস্য বাক্যস্যান্যার্থপ্রকাশনমুপপত্তিসামর্থ্যাদিতি।

অনুবাদ। "অচেতন" "করণ" বুদ্ধির অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু তাহা (অন্তঃকরণ) চেতন হইয়া পড়ে। দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত হইতে অর্থাৎ দেহাদি মিলিত সমষ্টি হইতে ভিন্ন এই চেতন একমাত্র। প্রমেয় লক্ষণার্থ বাক্যের (অর্থাৎ বুদ্ধি নামক প্রমেয়ের লক্ষণোদ্দেশ্যে কথিত সূত্রের) অন্যার্থ প্রকাশন (সাংখ্যমত নিষেধরূপ অন্যার্থের সূচনা) উপপত্তি সামর্থ্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সূত্রে "বুদ্ধি," "উপলব্ধি" ও "জ্ঞান" এই তিনটিকে একার্থক পর্য্যায় শব্দ বলিয়া প্রকাশ করায় উহার দ্বারা সাংখ্যমত নিষেধরূপ অন্যার্থেরও প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

টিপ্পনী। বুদ্ধির কতিপয় কারণ (আত্মাদি) নিরূপণ পূর্ব্বক উদ্দেশানুসারে বুদ্ধির লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। সূত্রে "বুদ্ধি," "উপলব্ধি" ও "জ্ঞান" এই তিনটি একার্থক শব্দ—ইহা বলাতেই "বুদ্ধির" লক্ষণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাকে "উপলব্ধি" বলে এবং "জ্ঞান" বলে, তাহাই "বুদ্ধি"। বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ। প্রসিদ্ধ পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ একার্থক শব্দের দ্বারাও পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। মহর্ষি এখানে তাহাই বলিয়াছেন। জ্ঞান পদার্থ সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ; ঐ জ্ঞান ও বুদ্ধি একই পদার্থ—ইহা বলিলে "বুদ্ধি" কাহাকে বলে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। "জ্ঞা" ধাতু ও "বুধ্" ধাতুর সর্ব্বত্র এক অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়। পরন্তু ঐ ভাবে বুদ্ধি পদার্থের লক্ষণ বলায় অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান এই তিনটিকে একই পদার্থ বলায় সাংখ্যের মতও নিরাকৃত হইয়াছে। অবশ্য সাংখ্যমত নিরাকরণোদ্দেশ্যে এই সূত্র বলা হয় নাই, তৃতীয়াধ্যায়ে "বুদ্ধি"পরীক্ষা-প্রকরণেই মহর্ষি সাংখ্যমত নিরাকরণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বুদ্ধির লক্ষণ বলিতে যাইয়া সূত্রকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সাংখ্যমত নিরাকরণকারীর ন্যায়ই এই সূত্রটি বলা হইয়াছে; তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বভাষ্যে "প্রত্যাচক্ষাণক ইব" এই স্থলে "ইব" শব্দের দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন। সাংখ্যমতে "বুদ্ধি" বলিতে অন্তঃকরণ। ঐ বুদ্ধির বৃত্তি অর্থাৎ কোন পদার্থাকারে পরিণামবিশেষই "জ্ঞান"। উহা বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। কারণ, আত্মা অপরিণামী। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা চেতন ও অকর্ত্তা। চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় স্বয়ং অপ্রকাশ

জড় বুদ্ধিতত্ত্ব (অন্তঃকরণ) চৈতন্যরূপ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ছায়াপাতেই প্রকাশিত হয় এবং পদার্থকে প্রকাশ করে। ঐ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার সহিত পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের যে অবাস্তব সম্বন্ধ, তাহার নাম "উপলব্ধি।" উহাই অপরিণামী আত্মার বৃত্তি। বুদ্ধির পরিণাম-বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধিরই বৃত্তি। ফলতঃ সাংখ্যমতে "বুদ্ধি", "জ্ঞান", "উপলব্ধি"—এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। ভাষ্যকার এই সাংখ্যমতের সামান্যতঃ উল্লেখ করিয়া সামান্যতঃ তাহার অযৌক্তিকতাও সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, জড় অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না। তাহা হইলে তাহা চেতন পদার্থ হইয়া পড়ে। দেহাদি হইতে ভিন্ন চেতন পদার্থ একদেহে একমাত্র, ইহা সাংখ্যেরও সিদ্ধান্ত। অন্তঃকরণকে চেতন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে এক দেহে দুইটি চেতন পদার্থ মানা হয়,—তাহা হইলে অন্তঃকরণের জ্ঞাত পদার্থ আত্মা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ, এক চেতনের জ্ঞাত পদার্থ অন্য চেতন উপলব্ধি করিতে পারে না। জড় অন্তঃকরণে জ্ঞান হইলেও তাহা বস্তুতঃ চেতন পদার্থ হয় না—কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় অন্তঃকরণে চেতন আত্মার প্রতিবিম্বপাত হয় বলিয়াই, অন্তঃকরণ চেতনের ন্যায় হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই জড় হইয়াও পদার্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সাংখ্য-সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নহে। কারণ, আত্মা সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় পরিণামী পদার্থ নহে, অন্তঃকরণে তাহার প্রতিবিম্বপাত বাস্তব হইতে পারে না। নিরাকার নির্ব্বিকার আত্মার প্রতিবিম্বপাত অসম্ভব। সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞান স্বীকার করিলে তাহার স্বাভাবিক চৈতন্য স্বীকার করিতেই হইবে। আত্মা ও অন্তঃকরণ এই উভয়কে চেতন পদার্থ বলিয়া বসিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এক আত্মাকেই চেতন পদার্থ বলিতে হইবে। জ্ঞান তাহারই ধর্ম্ম; বুদ্ধি ও উপলব্ধি ঐ জ্ঞানেরই নামান্তর। উহারা সাংখ্যসম্মত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে। ইহাই ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। স্মৃত্যনুমানাগম-সংশয়-প্রতিভা-স্বপ্নজ্ঞানোহাঃ সুখাদিপ্রত্যক্ষ-মিচ্ছাদয়শ্চ মনসো লিঙ্গানি তেষু সৎসু ইয়মপি।

অনুবাদ। "স্মৃতি", "অনুমান", "আগম" (শাব্দবোধ), "সংশয়", "প্রতিভা" (ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষ মানস জ্ঞানবিশেষ), "স্বপ্নজ্ঞান", "ঊহ" ("আপত্তি" নামক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ অথবা সম্ভাবনা-জ্ঞানরূপ তর্ক), সুখাদির প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছাদি, মনের (মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের) "লিঙ্গ" (অনুমাপক)। সেগুলি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গগুলি থাকিতে ইহাও (অর্থাৎ সূত্রোক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিও মনের লিঙ্গ)।

সূত্র। যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥১৬॥

অনুবাদ। একই সময়ে জ্ঞানের অর্থাৎ বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি, মনের লিঙ্গ (অনুমাপক)।

ভাষ্য। অনিন্দ্রিয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হন্তীতি। যুগপচ্চ খলু ঘ্রাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্নিকর্ষেষু সৎসু যুগপজ্‌-জ্ঞানানি নোৎপদ্যন্তে। তেনানুমীয়তে অস্তি তত্তদিন্দ্রিয়সংযোগি সহ-কারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি, যস্যাহসন্নিধের্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সন্নিধেশ্চোৎ-পদ্যত ইতি। মনঃ সংযোগানপেক্ষস্য হীন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষস্য জ্ঞানহেতুত্বে যুগপদুৎপদ্যেরন্ জ্ঞানানীতি।

অনুবাদ। "অনিন্দ্রিয় নিমিত্ত" অর্থাৎ ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয় যাহাদিগের নিমিত্ত নহে, এমন "স্মৃতি" প্রভৃতি (পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাদি) "করণান্তর-নিমিত্ত" অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ভিন্ন কোন একটি করণনিমিত্তক হইবার যোগ্য। এবং একই সময়ে ঘ্রাণ প্রভৃতির ও গন্ধ প্রভৃতির সন্নিকর্ষ হইলে একই সময়ে নিশ্চয়ই অনেক জ্ঞান (অনেক ইন্দ্রিয়জন্য বিজাতীয় অনেক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না; তদ্দ্বারা অনুমিত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয় সংযুক্ত, অব্যাপক অর্থাৎ অণুপরিমাণ (প্রত্যক্ষের) সহকারী কারণান্তর আছে, যাহার অসন্নিধিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগবশতঃ) "জ্ঞান" (সেই ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না এবং সন্নিধিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ হেতুত্ব হইলে অর্থাৎ মনঃসংযোগ-শূন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে, একই সময়ে অনেক জ্ঞান অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক বিজাতীয় প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হউক।

টিপ্পনী। বুদ্ধির পরে ক্রমপ্রাপ্ত মনের লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। মনের অনুমাপক বলাতেই মনের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার স্মৃতি প্রভৃতি মনের অনুমাপকগুলি বলিয়া "ইয়মপি" এই কথার দ্বারা সূত্রোক্ত "যুগপৎজ্ঞানানুৎপত্তি"রূপ মনের অনুমাপককে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গ থাকিলেও এই "যুগপৎ-জ্ঞানানুৎপত্তি"ও মনের লিঙ্গ, ইহাই সূত্রকারের তাৎপর্য্য। স্মৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গ কেন? এতদুত্তরে উদ্যোতকর-প্রদর্শিত অনুমানে দোষ দেখিয়া তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদির প্রত্যক্ষরূপ আত্মবিশেষগুণ ইন্দ্রিয়জন্য, তদ্দৃষ্টান্তে ঐরূপ আত্মবিশেষগুণ মাত্রই ইন্দ্রিয়জন্য, ইহা অনুমানসিদ্ধ। স্মৃতি প্রভৃতি আত্মবিশেষগুণগুলি যখন বহিরিন্দ্রিয়-জন্য হয় না, তখন উহাদিগের করণ একটি অন্তরিন্দ্রিয় আছেই, তাহার নাম "মন"। সুতরাং (ভাষ্যোক্ত) স্মৃতি প্রভৃতি মনের অনুমাপক। বহিরিন্দ্রিয় ও অনুমানাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ মনের দ্বারা যে এক প্রকার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার

নাম "প্রতিভা"। উহা "প্রাতিভ" নামেও অনেক স্থানে অভিহিত হইয়াছে। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ "পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে" "আর্ষ" জ্ঞানকে "প্রাতিভ" বলিয়াছেন। সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর "প্রতিভা"কেই "প্রাতিভ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনভাষ্য প্রভৃতি বহু প্রামাণিক গ্রন্থে এই "প্রাতিভ" জ্ঞানের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নও পরে "প্রাতিভ" জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। প্রশস্তপাদ শেষে বলিয়াছেন যে, এই "প্রাতিভ" জ্ঞান বহু পরিমাণে দেবগণ ও ঋষিগণেরই জন্মে, কদাচিৎ লৌকিকদিগেরও জন্মে। যেমন—"কন্যা বলিতেছে, কল্য ভ্রাতা আসিবে, ইহা আমার মন বলিতেছে।" কন্যার ঐরূপ জ্ঞান ভ্রম না হইলে উহা তাহার "প্রতিভা"। যদি উহা ভ্রম বলিয়া শেষে বুঝা যায়, তাহা হইলে উহা "প্রতিভা" নহে। যাহারা এই "প্রতিভার" দোহাই দিয়া, নিজের মন যাহা বলে অর্থাৎ নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহাই অভ্রান্ত মনে করেন, "বিবেকের বিরুদ্ধ" বলিয়া বৈদিক মতকেও ভ্রান্ত বলেন, তাঁহারা এই "প্রতিভার" সহিত পরিচিত হইলে অভ্রান্ত হইতে পারেন। ভাষ্যে "সুখাদি প্রত্যক্ষং" এই স্থলে "আদি" শব্দের দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণগুলি বুঝিতে হইবে। "ইচ্ছাদয়শ্চ" এই স্থলে "আদি" শব্দের দ্বারা সুখ-দুঃখ প্রভৃতি গুণগুলি বুঝিতে হইবে।

গন্ধজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রত্যক্ষ একই সময়ে হয় না। ইহা মহর্ষি গোতমের অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। তাই ভাষ্যকার "যুগপচ্চ খলু" এই স্থানে নিশ্চয়ার্থ "খলু" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি যথাস্থানে তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ঐ সিদ্ধান্তানুসারে বুঝা যায়, বাহ্য প্রত্যক্ষে এমন একটি সহকারী কারণান্তর আবশ্যক, যাহার অভাবে একই সময়ে ঘ্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয়ের গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হইলেও একই সময়ে গন্ধাদি নানা বিষয়ের নানা প্রত্যক্ষ হয় না। এ জন্য মহর্ষি গোতম পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম "মন" নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ মনের সংযোগকে বাহ্য প্রত্যক্ষে কারণ বলিয়াছেন। মন পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া একই সময়ে কোন এক ইন্দ্রিয় ভিন্ন অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারে না; ক্ষণবিলম্বে দ্রুত বেগবশতঃ এক ইন্দ্রিয় হইতে অন্য ইন্দ্রিয়ে যাইতে পারে। এ জন্য একই সময়ে ঐরূপ নানা প্রত্যক্ষ হয় না, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপে এক সময়ে নানা জাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তিবশতঃ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত মন নামক পদার্থ সিদ্ধ হয়, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন,—"তত্তদিন্দ্রিয়সংযোগি সহকারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি"। ইন্দ্রিয়গত রূপাদি মন নহে, এ জন্য বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়সংযোগি"। আকাশাদি মন নহে, এ জন্য বলিয়াছেন—"সহকারি"। আলোক মন নহে, এ জন্য বলিয়াছেন—"নিমিত্তান্তরং" অর্থাৎ আলোক প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ হইতে ভিন্ন কারণ। আত্মা মন নহে, এ জন্য বলিয়াছেন,—"অব্যাপি"। আত্মা বিশ্বব্যাপী। মন অণুপরিমাণ। মহর্ষি মনের অনুমাপক বলিয়াই মনের এইরূপ লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন।

ভাষ্য। ক্রমপ্রাপ্তা তু।

অনুবাদ। ক্রমপ্রাপ্ত কিন্তু, অর্থাৎ প্রমেয়সূত্রে উদ্দেশের ক্রমানুসারে মনের পরে প্রাপ্ত "প্রবৃত্তি" কিন্তু—

সূত্র। প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ ॥১৭॥

অনুবাদ। "বাগারম্ভ" (বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনক কার্য্য), "বুদ্ধ্যারম্ভ" (মনের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনক কার্য্য), "শরীরারম্ভ" (শরীরের দ্বারা নিষ্পন্ন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-জনক কার্য্য) "প্রবৃত্তি"।

ভাষ্য। মনোঽত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতম্। বুধ্যতেঽনেনেতি বুদ্ধিঃ। সোঽয়মারম্ভঃ শরীরেণ বাচা মনসা চ পুণ্যঃ পাপশ্চ দশবিধঃ। তদেতৎ কৃতভাষ্যং দ্বিতীয়সূত্র ইতি।

অনুবাদ। এই সূত্রে "বুদ্ধি" এই শব্দের দ্বারা "মন" অভিপ্রেত। ইহার দ্বারা (মনের দ্বারা) বুঝা যায়, এ জন্য "বুদ্ধি"। (অর্থাৎ ভাবার্থ-নিষ্পন্ন "বুদ্ধি" শব্দের "জ্ঞান" অর্থ হইলেও "বুধ্যতেঽনেন" এই ব্যুৎপত্তিতে করণার্থ-নিষ্পন্ন "বুদ্ধি" শব্দের মন অর্থ হইতে পারে, মহর্ষির এখানে তাহাই অভিপ্রেত)। শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা পুণ্য ও পাপ অর্থাৎ ধর্ম্মজনক ও অধর্ম্মজনক সেই এই আরম্ভ ("প্রবৃত্তি") দশ প্রকার। ইহা দ্বিতীয় সূত্রে কৃত-ভাষ্য হইয়াছে (অর্থাৎ শুভ ও অশুভ দশ প্রকার প্রবৃত্তি দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যেই বলা হইয়াছে)।

টিপ্পনী। প্রবৃত্তির লক্ষণ বলিতে মনোজন্য প্রবৃত্তিও বলিতে হইবে। মন নিরূপিত না হইলে তাহা বলা যায় না,—এ জন্য মহর্ষি মনের নিরূপণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত "প্রবৃত্তি"র নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার "ক্রমপ্রাপ্তা তু" এই কথার দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়া ইহাই জানাইয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনক শুভাশুভ কর্ম্মই মহর্ষির "প্রবৃত্তি" নামক প্রমেয়। তাই সূত্রে "আরম্ভ" শব্দের দ্বারা মহর্ষি তাহা জানাইয়াছেন। এই প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকেও মহর্ষি "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা স্থলবিশেষে প্রকাশ করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, "আরম্ভ" অর্থাৎ কর্ম্মই "প্রবৃত্তি"। উহা দ্বিবিধ,—জ্ঞানজনক এবং ক্রিয়াজনক। তন্মধ্যে যাহা জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা পুণ্য বা পাপের কারণ, তাহা "বাক্-প্রবৃত্তি"। সূত্রস্থ "বাচ্" শব্দের দ্বারা জ্ঞানজনক পদার্থমাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং মনের দ্বারা ইষ্টদেবতাদির চিন্তা ও চক্ষুরাদির দ্বারা সাধু ও অসাধু পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতিও "বাক্‌প্রবৃত্তির" মধ্যে গণ্য। ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,—'শরীরজন্য' এবং 'মনোজন্য'; শরীরের দ্বারা পরিত্রাণ, পরিচর্য্যা এবং দান; বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়। মনের দ্বারা দয়া, অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই দশ প্রকার পুণ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ পুণ্যজনক প্রবৃত্তি। এইরূপ

ঐগুলির বিপরীত ভাবে পাপ-প্রবৃত্তিও দশ প্রকার। ভাষ্যকার দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে দশ প্রকার পুণ্য ও পাপ-প্রবৃত্তির বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। তাই এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করেন নাই। দ্বিতীয় সূত্রে 'প্রবৃত্তি' শব্দ প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জন্মের কারণ। অস্থায়ী কর্ম্ম জন্মের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না। কর্ম্মবোধক শব্দের কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থেও গৌণ প্রয়োগ আছে। যেমন,—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।"—(গীতা)।

প্রচলিত পুস্তকগুলিতে এই সূত্রের শেষে "ইতি" শব্দ আছে। কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" গ্রন্থে ইতি-শব্দযুক্ত সূত্রের উল্লেখ নাই। সুতরাং "ইতি" শব্দ থাকিলে তাহা ভাষ্যকারের প্রযুক্তই বুঝিতে হইবে।

সূত্র। প্রবর্ত্তনা-লক্ষণা দোষাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) "প্রবর্ত্তনালক্ষণ" অর্থাৎ প্রবৃত্তি-জনকত্ব তাহাদিগের লক্ষণ এবং অনুমাপক।

ভাষ্য। প্রবর্ত্তনা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা, যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি। প্রত্যাত্মবেদনীয়া হীমে দোষাঃ কস্মাল্লক্ষণতো নির্দ্দিশ্যন্ত ইতি। কর্ম্মলক্ষণাঃ খলু রক্ত-দ্বিষ্টমূঢ়াঃ, রক্তো হি তৎকর্ম্ম কুরুতে যেন কর্ম্মণা সুখং দুঃখং বা লভতে তথা দ্বিষ্টস্তথা মূঢ় ইতি। রাগদ্বেষমোহা ইত্যুচ্যমানে বহু নোক্তং ভবতীতি।

অনুবাদ। "প্রবর্ত্তনা" বলিতে "প্রবৃত্তি"জনকত্ব। রাগাদি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) আত্মাকে পুণ্য বা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। যেখানে (যে আত্মাতে) মিথ্যাজ্ঞান (মোহ) আছে, সেখানে (সেই আত্মাতে) রাগ (বিষয়ে অভিলাষ) ও দ্বেষ আছে। (পূর্ব্বপক্ষ) "প্রত্যাত্মবেদনীয়" অর্থাৎ সর্ব্বজীবের মানস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এই দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা কেন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ? (উত্তর) যেহেতু "রক্ত" (অনুরক্ত),"দ্বিষ্ট" (দ্বেষযুক্ত) এবং মূঢ় (ভ্রান্ত) জীবগণ "কর্ম্মলক্ষণ" অর্থাৎ কর্ম্মই তাহাদিগের সেইরূপে অনু-মাপক। রক্ত ব্যক্তিই সেই কর্ম্ম করে, যে কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। সেইরূপ দ্বিষ্ট ব্যক্তিই সেই কর্ম্ম করে, যে কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তিই সেই কর্ম্ম করে, যে কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে।

"রাগদ্বেষমোহাঃ" এই কথাটি মাত্র বলিলে অর্থাৎ "প্রবর্ত্তনালক্ষণাঃ" এই কথাটি না বলিয়া "দোষা রাগদ্বেষমোহাঃ" এইরূপ সূত্র বলিলে অধিক বলা হয় না।

টিপ্পনী। "রাগ", "দ্বেষ" ও "মোহ" এই তিনটির নাম "দোষ"। উহা পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তি"র প্রযোজক, এ জন্য "প্রবৃত্তি"র পরে "দোষ" নিরূপণ করিয়াছেন। 'দোষের' মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহবশতঃই রাগ ও দ্বেষ জন্মে। ঐ রাগ ও দ্বেষই জীবকে সাক্ষাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। "মোহ"শূন্য বা মিথ্যাজ্ঞানশূন্য জীবের পুণ্যজনক বা পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না—অর্থাৎ তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম জন্মায় না। যত দিন মোহ থাকিবে, তত দিন জীব রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া পুণ্য বা পাপজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেই। সুতরাং প্রবর্ত্তনাই দোষের লক্ষণ; অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি যখন দোষ ব্যতীত হয় না, তখন তাদৃশ প্রবৃত্তিজনকত্বই দোষের লক্ষণ। আর ঐ প্রবর্ত্তনাই দোষের অনুমাপক। সূত্রে 'লক্ষণ' শব্দের এক পক্ষে লিঙ্গ বা অনুমাপক অর্থ বুঝিতে হইবে। রাগ, দ্বেষ ও মোহ মনোগ্রাহ্য আত্ম-বিশেষগুণ, সুতরাং উহারা সর্ব্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান প্রদর্শন কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে "কর্ম্মলক্ষণাঃ খলু" এই স্থলে "খলু" শব্দটি হেত্বর্থ।

ভাষ্যকারের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অন্য আত্মাতে তাহা অনুমেয়। কোন ব্যক্তি সুখ বা দুঃখজনক কার্য্য করিলে ঐ কর্ম্ম দ্বারাই তাহাকে রক্ত, দ্বিষ্ট ও মূঢ় বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। কারণ, মোহ ব্যতীত কাহারও রাগ বা দ্বেষ হয় না। রাগ, দ্বেষ ব্যতীতও কাহারও সুখ বা দুঃখজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত ব্যক্তিই সুখ বা দুঃখজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং যে প্রবর্ত্তনাবশতঃ জীব বাধ্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই প্রবর্ত্তনার আশ্রয় "দোষ"গুলিও জীবে আছে, এইরূপে "প্রবর্ত্তনা"ও অন্য জীবে দোষের অনুমাপক হয়। পরন্তু রাগ, দ্বেষ ও মোহ নিজ আত্মাতে সর্ব্ব জীবের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঐগুলি প্রবর্ত্তনাবিশিষ্ট বলিয়া সকলের জ্ঞাত নহে। উহাদিগকে ঐরূপে জানিলে নির্ব্বেদ জন্মিবে, এই অভিপ্রায়েও মহর্ষি ঐ রূপেই উহাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। "দোষা রাগদ্বেষমোহাঃ" এইরূপ সূত্র বলিলে কেবল দোষগুলির স্বরূপমাত্রই বলা হয়, তাহাতে বেশী কিছু বলা হয় না।

সূত্র। পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। "পুনরুৎপত্তি" অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জ্জন্ম "প্রেত্যভাব"।

ভাষ্য। উৎপন্নস্য ক্বচিৎসত্ত্বনিকায়ে মৃত্বা যা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্য-ভাবঃ। উৎপন্নস্য সম্বদ্ধস্য। সম্বন্ধস্তু দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ। পুন-রুৎপত্তিঃ পুনর্দ্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। পুনরিত্যভ্যাসাভিধানম্। যত্র ক্বচিৎ

প্রাণভৃন্নিকায়ে বর্ত্তমানঃ পূর্ব্বোপাত্তান্ দেহাদীন্ জহাতি তৎ প্রৈতি। যত্তত্রান্যত্র বা দেহাদীনন্যানুপাদত্তে তদ্ভবতি। প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম। সোঽয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোঽনাদিরপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। কোন প্রাণি-নিকায়ে অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি কোন এক-জাতীয় জীবকুলে উৎপন্নের মরণের পরে যে পুনরুৎপত্তি, তাহা "প্রেত্যভাব"। উৎপন্নের কি না,—সম্বন্ধ-বিশিষ্টের। সম্বন্ধ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত। "পুনরুৎপত্তি" বলিতে পুনর্ব্বার দেহাদির সহিত সম্বন্ধ। "পুনঃ" এই শব্দের দ্বারা অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুন্যের কথন হইয়াছে। যে কোনও প্রাণিনিকায়ে (একজাতীয় জীবকুলে) বর্ত্তমান হইয়া (জীব) পূর্ব্বপরিগৃহীত দেহাদিকে যে ত্যাগ করে, তাহা প্রেত হয়, অর্থাৎ সেই পূর্ব্বগৃহীত দেহাদির ত্যাগই জীবের প্রেতত্ব বা মরণ। সেই প্রাণিনিকায়ে অথবা অন্য প্রাণিনিকায়ে যে অন্য দেহাদিকে গ্রহণ করে, তাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই অভিনব দেহাদির গ্রহণই জীবের উৎপত্তি বা জন্ম। ফলিতার্থ--মরণোত্তর পুনর্জন্মই প্রেত্যভাব। সেই এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-রূপ প্রেত্যভাব অনাদি (এবং) মোক্ষান্ত জানিবে।

টিপ্পনী। প্রপূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর উত্তর ক্তাচ্ প্রত্যয় যোগে "প্রেত্য" শব্দ এবং "ভূ" ধাতু হইতে "ভাব" শব্দ নিষ্পন্ন। প্রপূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর অর্থ এখানে মরণ। ভূধাতুর অর্থ উৎপত্তি। তাহা হইলে "প্রেত্য" অর্থাৎ মরিয়া "ভাব" অর্থাৎ উৎপত্তি, ইহাই "প্রেত্যভাব" কথার দ্বারা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার শেষে ফলিতার্থ বলিয়াছেন—"প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম"। "নিকায়" শব্দের অর্থ এখানে সমানধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ একজাতীয় জীব-সমূহ। (সধর্ম্মিণাং স্যান্নিকায়ঃ)। আত্মা নিজের কর্ম্মফলে মনুষ্যাদি কোন একজাতীয় জীবকুলে উৎপন্ন হয়। নিত্য আত্মার উৎপত্তি নাই. তাই ভাষ্যকার "উৎপন্নস্য সম্বদ্ধস্য" এই কথার দ্বারা স্বপদ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বপরিগৃহীত দেহাদির পরিত্যাগ অর্থাৎ ঐ দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের নাম মরণ। পূর্ব্বসজাতীয় জীবকুলে অথবা অন্য জাতীয় জীবকুলে অভিনব দেহাদির গ্রহণ অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধের নাম উৎপত্তি বা জন্ম। উৎপত্তি মাত্র না বলিয়া "পুনরুৎপত্তি" শব্দের দ্বারা মহর্ষি এখানে "প্রেত্যভাবের" অনাদিত্ব সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয়াধ্যায়ে পরীক্ষা-প্রকরণে ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিবেন।

সূত্র। প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলম্ ॥২০॥

অনুবাদ। "প্রবৃত্তি" (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এবং "দোষ"-জনিত পদার্থ "ফল"।

ভাষ্য। সুখদুঃখসংবেদনং ফলম্। সুখবিপাকং কর্ম্ম দুঃখবিপাকঞ্চ। তৎ পুনর্দ্দেহেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধিষু সতীষু ভবতীতি সহ দেহাদিভিঃ ফলমভিপ্রেতম্। তথাহি প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলমেতৎ সর্ব্বং ভবতি। তদেতৎ ফলমুপাত্তমুপাত্তং হেয়ং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদেয়মিতি। নাস্য হানোপাদানয়োর্নিষ্ঠা পর্য্যবসানং বাহস্তি। স খল্বয়ং ফলস্য হানোপাদানস্রোতসোহ্যতে লোক ইতি।

অনুবাদ। সুখ ও দুঃখের অনুভব ফল। কর্ম্ম সুখফলক এবং দুঃখ-ফলক। তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সুখ-দুঃখ ভোগ আবার দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি থাকিলে হয়, এ জন্য দেহাদির সহিত "ফল" অভিপ্রেত, অর্থাৎ মহর্ষি দেহাদিকেও "ফল" বলিয়াছেন। ফলিতার্থ এই যে, প্রবৃত্তি ও দোষজনিত পদার্থ—এই সমস্ত (সুখ-দুঃখভোগ এবং তাহার সাধন দেহাদি সমস্ত) "ফল" হয়। সেই এই ফল গৃহীত হইয়া গৃহীত হইয়া ত্যাজ্য হয়, ত্যক্ত হইয়া ত্যক্ত হইয়া গ্রাহ্য হয়। ইহার অর্থাৎ ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের "নিষ্ঠা" অর্থাৎ সমাপ্তি অথবা "পর্য্যবসান" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অবসান নাই। ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোত অর্থাৎ ভোগের দ্বারা এক ফলের ত্যাগ এবং কর্ম্মের দ্বারা অন্য ফলের গ্রহণ, এই ভাবে অবিশ্রান্ত ফল-ত্যাগ ও ফল-গ্রহণের প্রবাহ সেই এই লোককে (জীবকুলকে) বহন করিতেছে। অর্থাৎ জীবকুল ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ স্রোতে নিরন্তর ভাসিতেছে।

টিপ্পনী। ফল দ্বিবিধ,—মুখ্য ও গৌণ। সুখ দুঃখের উপভোগই মুখ্য ফল। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহার সাধনগুলি গৌণ ফল। দ্বিবিধ ফলই মহর্ষির বিবক্ষিত। সূত্রে অতিরিক্ত "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি তাঁহার ঐ অভিপ্রায় সূচনা করিয়াছেন। যদিও "ফল" পদার্থগুলির যথাসম্ভব পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি ফলমাত্রই "প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত", ইহা জানিলে নির্ব্বেদ লাভ হয়। তাই মহর্ষি "প্রবৃত্তি-দোষজনিত" বলিয়া ফলের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। প্রবৃত্তি বলিতে এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। দোষজনিত ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলমাত্রের জনক; সুতরাং ফলমাত্রই প্রবৃত্তি ও দোষ-জনিত। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, কেবল প্রবৃত্তির প্রতিই দোষ কারণ নহে, প্রবৃত্তির কার্য্য সুখ ও দুঃখের প্রতিও দোষ কারণ, ইহা জানাইবার জন্যই মহর্ষি "প্রবৃত্তি-জনিত" না বলিয়া "প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত" এইরূপ বলিয়াছেন। দোষরূপ জলের দ্বারা সিক্ত আত্মভূমিতেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ বীজ সুখ-দুঃখ জন্মায়।

প্রলয়কালেও ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের সমাপ্তি হয়, তাই আবার বলিয়াছেন,—"পর্য্যবসানং বা"। অর্থাৎ প্রলয়কালে ঐ ফলত্যাগ ও ফলগ্রহণের অবসান-মাত্র হইলেও তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বতোভাবে অবসান হয় না। প্রলয়কালেও জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি থাকায় পুনঃ সৃষ্টিতে আবার ঐ ফলের ত্যাগ ও গ্রহণ হইয়া থাকে।

ভাষ্য। অথৈতদেব।

অনুবাদ। অনন্তর ইহাই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ ফলই—

সূত্র। বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ॥২১॥

অনুবাদ। "বাধনালক্ষণ" অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত বলিয়া "দুঃখ"।

ভাষ্য। বাধনা পীড়া তাপ ইতি। তয়াঽনুবিদ্ধমনুষক্তমবিনির্ভাগেণ বর্ত্তমানং দুঃখযোগাদ্দুঃখমিতি। সোঽয়ং সর্ব্বং দুঃখেনানুবিদ্ধমিতি পশ্যন্ দুঃখং জিহাসুর্জ্জন্মনি দুঃখদর্শী নির্ব্বিদ্যতে নির্ব্বিণ্ণো বিরজ্যতে বিরক্তো বিমুচ্যতে।

অনুবাদ। "বাধনা" বলিতে পীড়া, তাপ (অর্থাৎ যাহাকে পীড়া বলে, তাপ বলে, তাহাই বাধনা)। তাহার সহিত অর্থাৎ বাধনার সহিত অনুবিদ্ধ অনুষক্ত (সম্বন্ধবিশিষ্ট) অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান (পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল) দুঃখযোগবশতঃ (দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ) দুঃখ। সেই এই আত্মা (দুখানুবিদ্ধ জন্মবিশিষ্ট আত্মা) সমস্ত অর্থাৎ সুখ ও সুখসাধন দেহাদি দুঃখের সহিত অনুবিদ্ধ (নিয়ত সম্বন্ধ যুক্ত), ইহা দর্শন করতঃ (বোধ করতঃ) দুঃখ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া, জন্মে দুঃখদর্শী হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বিরক্ত (বৈরাগ্য-সম্পন্ন) হন, বিরক্ত হইয়া বিমুক্ত হন।

টিপ্পনী। দুঃখ না পাইলে, দুঃখ না বুঝিলে, পরম পুরুষার্থ অপবর্গ লাভের অধিকারই হয় না এবং শরীরাদি নিরূপণ না করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ বলা যায় না। এ জন্য অপবর্গের পূর্ব্বেই এবং শরীরাদির পরেই দুঃখের লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন। দুঃখ সকল জীবের সুপরিচিত পদার্থ। "বাধনা", "পীড়া", "তাপ"—এগুলি দুঃখ-বোধক পর্য্যায়শব্দ। সূত্রে "বাধনা" শব্দের প্রয়োগেই দুঃখের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। বাধনা যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ, তাহাই দুঃখ, এইরূপ সূত্রার্থ সহজ-বুদ্ধিগম্য হইলেও ভাষ্যকার সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকারের কথা এই যে, সুখ ও সুখ-সাধন জন্মাদি ফল-মাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ বলিয়া দুঃখ—ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "অথৈতদেব" এই কথার পূরণ করিয়া মহর্ষির সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে।

সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের অর্থ অনুষঙ্গ। অনুষঙ্গ বলিতে সম্বন্ধ। সুখে দুঃখের "অবিনাভাব" সম্বন্ধ। যেখানে সুখ আছে, সেখানে দুঃখ আছেই। শরীরে দুঃখের নিমিত্ততা সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ, উদ্দ্যোতকরের "অনুষঙ্গ" ব্যাখ্যা এখানে এইরূপ। তাঁহার অন্যবিধ ব্যাখ্যাও দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্য ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে "অনুবিদ্ধং" ইহার ব্যাখ্যা "অনুষক্তম্"। তাহার ব্যাখ্যা "অবিনির্ভাগেণ বর্ত্তমানম্।" অর্থাৎ দুঃখের সহিত পৃথক্ ভাবে (বিযুক্তভাবে) বর্ত্তমান কোন সুখাদি নাই। একেবারে দুঃখসম্বন্ধ নাই, এমন সুখ ও সুখ-সাধন শরীরাদি হইতেই পারে না; এই জন্য সুখাদি ফলে দুঃখ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়া সুখাদি ফলমাত্রকেই গৌণ দুঃখ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সূত্রে "বাধনা" শব্দের দ্বারা বাধনাবুদ্ধি অর্থাৎ দুঃখবুদ্ধি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। যাহা দুঃখবুদ্ধি-লক্ষণ, অর্থাৎ যাহাতে দুঃখ বলিয়া বুদ্ধি হয়, তাহাই দুঃখ। তাহা হইলে মুখ্য গৌণ উভয়বিধ দুঃখই সূত্রের দ্বারা লক্ষিত হইল। "প্রতিকূলবেদনীয়" অর্থাৎ যাহা প্রতিকূলভাবে (অপ্রিয়ভাবে, ভাল লাগে না—এই ভাবে) বুদ্ধির বিষয় হয়, এমন আত্মবিশেষ গুণই মুখ্য দুঃখ। তাহাতে মুখ্য দুঃখ বুদ্ধি হয়। সেই মুখ্য দুঃখানুষক্ত সুখাদি ফলমাত্রেই গৌণ দুঃখবুদ্ধি হয়। কারণ, সেগুলি সমস্তই দুঃখানুষক্ত। সুখাদি ফলমাত্রই দুঃখ, ইহা বুঝিলে, ঐরূপ ভাবনা করিলে নির্ব্বেদ লাভ করতঃ বৈরাগ্য লাভ করিয়া আত্মা মুক্তিলাভ করেন, এ জন্য সুখ ও সুখসাধন শরীরাদি ফলমাত্রেই দুঃখ-ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে।

ঋষিদিগের পরীক্ষিত এই বৈরাগ্যের উপায় কাহারও দুঃখ বাড়াইয়া দিবে না। পরন্তু বৈরাগ্যসাধন করিয়া দুঃখ হ্রাসই করিবে। বৈরাগ্যের সাধন দুঃখও ভয়ের সাধন করে না, দুঃখ সহিষ্ণুতার মূলোচ্ছেদও করে না। পরন্তু দুঃখ সহিষ্ণুতার মূল বন্ধনই করিয়া থাকে। দুঃখ স্বভাবতই অপ্রিয় পদার্থ, ইহা সত্য। শ্রুতিও "অপ্রিয়" শব্দের দ্বারা দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন ("প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ")। সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির অভিসন্ধি ব্যতীত দুঃখকে কেহই প্রিয় পদার্থ বলিয়া আলিঙ্গন করে না। ভাবুকতার আবরণে সত্য গোপন করা যায় না। তাই ভারতীয় দর্শনকার ঋষিগণ দুঃখের বীজনাশের উপায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাই "বৈরাগ্য-মেবাভয়ং" বলিয়া ভারতগুরু ভাবুকতা ছাড়িয়া বাস্তবতত্ত্বের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। বৈরাগ্য ব্যতীত কে কবে কোন্ বিষয়ে নির্ভয় হইতে পারিয়াছেন? কে কবে দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি ভুলিতে পারিয়াছেন? কে কবে বিষয়-সুখের দুশ্ছেদ্য মমতা-বন্ধন ছেদ করিয়া "অভয়পদ" লাভের জন্য উত্থিত হইতে পারিয়াছেন? বৈরাগ্য বহু সাধনার ফল। বহু দুঃখ না পাইলে—বহু কর্ম্ম না করিলে বৈরাগ্য সাধন হয় না। দুঃখ ব্যতীত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ভাষ্যারম্ভে দুঃখকেও "অর্থ" বলিয়া আসিয়াছেন। দুঃখ পরিহারের জন্যই দুঃখ অর্থ্যমান। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যের উপদেশ কাহাকেও দুঃখভীরু বা অকর্ম্মণ্য করে না। পরন্তু প্রকৃত বোদ্ধা বৈরাগ্যের তত্ত্ব বুঝিয়া বৈরাগ্য-সাধনের জন্য বহু ক্লেশসাধ্য কঠোর পুরুষকারেই ব্রতী হইয়া থাকেন।

সুখ এবং সুখসাধন জন্মাদি প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধি এখানে নির্ব্বেদ। স্বয়ং উপস্থিত সর্ব্ববিষয়েই বিতৃষ্ণতা বা উপেক্ষা-বুদ্ধিই এখানে বৈরাগ্য।

প্রচলিত অনেক পুস্তকেই এই সূত্রের শেষে "ইতি" শব্দ দৃষ্ট হয়। কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" ইতিশব্দান্ত সূত্রের উল্লেখ নাই; ইতি শব্দের এখানে কোন প্রয়োজনও নাই।

ভাষ্য। যত্র তু নিষ্ঠা যত্র তু পর্য্যবসানং সোঽয়ং।

অনুবাদ। যেখানে কিন্তু নিষ্ঠা (সমাপ্তি), যেখানে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অবসান, সেই এই—

সূত্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ ॥২২॥

অনুবাদ। তাহার সহিত (পূর্ব্বোক্ত মুখ্য গৌণ সর্ব্ববিধ দুঃখের সহিত) অত্যন্ত বিয়োগ অপবর্গ।

ভাষ্য। তেন দুঃখেন জন্মনাঽত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ। কথম্? উপাত্তস্য জন্মনো হানমন্যস্য চানুপাদানম্। এতামবস্থামপর্য্যন্তামপবর্গং বেদয়ন্তেঽপবর্গবিদঃ। তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।

অনুবাদ। সেই জন্মরূপ দুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মান শরীরাদি সর্ব্বদুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ "অপবর্গ"। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ কি প্রকার? (উত্তর) গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মের অগ্রহণ। অবধিশূন্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে (আত্মার শরীরাদি সর্ব্বদুঃখ-শূন্য কৈবল্যাবস্থাকে) অপবর্গবিদ্‌গণ অপবর্গ বলিয়া জানেন। তাহা অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি। (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থাই শাস্ত্রে অনেক স্থানে ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে)।

টিপ্পনী। দুঃখের পরে মুক্তি। ইহাই মহর্ষিকথিত চরম প্রমেয়। ইহাই জীবের চরম উন্নতি। পূর্ব্বোক্ত ফলগ্রহণ ও ফলত্যাগের ইহাতেই সমাপ্তি, ইহাতেই পর্য্যবসান। সূত্রস্থ "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত দুঃখই বোধ্য, তাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তেন দুঃখেন"। কেবল মুখ্য দুঃখই উহার দ্বারা বিবক্ষিত—এরূপ ভ্রম না হয়, তাই আবার বলিয়াছেন—"জন্মনা"। অর্থাৎ "জায়তে যৎ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ "জন্মন্"শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার এখানে "দুঃখ"শব্দের দ্বারা জায়মান শরীরাদি গৌণ মুখ্য সর্ব্ববিধ দুঃখই বুঝিতে হইবে, ইহা সূচনা করিয়াছেন। জীবগণ অনাদিকাল হইতে জন্মপ্রবাহে ভাসিয়া নানা দুঃখের বিচিত্র তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। ঐ জন্মপ্রবাহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। সাময়িক

রোগ নিবৃত্তির ন্যায় প্রলয়কালে জীবের সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি নহে, তাই উহা মুক্তি নহে; তাই বলিয়াছেন—"অত্যন্তং বিমুক্তিঃ" এবং "অপর্য্যন্তাম্"। ফলতঃ চিরকালের জন্য আত্মার জন্মাদি সর্ব্বদুঃখশূন্যাবস্থাই কৈবল্যাবস্থা। উহাই মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ। ঐ মুক্তি হইলে আর সংসার-ভয় থাকে না (ন চ পুনরাবর্ত্ততে)। মুক্তি অভয়। শ্রুতিও ব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ "অভয়" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—তাই শাস্ত্র অনেক স্থানে মুক্তিকে ব্রহ্ম এবং মুক্তিলাভকে ব্রহ্মলাভ বলিয়াছেন। এরূপ গৌণপ্রয়োগ ভাষায় প্রচুর পাওয়া যায়।

যাঁহারা ব্রহ্মপরিণামবাদী অর্থাৎ ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা যাঁহাদিগের মত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন -"অজরং" অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, তাঁহার কোনরূপেই পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

ব্রহ্মের ন্যায় মুক্তিরও কোন দিন কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নাই; তাই মুক্তি অজর ব্রহ্মসদৃশ। এইরূপ তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে অনেক স্থানে মুক্তিকে "ব্রহ্মভাব" বলা হইয়াছে। "নিরঞ্জনঃ···পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতিতে মুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মসাম্যলাভের কথা স্পষ্ট থাকায় অন্যান্য শ্রুতি ও স্মৃতিতে লক্ষণার সাহায্যে সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। পরন্তু "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥" এই ভগবদ্‌গীতাবাক্যে মুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মসাদৃশ্যলাভই স্পষ্ট প্রকটিত আছে। সেই ব্রহ্মসাদৃশ্য কি? তাহা বলিবার জন্যই ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ বলা হইয়াছে। নচেৎ ঐ পরার্দ্ধের উত্থাপক কোন আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন থাকে না। "সাধর্ম্ম্য" শব্দেরও প্রসিদ্ধার্থ বা মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিশিষ্ট সাদৃশ্যবোধের জন্য কাহাকে "ব্রহ্ম" বলিলে লক্ষণার দ্বারা "ব্রহ্মসদৃশ" এই অর্থ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু "ব্রহ্মসাম্য", "ব্রহ্মসাধর্ম্ম্য" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে লক্ষণার দ্বারা তাহার ব্রহ্মরূপতা অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তাহাতে "সাম্য", "সাধর্ম্ম্য" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। বিশিষ্ট সাদৃশ্য বোধের জন্য রাজসদৃশ ব্যক্তিকে "রাজা" বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত রাজাকে "রাজসদৃশ" বলিয়া লক্ষণার দ্বারা তাহার "রাজা" এই অর্থের কেহ ব্যাখ্যা করে না। ঐরূপ লক্ষণা নিষ্প্রমাণ। উহা অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন। প্রচলিত ন্যায়-মতানুসারে শ্রুতি স্মৃতির ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া অসংগত অপ্রসিদ্ধ লক্ষণার আশ্রয় করা যায় না। "সাম্য", "সাধর্ম্ম্য" প্রভৃতি শব্দের অসংগত লক্ষণার আশ্রয় না করিয়া অন্যান্য বহু শব্দের সংগত ও প্রসিদ্ধ লক্ষণার আশ্রয় করাই সমীচীন; ইহাই ন্যায়াচার্য্যগণের স্বপক্ষ সমর্থনের যুক্তি।

বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত যাহাই হউক, বৈনাশিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিতেন, প্রদীপের ন্যায় চিত্ত বা আত্মার চিরনির্ব্বাণই মুক্তি। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অমৃত্যুপদম্"। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কৈবল্যাবস্থারূপ মুক্তিকে "অমৃত্যুপদ" বলে। উহা আত্মার মৃত্যু নহে। আত্মার মৃত্যু অসম্ভব। পরন্তু আত্মার অত্যন্ত বিনাশ কখনও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান্‌ই উহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। আত্মার কৈবল্যাবস্থারূপ মুক্তি হইলে, আর মরিতে হয় না। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" (শ্রুতি)। "জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে"—

(গীতা) এবং উহাই আত্মার প্রকৃত ক্ষেমপ্রাপ্তি বা মঙ্গলপ্রাপ্তি। উহা মরণ নহে, উহা ভীষণ নহে—উহাই প্রকৃত শান্তি।

ভাষ্য। নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্মোক্ষে ব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে। তেষাং প্রমাণাভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো বা বিদ্যতে নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্মোক্ষেঽভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। মহত্ত্বের ন্যায় অর্থাৎ আত্মার পরম মহৎ-পরিমাণের ন্যায় মোক্ষে আত্মার নিত্যসুখ অভিব্যক্ত (অনুভূত) হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্যসুখের দ্বারা বিমুক্ত হইয়া (আত্মা) অত্যন্ত সুখী হন, ইহা কেহ কেহ মনে করেন অর্থাৎ ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। প্রমাণাভাববশতঃ তাহাদিগের উপপত্তি নাই। বিশদার্থ এই যে, মহত্ত্বের ন্যায় মোক্ষে আত্মার নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, অনুমান প্রমাণ নাই, আগম প্রমাণও নাই।

টিপ্পনী। আত্মার মহত্ত্ব অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাণ আত্মাতে নিত্যসিদ্ধ থাকিলেও সংসারাবস্থায় শরীরাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ যেমন তাহার অনুভূতি হয় না, কিন্তু মোক্ষে শরীরাদি প্রতিবন্ধক না থাকায় তাহার অনুভূতি হয়, তদ্রূপ আত্মাতে নিত্যসুখ থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সংসারাবস্থায় ঐ নিত্যসুখের অনুভূতি হয় না, মোক্ষে তাহার অনুভূতি হয়। ঐ নিত্যসুখের অভিব্যক্তিই মুক্তি। এই মতটি নব্য ন্যায়গ্রন্থে ভট্টমত বলিয়া উল্লিখিত[১] হইয়াছে। এবং নব্যন্যায়াচার্য্য রঘুনাথ শিরোমণি এই ভট্টমতের পরিষ্কার করিয়াছেন,—ইহাও অনুমিতি গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন। মুক্তিবাদগ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য ভট্টমত বলিয়া এই মতের পরিষ্কার করিয়া শেষে কেবল কল্পনাগৌরব বলিয়াই এই মত মনোরম নহে, ইহা বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের উল্লিখিত মতটিকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বেদান্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া সেই মতের বিরুদ্ধেই পরবর্ত্তী ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সুখস্বরূপ

১। নব্যনৈয়ায়িক গদাধর প্রভৃতি "নিত্য সুখের অভিব্যক্তি মোক্ষ" ইহা ভট্টমত বলিয়া উল্লেখ করায়, উহা ভট্ট কুমারিলের মত বলিয়াই অনেকের দৃঢ় সংস্কার আছে। কিন্তু ভট্টকুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে "সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার-প্রকরণে" (১০৫ শ্লোকে) সুখসম্ভোগ মুক্তি হইতে পারে না, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণ ভট্ট বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা অনুসন্ধেয়। নিত্যনিরতিশয় সুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা তুতাত ভট্টের মত বলিয়া উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী গ্রন্থে দেখা যায়। উদয়ন লিখিয়াছেন—"তৌতাতিতাস্তু অকার্য্যমপি ঈশ্বরজ্ঞানং শরীরমন্তরেণানিচ্ছন্তঃ কার্য্যমেব সুখজ্ঞানমপবর্গেঽস্তীতি বদন্তঃ" ইত্যাদি (কিরণাবলী, প্রথম ভাগ)। সেখানে প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"দুঃখসাধনশরীরনাশে নিত্যনিরতিশয় সুখাভিব্যক্তির্মুক্তিরিতি ভাট্টং মতং নিরাকরোতি তৌতাতিতাস্তিতি"। বর্দ্ধমানও ঐ মতকে কেবল ভাট্ট মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্য, সুতরাং ঐ সুখও নিত্য। ঐ নিত্য সুখস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা হইতে অভিন্ন। ভাষ্যে "আত্মনঃ" এই স্থলে "রাহোঃ শিরঃ" এই স্থলের ন্যায় অভেদে ষষ্ঠী। ফলিতার্থ এই যে, মোক্ষে আত্মস্বরূপ নিত্যসুখ অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যসুখস্বরূপ। মিশ্র মহোদয়ের উদ্ধৃত ভাষ্যসন্দর্ভে "মহত্ত্ববৎ" এই কথাটি নাই। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যেই "মহত্ত্ববৎ" এই কথাটি আছে। মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যায় মহত্ত্বদৃষ্টান্ত সংগত হয় না। ভাষ্যে "মহত্ত্ববৎ" এই কথাটি না থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভ এবং পরবর্ত্তী ভাষ্যসমূহের দ্বারা ভাষ্যকার এই মতের যে অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদি-সম্মত মুক্তিই এখানে ভাষ্যকারের সমালোচিত, ইহা মনে আসে না। মুক্তিতে নিত্যানন্দের অনুভূতি হয়, তাহার দ্বারা তৎকালে আত্মা অত্যন্ত সুখী হন, ইহাই মতবিশেষ বলিয়া ভাষ্যকার সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। মুক্তি নিত্যানন্দস্বরূপ, ভাষ্যকার এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সরলভাবে বুঝা যায় না। পরবর্ত্তী ভাষ্যসমূহের দ্বারা ভাষ্যকার তাঁহার উল্লিখিত মতেরই সমালোচনাপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন—সেই কথাগুলির পর্য্যালোচনা করিয়াই ভাষ্যকার কোন্ মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া স্থির করিবেন।

ভাষ্য। **নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং তস্য হেতুবচনম্।** নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং জ্ঞানমিতি তস্য হেতুর্ব্বাচ্যো যতস্তদুৎপদ্যত ইতি। **সুখবন্নিত্যমিতি চেৎ সংসারস্থস্য মুক্তেনাবিশেষঃ।** যথা মুক্তঃ সুখেন তৎ সংবেদনেন চ সন্ নিত্যেনোপপন্নস্তথা সংসার-স্থোহপি প্রসজ্যত ইতি উভয়স্য নিত্যত্বাৎ।

অভ্যনুজ্ঞানে চ ধর্ম্মাধর্ম্মফলেন সাহচর্য্যং যৌগপদ্যং গৃহ্যেত। যদিদমুৎপত্তিস্থানেষু ধর্ম্মাধর্ম্মফলং সুখং দুঃখং বা সংবেদ্যতে পর্য্যায়েণ, তস্য চ নিত্যসংবেদনস্য চ সহভাবো যৌগপদ্যং গৃহ্যেত ন সুখাভাবো নানভিব্যক্তিরস্তি, উভয়স্য নিত্যত্বাৎ।

অনুবাদ। নিত্যের অর্থাৎ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি কি না সংবেদন (জ্ঞান), তাহার হেতু বলিতে হইবে।

বিশদার্থ এই যে,—নিত্যের (নিত্যসুখের) অভিব্যক্তি বলিতে (তাহার) সংবেদন কি না জ্ঞান, তাহার (সেই নিত্যসুখজ্ঞানের) হেতু বলিতে হইবে—যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়।

সুখের ন্যায় (তাহা) নিত্য, অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের অভিব্যক্তিও নিত্য পদার্থ, তাহার কোন কারণ নাই, ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) মুক্ত ব্যক্তির সহিত সংসারীর

অবিশেষ হয়। বিশদার্থ এই যে,—যেমন মুক্ত ব্যক্তি নিত্যসুখ এবং তাহার নিত্যানুভূতির দ্বারা উপপন্ন আছেন—উভয়ের (সুখ ও সুখানুভবের) নিত্যতাবশতঃ সংসারী ব্যক্তিও তদ্রূপ (সতত নিত্যসুখ-সম্ভোগী) হইয়া পড়ে।

স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বমত রক্ষার্থ সংসারী ব্যক্তিও নিত্যসুখ সম্ভোগ করে, ইহা বলিয়া বসিলে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখের সহিত সহভাব কি না যৌগপদ্য গৃহীত হউক ? বিশদার্থ এই যে—উৎপত্তিস্থানসমূহে (চতুর্দ্দশ ভুবনে) এই যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে (সংসারিগণ কর্ত্তৃক) অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থাৎ সেই সাংসারিক সুখদুঃখানুভবের এবং নিত্যসংবেদনের অর্থাৎ নিত্যসুখের নিত্যানুভবের সহভাব কি না যৌগপদ্য বুঝা যাউক ?—(অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগের সহিত এক সময়েই নিত্যসুখভোগ হউক), উভয়ের (সুখ ও তাহার অভিব্যক্তির) নিত্যতাবশতঃ সুখের অভাব নাই, অভিব্যক্তিরও অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের অনুভূতিরও অভাব নাই।

ভাষ্য। **অনিত্যত্বে হেতুবচনম্**। অথ মোক্ষে নিত্যস্য সুখস্য সংবেদনমনিত্যং যত উৎপদ্যতে স হেতুর্ব্বাচ্যঃ **আত্মমনঃসংযোগস্য নিমিত্তান্তরসহিতস্য হেতুত্বম্**। আত্মমনঃসংযোগো হেতুরিতি চেৎ এবমপি তস্য সহকারিনিমিত্তান্তরং বচনীয়মিতি।

ধর্ম্মস্য কারণবচনম্। যদি ধর্ম্মো নিমিত্তান্তরং তস্য হেতুর্ব্বাচ্যো যত উৎপদ্যত ইতি।

যোগসমাধিজস্য কার্য্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ষয়ে সংবেদননিবৃত্তিঃ। যদি যোগসমাধিজো ধর্ম্মো হেতুস্তস্য কার্য্যাবসায়বিরোধাৎ প্রলয়ে সংবেদনমত্যন্তং নিবর্ত্তেত।

অসংবেদনে চাবিদ্যমানেনাবিশেষঃ। যদি ধর্ম্মক্ষয়াৎ সংবেদনো পরমো নিত্যং সুখং ন সংবেদ্যত ইতি কিং বিদ্যমানং ন সংবেদ্যতেঽথাবিদ্যমানমিতি নানুমানং বিশিষ্টেঽস্তীতি।

অনুবাদ। অনিত্যত্ব হইলে হেতু বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে—যদি মোক্ষে নিত্য সুখের অনুভব অনিত্য হয়, (তাহা হইলে) যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, সেই হেতু বলিতে হইবে।

নিমিত্তান্তর সহিত আত্মমনঃসংযোগেরই হেতুত্ব হয়। বিশদার্থ এই যে,

আত্মমনঃসংযোগ (নিত্য সুখানুভবে) হেতু, ইহা যদি বল, এইরূপ হইলেও তাহার সহকারী কারণান্তর বলিতে হইবে।

ধর্ম্মের কারণ বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, যদি ধর্ম্ম নিমিত্তান্তর হয় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্ম্মই আত্মমনঃসংযোগের সহকারী কারণ, তখন ঐ দৃষ্টান্তে মোক্ষে নিত্যসুখানুভবেও ধর্ম্মই যদি সহকারী কারণ বল, (তাহা হইলে) তাহার (সেই ধর্ম্মের) কারণ বলিতে হইবে, যাহা হইতে (সেই ধর্ম্ম) উৎপন্ন হয়। যোগসমাধি-জাত ধর্ম্মের কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ বিনাশ হইলে সংবেদনের (নিত্যসুখানুভূতির) নিবৃত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যদি যোগ-সমাধিজাত ধর্ম্ম (মোক্ষে নিত্যসুখানুভবের) কারণ হয় অর্থাৎ সহকারী কারণ হয়, তাহা হইলে, তাহার (ঐ ধর্ম্মের) কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম মাত্রই তাহার চরম কার্য্য বা চরম ফল নাশ্য, ধর্ম্মের কার্য্য বা ফলের সমাপ্তি হইলে ধর্ম্ম থাকে না, এ জন্য, প্রলয় হইলে অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মের বিনাশ হইলে সংবেদন (নিত্য সুখানুভব) অত্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া পড়ে।

সংবেদন না হইলে আবার অবিদ্যমানের সহিত অবিশেষ হয়। বিশদার্থ এই যে, যদি ধর্ম্ম ক্ষয়বশতঃ সংবেদনের (নিত্যসুখানুভবের) নিবৃত্তি হয়, নিত্য সুখ অনুভূত না হয়, তাহা হইলে কি বিদ্যমান (সুখ) অনুভূত হইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান (সুখ) অনুভূত হইতেছে না ? বিশিষ্টে অর্থাৎ একতর বিশেষ পক্ষে অনুমান প্রমাণ (যুক্তি) নাই।

ভাষ্য। **অপ্রক্ষয়শ্চ ধর্ম্মস্য নিরনুমানমুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ।** যোগসমাধিজো ধর্ম্মো ন ক্ষীয়ত ইতি নাস্ত্যনুমানমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যমিতি বিপর্য্যয়স্য ত্বনুমানম্। যস্য তু সংবেদনোপরমো নাস্তি তেন সংবেদন-হেতুর্নিত্য ইত্যনুমেয়ম্। নিত্যে চ মুক্তসংসারস্থয়োরবিশেষ ইত্যুক্তম্। যথা মুক্তস্য নিত্যং সুখং তৎসংবেদনহেতুশ্চ, সংবেদনস্য তূপরমো নাস্তি কারণস্য নিত্যত্বাৎ তথা সংসারস্থস্যাপীতি। এবঞ্চ সতি ধর্ম্মাধর্ম্মফলেন সুখদুঃখসংবেদনেন সাহচর্য্যং গৃহ্যেতেতি।

শরীরাদিসম্বন্ধঃ প্রতিবন্ধহেতুরিতি চেৎ, ন, শরীরাদীনা-মুপভোগার্থত্বাৎ বিপর্য্যয়স্য চাননুমানাৎ।

স্যান্মতং, সংসারাবস্থস্য শরীরাদিসম্বন্ধো নিত্যসুখসংবেদনহেতোঃ

প্রতিবন্ধকস্তেনাবিশেষো নাস্তীতি। এতচ্চাযুক্তং, শরীরাদয় উপভোগার্থাস্তে ভোগপ্রতিবন্ধং করিষ্যন্তীত্যনুপপন্নম্। ন চাস্ত্যনুমানমশরীরস্যাত্মনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি।

অনুবাদ। ধর্ম্মের (পূর্ব্বোক্ত যোগসমাধিজাত ধর্ম্মের) অত্যন্ত বিনাশ নাই, (এ বিষয়ে) অনুমান প্রমাণের অভাব। কারণ, ধর্ম্মের উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে—যোগসমাধিজাত ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ নিত্য, এই বিষয়ে অনুমান প্রমাণ নাই; পরন্তু উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ উৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই অনিত্য, এইরূপে বিপর্য্যয়ের (নিত্যত্বের বিপর্য্যয় অনিত্যত্বের) অনুমান আছে।

যাহার (মতে) কিন্তু সংবেদনের (নিত্য সুখানুভবের) নিবৃত্তি নাই, তিনি সংবেদনের হেতু নিত্য, ইহা অনুমান করিবেন। নিত্য হইলে অর্থাৎ নিত্য সুখানুভবের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে আবার মুক্ত ও সংসারীর অবিশেষ হয়, ইহা বলিয়াছি। বিশদার্থ এই যে—যেমন মুক্ত ব্যক্তির সুখ এবং তাহার সংবেদনের (অনুভবের) হেতু নিত্য, কারণের নিত্যত্ববশতঃ সংবেদনেরও (নিত্য সুখানুভবেরও) নিবৃত্তি নাই, সংসারী ব্যক্তিরও তদ্রূপ হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলে আবার ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল সুখদুঃখানুভবের সহিত সহভাব (যৌগপদ্য) গৃহীত হইয়া পড়ে।

শরীরাদি সম্বন্ধ প্রতিবন্ধের হেতু, ইহা যদি বল, তাহা নহে অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না। কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ এবং বিপর্য্যয়ের অর্থাৎ অশরীর আত্মার ভোগের অনুমান নাই। বিশদার্থ এই যে—(পূর্ব্বপক্ষ) সংসারীর শরীরাদি সম্বন্ধ নিত্যসুখানুভবের কারণের প্রতিবন্ধক, তজ্জন্য (সংসারীর মুক্ত ব্যক্তির সহিত) অবিশেষ নাই, ইহা মত হইবে অর্থাৎ ইহাই সমাধান করিব। (উত্তর) ইহাও অযুক্ত। (কারণ), শরীরাদি উপভোগার্থ; তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধ করিবে, ইহা উপপন্ন হয় না এবং অশরীর আত্মার কোন ভোগ আছে, এ বিষয়ে অনুমান নাই।

ভাষ্য। **ইষ্টাধিগমার্থা প্রবৃত্তিরিতি চেৎ, ন অনিষ্টোপরমার্থত্বাৎ।** ইদমনুমানং ইষ্টাধিগমার্থো মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিশ্চ মুমুক্ষূণাং নোভয়মনর্থকমিতি। এতচ্চাযুক্তং অনিষ্টোপরমার্থো মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিশ্চ মুমুক্ষূণামিতি, নেষ্টমনিষ্টেনাননুবিদ্ধং সম্ভবতীতি ইষ্টমপ্যনিষ্টং সম্পদ্যতে। অনিষ্টহানায় ঘটমান ইষ্টমপি জহাতি। বিবেকহানস্যাশক্যত্বাদিতি।

দৃষ্টাতিক্রমশ্চ দেহাদিষু তুল্যঃ। যথা দৃষ্টমনিত্যং সুখং পরিত্যজ্য নিত্যসুখং কাময়তে এবং দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধীরনিত্যা দৃষ্টা অতিক্রম্য মুক্তস্য নিত্যা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ, সাধীয়শ্চৈবং মুক্তস্য চৈকাত্ম্যং কল্পিতং ভবতীতি।

উপপত্তিবিরুদ্ধমিতি চেৎ সমানম্। দেহাদীনাং নিত্যত্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি সমানং সুখস্যাপি নিত্যত্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি।

অনুবাদ। প্রবৃত্তি ইষ্টলাভার্থ, ইহা যদি বল, তাহা নহে। কারণ, (প্রবৃত্তির) অনিষ্ট নিবৃত্ত্যর্থতা আছে। বিশদার্থ এই যে—(পূর্ব্বপক্ষ) মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি ইষ্ট লাভার্থ, (সুখ লাভের জন্য)। উভয় অর্থাৎ মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, এই অনুমান আছে অর্থাৎ উপদেশ মাত্র এবং প্রবৃত্তি মাত্রই যখন সুখলাভার্থ, তখন মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তিও সুখ লাভার্থ; সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমান-প্রমাণই আছে, উহা নিষ্প্রমাণ হইবে কেন? (উত্তর) ইহাও অযুক্ত। মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ (দুঃখ নিবৃত্তির জন্য)। অনিষ্টের সহিত (দুঃখের সহিত) অননুবিদ্ধ (সম্বন্ধহীন) ইষ্ট (সুখ) সম্ভব নহে; এ জন্য ইষ্টও (সুখও) অনিষ্ট (দুঃখ) হইয়া পড়ে। দুঃখ পরিহারের জন্য প্রবর্ত্তমান হইয়া সুখও ত্যাগ করে; কারণ, বিবেক পূর্ব্বক ত্যাগ করা যায় না অর্থাৎ দুঃখ-সংবলিত সুখের সুখ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কেবল দুঃখাংশকে ত্যাগ করা যায় না; দুঃখ-পরিহার করিতে হইলে একেবারে সুখকেও পরিত্যাগ করিতে হয়।

দৃষ্টের অতিক্রমও দেহাদিবিষয়ে তুল্য। বিশদার্থ এই যে, যেমন দৃষ্ট অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া (মুমুক্ষু) নিত্য সুখ কামনা করে, এইরূপ দৃষ্ট অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্যক্তির নিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিত্য সুখভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিত্য দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ হইলে মুক্ত ব্যক্তির ঐকাত্ম্যও অর্থাৎ কৈবল্যও সাধুতররূপেই কল্পিত হয়। উপপত্তি বিরুদ্ধ ইহা যদি বল (তাহা) সমান। বিশদার্থ এই যে, দেহাদির প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যত্ব কল্পনা করা যায় না, সুখেরও প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যত্ব কল্পনা করা যায় না, ইহা সমান।

ভাষ্য। **আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনাদাগমেঽপি সত্যবিরোধঃ।**

যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্যাৎ মুক্তস্যাত্যন্তিকং সুখমিতি। সুখশব্দ আত্যন্তিকে দুঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবমুপপদ্যতে, দৃষ্টো হি দুঃখাভাবে সুখশব্দপ্রয়োগো বহুলং লোক ইতি।

নিত্যসুখরাগস্যাপ্রহাণে মোক্ষাধিগমাভাবো রাগস্য বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ।

যদ্যয়ং মোক্ষে নিত্যং সুখমভিব্যজ্যতে ইতি নিত্যসুখরাগেণ মোক্ষায় ঘটমানো ন মোক্ষমধিগচ্ছেন্নাধিগন্তুমর্হতীতি বন্ধনসমাজ্ঞাতো হি রাগঃ। ন চ বন্ধনে সত্যপি কশ্চিন্মুক্ত ইত্যুপপদ্যত ইতি। **প্রহীণনিত্যসুখরাগস্যাপ্রতিকূলত্বম্।** অথাস্য নিত্যসুখরাগঃ প্রহীয়তে তস্মিন্ প্রহীণে নাস্য নিত্যসুখরাগঃ প্রতিকূলো ভবতি।

যদ্যেবং মুক্তস্য নিত্যং সুখং ভবতি অথাপি ন ভবতি নাস্যোভয়োঃ পক্ষয়োর্মোক্ষাধিগমো বিকল্পত ইতি।

অনুবাদ। আত্যন্তিক সংসার-দুঃখাভাবে সুখ-বচন-বশতঃ আগম থাকিলেও বিরোধ নাই। বিশদার্থ এই যে, যদিও "মুক্ত ব্যক্তির আত্যন্তিক সুখ" এইরূপ অর্থাৎ আপাততঃ ঐরূপ অর্থের প্রতিপাদক কোনও আগম থাকে, (তাহাতে) "সুখ" শব্দ অর্থাৎ সেই আগমস্থ সুখবাচক শব্দ আত্যন্তিক দুঃখাভাবে অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থে প্রযুক্ত, এই প্রকার উপপন্ন হয়। কারণ, লোকে দুঃখাভাবে অর্থাৎ দুঃখাভাব অর্থে সুখ শব্দের প্রয়োগ (সুখবাচক শব্দের প্রয়োগ) বহু দেখা যায়। পরন্তু নিত্য সুখাভিলাষের অপরিত্যাগে মোক্ষ লাভ হয় না; কারণ, রাগের বন্ধন সমাজ্ঞান আছে। বিশদার্থ এই যে, যদি এই ব্যক্তি (মুমুক্ষু ব্যক্তি) মোক্ষে নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ জন্য নিত্য সুখে অভিলাষবশতঃ মুক্তির জন্য প্রবর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে মুক্তি লাভ করে না; করিতে পারে না। যেহেতু, রাগ (বিষয়ে অভিলাষ বা আসক্তি) বন্ধন-সমাজ্ঞাত অর্থাৎ বন্ধন বলিয়াই সর্ব্বসম্মত। বন্ধন থাকিলেও কেহ মুক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না।

পরিত্যক্ত নিত্য-সুখাভিলাষের প্রতিকূলত্ব নাই। বিশদার্থ এই যে—যদি ইহার

(মুমুক্ষুর) নিত্য সুখে অভিলাষ পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ নিত্য সুখাভিলাষ স্বয়ংই মুমুক্ষুকে পরিত্যাগ করে, সেই নিত্য-সুখাভিলাষ পরিত্যক্ত হইলে, এই মুমুক্ষুর নিত্য-সুখাভিলাষ (মোক্ষলাভের) প্রতিকূল হয় না।

এইরূপ হইলে, অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বৈরাগ্যবশতঃই মুমুক্ষুর মোক্ষ-প্রবৃত্তি হইলে, যদি মুক্ত ব্যক্তির নিত্য সুখ হয় অথবা নাও হয়, উভয় পক্ষেই ইহার (মুমুক্ষুর) মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় না, (অর্থাৎ নিত্য সুখের কামনা না থাকায় নিত্য সুখের অনুভূতি না হইলেও তাহাকে নিঃসন্দেহে মুক্ত বলা যাইতে পারে)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মতের নিষ্প্রমাণত্ব সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, নিত্য পদার্থের অভিব্যক্তি তাহার অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ অনুভূতি নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী আত্মারও ঐ নিত্য সুখানুভূতি আছে বলিতে হয়। যদি বল, সংসারীর ঐ নিত্য সুখানুভূতি থাকিলেও তাহার দুঃখানুভূতিও আছে, সুতরাং মুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার বিশেষ আছে এবং অন্যান্য বিশেষও অনেক আছে। এই কথা মনে করিয়া ভাষ্যকার দোষান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সংসারীর ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমেই অনুভূত হইয়া থাকে। দুঃখভোগের সময়ে সুখভোগ হয় না, ইহা সর্ব্বানুভব-সিদ্ধ। যদি সংসারী আত্মারও নিত্যসুখানুভূতি থাকে, তাহা হইলে, উহা তাহার দুঃখানুভবের সমকালীন হইয়া পড়ে। একই সময়ে সুখ ও দুঃখের অনুভব সর্ব্বানুভব-বিরুদ্ধ। যদি বল, নিত্যসুখের অনুভূতি নিত্য পদার্থ হইবে কেন ? উহা পূর্ব্বে থাকে না ; নিত্যসুখ পূর্ব্বে থাকিলেও তাহার অনুভূতি মোক্ষেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ অনুভূতির উৎপাদক কারণ বলিতে হইবে। আত্মমনঃসংযোগ না থাকিলে কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মুক্তাবস্থায় আত্মাতে মনের সংযোগ থাকে, বলিলে তখন আত্মাকে "কেবল" বলা যায় না। মনঃসংযুক্ত আত্মা "কেবল" আত্মা নহে। যদিও তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ আত্মমনঃসংযোগ সহকারী কারণ ব্যতীত সুখানুভবের কারণ হয় না। সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্ম্মই তাহার সহকারী কারণ, তখন মুক্তাবস্থায় সুখানুভবেও ধর্ম্মকেই সহকারী কারণ বলিতে হইবে।

সংসারাবস্থার কারণগুলি মুক্তাবস্থায় আবশ্যক হয় না বলিলে মুক্তাবস্থায় চক্ষুরাদির অভাবেও রূপদর্শনাদি হইতে পারিত। ধর্ম্মকে সহকারী কারণ বলিলে ঐ ধর্ম্মের কারণ বলিতে হইবে। যদি বল, যোগসমাধিজাত ধর্ম্মই তখন সহকারী কারণ হয়, এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে কারণের অভাবে তখন নিত্যসুখানুভবের নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। ধর্ম্মমাত্রই ফলনাশ্য, ফলসমাপ্তি হইলে ধর্ম্ম থাকে না। যদি বল, নিত্যসুখানুভবরূপ ফলের যখন সমাপ্তি নাই, তখন তাহার কারণ ধর্ম্মও কোনও দিন বিনষ্ট হয় না ; এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যোগসমাধিজাত ধর্ম্মের ক্ষয় নাই, এ বিষয়ে অনুমান নাই। পরন্তু উৎপন্ন ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী, ইহা অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ। এই কথার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাদিরূপ কারণও খণ্ডিত হইয়াছে ; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানাদিও বিনাশী।

তাহাদিগের অভাবে নিত্যসুখানুভবেরও নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। যদি বল যে, মোক্ষে নিত্য সুখের অনুভূতির কখনও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, ঐ অনুভূতির প্রবাহ চিরকালই থাকে; সুতরাং উহার কারণটি কোন নিত্য পদার্থ, ইহা অনুমান করিব। এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, নিত্য সুখানুভবের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী জীবেরও নিত্য সুখের অনুভূতি হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে জীবের দুঃখ-ভোগের সহিত এক সঙ্গেই সুখভোগ হইতেছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ অসিদ্ধান্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল যে, কারণ থাকিলেও সংসারী জীবের শরীরাদি সম্বন্ধ প্রতিবন্ধক থাকায় নিত্য সুখের অনুভূতি হয় না, এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, শরীরাদি ভোগের সহায়, তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা অযুক্ত। পরন্তু শরীরাদিশূন্য আত্মার কোন ভোগ হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন অনুমান (যুক্তি) নাই।

যদি বল যে, প্রবৃত্তি মাত্র এবং উপদেশ মাত্রই সুখভোগার্থ; সুতরাং মোক্ষে উপদেশও মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি অবশ্য সুখভোগার্থ, এই অনুমান দ্বারাই মোক্ষে নিত্যসুখসম্ভোগ হয়, ইহা নির্ণয় করা যায়, উহা নিষ্প্রমাণ হইবে কেন? এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, অনেক প্রবৃত্তি সুখভোগার্থ হইলেও কেবল দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যখন মরিতেও প্রবৃত্তি হয়, তখন মোক্ষের উপায়ানুষ্ঠানেই বা তাহা হইবে না কেন?—বিরক্ত ব্যক্তির তাহা হইয়া থাকে। দুঃখ-সম্বন্ধ-শূন্য সুখ অসম্ভব; সুতরাং বিরক্ত ব্যক্তির নিকটে সুখও দুঃখ হইয়া পড়ে, তিনি দুঃখ পরিহারের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া সুখকেও পরিত্যাগ করেন। সুখের মধ্যগত দুঃখভাগ পরিত্যাগ করিয়া সুখ ভোগ করা যায় না। সুখভোগ করিতে হইলে ঐ দুঃখভোগও করিতে হয়। আর দুঃখকে একেবারে পরিহার করিতে হইলে সুখকেও একেবারে পরিহার করিতে হয়। বিরক্ত মুমুক্ষু তাহাই করিয়া থাকেন। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যই তিনি মোক্ষের উপায়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যিনি সুখের লালসা ছাড়িতে পারেন না, তিনি মোক্ষে অনধিকারী,—তাই তিনি এ কথা বুঝিতেও পারেন না।

পরন্তু মুমুক্ষু যদি দৃষ্ট অনিত্য সুখ ত্যাগ করিয়া নিত্য সুখের কামনাই করেন, অর্থাৎ নিত্য সুখভোগই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ দৃষ্ট অনিত্য দেহাদি ত্যাগ করিয়া তিনি নিত্য দেহাদিও কামনা করিবেন। নিত্য সুখ-সম্ভোগের জন্য মুক্ত ব্যক্তির নিত্য-দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে। আত্মার কেবল-ভাবরূপ প্রকৃত কৈবল্য ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখ-সম্ভোগরূপ নূতন কৈবল্যের কল্পনা করিলে—দেহাদি-শূন্য আত্মার নিত্য-সুখ-সম্ভোগরূপ কল্পিত কৈবল্যের অপেক্ষায়—দেহাদিযুক্ত আত্মার নিত্য-সুখ-সম্ভোগরূপ কল্পিত কৈবল্যই সাধুতর হয়। কারণ, দেহাদিযুক্ত আত্মাতেই সুখসম্ভোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টানুসারেই কল্পনা করিতে হয়। দেহাদির নিত্যত্ব প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিলে, সুখের নিত্যত্বও প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিতে পারি। দেহাদির ন্যায় সুখও জন্য ভাব-পদার্থ; সুতরাং সুখমাত্রই দেহাদির ন্যায় বিনাশী, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

যদি বল, মুক্ত ব্যক্তির নিত্য-সুখসম্ভোগ শ্রুতিসিদ্ধ। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্"। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং

লব্ধ্বানন্দীভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে নিত্যানন্দ-প্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রুতি-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিবে কিরূপে ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থেই আনন্দ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। দুঃখাভাব অর্থে আনন্দ ও সুখ প্রভৃতি শব্দের গৌণ প্রয়োগ চিরকালই হইয়া আসিতেছে। লৌকিক ভাষাতেও উহা দেখা যায়। গুরু ভার নামাইয়া ভারবাহী "বাঁচিলাম," "সুখী হইলাম" এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। সাময়িক জ্বরবিরামে রোগী "সুখী হইয়াছি" এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। ফলতঃ ঐরূপ বহু স্থলেই কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিতেই সুখবাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যদি বল, শ্রুতির মুখ্যার্থ বাধ না হইলে গৌণার্থ ব্যাখ্যা অসঙ্গত। পরন্তু কেবল ঐ নিজ সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য শ্রুতির অন্যান্য বহু অংশেই লক্ষণার সাহায্যে কোনরূপে নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা সমীচীন ব্যাখ্যা নহে,—এ জন্য ভাষ্যকার শেষে একটি বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিত্য সুখের কামনা থাকিলে মুক্তিলাভ হইতে পারে না ; কারণ, কামনা বা আসক্তি বন্ধন বলিয়াই সর্ব্বসিদ্ধ। বন্ধন থাকিলে কি তাহাকে মুক্ত বলা যায় ? পরন্তু কামনার অধীনতায় কর্ম্ম করিয়াই জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতেছে।

নিত্য সুখের কামনায় মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে, কামনা-পিশাচী উপস্থিত বিষয়-সুখেও মুমুক্ষুকে প্রবৃত্ত করাইয়া মোক্ষ সুদূর-পরাহত করিবে। অনেক পরমযোগী শেষে ক্ষুদ্র কামনার অধীন হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারাই "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"। অতএব মুমুক্ষু কামনাকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। রাগের ন্যায় দ্বেষও বন্ধন, দ্বেষকেও পরিত্যাগ করিবেন। সুখের কামনা পরিত্যাগ করিলে সুখকে দ্বেষ করা হয় না। দুঃখপরিহারের ইচ্ছা হইলেও দুঃখকে দ্বেষ করা হয় না। বৈরাগ্যই মুমুক্ষুতার মূল। মুমুক্ষু দুঃখকে বিদ্বেষ করেন না। বৈরাগ্য এবং বিদ্বেষ এক পদার্থ নহে। জন্মান্তরের নিষ্কাম সাধনার ফলে ত্যাগপ্রিয় সুকৃতী মানব ইহা অবিলম্বে বুঝিতে পারেন। অন্যের এখানে বড় গোল। মূলকথা, নিত্য সুখের কামনা মোক্ষের প্রতিকূল ; সুতরাং শ্রুতিতে মোক্ষে নিত্যসুখানুভব হয়, এ কথা থাকিতে পারে না। মোক্ষে নিত্য-সুখসম্ভোগ হয়, ইহা জানিয়া মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে, মুমুক্ষু সুখসম্ভোগের কামনা কখনই ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং মোক্ষে নিত্য-সুখ-সম্ভোগ শ্রুতির প্রকৃতার্থ নহে। ফলতঃ শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্থ "আনন্দ" শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষণা-স্বীকার উভয় পক্ষেই আছে। কারণ, "অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিতে মোক্ষে সুখাভাব স্পষ্ট রহিয়াছে। মোক্ষে সুখ-সম্ভোগবাদিগণ ঐ শ্রুতিতে সুখমাত্র-বোধক "প্রিয়" শব্দের অনিত্য সুখে লক্ষণা স্বীকার করিবেন। নচেৎ তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বাধিত হয়। "প্রিয়" শব্দের ঐরূপ লক্ষণার অপেক্ষায় "আনন্দ", "সুখ" প্রভৃতি শব্দের দুঃখাভাবে লক্ষণা প্রসিদ্ধ। লৌকিক ভাষাতেও ঐরূপ প্রয়োগ বহু দেখা যায়। তাই বলিয়াছেন—"বহুলং লোকে।"

যদি বল, প্রথমতঃ নিত্য সুখের কামনা থাকিলেও পরে সর্ব্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্য

উপস্থিত হওয়ায় মুমুক্ষু সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্কাম হইয়া পড়েন। সুতরাং নিত্যসুখাভিলাষ পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহা মোক্ষলাভের প্রতিকূল হয় না। সর্ব্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষে প্রবর্ত্তক, ইহা উভয় পক্ষেই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, যদি সর্ব্ব-বিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষের প্রকৃত প্রবর্ত্তক, এই প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তবে মুক্ত ব্যক্তির নিত্যসুখ-সম্ভোগ না হইলেও তাহাকে মুক্ত বলিবে না কেন? নিত্য সুখ-সম্ভোগে যখন তাহার কিছুমাত্র কামনা নাই, তখন উহা না হইলেই বা তাহার ক্ষতি কি? সুখ ও দুঃখ যাহার নিকটে সমান, তাহার সুখভোগ না হইলেও কোন ক্ষতি বুঝা যায় না। মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সর্ব্বসম্মত। উহা না হইলে আর কিছুতেই মুক্ত বলা যায় না। কোন সম্প্রদায়ই তাহা বলেন না। ঐ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইলে তাহার নিত্য সুখসম্ভোগ হউক বা না হউক, উভয় পক্ষেই মুক্তিলাভের কোন সংশয় নাই। নিত্য সুখ-সম্ভোগের যখন কোন কামনা নাই, তখন দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইলে আর তাহার মুক্তিলাভের বাকী থাকিল কি? মোক্ষে নিত্য সুখ-সম্ভোগ না হইলেও যদি তাহাকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার কর, তবে আর মোক্ষে নিত্য সুখ-সম্ভোগ হয়, উহাই মুক্তি, এই সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না।

পরন্তু নিত্য-সুখ-সম্ভোগ যখন জন্য ও ভাবপদার্থ, তখন তাহা অবশ্য বিনাশী। সুতরাং উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না এবং সুখসম্ভোগ "মুচ" ধাতুর অর্থ নহে; দুঃখ-নিবৃত্তিই উহার অর্থ। সুতরাং উহার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পর্য্যন্ত বুঝা যাইতে পারে। উহা জন্য হইলেও ভাবপদার্থ নহে। সুতরাং বিনাশের আশঙ্কা নাই। "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" এই শ্রুতিতে উহাই মুক্তিরূপে অভিহিত হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতিস্থ "আনন্দ" প্রভৃতি শব্দেরও উহাই অর্থ। শাস্ত্র কখনও মুখ্য মোক্ষকে স্বর্গাদির ন্যায় একটা অপূর্ব্ব সুখ-সম্ভোগ বলিতে পারেন না।

মোক্ষে নিত্য-সুখসম্ভোগবাদী কেহ কেহ বলেন যে, উৎপন্ন ভাবপদার্থ মাত্রই বিনাশী, এই নিয়ম স্বীকার করি না। নৈয়ায়িক মতে ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও চিরস্থায়ী, সেইরূপ মুক্ত ব্যক্তির বিজাতীয় সুখ-সম্ভোগ উৎপন্ন হইয়াও চিরস্থায়ী হইতে পারে। সাংসারিক সুখ-সম্ভোগের দৃষ্টান্তে ঐ বিজাতীয় নিত্য সুখসম্ভোগকে বিনাশী বলিয়া স্থির করা যায় না। কারণ, উহা শ্রুতি-সিদ্ধ চিরস্থায়ী পদার্থ। আত্যন্তিক দুঃখের অভাব প্রস্তরাদিতেও আছে, তাহা কখনও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না এবং নিত্য সুখ-সম্ভোগের কামনা না থাকিলেও নিত্যসুখ-সম্ভোগ হইতে পারে। যেমন দুঃখভোগের কামনা না থাকিলেও জ্বরাদি পীড়া উপস্থিত হইলে দুঃখ-ভোগ হয়, তদ্রূপ নিত্য-সুখসম্ভোগের কামনা না থাকিলেও তাহার কারণ ঘটিলে অবশ্য তাহা হইবেই। গোপী-প্রেমের ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, গোপীদিগের আত্মসুখের কিছুমাত্র কামনা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-সমাগমে তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সুখাপেক্ষায় কোটি গুণ সুখ হইত।

"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥"

—চৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪পঃ।

এ সুখ-সম্ভোগ কিরূপ, তাহা তাঁহারাই বুঝিতেন। সকলে ইহা বুঝিতে পারে না। তাই বলিয়া ইহা কবিকল্পিত নহে, ইহা অসম্ভব নহে।

বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম-কথিত মুক্তি-লক্ষণ কোন মতেরই বিরুদ্ধ নহে। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই মুক্তি হয় না। সুতরাং মহর্ষি ঐ সর্ব্বসম্মত অবস্থাকেই মুক্তির লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় আনন্দানুভূতি থাকে কি না, তাহা বর্ত্তমান ন্যায়সূত্রে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। অন্ততঃ পরম প্রাচীন ভাষ্যকার প্রভৃতি কোন ন্যায়াচার্য্যই তাহা স্বীকার করেন নাই। সকলেই তাহার বিরুদ্ধবাদী। মাধবাচার্য্যের "সংক্ষেপ শঙ্করজয়" গ্রন্থের শেষ-ভাগে পাওয়া যায়, কোন নৈয়ায়িক গর্ব্বের সহিত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে কণাদের মুক্তি হইতে গোতমের মুক্তির বিশেষ কি, এই দুরুত্তর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার গুণ-সম্বন্ধের অত্যন্ত বিনাশে আকাশের ন্যায় স্থিতিই মুক্তি। গোতমের মতে উক্ত অবস্থায় "আনন্দ সংবিৎ" থাকে[১]। মনে হয়, অতি প্রাচীন কালে গোতমের মুক্তির উক্তরূপই ব্যাখ্যা ছিল; ভাষ্যকার উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যার প্রতিবাদের জন্যই এখানে উক্ত মতের সমধিক সমালোচনা করিয়াছেন। এ সকল অতি গুরুতর কথা। মুক্তি-পরীক্ষা-প্রকরণে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। স্থানবত এব তর্হি সংশয়স্য লক্ষণং বাচ্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ। তৎকালে অর্থাৎ প্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ-সময়ে ক্রম-প্রাপ্ত সংশয়েরই লক্ষণ (এখন) বক্তব্য, এ জন্য তাহা (সংশয়ের লক্ষণ) বলিতেছেন।

সূত্র। সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান জন্য, (২) অসাধারণ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান জন্য, (৩) বিপ্রতিপত্তি জন্য অর্থাৎ বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্য জন্য, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য এবং (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য,—বিশেষাপেক্ষ (যাহাতে বিশেষজ্ঞানের ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকে না, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি থাকে) "বিমর্শ" অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান—"সংশয়"।

১। ভাসর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত "ন্যায়সার" গ্রন্থেও এই মত পাওয়া যায়। "ন্যায়সারে তু পুনরেবং নিত্যসংবেদ্যমানেন সুখেন বিশিষ্টাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষঃ"।—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের গুণরত্নটীকা।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে "প্রমেয়" পদার্থের পরেই "সংশয়" পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রমেয় লক্ষণের পরে এখন সংশয়ই ক্রমপ্রাপ্ত। এ জন্য প্রমেয়-লক্ষণের পরে এখন সংশয়েরই লক্ষণ বলিতেছেন। ভাষ্যে "তর্হি" ইহার ব্যাখ্যা—"তদানীং" (উদ্দেশসময়ে)। "স্থান" শব্দের অর্থ ক্রম। "স্থানবতঃ" ইহার ব্যাখ্যা "ক্রম-প্রাপ্তস্য"।

সূত্রে "সংশয়ঃ" এই অংশ লক্ষ্যনির্দ্দেশ। "বিমর্শঃ" এই অংশের দ্বারা সংশয়ের সামান্য লক্ষণ সূচিত। "বি" শব্দের অর্থ বিরোধ। "মৃশ" ধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাৎপর্য্যানুসারে এখানে "বিমর্শ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহাই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। সূত্রে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দ্বারা সংশয়মাত্রেই তৎকালে বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু পূর্ব্ব-দৃষ্ট সেই বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি থাকা চাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে। সূত্রের অন্যাংশের দ্বারা পাঁচটি বিশেষ কারণের উল্লেখে পঞ্চবিধ বিশেষ সংশয়ের পাঁচটি বিশেষলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ঐ পাঁচটি বিশেষ লক্ষণে সূত্রোক্ত "বিমর্শ" শব্দের অনুবৃত্তি করিতে হইবে এবং ঐ 'বিমর্শ' শব্দই পাঁচটি বিশেষ লক্ষণের লক্ষ্য পদ। সে পক্ষে উহার অর্থ বিশিষ্ট সংশয়।

বিবৃতি। সংশয় এক প্রকার জ্ঞানবিশেষ। নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। যে বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান নাই, সে বিষয়েও নিশ্চয়ের অভাব আছে, কিন্তু সংশয় নাই। মহর্ষি "বিমর্শ" শব্দের দ্বারা এই সংশয় জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন। "বিমর্শ" বলিতে বিরুদ্ধজ্ঞান অর্থাৎ বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। একই কালে একই পদার্থে যে সকল ধর্ম্ম থাকে না, থাকিতেই পারে না, সেই সকল ধর্ম্মকে সেই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ বলে। যেমন একই সময়ে একই মনুষ্যে পরিণীতত্ব, অপরিণীতত্ব, পুত্রবত্ত্ব, পুত্রহীনতা, এইরূপ ধর্ম্মগুলি থাকে না, থাকিতেই পারে না; সুতরাং ঐ ধর্ম্মগুলি একই সময়ে একই মনুষ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ, একই সময়ে একই মনুষ্যে ইনি পরিণীত, অথবা অপরিণীত, ইনি পুত্রবান্ অথবা অপুত্রক, এই প্রকার কোন জ্ঞান জন্মিলে ঐ জ্ঞান সংশয়। ফলতঃ একই ধর্ম্মীতে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম্মের জ্ঞানকেই সংশয় বলে। এই সংশয় সর্ব্বত্রই হয় না, হইতে পারে না, জ্ঞানের সামান্য কারণ থাকিয়া যেখানে সংশয়ের কোন বিশেষ কারণ আছে, সেখানেই সংশয় হয়। সংশয়ের বিশেষ কারণের ভেদেই সংশয়ের ভেদ। ভাষ্যকার পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য পঞ্চবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞান জন্য একপ্রকার সংশয় হয়। অধিকাংশ সংশয়ই এই প্রকার, তাই এই প্রকারটিকেই সর্ব্বাগ্রে বলা হইয়াছে।

(১) পথের ধারে একটি শাখাপল্লবশূন্য বৃক্ষ (স্থাণু) নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালে দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে ধাবমান পথিক উহাতে স্থাণু ও পুরুষের কোন বিশেষ ধর্ম্ম দেখিতে পাইল না, কিন্তু স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম্ম বা সাধারণ ধর্ম্ম দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি এবং সেইরূপ দণ্ডায়মান ভাব প্রভৃতি দেখিয়া পথিকের সংশয় হইল, এইটি কি স্থাণু? অর্থাৎ মুড়ো গাছ? অথবা পুরুষ, অর্থাৎ কোন মনুষ্য, এই সংশয় সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান জন্য। পথিক

সেই সম্মুখবর্ত্তী পদার্থকে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছে। তাই তাহার ঐরূপ সংশয় হইয়াছে।

(২) এইরূপ কোন স্থলে অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান-জন্যও সংশয় জন্মে। যে ধর্ম্মীতে সংশয় হয়, কেবল সেই ধর্ম্মীতেই যে ধর্ম্মটি থাকে, তাহার সজাতীয় এবং বিজাতীয় আর কোন পদার্থে থাকে না, সেই ধর্ম্মটিকে সেই ধর্ম্মীর অসাধারণ ধর্ম্ম বলে। যেমন শব্দের ধর্ম্ম শব্দত্ব, উহা শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না, সুতরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম। শব্দে যদি নিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম্ম এবং অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম্ম নিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে সেখানে ঐ শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্যও "শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য ?" এইরূপ সংশয় জন্মে। অর্থাৎ কোন নিত্য পদার্থেও শব্দত্ব নাই, কোন অনিত্য পদার্থেও শব্দত্ব নাই, এইরূপে জ্ঞায়মান শব্দত্ব ধর্ম্মটির শব্দে জ্ঞান হইলে তাহাতে ঐরূপ সংশয় জন্মে।

(৩) এইরূপ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়-প্রযুক্তও সংশয় জন্মে। একজন বলিলেন -"জগৎ মিথ্যা।" একজন বলিলেন—"জগৎ সত্য"। এই দুইটি বাক্য শুনিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হয়। এই প্রকার সংশয়কে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় বলা হইয়াছে।

(৪) এইরূপ উপলব্ধির অনিয়ম প্রযুক্তও সংশয় জন্মে। পদার্থ থাকিলেও উপলব্ধি হয় এবং না থাকিলেও অনেক স্থলে আছে বলিয়া ভ্রম উপলব্ধি হয়, সুতরাং উপলব্ধির নিয়ম নাই। এ জন্য কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে "ইহা বিদ্যমান, কি অবিদ্যমান" এইরূপ সংশয়ও অনেক স্থলে হয়। এইরূপ সংশয়কে উপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্ত সংশয় বলা হইয়াছে।

(৫) এইরূপ অনুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্তও এক প্রকার সংশয় জন্মে। ভূগর্ভে কত পদার্থ থাকিলেও উপলব্ধি হইতেছে না, আবার যাহার উৎপত্তি হয় নাই, অথবা যাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারও উপলব্ধি হয় না, সুতরাং অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, তজ্জন্য কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে তাহা বিদ্যমান, অথবা অবিদ্যমান, এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। তবে বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় থাকিলে এবং বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি না থাকিলে কোন স্থলেই কোন প্রকার সংশয় জন্মে না। তাই মহর্ষি সংশয় মাত্রকেই বলিয়াছেন—"বিশেষাপেক্ষ"।

ভাষ্য। সমানধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয় ইতি। স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্ম্মমারোহপরিণাহৌ পশ্যন্ পূর্ব্বদৃষ্টঞ্চ তয়োর্ব্বিশেষং বুভুৎসমানঃ কিং স্বিদিত্যন্যতরং নাবধারয়তি, তদনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ। সমানমনয়োর্দ্ধর্ম্মমুপলভে, বিশেষমন্যতরস্য নোপলভে ইত্যেষা বুদ্ধিরপেক্ষা সংশয়স্য প্রবর্ত্তিকা বর্ত্ততে, তেন বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ।

অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান জন্য বিশেষাপেক্ষ অর্থাৎ

যেখানে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি থাকিবেই, এমন "বিমর্শ" অর্থাৎ এতাদৃশ যে একই ধর্ম্মীতে অনেক বিরুদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞান, তাহা সংশয়, অর্থাৎ তাহাই প্রথম প্রকার সংশয়বিশেষ।

[উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন]

স্থাণু ও পুরুষের অর্থাৎ শাখা-পল্লবহীন বৃক্ষ এবং মনুষ্যের সমান ধর্ম্ম আরোহ এবং পরিণাহকে অর্থাৎ তুল্যরূপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতিকে দর্শন করতঃ এবং সেই স্থাণু পুরুষের পূর্ব্বদৃষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ অর্থাৎ স্থাণু ও পুরুষের যে বিশেষ ধর্ম্ম পূর্ব্বে দেখিয়াছে, তাহার উপলব্ধি না করিয়া কেবল তাহার স্মরণ করতঃ ইহা কি? অর্থাৎ ইহা স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপে একতরকে অর্থাৎ স্থাণু ও পুরুষ অথবা স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব-ধর্ম্ম, ইহার মধ্যে কোন একটিকে অবধারণ করে না অর্থাৎ ঐ উভয় বিষয়েই অনবধারণ করে, সেই অনবধারণরূপ জ্ঞান (ঐ স্থলে) সংশয়।

[সূত্রোক্ত 'বিশেষাপেক্ষ' এই কথার এই স্থলে ব্যাখ্যা করিতেছেন]

এই পদার্থদ্বয়ের অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ বা স্মৃতিবিষয়ীভূত এই দুইটি পদার্থের সমান ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি, একতরের বিশেষ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি সংশয়ের সম্বন্ধে অপেক্ষা কি না জনিকা আছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে সংশয়ের পূর্ব্বে ঐরূপ জ্ঞান হয়, ঐরূপ জ্ঞান ঐ প্রকার সংশয়ের পূর্ব্বে আবশ্যক, সুতরাং "বিশেষাপেক্ষ" হইয়া বিমর্শটি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে অনবধারণ জ্ঞানটি "সংশয়" হইয়াছে।

টিপ্পনী। সূত্রে "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ" এই অংশের দ্বারা দ্বিবিধ সংশয়ের দুইটি বিশেষ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি সমান ধর্ম্মের উপপত্তিজন্য, দ্বিতীয়টি অনেক ধর্ম্মের উপপত্তিজন্য। সূত্রস্থ একই "ধর্ম্ম" শব্দের উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝিয়া ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে "সমান ধর্ম্ম" বলিতে বুঝিতে হইবে—সাধারণ ধর্ম্ম। "উপপত্তি" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে জ্ঞান। সমান ধর্ম্মের উপপত্তি কি না—সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান। যে কোন স্থানে সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান হইলে যে কোন স্থানে সংশয় জন্মে না। যে ধর্ম্মীতে সংশয় হইবে, সেই ধর্ম্মীকেই সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানই ভাষ্যকারোক্ত সমান ধর্ম্মজ্ঞান। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, "সমান হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার", এইরূপে বহুব্রীহি সমাসই সূত্রকারের অভিপ্রেত, কর্ম্মধারয় সমাস অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানই সূত্রোক্ত "সমানধর্ম্মোপপত্তি"। এইরূপ ব্যাখ্যায় কোন আপত্তি না থাকিলেও ভাষ্যকার এখানে বহুব্রীহি সমাস সঙ্গত বোধ করেন নাই। কারণ, সূত্রস্থ একই "ধর্ম্ম" শব্দের উভয়ত্র সম্বন্ধ

মহর্ষির অভিপ্রেত রহিয়াছে। ভাষ্যকার সূত্রকারোক্ত "অনেকধর্ম্মোপপত্তি"র যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এখানে বহুব্রীহি সমাস সঙ্গত হয় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

সংশয় জ্ঞানে যে সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মুখ্য বিশেষণ হয়, তাহাকে সংশয়ের "কোটি" বলে। যেমন "ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ?" এইরূপ সংশয়ে স্থাণু অথবা স্থাণুত্ব একটি কোটি এবং পুরুষ অথবা পুরুষত্ব একটি কোটি। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে ঐ স্থলে ইহা স্থাণু কি না? (স্থাণুর্ন বা) ইত্যাদি প্রকারে সংশয় হয়, তাঁহারা ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধকোটি ভিন্ন কেবল বিরুদ্ধ ভাব পদার্থ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বিরুদ্ধ ভাব পদার্থমাত্র লইয়াও সংশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতে একই সংশয় দুইটি বিরুদ্ধ কোটির ন্যায় বহু বিরুদ্ধ কোটি লইয়াও হইতে পারে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন শব্দে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই তিন কোটি লইয়া সংশয় দেখাইয়াছেন এবং কেবল বিরুদ্ধ ভাব পদার্থ লইয়া সংশয় দেখাইয়াছেন। ইহার দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত মত তাঁহার সম্মত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। বস্তুতঃ "স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা" ইত্যাদি প্রকার বাক্যের দ্বারাও যখন সংশয়কারী তাহার সংশয়কে প্রকাশ করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সর্ব্বত্র "নঞ্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই সকলে সংশয় প্রকাশ করিবে, এইরূপ রাজাজ্ঞাও নাই, তখন কেবল বিরুদ্ধভাব পদার্থ বিষয়েও যে সংশয় জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। "স্থাণুর্ব্বা, পুরুষো বা" ইত্যাদি স্থলে নব্য নৈয়ায়িকগণ "বা" শব্দের অভাব অর্থ বলিতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদিগের "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ন বা" এইরূপ বাক্যে "নঞ্" শব্দটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহারা "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ বা" এইরূপ বাক্যের দ্বারাই সংশয় প্রকাশ করেন নাই কেন? এইরূপ বহু কোটি লইয়াও একটি সংশয় হইতে পারে। ঐরূপ সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কেন উহা হইবে না?[১]

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যে "বিশেষং বুভুৎসমানঃ" এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার বিবরণ করিয়াছেন। "অপেক্ষা" শব্দের ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করিয়া তাৎপর্য্যবলে উহার দ্বারা জ্ঞানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা সংশয়ের পরেই জন্মে, উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "সমানমনয়োর্ধর্ম্মমুপলভে" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, সূত্রে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দ্বারা সংশয়ের পূর্ব্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট সেই বিশেষ-

---

১। কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং কিমু মুকুরবিম্বং কিমু মুখং
কিমব্জে কিং মীনৌ কিমু মদনবাণৌ কিমু দৃশৌ।
নগৌ বা গুচ্ছৌ বা কনককলসৌ বা কিমু কুচৌ
তড়িদ্বা তারা বা কনকলতিকা বা কিমবলা॥

বিক্রমাদিত্যের নিকটে কালিদাসের কথিত কবিতা বলিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিতসমাজে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার চারি চরণে চারিটি সংশয় প্রকটিত। এই চারিটি সংশয়ের প্রত্যেকটি চতুষ্কোটিক এবং কেবল ভাবকোটিক। ইহার মধ্যে অভাব বুঝিলে কবিতার ভাব বুঝা হইবে না।

ধর্ম্মের স্মৃতি থাকা চাই, ইহাই সূত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত। "অপেক্ষা" শব্দের লক্ষণার দ্বারা ঐরূপ অর্থই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাইবার জন্য ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে "বিশেষস্মৃত্যপেক্ষঃ" এই কথার দ্বারা উহার ফলিতার্থ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ সংশয়মাত্রেই পূর্ব্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না। কিন্তু তাহার স্মরণ হওয়া চাই। বিশেষ জ্ঞান থাকিবে না, ইহা বলাতে সামান্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ স্থাণু অথবা পুরুষের বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় হয় না এবং স্থাণু ও পুরুষ এবং তাহার বিশেষ ধর্ম্মের কোন জ্ঞান না থাকিলেও ঐরূপ সংশয় হয় না।

ভাষ্য। অনেকধর্ম্মোপপত্তেরিতি। সমানজাতীয়মসমানজাতীয়ঞ্চা-নেকম্। তস্যানেকস্য ধর্ম্মোপপত্তেঃ। বিশেষস্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ। সমানজাতীয়েভ্যোঽসমানজাতীয়েভ্যশ্চার্থা বিশিষ্যন্তে। গন্ধবত্ত্বাৎ পৃথিব্যবাদিভ্যো বিশিষ্যতে গুণকর্ম্মভ্যশ্চ। অস্তি চ শব্দে বিভাগজত্বং বিশেষঃ, তস্মিন্ দ্রব্যং গুণঃ কর্ম্ম বেতি সন্দেহঃ। বিশেষস্য উভয়থা-দৃষ্টত্বাৎ কিং দ্রব্যস্য সতো গুণকর্ম্মভ্যো বিশেষঃ? আহোস্বিৎ গুণস্য সত ইতি অথ কর্ম্মণঃ সত ইতি। বিশেষাপেক্ষা—অন্যতমস্য ব্যবস্থাপকং ধর্ম্মং নোপলভে ইতি বুদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। (২) "অনেকধর্ম্মোপপত্তেঃ" এই কথাটি (ব্যাখ্যা করিতেছি) সমানজাতীয় এবং অসমানজাতীয় "অনেক"। সেই অনেকের ধর্ম্ম জ্ঞান জন্য, অর্থাৎ অনেক হইতে বিশেষক যে ধর্ম্ম (ব্যাবর্ত্তক অসাধারণ ধর্ম্ম), তাহার জ্ঞান জন্য। যেহেতু, উভয় প্রকারে বিশেষের দর্শন আছে, অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে পদার্থের বিশেষ বা ব্যাবৃত্তি দেখা যায়। (উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত এ কথার বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন)—সমানজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে এবং বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থসমূহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (ইহার উদাহরণ) গন্ধবত্ত্ব-হেতুক পৃথিবী (দ্রব্যত্বরূপে সজাতীয়) জলাদি হইতে এবং (বিজাতীয়) গুণ ও কর্ম্মসমূহ হইতে বিশিষ্ট হইতেছে। (অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান জন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন) শব্দে বিভাগজত্ব অর্থাৎ বিভাগজন্যত্বরূপ বিশেষ (ব্যাবর্ত্তক বা অসাধারণ ধর্ম্ম) আছে। তাহাতে অর্থাৎ শব্দে (ঐ বিভাগ-জন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান জন্য) দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্ম? এইরূপ সংশয় হয়। যেহেতু, উভয় প্রকারে বিশেষের দর্শন আছে। (প্রকৃত স্থলে ইহার

প্রকার দেখাইতেছেন) কি দ্রব্য হইয়া শব্দের গুণ ও কর্ম্ম হইতে বিশেষ ? অথবা গুণ হইয়া দ্রব্য ও কর্ম্ম হইতে বিশেষ ? অথবা কর্ম্ম হইয়া দ্রব্য ও গুণ হইতে বিশেষ ? অন্যতমের অর্থাৎ শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, অথবা কর্ম্মত্বের ব্যবস্থাপক (নিশ্চায়ক) ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি (এখানে) বিশেষাপেক্ষা, অর্থাৎ ঐরূপ বুদ্ধি এখানে থাকাতে ঐ সংশয় বিশেষাপেক্ষ হইয়াছে।

টিপ্পনী। সূত্রে "অনেকধর্ম্ম" বলিতে অসাধারণ ধর্ম্ম। সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থই এখানে "অনেক" শব্দের অর্থ। তাহার বিশেষক অর্থাৎ যে ধর্ম্মের দ্বারা ঐ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থগুলি হইতে ধর্ম্মীর ভেদ বুঝা যায়, তাহাই "অনেকধর্ম্ম"। তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা যায়—অসাধারণ ধর্ম্ম। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত "অনেক" শব্দের লক্ষণার দ্বারা অনেক পদার্থ হইতে বিশেষক, এই পর্য্যন্ত অর্থ বুঝিতে হইবে এবং ভাষ্যে "অনেকস্য" এই স্থলে সম্বন্ধার্থ ষষ্ঠীর দ্বারা বিশেষকত্বরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়া অনেক হইতে বিশেষক বা ভেদক ধর্ম্মই সেখানে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, অসাধারণ ধর্ম্মই "অনেক ধর্ম্ম"। কারণ, অসাধারণ ধর্ম্মই পদার্থকে তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট করে অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। যেমন গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না, এ জন্য উহা পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্ম। ঐ গন্ধ পৃথিবীকে তাহার সজাতীয় জল প্রভৃতি হইতে এবং বিজাতীয় গুণাদি পদার্থ হইতে বিশিষ্ট করে। গন্ধ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চিত থাকায় অর্থাৎ যে পদার্থে গন্ধ আছে, তাহা পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা নিশ্চিত থাকায় ঐ স্থলে অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান সংশয় জন্মায় না। কারণ, বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে সেখানে সংশয় জন্মিতে পারে না। বিশেষ ধর্ম্মের অনুপলব্ধি সংশয়মাত্রেই আবশ্যক, ইহা মহর্ষি "বিশেষাপেক্ষ" এই কথার দ্বারাই সূচনা করিয়াছেন।

অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় কোথায় কিরূপে হইয়া থাকে ? ভাষ্যকার তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দে বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম-জ্ঞান হইলে অন্যান্য কারণ সত্ত্বে "শব্দ কি দ্রব্য ? অথবা গুণ ? অথবা কর্ম্ম ?" এইরূপ একটি সংশয় জন্মে। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কোন বংশখণ্ডের অগ্রভাগ বিদীর্ণ করিয়া যখন উহার দুইটি অংশকে দুই হস্তের দ্বারা জোরে আকর্ষণ করা যায়, তখন যে শব্দ হয়, তাহা ঐ বংশখণ্ডের দুই ভাগের বিভাগজন্য এবং ঐ দুই অংশের সহিত আকাশের যে বিভাগ হয়, তজ্জন্য। ঐ স্থলে যে শব্দ জন্মে, তাহার প্রতি আকাশের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিভাগ অসমবায়ি কারণ। এইরূপ কোন বস্ত্রখণ্ডকে দুই হস্তের দ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিবার সময়ে যে শব্দ হয়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিভাগজন্য। ফলতঃ বিভাগ যাহার অসমবায়ি কারণ, তাহাই ভাষ্যোক্ত বিভাগজন্য পদার্থ। এইরূপ বিভাগজন্যতা শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই, সুতরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম। আপত্তি হইতে পারে যে, এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিও

প্রথম বিভাগ অসমবায়ি কারণ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিভাগজন্যত্ব যখন বিভাগেও থাকে, তখন উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ জন্মে, ইহা স্বীকার করি না। কোন বিভাগের প্রতি তাহার পূর্ব্বজাত বিভাগ কারণ নহে, পূর্ব্বজাত ক্রিয়াই বিভাগের কারণ। আর যদি বৈশেষিক মতানুসারে তাহা স্বীকারও করা যায়, অর্থাৎ বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও সেই বিভাগজন্য যে দ্বিতীয় বিভাগ, তাহা আর কোন বিভাগের অসমবায়ি কারণ নয় বলিয়া উহা কেবল শব্দেরই অসমবায়ি কারণ। অর্থাৎ বিভাগজন্য যে বিভাগ, তজ্জন্যত্ব ধর্ম্মটি শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে না থাকায় উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম। তাহা হইলে ভাষ্যকার যে "বিভাগজন্যত্ব"কে শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন, উহার অর্থ বিভাগজন্য যে দ্বিতীয় বিভাগ, সেই বিভাগজন্যত্ব বুঝিতে হইবে। সুতরাং বৈশেষিক মতেও ভাষ্যকারের কথা সংগত হইয়াছে। মহর্ষি কণাদোক্ত "দ্রব্য", "গুণ" ও "কর্ম্মের" "সত্তা" প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য শব্দে নিশ্চিত থাকায় শব্দ "দ্রব্য", "গুণ" ও "কর্ম্ম" হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত আছে। কিন্তু শব্দে "দ্রব্য", "গুণ" অথবা "কর্ম্মের" কোন বিশেষ ধর্ম্ম নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য "শব্দ কি দ্রব্য? অথবা গুণ? অথবা কর্ম্ম?" এইরূপ সংশয় জন্মে। শব্দ দ্রব্য হইয়াও বিভাগজন্য হইতে পারে, গুণ হইয়া অথবা কর্ম্ম হইয়াও বিভাগজন্য হইতে পারে। সিদ্ধান্তে যেমন গুণের মধ্যে আর কোন গুণ বিভাগজন্য না হইয়াও শব্দরূপ গুণবিশেষ বিভাগজন্য হইয়াছে, তদ্রূপ দ্রব্যের মধ্যে আর কোন দ্রব্য অথবা কর্ম্মের মধ্যে আর কোন কর্ম্ম বিভাগজন্য না হইলেও শব্দরূপ দ্রব্য অথবা কর্ম্মও বিভাগজন্য হইতে পারে, তাহাতেও বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মটি শব্দকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট করিতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান, শব্দবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মায়। পরিশেষানুমানের দ্বারা শব্দের গুণত্ব নিশ্চয় হইলে ঐ সংশয় নিবৃত্ত হয় (পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যটিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত "বিভাগজন্যত্ব" দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধারণ ধর্ম্ম নহে, এ জন্য পূর্ব্বোক্ত সংশয় সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্য নহে। মহর্ষি এই জন্যই অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। সূত্রে "অনেক ধর্ম্ম" বলিতে "অসাধারণ ধর্ম্ম"। প্রথমে "সমান ধর্ম্ম" বলাতেও "অনেক ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা অসাধারণ ধর্ম্মই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়।

ভাষ্য। বিপ্রতিপত্তেরিতি। ব্যাহতমেকার্থদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ। ব্যাঘাতো বিরোধোঽসহভাব ইতি। অস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনম্, নাস্ত্যাত্মেত্যপরম্। ন চ সদ্ভাবাসদ্ভাবৌ সহৈকত্র সম্ভবতঃ। ন চান্যতরসাধকো হেতুরুপলভ্যতে তত্র তত্ত্বানবধারণং সংশয় ইতি।

অনুবাদ। (৩) "বিপ্রতিপত্তেঃ" এই কথাটি (ব্যাখ্যা করিতেছি)। ব্যাঘাতযুক্ত "একার্থদর্শন" অর্থাৎ এক পদার্থে পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয় "বিপ্রতি-

পত্তি"। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ কি না অসহভাব (একাধারে না থাকা)। ('বিপ্রতিপত্তি' জন্য সংশয়ের উদাহরণ) আত্মা অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে, ইহা এক দর্শন (বাক্য)। আত্মা নাই, ইহা অপর দর্শন (বাক্য)। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব মিলিতভাবে একাধারে সম্ভব হয় না। অন্যতর সাধক অর্থাৎ নিত্য আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের নিশ্চায়ক হেতুও উপলব্ধ হইতেছে না। সেই স্থলে তত্ত্বের অর্থাৎ নিত্য আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের অনবধারণরূপ সংশয় হয়।

টিপ্পনী। "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের মুখ্যার্থ বিরুদ্ধজ্ঞান। কিন্তু উহা বাদী ও প্রতিবদীর জ্ঞান; সুতরাং অন্যের সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। এ জন্য এখানে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিজন্য বাক্যদ্বয়। তাৎপর্য্য-টীকাকারও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উপন্যাস করিয়া এখানে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের ঐরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ব্যাহতমেকার্থদর্শনং" এবং "অস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনং" এই ভাষ্যেও "দর্শন" শব্দের বাক্য-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে এখানে বাক্যবিশেষকেই "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইয়াছে। পরন্তু ভাষ্যকার সংশয়পরীক্ষাস্থলে (২ অঃ, ১ আঃ, ৬ সূত্র) এই সূত্রের "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"সমানেঽধিকরণে ব্যাহতার্থৌ প্রবাদৌ বিপ্রতিপত্তিশব্দস্যার্থঃ"। অর্থাৎ একাধারে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক প্রবাদদ্বয় (বাক্যদ্বয়) এই সূত্রোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ। তাহা হইলে এখানেও "দর্শন" শব্দ—তিনি বাক্য অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। "দৃশ্যতে জ্ঞায়তেঽনেন" এইরূপ বুৎপত্তি-সিদ্ধ "দর্শন" শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্যানুসারে বাক্যও বুঝা যাইতে পারে। ন্যায়াঙ্গ-সংশয়জনক দার্শনিক বিপ্রতিপত্তিগুলিই এখানে সূত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা সূচনা করিবার জন্যই ভাষ্যকার বাক্য শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয়।

সাংখ্যাদি শাস্ত্ররূপ বাক্যবিশেষ অর্থে এবং তজ্জন্য জ্ঞানবিশেষ অর্থেও বহু কাল হইতে "দর্শন" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও ঐরূপ অর্থে "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "সাংখ্যদর্শন," "যোগদর্শন" প্রভৃতি শব্দও সেখানে[১] প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরমপ্রাচীন বাৎস্যায়নও চতুর্থাধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—"অন্যোন্যপ্রত্যনীকানি প্রবাদুকানাং দর্শনানি"। এবং "দর্শন" শব্দের প্রকৃতি দৃশ ধাতুকে গ্রহণ করিয়া তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকের প্রথম সূত্রভাষ্যে সাংখ্যদর্শন তাৎপর্য্যে "দৃষ্ট" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ" এই শ্রুতিই পূর্ব্বোক্ত অর্থে "দর্শন" শব্দপ্রয়োগের মূল। মোক্ষের চরম কারণ আত্মদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকারই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। বিচার দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই এবং উহার উপায় বর্ণনের জন্যই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সৃষ্টি। ফল কথা, যে শাস্ত্র আত্মবিচারের দ্বারা পরম্পরায় আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাকে "দর্শনশাস্ত্র"

১। শান্তিপর্ব্ব, ৩০০।৫।৩০৬।২৬।৩০৭।১ দ্রষ্টব্য।

বলা যাইতে পারে। "দৃশ" ধাতুর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রতিপাদিত আত্মদর্শনরূপ বিশেষ অ গ্রহণ করিয়াই পূর্ব্বোক্ত অর্থে "দর্শন" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাতে আত্মদর্শনের কোন কথা নাই, তাহাতেও "দর্শনে"র সাদৃশ্য-প্রযুক্ত পরে "দর্শন" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। যাহাতে আত্মবিচার করিয়া আত্মদর্শনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, পরম্পরায় যাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-প্রতিপাদিত আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাই মুখ্য "দর্শন"।

সে যাহা হউক, মূলকথা এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যস্থের সংশয় হইয়া থাকে। আস্তিক বলিলেন,—"আত্মা অস্তি" ; নাস্তিক বলিলেন,—"আত্মা নাস্তি"। তাঁহাদিগের উভয়েরই একতর নিশ্চয় আছে। কিন্তু যে মধ্যস্থ শ্রোতা আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের সাধক হেতু পাইলেন না, তাঁহার সংশয় হইল– আত্মা অর্থাৎ নিত্য আত্মা আছে কি না ? এই সংশয় বিপ্রতিপত্তিজন্য। জ্ঞেয় তত্ত্বে এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি থাকায় তত্ত্বনির্ণীযুদিগের সংশয় হইতেছে। সংশয়ের পরে জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে। জিজ্ঞাসার ফলে বিচারপ্রবৃত্তি হইতেছে। বিচারদ্বারা অনেক স্থলে তত্ত্ব-নির্ণয় হইতেছে এবং বিভিন্ন মতের সমন্বয়বোধও হইতেছে। জিজ্ঞাসা মানবের জ্ঞানের মূল। জিজ্ঞাসার মূল আবার সংশয়। যে মানবের সংশয় হয় না, তিনি জ্ঞানরাজ্যের বহু দূরে আছেন। ফলতঃ সংশয় শান্তির চিরশত্রু নহে ; উহা চিরশান্তির মূল ; উহা জ্ঞানমন্দিরের প্রথম সোপান। সংশয় না হইলে নির্ণয়ের আশা থাকে না। গীতায় অর্জ্জুনের সংশয়ে কত তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং দার্শনিক নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি অজ্ঞ মানবের সংশয় জন্মাইয়া এক পক্ষে মঙ্গলই করিতেছে। সংশয় যত সুদৃঢ় হইবে, ততই নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। শেষে প্রকৃত তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই সকল সংশয় ছিন্ন হইবে। ("ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ")।

পক্ষান্তরে, শাস্ত্রে নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি আছে বলিয়াই শাস্ত্র ও তাহার চর্চ্চা এত দিন টিকিয়া আছে। বিপ্রতিপত্তিমূলক সাম্প্রদায়িকতার দোষ থাকিলেও উহার একটি মহাগুণ আছে—যাহার ফলে এ পর্য্যন্ত অনেক তত্ত্বই একেবারে বিলীন হইয়া যায় নাই।

ভাষ্য। উপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ খল্বপি, সচ্চোদকমুপলভ্যতে তড়াগাদিষু মরীচিষু চাবিদ্যমানমুদকমিতি। অতঃ ক্বচিদুপলভ্যমানে তত্ত্বব্যবস্থাপকস্য প্রমাণস্যানুপলব্ধেঃ কিং সদুপলভ্যতে, অথাসদিতি সংশয়ো ভবতি।

অনুবাদ। (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। তড়াগাদিতে বিদ্যমান জল উপলব্ধ হয় এবং মরীচিকায় অবিদ্যমান জল উপলব্ধ হয় ; অতএব উপলভ্যমান কোনও বিষয়ে তত্ত্ব-ব্যবস্থাপক (প্রকৃত-তত্ত্ব-নিশ্চায়ক) প্রমাণের অনুপলব্ধিবশতঃ কি বিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ? অথবা অবিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ? এইরূপ সংশয় হয়।

টিপ্পনী। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি হয়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয় অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এমন নিয়ম নাই। সুতরাং কোন স্থানে কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে তাহার বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে ভাষ্যোক্ত প্রকার সংশয় হয়। ইহাকেই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য চতুর্থ প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। ভাষ্যে "খল্বপি" এই শব্দটি[১] নিপাত। উহার অর্থ উদাহরণ-প্রদর্শন।

ভাষ্য। অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ—সচ্চ নোপলভ্যতে মূলকীলকোদকাদি, অসচ্চানুৎপন্নং নিরুদ্ধং বা, ততঃ ক্বচিদনুপলভ্যমানে সংশয়ঃ, কিং সন্নোপলভ্যতে ? উতাসন্নিতি সংশয়ো ভবতি। বিশেষাপেক্ষা পূর্ব্ববৎ।

অনুবাদ। (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। বিদ্যমান মূল, কীলক, জল প্রভৃতি (ভূগর্ভাদিস্থ) উপলব্ধ হয় না এবং অবিদ্যমান, অনুৎপন্ন বা বিনষ্ট বস্তু উপলব্ধ হয় না ; তজ্জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য অনুপলভ্যমান কোন পদার্থে সংশয় হয়। (সে কিরূপ সংশয়, তাহা বলিতেছেন) কি, বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? এইরূপ সংশয় হয়। বিশেষাপেক্ষা পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চায়ক হেতুর অথবা ঐ বিশেষ ধর্ম্মের অনুপলব্ধি পূর্ব্বোক্ত সংশয়গুলির ন্যায় এই সংশয়েও আবশ্যক।

টিপ্পনী। উপলব্ধির ন্যায় অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই। ভূগর্ভ প্রভৃতিস্থ বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং সর্ব্বত্র অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং কোন পদার্থ উপলব্ধ না হইলে, তখন তাহাতে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভাষ্যোক্ত প্রকার সংশয় হয়। মহর্ষি ইহাকেই অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য পঞ্চম প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। ভাষ্যে "অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ" এই কথার পরে পূর্ব্বোক্ত "খল্বপি" এই শব্দের যোগ করিতে হইবে। না করিলেও ব্যাখ্যা হয়।

ভাষ্য। পূর্ব্বঃ সমানোঽনেকশ্চ ধর্ম্মো জ্ঞেয়স্থঃ, উপলব্ধ্যনুপলব্ধী পুনর্জ্ঞাতৃগতে, এতাবতা বিশেষেণ পুনর্ব্বচনম্। সমানধর্ম্মাধিগমাৎ সমানধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিশেষস্মৃত্যপেক্ষো বিমর্শ ইতি।

অনুবাদ। পূর্ব্ব অর্থাৎ সূত্রে পূর্ব্বোক্ত সমান-ধর্ম্ম এবং অনেকধর্ম্ম জ্ঞেয়গত

১। উদয়নের ন্যায়কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে "আয়োজনাৎ খল্বপি" এই কথার ব্যাখ্যায় প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"খল্বপীতি নিপাতসমুদায়ঃ উদাহ্রিয়তে ইত্যর্থে বর্ত্ততে ন সমুচ্চয়ার্থঃ"।

অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের ধর্ম্ম, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি কিন্তু জ্ঞাতৃগত অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা আত্মার ধর্ম্ম, এইটুকু বিশেষবশতঃ পুনরুক্তি হইয়াছে। সমান ধর্ম্মের উপপত্তি-বশতঃ কি না—সমান-ধর্ম্মের জ্ঞানবশতঃ বিশেষ-স্মৃত্যপেক্ষ অর্থাৎ যাহাতে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ আবশ্যক, এমন "বিমর্শ" (সংশয়) হয়।

টিপ্পনী। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাস্থলে যে সংশয়, তাহা সাধারণ ধর্ম্মাদি জ্ঞানবশতঃই হইতে পারে, আবার তাহার জন্য পৃথক্ কারণ বলা কেন? পরবর্ত্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহা বলেন নাই। ভাষ্যকার এই প্রশ্ন মনে করিয়া তদুত্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে, সাধারণ ধর্ম্ম ও অসাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞেয়গত। অব্যবস্থিত উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জ্ঞাতৃগত। এই বিশেষটুকু ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্-ভাবে সংশয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মাদি জ্ঞান প্রযুক্ত সেখানে সংশয় হইতে পারিলেও, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্তও সেখানে বিশিষ্ট সংশয় হইয়া থাকে, ইহাই মহর্ষির মনের কথা। তজ্জন্য তিনি পঞ্চবিধ বিশেষ সংশয়ই পঞ্চবিধ বিশেষ কারণের উল্লেখ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

সূত্রস্থ "উপপত্তি" শব্দের অর্থভ্রমে অনেক পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। পরীক্ষাস্থলে সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং "বিশেষাপেক্ষ" এই কথাটির তাৎপর্য্যার্থ স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। এ জন্য ভাষ্যকার উপসংহারে আবার সূত্রোক্ত প্রথম প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইরূপেই অন্য চতুর্ব্বিধ সংশয়লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাও উহার দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন।

উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সংশয় ত্রিবিধ; পঞ্চবিধ নহে। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা কোন বিশেষ সংশয়ের বিশেষ কারণ নহে; উহা সংশয়মাত্রেরই কারণ। যে দুইটি পদার্থ-বিষয়ে সংশয় হয়, তাহার যে কোন একটির নিশ্চয়ের হেতু না থাকাই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং যে কোন একটির অভাবনিশ্চয়ের হেতু না থাকাই অনুপলব্ধির অব্যবস্থা। সংশয়মাত্রেই ঐ দুইটি আবশ্যক। নচেৎ স্থাণুত্ব বা পুরুষত্বের নিশ্চয় হইলে অথবা উহার কোন একটির অভাব নিশ্চয় হইলে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ ধর্ম্মাদি-জ্ঞান-জন্য তখনও পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় হয় না কেন? সুতরাং ত্রিবিধ সংশয়েরই বিশেষ লক্ষণে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা এই দুইটি সামান্য কারণকেও নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত। আর যেখানে কিছু বুঝিবার ইচ্ছাই নাই, সেখানে সংশয়ের অন্যান্য কারণ থাকিলেও সংশয় হয় না; এ জন্য বলিয়াছেন—"বিশেষাপেক্ষঃ" অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা থাকা চাই, তাহাও সংশয়মাত্রের কারণ। উহাও ত্রিবিধ সংশয়লক্ষণে নিবিষ্ট করিতে হইবে। বার্ত্তিকব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও

উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি সংশয়ের প্রযোজক মাত্র। ঐ সব স্থলে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ ধর্ম্মাদিজ্ঞানজন্যই সংশয় হয়। তাঁহার মতে সংশয় দ্বিবিধ। মহর্ষি কণাদ কেবল সাধারণ-ধর্ম্মজ্ঞান-জন্য একবিধ সংশয়ই বলিয়াছেন। কণাদ-সূত্রের উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, সমান-তন্ত্র গোতমদর্শনে অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজন্য যে সংশয়ের কথা আছে, মহর্ষি কণাদ তাহা বলেন নাই। কারণ, কণাদ সংশয়ের ন্যায় "অনধ্যবসায়" নামক এক প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।[1] তাঁহার মতে অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান তাহার প্রতিই কারণ। কণাদ-সম্মত ঐ জ্ঞানকে মহর্ষি গোতম সংশয়ই বলেন; এ জন্য তিনি অসাধারণ-ধর্ম্মজ্ঞানকে সংশয়ের কারণের মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের পঞ্চবিধ সংশয়ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও সরলভাবে মহর্ষির সূত্র পাঠ করিয়া এবং সূত্রস্থ "চ"-কারের প্রতি মনোযোগ করিয়া এবং সংশয়-পরীক্ষাস্থলে এই সূত্রোক্ত পাঁচটি হেতুকেই আশ্রয়পূর্ব্বক মহর্ষিকৃত ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্বপক্ষ সূত্রগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকার পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য পঞ্চবিধ সংশয়ই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়ের পৃথক্ কারণ কেন বলিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহারও একটু কারণ বলিয়া গিয়াছেন। ফল কথা, তিনি মহর্ষি-সূত্রের সহজ-বোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া উদ্যোতকর প্রভৃতির ন্যায় এখানে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় হইলে অথবা তাহার অভাব নিশ্চয় হইলে তখনও সাধারণ-ধর্ম্মাদি-জ্ঞানজন্য সংশয় হয় না কেন? এ আপত্তি ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও নাই। কারণ, ভাষ্যকারের মতে সূত্রে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দ্বারাই ঐ আপত্তি নিরাকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে সূত্রোক্ত ঐ কথার ফলিতার্থ এই যে, যাহাতে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি নাই, কিন্তু পূর্ব্বোপলব্ধ বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতিমাত্র আছে, তাহাই "বিশেষাপেক্ষ"। ফলতঃ ঐ "বিশেষাপেক্ষা" সংশয়মাত্রেই আবশ্যক। তাহা হইলে যেখানে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি হইয়া গিয়াছে, সেখানে ঐ "বিশেষাপেক্ষা" না থাকায় সংশয়ের আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককারের প্রদত্ত দোষ থাকিবে কেন?[2] যেখানে কিছু বুঝিবার ইচ্ছাই নাই, সেখানেও সংশয়ের সামগ্রী থাকিলে অবশ্য সংশয় হইয়া থাকে। ইচ্ছার অভাবে জ্ঞানের অনুৎপত্তি ঘটে না। যদি কোন স্থলে ঐরূপ ঘটে, ইচ্ছা না থাকায় সংশয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে সংশয়ের কোন কারণের অভাব হইয়াছে অথবা কোন প্রতিবন্ধক আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ফল কথা, "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দ্বারাই সূত্রকার সংশয়ের আপত্তিগুলির নিরাস করিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষাপ্রকরণে এ বিষয়ে

১। কণাদসূত্রে এ কথা স্পষ্ট না থাকিলেও কণাদ-মতব্যাখ্যাতা পরম প্রাচীন প্রশস্তপাদ "পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে" সংশয়ভিন্ন অনধ্যবসায় নামক সংশয়সদৃশ জ্ঞানান্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাখণ্ডনে উদ্যোতকরের বিশেষ কথা এবং ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ সূত্রভাষ্যব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

সকল কথা বিশদ ব্যক্ত হইবে। পরীক্ষা না পাইলে সকল তত্ত্ব ঠিক বুঝা যায় না। সংশয়ের কারণেও সংশয় হয়।

ভাষ্য। স্থানবতাং লক্ষণমিতি সমানম্।

অনুবাদ। ক্রম-প্রাপ্ত পদার্থ-বর্গের লক্ষণ বক্তব্য, ইহা সমান—(অর্থাৎ যেমন প্রমেয়-লক্ষণের পরে সংশয়-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সংশয়-লক্ষণের পরে এখন ক্রম-প্রাপ্ত প্রয়োজন-লক্ষণ এবং তাহার পরে যথাক্রমেই দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থ-বর্গের লক্ষণ বলা হইবে)।

সূত্র। যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্ ॥২৪॥

অনুবাদ। যে পদার্থকে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন।

ভাষ্য। যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় তদাপ্তি-হানোপায়মনুতিষ্ঠতি প্রয়োজনং তদ্বেদিতব্যম্। প্রবৃত্তি-হেতুত্বাদিমমর্থমাপ্স্যামি হাস্যামি বেতি ব্যবসায়োঽর্থস্যাধিকারঃ। এবং ব্যবসীয়মানোঽর্থোঽধিক্রিয়ত ইতি।

অনুবাদ। যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায় অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা (সেই পদার্থ) প্রয়োজন জানিবে। প্রবৃত্তিহেতুত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া এই পদার্থ পাইব অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ ব্যবসায় (নিশ্চয়) পদার্থের "অধিকার"। এইরূপে (পূর্ব্বোক্তরূপে) নিশ্চীয়মান পদার্থ অধিকৃত হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। প্রয়োজন দ্বিবিধ,—মুখ্য ও গৌণ। দ্বিবিধ প্রয়োজন প্রতিপাদনের জন্যই সূত্রে "অর্থ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নচেৎ উহা না বলিলেও চলিত। সুখের প্রাপ্তি এবং দুঃখের নিবৃত্তিতে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা হয়, এ জন্য ঐ দুইটিই মুখ্য প্রয়োজন। তাহার সাধনগুলি গৌণ প্রয়োজন। সূত্রের "অধিকৃত্য" এই কথার ব্যাখ্যা ভাষ্যে "ব্যবসায়"। "যমর্থমধিকৃত্য" এই কথার দ্বারা সূত্রে পদার্থের যে অধিকার বলা হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এই পদার্থ পাইব বা ত্যাগ করিব, এইরূপ নিশ্চয়ই পদার্থের অধিকার; অর্থাৎ সূত্রে অধিপূর্ব্বক কৃ ধাতুর অর্থ এখানে ঐরূপ নিশ্চয়। ঐরূপ নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির কারণ। কারণ, প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই জীব প্রাপ্তি বা পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়। প্রয়োজন-পদার্থের অন্যান্য কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ২৪।

সূত্র। লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য (অবিরোধ) হয়, তাহা দৃষ্টান্ত।

ভাষ্য। লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ, নৈসর্গিকং বৈনয়িকং বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ। তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাস্তর্কেণ প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতুমর্হন্তীতি। যথা যমর্থং লৌকিকা বুধ্যন্তে তথা পরীক্ষকা অপি, সোঽর্থো দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্ধব্যা ভবন্তীতি। দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষাঃ স্থাপনীয়া ভবন্তীতি। অবয়বেষু চোদাহরণায় কল্পত ইতি।

অনুবাদ। লোক-সমানতাকে অনতিক্রান্ত (অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণ লোকের তুল্যতাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এমন ব্যক্তিগণ) 'লৌকিক'। বিশদার্থ এই যে, (যাহারা) স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলন-সম্ভূত বুদ্ধিপ্রকর্ষকে অপ্রাপ্ত। তদ্বিপরীতগণ অর্থাৎ স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক বুদ্ধিপ্রকর্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক। (যেহেতু, তাঁহারা) তর্কের দ্বারা এবং প্রমাণ-সমূহের দ্বারা পদার্থকে পরীক্ষা করিতে পারেন। (লৌকিক এবং পরীক্ষকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া এখন দৃষ্টান্তের সূত্রোক্ত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন) যে পদার্থকে লৌকিকগণ যে প্রকার বুঝেন, পরীক্ষকগণও সেইরূপ বুঝেন, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত। (দৃষ্টান্ত লক্ষণের প্রয়োজন বর্ণন করিতেছেন) দৃষ্টান্ত-বিরোধের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সাধ্যশূন্যতা প্রভৃতি দোষের দ্বারা প্রতিপক্ষসমূহ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-সাধনসমূহ খণ্ডনীয় হয় (খণ্ডন করা যায়) এবং দৃষ্টান্ত-সমাধির দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের অসত্য-দোষারোপের প্রতিষেধের দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপনীয় হয় (স্থাপন করা যায়) এবং অবয়ব-সমূহের মধ্যে (প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে) উদাহরণের নিমিত্ত অর্থাৎ উদাহরণ নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণের নিমিত্ত (দৃষ্টান্ত পদার্থ) সমর্থ হয়[১]।

১। ভাষ্যে "উদাহরণায় কল্পতে" এই স্থলে সামর্থ্যবাচী "কৃপ" ধাতুর প্রয়োগবশতঃ চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথম সূত্র-ভাষ্যেও "তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্কঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তর্ক তত্ত্ব-

টিপ্পনী। যিনি বুঝেন, তিনি লৌকিক। যিনি বুঝান, তিনি পরীক্ষক। যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক প্রকৃতার্থে একমত, তাহাই দৃষ্টান্ত হয়। কোন পক্ষের ঐ পদার্থে প্রকৃতার্থের প্রতিকূল বিবাদ থাকিলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"যথা যমর্থং ইত্যাদি"। বস্তুতঃ যাহা লৌকিকবেদ্যই নহে, কেবল পরীক্ষকগণ-বেদ্য, এমন পদার্থও দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। এ সব কথা এবং তদনুসারে সূত্রের ব্যাখ্যা প্রথম সূত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, "লৌকিক-পরীক্ষকাণাং" এই কথার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীই সূত্রকারের অভিপ্রেত। বাদী ও প্রতিবাদীর যে পদার্থে বুদ্ধিসাম্য হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত। বিচারের বহুত্বাভিপ্রায়েই সূত্রে ঐ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। আর সূত্রোক্ত "অর্থ" শব্দের দ্বারা "উদাহরণবাক্য" প্রতিপাদ্য পদার্থ-বিশেষই অভিপ্রেত। তদ্ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টান্ত নহে। উদাহরণ-সূত্রের অর্থ-পর্য্যালোচনার দ্বারা এই বিশেষার্থ বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার তাঁহার "ভামতী" গ্রন্থে (ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভণাধিকরণে) উপনিষদুক্ত মৃত্তিকার দৃষ্টান্ততা সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, "লৌকিকপরীক্ষকাণাং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত, ইহাই মহর্ষি গোতমের বিবক্ষিত। দৃষ্টান্তে লোকসিদ্ধত্বও থাকা চাই, ইহা তাঁহার বিবক্ষিত নহে। অন্যথা তাঁহাদিগের পরমাণু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু প্রভৃতি লোকসিদ্ধ নহে। পরমাণু প্রভৃতি লোকসিদ্ধ না হইয়াও তাঁহাদিগের মতে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তের লক্ষণ ব্যতীত তাহার জ্ঞান অসম্ভব। দৃষ্টান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজন, ভাষ্যকার পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছেন। দৃষ্টান্ত না থাকিলে বা না জানিলে জগতে অনেক তত্ত্বই কেহ সকলকে বুঝাইতে পারিতেন না। যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম না হইত, শুক্তিতে রজত-ভ্রম না হইত, স্বপ্নে নানাবিধ অদ্ভুত ভ্রম না হইত, ঐন্দ্রজালিকের মায়াকৃত অদ্ভুত মিথ্যা-সৃষ্টি কেহ না দেখিত, তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্করও তাঁহার মায়াবাদকে লৌকিকের মনে,—বিরুদ্ধ-সংস্কারীর মনে উপস্থিত করিতে পারিতেন না। কেবল উপনিষদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে খিন্ন হইতে হইত। আবার উপনিষৎও যদি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইত্যন্ত বাক্যে মৃত্তিকাকে সত্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি উপাদান-কারণ ব্রহ্মের সত্যতা এবং তাহার কার্য্য জগতের মিথ্যাত্বসিদ্ধান্তই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রতিপক্ষের নিকটে সহজে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না। ফল কথা, দৃষ্টান্ত ব্যতীত প্রতিপক্ষের নিকটে যুক্তির দ্বারা কিছু প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে। স্বপক্ষ-সমর্থন ও পরপক্ষ-খণ্ডনে

জ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়, ইহাই সেখানে ঐ কথার অর্থ। এখানেও দৃষ্টান্ত পদার্থ উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণের জন্য আবশ্যক বলিয়া উহাকে উদাহরণ-বাক্যের নিমিত্ত সমর্থ বলা যাইতে পারে। মেঘদূতের—

"কল্পিষ্যন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ"।—পূর্ব্বমেঘ, ৫৩।

এই শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—"কৃপেঃ পর্য্যাপ্তিবচনস্য অলমর্থত্বাৎ তদ্‌যোগে নমঃ স্বস্তীত্যাদিনা চতুর্থী, অলমিতি পর্য্যাপ্ত্যর্থগ্রহণমিতি ভাষ্যকারঃ।"

দৃষ্টান্ত একটি প্রধান উপকরণ। মনে রাখিতে হইবে, দৃষ্টান্ত কখনই সর্ব্বাংশে সমান হয় না। কোথায়, কোন্ অংশে, কি ভাবে দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হয়। অন্যান্য কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ২৫।

ভাষ্য। অথ সিদ্ধান্তঃ, ইদমিত্থম্ভূতঞ্চেত্যভ্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং সিদ্ধং, সিদ্ধস্য সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ, সংস্থিতিরিত্থম্ভাবব্যবস্থা, ধর্ম্মনিয়মঃ। স খল্বয়ম্।

সূত্র। তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। অনন্তর (দৃষ্টান্ত-নিরূপণের পরে) সিদ্ধান্ত (নিরূপণীয়)। "ইহা" এবং "এই প্রকার" এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ পদার্থসমূহ "সিদ্ধ"। সিদ্ধের সংস্থিতি 'সিদ্ধান্ত'। "সংস্থিতি" বলিতে ইত্থম্ভাবের ব্যবস্থা কি না—ধর্ম্মনিয়ম। (অর্থাৎ এই পদার্থ এই ধর্ম্মবিশিষ্ট, অন্যধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, এইরূপ প্রমাণসিদ্ধ নিয়ম)। সেই-ই এই।

(সূত্রানুবাদ) "তন্ত্রাধিকরণে"র অর্থাৎ প্রমাণাশ্রিত বা প্রমাণবোধিত পদার্থের "অভ্যুপগমসংস্থিতি" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইত্থম্ভাবের ব্যবস্থা (পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মনিয়ম) "সিদ্ধান্ত"।

টিপ্পনী। দৃষ্টান্তের পরে সিদ্ধান্তই ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া নিরূপণীয়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্র-পাঠের পূর্ব্বেই সূত্র-প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত সামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া "স খল্বয়ং" এই কথার দ্বারা সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ফল কথা, "অথ সিদ্ধান্তঃ" ইত্যাদি ভাষ্য এই সূত্রেরই ভাষ্য। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐ ভাষ্য দেখিয়া নবীনগণের এখানে বিলুপ্ত সূত্রান্তরের অনুমান অমূলক। ভাষ্যকার "স খল্বয়ং" এই কথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিদ্ধান্ত যাহা ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই এই সূত্র-প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ মহর্ষি-সূত্রেরও ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত সূত্রের যোজনা করিতে হইবে। পদার্থমাত্রেরই সামান্য ধর্ম্ম এবং বিশেষ ধর্ম্ম আছে। "ইদং" বলিয়া সামান্যতঃ এবং "ইত্থম্ভূতং" বলিয়া বিশেষতঃ পদার্থনির্ণয় হয়। ঐ সামান্য ধর্ম্ম এবং বিশেষ ধর্ম্মরূপে স্বীক্রিয়মাণ পদার্থকে "সিদ্ধ" বলে। ঐ সিদ্ধের অন্তকে সিদ্ধান্ত বলে। "অন্ত" বলিতে সমাপ্তি। সামান্যতঃ স্বীকৃত পদার্থের প্রমাণের দ্বারা বিশেষতঃ নিশ্চয় হইলেই উহার স্বীকারের সমাপ্তি হয়। উহারই নাম "সংস্থিতি"। এই পদার্থ এই প্রকারই হইবে, অন্য প্রকার হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা বা নিয়মই "সংস্থিতি"। তাই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ইত্থম্ভাবব্যবস্থা"। উহারই বিবরণ করিয়াছেন—"ধর্ম্মনিয়মঃ"। এই সূত্রটি অথবা ইহার পরবর্ত্তী

সূত্রটি মহর্ষি গোতমের উক্ত নহে। কারণ, এখানে দুইটি সূত্র নিষ্প্রয়োজন এবং অর্থ-সঙ্গতিও হয় না—এই পূর্ব্বপক্ষাবলম্বন করিয়া উদ্যোতকর সমাধান করিয়াছেন যে, দুইটিই ঋষিসূত্র। প্রথমটি—সিদ্ধান্তের সামান্যলক্ষণসূত্র। দ্বিতীয়টি—সিদ্ধান্তের বিভাগ-সূত্র। সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়ই আবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকারও এই সূত্রটিকে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণসূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে[১], সূত্রে "তন্ত্র" শব্দের অর্থ এখানে প্রমাণ। "তন্ত্র", কি না প্রমাণ যাহার "অধিকরণ" অর্থাৎ আশ্রয়, অর্থাৎ যে পদার্থ কোন মতে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত, তাহাই "তন্ত্রাধিকরণ"। বিভিন্ন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির সমস্তই বস্তুতঃ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, এ জন্য যিনি যে পদার্থ প্রামাণিক বলিয়া মানেন, তাঁহার পক্ষে সেইটিই "তন্ত্রাধিকরণ" বা প্রামাণিক পদার্থ। বাদী ও প্রতিবাদীর মতানুসারেই এখানে প্রামাণিক পদার্থের কথা বলা হইয়াছে। ভাষ্যে যাহাকে "সংস্থিতি" বলা হইয়াছে, সূত্রে তাহাকেই "অভ্যুপগমসংস্থিতি" বলা হইয়াছে। মূলকথা, এইটি সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণসূত্র। এই সিদ্ধান্তকে মহর্ষি গোতম চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যে পদার্থ কোন শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধ নহে এবং অন্ততঃ কোন এক শাস্ত্রে কথিত, তাহার নাম (১) "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত"। যে পদার্থ সকল শাস্ত্রের সম্মত নহে, কোন শাস্ত্রকারবিশেষেরই সম্মত, তাহার নাম (২) "প্রতি-তন্ত্রসিদ্ধান্ত"। যে পদার্থটি প্রমাণসিদ্ধ করিতে হইলে তাহার আনুষঙ্গিক অন্য পদার্থেরও সিদ্ধি আবশ্যক হয়, সেখানে সেই প্রকৃত পদার্থটিই আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্তের অধিকরণ বা আশ্রয় বলিয়া সেইরূপে (৩) "অধিকরণসিদ্ধান্ত"। যেমন ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইলে সেখানে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পদার্থও সিদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং সেখানে ঐ সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট জগৎকর্ত্তাই "অধিকরণসিদ্ধান্ত"। ইহা ভাষ্যকারের মত। পরবর্ত্তী নব্য-দিগের মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে আনুষঙ্গিক পদার্থগুলিই "অধিকরণসিদ্ধান্ত"। বিচারস্থলে অন্যের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই যদি তাহার বিশেষ ধর্ম্ম লইয়া বিচার করা হয়, তাহা হইলে সেখানে ঐ ভাবে স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তের নাম (৪) "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"। ইহাও ভাষ্যকারের মত। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকদিগের মতে যাহা ঋষি স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু ঋষির অন্য কথার দ্বারা তাহা ঋষির মত বলিয়াই বুঝা যায়, তাহার নাম "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"। পূর্ব্বোক্ত প্রকার সিদ্ধান্তের ভেদ ও লক্ষণ এবং উদাহরণাদি ইহার পরেই পাওয়া যাইবে। মহর্ষি গোতমোক্ত চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তের জ্ঞানই বিচারে আবশ্যক। তাই অবয়বের পূর্ব্বেই মহর্ষি বিচারাঙ্গ সিদ্ধান্ত পদার্থের সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন। ২৬।

ভাষ্য। তন্ত্রার্থ-সংস্থিতিঃ তন্ত্রসংস্থিতিঃ। তন্ত্রমিতরেতরাভি-সম্বদ্ধস্যার্থসমূহস্যোপদেশঃ শাস্ত্রম্। অধিকরণানুষঙ্গার্থা সংস্থিতিরধি-

১। তন্ত্র্যন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রমেয়াণ্যনেনেতি তন্ত্রং প্রমাণং তদেব অধিকরণমাশ্রয়ো জ্ঞাপকত্বেন যেষামর্থানাং।—ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা।

করণসংস্থিতিঃ। অভ্যুপগমসংস্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ। তদ্বিশেষ-পরীক্ষণায়াভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ। তন্ত্রভেদাত্তু খলু—

সূত্র। স চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধি-করণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। তত্রৈতাশ্চতস্রঃ সংস্থিতয়োঽর্থান্তরভূতাঃ।

অনুবাদ। "তন্ত্রার্থসংস্থিতি" (অর্থাৎ সাক্ষাৎশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত) "তন্ত্রসংস্থিতি"। (১) সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত (২) এবং (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত)।

তন্ত্র বলিতে (এখানে) পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ-সমূহের উপদেশ শাস্ত্র। অধিকরণের অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদার্থের সংস্থিতি "অধিকরণসংস্থিতি" ((৩) অধিকরণসিদ্ধান্ত)। অনবধারিত পদার্থের স্বীকার অর্থাৎ বিচারস্থলে অসিদ্ধ পদার্থকেও মানিয়া লওয়া "অভ্যুপগমসংস্থিতি" ((৪) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত)। তাহার অর্থাৎ বিচার্য্য পদার্থের বিশেষ পরীক্ষার জন্য অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত হয়। তন্ত্রভেদ প্রযুক্তই অর্থাৎ শাস্ত্রের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই (সূত্রানুবাদ) তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ। কারণ, "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত," "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত," "অধিকরণসিদ্ধান্ত" এবং "অভ্যুপগমসিদ্ধান্তে"র অর্থান্তরভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ বা বৈলক্ষণ্য আছে। (ভাষ্যানুবাদ) তন্মধ্যে এই চারিটি সিদ্ধান্ত অর্থান্তরভূত অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ। (অর্থাৎ সিদ্ধান্তব্যক্তি অসংখ্য হইলেও তাহাকে এই চারি প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে। কারণ, এই চারিটি পরস্পর বিলক্ষণ এবং ইহার মধ্যেই সকল সিদ্ধান্ত আছে)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় সিদ্ধান্তের এই বিভাগ-সূত্রটিরও পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়া পরে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। "তন্ত্রার্থসংস্থিতিঃ" ইত্যাদি ভাষ্য পূর্ব্ব-সূত্রের ভাষ্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উহা এই সূত্রেরই ভাষ্য। সূত্রে এবং ভাষ্যে "সংস্থিতি" শব্দ সিদ্ধান্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সূত্রে দ্বন্দ্বসমাসের পরবর্ত্তী "সংস্থিতি" শব্দের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধবশতঃ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সংস্থিতি বা সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। ভাষ্যকার চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিতে "তন্ত্রসংস্থিতি", "অধিকরণসংস্থিতি" এবং "অভ্যুপগমসংস্থিতি" এই তিনটিকেই বলিয়াছেন, তবে সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ হয় কিরূপে? এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—"তন্ত্রভেদাত্তু খলু"। ভাষ্যকারের ঐ কথার সহিত "স চতুর্ব্বিধঃ" এই সূত্রাংশের যোজনা বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত "তন্ত্রসংস্থিতি" শব্দের দ্বারাই "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" ও "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত" এই দুইটি সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। কারণ, তন্ত্রের ভেদ আছে। প্রতিতন্ত্র-

গুলিও "তন্ত্র"। সুতরাং "তন্ত্রসংস্থিতি" বলিলে "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তে"র ন্যায় "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত"ও বলা হইল। ফলতঃ ভাষ্যকার ঐরূপে চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধই বলা হয় কেন? দ্বিবিধ বা ত্রিবিধও বলা যাইতে পারে? সূত্রকার এতদুত্তরে সিদ্ধান্তের চতুর্ব্বিধত্বের হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রপাঠের পরে "তত্রৈতাশ্চতস্রঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সূত্রোক্ত ঐ হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ কথিত চারিটি সিদ্ধান্তের পরস্পর ভেদ থাকায় সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ এবং সকল সিদ্ধান্তই এই চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই চারিটির বেশীও নহে, কমও নহে, এই নিয়মের জন্যই সূত্রকার সিদ্ধান্তের চতুর্ব্বিধ বিভাগ করিয়াছেন। "স চতুর্ব্বিধঃ" এই অংশ ভাষ্য বলিয়াই অনেকে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা সূত্রাংশ। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" গ্রন্থে ঐ অংশকে সূত্রমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যের শেষে, ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐ অংশকে মহর্ষিবচন বলিয়া বুঝা যায়।

ভাষ্য। তাসাম্।

অনুবাদ। তাহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ "সংস্থিতি"র (সিদ্ধান্তের) মধ্যে—

সূত্র। সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥২৮॥

অনুবাদ। সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, শাস্ত্রে কথিত পদার্থ "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত।"

ভাষ্য। যথা ঘ্রাণাদীনীন্দ্রিয়াণি, গন্ধাদয় ইন্দ্রিয়ার্থাঃ, পৃথিব্যাদীনি ভূতানি, প্রমাণৈরর্থস্য গ্রহণমিতি।

অনুবাদ। যেমন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত, প্রমাণের দ্বারা পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়, ইত্যাদি (সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার "তাসাং" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংস্থিতির অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণ-চতুষ্টয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে পদার্থ সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, তাহা "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত"। ভাষ্যকার ঘ্রাণাদির ইন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতিকে ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ঘ্রাণাদির ভৌতিকত্ব বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। ভাষ্যের শেষোক্ত "ইতি" শব্দটি আদি অর্থে প্রযুক্তও বলা যায়। "ইতি" শব্দের "আদি" অর্থ কোষে কথিত আছে[১]। "সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ" এই কথা না বলিয়া "সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত" এই কথা বলিলে গোতমোক্ত "ছল"ও "জাতির" অসদুত্তরত্ব সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, উহা সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত নহে; কেবল ন্যায়শাস্ত্রেই কথিত। তবে উহা সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, এই জন্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইতেছে। কেবল সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মহর্ষি সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত

১। ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকর্ষাদিসমাপ্তিষু।—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ, ২০।

বলেন না, কোন শাস্ত্রেও কথিত হওয়া চাই। তাই আবার বলিয়াছেন—"তন্ত্রেঽধিকৃতঃ"। উদ্যোতকর, বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। উহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে, এ জন্য বলিয়াছেন—"তন্ত্রেঽধিকৃতঃ"। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে ন্যায়তন্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, এ জন্য উহা সর্ব্বতন্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেও "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" হইবে না। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের লক্ষণ অন্যবিধ। তাঁহার মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত" নহে। এ সব কথা পরে ব্যক্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত "দৃষ্টান্ত" এবং এই "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" একই পদার্থ, ইহার পৃথক্ উল্লেখ কেন ? এতদুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন— "দৃষ্টান্ত" কেবল বাদী ও প্রতিবাদীরই নিশ্চিত থাকে। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত তদ্রূপ নহে। উহা সকলেরই নিশ্চিত। দৃষ্টান্ত অনুমান ও আগমের আশ্রয়, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত তদ্রূপ নহে; সুতরাং দুইটির ভেদ আছে। উহারা এক পদার্থ নহে।

সূত্র। সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥২৯॥

অনুবাদ। একশাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বশাস্ত্রসিদ্ধ, (কিন্তু) পরতন্ত্রে (অন্য শাস্ত্রে) অসিদ্ধ (পদার্থ) "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত"।

ভাষ্য। যথা নাসত আত্মলাভঃ, ন সত আত্মহানং, নিরতিশয়াশ্চেতনাঃ, দেহেন্দ্রিয়মনঃসু বিষয়েষু তত্তৎকারণে চ বিশেষ ইতি সাংখ্যানাম্। পুরুষকর্ম্মাদিনিমিত্তো ভূতসর্গঃ, কর্ম্মহেতবো দোষাঃ প্রবৃত্তিশ্চ, স্বগুণ-বিশিষ্টাশ্চেতনাঃ, অসদুৎপদ্যতে উৎপন্নং নিরুধ্যত ইতি যোগানাম্।

অনুবাদ। যেমন অসতের উৎপত্তি নাই, সতের অত্যন্ত বিনাশ নাই, (তিরোভাবমাত্র আছে)। চেতনগণ অর্থাৎ আত্মাগুলি নিরতিশয় (অপরিণামী নির্গুণ)। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে, বিষয়-সমূহে এবং তত্তৎকারণে অর্থাৎ "মহৎ", "অহঙ্কার" এবং "পঞ্চতন্মাত্র"রূপ সূক্ষ্ম ভূতে "বিশেষ" (পরিণামবিশেষ) আছে, ইহা সাংখ্যদিগেরই (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত)। ভূতসৃষ্টি (দ্ব্যণুকাদিব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি) পুরুষের কর্ম্মাদিজন্য (জীবের অদৃষ্ট এবং পরমাণুদ্বয় সংযোগাদি কারণজন্য)। দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) এবং প্রবৃত্তি, কর্ম্মের (অদৃষ্টের) হেতু। আত্মাগুলি স্বগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাদি-নিজগুণ-বিশিষ্ট। অসৎই অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না, তাহাই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন বস্তু অর্থাৎ জন্য সৎপদার্থ নিরুদ্ধ হয়

(অত্যন্ত বিনষ্ট হয়), ইহা যোগদিগেরই অর্থাৎ সাংখ্যের পরিণামবাদের বিপরীতবাদী "আরম্ভবাদী"দিগেরই (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত)।

টিপ্পনী। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন,—সূত্রে "সমান" শব্দ একার্থে প্রযুক্ত। যেমন, নৈয়ায়িকদিগের ন্যায়শাস্ত্র সমানতন্ত্র, সাংখ্যাদি-শাস্ত্র পরতন্ত্র ইত্যাদি। ফলতঃ যাহার যেটি নিজ-তন্ত্র, তাহাই এখানে "সমান-তন্ত্র" শব্দের প্রতিপাদ্য এবং যে পদার্থ যাহার সমান তন্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু পরতন্ত্রে অসিদ্ধ, সেই পদার্থ তাহার "প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত"। যেমন মীমাংসকদিগের শব্দ-নিত্যতা প্রভৃতি। কোন সিদ্ধান্তে একাধিক সম্প্রদায়ের একমত থাকিলে তাহাও তাহাদিগের সকলেরই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইবে। যেমন ভাষ্যোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তগুলি পাতঞ্জলেরও সিদ্ধান্ত। পাতঞ্জলও সাংখ্য, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যে "সাংখ্যানাং" এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে। উহাতে পাতঞ্জলদিগকেও বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে সাংখ্যের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'যোগানাম্'। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—"ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণীতি যোগানামভৌতিকানীতি সাংখ্যানাম্"। বার্ত্তিক ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"যোগানামেব সাংখ্যানামেবেতি নিয়মঃ"। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার "যোগানাং" এই কথার দ্বারা কাহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা কিছু বলেন নাই। "যোগানাং" এই কথা বলিলে যোগাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কথাই সকলে বুঝিয়া থাকেন। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই ব্রহ্মসূত্রে যখন যোগ-শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থেই "যোগ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তখন ঐ "যোগ" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে "যোগানাং" এই কথার দ্বারা যোগাচার্য্যসম্প্রদায়কে অবশ্য বুঝা যাইতে পারে এবং ঐরূপ প্রয়োগে তাহাই সকলে বুঝিয়া থাকেন। যোগাচার্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন কোন সম্প্রদায় যদি ন্যায় ও বৈশেষিকের "আরম্ভবাদ" অবলম্বন করিয়া যোগবর্ণন করিয়া থাকেন এবং ভাষ্যকারের সময়ে তাঁহাদিগের মতের প্রসিদ্ধি থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যকার "যোগানাং" এই কথার দ্বারা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন। কিন্তু কেবল "যোগানাং" এই কথা বলিলে সামান্যতঃ যোগাচার্য্য সম্প্রদায়মাত্রই বুঝা যায়। পরন্তু কোন যোগাচার্য্য ন্যায়বৈশেষি-কের আরম্ভবাদ গ্রহণ করিয়া যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায় না। যোগাচার্য্য ভগবান্ বার্ষগণ্য মায়াবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কথায় পাওয়া যায়—(পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্য ভামতী দ্রষ্টব্য)। ফলকথা; ভাষ্যকার যে সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া "যোগানাং" এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, উহা যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপে কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না। উহা বৈশেষিক ও ন্যায়ের সিদ্ধান্তরূপেই সুপ্রসিদ্ধ আছে। তবে ভাষ্যকার কেন ঐরূপ বলিয়াছেন? ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন।

বহু অনুসন্ধানের ফলে কোন দ্রাবিড় মহামনীষীর মুখে শুনিতে পাই যে, এখানে "যোগানাং" এই কথার ব্যাখ্যা "বৈশেষিকানাম্"। মহর্ষি কণাদ যোগবিভূতির দ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করায় তাঁহার ঐ শাস্ত্র তৎকালে যোগশাস্ত্র নামেও অভিহিত হইত। "যোগী" অর্থাৎ যোগবিভূতিসম্পন্ন মহর্ষি কণাদ কর্ত্তৃক প্রোক্ত এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপে

"যোগ" শব্দের অর্থ বৈশেষিক শাস্ত্র। তাহার পরে ঐ "যোগ" কি না—বৈশেষিক শাস্ত্রে যাঁহারা বিজ্ঞ অর্থাৎ ঐ শাস্ত্রমতের সম্প্রদায়, এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা "যোগ" শব্দের অর্থ এখানে বৈশেষিক সম্প্রদায় বুঝা যাইতে পারে[১]। বস্তুতঃ বৈশেষিকের প্রধান আচার্য্য পরমপ্রাচীন প্রশস্তপাদও তাঁহার "পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে"র শেষে কণাদের যোগবিভূতির পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন[২]। অন্যান্য টীকাকারগণও কণাদের যোগবিভূতির কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং বায়ুপুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও কণাদের যোগবিভূতি বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, কেবল বৈশেষিক সম্প্রদায়কে বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যুৎপত্তি আশ্রয় করিয়া "যোগ" শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ অন্য কোন স্থানে ঐরূপ প্রয়োগ করেনও নাই। উদ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে" বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে "বৈশেষিকানাং" এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনিও "যোগানাং" এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই? আর যদি গত্যন্তর না থাকায় এখানে "যোগ" শব্দের ঐরূপ একটা অর্থ ব্যাখ্যা করিতেই হয় এবং করা যায়, তাহা হইলে এখানে "যোগানাং" এই কথার ব্যাখ্যা "আরম্ভবাদিনাং" ইহাও বলিতে পারি। কারণ, "যোগ" শব্দের সংযোগ অর্থ সুপ্রসিদ্ধ আছে। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" যোগ ব্যাখ্যায় মহামনীষী মাধবাচার্য্যও "যোগ" শব্দের সংযোগরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ, ইহা বলিয়াছেন। এখন তাৎপর্য্যানুসারে যদি "যোগিন্" শব্দের দ্বারা কণাদ মহর্ষিকেই বুঝিয়া তাঁহার প্রোক্ত শাস্ত্রকে "যোগ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা হইলে তাৎপর্য্যানুসারে "যোগ" শব্দের দ্বারা ন্যায় ও বৈশেষিকের "আরম্ভবাদে"র মূল যে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ এবং ঐরূপ অন্যান্য সংযোগ, তাহাও বুঝিতে পারি। তাহা হইলে ঐরূপে "যোগ" বা সংযোগবিশেষবাদীকেও "যোগী" বলিতে পারি। যেমন দ্বৈতবাদীকে "দ্বৈতী" এবং অদ্বৈতবাদীকে "অদ্বৈতী" বলা হয়, তদ্রূপ পরমাণুদ্বয়ের "যোগ"বাদীকে "যোগী" বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে "যোগিন্" শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদীদিগকেও বুঝা যাইতে পারে। "যোগী" অর্থাৎ আরম্ভবাদীর প্রোক্ত শাস্ত্রকে "যোগ" বলা যাইতে পারে। সেই "যোগ"শাস্ত্রকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকেও "যোগ" বলা যাইতে পারে[৩]। ভাষ্যকার যে তাহাই বলেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে অন্যরূপ তাৎপর্য্যও কল্পনা করিবার অধিকার আছে। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি যাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত, তাঁহাদিগকে "আরম্ভবাদী" বলে। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগই আরম্ভবাদীদিগের স্বসিদ্ধান্তের মূল। উহা খণ্ডিত হইলেই "আরম্ভবাদ"

১। তদধীতে তদ্বেদ।—পাণিনিসূত্র, ৪।২।৫৯। প্রোক্তাল্লুক্—পাণিনিসূত্র, ৪।২।৬৪। প্রোক্তার্থকপ্রত্যয়াৎ পরস্যাধ্যেতৃবেদিতৃপ্রত্যয়স্য লুক্ স্যাৎ—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্।
চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ।—প্রশস্তপাদবাক্য।

৩। যোগিনা আরম্ভবাদিনা প্রোক্তং শাস্ত্রং যোগং,—তদ্বিদন্তি যে তে যোগাঃ আরম্ভবাদিনঃ।

খণ্ডিত হয়। এ জন্য আরম্ভবাদ খণ্ডনে "ব্রহ্মসূত্র" ও "শারীরক ভাষ্যে" ঐ সংযোগই প্রধানতঃ এবং বিশেষতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। পরমাণু বা অন্য অবয়বের সংযোগবিশেষজন্য অবয়বীর উৎপত্তি হয়, ইহা "আরম্ভবাদী দিগেরই মত। অন্যবাদীরা উহা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং "আরম্ভবাদে"র মূল সংযোগকে ধরিয়া ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে "যোগানাং" এই কথার দ্বারা "আরম্ভবাদী" সম্প্রদায়কে প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাতে ঐরূপ প্রয়োগের সার্থকতাও হয়। কারণ, আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কে এক কথায় প্রকাশ করিবার জন্য ঐরূপ প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। ভাষ্যকার যখন "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তে"র উদাহরণ বলিতে "যোগানাং" এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন উহা যোগসম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। তাৎপর্য্যটীকাকারও "যোগানা"মেব এইরূপ কথার দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য ঐগুলি ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই ঐ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বলিয়াই বুঝা যায়, কিন্তু শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি যে কেবল বৈশেষিকের অথবা কেবল নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত নহে, উহা আরম্ভবাদী সকল সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, তদ্‌ভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বলিতে হইলে এখানে "বৈশেষিকাণামেব" অথবা "নৈয়ায়িকানামেব" এইরূপ কোন প্রয়োগের দ্বারা তাহা বলা হয় না। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে "যোগানামেব" এই কথার দ্বারা তাঁহার শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি "আরম্ভবাদী" মাত্রেরই "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত," ইহা প্রকাশ করিতে পারেন।

মূলকথা, যে অর্থেই হউক, ভাষ্যকার যে এখানে "যোগ" শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদী বৈশেষিক সম্প্রদায় অথবা ঐ মতাবলম্বী সকল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, ভাষ্যকারের শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি "আরম্ভবাদী" ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে। বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে "যোগ" শব্দের প্রয়োগ জৈন ন্যায়ের গ্রন্থেও পাইয়াছি[১]। জৈন ন্যায়ের গ্রন্থে কোন কোন স্থলে "যৌগ" শব্দেরও প্রয়োগ আছে[২]। আবার কোন স্থলে "যৌগ" শব্দের দ্বারা প্রমাণ-চতুষ্টয়বাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে[৩]। ইহার দ্বারা বুঝা

১। যোগস্ত সদকারণবন্নিত্যমিত্যাদিবৎ।

সদকারণবন্নিত্যমিতি যোগবচো যথা।—বিদ্যানন্দস্বামিকৃত "পত্রপরীক্ষা" (জৈন ন্যায়)।

"সদকারণবন্নিত্যং" এইটি বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম সূত্র। এইটিকে উল্লেখ করিয়া ইহাকে "যোগ"-বাক্য বলা হইয়াছে।

২। সৌগতসাংখ্যযৌগানাং তথাভূতপরিণাম-বিশেষাসিদ্ধেঃ।—(বিদ্যানন্দস্বামিকৃত পত্রপরীক্ষা)।

৩। সৌগত-সাংখ্যযৌগ-প্রাভাকর-জৈমিনীয়ানাং প্রত্যক্ষানুমানাগমোপমানার্থাপত্ত্যভাবৈরেকৈকাধিকৈর্ব্যাপ্তিবৎ।
—("পরীক্ষামুখ", ৬ সমুদ্দেশ, ৫৭ সূত্র)।

এই সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগুলির যথাক্রমে এক একটি অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে "যৌগ" পক্ষে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশেষিক যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বয়বাদী, তখন এই সূত্রে "যৌগ" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়বাদী নৈয়ায়িককেই গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"অথাদৌ নৈয়ায়িকানাং যৌগাপরাভিধানানাং"।

যায়, প্রাচীন কালে বৈশেষিক সম্প্রদায়কে "যোগ" বা "যৌগ" শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইত এবং কোন স্থলে "যৌগ" শব্দের দ্বারা কেবল গৌতম সম্প্রদায়কেও প্রকাশ করা হইত। কেন হইত, কিরূপ অর্থে ঐরূপ প্রয়োগ হইত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা না গেলেও ঐরূপ প্রয়োগ বিষয়ে সংশয় নাই। সুধীগণের চিন্তা করিবার জন্য জৈন ন্যায়ের গ্রন্থসংবাদও প্রদত্ত হইল। অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধান করিয়া তথ্য নির্ণয় করুন।

সূত্র। যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ-সিদ্ধান্তঃ ॥৩০॥

অনুবাদ। যে পদার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য প্রকরণের অর্থাৎ অন্য আনুষঙ্গিক পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহা (সেই পদার্থ) অধিকরণসিদ্ধান্ত।

ভাষ্য। যস্যার্থস্য সিদ্ধাবন্যেঽর্থা অনুষজ্যন্তে, ন তৈর্ব্বিনা সোঽর্থঃ সিধ্যতি তেঽর্থা যদধিষ্ঠানাঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ। যথেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা দর্শন-স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাদিতি। অত্রানুষঙ্গিণোঽর্থা ইন্দ্রিয়-নানাত্বম্; নিয়তবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি, স্ববিষয়-গ্রহণলিঙ্গানি, জ্ঞাতুর্জ্ঞান-সাধনানি, গন্ধাদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং গুণাধিকরণং, অনিয়তবিষয়াশ্চেতনা ইতি, পূর্ব্বার্থসিদ্ধাবেতেঽর্থাঃ সিধ্যন্তি ন তৈর্ব্বিনা সোঽর্থঃ সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। যে পদার্থের (সাধ্যের অথবা হেতুর) সিদ্ধিবিষয়ে অন্য পদার্থগুলি অনুষক্ত (সংবদ্ধ) হয়, বিশদার্থ এই যে—সেইগুলি অর্থাৎ সেই আনুষঙ্গিক পদার্থ-গুলি ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্ব্বোক্ত পদার্থ) সিদ্ধ হয় না,—আরও বিশদার্থ এই যে, সেই পদার্থগুলি (সেই আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি) 'যদধিষ্ঠান' অর্থাৎ যে পদার্থের আশ্রিত, তাহা অর্থাৎ সেই সাক্ষাৎ উল্লিখ্যমান আশ্রয়-পদার্থটি 'অধিকরণ সিদ্ধান্ত'। (উদাহরণ) যেমন দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুঃ ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এক পদার্থের প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন (ইহা মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন)।

ইহাতে অর্থাৎ চক্ষুঃ ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার একার্থ-প্রতিসন্ধান-সিদ্ধিবিষয়ে আনুষঙ্গিক পদার্থ ইন্দ্রিয়নানাত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব (এবং) ইন্দ্রিয়গুলি (বহি-রিন্দ্রিয়গুলি) নিয়তবিষয়,—স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণ (এবং) আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়বর্গের বিষয়নিয়ম এবং স্ব স্ব বিষয়গ্রহণলক্ষণত্ব এবং আত্মার

প্রত্যক্ষসাধনত্ব (এবং) দ্রব্য গন্ধাদি গুণ হইতে ভিন্ন (এবং) গুণের আধার, অর্থাৎ দ্রব্যের গন্ধাদিগুণভিন্নত্ব এবং গুণাশ্রয়ত্ব, (এবং) আত্মাগুলি অনিয়তবিষয় অর্থাৎ আত্মার গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়মের অভাব। (অর্থাৎ মহর্ষিকথিত পূর্ব্বোক্ত একার্থপ্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধিতে এইগুলি আনুষঙ্গিক পদার্থ)। পূর্ব্বার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অর্থাৎ মহর্ষির সাক্ষাৎ কথিত পূর্ব্বোক্ত একার্থপ্রতিসন্ধানের সিদ্ধিতে অন্তর্গত এই পদার্থগুলি (ইন্দ্রিয়বহুত্বাদি) সিদ্ধ হয়; (কারণ) সেইগুলি ব্যতীত অর্থাৎ ঐ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্ব্বোক্ত প্রতিসন্ধান) সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই বার অধিকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তচতুষ্টয়ের মধ্যে এইটিই দুর্ব্বোধ। সুতরাং ইহার ব্যাখ্যাও একরূপ হয় নাই। অনুবাদে তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—ভাষ্যে "যস্যার্থস্য সিদ্ধৌ" এই স্থলে বিষয়সপ্তমী, নিমিত্ত-সপ্তমী নহে। শেষে তাৎপর্য্যার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে পদার্থটি জানিতে হইলে তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি তাহার অন্তর্ভাবেই জানিতে হয়, সাক্ষাৎ উল্লিখ্যমান সেই পদার্থ তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলির আধার; কারণ, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ঐ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি সিদ্ধ হয়; সেই পদার্থ পক্ষই (সাধ্যই) হউক আর হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত হইবে। যেমন "জগৎ চেতনকর্ত্তৃকং উৎপত্তিমত্ত্বাৎ বস্ত্রবৎ" এইরূপে জগতের চেতনকর্ত্তৃকত্ব সাধন করিলে সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্ববিশিষ্ট-চেতনকর্ত্তৃকত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্যতীত জগতের চেতনকর্ত্তৃকত্ব সম্ভব হয় না। এ স্থলে চেতনকর্ত্তৃকত্বরূপ সাধ্যটি তাহার সিদ্ধির অন্তর্গত আনুষঙ্গিক সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পদার্থযুক্ত হইয়াই সিদ্ধ হয়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সহিত চেতনকর্ত্তৃকত্বই ঐ স্থলে অধিকরণসিদ্ধান্ত, এবং আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্বসাধনে মহর্ষি গোতম (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্রে) "আমি যাহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছিলাম,তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করিতেছি" এই প্রকার একার্থপ্রতিসন্ধানকে হেতু বলিয়াছেন। ঐ হেতুটি সিদ্ধ হইতে গেলে ভাষ্যোক্ত ইন্দ্রিয়-বহুত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পদার্থবর্গসহিত হইয়াই সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ ইন্দ্রিয়বহুত্বাদি ব্যতীত ঐরূপ একার্থপ্রতিসন্ধান সিদ্ধ হয় না (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে ঐ প্রতিসন্ধানরূপ হেতু ইন্দ্রিয়বহুত্বাদিসহিত হইয়াই সিদ্ধ হইয়া ঐরূপে "অধিকরণসিদ্ধান্ত" হইয়াছে। এই জন্যই উদ্যোতকর লিখিয়াছেন —"বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদনুষঙ্গী যো যঃ সোঽধিকরণ-সিদ্ধান্তঃ।" ইহাই বাচস্পতিমিশ্রের ব্যাখ্যা। উদয়নের "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থের দীধিতিতে রঘুনাথ শিরোমণি বার্ত্তিকের পাঠ ও তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার উল্লেখ করিয়া অন্যরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া রঘুনাথের পরবর্ত্তী বিশ্বনাথ ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না, সেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ নবীন রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে আনুষঙ্গিক পদার্থগুলিই

অধিকরণসিদ্ধান্ত। কারণ, তাহাই প্রকৃত পদার্থসিদ্ধির আশ্রয়। উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারাও সরলভাবে ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের কথার দ্বারা ইহা সরলভাবে বুঝা যায় না। তাঁহার মতে প্রস্তুত পদার্থটিই আনুষঙ্গিক পদার্থের আশ্রয় বলিয়া তাহাই "অধিকরণসিদ্ধান্ত"। সূত্রেও 'যৎ' শব্দের দ্বারা প্রস্তুতপদার্থই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ। কারণ, পরে 'অন্য' শব্দ আছে। এখন কথা এই যে, প্রস্তুত পদার্থই হউক আর আনুষঙ্গিক পদার্থই হউক, তাহা "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" বা "প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত" হইলে তাহাকে পৃথক্ "অধিকরণসিদ্ধান্ত" বলা নিষ্প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়নানাত্বাদি সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তই আছে; তাহাকে আবার "অধিকরণসিদ্ধান্ত" বলিবার প্রয়োজন কি? ইহা সকলকেই ভাবিতে হইবে। বাচস্পতির ব্যাখ্যায় এ ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহার মতে কেবল ইন্দ্রিয়নানাত্ব প্রভৃতি বা কেবল পূর্ব্বোক্ত সূত্রকারীয় প্রতিসন্ধানরূপ হেতুই "অধিকরণ-সিদ্ধান্ত" নহে। ইন্দ্রিয়নানাত্বাদি আনুষঙ্গিক পদার্থ সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রতিসন্ধানরূপ প্রস্তুত হেতুই "অধিকরণসিদ্ধান্ত"। তিনি সূত্রকার ও ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। "পূর্ব্বার্থসিদ্ধাবেতেঽর্থাঃ" এই ভাষ্যসন্দর্ভের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"পূর্ব্বোঽর্থো যঃ সাক্ষাদধিকৃতঃ তস্য সিদ্ধাবন্তর্গত ইতি ভাষ্যার্থঃ"। ফলতঃ বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যায় অধিকরণ-সিদ্ধান্তটি সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত ও প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ, ইন্দ্রিয়নানাত্ব প্রভৃতি অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রতিসন্ধান পৃথগ্‌ভাবে শাস্ত্রে কথিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রমাণসিদ্ধ ইন্দ্রিয়নানাত্বাদি সহিত প্রতিসন্ধান কোন শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। এই জন্য ঐরূপ সিদ্ধান্তকে "অধিকরণসিদ্ধান্ত" নামে তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। মনে হয়, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত লক্ষণসূত্রে মহর্ষি এই জন্যই "তন্ত্রেঽধিকৃতঃ" এই কথাটি বলিয়াছেন। কেবল সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ পদার্থকেই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিলে সর্ব্বসম্মত অধিকরণসিদ্ধান্তও সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ ব্যাখ্যাত অধিকরণসিদ্ধান্তটি সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে বিশিষ্ট। সুতরাং মহর্ষি তাহাকে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্ করিয়াই বলিয়াছেন।

সূত্র। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণ-মভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥৩১॥

অনুবাদ। অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা অনবধারিত পদার্থের স্বীকার করিয়া (যে স্থলে) তাহার বিশেষ পরীক্ষা হয়, (সেই স্থলে সেই স্বীকৃত পদার্থটি) "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"।

ভাষ্য। যত্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে—অস্তু দ্রব্যং শব্দঃ, স তু নিত্যোঽথানিত্য ইতি,—দ্রব্যস্য সতো নিত্যতাঽনিত্যতা বা তদ্বিশেষঃ পরীক্ষ্যতে সোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ, স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিখ্যাপয়িষয়া পরবুদ্ধ্যবজ্ঞানাচ্চ প্রবর্ত্তত ইতি।

অনুবাদ। যে স্থলে অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা অনবধারিত কোনও পদার্থ-সামান্য স্বীকৃত হয়, (উদাহরণের উল্লেখের সহিত সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন) হউক শব্দ দ্রব্য, কিন্তু তাহা নিত্য অথবা অনিত্য ? (এইরূপে) দ্রব্য হইলে তাহার অর্থাৎ দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত শব্দের নিত্যতা অথবা অনিত্যতারূপ "তদ্বিশেষ" (শব্দগত বিশেষ ধর্ম্ম) পরীক্ষিত হয়, তাহা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত, (ইহা) নিজবুদ্ধির প্রকর্ষ-খ্যাপনেচ্ছা-প্রযুক্ত এবং পরবুদ্ধির অবজ্ঞা প্রযুক্ত প্রবৃত্ত হয়।

টিপ্পনী। "অভ্যুপগম্যতে পরীক্ষাং বিনাপি স্বীক্রিয়তে" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বিনা বিচারে স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তই "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"। ভাষ্যকার নিজের মতানুসারে উদাহরণ-প্রদর্শনের সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত উদাহরণের মূল কথা এই যে, মীমাংসক সম্প্রদায়-বিশেষের মতে শব্দ দ্রব্যপদার্থ এবং নিত্য। নৈয়ায়িক মতে শব্দ গুণ-পদার্থ এবং অনিত্য। মীমাংসক শব্দের দ্রব্যত্বসাধন করিতেছেন—নৈয়ায়িক তাহার খণ্ডন করিতে গিয়া মধ্যে বলিলেন, —"আচ্ছা, হউক্ শব্দ দ্রব্যপদার্থ, কিন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, তাহা বিচার কর।" এইরূপে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়া তাহার বিশেষধর্ম্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের পরীক্ষা করিয়া নিত্যত্ব খণ্ডন করিলেন। প্রকারান্তরে মীমাংসক পরাস্ত হইলেন। ঐ স্থলে শব্দের দ্রব্যত্ব মীমাংসকের "প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত" হইলেও তৎকালে নৈয়ায়িকের পক্ষে উহা "অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত"। নৈয়ায়িক দেখিলেন, মীমাংসক শব্দকে দ্রব্য ও নিত্য পদার্থ বলিতেছেন; তাঁহার সম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়াও শব্দের নিত্যত্ব খণ্ডন করিতে পারি। শব্দনিত্যতাই মীমাংসকের সুদৃঢ় প্রধান সিদ্ধান্ত, সুতরাং স্ববুদ্ধির প্রকর্ষখ্যাপন ও প্রতিবাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞার জন্য তাহাই করিব। তাই বিনা বিচারেই মীমাংসকসম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইলেন। বিচারস্থলে তীব্র প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী নিজ বুদ্ধির প্রকর্ষখ্যাপনাদির ইচ্ছায় অনেক স্থলেই এইরূপ করিয়া থাকেন এবং এই ভাবেই "অভ্যুপগমবাদ," "প্রৌঢ়িবাদ" প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

ন্যায়-বার্ত্তিককার প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সূত্রে "অপরীক্ষিত" বলিতে যাহা ঋষিসূত্রে সাক্ষাৎ উপনিবদ্ধ হয় নাই, অথচ তাহার বিশেষ ধর্ম্মের এমন ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা বুঝা যায়, উহা ঋষির স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। যেমন মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ন্যায়সূত্রে সাক্ষাৎ উপবর্ণিত না হইলেও ন্যায়সূত্রে মনের যে বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা আছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ন্যায়সূত্রকার মহর্ষির স্বীকৃত। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষি গোতমের "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত"। ফল কথা, যেটি সূত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, কিন্তু তাহার বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা তাহাকে সূত্রকারের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায়, উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে তাহারই নাম "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত" এবং ঐরূপই সূত্রার্থ। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পক্ষে বলিতে পারি যে,

সূত্র পাঠ করিয়া ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সহজবুদ্ধিগম্য হয়। "অপরীক্ষিত" শব্দের দ্বারা যাহা পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা বুঝিয়া লওয়া হয় নাই, এই অর্থই সহজে বুঝা যায়। যাহা ঋষিসূত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, এই অর্থ উহার দ্বারা সহজে বুঝা যায় না। উহা বুঝিতে কষ্টকল্পনা করিতে হয়। পরন্তু বিশেষ পরীক্ষাপ্রযুক্ত অপরীক্ষিতের স্বীকার, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে "তদ্বিশেষপরীক্ষণাদপরীক্ষিতাভ্যুপগমঃ" এইরূপ ভাষাই মহর্ষি প্রয়োগ করিতেন। ফল কথা, ঋষি-সূত্রের সহজবোধ্য অর্থ পরিত্যাগ করা ভাষ্যকার সঙ্গত মনে করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ভাষ্যকারের মতে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত নহে। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার মতে "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত"। মনু স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" এই ভগবদ্গীতাবাক্যে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্ট প্রকটিত থাকায় উহা সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ বলিয়াই ভাষ্যকার মনে করেন। "বেদান্ত-পরিভাষা"-কারের পক্ষ হইয়া ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলে ভাষ্যকার তাহা নিতান্ত অপব্যাখ্যা মনে করেন। বস্তুতঃ মন্বাদিশাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ববাদ স্পষ্ট আছে। তবে ঋষিসূত্রে ইন্দ্রিয় হইতে মনের যে পৃথক্ উল্লেখ আছে, ভাষ্যকার তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছেন। ঋষিসূত্রে বহিরিন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যেই ইন্দ্রিয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার দ্বারা মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" ইত্যাদি উপনিষদেও বহিরিন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যেই ইন্দ্রিয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বহিরিন্দ্রিয়বর্গ হইতে অন্তরিন্দ্রিয় মনের বিশেষ-প্রদর্শনের জন্যই উপনিষদে ঐরূপে বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহা ঐ উপনিষদ্বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। তাহা হইলে মনের ইন্দ্রিয়ত্বপ্রতিপাদক মন্বাদি শাস্ত্রবাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব "সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত" হইলে তাহা কোনমতে "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত" হইতেও পারে না। কারণ, সর্ব্বসম্মত পদার্থে কোন পক্ষেরই বিবাদ হয় না; এবং ভাষ্যকারের মতে যখন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্তই বিচারস্থলে অন্যের "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত" হইবে, তখন তাহাতে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণও অবশ্য থাকিবে।

ভাষ্যকারের মতে স্বীকৃত পদার্থই সিদ্ধান্ত। কারণ, তিনি পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন— "অনুজ্ঞায়মানোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ।" সুতরাং তাঁহার মতে সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ-সূত্রেরও সেইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণসূত্রের মধ্যেও প্রথম তিনটিতে পদার্থেরই সিদ্ধান্তত্ব স্পষ্ট আছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি পদার্থের অভ্যুপগমকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকায় ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, "অর্থাভ্যুপগময়োর্গুণপ্রধানভাবস্য বিবক্ষাতন্ত্রত্বাৎ।" অর্থাৎ কেহ পদার্থের প্রাধান্য, কেহ তাহার অভ্যুপগমের প্রাধান্য বিবক্ষা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন, ফলে উহা একই কথা। উহাতে কোন বিরোধ হয় নাই। সিদ্ধান্তের ভেদ থাকিলে অথবা সর্ব্ববিষয়ে সকলের ঐকমত্য সম্ভব হইলে বিচারপ্রবৃত্তি অসম্ভব, এ কথা ভাষ্যকার পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছেন।

ভাষ্য। অথাবয়বাঃ।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্তনিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) অবয়বগুলি (নিরূপণ করিয়াছেন)।

সূত্র। প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ॥৩২॥

অনুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, (৫) নিগমন, ইহারা অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচটি বাক্য "অবয়ব"।

বিবৃতি। অনুমান প্রমাণ সামান্যতঃ দ্বিবিধ। স্বার্থ এবং পরার্থ। নিজের তত্ত্ব-নিশ্চয়ের জন্য যে অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে স্বার্থানুমান। যেখানে নিজের এক পক্ষের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রতিবাদী তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ প্রকাশ করিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় জন্মাইয়াছে, সেখানে মধ্যস্থদিগের নির্ণয়ের জন্য অথবা প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার জন্য যে অনুমান-প্রমাণ আশ্রয় করা হয়, তাহাকে পরার্থানুমান বলে। এই "পরার্থ" শব্দের দুই প্রকার অর্থের ব্যাখ্যা আছে। "পরার্থ" বলিলে বুঝা যায়, পরের জন্য। পরের জন্য অর্থাৎ মধ্যস্থের জন্য, মধ্যস্থের নির্ণয়ের জন্য। অথবা (২) পরের জন্য কি না প্রতিবাদীর জন্য, অর্থাৎ প্রতিবাদীর পরাজয়ের জন্য। কিন্তু যে বিচারে মধ্যস্থ নাই, কেবল তত্ত্বনির্ণয় উদ্দেশ্য করিয়া গুরু-শিষ্য প্রভৃতি যে বিচার করেন, সেই "বাদ"বিচারে প্রতিবাদীর পরাজয় উদ্দেশ্য না থাকায় এবং মধ্যস্থ না থাকায় সেই স্থলীয় অনুমান পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাখ্যানুসারে "পরার্থ" হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, যে অনুমান প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থকে বুঝাইবার জন্য, তাহাই "পরার্থানুমান", তাহা হইলে "বাদ"-বিচারের পরার্থানুমানও ঐ কথার দ্বারা পাওয়া যায়। "বাদ"বিচারে মধ্যস্থ না থাকিলেও প্রতিবাদী অবশ্য থাকিবে। প্রতিবাদী না থাকিলে কোন বিচারই হয় না। তবে "বাদ"বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষা না থাকায় মধ্যস্থের আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু যে বিচারে বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষু, যে কোনরূপে নিজের বিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেখানে বিচার্য্য বিষয়ে বিজ্ঞতম নিরপেক্ষ এবং উভয় পক্ষের সম্মানিত মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক। সভাপতি সেই মধ্যস্থ নিয়োগ করিবেন। উপযুক্ত মধ্যস্থ না থাকিলে এবং কোন বিশিষ্ট নিয়মের অধীন না থাকিয়া বিচার করিলে, সে বিচারে অনেক প্রকার গোলযোগ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াই থাকে। এ জন্য মহর্ষি গোতম সেই বিচারের একটি বিশিষ্ট নিয়মবন্ধনের জন্য "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য-বিশেষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথাক্রমে ঐ "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের সমষ্টিকে পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ "ন্যায়" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য ঐ "ন্যায়" নামক বাক্যসমষ্টির পাঁচটি অংশ, তাই উহাদিগকে "অবয়ব" বলা হইয়াছে (প্রথম সূত্র-ভাষ্যে অবয়ব-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, বিচারে নিজের পক্ষটি বুঝাইতে এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ

উপস্থিত করিতে যে সকল বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই বাক্যগুলিই "অবয়ব" নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে বাক্যের দ্বারা পরের হেতুর দোষের উল্লেখ করা হইবে, অথবা প্রতিবাদীর উল্লিখিত দোষের নিরাকরণ করা হইবে, সে সকল বাক্য "অবয়ব" নামে কথিত হয় নাই। মহর্ষির পঞ্চাবয়বের লক্ষণগুলি দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার "অবয়ব" পদার্থের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ নামগুলির উল্লেখ করিলেও এই সূত্রের দ্বারা "অবয়বের" সামান্য লক্ষণেরও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, পদার্থের সামান্য লক্ষণ ব্যতীত তাহার বিভাগ হইতে পারে না। পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ এই "অবয়ব" পদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যায় প্রচুর বুদ্ধিমত্তা ও বাক্‌কুশলতার পরিচয় দিলেও মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পঞ্চ বাক্যের অন্যতমত্বই "অবয়বের" সামান্য লক্ষণ এবং যথাক্রমে উচ্চারিত "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পঞ্চবাক্যের সমূহত্বই বাক্যরূপ ন্যায়ের সামান্য লক্ষণ। মহর্ষি-সূত্রে ইহাই যেন সূচিত হইয়াছে[১]। মূলকথা, পরার্থানুমানকে যেমন "ন্যায়" বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমানে "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি যে পাঁচটি বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়, ঐ পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিকেও "ন্যায়" বলা হইয়াছে। যথাক্রমে উচ্চারিত ঐ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিতেই এই "ন্যায়" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। উহাদিগের এক একটি বাক্য "ন্যায়" নামে ব্যবহৃত হয় না। প্রতিজ্ঞাদি এক একটি বাক্য ন্যায়ের "অবয়ব" নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের যে ভাবে প্রয়োগ হয়, তাহার একটা উদাহরণ দেখাইতেছি। নৈয়ায়িক শব্দকে অনিত্য বলেন, মীমাংসক শব্দকে নিত্য বলেন। উভয় পক্ষ জিগীষাবশতঃ স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন করিয়া বিচার করিবেন। সভার আহ্বান হইল, উপযুক্ত মধ্যস্থের নিয়োগ হইল। বাদী নৈয়ায়িক, মীমাংসক তাঁহার প্রতিবাদী। মধ্যস্থ প্রথমে বাদী নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"তোমার সাধনীয় কি?" অর্থাৎ তুমি কি প্রতিপন্ন করিতে চাও। তখন বাদী নৈয়ায়িক প্রথমেই বলিবেন—(১) "শব্দ অনিত্য"। এখানে "শব্দ অনিত্য"

১। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য মিলিত হইয়া একবাক্যতা লাভ করতঃ একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে। ঐ বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদক মহাবাক্যকেই "ন্যায়" বলে। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য প্রত্যেকে ঐ মহাবাক্যের অঙ্গ বা অবয়ব। এই প্রাচীন মত উদ্যোতকরের কথাতে পাওয়া যায়। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ এই প্রাচীন মতকেই আশ্রয় করিয়া "ন্যায়" ও "অবয়বের" লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকপ্রধান রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশের "ন্যায়" ও "অবয়বের" লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে গঙ্গেশের অবলম্বিত চিরপ্রচলিত মতের প্রতিবাদই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"উচিতানুপূর্ব্বীকপ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকসমুদায়ত্বং ন্যায়ত্বম্"। অর্থাৎ যথাক্রমে "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি "নিগমন" পর্য্যন্ত বাক্যের সমষ্টিই "ন্যায়"। উহারা মিলিত হইয়া কোন একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না, ইহা রঘুনাথ বুঝাইয়াছেন। রঘুনাথ "অবয়বের" প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন—"ন্যায়ান্তর্গতত্বে সতি প্রতিজ্ঞাদ্যন্যতমত্বম্"। অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদিবাক্যের অন্যতমই "অবয়ব"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উহাই বলিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ প্রভৃতিও মহর্ষি-সূত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বাক্যটির নাম "প্রতিজ্ঞা"। ঐ বাক্যটি নৈয়ায়িকের সাধ্যনির্দ্দেশ; সুতরাং উহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাহার পরে মধ্যস্থ পুনর্ব্বার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি কি হেতুর দ্বারা তোমার মত সংস্থাপন করিবে? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহার হেতু কি? কোন্ পদার্থ শব্দে অনিত্যত্বের সাধক বা জ্ঞাপক? তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন যে, (২) "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক"। নৈয়ায়িকের এই বাক্যটির নাম "হেতু" অর্থাৎ "হেতু" নামক দ্বিতীয় অবয়ব। পরে মধ্যস্থ পুনর্ব্বার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব থাকিলেই যে সেখানে অনিত্যত্ব থাকিবে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহারা যে অনিত্যই হইবে, ইহা কিরূপে বুঝিব? এতদুত্তরে তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন,—(৩) "উৎপত্তিধর্ম্মক ঘটাদি দ্রব্যকে অনিত্য দেখা যায়" অর্থৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্যই হইবে, ইহা উৎপত্তিধর্ম্মক বহু পদার্থ দেখিয়া নিশ্চয় করা গিয়াছে। নৈয়ায়িকের পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় বাক্যের নাম "উদাহরণবাক্য"। পরে মধ্যস্থ বাদীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আচ্ছা, উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য, ইহা বুঝিলাম, তাহাতে শব্দ অনিত্য হইবে কেন? এতদুত্তরে বাদী নৈয়ায়িক তখন বলিবেন—(৪) "শব্দ সেই প্রকার উৎপত্তিধর্ম্মক"। অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থ যেমন উৎপত্তিধর্ম্মক, তদ্রূপ শব্দও তাদৃশ উৎপত্তিধর্ম্মক। নৈয়ায়িকের এই চতুর্থ বাক্যটির নাম "উপনয়"। তাহার পরে মধ্যস্থ বলিবেন যে, তুমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলে, তাহা এক কথায় উপসংহার করিয়া বল। তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন—(৫) "সেই উৎপত্তিধর্ম্মকত্বহেতুক শব্দ অনিত্য"। নৈয়ায়িকের এই পঞ্চম বাক্যটির নাম "নিগমন"। এই প্রণালীতে শেষে মীমাংসকও আত্মপক্ষ স্থাপন করিবেন।

এইরূপ বিচারে মধ্যস্থের সংশয়বশতঃ জিজ্ঞাসা জন্মে। ঐ সংশয় নিরাস করিতে তর্ক আবশ্যক হয়। প্রমাণই তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়। প্রমাণের তদ্বিষয়ে সামর্থ্য আছে। তত্ত্ব নিশ্চয়ই প্রমাণের ফল। পূর্ব্বোক্ত সংশয় প্রভৃতি পাঁচটিকেও কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় অবয়বের মধ্যে গণ্য করিয়া অবয়ব দশটি বলিতেন। কিন্তু "সংশয়", "জিজ্ঞাসা", "তর্ক", "প্রমাণের তত্ত্বনিশ্চয়-সামর্থ্য" এবং "তত্ত্বনিশ্চয়"—এই পাঁচটি বাক্য নহে, সুতরাং উহারা ন্যায়বাক্যের অবয়ব হইতে পারে না। বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে,* এ জন্য মহর্ষি প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যকেই "অবয়ব" বলিয়াছেন।

ভাষ্য। দশাবয়বানেকে নৈয়ায়িকা বাক্যে সঞ্চক্ষতে। জিজ্ঞাসা, সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঃ, প্রয়োজনং, সংশয়ব্যুদাস ইতি। তে কস্মান্নোচ্যন্ত ইতি। তত্রাপ্রতীয়মানেঽর্থে প্রত্যয়ার্থস্য প্রবর্ত্তিকা জিজ্ঞাসা। অপ্রতীয়মানমর্থং কস্মাজ্জিজ্ঞাসতে? তং তত্ত্বতো জ্ঞাতং হাস্যামি বা উপাদাস্যে, উপেক্ষিষ্যে বেতি। তা এতা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়স্তত্ত্বজ্ঞান-

স্যার্থস্তদর্থময়ং জিজ্ঞাসতে। সা খল্বিয়মসাধনমর্থস্যেতি। জিজ্ঞাসাধিষ্ঠানং সংশয়শ্চ ব্যাহতধর্ম্মোপসংঘাতাৎ তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্নঃ। ব্যাহতয়োর্হি ধর্ম্ময়োরন্যতরৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতীতি। স পৃথগুপদিষ্টোঽপ্যসাধনমর্থস্যেতি। প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগমার্থানি, সা শক্যপ্রাপ্তির্ন সাধকস্য বাক্যস্য ভাগেন যুজ্যতে প্রতিজ্ঞাদিবদিতি। প্রয়োজনং তত্ত্বাবধারণমর্থসাধকস্য বাক্যস্য ফলং নৈকদেশ ইতি। সংশয়ব্যুদাসঃ প্রতিপক্ষোপবর্ণনং, তৎ প্রতিষেধে তত্ত্বাভ্যনুজ্ঞানার্থং, ন ত্বয়ং সাধকবাক্যৈকদেশ ইতি। প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থা অবধারণীয়ার্থোপকারাৎ। তত্ত্বসাধকভাবাত্তু প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সাধকবাক্যস্য ভাগা একদেশা অবয়বা ইতি।

অনুবাদ। অন্য নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় বাক্যে (ন্যায় নামক বাক্যে) দশটি অবয়ব বলেন। (তন্মধ্যে গোতমোক্ত পাঁচটি হইতে অতিরিক্ত পাঁচটি ভাষ্যকার বলিতেছেন) (১) জিজ্ঞিসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যপ্রাপ্তি, (৪) প্রয়োজন, (৫) সংশয়ব্যুদাস। (প্রশ্ন) সেগুলি অর্থাৎ অন্য নৈয়ায়িক-সম্মত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটি অবয়ব (মহর্ষি গোতম) কেন বলেন নাই ?—(জিজ্ঞাসা প্রভৃতির ব্যাখ্যান পূর্ব্বক ইহার কারণ প্রকাশ করিতেছেন) তন্মধ্যে (জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটির মধ্যে) অপ্রতীয়মান (সামান্যতঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষতঃ অজ্ঞায়মান) পদার্থ বিষয়ে প্রত্যয়ার্থের অর্থাৎ ঐ পদার্থের বিশেষ তত্ত্বাবধারণের প্রয়োজন হানাদিবুদ্ধির প্রবর্ত্তিকা (উৎপাদিকা) জিজ্ঞাসা। (প্রশ্নোত্তরমুখে এই কথার বিশদার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন) অজ্ঞায়মান পদার্থকে কেন জিজ্ঞাসা করে ? (উত্তর) যথার্থরূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে—অর্থাৎ ঐ অজ্ঞায়মান পদার্থকে বিশেষরূপে জানিয়া ত্যাগ করিব অথবা গ্রহণ করিব অথবা উপেক্ষা করিব, এই জন্য। সেই এই হানবুদ্ধি, গ্রহণবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগাদি করে, সেই বুদ্ধি) তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নিশ্চয়ের প্রয়োজন। সেই নিমিত্ত জ্ঞাতা ব্যক্তি (বিশেষতঃ অজ্ঞায়মান পদার্থকে) জিজ্ঞাসা করে। সেই এই "জিজ্ঞাসা" অর্থের সাধক (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় পরপ্রতিপাদক) নহে। (অর্থাৎ এই জন্যই জিজ্ঞাসা ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না।) জিজ্ঞাসার মূল সংশয়ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন (নিকটবর্ত্তী)। যেহেতু, বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের একটিই তত্ত্ব হইতে পারে। সেই "সংশয়" (মহর্ষি কর্ত্তৃক) পৃথক্

উপদিষ্ট হইলেও অর্থের সাধক (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় পরপ্রতিপাদক) নহে। (অর্থাৎ এই জন্যই সংশয় ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না)।

প্রমাণগুলি প্রমাতার প্রমেয়-বোধার্থ। সেই "শক্যপ্রাপ্তি" অর্থাৎ প্রমাতা ও প্রমাণগুলির প্রমেয়-বোধ-জনন-শক্তি প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় সাধক অর্থাৎ পর-প্রতিপাদক বাক্যের অংশের সহিত যুক্ত হয় না (অর্থাৎ এই জন্যই "শক্যপ্রাপ্তি" ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না)। তত্ত্ব-নিশ্চয়রূপ প্রয়োজন অর্থ-সাধক বাক্যের (পরপ্রতিপাদক ন্যায়-বাক্যের) ফল, একদেশ নহে। (অর্থাৎ এই জন্যই প্রয়োজন ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না)। "সংশয়ব্যুদাস" বলিতে প্রতিপক্ষোপবর্ণন, অর্থাৎ প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের কথন, প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের নিষেধ হইলে, তাহা (প্রতিপক্ষোপবর্ণন) তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞার নিমিত্ত। ইহা (সংয়শব্যুদাস) কিন্তু সাধকবাক্যের (পরপ্রতিপাদক ন্যায়-বাক্যের) একদেশ (অংশ) নহে। (অর্থাৎ এই জন্যই "সংশয়ব্যুদাস" ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না)। প্রকরণে অর্থাৎ বিচার-প্রবৃত্তিতে কিন্তু অবধারণীয় পদার্থের উপকারিত্ব প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি (পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি) সমর্থ অর্থাৎ আবশ্যক। পদার্থ-সাধকত্ব অর্থাৎ পরপ্রতিপাদকত্ব প্রযুক্ত কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি (গোতমোক্ত পাঁচটি) সাধক-বাক্যের অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের ভাগ, একদেশ, অবয়ব।

টিপ্পনী। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অবয়বের সংখ্যাবিষয়ে অন্যান্য মতগুলি ভ্রান্ত, ইহা সূচনা করিবার জন্যই অর্থাৎ অবয়বের সংখ্যা-নিয়মের জন্যই ন্যায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম এই বিভাগ-সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু ইহা কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল দশাবয়ববাদেরই এখানে উল্লেখ করিয়া তাহার অনুপপত্তি দেখাইয়াছেন।

ভাষ্যকারোক্ত দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রকৃত পরিচয় এখন নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ তাঁহাদিগের বিশেষ বার্ত্তা কিছু বলিয়া যান নাই। "তার্কিকরক্ষা"-কার বরদরাজ এবং তাহার টীকাকার মল্লিনাথ এবং "ন্যায়সার" গ্রন্থকার প্রভৃতি দশাবয়ববাদী-দিগকে প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রাচীন নৈয়ায়িক কাহারা, ইহা কেহ বলেন নাই। খৃষ্ট-পূর্ব্ববর্ত্তী "ভাস" কবির "প্রতিমা" নাটকে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের সংবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। "চরকসংহিতা"য় গোতমের উক্ত ও অনুক্ত ন্যায়াঙ্গ অনেক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু দশাবয়ববাদ তাহাতেও নাই।

অবশ্য কেহ কল্পনা করিতে পারেন যে, মহর্ষি গোতমের পূর্ব্ববর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ অথবা তন্মধ্যে কোন ন্যায়াচার্য্য "দশাবয়ববাদী" ছিলেন। মহর্ষি গোতম ঐ মতের অসঙ্গতি বুঝিয়া "পঞ্চাবয়ব-

ন্যায়বিদ্যা"র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তখন হইতে গোতমের বিশুদ্ধ ও সুপ্রণালীবদ্ধ সূত্রগুলিই ন্যায়বিদ্যার মূলগ্রন্থরূপে প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ "ন্যায়বিদ্যা" অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিদ্যার গণনায় শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি"। ছান্দোগ্যোপনিষদে "বাকো বাক্য" অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বৃহদারণ্যকে "সূত্র" গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, বৈদিক যুগের ঐ সকল সূত্রই সংকলিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরে পাণিনিসূত্র ও গৃহ্যাদিসূত্র এবং ন্যায়াদি দর্শনসূত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বে ন্যায়বিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কোন আচার্য্য থাকিলে, মহর্ষি গোতম অবশ্যই তাঁহার নামাদির উল্লেখ করিতেন। বেদান্তসূত্র প্রভৃতির ন্যায় ন্যায়সূত্রে বিভিন্নমতবাদী কোন আচার্য্যের নামাদির উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যায়, মহর্ষি গোতমই সর্ব্বপ্রথম সূত্রসমূহের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ন্যায়-তত্ত্বসমূহের গ্রন্থন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব হইতে ন্যায়বিদ্যা থাকিলেও, তিনিই ন্যায়বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, দর্শনকার ঋষি—ইহাই চির-প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। তাঁহার পূর্ব্বে বা সমকালে দশাবয়ববাদী ন্যায়াচার্য্য কেহ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যদি কল্পনার আশ্রয়েই একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যরূপ কল্পনাও সঙ্গত কি না, তাহাও চিন্তা করা উচিত।

আমার মনে হয়, বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে যাঁহারা বিকৃত, কল্পিত ও অসম্পূর্ণ ন্যায়সূত্রের সাহায্যে এবং কল্পনার আশ্রয়ে ন্যায়নিবন্ধ রচনা করিয়া গোতমীয় ন্যায়মতের প্রচার করতঃ কোন মতে সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দশাবয়ববাদের উদ্ভাবক। ঐ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সর্ব্বাংশে প্রকৃত গোতম মত জানিতেন না। অনেক নূতন সূত্র ও নূতন মতের কল্পনা করিয়া তাহা গোতম মত বলিয়াই প্রচার করিতেন। তাঁহারা গোতমীয় পঞ্চাবয়বসিদ্ধান্তে ভ্রান্ত ছিলেন, তাই প্রকৃত গোতম-মতপ্রতিষ্ঠাকামী বাৎস্যায়ন অবয়ব বিষয়ে এখানে তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। অবয়ব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইলে, উদ্যোতকরের ন্যায় তিনি এখানে মীমাংসক মতেরও উল্লেখ করিতেন। ফলতঃ বাৎস্যায়ন এখানে অন্য কোন মতের উল্লেখ না করিয়া, কেবল অপ্রসিদ্ধ দশাবয়বমতের উল্লেখপূর্ব্বক তাহার অনুপপত্তি প্রদর্শন কেন করিয়াছেন? ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অবয়ব-সংখ্যাবিষয়ে অন্যান্য মতের ন্যায় দশাবয়বমতটি প্রসিদ্ধ হইলে, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা যাইত। প্রাচীন শ্রীধরাচার্য্যও বৈশেষিক গ্রন্থ "ন্যায়-কন্দলী"তে প্রশস্তপাদের পঞ্চাবয়বব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াও দশাবয়বমতের উল্লেখ করেন নাই। কারণ, উহা কোন প্রবল ও প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের মত নহে। অপ্রসিদ্ধ এবং দুর্ব্বল মত হইলেও প্রকৃত গোতম-মত-প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উহার উল্লেখপূর্ব্বক অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনে হয়, "তার্কিকরক্ষা"-কার বরদরাজ প্রভৃতিও পরে এইরূপ কল্পনার বলেই দশাবয়ববাদীদিগকে প্রাচীন নৈয়ায়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার পূর্ব্বক অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা করিলে, ঐ প্রাচীন

নৈয়ায়িকদিগের সংগ্রহগ্রন্থগুলি অনাদৃত হইয়া ক্রমে বিলুপ্ত হওয়ায়, উদ্যোতকর প্রভৃতিও তাঁহাদিগের বিশেষ পরিচয় পান নাই। তাঁহারা কোনও প্রসিদ্ধ বা প্রামাণিক গ্রন্থকার হইলে, কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অবশ্যই তাঁহাদিগের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত এবং বাৎস্যায়নও তাঁহাদিগের নামাদির উল্লেখ করিতেন। ভাষ্যকারের "একে নৈয়ায়িকাঃ" এই কথাটির প্রতি মনোযোগ করিলেও দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকগণ প্রকৃত গোতম সম্প্রদায় নহেন এবং উল্লেখ্য-নামা কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও নহেন, ইহা মনে আসে। ঐ স্থলে "একে" ইহার ব্যাখ্যা "অন্যে"। ("একে মুখ্যান্যকেবলাঃ")।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে এক সময়ে গৌতমীয় ন্যায়সূত্র নানা কারণে কপিল-সূত্রের ন্যায় বিলুপ্ত, বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী মনীষিগণ নিজ মতানুসারে ন্যায়সূত্রের পাঠান্তর কল্পনা করিয়া নিজ মতের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ জৈন-ন্যায়গ্রন্থে বিদ্যমান। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের উদ্ধৃত ন্যায়সূত্র হইতে অতিরিক্ত কয়েকটি সূত্রও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ন্যায়সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐগুলিকে তিনি ন্যায়সূত্র বলিয়া কোথায় পাইলেন, তাঁহার ঐ ধারণার মূল কি, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার পূর্ব্বক অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা করিয়া যাহাদিগকে ন্যায়-তত্ত্ব বুঝাইয়া গিয়াছেন— বাৎস্যায়নই যাঁহাদিগের ন্যায়সূত্রার্থ-বোধে আদিগুরু, তাঁহারাও অনেক বিষয়ে বাৎস্যায়নের বিরুদ্ধ-মতবাদী হইয়াছেন কেন? ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত কেহই ন্যায়সূত্রমধ্যে "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" এইরূপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীনের মুখে ঐটি ন্যায়সূত্র বলিয়া শুনা যায়। কেবল তাহাই নহে— শান্তিপুরের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, নানা-গ্রন্থকার রাধামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য্যকৃত "ন্যায়সূত্র-বিবরণ" গ্রন্থে ঐ সূত্রটি চতুর্থাধ্যায়ের সর্ব্বশেষে গৌতমসূত্ররূপে গৃহীত ও বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত দেখা যায়। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ঐটিকে ন্যায়সূত্র বলিয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা ভাবিতে হইবে। তিনি প্রসিদ্ধি অনুসারে ঐটি ন্যায়সূত্ররূপে গ্রহণ করিলেও, ঐ প্রসিদ্ধির মূল কোথায়? তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

মাধবাচার্য্যের "সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থের শেষে পাওয়া যায়, কোন দেশবিশেষে কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে গর্ব্বের সহিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তবে কণাদের মুক্তি হইতে গোতমের মুক্তির বিশেষ কি, ইহা বল; নচেৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব পরিত্যাগ কর। তদুত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গোতমের মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সহিত আনন্দ-সংবিৎ থাকে, এই কথা বলিয়া সেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের নিকটে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের ঐ কথার প্রামাণ্য না থাকিলেও, উহার মূল একটা স্বীকার করিতেই হইবে। অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে মাধবাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তি ঐরূপ একটি অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। মনে হয়, বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে গৌতম-মুক্তির ঐরূপ ব্যাখ্যাই ছিল। বাৎস্যায়নই প্রথমতঃ মুক্তিবিষয়ে পূর্ব্বপ্রচলিত ঐ গৌতম মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ গৌতম মুক্তিবিষয়ে বাৎস্যায়নেরই ব্যাখ্যার অনুসরণ করতঃ তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে গৌতম মুক্তি-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মত বিশেষ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, বাৎস্যায়ন মোক্ষলক্ষণ-ভাষ্যে বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক এই মতের অনুপপত্তি দেখাইতে যাইতেন না, ইহা মনে হয়। লক্ষণ-প্রকরণে তাঁহার ঐরূপ বাদ-প্রতিবাদ আর কোন স্থানে নাই। মুক্তির লক্ষণবিষয়ে তিনি সেখানে আর কোন মতেরও উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিবাদ করেন নাই।

সে যাহা হউক, এখন মূল কথা এই যে, বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বিরুদ্ধ গৌতমমত-ব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ছিলেন, ইহা বুঝিবার প্রচুর কারণ আছে এবং বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতেই মূল ন্যায়সূত্রের অনেকাংশে বিকৃতি ও বিলোপ ঘটিয়াছিল, ইহাও বেশ বুঝা যায়। উদ্যোতকরের সূত্র-পরিচয় এবং বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়-সূচীনিবন্ধ" প্রভৃতির প্রয়োজন চিন্তা করিলেও ঐ বুদ্ধি আরও সুদৃঢ় হয়। বাৎস্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক নৈয়ায়িকদিগের ব্যাখ্যাত মত প্রকৃত গৌতম মত হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের অনেক মত এবং তাঁহাদিগের সংগৃহীত বা কল্পিত অনেক সূত্র পরম্পরাগত হইয়া বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ একেবারে অমূলক নূতন সূত্রের কল্পনা করিতে পারেন না। ফল কথা, বাৎস্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমকালবর্ত্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক প্রাচীন নৈয়ায়িকগণই দশাবয়ববাদের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা সদনুমান কি না, তাহা বলিতে পারি না। কল্পনার অন্ধকারে থাকিয়া তাহা ঠিক বলাও যায় না। তবে কল্পনা বা আলোচনা তত্ত্বনির্ণীষুর সহায়তা করে, ইহা বলিতে পারি।

"প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি পাঁচটির ন্যায় "জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি পাঁচটিও যখন ন্যায়াঙ্গ, তখন মহর্ষি অবয়বের মধ্যে কেন তাহাদিগের উল্লেখ করেন নাই? এ প্রশ্নের উত্তর ভাষ্যকারকে দিতে হইবে, তাই ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটির স্বরূপ-বর্ণন পূর্ব্বক তাহারা ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া গিয়াছেন।

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে সংশয় ও জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষতঃ অজ্ঞাত পদার্থে বিশেষ ধর্ম্মের সংশয় হইলে, তাহাতে বিশেষ ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা হয়। জিজ্ঞাসার ফলে প্রমাণের দ্বারা পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তদ্বিষয়ে হানাদি বুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগাদি করে) জন্মে। তাই বলিয়াছেন—"প্রত্যয়ার্থস্য প্রবর্ত্তিকা"। পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই এখানে "প্রত্যয়" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। হানাদি বুদ্ধিই তাহার "অর্থ" অর্থাৎ প্রয়োজন। "জিজ্ঞাসা" পরম্পরায় ঐ প্রয়োজনের উৎপাদক। জিজ্ঞাসার মূল আবার "সংশয়"। সংশয়ে যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয় হয়, তাহার একটি তত্ত্ব হইতে পারে, এ জন্য সংশয় তত্ত্বজ্ঞানের নিকটবর্ত্তী। "শক্যপ্রাপ্তি"র ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন,—"শক্যং প্রমেয়ং তস্মিন্ প্রাপ্তিঃ শক্ততা প্রমাণানাং প্রমাতুশ্চ"। অর্থাৎ প্রমাতা ও প্রমাণের প্রমেয় বোধজনন-শক্তিই "শক্যপ্রাপ্তি"। "সংশয়ব্যুদাসে"র প্রসিদ্ধ নাম "তর্ক"। "সংশয়ো ব্যুদস্যতেহনেন" এইরূপ

ব্যুৎপত্তিতে ঐ কথার দ্বারা তর্ক বুঝা যায়। তর্কই সংশয় দূর করে। ভাষ্যকার ইহাকে বলিয়াছেন,—"প্রতিপক্ষোপবর্ণন"। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের বর্ণন। যেমন "যদি শব্দ নিত্য হয়, তবে জন্য পদার্থ না হউক?"—এইরূপে অনিত্যত্বের প্রতিপক্ষ নিত্যত্বে হেতুর অভাব বর্ণন করিলে (অর্থাৎ ঐরূপ তর্কের দ্বারা) শব্দের অনিত্যত্ব-সাধক প্রমাণ সমর্থিত হয়। প্রমাণের দ্বারা শব্দে নিত্যত্বের প্রতিষেধ হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার তর্ক শব্দের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণকে সমর্থন করিয়া অনুজ্ঞা করে।

ভাষ্যে "তত্ত্বং জ্ঞায়তেঽনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ "তত্ত্বজ্ঞান" শব্দের দ্বারা প্রমাণ বুঝিতে হইবে।

দশাবয়ববাদখণ্ডনে ভাষ্যকারের মূল কথা এই যে, ন্যায়ের দ্বারা সাধ্যসাধন করিতে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যের ন্যায় "জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থও নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটিও ন্যায়ের অঙ্গ। কিন্তু উহারা যখন বাক্য নহে, পরপ্রতিপাদক নহে, তখন উহারা কোন মতেই ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না। বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে। পরন্তু জিজ্ঞাসা প্রভৃতি স্বরূপতঃই আবশ্যক হয় অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের ন্যায় উহাদিগের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। সুতরাং জিজ্ঞাসাদি-বোধক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ঐ বাক্যগুলিকে অবয়বরূপে কল্পনা করাও নিষ্প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য নিজের জ্ঞান দ্বারা পরপ্রতিপাদক হয়; সুতরাং ঐ পাঁচটিই ন্যায়বাক্যের "ভাগ" অর্থাৎ একদেশ বা অংশ বলিয়া "অবয়ব" নামে অভিহিত হইতে পারে। এ জন্য মহর্ষি গোতম ঐ পাঁচটিকেই "অবয়ব" বলিয়াছেন। "চিন্তা-মণি"কার গঙ্গেশও "অবয়ব-নিরূপণে"র শেষে সংশয় ও প্রয়োজন প্রভৃতি ন্যায়ের অঙ্গ হইলেও বাক্য নহে বলিয়া অবয়ব নহে, এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, "কণ্টকোদ্ধার" সর্ব্বত্র আবশ্যক হয় না, এ জন্য তাহা বাক্য হইলেও "অবয়ব" নহে। "নায়ং হেত্বাভাসঃ" অর্থাৎ এইটি হেত্বাভাস নহে, এইরূপ বাক্যকে নবীন ন্যায়াচার্য্যগণ "কণ্টকোদ্ধার" বলিয়াছেন। অন্যান্য কথা নিগমসূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য (৩৯ সূত্র)।

ভাষ্য। তেষান্তু যথাবিভক্তানাং।

সূত্র। সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥৩৩॥

অনুবাদ। যথাবিভক্ত সেই প্রতিজ্ঞাদি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাবয়বের মধ্যে "সাধ্য-নির্দ্দেশ" অর্থাৎ যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া কোন ধর্ম্মীকে অনুমানের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে বাদী উপস্থিত হইয়াছেন, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম্মিমাত্রের বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্য পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দ্দেশঃ। অনিত্যঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। প্রজ্ঞাপনীয় ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্ম্মীর অর্থাৎ কোন ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্মটিকে অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে ন্যায় প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম্মীর "পরিগ্রহ বচন" অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা যায়, এমন বাক্য, "প্রতিজ্ঞা"। (মহর্ষি এই অর্থেই বলিয়াছেন) প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দ্দেশ[১]। (উদাহরণ) "শব্দ অনিত্য" অর্থাৎ যেমন শব্দকে অনিত্য বলিয়া বুঝাইতে গেলে "শব্দ অনিত্য" এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা হইবে।

বিবৃতি। পঞ্চাবয়বের প্রথম অবয়ব "প্রতিজ্ঞা"। বাদীর বক্তব্য কি ? বাদী কি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন ? ইহা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বলিতে হইবে। বাদী যে বাক্যের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে তাহাই বলিবেন, সেই বাক্যটির নাম "প্রতিজ্ঞা"। বাদী তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাহা করিতেই হইবে এবং "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি দোষে বাদী নিগৃহীত হইবেন, এই জন্য বাদীর ঐ বাক্যের নাম "প্রতিজ্ঞা"। বাদী শব্দকে অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উপস্থিত হইলে সেখানে শব্দরূপ ধর্ম্মীতে অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মটিই তাঁহার প্রজ্ঞাপনীয়। কারণ, তাহা লইয়াই শব্দ নিত্যতাবাদী মীমাংসকের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত। শব্দরূপ ধর্ম্মী লইয়া কাহারও কোন বিবাদ নাই। শব্দ নামে একটা পদার্থ আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শব্দের অনিত্যতাবাদী নৈয়ায়িক মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে "অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দ" এইরূপ অর্থবোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা তাহার সাধ্য নির্দ্দেশ হইবে। সুতরাং "শব্দ অনিত্য" এইরূপ বাক্য ঐ স্থলে "প্রতিজ্ঞা"। ঐ বাক্যের দ্বারা মধ্যস্থ বুঝিতে পারিবেন যে, "শব্দ অনিত্য", ইহাই এই বাদীর সাধ্য, ইনি শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিতেছেন। এইরূপ পর্ব্বতে বহ্নির সংস্থাপনে "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। মনুষ্যমাত্রেরই বিনশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে "মনুষ্যমাত্র বিনশ্বর" এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপনে "আত্মা নিত্য" এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। সর্ব্বত্রই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের দ্বারা সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিমাত্রের বোধ জন্মে। অতিরিক্ত আর কোন ধর্ম্মের বোধ হয় না। অতিরিক্ত কোন ধর্ম্মের উল্লেখ করিলে তাহা প্রতিজ্ঞা-বাক্য হইবে না ; এই জন্য "নিগমন-বাক্য" প্রতিজ্ঞা নহে। "নিগমন"-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞার্থ ভিন্ন অতিরিক্ত অর্থেরও বোধ জন্মে। এইরূপ "ন্যায়" প্রয়োগ উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু "শব্দ অনিত্য" এইরূপ বাক্য কেহ বলিলেন, সেখানে সেইরূপ বাক্যও "প্রতিজ্ঞা" হইবে না। ন্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যই "প্রতিজ্ঞা"।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সূত্রস্থ "সাধ্য" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"প্রজ্ঞাপনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী"। সূত্রস্থ "নির্দ্দেশ" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"পরিগ্রহবচন"। "পরিগ্রহ" শব্দের অর্থ এখানে

১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই ভাষ্যে প্রতিজ্ঞালক্ষণের ব্যাখ্যার পরে "প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দ্দেশঃ" এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে বুঝিতে হইবে, ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে মহর্ষি যে ঐ অর্থেই "সাধ্যনির্দ্দেশ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

বোধক, "বচন" শব্দের অর্থ বাক্য। "পরিগ্রহ-বচন" কি না—বোধক বাক্য[১]। যাহার দ্বারা নির্দ্দেশ করা অর্থাৎ বুঝান হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে সূত্রে "নির্দ্দেশ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সাধ্যের নির্দ্দেশ কি না—"পরিগ্রহ-বচন" অর্থাৎ সাধ্যের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা। যাহা সিদ্ধ নহে, যাহাকে বাদী সাধন করিবেন, তাহাকে "সাধ্য" বলে। শব্দ সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব ধর্ম্মটি সিদ্ধ নহে; কারণ, প্রতিবাদী মীমাংসক তাহা মানেন না, সুতরাং শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্মটি "সাধ্য"। নৈয়ায়িক তাহা সাধন করিবেন। শব্দ পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনিত্যত্বরূপে পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকায় অনিত্যত্বরূপে শব্দকেও সেখানে "সাধ্য" বলা যায়। মহর্ষি গোতম এই অর্থেই এখানে এবং আরও অনেক সূত্রে "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরূপ সাধ্য অর্থেও মহর্ষি-সূত্রে "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ আছে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। "উদাহরণ-সূত্র"-ভাষ্যে ভাষ্যকারও "সাধ্য" শব্দের দ্বিবিধ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফল কথা, অনুমেয়-ধর্ম্ম বা সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীকে প্রাচীনগণ "সাধ্যধর্ম্মী" বলিতেন। এই সূত্রে সেই সাধ্যধর্ম্মী অর্থেই মহর্ষি "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিরূপ যে "সাধ্য", তাহার "নির্দ্দেশ" অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র তাহাই বুঝা যায় এবং ন্যায়বাদী তাহা বুঝাইয়া থাকেন, সেই বাক্যই "প্রতিজ্ঞা"। "সাধ্য" শব্দের দ্বারা সাধনীয় ধর্ম্মকে বুঝিয়া, সাধ্য ধর্ম্মের নির্দ্দেশকে প্রতিজ্ঞা বুঝিলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কেবল "অনিত্যত্বং" এইরূপ বাক্যও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ঐরূপ বাক্য "প্রতিজ্ঞা" হইবে না। তত্ত্বচিন্তা-মণিকার গঙ্গেশ সর্ব্বত্র সাধ্য ধর্ম্ম অর্থেই "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং সেই অর্থে "সাধ্যের" নির্দ্দেশকে পূর্ব্বোক্ত দোষবশতঃ "প্রতিজ্ঞা" বলিতে পারেন নাই। তিনি "সাধ্যনির্দ্দেশ প্রতিজ্ঞা নহে," এই কথা বলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে "প্রতিজ্ঞা"র লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে মহর্ষির এই প্রতিজ্ঞার লক্ষণ-সূত্রের উদ্ধারপূর্ব্বক মহর্ষি-সূত্রানুসারে "সাধ্য" শব্দের পূর্ব্বোক্ত সাধ্য ধর্ম্মী অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াই মহর্ষিপ্রোক্ত প্রতিজ্ঞা লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন[২]। শেষে তিনি নিজেও স্বাধীনভাবে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন।

১। পরিগৃহ্যতেঽনেনেতি পরিগ্রহঃ স চ বচনঞ্চেতি পরিগ্রহবচনম্।—(তাৎপর্য্যটীকা)।

২। "তত্ত্বচিন্তামণি"র অবয়ব প্রকরণে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি মহর্ষি গোতমের প্রতিজ্ঞালক্ষণ-সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করায়, সেখানে দীধিতির টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যে, গঙ্গেশ মহর্ষিপ্রোক্ত প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন। দীধিতিকার রঘুনাথ মহর্ষি-সূত্রের "সাধ্য" শব্দের বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিয়া, মহর্ষির প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের নির্দ্দোষত্ব সমর্থন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, গঙ্গেশ মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞালক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিতে যান নাই। তিনি সেখানে এইমাত্র বলিয়াছেন,—"তত্র প্রতিজ্ঞা ন সাধ্যনির্দ্দেশঃ সাধ্যপদেঽহেতিব্যাপ্তেঃ"। ইহার দ্বারা গঙ্গেশ মহর্ষি-লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। গঙ্গেশ অনুমেয় ধর্ম্ম অর্থেই সর্ব্বত্র "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ প্রয়োগের কারণও আছে। সাধ্যের ব্যাপ্তিনিরূপণে অনুমেয় ধর্ম্মরূপ সাধ্যই গ্রাহ্য। সুতরাং ঐ অর্থে "সাধ্যনির্দ্দেশ" প্রতিজ্ঞা বলা যায় না, ইহাই গঙ্গেশের তাৎপর্য্য। গঙ্গেশ মহর্ষির প্রতিজ্ঞালক্ষণটি উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনি মহর্ষিপ্রোক্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণের ব্যাখ্যা করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। তবে গঙ্গেশ যে ভাবে, যে ভাষায়

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ তাঁহার "পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে" প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন,— "অনুমেয়োদ্দেশোঽবিরোধী প্রতিজ্ঞা"। অনুমানের দ্বারা যে ধর্ম্মটি প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই তাঁহার মতে "অনুমেয়" এবং তাহারই নাম "পক্ষ"। যেমন পর্ব্বতে বহ্নিধর্ম্ম প্রতিপাদনের ইচ্ছা হইলে সেখানে "বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতই" অনুমেয় বা পক্ষ। "অনুমেয়" কি? এই বিষয়ে প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল। সে সকল মত যথাসম্ভব অনুমান-সূত্র-ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ন বা" এইরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা যখন অভেদ সম্বন্ধে পর্ব্বতে "বহ্নিমান্"কেই বুঝা যায় অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়জন্য বোধে যখন বহ্নিধর্ম্ম বিশেষণ হয় না, "বহ্নিমান্"ই বিশেষণ হয়, তখন ঐরূপ প্রতিজ্ঞাস্থলে "বহ্নিমান্"ই সাধ্য, বহ্নিধর্ম্ম সাধ্য নহে। অবয়ব ব্যাখ্যায় দীধিতিকার রঘুনাথ এই মতের উল্লেখ করিয়া ইহার প্রকর্ষ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে "অবিরোধী" এই কথাটি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা "প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ", "অনুমানবিরুদ্ধ", "স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ" এবং "স্ববচনবিরুদ্ধ" প্রতিজ্ঞাভাস-গুলি নিরাকৃত হইয়াছে। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, বাদী যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই "সাধ্য" হইবে না। যাহা সাধনের যোগ্য, তাহাই সাধ্য, তাহারই নাম "পক্ষ", তদ্‌ভিন্ন "পক্ষাভাস"। বাদী যদি নিজের ভ্রমবশতঃ প্রত্যক্ষাদি-বিরুদ্ধ কোন পদার্থ সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতিজ্ঞার ন্যায় কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য "প্রতিজ্ঞা" হইবে না; উহার নাম "প্রতিজ্ঞাভাস"। তাই প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে "অবিরোধী" এই কথাটি বলিয়াছেন।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, "প্রজ্ঞাপনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী"ই যখন মহর্ষি-সূত্রোক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ এবং তাহার "নির্দ্দেশ"কেই মহর্ষি প্রতিজ্ঞা বলিয়াছেন, তখন "প্রতিজ্ঞাভাস"গুলিতে প্রতিজ্ঞার লক্ষণই নাই, সুতরাং প্রতিজ্ঞার লক্ষণে "অবিরোধী" অথবা ঐরূপ কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাই মহর্ষি গোতম তাহা বলেন নাই।

"অগ্নি অনুষ্ণ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে সেখানে ঐ বাক্যটি "প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে। প্রথম সূত্র-ভাষ্যে "ন্যায়াভাসের" উদাহরণ ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলা হইয়াছে। সেখানে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগের কথাও বলা হইয়াছে।

ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মহর্ষির প্রতিজ্ঞালক্ষণের দুষ্টতা ভ্রম হইতে পারে, এই জন্য সেখানে দূরদর্শী রঘুনাথ শিরোমণি মহর্ষির প্রতিজ্ঞালক্ষণ-সূত্রটির উল্লেখ করিয়া তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ গঙ্গেশের ভ্রম প্রদর্শন করেন নাই, তিনি অন্যের ভ্রম সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহারই নিরাস করিয়া গিয়াছেন। মূলকথা, গঙ্গেশ মহর্ষির সূত্রার্থ না বুঝিয়া, মহর্ষির ভ্রম প্রদর্শন করিতে গিয়াছেন, ইহা বলিতে ইচ্ছা হয় না, টীকাকার জগদীশ ও মথুরানাথও তাহা বলেন নাই। নৈয়ায়িকগণ এ কথাগুলি চিন্তা করিবেন।

"ন্যায়কন্দলী"কার প্রশস্তপাদোক্ত "অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাসের" উদাহরণ বলিয়াছেন,— "গগনং নিবিড়ং" অর্থাৎ "গগন নিবিড়" এই বাক্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যে অনুমানের দ্বারা গগন সিদ্ধ হইয়াছে, সেই অনুমানের দ্বারাই গগন নিরবয়ব বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায় "গগন নিবিড়" এই বাক্য "অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস"। কারণ, নিরবয়ব পদার্থ নিবিড় হইতে পারে না। সাবয়ব পদার্থই নিবিড় হইতে পারে।

কোন বৈশেষিক যদি বলেন,—"কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে", তাহা হইলে তাঁহার ঐ বাক্য "স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে। কারণ, কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না, ইহাই বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

যদি কেহ বলেন—"শব্দ বাচক নহে", তাহা হইলে ঐ বাক্য "স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে। কারণ, বাদী নিজেই শব্দের বাচকত্ব স্বীকার করিয়া অপরকে শব্দের দ্বারা অর্থ বুঝাইবার জন্য ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

"স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ" এবং "স্ববচনবিরুদ্ধ" প্রতিজ্ঞাভাস অনুমানবিরুদ্ধই হইবে, ঐ দুইটির আবার পৃথক্ উল্লেখ কেন? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া "ন্যায়কন্দলী"কার বলিয়াছেন যে, অন্যত্র তাহা হইলেও সর্ব্বত্র তাহা হয় না। যেমন বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমস্ত পদার্থকেই "ক্ষণিক" বলেন। কিন্তু কোন বৌদ্ধ যদি বলেন,—"সমস্ত পদার্থ অক্ষণিক", তাহা হইলে স্থিরবাদী অন্য সম্প্রদায় উহাকে প্রমাণবিরুদ্ধ বলিতে পারেন না। সেখানে বৌদ্ধের ঐ বাক্য তাঁহার "স্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস", ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, কিন্তু স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ, এমন প্রতিজ্ঞাভাস আছে। এইরূপ "স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস"ও আছে।

কোন বৈশেষিক যদি বলেন, "শব্দ নিত্য," তাহা হইলে দিঙ্নাগ বলিয়াছেন, উহা "আগম-বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে। উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, বৈশেষিক আগমের দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সাধন করেন না। কারণ, শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা এই উভয়বোধক আগম থাকায় আগমার্থে সন্দেহবশতঃ বৈশেষিক প্রথমতঃ অনুমানকেই আশ্রয় করেন। শেষে সেই অনুমানের দ্বারা শব্দের অনিত্যতা নির্ণয় করিয়া উহাই আগমার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন। সুতরাং "শব্দ নিত্য", এইরূপ বাক্য বৈশেষিকের পক্ষে "অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস"ই হইবে; উহা "আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে না।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্যকেও দিঙ্নাগ প্রভৃতি এক প্রকার "প্রতিজ্ঞাভাস" বলিয়াছেন, কিন্তু উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্য যেখানে "প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে, সেখানে অবশ্য উহা কোন প্রমাণ-বিরুদ্ধই হইবে। সুতরাং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ নামে পৃথক্ এক প্রকার "প্রতিজ্ঞাভাস" কেন বলিব, তাহা বুঝি না। উদ্যোতকর এইরূপে দিঙ্নাগ-প্রদর্শিত অনেক প্রকার "প্রতিজ্ঞাভাসের" উদাহরণ খণ্ডন করিয়াছেন এবং দিঙ্নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের প্রতিজ্ঞালক্ষণেরও খণ্ডন করিয়াছেন। "ন্যায়বার্ত্তিকে" সেই সকল কথা দ্রষ্টব্য।

দিঙ্নাগ প্রভৃতির ন্যায় জয়ন্ত ভট্টও "ন্যায়মঞ্জরী"তে আরও কতকগুলি "প্রতিজ্ঞাভাসে"র

উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম "প্রতিজ্ঞাভাস" নামে পৃথক্ করিয়া আর কিছু বলেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম সূত্র-ভাষ্যে "ন্যায়াভাস" বলিয়াই "প্রতিজ্ঞাভাস" বলিয়াছেন। কারণ, "প্রতিজ্ঞাভাস" হইলেই সেখানে "ন্যায়াভাস" হইবে, "ন্যায়াভাস" হইলেই "প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যই "প্রতিজ্ঞাভাস", "পক্ষাভাস" ইত্যাদি নামে "ন্যায়াভাস" বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি গোতম "ন্যায়াভাস" নাম করিয়াও কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল "হেত্বাভাসের"ই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। "প্রতিজ্ঞাভাস" প্রভৃতির স্থলে সর্ব্বত্র "হেত্বাভাস" থাকিবেই। সুতরাং "হেত্বাভাস" বলাতেই মহর্ষির ঐগুলি বলা হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী সূত্রকার মহর্ষি গোতম এই জন্যই "প্রতিজ্ঞাভাস" প্রভৃতি বলিয়া গ্রন্থগৌরব করেন নাই। জয়ন্ত ভট্টও শেষে ইহাই বলিয়াছেন,—

"অত এব চ শাস্ত্রেঽস্মিন্ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা।
পক্ষাভাসাদয়ো নোক্তা হেত্বাভাসাস্ত দর্শিতাঃ" ॥—৩৩

সূত্র। উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ। উদাহরণের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ কেবল দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মীর যাহা কেবল সমান ধর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধনীয় পদার্থের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ "হেতু" (সাধর্ম্ম্য হেতু নামক দ্বিতীয় অবয়ব)।

ভাষ্য। উদাহরণেন সামান্যাৎ সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতুঃ। সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্ম্মমুদাহরণে চ প্রতিসন্ধায় তস্য সাধনতা-বচনং হেতুঃ। উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদিতি। উৎপত্তি-ধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধন কি না প্রজ্ঞাপন, অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের সাধনতাবোধক বাক্যবিশেষ হেতু (সাধর্ম্ম্যহেতু নামক দ্বিতীয় অবয়ব)। বিশদার্থ এই যে, সাধ্যে অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীতে ধর্ম্মকে (হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্মবিশেষকে) প্রতিসন্ধান করিয়া এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেও (সেই ধর্ম্মকে) প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ যাহাকে দৃষ্টান্ত পদার্থে দেখিয়াছি, তাহাকে এই সাধ্য ধর্ম্মীতেও দেখিতেছি বা জানিতেছি, এইরূপে সেই হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্মটিকে বুঝিয়া, সেই ধর্ম্মের সাধনতাবচন (সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্যবিশেষ) হেতু, অর্থাৎ এইরূপ বাক্যবিশেষই সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। (যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাস্থলে) "উৎপত্তিধর্ম্মধর্ম্মকত্বাৎ" এই বাক্য। অর্থাৎ "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব (অনিত্যত্বের) জ্ঞাপক" এইরূপ অর্থবোধক বাক্য পূর্ব্বোক্ত স্থলে সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। উৎপত্তি-ধর্ম্মক (বস্তু) অনিত্য দেখা গিয়াছে।

বিবৃতি। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বাদী নিজের সাধ্য ধর্ম্মটিকে প্রকাশ করিয়া মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে ঐ সাধ্য ধর্ম্মের সাধন অর্থাৎ হেতু পদার্থকে প্রকাশ করিবেন। মধ্যস্থ প্রশ্ন করিবেন,—"তোমার সাধ্য ধর্ম্মের জ্ঞাপক কি ?" সুতরাং বাদী সেখানে হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া প্রকাশ করিবেন। যে বাক্যের দ্বারা বাদী তাহা প্রকাশ করিবেন, তাহাকে বলে "হেতুবাক্য"। এই হেতুবাক্যই "হেতু" নামে দ্বিতীয় অবয়ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন "শব্দ অনিত্য" এই প্রতিজ্ঞা বলিলে মধ্যস্থের প্রশ্ন হইবে—"শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক কি ?" তখন বাদী নৈয়ায়িক যদি "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব"কে ঐ স্থলে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বলিবেন,—"উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব, জ্ঞাপক"। সংস্কৃত ভাষায় বিচার হইলে বলিবেন,—"উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ"। ঐ বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা "জ্ঞাপকত্ব" বুঝিতে হইবে, সুতরাং ঐ বাক্যের দ্বারা "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক" ইহাই বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে যখন "শব্দ অনিত্য," এইরূপ বাক্য বলা হইয়াছে এবং তাহার পরে "শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক কি ?" এইরূপ প্রশ্ন হইয়াছে, তখন "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক" এইরূপ বাক্য বলিলে "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব" পদার্থটি শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক, এইরূপই চরম বোধ হইবে। ফলকথা, যে বাক্যের দ্বারা বাদী তাহার হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া বুঝাইবেন, তাহাই হেতুবাক্য। তাহাকেই বলে—"হেতু" নামক অবয়ব। হেতু পদার্থ বিবিধ ; (১) সাধর্ম্ম্যহেতু এবং (২) বৈধর্ম্ম্য হেতু। সুতরাং হেতুবাক্যও ঐ নামদ্বয়ে দ্বিবিধ। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা "সাধর্ম্ম্যহেতু-বাক্যে"র লক্ষণ বলিয়াছেন।

যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার ধর্ম্ম, তাহাকে বলে "উৎপত্তিধর্ম্মক" পদার্থ। ন্যায়মতে শব্দ "উৎপত্তিধর্ম্মক" পদার্থ। শব্দ যদি ঘটাদি পদার্থের ন্যায় জন্য পদার্থ না হইয়া আত্মা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় নিত্য পদার্থ হইত, তাহা হইলে উচ্চারণ না করিলেও শব্দের শ্রবণ হইত। উচ্চারণের দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধ শব্দের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না, এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি গোতম বলেন নাই। গোতমের মতে শব্দ পূর্ব্বে থাকে না, শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহার শ্রবণ হয় না, যাহা শ্রবণের যোগ্যই নহে, কিন্তু বর্ত্তমান আছে, নিত্য সিদ্ধ আছে, তাহাকে শব্দ বলা যাইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তানুসারে শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক। উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব ঘটাদি পদার্থের ন্যায় শব্দেরও ধর্ম্ম। উৎপত্তিধর্ম্মক হইলেই যে, সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা কিরূপে বুঝা যায় ? এ জন্য নৈয়ায়িক উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। নৈয়ায়িক যদি ঘটাদি পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নৈয়ায়িকের পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্য "সাধর্ম্ম্য-হেতুবাক্য" হইবে। ঘটাদি পদার্থরূপ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে, সেখানে অনিত্যত্বও আছে, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত। এখন উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব ধর্ম্মটি যদি শব্দে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহা শব্দ ও ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম্ম। নৈয়ায়িক ঐ "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব"কে শব্দ ও ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া যদি পূর্ব্বোক্ত স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য বলেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য "সাধর্ম্ম্যহেতুবাক্য" হইবে। আর যদি ঐ স্থলে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করেন অর্থাৎ "যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক নহে, তাহা অনিত্য নহে,—যেমন আত্মা প্রভৃতি" এইরূপ কথা বলেন,

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এইরূপ হেতুবাক্যই সেখানে "বৈধর্ম্ম্যহেতুবাক্য" হইবে। আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব না থাকায় উহা শব্দ ও আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্ম নহে, উহা আত্মা প্রভৃতির বৈধর্ম্ম্য। উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু পদার্থকে যদি ঐরূপে আত্মাদি দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্ম্যরূপে বুঝিয়া, তাহার জ্ঞাপকত্ব-বোধক বাক্য বলা হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্য সেখানে "বৈধর্ম্ম্যহেতুবাক্য" হইবে। এই "বৈধর্ম্ম্যহেতুবাক্যে"র কথা ইহার পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব বাক্যবিশেষ। "প্রতিজ্ঞা"র লক্ষণের পরে "হেতু" নামক অবয়বের লক্ষণই যখন মহর্ষির বক্তব্য, তখন এই সূত্রে "হেতু" শব্দের দ্বারা হেতু পদার্থ না বুঝিয়া হেতুবাক্যই বুঝিতে হইবে। সূত্রে "সাধ্যসাধনং" এই অংশের দ্বারা ঐ হেতু-বাক্যের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। উহার দ্বারাও সাধ্যসাধন হেতুপদার্থ না বুঝিয়া, সাধ্যের সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্যবিশেষই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও সূত্রস্থ "সাধ্যসাধন" শব্দের ব্যাখ্যায় শেষে "তস্য সাধনতাবচনং" এই কথা বলিয়া মহর্ষির ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধ্যের সাধন যে বাক্যে থাকে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা সাধ্যসাধন পদার্থকে সাধন বলিয়া বুঝা যায়, এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাসসিদ্ধ "সাধ্যসাধন" শব্দের দ্বারা এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য বুঝা যায়, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐ পথে যান নাই। প্রাচীন মতে সূত্রে "সাধ্যসাধন" শব্দের দ্বারাই সাধ্যের সাধনতাবোধক বাক্য পর্য্যন্তই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও তাহাই প্রকটিত। বস্তুতঃ প্রাচীন ভাষায় ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। পরন্তু ঐরূপ প্রয়োগের দ্বারা সাধ্যসাধনত্বই যে হেতু পদার্থের লক্ষণ, ইহাও মহর্ষি সূচনা করিয়াছেন। সূত্রে এইরূপ সূচনাই থাকে।

মহর্ষি দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক্ লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। তাহার দ্বারাই দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ বুঝিয়া মহর্ষির উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণ বুঝা যাইবে। কিন্তু হেতু পদার্থের স্বরূপ না বুঝিলে, "হেতুবাক্য" ও "হেত্বাভাস" বুঝা যায় না। মনে হয়, সেই জন্যই মহর্ষি "সাধ্যসাধন" শব্দের দ্বারাই হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে হেতু পদার্থের স্বরূপও সূচিত হইয়াছে। তবে হেতু-বাক্যের লক্ষণই এখানে মহর্ষির মূল বক্তব্য, সেই জন্যই এই সূত্রের উক্তি, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ হেতু-বাক্যের লক্ষণ পক্ষেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টের কথায় পাওয়া যায়, কোন সম্প্রদায় এই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ইহাকে হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেন, শেষে ইহার দ্বারাই হেতুবাক্যের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এইরূপ কথা বলিতেন। জয়ন্ত ভট্ট সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি রক্ষা করিয়াও ঐ মতের সমর্থন করিতে গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐরূপ বলেন নাই। "অবয়ব" প্রস্তাবে হেতুবাক্যের লক্ষণই যখন মহর্ষির এখানে মূল বক্তব্য, তখন হেতু পদার্থের লক্ষণই প্রধানতঃ এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলেন নাই, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। জয়ন্ত ভট্টের অন্যান্য কথা ইহার পরবর্ত্তী সূত্রে প্রকটিত হইবে।

মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের" লক্ষণ বলিলেও, সূত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে ইহার দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্য লক্ষণও বুঝা যায়। বস্তুতঃ হেতুবাক্যের সামান্য লক্ষণও মহর্ষির বক্তব্য। সামান্য জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্য লক্ষণ এবং সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সামান্য লক্ষণটি আর্থ এবং বিশেষ লক্ষণটি শাব্দ। বিশেষ লক্ষণ পক্ষে সূত্রে "হেতু" শব্দের দ্বারা "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" বুঝিতে হইবে। "উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং" এই কথার দ্বারা ঐ "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের" লক্ষণ বলা হইয়াছে।

যাহা উদাহৃত হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে সূত্রে "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা এখানে "দৃষ্টান্ত" পদার্থই বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত পদার্থ দ্বিবিধ, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের" এই লক্ষণে "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা "সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তই" বুঝিতে হইবে। "সাধর্ম্ম্য" বলিতে সমান ধর্ম্ম। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্য" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "সামান্য"। "সামান্য" বলিতে সমানতা বা সমানধর্ম্মই বুঝিতে হইবে। কাহার সহিত সমান ধর্ম্ম? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে, "উদাহরণসাধর্ম্ম্য"। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ম্ম। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত কাহার সমান ধর্ম্ম, ইহা সূত্রকার না বলিলেও সাধ্যধর্ম্মীর সমান ধর্ম্মই বুঝা যায়। কারণ, তাহাই প্রকৃত এবং নিকটবর্ত্তী। ফল কথা, "সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত" পদার্থের সহিত "সাধ্য ধর্ম্মীর" যাহা সমান ধর্ম্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম্মটি "সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তেও" আছে এবং "সাধ্য ধর্ম্মীতে"ও আছে, তাহাই এই সূত্রে "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ঐরূপ পদার্থকেই "সাধর্ম্ম্য হেতু" পদার্থ বলে। যে কোন পদার্থের সহিত সমান ধর্ম্ম বলিলে বিরুদ্ধ ও ব্যভিচারী অর্থাৎ হেত্বাভাস ও হেতু পদার্থ হইয়া পড়ে, তাই বলা হইয়াছে—"উদাহরণ সাধর্ম্ম্য"। কোন ব্যভিচারী পদার্থ উদাহরণেও আছে, আবার যাহা উদাহরণ নহে, সেই পদার্থেও আছে—এমন পদার্থও "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য" বলিয়া হেতু পদার্থ হইয়া পড়ে, এ জন্য "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য" বলিতে এখানে কেবলমাত্র উদাহরণের সহিতই সমান ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এবং "সাধর্ম্ম্য" বলিতেও কেবলমাত্র সাধর্ম্ম্য (বৈধর্ম্ম্য নহে) বুঝিতে হইবে। ফলকথা, এই সূত্রে "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা "সাধর্ম্ম্য হেতু" পদার্থেরও লক্ষণ সূচিত হওয়ায়, উহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ হইল যে, কেবলমাত্র "সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত" পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মীর যাহা কেবলমাত্র সমান ধর্ম্ম, ফলিতার্থ এই যে, যাহা সেখানে "সাধর্ম্ম্য হেতু" পদার্থ, তৎপ্রযুক্ত তাহার সাধ্যসাধনতাবোধক যে বাক্য, তাহাই "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য"। যেগুলি দুষ্ট হেতু অর্থাৎ হেত্বাভাস, সেগুলি সাধ্যসাধনই হয় না, সুতরাং তাহার সাধনত্ববোধক ঐরূপ বাক্য হেতু-বাক্য হইবে না। এবং ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত না হইলেও ঐরূপ কোন বাক্য ন্যায়ের অবয়ব হেতু-বাক্য হইবে না। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞায় হেতুবাক্য বলিয়াছেন—"উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাৎ" এই বাক্য। "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" শব্দে আছে এবং ঘটাদি পদার্থরূপ-সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তেও

আছে, সুতরাং উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব ধর্ম্মটি সূত্রোক্ত "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য"। উহা কেবল ঘটাদি অনিত্য পদার্থরূপ সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তেই থাকায় এবং শব্দে থাকায় কেবল সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের সহিত সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সমান ধর্ম্মই হইয়াছে। উহাকে ঐরূপে বুঝিয়া ঐ স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ঐ বাক্য "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" হইবে। ফল কথা এই যে, হেতুবাক্য প্রয়োগের পরে বাদী যেরূপ উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তদনুসারেই ঐ হেতুবাক্যের পূর্ব্বোক্ত ভেদ হইবে। বাদী যদি "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের" দ্বারা পরে সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যটি "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" হইবে। আর যদি "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের" দ্বারা বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার হেতুবাক্য "বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" হইবে। ভাষ্যকার যে এখানে সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝাইতেই শেষে এখানে "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যটির"ও উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহরণসূত্রে এ সকল কথা পরিস্ফুট হইবে। (৩৬।৩৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

সূত্রের "সাধ্যসাধনং" এই অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধনং প্রজ্ঞাপনং।" সূত্রে "সাধ্য" শব্দটি যে এখানে সাধ্য ধর্ম্ম অর্থেই প্রযুক্ত, ইহা ভাষ্যকারের কথাতেও বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কেবল "সাধ্যস্য" এই কথা বলিলে, যে ধর্ম্মীতে অনুমান হয়, কেবল সেই ধর্ম্মীমাত্রকেই কেহ বুঝিতে পারেন, এ জন্য ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য"। উহার দ্বারা এখানে অনুমেয় ধর্ম্ম সহিত ধর্ম্মীই সূত্রোক্ত "সাধ্য" শব্দের অর্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে, কেবল ধর্ম্মীমাত্র বুঝিতে হইবে না, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। এই জন্যই ভাষ্যকার শেষে "সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্ম্মং" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অর্থ সুব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঐ স্থলে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা সাধ্য ধর্ম্মীকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, সাধ্য ধর্ম্মী এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেই হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্মটির প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্যটীকাকারের কথায় বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ "সাধ্য" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মী অর্থই গ্রাহ্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু উহা যে সূত্রোক্ত "সাধ্য" শব্দেরই বিবরণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। ভাষ্যকারের শেষ কথাগুলি তাঁহার অন্য প্রকারে বিশদার্থ ব্যাখ্যাও বলা যায়। পরন্তু ভাষ্যকার প্রথমে কেবল "সাধ্যস্য" এই কথা বলিলে, উহার দ্বারা কেবল ধর্ম্মী মাত্র বুঝিবে কেন? কেবল ধর্ম্মী "সাধ্য" হইতে পারে না। ভাষ্যকার উদাহরণ সূত্রভাষ্যে "সাধ্য" শব্দের যে দ্বিবিধ অর্থ বলিয়াছেন, তদনুসারে কেবল "সাধ্য" বলিলে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী বুঝা যাইতে পারে। "সাধ্য" শব্দের দ্বারা যদি এখানে তাহাই ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকার আবার "ধর্ম্মস্য" এই কথা বলিবেন কেন? ফলকথা, ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় "সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য" এই কথা বলিয়া, সূত্রোক্ত "সাধ্য" শব্দের দ্বারা এখানে যে সাধ্য-ধর্ম্মীকে গ্রহণ না করিয়া সাধ্য ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই মনে আসে। ভাষ্যকারের ঐ কথার সরল অর্থ ত্যাগ করিবার কোন কারণও মনে আসে না। পরন্তু হেতু পদার্থটি সাধ্য ধর্ম্মেরই সাধন হয়। হেতুপদার্থ সাধ্য ধর্ম্মীর ব্যাপ্য হয় না, সাধ্য ধর্ম্মেরই ব্যাপ্য হইয়া থাকে। সুতরাং মহর্ষি

এখানে "সাধ্যসাধনং" এই বাক্যে সাধ্য ধর্ম্ম অর্থেই "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই সহজে বুঝা যায়। সুধীগণ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

"সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" স্থলে "সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত" পদার্থ এবং সাধ্য ধর্ম্মীতে হেতুপদার্থকে প্রতিসন্ধান করিয়া, তাহার সাধকত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, এ জন্য ঐ হেতুবাক্য উদাহরণ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইবার জন্যই পরে ঐ কথা বলিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত পদার্থে যাহা দেখিয়াছি বা জানিয়াছি, এই সাধ্য ধর্ম্মীতেও তাহাকে দেখিতেছি বা জানিতেছি, এইরূপে হেতুপদার্থের জ্ঞানই তাহার দৃষ্টান্ত পদার্থ ও সাধ্যধর্ম্মীতে প্রতিসন্ধান। "প্রতিসন্ধান" বলিতে "প্রত্যভিজ্ঞা" নামক জ্ঞানবিশেষ। উহা অনেক সময়ে একজাতীয় পদার্থেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হইয়া থাকে। রন্ধনগৃহে যে ধূম দেখা হয়, পর্ব্বতে ঠিক সেই ধূমই দেখা হয় না, তাহার সজাতীয় অন্য ধূমই দেখা হইয়া থাকে। তাহা হইলেও ধূমত্বরূপে অথবা বিশিষ্ট ধূমত্বরূপে সজাতীয় ধূম দেখিয়াও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ যাহা রন্ধনগৃহে দেখিয়াছি, তাহা পর্ব্বতেও দেখিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে।

বাৎস্যায়নের প্রবল প্রতিবাদী বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ তাঁহার "প্রমাণসমুচ্চয়" গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, "সাধর্ম্ম্যং যদি হেতুঃ স্যাৎ ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী"। দিঙ্‌নাগের কথা এই যে, যদি উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যই হেতু হয়, তাহা হইলে উহা বাক্য না হওয়ায় ন্যায়বাক্যের অংশ বা "অবয়ব" হইতে পারে না। আর যদি হেতু পদার্থেরই লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি সংগত হয় না, প্রথমা বিভক্তিই সঙ্গত হয়, অর্থাৎ "উদাহরণসাধর্ম্ম্যং সাধ্যসাধনং হেতুঃ" এইরূপ সূত্রই বলা উচিত। দিঙ্‌নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর ঐ কথার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকরের প্রতিবাদের মর্ম্ম এই যে, হেতুবাক্যের লক্ষণই এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন। উদাহরণ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধনতাবোধক বাক্যই সূত্রার্থ। উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যরূপ হেতুপদার্থ উদাহরণসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হইতে না পারিলেও হেতুবাক্য উদাহরণসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, হেতু পদার্থটিকে উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য বলিয়া বুঝিয়াই তাহার জ্ঞাপকত্ববোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহাই হেতুবাক্য। তাহার প্রতি উদাহরণসাধর্ম্ম্য অর্থাৎ হেতু পদার্থ ঐরূপে নিমিত্ত বা প্রযোজক হইবে। সুতরাং সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি সঙ্গত এবং আবশ্যক। ফলকথা, হেতুপদার্থের লক্ষণ হইলেই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি হয় এবং তাহা ন্যায়বাক্যের অংশ হেতুবাক্যের লক্ষণ হয় না। যখন পূর্ব্বোক্তরূপে হেতুবাক্যের লক্ষণই সূত্রার্থ, তখন দিঙ্‌নাগের প্রদর্শিত দোষ এখানে সম্ভবই নহে। দিঙ্‌নাগ সূত্রার্থ না বুঝিয়াই এখানে কাল্পনিক দোষের আরোপ করিয়াছেন, ইহাই উদ্যোতকরের প্রতিবাদের সার ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি ? নেত্যুচ্যতে। কিং তর্হি ?

অনুবাদ। হেতুবাক্যের লক্ষণ কি এই মাত্র ? অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে হেতুবাক্যের লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই কি কেবল হেতুবাক্যের লক্ষণ ? (উত্তর) ইহা

বলিতেছি না, অর্থাৎ হেতুবাক্যের যে আর কোন প্রকার লক্ষণ নাই, ইহা বলা হয় নাই। (প্রশ্ন) তবে কি ? অর্থাৎ তাহা হইলে হেতুবাক্যের অন্য প্রকার লক্ষণ কি ? (এই প্রশ্নের উত্তররূপে মহর্ষি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন)।

সূত্র। তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ অর্থাৎ উদাহরণবিশেষের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ সাধ্যসাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ হেতু (বৈধর্ম্ম্যহেতুবাক্য)।

ভাষ্য। উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ। কথং ? অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং যথা আত্মাদি দ্রব্য-মিতি।

অনুবাদ। উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত মাত্রের যাহা কেবল বৈধর্ম্ম্য তৎপ্রযুক্ত, সাধ্যসাধনও অর্থাৎ ঐরূপ সাধ্যসাধনতাবোধক বাক্যবিশেষও হেতু (বৈধর্ম্ম্য-হেতুবাক্য)। (প্রশ্ন) কি প্রকার ? অর্থাৎ এই বৈধর্ম্ম্যহেতু-বাক্য কি প্রকার ? (উত্তর) "শব্দ অনিত্য", "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব-জ্ঞাপক", "অনুৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু নিত্য, যেমন আত্মাদি দ্রব্য" (অর্থাৎ প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই বাক্যই বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আত্মা প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে না থাকায়, উহা আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্ম্য। প্রদর্শিত স্থলে ঐ হেতুবাক্যটি পূর্ব্বোক্ত বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হওয়ায় উহা বৈধর্ম্ম্য হেতু-বাক্য)।

টিপ্পনী। হেতুবাক্য বিবিধ ;—সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য এবং বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। মহর্ষি পূর্ব্ব-সূত্রের দ্বারা "সাধর্ম্ম্যহেতুবাক্যের" লক্ষণ বলিয়া, এই সূত্রের দ্বারা "বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের" লক্ষণ বলিয়াছেন। এই সূত্রে "তথা" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্র হইতে "উদাহরণ" শব্দের এবং "সাধ্য-সাধনং" এবং "হেতুঃ" এই দুইটি বাক্যের অনুবৃত্তি সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ কথাগুলির যোগ করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। যাহা উদাহৃত হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পূর্ব্বসূত্রে দৃষ্টান্ত পদার্থ অর্থেই "উদাহরণ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত পদার্থও দ্বিবিধ ;—সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত। যেখানে হেতুপদার্থ নাই, সাধ্য ধর্ম্মও নাই, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, ভাষ্যকারের মতে তাহা "বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত"। হেতু পদার্থটি তাহাতে থাকে না, সুতরাং হেতু পদার্থ বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেরই বৈধর্ম্ম্য হয়। অতএব এই সূত্রে "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা "বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত"কেই বুঝিতে হইবে। এবং এই সূত্রে "উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্য" কথার দ্বারা যাহা বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থমাত্রের কেবল বৈধর্ম্ম্য (সাধর্ম্ম্য নহে), তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই মহর্ষির বিবক্ষিত এবং তাহাকেই বলে "বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থ"। যেমন "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" আত্মা

প্রভৃতি পদার্থে নাই বলিয়া, উহা আত্মাদি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্ম্য। শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইলে, উহা সেখানে বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থ। সুতরাং ঐ স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" পদার্থটি কেবল ঐ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্ম্য মাত্র হওয়ায় "বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থ" হইয়াছে। যাহা বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের ন্যায় অন্য পদার্থেরও বৈধর্ম্ম্য, তাহা "বৈধর্ম্ম্যহেতুপদার্থ" নহে। তাহা হইলে শরীরমাত্রে "সাত্মকত্বে"র অনুমানে "প্রাণাদিমত্ব"ও বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা হইবে না। কারণ, "প্রাণাদিমত্ব" যেমন ঐ স্থলে বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত (প্রাণাদিশূন্য এবং নিরাত্মক) ঘটাদি পদার্থের বৈধর্ম্ম্য, তদ্রূপ মৃত শরীরেরও বৈধর্ম্ম্য। মৃত দেহেও প্রাণাদি নাই। শরীরমাত্রেই সাত্মকত্বের অনুমান করিতে গেলে সেখানে মৃত শরীর দৃষ্টান্ত হইবে না। ফলকথা, যে পদার্থটি কেবল "বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তে"র বৈধর্ম্ম্য মাত্র, তাহাই বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থ এবং তাহাই এই সূত্রে "উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্য" কথার দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" পদার্থকে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তের বৈধর্ম্ম্যরূপে বুঝিয়া "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা "বৈধর্ম্ম্য-হেতুবাক্য" হইবে। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঐ বাক্যটিকেই "বৈধর্ম্ম্য-হেতুবাক্যে"র উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়া, উহা যে এখানে "বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তে"র বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য শেষে ঐ স্থলীয় "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য"টিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ যে হেতুবাক্যের পরে "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্যে"র প্রয়োগ হইবে, তাহাই বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য। বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থকে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাই সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হয় এবং বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থকে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্য বলিয়া বুঝিয়াই ঐরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং "উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্য" বা বৈধর্ম্ম্য হেতুপদার্থ, ঐরূপ হেতুবাক্যের নিমিত্ত বা প্রযোজক, তাহা হইলে বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যকে উদাহরণ বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত বলা যায়, সুতরাং এই সূত্রেও পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি নাই। হেতু পদার্থ এবং হেতুবাক্য একই পদার্থ নহে। হেতুবাক্যের প্রতি হেতু পদার্থ প্রযোজক হওয়ায়, হেতুবাক্যকে হেতুপদার্থপ্রযুক্ত বলা যাইতে পারে।

এই বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের ব্যাখ্যায় পরবর্ত্তী কোন নৈয়ায়িকই ভাষ্যকারের মত গ্রহণ করেন নাই। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে যাহাকে "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" বলিয়া আসিয়াছেন, এখানে তাহাকেই অর্থাৎ সেইপ্রকার বাক্যকেই "বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য" হইতে এই "বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যে"র বাস্তব কোন ভেদ হয় নাই, কেবল প্রয়োগভেদ হইয়াছে মাত্র। তাহাতে হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণের ভেদবশতঃও হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইতে পারে না। যদি তাহাই হয় অর্থাৎ যদি উদাহরণের ভেদবশতঃই হেতুবাক্যের এই ভেদ মহর্ষির বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মহর্ষি "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্যে"র যে লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাই এই ভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে, মহর্ষির এই সূত্রটির কোন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং ভাষ্যকার-প্রদর্শিত বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের উদাহরণ গ্রাহ্য নহে। "জীবৎ শরীরং ন নিরাত্মকং অপ্রাণাদিমত্বপ্রসঙ্গাৎ" অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির

শরীর আত্মশূন্য নহে, যে হেতু তাহা হইলে উহা প্রাণাদিশূন্য হইয়া পড়ে, এইরূপ স্থলেই বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্যের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশও উদ্যোতকরের মতানুসারে পূর্ব্বোক্ত স্থলে এবং "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ" অর্থাৎ পৃথিবী জলাদি সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে গন্ধ আছে। যাহা জলাদি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা গন্ধযুক্ত নহে, এইরূপ স্থলে "গন্ধবত্ত্বাৎ" এই বাক্যকে বৈধর্ম্ম্য হেতুবাক্য বা "ব্যতিরেকী হেতুবাক্য" বলিয়াছেন।

উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী প্রায় সকল ন্যায়াচার্য্যগণের মতেই হেতু ও অনুমান ত্রিবিধ। (১) "অন্বয়ী," (২) "ব্যতিরেকী," (৩) "অন্বয়ব্যতিরেকী"। অনুমানের পূর্ব্বে অনুমেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত পদার্থকে "সপক্ষ" বলে। ঐ "সপক্ষ" পদার্থ উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত হইলে তাহাকে "অন্বয়ী উদাহরণ" বলে। ঐ অন্বয়ী উদাহরণের সাহায্যে হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহাকে অন্বয়ব্যাপ্তি বলে। গঙ্গেশ প্রভৃতি প্রধানতঃ এই অন্বয়ব্যাপ্তির স্বরূপ বলিয়াছেন—"হেতুব্যাপক-সাধ্যসামানাধিকরণ্য"। অর্থাৎ যেখানে যেখানে হেতুপদার্থ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই যে সাধ্য ধর্ম্ম থাকে, তাহাকে বলে "হেতুব্যাপকসাধ্য"। তাহার সহিত হেতু পদার্থের একাধারে থাকাই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের অন্বয়ব্যাপ্তি। যেখানে অনুমেয় ধর্ম্মটি সন্দিগ্ধ, অথবা নিশ্চিত হইলেও অনুমানের ইচ্ছার বিষয়ীভূত, তাহাকে "পক্ষ" বলে। এক কথায় যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, সেই ধর্ম্মীকেই নব্যগণ "পক্ষ" বলিয়াছেন। যে পদার্থে অনুমেয় ধর্ম্মটি নাই, ইহা উভয় পক্ষের সম্মত, সেই পদার্থকে "বিপক্ষ" বলে (হেত্বাভাস-লক্ষণপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)। যেখানে এই বিপক্ষ নাই, কেবল সপক্ষরূপ "অন্বয়ী উদাহরণে"র সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত "অন্বয়ব্যাপ্তি"র নিশ্চয়পূর্ব্বক অনুমান হয়, সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (১) অন্বয়ী বা "কেবলান্বয়ী"। যেমন "ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" এইরূপে বাচ্যত্বধর্ম্মের অনুমানে "বিপক্ষ" নাই। কারণ, এখানে সাধ্য বা অনুমেয় ধর্ম্ম "বাচ্যত্ব"। বস্তু মাত্রেরই বাচক শব্দ আছে; সুতরাং বস্তু মাত্রই শব্দের বাচ্য অর্থাৎ সকল বস্তুতেই বাচ্যত্বরূপ ধর্ম্ম আছে। তাহা হইলে ঐ বাচ্যত্ব-রূপ সাধ্যশূন্য পদার্থ না থাকায়, ঐ স্থলে "বিপক্ষ" নাই অর্থাৎ ঐ স্থলে "বিপক্ষ" অলীক। সুতরাং বিপক্ষরূপ "ব্যতিরেকী উদাহরণ" এখানে অলীক। কিন্তু ঘটাদি বহু বস্তুই "বাচ্যত্ব"রূপ সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত থাকায়, যে যে স্থানে জ্ঞেয়ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ত্ব আছে, সেই সমস্ত স্থানে বাচ্যত্ব আছে;—যেমন ঘটাদি জ্ঞেয় পদার্থ। এইরূপে "অন্বয়ী উদাহরণের সাহায্যে এখানে জ্ঞেয়ত্বরূপ হেতু পদার্থে বাচ্যত্বরূপ সাধ্য ধর্ম্মের "অন্বয়ব্যাপ্তি" নিশ্চয়পূর্ব্বক অনুমান হয়। এই জন্য এই স্থলীয় হেতুও অনুমান অন্বয়ী বা কেবলান্বয়ী। গঙ্গেশের মতে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে।

যেখানে পূর্ব্বোক্ত "সপক্ষ" অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মযুক্ত বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ নাই, কিন্তু বিপক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মশূন্য বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ আছে, সেখানে সেই বিপক্ষ পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, তাহাকে ব্যতিরেকী উদাহরণ বলে। সেই ব্যতিরেকী উদাহরণের সাহায্যে "ব্যতিরেকব্যাপ্তি" নিশ্চয় পূর্ব্বক সেখানে অনুমান হয়; এ জন্য সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (২) ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী। সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বকেই

নব্যগণ "ব্যতিরেকব্যাপ্তি" বলিয়াছেন। যে যে স্থানে সাধ্য ধর্ম্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই যে অভাব থাকে, তাহাকে সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব বলে। সাধ্যশূন্য স্থান মাত্রেই হেতুর অভাব থাকিলে, তাহা সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব হয়। সেই হেতুর অভাবের প্রতিযোগী হেতু। কারণ, যাহার অভাব, তাহাকে ঐ অভাবের "প্রতিযোগী" বলে। তাহা হইলে সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে হেতুর অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকে। ফলতঃ এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান স্থলে সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাবের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব জ্ঞান হইয়াই অনুমান হয়, এই জন্য উহাকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান বলা হইয়াছে। "ব্যতিরেক" শব্দের অর্থ অভাব।

যেমন "জীবচ্ছরীরং সাত্মকং প্রাণাদিমত্বাৎ" অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, যেহেতু তাহাতে প্রাণাদি আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীরে সাত্মকত্বের অনুমানে "সপক্ষ" নাই। কারণ, জীবিত ব্যক্তির শরীর এখানে "পক্ষ" হইয়াছে। উহা ভিন্ন "সাত্মক" বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত কোন পদার্থই নাই। যাহা সাধ্যযুক্ত বলিয়া উভয় পক্ষের সম্মত, তাহাই "সপক্ষ"। তাহা এখানে নাই। কিন্তু সাত্মকত্বশূন্য অর্থাৎ যাহাতে আত্মা নাই—ইহা সর্ব্বসম্মত, এমন ঘটাদি পদার্থরূপ বিপক্ষ আছে। সুতরাং ঐ স্থলে যাহা সাত্মক নহে, তাহা প্রাণাদিযুক্ত নহে অর্থাৎ প্রাণাদির] কারণ ইচ্ছাদিযুক্ত নহে, যেমন ঘটাদি—এইরূপে ব্যতিরেকী উদাহরণের সাহায্যে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়পূর্ব্বকই অনুমান হয়। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীর আত্মশূন্য নহে, তাহা হইলে উহা প্রাণাদিশূন্য হইয়া পড়ে; আত্মশূন্য পদার্থমাত্রই প্রাণাদিশূন্য, জীবিত ব্যক্তির শরীরে যখন প্রাণাদি আছে, তখন উহাতে আত্মা আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীরে সাত্মকত্বের অনুমান হয়। এখানে জীবিত ব্যক্তির শরীর ভিন্ন প্রাণাদিযুক্ত অথচ সাত্মক বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থ নাই, সুতরাং সপক্ষ না থাকায় অন্বয়ী উদাহরণের সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু ঘটাদিরূপ "বিপক্ষ" ব্যতিরেকী উদাহরণ আছে। তাহার সাহায্যে ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়পূর্ব্বক অনুমান হওয়ায়, এই স্থলীয় হেতু ও অনুমান ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী।

যেখানে "সপক্ষ"ও আছে, বিপক্ষও আছে, এবং হেতুপদার্থটি "সপক্ষে" আছে, কিন্তু "বিপক্ষে" নাই, সেই স্থলে সপক্ষরূপ অন্বয়ী উদাহরণ এবং বিপক্ষরূপ ব্যতিরেকী উদাহরণ, এই দ্বিবিধ উদাহরণের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি—এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তির নিশ্চয়পূর্ব্বকই অনুমান হওয়ায় সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (৩) অন্বয়ব্যতিরেকী। যেমন পর্ব্বতে বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান স্থলে পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষ আছে এবং জল প্রভৃতি বিপক্ষও আছে। ঐ স্থলে যে স্থানে বিশিষ্ট ধূম আছে, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি আছে, যেমন পাকশালা—এইরূপে অন্বয়ী উদাহরণের সাহায্যে বিশিষ্ট ধূমে বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। এবং যে যে স্থানে বহ্নি নাই, সেই সমস্ত স্থানে বিশিষ্ট ধূম নাই, যেমন জল—এইরূপে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে হেতু ও অনুমান অন্বয়ব্যতিরেকী।

উদ্যোতকর মহর্ষি-সূত্রোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অনুমানের এইরূপ প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকদিগেরই উদ্‌ভাবিত নহে।

"তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই অনুমানকে পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রিবিধ বলিয়া তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রদর্শিত "ব্যতিরেকী" অনুমানের উদাহরণস্থলে কোন জীবিত ব্যক্তির শরীরে সাত্মকত্ব নিশ্চয় অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া সেই শরীরবিশেষই "সপক্ষ" আছে, তাহাই "অন্বয়ী উদাহরণ" হইবে, তাহার সাহায্যে "অন্বয়ব্যাপ্তি"র নিশ্চয় করিয়াই অর্থাৎ "যাহা যাহা প্রাণাদিযুক্ত, সে সমস্তই সাত্মক, যেমন আমার শরীর"—এইরূপে "প্রাণাদিমত্ত্ব" হেতুতে "সাত্মকত্ব"রূপ সাধ্য ধর্ম্মের "অন্বয়ব্যাপ্তি" নিশ্চয় পূর্ব্বকই জীবিত ব্যক্তির শরীরমাত্রে সাত্মকত্বের অনুমান হইতে পারে, সুতরাং "ব্যতিরেকী" বা "কেবলব্যতিরেকী" নামে কোন প্রকার হেতু বা অনুমান নাই, এই কথা বলিয়া অনেকে উহা মানেন নাই। প্রাচীন কাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে উহা লইয়া বহু বিচার হইয়া গিয়াছে। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ "ব্যতিরেক্যনুমান" গ্রন্থে সেই সমস্ত বিচারের বিস্তৃত প্রকাশ করিয়াছেন। গঙ্গেশ চরম কথা বলিয়াছেন যে, যদিও ঐরূপ স্থলে কোনপ্রকারে "অন্বয়ব্যাপ্তি" নিশ্চয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা যেখানে হয় নাই, কেবলমাত্র "ব্যতিরেকী উদাহরণে"র সাহায্যে "ব্যতিরেকব্যাপ্তি" নিশ্চয়ই হইয়াছে, সেখানেও অনুমিতি হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। অন্ততঃ সেইরূপ স্থলেও "কেবলব্যতিরেকী" অনুমান অবশ্য স্বীকার্য্য। মীমাংসকগণ ঐরূপ স্থলে অনুমিতি স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা ঐরূপ স্থলে "অর্থাপত্তি" নামে অতিরিক্ত প্রমাণ ও প্রমিতি স্বীকার করিয়াছেন। গঙ্গেশ তাঁহার "অর্থাপত্তি" গ্রন্থে সেই মতেরও বিশদ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মীমাংসক-মত-পক্ষপাতী হইয়া নিজে কেবল মাত্র "অন্বয়ী" অনুমানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্ব্বত্র "অন্বয়ব্যাপ্তি" নিশ্চয়পূর্ব্বকই অনুমান হয়, এ জন্য অনুমানমাত্রই "অন্বয়ী"। গঙ্গেশের প্রদর্শিত "ব্যতিরেকী" অনুমান স্থলে রঘুনাথ মীমাংসকদিগের ন্যায় "অর্থাপত্তি" নামে অতিরিক্ত জ্ঞানই স্বীকার করিয়াছেন[১]। কিন্তু রঘুনাথের এই মত প্রকৃত ন্যায়মত নহে। উহা গৌতম মত-বিরুদ্ধ। কারণ, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয়াধ্যায়ে মীমাংসক-সম্মত "অর্থাপত্তি"র প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করিয়া "অর্থাপত্তি"কে অনুমানের মধ্যেই নিবিষ্ট করিয়াছেন।

গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও হেতু ও অনুমানকে পূর্ব্বোক্ত নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তবে তিনি "ব্যতিরেকব্যাপ্তি" জ্ঞানকে অনুমিতির কারণরূপে মানেন নাই। "অর্থাপত্তি" নামেও অতিরিক্ত প্রমাণ মানেন নাই। তাঁহার মতে সর্ব্বত্র "অন্বয়ব্যাপ্তি"র নিশ্চয়-পূর্ব্বকই অনুমিতি হয়। ঐ অন্বয়ব্যাপ্তিনিশ্চয় যে স্থলে "অন্বয়সহচার" মাত্র জ্ঞানজন্য হয়, সেই স্থলীয় অনুমান "অন্বয়ী"। এবং যেখানে উহা "ব্যতিরেকসহচার" মাত্র জ্ঞানজন্য হইবে, সেই স্থলীয় অনুমান "ব্যতিরেকী"। এবং "অন্বয়সহচার" ও "ব্যতিরেকসহচার" এই দ্বিবিধ "সহচার" জ্ঞানজন্য হইলে সেই স্থলীয় অনুমান "অন্বয়ব্যতিরেকী"। সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতু

১। ব্যতিরেকসহচারেণান্বয়ব্যাপ্তিগ্রহণাশ্রয়ণাদ্বা (অনুমিতিদীধিতি)।—তথাচ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানং হেতুরেব ন, কুতস্তজ্জন্যানুমিতাবব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। স্বয়ং ব্যতিরেক-পরামর্শজন্য-বুদ্ধেরর্থাপত্তিত্বোপগমাদাশ্রয়ণা-দিত্যুক্তং। আচার্য্যৈরাশ্রয়ণাদিতি তদর্থঃ (জাগদীশী)।

আছে, এইরূপ জ্ঞানের নাম "অন্বয়সহচারজ্ঞান"। সাধ্যশূন্য স্থানে হেতু নাই, এইরূপ জ্ঞানের নাম "ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান"। এই "সহচারজ্ঞান" ব্যাপ্তিজ্ঞানের অন্যতম কারণ। উদয়নাচার্য্য ঐ ব্যাপ্তিগ্রাহক "সহচারে"র ভেদেই অনুমানকে পূর্ব্বোক্ত নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। উদয়নের মতে "ব্যতিরেকসহচার" জ্ঞানের দ্বারা "অন্বয়ব্যাপ্তি"র নিশ্চয় পূর্ব্বকই অনুমিতি জন্মে, ইহা নব্য ন্যায়ের অনেক গ্রন্থে পরিস্ফুট আছে। উদয়নের "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে (তৃতীয় স্তবকে) অর্থাপত্তি বিচারে কিন্তু ইহা পরিস্ফুট নাই।

উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হেতু ও অনুমান বিষয়ে নানা মতভেদের সৃষ্টি করিলেও ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ নাম ও তাহাদিগের ঐরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকারের মতে হেতু দ্বিবিধ;—সাধর্ম্ম্য হেতু এবং বৈধর্ম্ম্য হেতু। হেতুবাক্যও পূর্ব্বোক্ত নামদ্বয়ে দ্বিবিধ। উদাহরণের ভেদেই হেতুবাক্যের ঐরূপ ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপ্রদর্শিত "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই প্রকার হেতুবাক্যটি সাধর্ম্ম্যোদাহরণ স্থলে সাধর্ম্ম্য হেতুবাক্য হইবে এবং বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ স্থলে উহা বৈধর্ম্ম্যহেতুবাক্য হইবে। ফলকথা, উদাহরণের ভেদে এক আকারের হেতুবাক্যেরও পূর্ব্বোক্ত প্রকারভেদ হইবে এবং তাহা হইতে পারে। উদ্দ্যোতকর এই কথার উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, উদাহরণের ভেদে হেতুবাক্যের ঐ প্রকার ভেদই মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে, মহর্ষির পরবর্ত্তী বৈধর্ম্ম্যোদাহরণসূত্রের দ্বারাই এই ভেদ ব্যক্ত হইতে পারে; সুতরাং মহর্ষির এই সূত্রটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার ইহা মনে করেন নাই। কারণ, হেতুবাক্য দ্বিবিধ, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্যও মহর্ষির এখানে এই সূত্রটি বলা আবশ্যক। সুতরাং মহর্ষি এখানে যথাক্রমে দুইটি সূত্রের দ্বারাই দ্বিবিধ হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। ফলকথা, প্রকৃত স্থলে উদাহরণসূত্রের দ্বারা হেতুর দ্বিবিধত্ব বুঝা গেলেও, মহর্ষি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য অর্থাৎ হেতু ত্রিবিধ নহে, দ্বিবিধ, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্য এই সূত্রটি বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও হেত্বাভাসের লক্ষণ-সূত্রগুলির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছেন যে, যদিও এই হেতুলক্ষণের দ্বারাই হেতুপদার্থের অবধারণ হওয়ায়, হেত্বাভাসগুলি নিরাকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ সেগুলি হেতু নহে, সেগুলি "হেত্বাভাস" ইহা বুঝা গিয়াছে অর্থাৎ যদিও হেতুপদার্থের লক্ষণ বুঝিলেই "হেত্বাভাসে"র স্বরূপ বুঝা যায়, তথাপি "অনৈকান্তিক" প্রভৃতি নামে এই "হেত্বাভাস"গুলি পঞ্চবিধ,—এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্যই মহর্ষি যথাস্থানে "হেত্বাভাসে"র পাঁচটি লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের এই কথার ন্যায় এখানেও ভাষ্যকারের পক্ষে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। ফলকথা, মহর্ষি বাক্যসংক্ষেপ না করিয়া অন্য স্থলের ন্যায় এখানেও দুইটি সূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুবাক্যেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং উদাহরণের ভেদেই হেতুবাক্যের এই দ্বিবিধত্ব মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহাই ভাষ্যকারের কথা। হেতুপদার্থ এবং হেতুবাক্য যে ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বোক্তরূপে দ্বিবিধ এবং একই হেতুপদার্থ উদাহরণের ভেদে "সাধর্ম্ম্যহেতু" এবং "বৈধর্ম্ম্য হেতু" হইতে পারে, ইহা নিগমন-সূত্র-ভাষ্যেও স্পষ্ট আছে। "সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য হেতু" বা "অন্বয়ব্যতিরেকী" নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু ভাষ্যকার মানেন নাই।

একই স্থানে দ্বিবিধ উদাহরণের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তিনিশ্চয়কে অনুমিতির কারণ বলিয়া স্বীকার করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। কোন কোন নব্য নৈয়ায়িকও তাহা আবশ্যক মনে না করিয়া "অন্বয়ব্যতিরেকী" নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু বা অনুমান মানেন নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি যাহাকে "অন্বয়ব্যতিরেকী" হেতু বলিয়াছেন, ভাষ্যকারের মতে তাহা "সাধর্ম্ম্য হেতু"ও হইতে পারে, "বৈধর্ম্ম্য হেতু"ও হইতে পারে। ভাষ্যকার "শেষবৎ" অনুমানের যাহা উদাহরণ দেখাইয়া আসিয়াছেন, উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহা গ্রহণ করেন নাই (পঞ্চম সূত্রভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, "শেষবৎ" অনুমান "ব্যতিরেকী" অনুমানেরই নামান্তর। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত "শেষবতে"র উদাহরণটি "অন্বয়-ব্যতিরেকী", সুতরাং উহা গ্রাহ্য নহে। ভাষ্যকার কিন্তু "পরিশেষ" অনুমানকেই "শেষবৎ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই স্থলীয় হেতু উদাহরণানুসারে "সাধর্ম্ম্য হেতু"ও হইতে পারে, "বৈধর্ম্ম্য হেতু"ও হইতে পারে। ফলকথা, "পরিশেষ" অনুমান বা ভাষ্যকার-ব্যাখ্যাত "শেষবৎ" অনুমান সর্ব্বত্র "ব্যতিরেকী" অনুমানই হইবে, অর্থাৎ উহা "ব্যতিরেকী" অনুমানেরই নামান্তর, ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হয় নাই। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে তাঁহার ঐ উদাহরণ অসংগত হয় নাই।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথও হেতুবাক্যকে "অন্বয়ী" ও "ব্যতিরেকী" নামে দ্বিবিধ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সূত্রের "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা "অন্বয়ব্যাপ্তি" এবং "বৈধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা "ব্যতিরেকব্যাপ্তি" ফলিতার্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রদ্বয়ের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির ভেদেই হেতু দ্বিবিধ। এক হেতুতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে, সেই স্থলীয় হেতুবাক্যের নাম "অন্বয়ব্যতিরেকী", মহর্ষি-সূত্রে তাহাও সূচিত হইয়াছে; ইহা মতান্তর বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বৃত্তিকারের নিজের মত নহে।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট এখানে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয়াই হেতুবাক্যের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। হেতুপদার্থ কি, তাহা বলা প্রয়োজন এবং হেতুপদার্থের স্বরূপ বুঝিলে হেতুবাক্যের লক্ষণ সহজেই বুঝা যাইবে এবং "অবয়ব" প্রকরণ-বশতঃ শেষে তাহাই বুঝিতে হইবে। হেতুপদার্থের লক্ষণপক্ষে কেহ কেহ হেতুলক্ষণসূত্রদ্বয়ে পঞ্চমী বিভক্তি ত্যাগ করিয়া, ঐ স্থলে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত সূত্র পাঠ করিতেন, এই কথা বলিয়া জয়ন্ত ভট্ট হেতু পদার্থের লক্ষণপক্ষেও সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির কথঞ্চিৎ সংগতি ও আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন।

জয়ন্তভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম অনুমানসূত্রে (পঞ্চম সূত্রে) "তৎপূর্ব্বকং" এই কথার দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র সূচনা করিয়াছেন। এখানে হেতুলক্ষণসূত্রে "সাধ্য-সাধন" শব্দের দ্বারা ঐ "ব্যাপ্তি"র স্বরূপও সূচনা করিয়াছেন এবং "হেত্বাভাস"কে পঞ্চবিধ বলিয়া "ব্যাপ্তি" পঞ্চবিধ, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। এক একটি "ব্যাপ্তি"র অভাবেই এক একটি "হেত্বাভাস" হওয়ায়, "হেত্বাভাস" পঞ্চবিধ হইয়াছে। "হেত্বাভাসে"র কোন লক্ষণ না থাকাই "ব্যাপ্তি"। তাহাই হেতুর সাধ্যসাধনতা। যাহা সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট,

তাহাই প্রকৃত হেতু। "হেত্বাভাস" পদার্থে সাধ্যসাধনতা অর্থাৎ সাধ্যের "ব্যাপ্তি" নাই, এ জন্য সেগুলি হেতু নহে। ফলকথা, মহর্ষি হেতুলক্ষণসূত্রে "সাধ্যসাধন" শব্দের দ্বারা "ব্যাপ্তি"কেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং হেতু পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ব্ব সূত্রে "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ" এই কথার দ্বারা এবং এই সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে "অন্বয়ব্যতিরেকী" ও "কেবলব্যতি-রেকী" হেতুর বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন। "কেবলান্বয়ী" নামে কোন হেতু নাই; মহর্ষি তাহা বলেন নাই। কোন সম্প্রদায় একমাত্র "অন্বয়ব্যতিরেকী" হেতুই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম দুই সূত্রের দ্বারা "অন্বয়ব্যতিরেকী" হেতুরই লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, "কেবলান্বয়ী" এবং "কেবলব্যতিরেকী" নামে কোন প্রকার হেতু নাই, উহা স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা "অন্বয়" এবং পরসূত্রের দ্বারা "ব্যতিরেক" নিরূপণ করিয়া দুই সূত্রে এক বাক্যে "অন্বয়ব্যতিরেকী" হেতুরই নিরূপণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কারণ, ভাষ্যকার "কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি, নেত্যুচ্যতে" এই কথার দ্বারা এই সূত্রের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বসূত্রের সহিত এই সূত্রের একবাক্যভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উভয় সূত্রে তিনি হেতুবাক্যের একই প্রকার উদাহরণ বলিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত হেতুবাক্যটি দ্বিবিধ উদাহরণের যোগে "অন্বয়ব্যতিরেকী"। সুতরাং বুঝা যায়, ভাষ্যকারও একমাত্র "অন্বয়ব্যতিরেকী" হেতুই মহর্ষির সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জয়ন্তভট্ট এই মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "কেবলব্যতিরেকী" হেতু অবশ্য স্বীকার্য্য, নচেৎ আত্মা প্রভৃতি পদার্থসাধন সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বে (অনুমান-সূত্র ভাষ্যে) আত্মার অনুমানে "কেবলব্যতিরেকী" হেতুকেই আশ্রয় করিয়াছেন, সুতরাং "কেবলব্যতিরেকী" হেতু ভাষ্যকারেরও সম্মত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা ভাষ্যকার সেই "কেবল-ব্যতিরেকী" হেতুরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতেই হইবে। ফলকথা, জয়ন্তভট্ট "কেবল-ব্যতিরেকী" হেতুর সমর্থন করিয়া হেতুকে "অন্বয়ব্যতিরেকী" এবং "কেবলব্যতিরেকী" এই নামদ্বয়ে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। "কেবলান্বয়ী" বা "অন্বয়ী" নামে কোন হেতু বা অনুমান মানেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষি দুই সূত্রের দ্বারা একযোগে একপ্রকার হেতুর লক্ষণই বলেন নাই। একমাত্র লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য হইলে, তিনি এক সূত্রের দ্বারাই তাহা বলিতেন। মহর্ষি অন্যত্রও দুই সূত্রের দ্বারা একমাত্র লক্ষণ বলেন নাই। পরন্তু ভাষ্যকারের মতে হেতু যে দ্বিবিধ, ইহা নিগমন-সূত্রভাষ্যে স্পষ্ট আছে, সুতরাং ভাষ্যকার হেতুকে একপ্রকার বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা কখনই বলা যায় না। এবং নিগমন-সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার পৃথক্‌ভাবে দ্বিবিধ হেতুবাক্যের প্রয়োগ প্রদর্শন করায়, তিনি যে একই স্থলে "অন্বয়ব্যতিরেকী" নামে একপ্রকার হেতুবাক্যই এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। (নিগমনসূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার "অন্বয়-ব্যতিরেকী" নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু মানেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জয়ন্ত-ভট্টের সূত্র ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, হেতুপদার্থের লক্ষণ পক্ষে সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির সম্যক্

সংগতি হয় না। পরন্তু "অবয়ব" প্রকরণবশতঃ এখানে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই মহর্ষির মুখ্য বক্তব্য, সুতরাং এই দুই সূত্রের দ্বারা প্রকরণানুসারে হেতুবাক্যের লক্ষণই মুখ্যতঃ বুঝিতে হইবে। তাহাতে হেতুপদার্থের স্বরূপ এবং ভেদও বুঝা যাইবে। প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও হেতুবাক্যের লক্ষণ পক্ষেই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া ইহার দ্বারাই হেতুপদার্থের স্বরূপও প্রকটিত হইয়াছে, ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। হেতুবাক্যে যে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়, ঐ পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই সেখানে হেতুপদার্থের হেতুত্ব বা জ্ঞাপকত্ব বুঝা যায়। পঞ্চমী বিভক্তির[১] ঐরূপ অর্থে "নিরূঢ়লক্ষণা" থাকায় হেতুবাক্যে পঞ্চমী বিভক্তিরই প্রয়োগ করিতে হইবে।

"তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, হেতুবাক্যস্থলে সর্ব্বত্র হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে লক্ষণাই বাদীর অভিপ্রেত। কারণ, হেতুপদার্থের জ্ঞানই বস্তুতঃ অনুমানে হেতু হইয়া থাকে। হেতুপদার্থ অনুমানের হেতু হয় না। সুতরাং পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ যে হেতুত্ব, তাহাতে হেতু-পদার্থের অন্বয় সম্ভব নহে বলিয়া, হেতুবোধক শব্দের দ্বারা লক্ষণার সাহায্যে হেতুজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা সেখানে "জ্ঞাপ্যত্ব" বুঝিতে হইবে। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে "ধূমাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য বলিলে, সেখানে "ধূম" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—ধূমজ্ঞান। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে—জ্ঞাপ্যত্ব, ধূমজ্ঞান বহ্নির জ্ঞান জন্মায়, এ জন্য ধূমজ্ঞানটি জ্ঞাপক, বহ্নি তাহার জ্ঞাপ্য। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের মিলনে উহার দ্বারা বুঝা যাইবে—"ধূমজ্ঞানের জ্ঞাপ্য যে বহ্নি, সেই বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত"। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মিলনে একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ জন্মে, এই প্রাচীন মত স্বীকার না করিলেও "প্রতিজ্ঞা" ও "হেতুবাক্যে"র একবাক্যতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি হেতুবাক্যস্থ হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে লক্ষণা স্বীকার করেন নাই। তিনি গঙ্গেশের ঐ মতের অপরিহার্য্য অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। রঘুনাথ নব্য মত বলিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন হেতুবাক্যস্থ পঞ্চমী বিভক্তিতেও লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে, তখন ঐ পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই লক্ষণার সাহায্যে "জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব"রূপ অর্থ বুঝিয়া "প্রতিজ্ঞা" ও "হেতুবাক্যে"র মিলনে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বোধ হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বত্র হেতুবাক্যস্থ পঞ্চমী বিভক্তিতেই "জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব"রূপ অর্থে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। হেতু-বোধক শব্দের দ্বারা হেতুপদার্থই বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন মতে সর্ব্বত্র হেতুবাক্যস্থ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ হেতুত্ব বা সাধনত্ব। উহার ফলিতার্থ—জ্ঞাপকত্ব। ঐ জ্ঞাপকত্বের সহিত হেতুপদার্থ ও সাধ্য ধর্ম্মের সম্বন্ধবিশেষে অন্বয় বোধই প্রাচীন-দিগের সম্মত। সুতরাং "ধূমাৎ" এইরূপ বাক্যের দ্বারা ধূমরূপ হেতু পদার্থের যে জ্ঞাপকত্ব, তাহা বুঝা যায়, অর্থাৎ "ধূম জ্ঞাপক" ইহা বুঝা যায়। তাহাতেই মধ্যস্থের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয়। জ্ঞাপকত্ব বলিতে এখানে জ্ঞানজনক জ্ঞানের বিষয়ত্ব। সুতরাং উহা হেতু পদার্থেই থাকে।

১। হেতুত্বাদৌ পঞ্চমী লাক্ষণিকী।—অবয়বদীধিতি। হেতুত্বং জ্ঞাপকত্বং আদিনা জ্ঞাপ্যত্বাদেঃ পরিগ্রহঃ—জাগদীশী।

ভাষ্যকারের প্রদর্শিত "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারা উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক, ইহা বুঝা যায়। ৩৫।

সূত্র। সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্॥৩৬॥

অনুবাদ। সাধ্যধর্ম্মীর সহিত সমানধর্ম্ম প্রযুক্ত সেই সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্মটি যেখানে বিদ্যামান থাকে, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ, (সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য)।

বিবৃতি। যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া যে ধর্ম্মীকে অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে হইবে সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম্মীকে বলে "সাধ্যধর্ম্মী" এবং সেই ধর্ম্মীতে সেই ধর্ম্মটিকে বলে "সাধ্যধর্ম্ম"। "সাধ্য" বলিলে এই সাধ্য ধর্ম্মী অথবা এই "সাধ্যধর্ম্ম"কে বুঝিতে হইবে। যেমন নৈয়ায়িক শব্দরূপ ধর্ম্মীকে অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে গেলে, সেখানে অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দই নৈয়ায়িকের "সাধ্যধর্ম্মী" এবং ঐ অনিত্যত্ব ধর্ম্মই "সাধ্যধর্ম্ম"। নৈয়ায়িক প্রথমতঃ (১) "শব্দ অনিত্য", এই কথার দ্বারা ঐ সাধ্যধর্ম্মীকে প্রকাশ করিবেন। উহাই তাঁহার "সাধ্যনির্দ্দেশ", উহারই নাম "প্রতিজ্ঞা"। পরে শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহার জ্ঞাপক কি ? এই প্রশ্নানুসারে নৈয়ায়িক বলিবেন,—(২) উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্মটি শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক। নৈয়ায়িকের এই দ্বিতীয় বাক্যই (উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক) তাহার হেতুবাক্য।

যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, উৎপত্তি তাহাদিগের ধর্ম্ম। সুতরাং সেই সকল পদার্থকে "উৎপত্তিধর্ম্মক" বলা যায়। তাহা হইলে সেই সকল পদার্থে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" নামে ধর্ম্ম আছে, এ কথাও বলা যায়। নৈয়ায়িকের বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা অনিত্য পদার্থ। শব্দের যখন উৎপত্তি হয়, তখন শব্দও অনিত্য পদার্থ, শব্দ কখনই নিত্য পদার্থ হইতে পারে না। উৎপত্তি হইলেই যে সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা বুঝিব কিরূপে ? এ জন্য নৈয়ায়িক শেষে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। নৈয়ায়িক বলিবেন যে, (৩) "যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা অনিত্য ; যেমন স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য"। নৈয়ায়িকের ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেগুলিকে ত অনিত্যই দেখা যায়। ঐ যে কুম্ভকারগণ স্থালী প্রভৃতি (হাড়ী কলস প্রভৃতি) প্রস্তুত করিতেছে, ঐগুলি কি নিত্য পাদর্থ ? ঐগুলি ত সর্ব্বসম্মত অনিত্য পদার্থ। উহাদিগের উৎপত্তি হইতেছে, সুতরাং উহারা উৎপত্তিধর্ম্মক। তাহা হইলে ঐ সকল দৃষ্টান্তেই বুঝা গেল যে, উৎপত্তিধর্ম্মক হইলেই সে পদার্থ অনিত্য হইবে। অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব সাধন এবং অনিত্যত্ব তাহার সাধ্যধর্ম্ম, ইহা ঐ সকল দৃষ্টান্তেই বুঝা গিয়াছে। নৈয়ায়িকের ঐ তৃতীয় বাক্যের নাম "উদাহরণ-বাক্য"। এই স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" এই ধর্ম্মটি নৈয়ায়িকের সাধ্যধর্ম্মী অনিত্য শব্দ এবং স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত,—এই উভয়েই আছে ;

কোন নিত্য পদার্থে নাই, এ জন্য ঐ ধর্ম্মটি সাধ্যধর্ম্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের "সাধর্ম্ম্য" বা সমান ধর্ম্ম। ঐ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মটি আছে বলিয়া, স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে অনিত্যত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ফলিতার্থ এই যে, ঐ উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব থাকিলেই সেখানে অনিত্যত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, ইহা ঐ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে; তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তের বোধক পূর্ব্বোক্ত প্রকার তৃতীয় বাক্য নৈয়ায়িকের "উদাহরণ-বাক্য" হইবে। ঐ উদাহরণ-বাক্য পূর্ব্বোক্তরূপ সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত বলিয়া উহাকে বলে "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য।"

ভাষ্য। সাধ্যেন সাধর্ম্ম্যং সমানধর্ম্মতা, সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ কারণাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত ইতি। তস্য ধর্ম্মস্তদ্ধর্ম্মঃ। তস্য, সাধ্যস্য। সাধ্যঞ্চ দ্বিবিধং,—ধর্ম্মিবিশিষ্টো বা ধর্ম্মঃ শব্দস্যানিত্যত্বং, ধর্ম্মবিশিষ্টো বা ধর্ম্মী, অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ইহোত্তরং তদ্গ্রহণেন গৃহ্যত ইতি। কস্মাৎ ? পৃথগ্ধর্ম্মবচনাৎ। তদ্ধর্ম্মস্য ভাবস্তদ্ধর্ম্মভাবঃ, স যস্মিন্ দৃষ্টান্তে বর্ত্ততে স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধর্ম্ম্যাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী ভবতি, স চোদাহরণমিষ্যতে। তত্র যদুৎপদ্যতে তদুৎপত্তিধর্ম্মকং, তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি আত্মানং জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম্। এবমুৎপত্তিধর্ম্মকত্বং সাধনমনিত্যত্বং সাধ্যং, সোঽয়মেকস্মিন্ দ্বয়োর্ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ সাধর্ম্ম্যাদ্ব্যবস্থিত উপলভ্যতে, তং দৃষ্টান্তে উপলভমানঃ শব্দেঽপ্যনুমিনোতি, শব্দোঽপ্যুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ স্থাল্যাদিবদিতি।

উদাহ্রিয়তে তেন ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাব ইত্যুদাহরণম্।

অনুবাদ। সাধ্যধর্ম্মীর সহিত অর্থাৎ যে ধর্ম্মীকে কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মীর সহিত সাধর্ম্ম্য কি না—সমান-ধর্ম্মতা অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম। সাধ্যসাধর্ম্ম্যরূপ প্রয়োজকবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীর সমান ধর্ম্মটি আছে বলিয়া, সেই সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্মটি (সাধ্যধর্ম্মটি) যেখানে বিদ্যমান আছে, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। ("তদ্ধর্ম্মভাবী" এই সূত্রোক্ত বাক্যের পদার্থ বর্ণন-পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতেছেন)। তাহার ধর্ম্ম "তদ্ধর্ম্ম"। তাহার কি না—সাধ্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীর। "সাধ্য" কিন্তু দ্বিবিধ, (১) ধর্ম্মিবিশিষ্ট ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন ধর্ম্মিগত কোন ধর্ম্ম, (যেমন) শব্দের অনিত্যত্ব অর্থাৎ শব্দরূপ ধর্ম্মিগত অনিত্যত্বধর্ম্ম। (২) অথবা ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী (যেমন) অনিত্য শব্দ অর্থাৎ অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট শব্দরূপ ধর্ম্মী। এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা উত্তরটি

অর্থাৎ শেষোক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিরূপ সাধ্য বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) "ধর্ম্ম" শব্দের পৃথক্ উল্লেখবশতঃ। অর্থাৎ সূত্রে "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই স্থলে "তৎ" শব্দের দ্বারা যদি সাধ্য ধর্ম্ম বুঝানই মহর্ষির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আর "ধর্ম্ম" শব্দ পৃথক্ বলিতেন না, "তদ্‌ভাবী" এইরূপই বলিতেন। তদ্ধর্ম্মের ভাব "তদ্ধর্ম্মভাব"। তাহা অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে সাধ্যধর্ম্ম, তাহার ভাব কি না —বিদ্যমানতা যে দৃষ্টান্ত পদার্থে আছে, সেই দৃষ্টান্ত (প্রদর্শিত স্থলে) উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ সাধ্যসাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী" আছে। (অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্ম আছে, উহা সাধ্যধর্ম্মী অনিত্য শব্দেও আছে, সুতরাং ঐ ধর্ম্মটি শব্দ ও স্থালী প্রভৃতির সমান ধর্ম্ম এবং ঐ ধর্ম্মটি থাকিলেই সেখানে অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম থাকে, ইহা স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে। এ জন্য পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে অনিত্যত্ব, তাহার ভাব কি না—বিদ্যমানতা ঐ দৃষ্টান্তে আছে)। তাহাই অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্তবোধক বাক্যবিশেষই উদাহরণ বলিয়া অর্থাৎ "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য" বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে।

সেই স্থলে অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও যে কোনরূপে বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না (এবং) আত্মাকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে ত্যাগ করে, নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না, এজন্য অনিত্য। এইরূপ হইলে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতু, অনিত্যত্ব সাধ্যধর্ম্ম। ধর্ম্মদ্বয়ের অর্থাৎ অনিত্যত্ব এবং উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব এই দুইটি ধর্ম্মের সেই এই সাধ্য-সাধন-ভাব সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত ব্যবস্থিত বলিয়া এক পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে উপলব্ধি করে। তাহাকে অর্থাৎ ঐ দুইটি ধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধন ভাবকে দৃষ্টান্ত পদার্থে উপলব্ধিকরতঃ শব্দেও অনুমান করে। (কিরূপ অনুমান করে, তাহা বলিতেছেন) শব্দও উৎপত্তিধর্ম্মক বলিয়া স্থালী প্রভৃতির ন্যায় (হাড়ী কলস প্রভৃতি উৎপত্তি-ধর্ম্মক বস্তুর ন্যায়) অনিত্য।

তাহার দ্বারা অর্থাৎ সেই বাক্যবিশেষের দ্বারা ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্যসাধন-ভাব উদাহৃত (প্রদর্শিত) হয়, এজন্য "উদাহরণ" অর্থাৎ "উদাহরণ" শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে—উদাহরণ-বাক্য এবং উহার দ্বারাই উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

টিপ্পনী। "প্রতিজ্ঞা"-বাক্যের পরেই "হেতু"-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া সেই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারণ, যাহা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিশূন্য বা ব্যভিচারী পদার্থ, তাহা হেতু হয় না। ঐ ব্যাপ্তি প্রদর্শন উদাহরণ-বাক্য ব্যতীত হয় না, এ জন্য মহর্ষি হেতু-বাক্যের লক্ষণের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত "উদাহরণ-বাক্যের" লক্ষণ বলিয়াছেন। "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থও বুঝা যায়; কিন্তু এখানে "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা "উদাহরণ-বাক্য" বুঝিতে হইবে। কারণ, মহর্ষি "উদাহরণ" নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। "অবয়ব" বাক্যবিশেষ, সুতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ "অবয়ব" হইতে পারে না। যে বাক্যের দ্বারা দুইটি ধর্ম্মের সাধ্যসাধন-ভাব উদাহৃত অর্থাৎ প্রদর্শিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ "উদাহরণ" শব্দের দ্বারাই সূত্রে "উদাহরণ" নামক তৃতীয় অবয়বের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকারও সর্ব্বশেষে সূত্রোক্ত "উদাহরণ" শব্দের পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া, মহর্ষি-সূচিত উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এই উদাহরণ-বাক্য দ্বিবিধ;—"সাধর্ম্ম্যোদাহরণ" এবং "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ"। উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ যথাক্রমে ইহাকেই বলিয়াছেন—"অন্বয়ী উদাহরণ" এবং "ব্যতিরেকী উদাহরণ"। উদাহরণের দ্বিবিধত্ব বিষয়ে সকলেই একমত। "হেতু"কে ত্রিবিধ বলিলেও "উদাহরণকে" কেহই ত্রিবিধ বলেন নাই। উদাহরণ-বাক্য-বোধ্য দৃষ্টান্ত পদার্থও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বিবিধ। দৃষ্টান্ত পদার্থ কাহাকে বলে, মহর্ষি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এখানে সেই দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্যবিশেষকেই "উদাহরণ-বাক্য" বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত পদার্থ কখনই উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে না, মহর্ষি তাহা বলিতে পারেন না, সুতরাং সূত্রে "দৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—দৃষ্টান্তবোধক বাক্য। প্রাচীন ভাষায় এইরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতিও এখানে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ"-বাক্যের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। কিরূপ দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্যবিশেষ "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ" হইবে, তাহা বলিবার জন্য মহর্ষি বলিয়াছেন—"সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্তঃ"। ভাষ্যকার "সাধ্যেন সাধর্ম্ম্যং" এই কথার দ্বারা সংক্ষেপে ঐ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে স্বপদ বর্ণনার দ্বারা সূত্রের বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন।

যাহা অনুমানের দ্বারা সাধন করিতে হইবে, তাহাকে বলে "সাধ্য"। শব্দগত অনিত্যত্ব ধর্ম্মও "সাধ্য" হইতে পারে, আবার অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দও সাধ্য হইতে পারে। শব্দ সিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনিত্য বলিয়া সর্ব্বসিদ্ধ নহে। কারণ, মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নৈয়ায়িক মীমাংসকের সহিত বিচারে শব্দকে অনিত্য বলিয়া সাধন করিতে গেলে, অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দকেও "সাধ্য" বলা যায়। মহর্ষি প্রায় সর্ব্বত্রই এই অভিপ্রায়ে "সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী" অর্থেই "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে "সাধ্য"কে দ্বিবিধ বলিয়া অর্থাৎ কোন ধর্ম্মিগত ধর্ম্ম, অথবা সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম্মী, এই উভয় অর্থেই "সাধ্য" শব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া মহর্ষির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সূত্রে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিরূপ সাধ্যকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, উৎপত্তি-

ধর্ম্মকত্ব প্রভৃতি হেতু পদার্থ তাহারই সাধর্ম্ম্য হইতে পারে, সাধ্যধর্ম্মের সাধর্ম্ম্য হইতে পারে না ; কোন স্থলে হইলেও সেইরূপ সাধর্ম্ম্য এখানে বিবক্ষিত নহে। যে ধর্ম্মীকে কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের যেটি সমান ধর্ম্ম, তাহাই এখানে "সাধ্যসাধর্ম্ম্য"। ফলিতার্থ এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধর্ম্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের যাহা কেবল মাত্র সাধর্ম্ম্য (বৈধর্ম্ম্য নহে), তাহাই এই সূত্রে "সাধ্যসাধর্ম্ম্য"। এখানে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা যদি ধর্ম্মিরূপ সাধ্যই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই স্থলে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মিরূপ সাধ্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পদার্থ ই বুঝিতে হয়। উদ্যোতকর প্রভৃতি এইরূপ যুক্তির দ্বারা সূত্রোক্ত "তৎ" শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিলেও যদি কেহ পরবর্ত্তী বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির ন্যায়[১] "সাধর্ম্ম্য" শব্দের অন্যরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেন এবং "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই স্থলে "তদ্ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা তাহার ধর্ম্ম না বুঝিয়া, সেই সাধ্যরূপ ধর্ম্মকেই বুঝেন এবং সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে সে ব্যাখ্যা সংগত নহে, এত দুর চিন্তা করিয়া ভাষ্যকার একটি বিশেষ যুক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের সে যুক্তির মর্ম্ম এই যে, যদি সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মই মহর্ষির বিবক্ষিত হইত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী "সাধ্য" শব্দের দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে আর "ধর্ম্ম" শব্দের পৃথক্ উল্লেখ করিতেন না। "তদ্‌ভাবী" এইরূপ কথা বলিলেই মহর্ষির বক্তব্য বলা হইত। মহর্ষি যখন "তদ্‌ভাবী" না বলিয়া "তদ্ধর্ম্মভাবী" এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়, "তৎ" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীই তাঁহার বিবক্ষিত। "তদ্ধর্ম্ম" বলিতে সেই সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম। "তদ্ধর্ম্ম" বলিতে সেই সাধ্যরূপ ধর্ম্ম বুঝিলে, সে পক্ষে "ধর্ম্ম" শব্দের প্রকৃত সার্থকতা থাকে না, ইহাই ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য। এখানে ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা মহর্ষি যে সাধ্যধর্ম্মকেও "সাধ্য" বলেন অর্থাৎ তাঁহার "সাধ্য" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্ম অর্থও কোন স্থলে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহা ভাষ্যকারেরও মত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা না হইলে এখানে ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রোক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা ধর্ম্মিরূপ সাধ্যই বুঝিতে হইবে, এই কথা বলিতে এবং তাহার হেতু দেখাইতে গিয়াছেন কেন ? যাহার দ্বারা অর্থ গ্রহণ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে প্রাচীনগণ শব্দ অর্থেও "গ্রহণ" শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ভাষ্যে "তদ্‌গ্রহণ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে তৎ শব্দ।

এখন মূল কথা এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধর্ম্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের যাহা কেবলমাত্র সাধর্ম্ম্য (বৈধর্ম্ম্য নহে), তাহাই সূত্রোক্ত "সাধ্যসাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্ম্মী। স্থালী প্রভৃতি সর্ব্বসম্মত অনিত্য পদার্থগুলি দৃষ্টান্ত। ঐ সকল পদার্থের উৎপত্তি মীমাংসকও মানেন। নৈয়ায়িক শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক বহু বিচার দ্বারা শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব"

১। সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসহচরিত-ধর্ম্মাৎ প্রকৃতসাধনাদিত্যর্থঃ। তৎ সাধ্যরূপং ধর্ম্মং ভাবয়তি, তথাচ সাধন-বত্তাপ্রযুক্ত-সাধ্যবত্তানুভাবকোঽবয়বঃ সাধ্যসাধনব্যাপ্ত্যপদর্শকোদাহরণমিতি যাবৎ।—বিশ্বনাথবৃত্তি।

ধর্ম্মটি প্রদর্শিত স্থলে সাধ্যধর্ম্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম্ম। স্থালী প্রভৃতি অনিত্য কোন পদার্থে ঐ ধর্ম্মের অভাবও নাই; সুতরাং উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব ধর্ম্মটি প্রদর্শিত স্থলে সূত্রোক্ত "সাধ্যসাধর্ম্ম্য" হইয়াছে। ঐ উৎপত্তিধর্ম্মক বলিয়া স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যেও অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক হইলেই সেখানে অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, ইহা স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যে বুঝা গিয়াছে। তাহা হইলে এখানে ঐ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তকে সূত্রোক্ত "সাধ্য-সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত তদ্ধর্ম্মভাবী" বলা যাইতে পারে। ঐরূপ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য-বিশেষই এখানে সূত্রানুসারে "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে বাক্যে সাধ্যসাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবিত্ব" প্রদর্শিত হয়, ঐ বাক্যই "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে, ঐরূপ বাক্য না হইলে হইবে না, ইহাই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা সূচিত হইয়াছে। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা এখানে প্রযোজকত্ব অর্থই বুঝিতে হইবে। "সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ" এই কথার অর্থ সাধ্যসাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত। এই প্রযোজকতা কি? তাহা ভাবিয়া বুঝা উচিত। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, উহার ফলিতার্থ এখানে ব্যাপ্যতা। তাহা ভিন্ন আর কোন অর্থ এখানে সংগত হয় না। তাহা হইলে বুঝা গেল, সাধ্য-সাধর্ম্ম্যটি ব্যাপ্য। প্রকৃত স্থলে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বই "সাধ্যসাধর্ম্ম্য" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনিত্যত্ব-ধর্ম্মটি তাহার ব্যাপক। অনিত্যত্বই প্রকৃতস্থলে সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম। সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য না হইলে তাহা হেতুপদার্থই হয় না। "যাহা যাহা উৎপত্তি-ধর্ম্মক, তাহা অনিত্য,—যেমন স্থালী প্রভৃতি", এইরূপ বাক্যের দ্বারা উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব ধর্ম্মটি অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য, অনিত্যত্ব ধর্ম্ম তাহার ব্যাপক, ইহা অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব প্রদর্শিত হয়, এ জন্য ঐরূপ বাক্য "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে। সূত্রে "সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ" এবং "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই দুইটি কথার দ্বারা সাধনশূন্য পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মশূন্য পদার্থ এবং যেখানে সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহা সূচিত হইয়াছে। সে সকল পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলে, তাহা "দৃষ্টান্তাভাস" হইবে, "দৃষ্টান্ত" হইবে না, সুতরাং সেই সকল পদার্থবোধক বাক্যবিশেষ প্রয়োগ করিলে তাহা "উদাহরণাভাস" হইবে, "উদাহরণ-বাক্য" হইবে না। এই সূত্রে "তদ্ধর্ম্মভাবী" এই কথার ব্যাখ্যায় প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল।[১] উদ্দ্যোতকরের চরম ব্যাখ্যানুসারে তাৎপর্য্য-টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তদ্ধর্ম্মরূপ ভাব পদার্থ যেখানে বিদ্যমান আছে, তাহাই "তদ্ধর্ম্ম-ভাবী"। উদ্দ্যোতকর ঐ স্থলে "ভাব"শব্দের দ্বারা ভাব পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন, তাহারও কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তদ্ধর্ম্মের ভাবই "তদ্ধর্ম্মভাব"। "অস" ধাতুনিষ্পন্ন "ভাব" শব্দের অর্থ এখানে বিদ্যমানতা। উদ্দ্যোতকর এখানে ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"স যস্মিন্ দৃষ্টান্তে ভবতি বিদ্যতে"। উৎপত্তি-

১। "তদ্ধর্ম্মং ভাবয়িতুং বোধয়িতুং শীলমস্য" অর্থাৎ যাহা সাধ্য সাধর্ম্ম্যরূপ হেতু পদার্থ প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের বোধক, এইরূপ প্রাচীন ব্যাখ্যা উদ্দ্যোতকর খণ্ডন করিয়াছেন। নবীন বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কিন্তু ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ধর্ম্মকত্ব প্রযুক্ত স্থালী প্রভৃতিতে অনিত্যত্ব ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। তাই উদ্যোতকর "ভবতি" এই কথা বলিয়া তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বিদ্যতে"। অর্থাৎ উদ্যোতকর "ভবতি" এই স্থলে বিদ্যমানতা অর্থেই "ভূ" ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও শেষে এখানে "তদ্ধর্ম্মভাবী ভবতি" এইরূপ কথা লিখিয়াছেন; সুতরাং বিদ্যমানতা অর্থে "ভূ" ধাতুর প্রয়োগ তিনিও করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ঐরূপ প্রয়োগ করিতেন।

উৎপত্তিধর্ম্মক কাহাকে বলে এবং তাহা অনিত্য হয় কেন? অনিত্য বলিতে এখানে কি বুঝিতে হইবে? ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে "উৎপত্তিধর্ম্মক" বলে। ঐরূপ পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না এবং উৎপত্তির পরে কোন দিন আত্মত্যাগ করে। আত্মত্যাগ করে, এই কথারই পুনর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহা নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয়। যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না এবং উৎপন্ন হইয়াও চিরকাল থাকে না, তাহাই এখানে অনিত্য বলিতে বুঝিতে হইবে। শব্দ উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না এবং শব্দের অত্যন্ত বিনাশ হয়, ইহাই শব্দ অনিত্য—এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা নৈয়ায়িক প্রকাশ করিয়াছেন। উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুমাত্রই যখন উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না এবং কোন কালে তাহার বিনাশ হইবেই—ইহা নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত, তখন নৈয়ায়িক উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব পদার্থকে অনিত্যত্ব সাধনে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

আপত্তি হইতে পারে যে, "ধ্বংস" নামক অভাবের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহার ধ্বংস হইতে পারে না, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত অনিত্যত্ব "ধ্বংস" পদার্থে না থাকায়, অনিত্যত্বের অনুমানে ভাষ্যকার "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব"কে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না; কারণ, উহা অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। এতদুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, উৎপত্তিধর্ম্মক ভাব পদার্থমাত্রই অনিত্য, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ প্রাচীনগণ উৎপত্তি পদার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সেই উৎপত্তি কেবল ভাব পদার্থেরই ধর্ম্ম হয়। বস্তুর প্রথম ক্ষণে তাহার কারণের সহিত সমবায় সম্বন্ধই যদি এখানে "উৎপত্তি" পদার্থ বলিয়া ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উহা ধ্বংসে না থাকায় তাঁহার হেতু ব্যভিচারী হয় নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব"ই চরম হেতু নহে। ঐ হেতুতে পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যভিচারের আপত্তি করিয়া মহর্ষি গোতমই তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং মহর্ষি অন্য হেতুরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা প্রকটিত হইবে। (২ অঃ, ২ আঃ, ১৩।১৪।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য) ॥৩৬॥

সূত্র। তদ্বিপর্য্যয়াদ্বাবিপরীতম্ ॥৩৭॥

অনুবাদ। তাহার বিপর্য্যয়প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত বিপরীত (অতদ্ধর্ম্মভাবী) দৃষ্টান্তও অর্থাৎ ঐরূপ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য-বিশেষও উদাহরণ (বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য)।

বিবৃতি। যেখানে যেখানে হেতু আছে, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম্ম আছে, ইহা যে দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, অনুমানস্থলে সেই দৃষ্টান্তকে বলে "সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত" এবং "অন্বয়দৃষ্টান্ত"। ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ হইবে "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" এবং যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম্ম নাই অথবা যেখানে যেখানে সাধ্যধর্ম্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই হেতু নাই, ইহা যে দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, অনুমানস্থলে তাহাকে বলে "বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত" ও "ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত"। ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষকে বলে "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য"। যেমন প্রদর্শিত স্থলে "যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক নহে, সেগুলি অনিত্য নহে—যেমন আত্মা প্রভৃতি" এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে। এই স্থলে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সাধর্ম্ম্য। তাহার অভাব অর্থাৎ "অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব" সাধ্যধর্ম্মী শব্দের বৈধর্ম্ম্য। উহা আত্মাদি নিত্য পদার্থে আছে, সেখানে সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্ব নাই, তাহা হইলে ঐ স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্ত সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত "বিপরীত" অর্থাৎ "তদ্ধর্ম্মভাবী" নহে, "অতদ্ধর্ম্মভাবী"। সুতরাং ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ ঐ স্থলে "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে।

ভাষ্য। দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং। সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাদতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি। অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকং নিত্যমাত্মাদি। সোঽয়মাত্মাদির্দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাদনুৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাদতদ্ধর্ম্মভাবী, যোঽসৌ সাধ্যস্য ধর্ম্মোঽনিত্যত্বং, স তস্মিন্ ন ভবতীতি। অত্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্যাভাবাদনিত্যত্বং ন ভবতীতি উপলভমানঃ শব্দে বিপর্য্যয়মনুমিনোতি উৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্য ভাবা-দনিত্যঃ শব্দ ইতি।

সাধর্ম্ম্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। বৈধর্ম্ম্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাদতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। পূর্ব্বস্মিন্ দৃষ্টান্তে যৌ তৌ ধর্ম্মৌ সাধ্যসাধনভূতৌ পশ্যতি, সাধ্যেঽপি তয়োঃ সাধ্যসাধনভাবমনুমিনোতি। উত্তরস্মিন্ দৃষ্টান্তে যয়োর্ধর্ম্ময়ো-রেকস্যাভাবাদিতরস্যাভাবং পশ্যতি, তয়োরেকস্য ভাবা[১]দিতরস্য ভাবং

[১]। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্য-পুস্তকেই এখানে "তয়োরেকস্যাভাবাদিতরস্যাভাবং সাধ্যেঽনুমিনোতি" এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠ সংগত হয় না। একের ভাবপ্রযুক্ত অপরের ভাবকে অনুমান করে, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য এবং তাহাই প্রকৃত কথা। ভাষ্যকার ইহার পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—"শব্দে বিপর্য্যয়মনুমিনোতি উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বস্য ভাবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি"। সুতরাং এখানেও "একস্য ভাবাদিতরস্য ভাবং সাধ্যেঽনুমিনোতি" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইল।

সাধ্যেঽনুমিনোতীতি। তদেতদ্ধেত্বাভাসেষু ন সম্ভবতীত্যহেতবো হেত্বাভাসাঃ। তদিদং হেতূদাহরণয়োঃ সামর্থ্যং পরমসূক্ষ্মং দুঃখবোধং পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি।

অনুবাদ। "দৃষ্টান্ত উদাহরণং" এই কথাটি প্রকৃত (প্রকরণলব্ধ) অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে ঐ অংশের এই সূত্রে অনুবৃত্তি বুঝিতে হইবে। (তাহা হইলে সূত্রার্থ হইল) সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃত হেতু পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত "অতদ্ধর্ম্মভাবী" অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, এমন যে দৃষ্টান্ত, তাদৃশ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় অর্থাৎ "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণবাক্য" হয়। (যেমন) (১) "শব্দ অনিত্য", (২) "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক", (৩) "অনুৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয় না, এমন আত্মা প্রভৃতি নিত্য"। সেই এই আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত (বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত) সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ শব্দে থাকে না—এমন যে অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর অভাব, তৎপ্রযুক্ত "অতদ্ধর্ম্ম-ভাবী", বিশদার্থ এই যে, সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম এই যে অনিত্যত্ব, তাহা সেই আত্মা প্রভৃতিতে নাই।

এই আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তে—উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব না থাকিলে অনিত্যত্ব থাকে না, ইহা উপলব্ধি করতঃ শব্দে বিপর্য্যয় অর্থাৎ অনিত্যত্বাভাবের বিপর্য্যয় অনিত্যত্ব অনুমান করে (কিরূপে, তাহা বলিতেছেন) উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের ভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে বলিয়া "শব্দ অনিত্য"।

সাধর্ম্ম্যোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্য হেতু" বাক্যস্থলে সাধ্য-ধর্ম্মীর সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী" দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পূর্ব্বব্যাখ্যাত ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয়। বৈধর্ম্ম্যোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "বৈধর্ম্ম্যহেতু" বাক্য স্থলে সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত "অতদ্ধর্ম্মভাবী" দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বব্যাখ্যাত ঐরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয়।

পূর্ব্বদৃষ্টান্তে অর্থাৎ প্রথমোক্ত সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তে সেই যে দুইটি সাধ্যসাধন-ভাবাপন্ন ধর্ম্ম দর্শন করে অর্থাৎ একটিকে সাধ্য এবং অপরটিকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝে, সাধ্যধর্ম্মীতেও সেই দুইটি ধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাব অনুমান করে। (অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে স্থালী প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে এবং অনিত্যত্বও আছে,

ইহা বুঝিলে অনিত্যত্ব সাধ্য এবং উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব তাহার সাধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব থাকিলেই সেখানে অনিত্যত্ব থাকে, ইহা বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দেও অনিত্যত্বকে সাধ্য বলিয়া এবং উৎপত্তিধর্ম্মকত্বকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝে অর্থাৎ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব ও অনিত্যত্ব এই দুটি ধর্ম্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব বুঝিয়া উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতুর সাহায্যে শব্দকে অনিত্য বলিয়া অনুমান করে)।

শেষোক্ত দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তে যে দুইটি ধর্ম্মের একের অভাব প্রযুক্ত অপরটির অভাব বুঝে, সেই দুইটি ধর্ম্মের একের ভাব প্রযুক্ত অপটির ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সাধ্যধর্ম্মীতে অনুমান করে। (যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব প্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব বুঝিলে অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব না থাকিলে সেখানে অনিত্যত্ব থাকে না, ইহা বুঝিলে ঐ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বের ভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ভাব অনুমান করে)।

সেই ইহা অর্থাৎ এইরূপে সাধ্যসাধনত্ব হেত্বাভাসগুলিতে সম্ভব হয় না, এজন্য হেত্বাভাসগুলি হেতু নহে। "হেতু" ও "উদাহরণের" সেই এই অতি সূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ সামর্থ্য প্রশস্ত পণ্ডিতের বোধ্য (অর্থাৎ ইহা প্রশস্ত পণ্ডিত ভিন্ন সকলে বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াই অনেকে এ বিষয়ে অনেক ভ্রম করে)।

টিপ্পনী। সূত্রের "তদ্বিপর্য্যয়াৎ" এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"সাধ্যবৈধর্ম্ম্যাৎ" অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে যে "সাধ্যসাধর্ম্ম্য" উক্ত হইয়াছে, তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ তাহার অভাবকেই ভাষ্যকার "সাধ্যবৈধর্ম্ম্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রোক্ত "বিপরীতং" এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অতদ্ধর্ম্মভাবী"। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী"র বিপরীত "অতদ্ধর্ম্মভাবী"। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "দৃষ্টান্ত উদাহরণং" এই অংশের অনুবৃত্তি সূত্রকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়, নচেৎ সূত্রার্থ সংগতি হয় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমেই সেই কথার উল্লেখপূর্ব্বক সম্পূর্ণ সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। "উদাহরণ" শব্দের ক্লীবলিঙ্গত্বানুসারেই সূত্রকার "বিপরীতং" এইরূপ ক্লীব-লিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার সূত্রস্থ "বা" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সমুচ্চয়। প্রকৃত কথা এই যে, "শব্দোঽনিত্যঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুপদার্থে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য যেমন পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যে"র প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ ঐ স্থলে "বৈধর্ম্ম্যো-দাহরণ-বাক্যে"রও প্রয়োগ করা যায়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সেই "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যে"র লক্ষণ বলিয়াছেন। এই "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যে"র দ্বারা কিরূপে ঐ স্থলে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হয়, ভাষ্যকার তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, যাহা অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় না, স্থূল কথা, যাহা চিরদিনই আছে এবং চির-

দিনই থাকিবে, এমন পদার্থগুলি অনিত্য নহে অর্থাৎ সে সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বুঝিলেও যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, সে সকল পদার্থ অনিত্য, এইরূপে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব পদার্থে অনিত্যত্বধর্ম্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। কারণ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব না থাকিলেই অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ না হইলেই যখন সেই পদার্থকে নিত্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে—আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে তাহা নিশ্চয় করা যাইতেছে, তখন উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব থাকিলে অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ হইলে তাহা অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় উহার দ্বারা হইবেই। ফলতঃ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব এবং অনিত্যত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম সমদেশবর্ত্তী। অর্থাৎ যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা অনিত্য এবং যাহা অনিত্য, তাহা উৎপত্তিধর্ম্মক; সুতরাং উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব থাকিলে অনিত্যত্বের অভাব থাকে—ইহা বুঝিলে, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের ভাব থাকিলে অনিত্যত্বের ভাব থাকে,—অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব যেখানে বিদ্যমান থাকে, সেখানে অনিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহাও বুঝা যায়;—তাহার ফলে শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্ব ধর্ম্মের অনুমান হয়। প্রদর্শিত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্ম্মী। উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতু পদার্থটি তাহার সাধর্ম্ম্য। ঐ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব তাহার বৈধর্ম্ম্য; কারণ, ন্যায়-মতে শব্দের উৎপত্তি হয়, সুতরাং শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক। উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব শব্দের ধর্ম্ম, তাহার অভাব শব্দে থাকে না, এ জন্য উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব শব্দের বৈধর্ম্ম্য। যাহা যেখানে থাকে না, তাহাকে সেই পদার্থের "বৈধর্ম্ম্য" বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত "সাধ্য-বৈধর্ম্ম্য" প্রযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব প্রযুক্ত আত্মা প্রভৃতি পদার্থগুলি "অতদ্ধর্ম্ম-ভাবী"। কারণ, আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে অনিত্যত্ব, তাহা বিদ্যমান নাই। যে পদার্থে "তদ্ধর্ম্মের" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্মের "ভাব" কি না—বিদ্যমানতা আছে, তাহাকেই বলা হইয়াছে "তদ্ধর্ম্মভাবী"। আর যে সকল পদার্থে ঐ তদ্ধর্ম্মের "ভাব" নাই, তাহাকে বলা হইয়াছে "অতদ্ধর্ম্মভাবী" অর্থাৎ যে পদার্থ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী"র বিপরীত, তাহাই "অতদ্ধর্ম্মভাবী" এবং তাহাই "বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত"। পূর্ব্বোক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি পদার্থে সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম অনিত্যত্ব বিদ্যমান না থাকায় ঐ সকল পদার্থ পূর্ব্বোক্ত "অতদ্ধর্ম্মভাবী" বলিয়া "বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত"। ঐ আত্মাদি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই ঐ স্থলে "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বিবিধ;—"অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান" এবং "ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান"। (৩৫ সূত্র ভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। যেখানে যেখানে এই হেতু পদার্থ থাকে, সেই সমস্ত স্থানে এই সাধ্যধর্ম্ম থাকে, এইরূপ জ্ঞান অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান। যেখানে যেখানে এই সাধ্যধর্ম্ম নাই, সেই সমস্ত পদার্থে এই হেতু পদার্থ নাই, এইরূপ জ্ঞানকে পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ "ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান" বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে হেতুপদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের অভাব বলায়, তাঁহার মতে যেখানে যেখানে হেতু পদার্থ নাই, সেই সমস্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম নাই, এইরূপ জ্ঞানও অনেক স্থলে "ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান" হইবে, ইহা বুঝা যায়। এবং যাঁহারা ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়াই অনুমিতি হয় বলিয়াছেন, ব্যতিরেক-

ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেন নাই, তাঁহাদিগের ঐ মতের মূল বলিয়া ভাষ্যকারকেও বলা যাইতে পারে। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব নাই, সে সকল পদার্থ নিত্য, এইরূপ বুঝিলে, যে সকল পদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্য—ইহা বুঝা যায়, এইরূপ কথা ভাষ্যকারের কথায় এখানে পাওয়া যায়। ফলকথা, "বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তে" হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের অভাব বুঝিয়া যদি সেই হেতু থাকিলে সেই সাধ্যধর্ম্ম থাকিবেই, এইরূপ নিশ্চয় হয় এবং ভাষ্যকারও সেইরূপ কথা বলিয়াছেন—ইহা বলা যায়, তাহা হইলে "যেখানে যেখানে এই হেতু আছে, সেই সমস্ত স্থানেই এই সাধ্যধর্ম্ম আছে", এইরূপ "অন্বয়ব্যাপ্তি" নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র অনুমিতির কারণ। যেখানে যেখানে এই হেতু নাই, সেখানে সেখানে এই সাধ্যধর্ম্ম নাই, এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিনিশ্চয় অনুমিতির কারণ নহে, স্থলবিশেষে উহা অন্বয়ব্যাপ্তিনিশ্চয়েরই কারণ—ইহাই ভাষ্যকারের মত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার এখানে হেতু পদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের অভাব বলায়, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যাকে অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যে"র দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব প্রযুক্তই হেতুপদার্থের অভাব প্রদর্শিত হয়। যেখানে যেখানে সাধ্য ধর্ম্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই হেতু পদার্থ নাই, এইরূপ জ্ঞানই "ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান"। কারণ, সাধ্যধর্ম্মের অভাব থাকিলে সেখানে তাহার হেতু পদার্থের অভাব থাকে। হেতু পদার্থ না থাকিলেই সেখানে সাধ্যধর্ম্ম থাকিবে না, এইরূপ কথা বলা যায় না; ঐরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র নাই। যেখানে বহ্নি সাধ্যধর্ম্ম, বিশিষ্ট ধূম তাহার হেতু, সেখানে হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের অভাব—ইহা কোনমতেই বলা যাইবে না। কারণ, বিশিষ্ট ধূম না থাকিলেও অনেক স্থানে বহ্নি থাকে, কিন্তু বহ্নি না থাকিলে কোন স্থানেই বিশিষ্ট ধূম থাকে না, থাকিতেই পারে না; সুতরাং সাধ্যধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত হেতুর অভাব থাকে—ইহাই বলিতে হইবে এবং বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যও সেইরূপই বলিতে হইবে। এবং ভাষ্যকার যে স্থলে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ স্থলে হেতু "অন্বয়-ব্যতিরেকী"। ঐরূপ স্থলে সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল বৈধর্ম্ম্য হেতু স্থলেই "সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত" না থাকায় বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, সুতরাং ভাষ্যকারের উদাহরণ-স্থলও ঠিক হয় নাই। ফলকথা, ভাষ্যকারের মত এখানে গ্রাহ্য নহে; উহা যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে কিরূপ স্থলে, কিপ্রকারে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য হইবে? উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "জীবৎশরীরং সাত্মকং প্রাণাদিমত্ত্বাৎ" এই স্থলে অর্থাৎ "জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, প্রাণাদিমত্ত্ব (ইহার) জ্ঞাপক, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও হেতুস্থলে "যাহা যাহা সাত্মক নহে, তাহা প্রাণাদিযুক্ত নহে—যেমন ঘটাদি" এইরূপ ঘটাদি বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য। যে সকল পদার্থে আত্মা নাই, সে সকল পদার্থে প্রাণাদি নাই, ইহা বুঝিলে প্রাণাদিযুক্ত জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, ইহা বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত ঘটাদি পদার্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয় বশতঃই ঐরূপ অনুমান

হয়, ইহাই পরবর্ত্তী অনেক নৈয়ায়িকের মত। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের পূর্ব্বকথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সাত্মকত্বরূপে সাধ্যধর্ম্মী যে জীবিত ব্যক্তির শরীর, তাহার সহিত বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত ঘটাদি পদার্থের বৈধর্ম্ম্য যে সাত্মকত্বের অভাব, তৎপ্রযুক্ত যে পদার্থ "অতদ্ধর্ম্মভাবী" অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মী জীবিত ব্যক্তির শরীরের প্রাণাদিমত্ত্ব ধর্ম্ম যেখানে নাই, এমন যে ঘটাদি পদার্থ, তাহাই বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত। শেষে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে ঘটাদি পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত হেতু পদার্থের অভাব থাকে, সেই ঘটাদি পদার্থ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত হইবে এবং ঐ বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য হইবে। ফলকথা, উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মতে যেখানে যেখানে সাধ্যধর্ম্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতুপদার্থ নাই, ইহাই বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় এবং ঐরূপ ভাবেই বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়।

ভাষ্যকার ইহার বিপরীত কথা কেন বলিয়াছেন অর্থাৎ তিনি এখানে হেতুপদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের অভাবের কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা এখানে বিশেষ চিন্তনীয়। তাৎপর্য্য-টীকাকার প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে যান নাই। তাঁহারা সকলেই ভাষ্যকারের কথা অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আমার মনে হয়, ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রের পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ সূত্রার্থ সংগত বোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ঐরূপ ভাবে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিসূত্রে 'তদ্বিপর্য্যয়' শব্দ আছে। তাহার দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত সাধ্যসাধর্ম্ম্যের বিপর্য্যয়ই বুঝা যায়। সাধ্যসাধর্ম্ম্যের বিপর্য্যয় বলিতে সাধ্যসাধর্ম্ম্যের অভাবকে বুঝা যায়। তাহাকেই ভাষ্যকার বলিয়া-ছেন সাধ্যবৈধর্ম্ম্য। পূর্ব্বসূত্রে "সাধ্যসাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা ফলতঃ প্রকৃত হেতু পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এই সূত্রে "তদ্বিপর্য্যয়" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সাধ্যসাধর্ম্ম্য" যে প্রকৃত হেতু, তাহার অভাবকেই বুঝা যায়। এবং এই সূত্রে "বিপরীত" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী"র বিপরীতই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বসূত্রে "তদ্ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীর ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে। যে কোনরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ফলে উহার দ্বারা সাধ্যধর্ম্মই গৃহীত হইবে, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এই সূত্রে তদ্ধর্ম্মভাবীর বিপরীত বলিতে যেখানে সাধ্যধর্ম্মটি বিদ্যমান নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত হেতুর অভাব প্রযুক্ত প্রকৃত সাধ্যধর্ম্মের অভাব যেখানে আছে, এমন পদার্থই "বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত" এবং সেই বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য, ইহাই মহর্ষিসূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে এই সূত্রে "তদ্বিপর্য্যয়" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সাধ্যধর্ম্মের অভাব এবং 'বিপরীত' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—হেতুশূন্য। কিন্তু পূর্ব্বসূত্রে যে তদ্ধর্ম্মভাবী এই কথাটি আছে, তাহার অর্থ সেখানে সাধ্যধর্ম্মযুক্ত, সুতরাং এই সূত্রে তাহার বিপরীত অর্থই "বিপরীত" শব্দের দ্বারা বুঝা উচিত। তাহা হইলে এই সূত্রে "বিপরীত" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় সাধ্যধর্ম্মশূন্য। যদিও হেতু পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্ম এই

দুইটিকেই সাধ্যসাধর্ম্ম্য শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং সাধ্যধর্ম্মের অভাবকেও এই সূত্রে তদ্বিপর্য্যয় শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা যায়; উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বসূত্রে যখন হেতু পদার্থকেই সাধ্যসাধর্ম্ম্য শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই সূত্রে "তদ্বিপর্য্যয়" শব্দের দ্বারা তাহার অর্থাৎ সাধ্যসাধর্ম্ম্য হেতুপদার্থের অভাবকেই বুঝা উচিত এবং পূর্ব্বসূত্রে "তদ্ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা যখন সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যাতেই সাধ্যধর্ম্মকেই গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই সূত্রে "বিপরীত" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, এইরূপ অর্থই বুঝা উচিত। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "তদ্ধর্ম্মভাবী"র "বিপরীত" অতদ্ধর্ম্মভাবী। যেখানে তদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম বিদ্যমান নাই, এমন পদার্থই "অতদ্ধর্ম্মভাবী"। এইরূপে পূর্ব্ব-সূত্রের পদার্থানুসারে এই সূত্রের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, তদনুসারে ভাষ্যকার এখানে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। পরন্তু উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতু এবং অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্ম, এই দুইটি সমদেশবর্ত্তী। অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু মাত্রই অনিত্য এবং অনিত্য বস্তুমাত্রই উৎপত্তিধর্ম্মক[১], এইরূপ হেতু ও সাধ্যধর্ম্মকে "সমব্যাপ্ত" হেতুসাধ্য বলে। এইরূপ স্থলে হেতুর অভাব প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের অভাব, এ কথাও বলা যায় অর্থাৎ যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক নহে, তাহা অনিত্য নহে অর্থাৎ নিত্য; যেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপ কথাও বলা যায়। হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্যই উদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়। প্রকৃত স্থলে সেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন যদি ঐরূপ বাক্যের দ্বারাও হয় এবং মহর্ষির সূত্রানুসারেও ঐরূপ বাক্যকেই বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ভাষ্যকার তাহাই কেন বলিবেন না? ভাষ্যকার বুঝিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম্ম নাই, ইহা যে পদার্থে বুঝা যায়, তাহাকেই মহর্ষি বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত বলিয়াছেন এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব নাই, সেই সমস্ত স্থানেই অনিত্যত্ব নাই, ইহার কুত্রাপি ব্যভিচার নাই এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক নহে, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে, ইহা বুঝিলেও যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য, ইহা বুঝা হয়, সুতরাং ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্যই প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে হেতু ও সাধ্যধর্ম্ম সমদেশবর্ত্তী নহে, যেমন বিশিষ্ট ধূম হেতু, বহ্নি সাধ্য, এইরূপ স্থলে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য ভাষ্যকার কিরূপ বলিতেন? সেখানে ত যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি নাই—এইরূপ কথা বলা যাইবে না? কারণ, ধূমশূন্য স্থানেও বহ্নি থাকে। এতদুত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, মহর্ষি-সূত্রের ভাষ্যকার-সম্মত অর্থানুসারে ঐ স্থলে যখন "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইতে পারে না, তখন ঐ স্থলে ভাষ্যকার কেবল সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যই বলিতেন। অর্থাৎ "যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালা", এইরূপ সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাই

১। যাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ উভয়ই হয়, এই অর্থে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অনিত্য" শব্দের প্রয়োগ করায় অনিত্য বস্তু মাত্রকেই তিনি উৎপত্তিধর্ম্মক বলিতে পারেন। (৩৬ সূত্র-ভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

ঐ স্থলে বিশিষ্ট ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। সেখানে বিশিষ্ট ধূম কেবল সাধর্ম্ম্য হেতুই হইবে, বৈধর্ম্ম্য হেতু না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতু স্থলে বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যও সম্ভব হওয়ায় ঐ হেতু "বৈধর্ম্ম্যহেতু"ও হইবে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, মহর্ষি সমদেশবর্ত্তী হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের স্থলেই "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যে"র ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, ভাষ্যকারের মতে মহর্ষির ঐ লক্ষণ সেইরূপ স্থলেই সঙ্গত হয়। যেখানে বহ্নি সাধ্য, বিশিষ্ট ধূম হেতু, সেই স্থলে "যেখানে যেখানে বহ্নি নাই, সেই সমস্ত স্থানে বিশিষ্ট ধূম নাই—যেমন জল", এইরূপ বাক্যই "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য" হইবে। মহর্ষি-সূত্রে ইহা প্রকটিত না থাকিলেও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া ইহা মহর্ষির সম্মত এবং সূত্রে "বা" শব্দের দ্বারা ইহাও সূচিত। ফল কথা, হেতুর অভাবপ্রযুক্ত যেখানে সাধ্যধর্ম্মের অভাব, এমন পদার্থকেই ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা "বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত" বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সমদেশবর্ত্তী হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের স্থলে তাহা হইতেও পারে, এ জন্য ভাষ্যকার এখানে ঐরূপ বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থটি "সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত" অথবা "বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত" হইবে, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্য প্রয়োগ না করিলেও উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে। যেমন "যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, সে সমস্ত অনিত্য" এই পর্য্যন্ত বলিলেও উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে। উহার পরে আবার "যেমন স্থালী প্রভৃতি" এই কথাটি না বলিলেও চলে। হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্যই উদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়। তাহা পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারাও হইতে পারে। ভাষ্যকার কিন্তু উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগে দৃষ্টান্তবোধক শব্দেরও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন (নিগমন-সূত্র দ্রষ্টব্য)। মহর্ষিসূত্রের দ্বারাও দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগের কর্ত্তব্যতা বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত মতের আশ্রয় করিয়া এখানে মহর্ষি-সূত্রোক্ত "দৃষ্টান্ত" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তকথনযোগ্য অবয়ব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্তের কথন না হইলেও উদাহরণ-বাক্যে দৃষ্টান্তের কথন-যোগ্যতা আছে, উদাহরণ-বাক্যরূপ তৃতীয় অবয়বে দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ করা যায়, অন্য কোন অবয়বে তাহা করা যায় না। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ সার্ব্বত্রিক নহে, এই কথা বলিয়াছেন। তিনি ইহার হেতু বলিয়াছেন যে—"যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নি আছে" এই পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারাই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি বোধ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণের অনেকেই ঐ স্থলে কেবল "যথা মহানসং" অর্থাৎ যেমন রন্ধনশালা, এইরূপ বাক্যকেও উদাহরণ-বাক্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষে "পণ্ডিতৈরুপবেদনীয়ং" এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। "পণ্ডিতরূপবেদনীয়ং" ইহাই প্রকৃত পাঠ। "পণ্ডিত" শব্দের পরে প্রশস্ত বা উৎকৃষ্ট অর্থে "রূপ" প্রত্যয়ের[১] যোগে "পণ্ডিতরূপ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "পণ্ডিতরূপ" শব্দের অর্থ প্রশস্ত পণ্ডিত।

ভাষ্যকার এখানে হেতু ও উদাহরণের অতি দুর্ব্বোধ পরম সূক্ষ্ম সামর্থ্য প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই

১। "প্রশংসায়াং রূপপ্"—পাণিনিসূত্র, ৫।৩।৬৬।

বুঝিতে পারেন, এ কথাটি কেন লিখিয়াছেন ? ইহা ভাবিবার বিষয়। ভাষ্যকারের পূর্ব্বেও ন্যায়সূত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা ছিল, ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের মতে তাঁহার পূর্ব্বতন কোন কোন পণ্ডিত হেতু ও উদাহরণের ব্যাখ্যায় অনেক ভ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাও ঐ কথার দ্বারা মনে করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা তাহারই ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন কি না, ইহা এই ভাবের ভাবুকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। ৩৭।

সূত্র। উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ। সাধ্যধর্ম্মীর সম্বন্ধে অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে ধর্ম্মবিশেষের অনুমান করিতে হইবে, তাহাতে উদাহরণানুসারী "তথা" অর্থাৎ তদ্রূপ এই প্রকারে, অথবা "ন তথা" অর্থাৎ তদ্রূপ নহে, এই প্রকারে উপসংহার অর্থাৎ হেতুর উপন্যাস (হেতুবোধক বাক্য) উপনয়।

বিবৃতি। যে হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অনুমান করিতে হইবে, সেই হেতু সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে আছে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই সাধ্যধর্ম্ম থাকে, ইহা উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝাইয়া, তাহার পরেই সেই হেতু পদার্থটি সাধ্যধর্ম্মীতে আছে অর্থাৎ সেই হেতুর দ্বারা যেখানে সাধ্যধর্ম্মটির অনুমান করিতে হইবে, সেই পদার্থে আছে, ইহা বুঝাইতে হইবে, নচেৎ অনুমান হইতে পারে না। যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, সে সমস্তই অনিত্য, ইহা বুঝিলেও ঐ উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতুটি শব্দে আছে, ইহা না বুঝিলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান হইতে পারে না। ঐরূপ বুঝার নামই "লিঙ্গপরামর্শ"। যে বাক্যের দ্বারা ঐরূপ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে—"উপনয়"। উদাহরণ-বাক্যের পরেই উদাহরণ-বাক্যানুসারে এই "উপনয়-বাক্য" প্রয়োগ করিতে হয়। উদাহরণ-বাক্য দ্বিবিধ, সুতরাং উপনয়-বাক্যও দ্বিবিধ। (১) সাধর্ম্ম্যো-পনয়, (২) বৈধর্ম্ম্যোপনয়। "উৎপত্তিধর্ম্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য" এইরূপ সাধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের পরে "শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তিধর্ম্মক", এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারা বুঝা যায়, অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব, তাহা শব্দে আছে, শব্দও স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় উৎপত্তি-ধর্ম্মক, ঐ স্থলে এইরূপ বাক্যের নাম "সাধর্ম্ম্যোপনয়"। এবং ঐ স্থলে "অনুৎপত্তিধর্ম্মক আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য" এইরূপ বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের পরে "শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে" এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারাও বুঝা যায়, অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব, তাহা শব্দে আছে। শব্দ আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের ন্যায় অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে, ইহা বলিলে শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। ঐ স্থলে ঐরূপ বাক্যের নাম "বৈধর্ম্ম্যোপনয়"। (নিগমন-সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। উদাহরণাপেক্ষ উদাহরণতন্ত্রঃ উদাহরণবশঃ। বশঃ সামর্থ্যং। সাধ্যসাধর্ম্ম্যযুক্তে উদাহরণে স্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং তথা শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক ইতি সাধ্যস্য শব্দস্যোৎপত্তিধর্ম্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে। সাধ্যবৈধর্ম্ম্যযুক্তে পুনরুদাহরণে আত্মাদিদ্রব্যমনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যং দৃষ্টং ন চ তথা শব্দ ইতি অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্যোপসংহার-প্রতিষেধেনোৎপত্তিধর্ম্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে। তদিদমুপসংহারদ্বৈতমুদাহরণদ্বৈতাদ্ভবতি। উপসংহ্রিয়তেঽনেনেতি চোপসংহারো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। উদাহরণাপেক্ষ কি না উদাহরণতন্ত্র,—উদাহরণের বশ, অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্যের বশ্য। বশ অর্থাৎ বশ্যতা (এখানে) সামর্থ্য। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণ-বাক্যের ফল, উহা উদাহরণ-বাক্যানুসারেই প্রয়োগ করিতে হয়, এ জন্য উদাহরণাপেক্ষ।

সাধ্যসাধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্যোদাহরণ স্থলে "উৎপত্তি-ধর্ম্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়, শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তি-ধর্ম্মক" এইরূপে সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সম্বন্ধে অর্থাৎ অনিত্যত্বরূপে সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব উপসংহৃত (প্রদর্শিত) হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্যটির দ্বারা অনিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব, তাহা শব্দে আছে, ইহা বুঝান হয়; ঐ বাক্যটি সাধর্ম্ম্যোপনয় বাক্য।

সাধ্যবৈধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণে কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ স্থলে "অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক (যাহার উৎপত্তি নাই) আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখা যায়, কিন্তু শব্দ তদ্রূপ নহে" এই বাক্যের দ্বারা ("শব্দ তদ্রূপ নহে" এই শেষোক্ত বাক্যটির দ্বারা) অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বের উপসংহার নিষেধের দ্বারা অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা শব্দে অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব নাই, ইহা উপসংহার (প্রদর্শন) করিয়া উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব উপসংহৃত (প্রদর্শিত) হয়। উপসংহারের অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে হেতু-পদার্থের বোধক পূর্ব্বোক্ত উপনয়-বাক্যের সেই এই (পূর্ব্বোক্ত) দ্বিবিধত্ব উদাহরণের দ্বিবিধত্ব প্রযুক্ত হয়। ইহার দ্বারা উপসংহৃত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীতে হেতু-পদার্থের উপসংহার করা হয়; এ জন্য ইহাকে "উপসংহার" জানিবে (অর্থাৎ এইরূপ অর্থেই উপনয়-বাক্যকে উপসংহার বলা হইয়াছে)।

টিপ্পনী। সূত্রে "উদাহরণাপেক্ষঃ সাধ্যস্যোপসংহারঃ" এই অংশের দ্বারা উপনয়-বাক্যের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। "তথা" এবং "ন তথা" এই কথার দ্বারা উপনয়-বাক্যের বিশেষ লক্ষণ বলা হইয়াছে। উপনয়-বাক্য উদাহরণ-বাক্যকে অপেক্ষা করে, উদাহরণ-বাক্যের পরে তদনুসারে উপনয়-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন—"উদাহরণাপেক্ষ"। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"উদাহরণ-তন্ত্র", আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"উদাহরণ-বশ"। তাৎপর্য্য-টীকাকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"বশ্যতে ইতি বশঃ বশিন উদাহরণস্য বশ্য ইত্যর্থঃ"। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণবাক্যের বশ্য। শেষে বলিয়াছেন যে, ঐ বশ্যতাকেই "বশ" শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার উহার অর্থ বলিয়াছেন "সামর্থ্য"। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ "সামর্থ্যে"র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"বশ্যেন উদাহরণস্য ফলেন উপনয়েন অভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ"। অর্থাৎ উপনয়-বাক্য উদাহরণবাক্যের ফল, ঐ ফলের সহিত উদাহরণবাক্যের সম্বন্ধই উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বশ্যতা এবং উহাই এখানে উদাহরণের সামর্থ্য। ভাষ্যকার আদি ভাষ্যেও ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থে "সামর্থ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মূলকথা, উদাহরণবাক্য ব্যতীত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শন হয় না। হেতুপদার্থকে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া না বুঝিয়া সাধ্য-ধর্ম্মীতে হেতুপদার্থের অবধারণ হইলেও অনুমান হইতে পারে না; সুতরাং হেতুপদার্থকে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝাইয়া সাধ্যধর্ম্মীতে সেই হেতুপদার্থের উপসংহার করিতে হইবে, তাহাই "উপনয়-বাক্য" হইবে এবং উদাহরণের ভেদানুসারেই "উপনয়-বাক্যে"র প্রকারভেদ হইবে; সুতরাং "উপনয়" উদাহরণ-সাপেক্ষ।

যে বাক্যের দ্বারা উপসংহার করা হয় অর্থাৎ কোন পদার্থে কোন পদার্থের অবধারণ করা হয়, তাহাকে উপসংহার-বাক্য বলা যায়। মহর্ষি ঐরূপ বাক্যবিশেষ অর্থেই সূত্রে "উপসংহার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উপনয় বাক্যবিশেষ। সুতরাং সূত্রোক্ত "উপসংহার" শব্দের অর্থও বাক্যবিশেষ। ভাষ্যকারও শেষে সূত্রোক্ত "উপসংহার" শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন কিরূপ বাক্য-বিশেষ উপনয় হইবে? এ জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—"উদা-হরণাপেক্ষঃ" এবং "সাধ্যস্য"। এখানে "সাধ্য" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে সাধ্যধর্ম্মী। কারণ, উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের উপসংহার করা হয় না। অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, উপনয়-বাক্যের দ্বারা ত সাধ্যধর্ম্মীরও উপসংহার করা হয় না, সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুপদার্থেরই উপসংহার করা হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এই জন্যই এখানে সাধ্যধর্ম্মী শব্দের সম্বন্ধে, উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতুর উপসংহার হয়, এই কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার হয় না, সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য যে হেতু, সেই হেতু-যুক্তভাবে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার হয়। অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বারা যখন সাধ্যধর্ম্মীকে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যহেতুবিশিষ্ট বলিয়াই বুঝান হয়, তখন উপনয়-বাক্যের দ্বারা ঐ ভাবে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার হয়, ইহা বলা যাইতে পারে এবং ঐ ভাবে সাধ্যধর্ম্মীর উপসংহার-বাক্যকে উপনয়-বাক্য বলা যাইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্য-

টীকাকারের কথা। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে,[১] সূত্রে "সাধ্যস্য" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুর উপসংহার-বাক্যই উপনয়। সূত্রে "হেতু" শব্দ না থাকিলেও উহা এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে। জয়ন্তভট্টের ব্যাখ্যায় কোন গোল নাই। ঋষিসূত্রে এক বিভক্তি স্থানে অন্য বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও যায়। ভাষ্যকারও এখানে সাধ্যধর্ম্মীর সম্বন্ধে হেতুর উপসংহার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং "হেতু" শব্দ সূত্রে না থাকিলেও এখানে হেতুর উপসংহারই সূত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারও বুঝিয়াছিলেন। "সাধ্যস্য" এই স্থলে সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেও উহার দ্বারা "সাধ্যধর্ম্মীতে" এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগস্থলেও সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ কোন কোন স্থলে দেখাও যায়। জয়ন্তভট্ট তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ফলকথা, জয়ন্তভট্ট যেরূপ বলিয়াছেন, সূত্রকার ও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকারের ন্যায় কষ্টকল্পনা না করিলেও চলে।

ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে "শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তি-ধর্ম্মক" এইরূপ উপনয়বাক্যের দ্বারা যেমন সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুপদার্থের উপসংহার হয়, সেইরূপ "শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে" এইরূপ উপনয়-বাক্যের দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু-পদার্থের উপসংহার হয়। কারণ, শব্দ আত্মা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে, এই কথা বলিলে শব্দে অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বের উপসংহার নিষেধ করা হয় অর্থাৎ শব্দে অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব নাই, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে ফলতঃ শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব আছে, ইহাই বলা হইল। সুতরাং ঐরূপ বাক্যের দ্বারাও সাধ্যধর্ম্মী শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য উৎপত্তিধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর উপসংহার হওয়ায়, ঐরূপ বাক্যও ঐ স্থলে "উপনয়বাক্য" হইবে। ঐ বাক্য পূর্ব্বোক্ত "বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ"-সাপেক্ষ হওয়ায় উহা ঐ স্থলে "বৈধর্ম্ম্যোপনয়বাক্য"।

কোন্ প্রাচীন সম্প্রদায় "নচ নায়ং তথা" এইরূপ বাক্যকেই "বৈধর্ম্ম্যোপনয়" বাক্য বলিতেন। এই মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে "নচ নায়ং তথা" অর্থাৎ "শব্দ উৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে, ইহা নহে," এইরূপ অর্থের বোধক ঐরূপ বাক্যই "বৈধর্ম্ম্যোপনয়"-বাক্য হইবে। কিন্তু মহর্ষি যখন "বৈধর্ম্ম্যোপনয়"-বাক্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে "ন তথা" এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মত মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝা যায় না। ভাষ্যকারও ঐরূপ বলেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় সাধ্যধর্ম্মীকে "অয়ং" এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া "তথা চায়ং" এইরূপ বাক্যকে "সাধর্ম্ম্যোপনয়"-বাক্য বলিতেন। ভাষ্যকার তাহাও বলেন নাই। পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণও ঐরূপ না বলিলেও অবয়ব ব্যাখ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি প্রাচীনদিগের "তথা চায়ং" এইরূপ উপনয়-বাক্যের সংগতি দেখাইয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, উপনয়বাক্যে যে "তথা"শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে, ইহা সূত্রকারের তাৎপর্য্য নহে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এইরূপ স্থলে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানয়ং" অথবা

১। সাধ্যস্যেতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী মন্তব্যা সাধ্যে ধর্ম্মিণি হেতোরুপসংহার উপনয়ঃ।—(ন্যায়মঞ্জরী, উপনয়-সূত্র)।

"তথা চায়ং" এই দুই প্রকারই উপনয়বাক্য বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার সর্ব্বত্রই উপনয়-বাক্যে "তথা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই "উপনয়"-বাক্যে "তথা" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এবং "অয়ং" এই বাক্যের দ্বারাই ধর্ম্মীর নির্দ্দেশ করিয়া "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানয়ং" ইত্যাদি প্রকার বাক্যকেই "উপনয়" বলিয়াছেন এবং "উপনয়-বাক্য"স্থ "অয়ং" এই বাক্যের নিগমন-বাক্যে "অনুষঙ্গ" করিলে "তস্মাদ্‌বহ্নিমান্" ইত্যাদি প্রকার বাক্যও "নিগমন" হইতে পারে, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু এইরূপ বলেন নাই। (নিগমন-সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ॥৩৮॥

ভাষ্য। দ্বিবিধস্য পুনর্হেতোর্দ্বিবিধস্য চোদাহরণস্যোপসংহারদ্বৈতে চ সমানম্।

অনুবাদ। দ্বিবিধ "হেতু"র সম্বন্ধে এবং দ্বিবিধ "উদাহরণে"র সম্বন্ধে এবং উপসংহারদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বিবিধ "উপনয়ে" (পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত "নিগমন"-বাক্য) সমান অর্থাৎ নিগমন-বাক্য সর্ব্বত্রই এক প্রকার।

সূত্র। হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ। হেতুকথনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন "নিগমন" (নিগমন নামক পঞ্চম অবয়ব)।

বিবৃতি। উপনয়বাক্যের পরেই যে বাক্যটির প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার নাম "নিগমন"। পূর্ব্বে যে হেতুর উল্লেখ করা হইবে, সেই "হেতু"র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিয়া সেই সঙ্গে—সর্ব্বাগ্রে যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উল্লেখ করা হইবে, তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটি "নিগমন-বাক্য" হইবে। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ" অর্থাৎ সেই উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব হেতুক শব্দ অনিত্য, এইরূপ অর্থের বোধক বাক্য। ঐ বাক্যের প্রথমে পূর্ব্বোক্ত হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, শেষে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনরুল্লেখ হইয়াছে। এই "নিগমন"-বাক্যই পঞ্চাবয়বের চরম অবয়ব। ইহার দ্বারাই ন্যায়বাক্যের উপসংহার বা সমাপ্তি করা হয়। স্থূল কথায় ইহাই প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের সারসংকলন। প্রতিজ্ঞাবাক্য, হেতুবাক্য, উদাহরণবাক্য এবং উপনয়বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাহা বলা হয়, সেইগুলি সমস্তই শেষে এই "নিগমন"-বাক্যের দ্বারা একবারে বলা হয়। এই নিগমন বাক্যই পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া উহাদিগকে একই প্রতিপাদ্যের প্রতিপাদক করে, এ জন্য ইহার নাম "নিগমন"।

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্যোক্তে বা বৈধর্ম্ম্যোক্তে বা যথোদাহরণমুপসংহ্রিয়তে

তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি নিগমনম্। নিগম্যন্তেঽনেনেতি প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনম্। নিগম্যন্তে সমর্থ্যন্তে সম্বধ্যন্তে। তত্র সাধর্ম্ম্যোক্তে তাবদ্ধেতৌ বাক্যং "অনিত্যঃ শব্দ" ইতি প্রতিজ্ঞা। "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বা"দিতি হেতুঃ। "উৎপত্তি-ধর্ম্মকং স্থাল্যাদি দ্রব্যমনিত্য"মিত্যুদাহরণম্। "তথা চোৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দ" ইত্যুপনয়ঃ। "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ" ইতি নিগমনম্। বৈধর্ম্ম্যোক্তেঽপি "অনিত্যঃ শব্দঃ" "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ", "অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকমাত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং", "ন চ তথাঽনুৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ" "তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ" ইতি।

অনুবাদ। উদাহরণানুসারে হেতুবাক্য সাধর্ম্ম্য প্রযুক্তই উক্ত হউক, আর বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্তই উক্ত হউক, অর্থাৎ তাদৃশ হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া "সেই উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য" এইরূপ নিগমন-বাক্য উপসংহৃত হয় অর্থাৎ চরম বাক্যরূপে প্রযুক্ত হয়।

(এই "নিগমন" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন) ইহার দ্বারা "প্রতিজ্ঞা", "হেতু," "উদাহরণ" এবং "উপনয়" এক অর্থে নিগমিত হয়, এ জন্য ইহাকে "নিগমন" বলিয়াছেন। নিগমিত হয়, কি না, সামর্থ্যযুক্ত হয়, সম্বন্ধযুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়ব মিলিত হইয়া যে একার্থের প্রতিপাদন করে,তাহাতে ঐ বাক্য-চতুষ্টয়ের যে সামর্থ্য বা পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক, পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যই তাহা সম্পাদন করে ; এ জন্য ঐ বাক্যের নাম "নিগমন"।

[ভাষ্যকার পরিশেষে এখানে "সাধর্ম্ম্য হেতু" ও "বৈধর্ম্ম্য হেতু" স্থলে প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থলে ন্যায়বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন]।

সেই স্থলে (শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানস্থলে) সাধর্ম্ম্যোক্ত হেতু হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "সাধর্ম্ম্য হেতু" স্থলে (১) "শব্দ অনিত্য" এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। (২) "উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক," এই বাক্য হেতু। (৩) "উৎপত্তিধর্ম্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য", এই বাক্য উদাহরণ। (৪) "শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তি-ধর্ম্মক," এই বাক্য উপনয়। (৫) "সেই উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য" এই বাক্য নিগমন। এবং বৈধর্ম্ম্যোক্ত হেতু হইলে অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য হেতু স্থলে (১) "শব্দ অনিত্য"

এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। (২) "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক", এই বাক্য হেতু। (৩) "অনুৎ-পত্তি-ধর্ম্মক আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখা যায়" এই বাক্য উদাহরণ। (৪) "শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে" এই বাক্য উপনয়। এবং (৫) "সেই উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য", এই বাক্য নিগমন।

টিপ্পনী। নিগমন-বাক্য সর্ব্বত্রই একরূপ। ভাষ্যকার প্রথমেই সেই কথা বলিয়া সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ প্রথম ভাষ্য সন্দর্ভের সহিত সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে। সূত্রে "হেতু" শব্দের অর্থ এখানে হেতুবাক্য। অবয়ব প্রকরণে "হেতু" শব্দের দ্বারা হেতু-পদার্থ না বুঝিয়া হেতু-বাক্যরূপ অবয়বই বুঝা উচিত। "অপদেশ" শব্দের অর্থ এখানে কথন। পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ উত্তরবর্ত্তিতা। তাহা হইলে সূত্রের "হেত্বপদেশাৎ" এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, হেতু-বাক্য কথনের পরে, অর্থাৎ হেতু-বাক্য কথনপূর্ব্বক। তাহা হইলে সম্পূর্ণ সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়, "হেতুবাক্যের কথন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন নিগমন।" যে কোন বাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থের কথনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থের পুনঃ কথনই সূত্রার্থ বলিলে সূত্রে "হেতু" শব্দের দ্বারা হেতু-পদার্থ এবং "প্রতিজ্ঞা" শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বুঝিতে হয়, কিন্তু তাহা সহজে বুঝা যায় না; তাহাতে "প্রতিজ্ঞা" শব্দের যাহা প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝা উচিত, তাহা বুঝা হয় না। অবয়ব প্রকরণে "প্রতিজ্ঞা" শব্দের দ্বারা প্রথম অবয়ব প্রতিজ্ঞা-বাক্যকেই বুঝা উচিত এবং তাহারই পুনঃ কথন সহজে উপপন্ন হয়। পরবর্ত্তী অনেক নৈয়ায়িক পূর্ব্বোক্ত প্রকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াই পূর্ব্বোক্ত স্থলে "তস্মাদনিত্যঃ শব্দঃ" অথবা "তস্মাদনিত্যোহয়ং" এইরূপ "নিগমন"-বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার "হেতুবাক্যে"রই উল্লেখ করিয়া তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকার "প্রতিজ্ঞাবাক্যে"র উল্লেখ করিয়া "নিগমন-বাক্য" প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে হেতুবাক্যের কথন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃকথনই সূত্রার্থ বলিয়া বুঝা যায়। পূর্ব্বে "উদাহরণ"-বাক্যের দ্বারা যে হেতু-পদার্থকে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হইবে এবং "উপনয়"-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য যে হেতু-পদার্থ সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, ইহা বুঝান হইবে, সেই হেতু-পদার্থকেই সেইরূপে "নিগমন"-বাক্যে প্রকাশ করিবার জন্য—"নিগমন"-বাক্যে হেতু-বাক্যের প্রথমে "তস্মাৎ" এই বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মী শব্দে বর্ত্তমান, সেই উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য, ইহাই "নিগমন"-বাক্যের দ্বারা ঐ স্থলে বুঝান হইয়া থাকে। কেহ বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের "তস্মাৎ" এই কথার অর্থ অতএব। অর্থাৎ যেহেতু উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব অনিত্যত্বের ব্যাপ্য এবং উহা শব্দে আছে, অতএব উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য, ইহাই ভাষ্যকারোক্ত "নিগমন"-বাক্যের অর্থ। ফলতঃ "নিগমন"-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের প্রতিপাদ্যই প্রকাশ করা হয়। "নিগমন"-বাক্যে "প্রতিজ্ঞা-বাক্য" ও "হেতু"-বাক্য মিলিত থাকে এবং "তস্মাৎ" এই কথার দ্বারা "উদাহরণ"-বাক্য এবং

"উপনয়"-বাক্যের ফলিতার্থ প্রকটিত হইয়া থাকে। "তস্মাৎ" এই স্থলে "তৎ" শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান বলিয়া বোধিত হেতু-পদার্থকেই সেইরূপে বুঝা যায়। পরবর্ত্তী অনেক নৈয়ায়িক কেবল "তস্মাৎ" এই কথার দ্বারাই পূর্ব্ববোধিত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি হেতু-বাক্যের কথনই সূত্রকারের অভিমত হয়, "হেত্বপদেশ" শব্দের দ্বারা সূত্রকার তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল "তস্মাৎ" এইরূপ বাক্য বলিলে চলিবে না। প্রকৃত হেতুবাক্য "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাৎ" এইরূপ কথাই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ" এই কথাটি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "তস্মাৎ" এই কথারই ব্যাখ্যা বলা যায় না; কারণ, তিনি এখানে "নিগমন-বাক্যে"র আকারই দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না। "তস্মাৎ" এই কথাটি পূর্ব্বে না বলিলে, উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব হেতুকে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মী শব্দে বর্ত্তমান বলিয়া প্রকাশ করা হয় না, এই জন্য পূর্ব্বে "তস্মাৎ" এই কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায়, সূত্রে যে "হেত্বপদেশ" শব্দ আছে, উহার দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে হেতুবাক্যের কথনই ভাষ্যকার বুঝিয়াছিলেন। আর যদি ভাষ্যকারের "তস্মাৎ" এই কথার দ্বারা "অতএব" এইরূপ অর্থই বুঝা হয়, তাহা হইলে ঐরূপে হেতুবাক্যের কথনই সূত্রোক্ত "হেত্বপদেশ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয়। যাহারা "নিগমন"-বাক্যে পূর্ব্বোক্ত হেতুবাক্যের উল্লেখ না করিয়া কেবল "তস্মাৎ" এই কথার দ্বারাই পূর্ব্বজ্ঞাত হেতু-পদার্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও ঐ "তৎ"শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান হেতুপদার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, "সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান যে হেতুপদার্থ, সেই হেতুপদার্থের জ্ঞাপনীয় যে সাধ্যধর্ম্ম, সেই সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট সাধ্যধর্ম্মী" এই পর্য্যন্ত যে বাক্যের দ্বারা বুঝা যাইবে, ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত ঐরূপ বাক্যবিশেষই "নিগমন", ইহাই পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণের সমর্থিত স্থূল সিদ্ধান্ত। অনেকে সাধর্ম্ম্য হেতু স্থলে "তস্মাত্তথা" এবং বৈধর্ম্ম্যহেতুস্থলে "তস্মান্ন তথা" এইরূপ নিগমন-বাক্য বলিতেন; কিন্তু ঐরূপ বাক্যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনর্ব্বচন নাই, "তথা" এবং "ন তথা" এইরূপ "প্রতিজ্ঞা" বাক্য হয় না। "প্রতিজ্ঞা"-বাক্য সর্ব্বত্রই একরূপ এবং "নিগমন"ও সর্ব্বত্র একরূপ, ইহা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাবাক্যেরই পুনর্ব্বচন করিতে হইলে ভিন্ন প্রকার "নিগমন"-বাক্য হইতেও পারে না। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও "তস্মাত্তথা" এইরূপ "নিগমন"-বাক্য কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহা বিশেষ বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় প্রশ্ন এই যে, "প্রতিজ্ঞা"বাক্য সাধ্যনির্দ্দেশ, "নিগমন"-বাক্য সিদ্ধনির্দ্দেশ, অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগ প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্তই হয় না; সুতরাং মহর্ষি "নিগমনবাক্য"কে প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচন বলিতে পারেন না। যাহার কোন অংশে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ নাই, তাহাকে কি প্রতিজ্ঞার পুনর্ব্বচন বলা যায়? এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও "প্রতিজ্ঞা" সাধ্যনির্দ্দেশ এবং "নিগমন" সিদ্ধনির্দ্দেশ, তথাপি "প্রতিজ্ঞাবাক্যে"র দ্বারা যে পদার্থটি সাধ্যরূপে বোধিত হয়, "নিগমনবাক্যে"র দ্বারা সেই পদার্থটিই সিদ্ধরূপে বোধিত হয়, অর্থাৎ

"প্রতিজ্ঞাবাক্যে" যে পদার্থের সাধ্যত্ব ছিল, "নিগমনবাক্যে" তাহারই সিদ্ধত্ব হয়; সুতরাং সাধ্যত্ব ও সিদ্ধত্বরূপ অবস্থাবিশিষ্ট একই পদার্থ "প্রতিজ্ঞাবাক্য"ও "নিগমনবাক্যে"র প্রতিপাদ্য হওয়ায় "নিগমনবাক্যে" "প্রতিজ্ঞা" শব্দের গৌণপ্রয়োগ করিয়া মহর্ষি "নিগমন-বাক্য"কে "প্রতিজ্ঞা"র পুনর্ব্বচন বলিয়াছেন। অর্থাৎ "নিগমনবাক্য" বস্তুতঃ "প্রতিজ্ঞাবাক্য" না হইলেও কোন অংশের দ্বারা প্রতিজ্ঞার্থের প্রতিপাদক হওয়ায় এবং পরভাগে "প্রতিজ্ঞাবাক্যে"র সমানাকার হওয়ায় তাহাকে "প্রতিজ্ঞাবাক্যে"র পুনর্ব্বচন বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকার "নিগমন" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য একার্থে নিগমিত হয়। "নিগমিত হয়" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সমর্থিত হয়"। শেষে তাহারই আবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সম্বন্ধযুক্ত হয়"। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, "নিগমন-বাক্যে"র দ্বারা তাহা বুঝা যায়। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। অবয়বসমুদায়ে চ বাক্যে সম্ভূয়েতরেতরাভিসম্বন্ধাৎ প্রমাণান্যর্থং সাধয়ন্তীতি। সম্ভবস্তাবৎ, শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা, আপ্তোপদেশস্য প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতিসন্ধানাৎ, অনৃষেশ্চ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ, তচ্চোদাহরণভাষ্যে ব্যাখ্যাতম্। প্রত্যক্ষবিষয়মুদাহরণং, দৃষ্টেনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ। উপমানমুপনয়ঃ, তথেত্যুপসংহারাৎ, ন চ তথেতি চোপমানধর্ম্মপ্রতিষেধে বিপরীতধর্ম্মোপসংহারসিদ্ধেঃ। সর্ব্বেষামেকার্থপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি।

ইতরেতরাভিসম্বন্ধোঽপ্যসত্যাং প্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া হেত্বাদয়ো ন প্রবর্ত্তেরন্। অসতি হেতৌ কস্য সাধনভাবঃ প্রদর্শ্যেত। উদাহরণে সাধ্যে চ কস্যোপসংহারঃ স্যাৎ, কস্য চাপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং স্যাদিতি। অসত্যুদাহরণে কেন সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং বা সাধ্যসাধনমুপাদীয়েত, কস্য বা সাধর্ম্ম্যবশাদুপসংহারঃ প্রবর্ত্তেত। উপনয়ঞ্চান্তরেণ সাধ্যেঽনুপসংহৃতঃ সাধকো ধর্ম্মো নার্থং সাধয়েৎ, নিগমনাভাবে চানভিব্যক্তসম্বন্ধানাং প্রতিজ্ঞাদীনামেকার্থেন প্রবর্ত্তনং তথেতি প্রতিপাদনং কস্যেতি।

অনুবাদ। অবয়ব সমূহরূপ বাক্যে অর্থাৎ ব্যাখ্যাত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায়বাক্যে প্রমাণগুলি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারিটি প্রমাণ

মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অর্থ (সাধ্যপদার্থ) সাধন করে। সম্ভব অর্থাৎ অবয়বসমূহের মূলে প্রমাণ-চতুষ্টয়ের মিলন (দেখাইতেছি)।

প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দবিষয়, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত কোন বিষয়ের প্রতিপাদক। কারণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা আপ্তবাক্যের (শব্দপ্রমাণের) প্রতিসন্ধান করিতে হয় অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা-কেই অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হয় এবং বুঝাইতে হয় ; সুতরাং যে বিষয়টি প্রতিপাদন করিতে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, ঐ বিষয়টি শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত থাকায় ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকে। এবং ঋষিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ ঋষিভিন্ন ব্যক্তিরা যখন আগমগম্য অলৌকিক তত্ত্বের দর্শন করেন নাই, তখন তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগের সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আগম-প্রমাণ হইতে পারে না। এই জন্যই তাঁহারা ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধনের জন্য হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করেন এবং তাঁহাদিগের ঐ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের মূলে আগম-প্রমাণ আছে বলিয়াই, ঐ প্রতিজ্ঞাকে আগম বলা হইয়াছে।

হেতুবাক্য অনুমান প্রমাণ। কারণ, উদাহরণে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ হেতু-পদার্থ ও সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া (হেতুর) জ্ঞান হয়। তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থও সাধ্যধর্ম্মকে দেখিয়াই যে ঐ উভয়ের সাধ্য-সাধনভাব বা ব্যাপক-ব্যাপ্যভাব বুঝা যায়, উহাদিগের মধ্যে একটি সাধন (ব্যাপ্য) এবং অপরটি তাহার সাধ্য (ব্যাপক), ইহা নির্ণয় করা যায়, ইহা উদাহরণ-ভাষ্যে (উদাহরণসূত্র ভাষ্যে) ব্যাখ্যা করিয়াছি।

[তাৎপর্য্য এই যে—দৃষ্টান্ত পদার্থে কোন পদার্থকে ব্যাপ্য এবং কোন পদার্থকে তাহার ব্যাপক বলিয়া বুঝিয়া অর্থাৎ এই পদার্থ যে যে স্থানে আছে, সেই সমস্ত স্থানে এই পদার্থ আছেই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই সেই ব্যাপ্য পদার্থটিকে হেতু বলিয়া বুঝা হয়। তদনুসারেই সেই হেতুর বোধক হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, পূর্ব্বে ঐরূপ নিশ্চয় না হইলে কখনই হেতুবাক্য প্রয়োগ করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হেতুনিশ্চয় অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য ; সুতরাং তন্মূলক হেতুবাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে]।

উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষবিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বোধিত পদার্থের বোধক। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্য-

ব্যাপকভাব দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে যে পদার্থ দৃষ্ট নহে—অনুমেয়, সেই পদার্থের সিদ্ধি হয় (তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াই যখন উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তখন উদাহরণ-বাক্য প্রত্যক্ষমূলক ; এ জন্য উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে ।)

উপনয়-বাক্য উপমান-প্রমাণ ; কারণ, "তথা" এই বাক্যের দ্বারা উপসংহার হইয়া থাকে,—অর্থাৎ উপনয়-বাক্যে "তথা" এই বাক্যের দ্বারা সাদৃশ্য বোধ হওয়ায় সেই সাদৃশ্য-জ্ঞান-মূলক উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। এবং "ন চ তথা" এইরূপ বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ "তদ্রূপ নহে" এইরূপ বাক্যের দ্বারা উপমানের ধর্ম্মের নিষেধ হইলেও বিপরীত ধর্ম্মের উপসংহার সিদ্ধি হয়, [তাৎপর্য্য এই যে, বৈধর্ম্ম্য হেতু স্থলে যে উপনয়-বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহার দ্বারাও সাধ্য-ধর্ম্মীতে প্রকৃত হেতুরই উপসংহার সিদ্ধ হয় ; যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে "শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে" এইরূপ উপনয়-বাক্যের দ্বারা আত্মা প্রভৃতি যে উপমান অর্থাৎ দৃষ্টান্ত, তাহার ধর্ম্ম যে অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব, তাহা শব্দে নাই, এ কথা বলা হইলেও অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত আত্মাদি পদার্থের সহিত শব্দের সাদৃশ্য বোধ না হইয়া বিসদৃশত্ব-বোধ হইলেও তাহারই ফলে ঐ অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের বিপরীত ধর্ম্ম যে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব, শব্দে তাহারই উপসংহার (অবধারণ) হইয়া পড়ে।]

সকলগুলির অর্থাৎ "প্রতিজ্ঞা", "হেতু", "উদাহরণ" এবং "উপনয়" এই চারিটি বাক্যের এবং তাহাদিগের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয়ের একার্থ-বোধ বিষয়ে সামর্থ্য-প্রদর্শন অর্থাৎ উহারা মিলিত হইয়া যে একটি অর্থের বোধ জন্মাইবে, তাহাতে উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ বা আকাঙ্ক্ষা আবশ্যক, তাহার বোধক "নিগমন"।

পরস্পর সম্বন্ধও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষাও (দেখাইতেছি)।

"প্রতিজ্ঞা" না থাকিলে হেতু প্রভৃতি নিরাশ্রয় হওয়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। "হেতু" না থাকিলে কাহার সাধনত্ব প্রদর্শিত হইবে ? দৃষ্টান্ত পদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মীতে কাহার উপসংহার করা হইবে ? কাহারই বা কথন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ব্বচন-রূপ "নিগমন" হইবে ?

"উদাহরণ" না থাকিলে কাহার সহিত সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যকে সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে ? কাহারই বা সাধর্ম্ম্য বশতঃ উপসংহার (উপনয়) প্রবৃত্ত হইবে ?

এবং "উপনয়"-বাক্য ব্যতীত সাধ্যধর্ম্মীতে অনুপসংহৃত সাধক ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্য-ধর্ম্মীতে যাহার উপসংহার করা হয় নাই, এমন হেতুপদার্থ অর্থ (সাধ্যপদার্থ) সাধন করিতে পারে না।

এবং "নিগমনবাক্যে"র অভাবে অনভিব্যক্তসম্বন্ধ অর্থাৎ নিগমনবাক্য না বলিলে যাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান হয় না, এমন প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের একার্থ বিশিষ্টরূপে প্রবর্ত্তন কি না,—"তথা" এই প্রকারে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য যে একার্থযুক্ত, সেই প্রকারে প্রতিপাদকতা কাহার হইবে? অর্থাৎ নিগমন-বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, উহারা যে একই বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত, তাহা বুঝা যায়। নিগমন-বাক্য ব্যতীত তাহা কোন্ বাক্য প্রতিপাদন করিবে অর্থাৎ বুঝাইবে?

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ মিলিত হইয়া সাধ্যসাধন করে, অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে চারিটি প্রমাণই আছে; সুতরাং এই পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায় প্রয়োগ করিয়া সাধ্যসাধন করিলে সেই সাধ্যপদার্থটি সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত বলিয়া, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য, তদ্বিষয়ে আর কাহারও বিরুদ্ধবাদ সম্ভব হইতে পারে না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই প্রথম-সূত্র-ভাষ্যে পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়কে "পরম" বলিয়াছেন। এখন প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-সমূহে যে সর্ব্বপ্রমাণের মিলন আছে, তাহা বুঝাইতে হইবে; তাই ভাষ্যকার প্রথম-সূত্র-ভাষ্যে সংক্ষেপে সেই কথা বলিয়া আসিলেও এখানে হেতুর উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যে "সম্ভূয়" এই কথার অর্থ মিলিত হইয়া; সংপূর্ব্বক ভূ ধাতুর মিলন অর্থে প্রয়োগ আছে। তাই ভাষ্যকার শেষে "সম্ভব" শব্দের দ্বারাই সেই মিলনকে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যে "সম্ভব" শব্দের অর্থ এখানে মিলন[১]। ভাষ্যকার তাঁহার কথিত প্রমাণচতুষ্টয়ের মিলন বুঝাইতে "প্রথম অবয়ব" প্রতিজ্ঞাকে বলিয়াছেন শব্দবিষয়, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দ-প্রমাণ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার দ্বারাই সাধ্যনির্ণয় হইতে পারায় হেতুপ্রভৃতি প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তবে ভাষ্যকার

১। জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—মহদাদিভিঃ সম্ভূতং মিলিতং। সংপূর্ব্বো ভবতিঃ সংগমার্থে প্রসিদ্ধ এব, সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগেত্যাদৌ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন আচার্য্যগণ সত্তা অর্থেও "সম্ভব" শব্দের প্রয়োগ করিতেন। প্রমাণের সম্ভব, কি না—প্রমাণের সত্তা, এইরূপও ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রমাণপরীক্ষারম্ভ দ্রষ্টব্য।

"প্রতিজ্ঞাকে" শব্দ-প্রমাণ বলিয়াছেন কিরূপে ? উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের প্রতিপাদন করিতেই এই ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি। আত্মা প্রভৃতি পদার্থগুলি শাস্ত্রের দ্বারা যেরূপে বুঝা গিয়াছে, সেইগুলিকে অনুমানের দ্বারা সেইরূপে প্রতিপাদন করাই "ন্যায়ে"র মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা শাস্ত্রার্থে বিবাদ করিবে এবং শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত তত্ত্ব মানিবে না, তাহার বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিবে, তাহাদিগকে যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সেই পদার্থকেই মানাইতে হইবে এবং সেই তত্ত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্যও মানাইতে হইবে, তজ্জন্য "ন্যায়" প্রয়োগ করিয়া বিচার করিতে হইবে। শাস্ত্রের দ্বারা যাহা যেরূপে বুঝা হইয়াছে, তাহাকে সেইরূপে প্রতিপাদন করিতে যে "ন্যায়" প্রয়োগ করা হইবে, তাহাই প্রকৃত ন্যায়। তাহার প্রথম অবয়ব "প্রতিজ্ঞা" শব্দ-প্রমাণ না হইলেও শব্দ-প্রমাণ মূলক অর্থাৎ তাহার মূলে শব্দ-প্রমাণ আছে, কারণ, শব্দ-প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্যে তাহাই বিষয় হইবে। এই জন্য ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাকে শব্দ-বিষয় বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞার মূলে শব্দ-প্রমাণ থাকায় উহা শব্দ-প্রমাণের ন্যায় ; এ জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাকে আগম বলিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা আত্মাদি পদার্থের প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পরম্পরায় ঐ শাস্ত্র-প্রতিপাদিত আত্মাদি পদার্থের প্রতিপাদক হইবে। ফল কথা, যাহা প্রকৃত "ন্যায়", তাহাতে শব্দ-প্রমাণ-বোধিত বিষয়ই সাক্ষাৎ এবং পরম্পরায় প্রতিপাদ্য হয়। সেই ন্যায়ের দ্বারা শাস্ত্র-বোধিত পদার্থেরই দৃঢ়তর বোধ জন্মে এবং তাহাই "ন্যায়ে"র মুখ্য প্রয়োজন। এবং "প্রতিজ্ঞা"কে আগম বলিয়া আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রকৃত প্রতিজ্ঞা হইবে না, উহা "প্রতিজ্ঞাভাস" হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। মূল কথা, শব্দ-প্রমাণ-মূলক প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত প্রতিজ্ঞা, মুখ্য প্রতিজ্ঞা ; তাহাই প্রকৃত ন্যায়ের প্রথম অবয়ব, এ জন্য ভাষ্যকার তাহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়াই ধরিয়াছেন। যে প্রতিজ্ঞা শব্দ-প্রমাণ-মূলক নহে, শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধও নহে, (যেমন "পর্ব্বত বহ্নিমান্" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার ঐ কথা[১] বলেন নাই। সেই সকল "ন্যায়" প্রকৃত ন্যায় নহে, অর্থাৎ যে "ন্যায়" ব্যুৎপাদন করা ন্যায়-বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য, সে "ন্যায়" নহে। ভাষ্যকার এখানে "প্রতিজ্ঞা"কে শব্দবিষয় বলিয়া তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা আপ্তবাক্যের প্রতিসন্ধান করিতে হয়।* এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, আপ্তবাক্যের দ্বারা যাহা বুঝা যাইবে, তাহাকেই অনুমানের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অপরকে বুঝাইতে হইবে। তাহার পরে প্রত্যক্ষের দ্বারা তাহাকে বুঝিলে আর সে বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা থাকিবে না। অলৌকিক তত্ত্বে সমাধি জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে, তখন তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জন্মিবে। ফল কথা, প্রথমতঃ শাস্ত্রের দ্বারা শ্রবণ-জ্ঞান লাভ করিয়া সেই শাস্ত্র-

---

১। তস্মাদ্‌যদ্যপি ন ন্যায়মাত্রবর্ত্তিনী প্রতিজ্ঞা আগমস্তথাপি প্রকৃতন্যায়াভিপ্রায়েণ দ্রষ্টব্যং। তথা চাগমানুসন্ধানেন প্রতিজ্ঞায়াঃ কল্পিতবিষয়ত্বমপি নিরাকৃতং বেদিতব্যং।—প্রথম সূত্রভাষ্যে তাৎপর্য্যটীকা।

জ্ঞাত তত্ত্বেরই অনুমানের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে যে "প্রতিজ্ঞা"-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাতে শাস্ত্র-বোধিত বিষয়ই প্রতিপাদ্য হইবে ; সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞা শব্দ-প্রমাণ-মূলক বলিয়া উহা শব্দ প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আপত্তি হইতে পারে যে, "প্রতিজ্ঞা"বাক্যই শব্দপ্রমাণ কেন হয় না ? উহাকে শব্দ-প্রমাণ-মূলক বলিয়া গৌণভাবে শব্দ-প্রমাণ বলা হইতেছে কেন ? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃত ন্যায়ের প্রথম অবয়ব প্রতিজ্ঞাবাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য হইবে, তদ্বিষয়ে ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই, অর্থাৎ যাঁহারা ঐ সকল অলৌকিক তত্ত্ব দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তদ্বিষয়ের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহা লোকে মানিতে পারে না, এ জন্য তাঁহারা ঐ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া শেষে হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়া সাধ্য পদার্থের সমর্থন করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদিগের ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে শব্দ প্রমাণ থাকায়, তাহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়া বলা হইতেছে। ফল কথা, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তিরা শাস্ত্রগম্য অলৌকিক তত্ত্বে পরতন্ত্র ; তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইতে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলে তাঁহাদিগের ঐ বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

প্রতিজ্ঞার পরে "হেতু"-বাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। হেতুবাক্য বস্তুতঃ অনুমান-প্রমাণ না হইলেও হেতুবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্থের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অনুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য করিয়া তাহার সম্পাদক হেতুবাক্যকে ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, হেতুবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্থের যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমান-প্রমাণ নহে। প্রথমতঃ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুজ্ঞান হয়, তাহার পরে যে স্থানে সেই হেতুর দ্বারা কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, সেই স্থানে হেতুজ্ঞান হয় ; পরার্থানুমানে ইহাই দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান। হেতুবাক্যের দ্বারা এই দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। শেষে যে স্থানে সেই ধর্ম্মটির অনুমান করিতে হইবে, সেই স্থানে সেই অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতুপদার্থটি আছে. এইরূপে হেতুর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই তৃতীয় হেতুজ্ঞান। "উপনয়"-বাক্যের দ্বারা উহা জন্মিয়া থাকে। ঐ তৃতীয় হেতুজ্ঞানের পরেই অনুমিতি জন্মে ; এ জন্য উহাই মুখ্য অনুমান-প্রমাণ। উহা হেতুবাক্যের দ্বারা জন্মে না ; সুতরাং হেতুবাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা যায় কিরূপে ? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া হেতুবাক্য অনুমান-প্রমাণ কেন, তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, উদাহরণে সম্যক্ দর্শন করিয়া হেতুপদার্থের জ্ঞান হয়। ভাষ্যে এখানে "উদাহরণ" শব্দের অর্থ যাহা উদাহৃত হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থ। উদাহরণ বাক্য নহে। "উদাহরণ" শব্দের দ্বারা উদাহরণ বাক্যের ন্যায় দৃষ্টান্ত পদার্থও বুঝা যায়। এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ অর্থেও সূত্রে ও ভাষ্যে "উদাহরণ" শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। অনেক পুস্তকেই এখানে "সাদৃশ্যপ্রতিপত্তেঃ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু "সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই আছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু পদার্থ ও সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়া অর্থাৎ এই পদার্থ থাকিলে সেখানে এই পদার্থ থাকিবেই, ইহা কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে

যথার্থরূপে বুঝিয়া হেতুর জ্ঞান হয় অর্থাৎ সেই ব্যাপ্য পদার্থটিকে হেতু বলিয়া বোধ জন্মে। তাৎপর্য্য-টীকাকার শেষে ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে[1] যদিও প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হেতুজ্ঞান এবং হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি স্মরণ, এই সবগুলিই অনুমান-প্রমাণ (পঞ্চম সূত্র টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), তাহা হইলেও হেতুবাক্যজন্য যে দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান, তাহাকেই এখানে ঐ সমস্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়া অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ পরার্থানুমানস্থলে ঐ দ্বিতীয় হেতু জ্ঞানের সম্পাদক বলিয়া হেতুবাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ফল কথা, হেতুবাক্য-জন্য হেতুজ্ঞানকেও অনুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য করিয়া, উহা যাহা হইতে জন্মে, সেই হেতুবাক্যকে ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উপনয়-বাক্য জন্য যে হেতুজ্ঞান জন্মে, তাহা মুখ্য অনুমান-প্রমাণ হইলেও হেতু-বাক্যজন্য হেতুজ্ঞান ও অনুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য। তাৎপর্য্য-টীকাকার প্রথম সূত্রভাষ্যে এই প্রস্তাবে বার্ত্তিকের তাৎপর্য্যবর্ণনায় বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ যেখানে হেতুপদার্থের জ্ঞান হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থকে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়াই জ্ঞান হয়। শেষে যখন সেই হেতুর দ্বারা কোন স্থানে সেই সাধ্যধর্ম্মটির অনুমান হয়, তখন সেই স্থানে যে দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান হয়, তাহা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া হেতুর জ্ঞান না হইলেও উহার দ্বারা হেতুপদার্থে পূর্ব্বানুভূত সেই ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের স্মৃতি জন্মে; সুতরাং উহা ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্মারক হওয়ায়, ঐ ব্যাপ্তি স্মরণরূপ অনুমানের সহকারী কারণ। এই ভাবে অনুমান-প্রমাণের সহকারী কারণ ঐ দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানও অনুমান-প্রমাণ হওয়ায় তাহার সম্পাদক হেতুবাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ফলতঃ হেতুবাক্য যদি অনুমান-প্রমাণ সম্পাদন করিল, তাহা হইলে হেতুবাক্যকে ঐ ভাবে অনুমান প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে; ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন, বস্তুতঃ হেতুবাক্যটিই যে অনুমান-প্রমাণ, ইহা ভাষ্যকারের কথা নহে। মনে রাখিতে হইবে, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়বে চারিটি প্রমাণের মিলন দেখাইতেই ভাষ্যকার এ সকল কথা বলিয়াছেন। ন্যায়বাক্যের সাহায্যে যখন অনুমান-প্রমাণকেই মুখ্যরূপে আশ্রয় করা হয়, তখন সেখানে অনুমান-প্রমাণ মুখ্যরূপেই আছে।

হেতুবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে, হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহার দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে অনুমেয় পদার্থের সিদ্ধি (অনুমিতি) হয়। শেষে তাৎপর্য্য বলিয়াছেন যে, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হইতে গেলে তাহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছেই নচেৎ অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না। অনুমানের দ্বারা তাহার জ্ঞান যেখানে হইবে, সেখানে হেতু আবশ্যক; সেই হেতু থাকিলেই যে সেই

১। এতদুক্তং ভবতি যদ্যপি ত্রয়াণামপি লিঙ্গদর্শনানাং সম্মৃতীনামনুমানত্বং তথাপি তদেকদেশে মধ্যমেঽপি লিঙ্গদর্শনে সমুদায়োপচারাদনুমান ব্যপদেশ ইতি—(তাৎপর্য্যটীকা)।

পদার্থটি সেখানে থাকিবেই, ইহা যথার্থরূপে নিশ্চয় করা আবশ্যক। ইহাকেই বলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়, ইহার জন্য দৃষ্টান্ত আবশ্যক। অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিলে সেই অনুমানের হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছেই; এই জন্যই মহর্ষি অনুমানকে প্রত্যক্ষ-বিশেষমূলক জ্ঞান বলিয়াছেন। ফলকথা, কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে, হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, তাহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকায় এবং উদাহরণ-বাক্যটি সেই মূলভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উত্থিত হওয়ায়, উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ উদাহরণ-বাক্যটি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাহা নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথম সূত্র-ভাষ্যে এই প্রস্তাবে বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যে প্রত্যক্ষ পদার্থটিতে পূর্ব্বে হেতু-পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে, উদাহরণ-বাক্যটি সেই পদার্থের স্মারক হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থলে যেমন কোন বিবাদ থাকে না, তদ্রূপ উদাহরণ-বাক্য বলিলেও কোন বিবাদ থাকে না; কারণ, উদাহরণ-বাক্যটি মূলভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উত্থিত, সুতরাং উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুল্য; এই জন্য উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে।

উদাহরণ-বাক্যের পরে "উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, উপমান-বাক্যে যে "তথা" শব্দটি থাকে, উপনয়-বাক্যেও সেইরূপ "তথা" শব্দ থাকায় উপনয়বাক্যে উপমান-বাক্যের একাংশ থাকে (ষষ্ঠ সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।) তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, "তথা চায়ং" অর্থাৎ "ইহা তদ্রূপ" (তৎসদৃশ), এইরূপে প্রবর্ত্তমান উপনয়-বাক্য "তথা" শব্দকে অপেক্ষা করে, সুতরাং উপনয়বাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত উদাহরণ-বাক্যে যে "যথা" শব্দ থাকে, তাহার সহিত উপনয়বাক্যস্থ "তথা" শব্দের যোগ হওয়ায় একটা সাদৃশ্য বোধ জন্মে। যেমন "যথা পাকশালা তথা পর্ব্বত", "যথা স্থালী তথা শব্দ" ইত্যাদি। উপমান-প্রমাণের মূল উপদেশ-বাক্য এবং তাহার অর্থ স্মরণ এবং সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ, এই সবগুলিই কেহ সাক্ষাৎ ও কেহ পরম্পরায় উপমান-প্রমাণ। তন্মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষরূপ উপমান-প্রমাণের একাংশ সাদৃশ্যে যে "যথা তথা ভাব"টি থাকে, অর্থাৎ যেমন "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্যের দ্বারা অবগত সাদৃশ্যে যে ভাবটি থাকে, উপনয়-বাক্যেও ঐ "যথা তথা ভাব"টি থাকে বলিয়া তাহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ উপমান-বাক্য বস্তুতঃ উপমান-প্রমাণ না হইলেও উপমান-প্রমাণ সদৃশ বলিয়া ভাষ্যকার তাহাতে "উপমান" শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিষয়ে আরও চিন্তা করা উচিত মনে হয়। প্রথম কথা মনে করিতে হইবে যে, ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাদি অবয়বসমূহে চারিটি প্রমাণ দেখাইবার জন্যই "উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। ন্যায়বাক্যে চারিটি প্রমাণ সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, ইহাই কিন্তু ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য এবং এই যুক্তিতেই ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকে "পরম ন্যায়" বলিয়াছেন। এ কথা উদ্যোতকর ও বাচস্পতি

মিশ্রও সেখানে লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যায় প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণমূলক, এইরূপ কথাও তাৎপর্য্যটীকাকার এবং তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির প্রকাশ-টীকাকার প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। কিন্তু যদি উপনয়-বাক্যে উপমান-প্রমাণের বস্তুতঃ কোন বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যে কোন একটা সাদৃশ্য লইয়া উপনয়বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিলে উপনয়-বাক্যের মূলে উপমান-প্রমাণ আছে, ইহা বলা হয় না। তাহা না বলিতে পারিলেও প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-সমূহে সর্ব্বপ্রমাণ মিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। উপনয়বাক্য যদি উপমান-প্রমাণের ফল নিষ্পাদন না করে, তাহা হইলে আর কিরূপে উহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়? কেবল উপমান-প্রমাণের যে কোন একটা সাদৃশ্য থাকাতেই উপনয়বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমার মনে হয়, ভাষ্যকারের মতে "উপনয়"-বাক্যের দ্বারা যে সাদৃশ্যবোধ জন্মে, "উপনয়"-বাক্যটি ঐরূপ সাদৃশ্য-জ্ঞানমূলক,—ঐ সাদৃশ্য-জ্ঞানকেই উপমান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার "উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উপনয়-বাক্য সাদৃশ্য-জ্ঞানমূলক এবং সাদৃশ্যজ্ঞানরূপ উপমান-প্রমাণের নিষ্পাদক। "যেমন স্থালী, তদ্রূপ শব্দ" এইরূপ বাক্যার্থবোধ হইলে অনিত্য স্থালীর সহিত শব্দের একটা সাদৃশ্যবোধ জন্মে। প্রদর্শিত স্থলে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বই সেই সাদৃশ্য। "স্থালী যেমন উৎপত্তিধর্ম্মক, শব্দও তদ্রূপ উৎপত্তিধর্ম্মক" ইহাই ঐ স্থলে উপনয়-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উদাহরণ-বাক্যে "যথা" শব্দ না থাকিলেও উপনয়-বাক্যে "তথা" শব্দ থাকায় "যথা" শব্দের জ্ঞানপূর্ব্বক উপনয়-বাক্যের দ্বারাই ঐরূপ সাদৃশ্য বোধ জন্মে। অবশ্য ঐরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানকে এবং তাহার ফল তত্ত্বজ্ঞানকে কোন নৈয়ায়িকই উপমান-প্রমাণ ও উপমিতি বলেন নাই। শব্দবিশেষের অর্থবিশেষ নিশ্চয়ই উপমান-প্রমাণের ফল বলিয়া প্রধান ন্যায়াচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপমানের অতিরিক্ত প্রামাণ্য সমর্থনে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও ঐ সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যখন "উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন, তখন তিনি উপমানের দ্বারা শব্দার্থ-নিশ্চয় ভিন্ন অন্য প্রকার বোধও জন্মে—এই মতাবলম্বী, ইহা বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু ভাষ্যকার মহর্ষি গোতমের উপমান-লক্ষণ-সূত্রের (৬ সূত্র) ভাষ্যে উপমান-প্রমাণের প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে[১], "ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।" তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা সেখানে বৈধর্ম্ম্যোপমিতির সমর্থন করিয়াছেন এবং সেখানে ভাষ্যকারকে "ভগবান্" বলিয়া ভাষ্যকারের মত অবশ্য-গ্রাহ্য এবং উহাও মহর্ষি গোতমের সম্মত, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন (ষষ্ঠ সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)।

উপমান-প্রমাণের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নোত্তরে ভাষ্যকার ষষ্ঠ সূত্রভাষ্যে প্রথমে সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সম্বন্ধ-নিশ্চয়কে অর্থাৎ এই পদার্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপে শব্দার্থ-নিশ্চয়কে উপমান-প্রমাণের

১। এবমন্যোঽপ্যুপমানস্য লোকে বিষয়ো বুভুৎসিতব্যঃ।—ষষ্ঠ সূত্রভাষ্য।

প্রয়োজন বলিয়াছেন। এবং সেখানে "ইহা (মহর্ষি) বলিয়াছেন", এইরূপ কথাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার পরে ভাষ্যকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 'ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।" ভাষ্যকার ঐ ভাবে শেষে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? তাহা ভাবিতে হইবে। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, জগতে সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্যরূপ তত্ত্বও উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, মহর্ষি গোতম ইহা কণ্ঠতঃ না বলিলেও ইহা তাঁহার মত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে শব্দার্থ-নিশ্চয়ের ন্যায় অন্যরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ও উপমান-প্রমাণের দ্বারা অনেক স্থলে হইয়া থাকে, ইহা ভাষ্যকারের মত বলা যাইতে পারে। এবং তাহা হইলে ভাষ্যকার যে উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহাও সুসংগত হইতে পারে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ[১] ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখ করিয়া যেরূপ উদাহরণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি ঐরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা না করিলেও এবং শব্দার্থ-নিশ্চয় ভিন্ন অন্যরূপ তত্ত্বের নিশ্চয়ও উপমানের দ্বারা হইয়া থাকে, এই মত কোন প্রধান ন্যায়াচার্য্য স্বীকার না করিলেও ভাষ্যকারের যে ঐরূপ মত ছিল, ইহা বুঝিবার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি সুধীগণের চিন্তনীয়।

বস্তুতঃ "গবয়" শব্দ "করভ" শব্দ প্রভৃতির অর্থ-নিশ্চয়ই যদি কেবল উপমান-প্রমাণের ফল হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপযোগিতা বিশেষ কিছুই থাকে না। যদি উহার দ্বারা অন্যরূপ তত্ত্ব-নিশ্চয়ও জন্মে, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপযোগিতা থাকিতে পারে। নচেৎ উপমান-প্রমাণ মুমুক্ষুর কোন্ বিশেষ কার্য্যে আবশ্যক, এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া যায় না। বেদাদি শাস্ত্রে অনেক স্থানে সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়া অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সকল স্থানের অনেক স্থলে সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝা যায়, তাহাকে উপমান-প্রমাণের ফল বলিলে উপমান-প্রমাণ বিশেষরূপে মোক্ষোপযোগী হইতে পারে। মীমাংসকগণ উপমান-প্রমাণের ঐরূপই উপযোগিতা বর্ণন করিয়াছেন। ভট্ট কুমারিলের "শ্লোকবার্ত্তিকে"র "উপমান পরিচ্ছেদ" দেখিলে ইহা পাওয়া যাইবে। মীমাংসাভাষ্যকার শবর স্বামীও উপমান-প্রমাণের দ্বারা অন্যবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ের কথা[২] বলিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা "উপমান" নামে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার করা আবশ্যক মনে করেন নাই, তাঁহারা ঐরূপ বলিতে পারেন না। কিন্তু মহর্ষি গোতম যখন মীমাংসকের ন্যায় উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তখন মীমাংসকের ন্যায় "উপমান"-প্রমাণের দ্বারা স্থলবিশেষে অন্যবিধ তত্ত্ব-নিশ্চয়ও জন্মে, ইহা গোতমের মত ছিল বলিতে বাধা কি? তবে শব্দবিশেষের অর্থবিশেষ নিশ্চয় কোন কোন স্থলে "উপমান" প্রমাণের দ্বারাই হয়,

---

১। এবমন্যোঽপ্যুপমানস্য বিষয় ইতি ভাষ্যং যথা—মুদ্গপর্ণী সদৃশী ওষধী বিষং হন্তীত্যাদিদেশবাক্যার্থে জ্ঞাতে মুদ্গপর্ণী সাদৃশ্যজ্ঞানে জাতে ইয়মোষধী বিষহরণীত্যুপমিত্যাবিষয়ী ক্রিয়ত ইত্যাদি :—ষষ্ঠ সূত্রবৃত্তি।

২। উপমানাচ্চোপদিশ্যতে যাদৃশং ভবান্ স্বয়মাত্মানং পশ্যতি অনেনোপমানেনাবগচ্ছ অহমপি তাদৃশমেব পশ্যামীতি ইত্যাদি।—(শবর-ভাষ্য, পঞ্চম সূত্র)।

উহা সেখানে অন্য প্রমাণের দ্বারা হইতেই পারে না; সুতরাং "উপমান" নামে অতিরিক্ত প্রমাণ সিদ্ধ পদার্থ, এইটি গোতমের বিশেষ যুক্তি। এই জন্যই মহর্ষি গোতম "উপমানে"র অতিরিক্ত প্রামাণ্য সমর্থন স্থলে ঐ কথাটিরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারি। তাহাতে "উপমান"-প্রমাণের অন্য ফলের নিষেধ করা হয় নাই। পরন্তু নিষেধ না করিলে পরের মত অনুমত হয়, এ কথা চতুর্থ সূত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার উপমান-প্রমাণ স্থলেও গোতমের অনিষিদ্ধ মীমাংসক-মত গোতমের অনুমত বলিবেন না কেন ?

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাগুলিতে পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণের সম্মতি না থাকিলেও ভাষ্যকার যখন "উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং ষষ্ঠ সূত্রভাষ্য শেষে "ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় আছে" এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তখন ভাষ্যকারের উপমানের বিষয় বিষয়ে মত কিরূপ, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। এবং উপনয়-বাক্যের মূলে যদি বস্তুতঃ উপমান-প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যকার উপনয়-বাক্যকে কিরূপে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং কিরূপেই বা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বে সর্ব্বপ্রমাণ মিলিত হইয়া বস্তু সাধন করে, এই কথা বলিয়াছেন, ইহাও সুধীগণ চিন্তা করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিবেন। সুধীগণের সমালোচনার জন্যই পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি লিখিত হইল।

"বৈধর্ম্ম্যোপনয়"-বাক্য স্থলেও ফলে সাধ্যধর্ম্মীতে প্রকৃত হেতুরই উপসংহার হইয়া থাকে। কারণ, ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে "শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে" এইরূপ বাক্যই "বৈধর্ম্ম্যোপনয়।" উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের ন্যায় অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব নাই। তাহা হইলে শব্দে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব আছে, ইহাই বুঝা হয়। তাহা হইলে ঐ স্থলে শব্দরূপ সাধ্যধর্ম্মীতে অনিত্যত্বধর্ম্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব হেতু, তাহারই উপসংহার বা নিশ্চয় হয়। শব্দে ঐ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বের জ্ঞানই শব্দে আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্ম্য-জ্ঞান। ঐ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বকে আত্মা প্রভৃতির বৈধর্ম্ম্যরূপে পূর্ব্বোক্ত "বৈধর্ম্ম্যোপনয়"-বাক্যের দ্বারা বুঝা হয়; সুতরাং "বৈধর্ম্ম্যোপনয়"-বাক্যকে বৈধর্ম্ম্যোপমান বলিয়াই ভাষ্যকার বলিবেন। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্যবিধ তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য বৈধর্ম্ম্যোপমানও ভাষ্যকারের সম্মত বলিয়া বুঝা যায়; নচেৎ "বৈধর্ম্ম্যোপনয়" স্থলে ভাষ্যকার উপমান বলিয়া ধরিবেন কাহাকে ? ভাষ্যকার এখানে নিজেই বলিয়াছেন যে, "তদ্রূপ নহে" এই কথার দ্বারা উপমানের ধর্ম্ম নিষেধ করিলেও তদ্দ্বারা বিপরীত ধর্ম্মেরই উপসংহার হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলের "উপনয়"কে যখন "বৈধর্ম্ম্যোপনয়" বলা হইয়াছে, তখন ঐ "উপনয়"কে ভাষ্যকার "বৈধর্ম্ম্যোপমান" বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিতেন, ইহা বুঝা যায়।

"তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি"তে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও "নিগমন"-বাক্যেও প্রমাণ-বিশেষের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলেও ভাষ্যকার সামান্যতঃ অবয়ব-সমূহে সর্ব্বপ্রমাণের মিলন আছে বলায়, শেষে "নিগমনে"র মূল বলিয়া কোন প্রমাণের উল্লেখ না করাতেও কোন দোষ হয় নাই। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যেই তাঁহার সর্ব্বপ্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়া গিয়াছে।

পরন্তু গোতম-মতে প্রত্যক্ষাদি চারিটি ভিন্ন কোন প্রমাণ নাই। "নিগমন"-বাক্যের মূলে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ না থাকায় উহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভাষ্যকার "নিগমন"-বাক্যের প্রয়োজন বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, সবগুলির একার্থবোধে সামর্থ্য-প্রদর্শক বাক্যই "নিগমন"। তাৎপর্য্যটীকাকার এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি উপনয় পর্য্যন্ত চারিটি বাক্যের একটি অর্থ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য যে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতু, অথবা অনুমেয়ধর্ম্ম, তাহা বুঝিতে ঐ চারিটি বাক্যের যে সামর্থ্য অর্থাৎ পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা আবশ্যক, নিগমনবাক্য তাহারই প্রদর্শক অর্থাৎ বোধক। শেষে বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য যে হেতু, তাহার জ্ঞান নিগমনের গৌণ প্রয়োজন। সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের জ্ঞানই নিগমনের মুখ্য প্রয়োজন। নিগমনের প্রয়োজন এইরূপে দ্বিবিধ। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথম সূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় এই স্থলে বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য মিলিত হইয়া যে একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাতে ঐ চারিটি বাক্যের একবাক্যতা-বুদ্ধি আবশ্যক। ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা না বুঝিলে উহাদিগের[১] একবাক্যতা বুঝা হয় না। প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের এবং উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের পরস্পর সাকাঙ্ক্ষতাই ভাষ্যে "সামর্থ্য" শব্দের অর্থ। নিগমন-বাক্য উহা বুঝাইয়া থাকে, এ জন্য নিগমন-বাক্য আবশ্যক। বিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারিত "অবয়ব"গুলির যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহাকে "আকাঙ্ক্ষা" বলে। ভাষ্যকার শেষে সেই আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষাও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা-বাক্যই সর্ব্বপ্রধান। কারণ, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। "প্রতিজ্ঞা" না থাকিলে হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগই হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে প্রতিজ্ঞা বলিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে হেতু কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। প্রথমেই হেতুবাক্যের অপেক্ষা থাকে না। হেতুবাক্য না বলিলেও সাধ্যধর্ম্মের সাধন কি, তাহা বলা হয় না, দৃষ্টান্ত এবং সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুপদার্থ আছে, ইহাও বলা হয় না,—হেতুকথন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পুনর্ব্বচনরূপ নিগমন-বাক্যও বলা যাইতে পারে না। কারণ, এ সমস্তই হেতুসাপেক্ষ। উদাহরণবাক্য না বলিলে দৃষ্টান্ত কি, তাহা বুঝা যায় না; সুতরাং দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যকে

১। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি বাক্য বিচ্ছিন্নরূপেই উচ্চারিত হয়। উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা না বুঝিলে উহাদিগের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝা যাইতে পারে না। পৃথক্ পৃথক্ বাক্যের দ্বারা পৃথক্ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন চারিটি অর্থই বুঝা যাইতে পারে; সুতরাং উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝা আবশ্যক। উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই এখানে উহাদিগের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা। উহা বুঝিলেই ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের "একবাক্যতা" বুঝা হয় এবং উহারই নাম "বাক্যৈকবাক্যতা।" মহর্ষি জৈমিনি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন,—"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষঞ্চেদ্বিভাগে স্যাৎ" (পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন, ২অঃ, ১পাদ, ৪৬ সূত্র) অর্থাৎ বিচ্ছিন্নরূপে পঠিত বাক্যগুলি যদি পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হয়, তাহা হইলে একার্থের প্রতিপাদক হওয়ায় উহারা "একবাক্য" হয়। অনুমিতিদীধিতির টীকায় গদাধর ভট্টাচার্য্য "একবাক্যতা" বুঝাইতে জৈমিনির এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া শেষে ফলিতার্থ বলিয়াছেন যে, পরস্পর মিলিত হইয়া বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাদকতাই একবাক্যতা।

সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, উদাহরণানুসারে উপনয়বাক্যও বলা যায় না। উপনয়বাক্য না বলিলেও সাধ্যধর্ম্মীতে হেতু আছে, ইহা বলা হয় না ; সুতরাং হেতুরূপে গৃহীত পদার্থ সাধ্যসাধন করিতে পারে না। নিগমন-বাক্য না বলিলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ অভিব্যক্ত হয় না অর্থাৎ উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায় না; তাহা না বুঝিলেও অর্থাৎ উহাদিগের পরস্পর-সাকাঙ্ক্ষতা না বুঝিলেও উহাদিগের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ হইতে পারে না। ভাষ্যে "একার্থেন প্রবর্ত্তনং" এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে, একার্থ-বিশিষ্ট-রূপে প্রবর্ত্তকতা। শেষে আবার ঐ কথারই বিবরণ করিয়াছেন,—"তথেতি প্রতিপাদনং"। অর্থাৎ নিগমনবাক্য ব্যতীত আর কেহ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যকে সেই প্রকারে (উহারা যে একার্থযুক্ত, উহারা যে পরস্পর-সাকাঙ্ক্ষ, উহারা যে একবাক্য, এই প্রকারে) প্রতিপাদন করিতে পারে না। নিগমন-বাক্যই উহাদিগকে ঐ প্রকার বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। নিগমন-বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, উহারা একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতেই প্রযুক্ত। ভাষ্যে "প্রতিপাদন" বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে প্রতিপাদকতা।

ভাষ্য। অথাবয়বার্থঃ—সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণা সম্বন্ধোপাদানং প্রতিজ্ঞার্থঃ। উদাহরণেন সমানস্য বিপরীতস্য বা সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধক-ভাববচনং হেত্বর্থঃ। ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধন-ভাবপ্রদর্শনমেকত্রোদাহরণার্থঃ। সাধনভূতস্য ধর্ম্মস্য সাধ্যেন ধর্ম্মেণ সামানাধিকরণ্যোপপাদনমুপনয়ার্থঃ। উদাহরণস্থয়োর্দ্ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবোপপত্তৌ সাধ্যে বিপরীত-প্রসঙ্গ-প্রতিষেধার্থং নিগমনম্।

ন চৈতস্যাং হেতূদাহরণ-পরিশুদ্ধৌ সত্যাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্য-বস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বং প্রক্রমতে। অব্যবস্থাপ্য খলু ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবমুদাহরণে জাতিবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে। ব্যবস্থিতে হি খলু ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবে দৃষ্টান্তস্থে গৃহ্যমাণে সাধনভূতস্য ধর্ম্মস্য হেতুত্বেনোপাদানং, ন সাধর্ম্ম্যমাত্রস্য ন বৈধর্ম্ম্যমাত্রস্য বেতি।

অনুবাদ। অনন্তর অবয়বগুলির প্রয়োজন (বলিতেছি)। ধর্ম্মীর সহিত অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মীর সহিত সাধ্য ধর্ম্মের সম্বন্ধের প্রতিপাদন "প্রতিজ্ঞা"র প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান অথবা বিপরীত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ সাধ্যধর্ম্মের সাধকত্ব কথন অর্থাৎ কোন্ পদার্থ ঐ সাধ্যধর্ম্মের সাধন, তাহা বলা "হেতু"বাক্যের প্রয়োজন। এক পদার্থে (দৃষ্টান্ত নামক কোন এক পদার্থে) দুইটি ধর্ম্মের সাধ্য-

সাধনভাব প্রদর্শন অর্থাৎ এই ধর্ম্মটি সাধ্য, এই ধর্ম্মটি তাহার সাধন, ইহা প্রদর্শন করা "উদাহরণ"-বাক্যের প্রয়োজন। সাধনভূত ধর্ম্মটির অর্থাৎ হেতু-পদার্থটির সাধ্যধর্ম্মের সহিত একত্র অবস্থিতি প্রতিপাদন করা "উপনয়"-বাক্যের প্রয়োজন, অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের আধার যে সাধ্যধর্ম্মী, তাহাতে হেতুপদার্থ আছে, ইহা বুঝানই উপনয়-বাক্যের প্রয়োজন, উপনয়-বাক্যের দ্বারা উহাই বুঝান হয়। দৃষ্টান্ত পদার্থে অবস্থিত দুইটি ধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাবের জ্ঞান হইলে সাধ্যধর্ম্মীতে বিপরীত প্রসঙ্গ নিষেধের জন্য "নিগমন" অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে একটি ধর্ম্মকে সাধ্য এবং একটি ধর্ম্মকে তাহার সাধন বলিয়া বুঝিলেও যে ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের সাধন করা উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্ম নাই, এইরূপ বিপরীত ধর্ম্মের আপত্তি নিরাস করা "নিগমন"-বাক্যের প্রয়োজন।

হেতু ও উদাহরণের এই পরিশুদ্ধি হইলে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা দোষ প্রদর্শনের নানা-প্রকারতা বশতঃ "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র বহুত্ব ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ "হেতু" ও "উদাহরণ" বিশুদ্ধ হইলে বহুবিধ "জাতি" নামক অসদুত্তর এবং বহুবিধ "নিগ্রহস্থান" হইতে পারে না। কারণ, জাতিবাদী অর্থাৎ জাতি নামক অসদুত্তরবাদী দৃষ্টান্ত পদার্থে দুইটি ধর্ম্মের সাধ্যসাধন ভাব ব্যবস্থাপন না করিয়া দোষ উল্লেখ করে। কিন্তু দুইটি ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থিত সাধ্যসাধন ভাবকে ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিশ্চিত বলিয়া জানিলে সাধনভূত ধর্ম্মের হেতুরূপে গ্রহণ হয়, অর্থাৎ যে ধর্ম্মটিকে প্রকৃত সাধ্যধর্ম্মের সাধন বলিয়াই যথার্থরূপে নিশ্চয় করে, সেই ধর্ম্মটিকেই হেতুরূপে গ্রহণ করে, সাধর্ম্ম্য মাত্রের (হেতুরূপে) গ্রহণ হয় না, অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্রের (হেতুরূপে) গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টান্তে কোন পদার্থকে সাধ্যসাধন বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চয় করিলে, যাহা বস্তুতঃ সাধ্যসাধন নহে, এমন কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য মাত্রকে হেতুরূপে গ্রহণ করে না; সুতরাং বহুবিধ অসদুত্তর করিতে হয় না, পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইতেও হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বভাষ্যে অবয়বগুলির প্রয়োজন একরূপ বলা হইলেও আবার ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার অন্য ভাবে অবয়বগুলির প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে "অবয়বার্থঃ" এখানে অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য স্থলে যথাক্রমে তাঁহার কথিত প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ (১) "শব্দ অনিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দধর্ম্মীর সহিত অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝান হয় অর্থাৎ শব্দধর্ম্মী অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, এই প্রতিপাদ্যটি প্রকাশ করা হয়। তাহার পরে শব্দধর্ম্মীতে যে

অনিত্যত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহার সাধক কি ? ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। এ জন্য (২) উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক, এইরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব অনিত্যত্বের সাধক, ইহা বলা হয়; ইহাই ঐ হেতুবাক্যের প্রয়োজন। তাহার পরে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব যে অনিত্যত্বের সাধক হয় অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব থাকিলেই যে সেখানে অনিত্যত্ব থাকিবেই, ইহা বুঝাইতে হইবে। এই জন্য (৩) "উৎপত্তিধর্ম্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়" এইরূপ উদাহরণবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝান হয়। ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা অনিত্য, স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যে ইহা দেখা গিয়াছে। আবার "অনুৎপত্তিধর্ম্মক আত্মা প্রভৃতি নিত্য" এইরূপ বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাও বুঝা যায় যে, যাহা যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, সে সমস্ত অনিত্য। ফলকথা, অনিত্যত্ব সাধ্যধর্ম্ম, উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব তাহার সাধন; ইহা স্থালী প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত এবং আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তে বুঝিয়া উদাহরণবাক্যের দ্বারা তাহাই বুঝান হয়। তাহা বুঝানই ঐ উদাহরণবাক্যের প্রয়োজন। তাহার পরে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বকে অনিত্যত্বের সাধন বলিয়া বুঝিলেও ঐ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব যে শব্দে আছে, ইহা না বুঝিলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান হয় না, এ জন্য তাহা বুঝাইতে হইবে। তাহা বুঝাইবার জন্যই (৪) "শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তিধর্ম্মক" অথবা "শব্দ তদ্রূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে" এইরূপ উপনয়-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। ফলতঃ শব্দধর্ম্মীতে যে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে, ইহা বুঝানই ঐ উপনয়-বাক্যের প্রয়োজন। উপনয়বাক্যের এই প্রয়োজন অনেক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ইহার প্রচুর প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ মহর্ষি গোতমের মত রক্ষণের জন্য ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা উপনয়বাক্যের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের কথা এই যে, হেতুবাক্যের দ্বারাই উপনয়বাক্যের কার্য্য হইয়া থাকে। "শব্দ অনিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলিয়া, "উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক" এই কথা বলিলে ঐ উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব শব্দে আছে, ইহা বাদীর অভিপ্রেত বলিয়াই বুঝা যায়। নচেৎ বাদী শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বকে হেতু বলিবেন কেন ? যাহাকে বাদী হেতুরূপে উল্লেখ করিবেন, তাহা বাদীর মতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মীতে নিশ্চয়ই আছে, ইহা বাদীর হেতুবাক্যের দ্বারাই বুঝা যায়। ন্যায়াচার্য্যগণের কথা এই যে, সাধ্যধর্ম্মের হেতু কি ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষানুসারে যে হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তাহার দ্বারা কেবল হেতুরই জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই পদার্থটি জ্ঞাপক, এইমাত্র জ্ঞানই তাহার দ্বারা হয়। ঐ হেতু বা জ্ঞাপক পদার্থটি যে সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝা যায় না। কারণ, তাহার বোধক কোন শব্দ হেতুবাক্যে থাকে না। প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের কথা এই যে, তাৎপর্য্য চিন্তা করিলেই হেতুবাক্যের দ্বারা উহা বুঝা যায়। ন্যায়াচার্য্যগণের কথা এই যে, যখন বিপক্ষের সহিত বিচারে মধ্যস্থের নিকটে নিজের বক্তব্যগুলি বুঝাইতে হইবে, তখন স্পষ্ট বাক্যের দ্বারাই তাহা বুঝান উচিত। পরন্তু সকল ব্যক্তিই সর্ব্বত্র বাদীর তাৎপর্য্য চিন্তা করিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারাই উপযুক্ত মধ্যস্থ বাদীর অভিমত

হেতু প্রভৃতি বুঝিতে পারেন; আর হেতুবাক্য প্রভৃতি সেখানে আবশ্যক কি? এইরূপ হেতুবাক্য প্রভৃতি যে কোন অবয়বের দ্বারা বাদীর তাৎপর্য্য চিন্তা করিয়া বাদীর প্রতিজ্ঞা বুঝিতে পারিলে আর সেখানে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োজন কি? পরন্তু উপনয়বাক্য না বলিলে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতুপদার্থ সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ যাহাকে লিঙ্গপরামর্শ বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান আর কোন বাক্যের দ্বারা জন্মে না, সুতরাং সেই জ্ঞান জন্মাইতেও উপনয়-বাক্য বলিতে হইবে। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তির উপন্যাস করিয়া উপনয়-বাক্যের সার্থকতা সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীনগণের মধ্যে সকলেই উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতু-পদার্থ সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, এইরূপ বোধ জন্মে, এই মত স্বীকার করেন নাই। অনেকের মতে উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীতে হেতুমাত্রেরই জ্ঞান হয়। উদাহরণবাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থকে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিলে, শেষে ঐ হেতু সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, ইহাই উপনয়-বাক্যের দ্বারা বুঝে অর্থাৎ উপনয়-বাক্যজন্য বোধে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি বিষয় হয় না। এবং এই হেতু এই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং এই হেতু সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, এইরূপ যথাক্রমে উৎপন্ন দুইটি জ্ঞানের পরেই অনুমিতি জন্মে; ইহাই অনেক প্রাচীনের সিদ্ধান্ত। অনেকে ভাষ্যকারেরও উহাই মত বলিয়া থাকেন। ভাষ্যকার এখানে উপনয়-বাক্যের যাহা প্রয়োজন বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তাঁহার ঐ মত অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উপনয়বাক্যের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে এবং মহর্ষির উপনয়সূত্রের "তথা" শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, মহর্ষি ও ভাষ্যকার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য যে হেতু, তাহা সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, এইরূপ বোধই উপনয়বাক্যের ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উদাহরণবাক্যের দ্বারা হেতু-পদার্থকে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝা যায় এবং সেইরূপ হেতু দৃষ্টান্ত-পদার্থে আছে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং উদাহরণবাক্যের পরে (পূর্ব্বোক্ত স্থলে) "শব্দ তদ্রূপ উৎপত্তি-ধর্ম্মক" এইরূপ উপনয়-বাক্য বলিলে শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব আছে, এইরূপ বোধ জন্মিতে পারে। ঐরূপ বোধের নামই লিঙ্গপরামর্শ। নব্য নৈয়ায়িকগণও উপনয়-বাক্যজন্য ঐরূপ বোধই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানয়ং" এইরূপ উপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে ঐ বাক্যের সমানার্থক-রূপে "তথা চায়ং" এইরূপ উপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি "তথা" এই শব্দের দ্বারাই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য হেতু-বিশিষ্ট, এইরূপ অর্থ প্রকটিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেন, বলিতেই হইবে।

সে যাহা হউক, মূলকথা এই যে, উপনয়বাক্য সর্ব্বত্রই বলিতে হইবে, ইহা ন্যায়াচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। তবে উদাহরণ-বাক্যের সার্ব্বত্রিক প্রয়োগ সকল নৈয়ায়িক স্বীকার করেন নাই। অনেকে বলিয়াছেন যে, যে হেতুতে, যে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিষয়ে কাহারই কোন বিবাদ নাই, সেখানে ব্যাপ্তিপ্রদর্শনের জন্য উদাহরণ-বাক্য বলা নিষ্প্রয়োজন। যেমন ব্যভিচারী হেতু হইলেই তাহা সাধক হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং কোন বাদী প্রতিবাদীর ব্যভিচারী হেতুকে

অসাধক বলিয়া বুঝাইতে "ব্যভিচারিত্ব"রূপ হেতুর উল্লেখ করিয়া উদাহরণবাক্যের প্রয়োগ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, উহা নিষ্প্রয়োজন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ প্রভৃতি এই মত স্বীকার করেন নাই। বাদীর নিজ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বোক্ত স্থলেও উদাহরণবাক্য বলিতে হইবে, যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়বেরই প্রয়োগ না করিলে তাহা "ন্যায়"ই হইবে না, ইহাই রঘুনাথ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত[১]। জৈন নৈয়ায়িকগণ বাদবিচারে প্রতিজ্ঞা ও হেতু এই দুইটি মাত্র অবয়বের প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলিলেও স্থলবিশেষে তিনটি এবং চারিটি এবং নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়বেরই প্রয়োগ কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়াছেন[২]।

পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যের প্রয়োজনও অনেক সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্ব্বে নিগমনবাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিলেও শেষে উহার আরও একটি প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও শেষে ঐ ভাবেই নিগমনবাক্যের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও নিগমনের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় উদ্যোতকরের ঐ কথা গ্রহণ করিয়া নিগমন-বাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। সে কথাটি এই যে, উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবোধ হইলেও এবং উপনয়-বাক্যের দ্বারা ঐ হেতু-পদার্থ সাধ্যধর্ম্মীতে আছে, ইহা বুঝা গেলেও বাদীর সাধ্যধর্ম্ম তাহার সাধ্যধর্ম্মীতে নাই, এইরূপ বিপরীত প্রসঙ্গ নিষেধের জন্য নিগমন-বাক্য আবশ্যক। শব্দ অনিত্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলেই শব্দে অনিত্যত্ব আছে, ইহা সিদ্ধ হইয়া যায় না। উহা সিদ্ধ করিতে হেতু, উদাহরণ এবং উপনয়বাক্য বলিতে হয়। কিন্তু উপনয়-বাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও শব্দে যদি বস্তুতঃই অনিত্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থলীয় হেতু "বাধিত" নামক হেত্বাভাস হইবে, উহা হেতু হইবে না। এবং যদি উভয় পক্ষে পরস্পর-প্রতিকূল তুল্যবল দুইটি হেতুর প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ঐ দুই হেতুই "সৎপ্রতিপক্ষিত" নামক হেত্বাভাস হইবে, উহা হেতু হইবে না। "অবাধিত" এবং "অসৎপ্রতিপক্ষিত" না হইলে সে পদার্থ সাধ্যসাধন হয় না, অর্থাৎ তাহাতে হেতুর লক্ষণই থাকে না (হেত্বাভাস লক্ষণ-প্রকরণ, প্রথম সূত্র-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। বাদী ন্যায়বাক্যের দ্বারা তাঁহার সাধ্য সাধন করিতে তাঁহার গৃহীত হেতু যে সাধ্যসাধন, অর্থাৎ তাহাতে যে হেতু পদার্থের সমস্ত লক্ষণই আছে, ইহা প্রকাশ করিবেন। তজ্জন্য বাদীকে পরিশেষে পঞ্চম অবয়ব নিগমনবাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে।

ফলকথা, নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী তাঁহার প্রযুক্ত হেতুকে "অবাধিত" এবং "অসৎপ্রতিপক্ষিত" বলিয়া প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ন্যায়বাদী নিগমন-বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করেন যে, উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য এবং সেই উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব শব্দে আছে, সুতরাং শব্দ অনিত্য। অর্থাৎ ঐ নিগমন-বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা একবারে

১। শিরোমণিমতে তত্রাপি বাদিনঃ স্বকর্ত্তব্যনির্ব্বাহার্থমুদাহরণস্যাবশ্যকত্বাৎ অন্যথা সর্ব্বত্রৈবোপনয়মাত্রস্যোদ্ভাব্যতাপত্তেঃ অনুমিত্যুপযুক্তব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতায়াস্তত এব লাভসম্ভবাৎ।—(অবয়বটীকায়ন্তে জাগদীশী)।

২। প্রয়োগপরিপাটী তু প্রতিপাদ্যানুসারতঃ।—(জৈন কুমারনন্দিকারিকা, জৈনন্যায়দীপিকা দ্রষ্টব্য)।

প্রকাশ করতঃ উপসংহার করিয়া দেখান হয় যে, শব্দে অনিত্যত্ব আছে, শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্ব ধর্ম্মের বিপরীত নিত্যত্ব ধর্ম্মের কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইতে পারে না। কারণ, "শব্দ অনিত্য" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম অথবা অনিত্যত্বরূপে শব্দ সাধ্যরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সিদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। নিগমন-বাক্যের দ্বারা উহা সিদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় শব্দধর্ম্মীতে অনিত্যত্বই আছে, নিত্যত্ব নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে শব্দধর্ম্মীতে নিত্যত্বের আপত্তি নিরস্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা নিগমন-বাক্যের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের কথা এই যে, নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী যাহা বুঝাইবেন, তাহা বাদীর তাৎপর্য্য বুঝিয়াই বুঝা যায়। বাদীর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির দ্বারা তাঁহার তাৎপর্য্যানুসারেই যখন উহা বুঝা যায়, তখন নিগমন-বাক্য নিরর্থক। নিগমনবাদী নৈয়ায়িকগণের কথা এই যে, বাদীর তাৎপর্য্য সকলেই সমান ভাবে বুঝিবে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কে বুঝিবে, কে না বুঝিবে, ইহাও পূর্ব্বে নিশ্চয় করা যায় না। বাদীর তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অনেক প্রতিবাদী অনেক আপত্তি করিয়া থাকে, তাহা বিচারক মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং তাৎপর্য্য বুঝিয়াই সকলে আমার বক্তব্য বুঝিয়া লইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া এই ক্ষেত্রে বাদীর বাক্যসংক্ষেপ কখনই উচিত নহে। বাদী নিজ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার সকল বক্তব্যই বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিবেন। সুতরাং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যই তাঁহার বক্তব্য। পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্য অবশ্যই বলিতে হইবে।

ভাষ্যকার পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন বর্ণন করিয়া, শেষে ঐ পঞ্চাবয়ব বুঝাইতে এত প্রযত্ন কেন, তাহার প্রয়োজন বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই শেষ কথার মর্ম্ম এই যে, কেবল সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-মূলক এবং ঐরূপ আরও বহুবিধ দোষ প্রদর্শন হইয়া থাকে। উহাকে মহর্ষি জাতি নামক অসদুত্তর বলিয়াছেন। আর বহুবিধ নিগ্রহস্থানও আছে, তদ্দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদী পরাজিত হইয়া থাকেন (প্রথমাধ্যায়ের শেষভাগ এবং পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যদি হেতু ও উদাহরণ পরিশুদ্ধ হয়, উহাতে কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদী নানাবিধ অসদুত্তর করিতে পারেন না। জাতিবাদী কোন উদাহরণে ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্যসাধন-ভাবের ব্যবস্থাপন না করিয়াই দোষ-প্রদর্শন করেন এবং করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন উদাহরণে এই ধর্ম্মটি এই ধর্ম্মের সাধন অর্থাৎ এই ধর্ম্ম থাকিলেই এই ধর্ম্ম সেখানে থাকিবেই, এইরূপ বুঝিয়া এবং বুঝাইয়া দোষ প্রদর্শন করিতে আসেন, তাহা হইলে তিনি ঐরূপ দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না, তাঁহার জাতি নামক অসদুত্তরের আর সেখানে অবসর থাকে না। সুতরাং সকলকেই হেতু ও উদাহরণের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তজ্জন্য পঞ্চাবয়বের তত্ত্ব বুঝান নিতান্ত আবশ্যক। ভাষ্যকার পূর্ব্বেও হেতু ও উদাহরণের অতি সূক্ষ্ম, অতি দুর্ব্বোধ সামর্থ্য সকলে বুঝে না, প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই বুঝেন, এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এই সকল তত্ত্ব যে অতি দুর্ব্বোধ, ইহা পরম প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসক-সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অথবা উদাহরণাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহারা[1] পঞ্চাবয়বের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু তাঁহার ভামতী গ্রন্থে পরার্থানুমানে অনেক স্থলে পঞ্চাবয়বেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইউরোপীয় নৈয়ায়িকগণও মীমাংসকদিগের ন্যায় প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে উদাহরণ এবং উপনয় এই দুইটি মাত্র অবয়ব স্বীকৃত, ইহা তার্কিকরক্ষার ন্যায় অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের কোন কোন গ্রন্থ-সংবাদে বুঝা যায়, প্রতিজ্ঞা এবং হেতুও তাঁহারা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ এবং সুবন্ধুর "প্রতিজ্ঞা-লক্ষণে"র সমালোচনা ও খণ্ডন উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিকেও পাওয়া যায়। সাংখ্যসূত্রে পঞ্চাবয়বের কথাই[2] পাওয়া যায়। বৈশেষিকাচার্য্য পরমপ্রাচীন প্রশস্তপাদ "পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে" নিয়ম পূর্ব্বক পঞ্চাবয়বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান এবং প্রত্যাম্নায় এই সকল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ মহর্ষি গোতমোক্ত পঞ্চাবয়ব সর্ব্বসম্মত না হইলেও অনেক সম্প্রদায়ের সম্মত এবং উহা অতি প্রাচীন মত। মহাভারতেও নারদ মুনির পঞ্চাবয়ব-বিজ্ঞতার সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে মহাভারতের পূর্ব্ব হইতেই পঞ্চাবয়ব ন্যায়-বিদ্যার গুরু-সম্প্রদায় এ দেশে ছিলেন, ইহা বুঝা যায়[3] ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য। অত ঊর্দ্ধং তর্কো লক্ষণীয় ইতি অথেদমুচ্যতে।

অনুবাদ। ইহার পরে (অবয়ব নিরূপণের পরে) তর্ক লক্ষণীয় অর্থাৎ তর্কের লক্ষণ বলিতে হইবে, এ জন্য অনন্তর এই সূত্র বলিয়াছেন।

সূত্র। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিত-স্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। অজ্ঞাত-তত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেছে—এমন পদার্থে, তত্ত্বটি জানিবার জন্য প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত যে "ঊহ" অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষ, তাহা "তর্ক"।

ভাষ্য। অবিজ্ঞায়মানতত্ত্বেঽর্থে জিজ্ঞাসা তাবজ্জায়তে জানীয় ইমমিতি। অথ জিজ্ঞাসিতস্য বস্তুনো ব্যাহতৌ ধর্ম্মৌ বিভাগেন বিমৃশতি

১। ত্রীনুদাহরণান্তান্ বা যদোদাহরণাদিকান্।
মীমাংসকাঃ সৌগতাস্তু সোপনীতিমুদাহৃতিম্ ।—(তার্কিকরক্ষা, ৬৫ কারিকা।)

২। পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ ।—(সাংখ্যসূত্র, ৫ অঃ, ২৭ সূত্র।)

৩। পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ ।—মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৫ অঃ, ৫ শ্লোক।

কিং স্বিদিত্যেবমাহোস্বিন্নৈবমিতি। বিমৃশ্যমানয়োর্দ্ধর্ম্ময়োরেকতরং কারণোপপত্ত্যাঽনুজানাতি, সম্ভবত্যস্মিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি। কারণোপপত্ত্যা স্যাদেবমেতন্নেতরদিতি। তত্র নিদর্শনং—যোঽয়ং জ্ঞাতা জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীয়েতি জিজ্ঞাসা। স কিমুৎপত্তি-ধর্ম্মকোঽথানুৎপত্তিধর্ম্মক ইতি বিমর্শঃ। বিমৃশ্যমানেঽবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে যস্য ধর্ম্মস্যাঽভ্যনুজ্ঞাকারণমুপপদ্যতে তমনুজানাতি, যদ্যয়মনুৎপত্তিধর্ম্মক-স্ততঃ স্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলমনুভবতি জ্ঞাতা। দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যা-জ্ঞানানামুত্তরমুত্তরং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য কারণং, উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-পায়াদপবর্গ ইতি স্যাতাং সংসারাপবর্গৌ। উৎপত্তিধর্ম্মকে জ্ঞাতরি পুনর্ন স্যাতাম্। উৎপন্নঃ খলু জ্ঞাতা দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ সম্বধ্যত ইতি, নাস্যেদং স্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলম্। উৎপন্নশ্চ ভূত্বা ন ভবতীতি, তস্যাবিদ্য-মানস্য নিরুদ্ধস্য বা স্বকৃতকর্ম্মণঃ ফলোপভোগো নাস্তি, তদেবমেকস্যানেক-শরীরযোগঃ শরীরবিয়োগশ্চাত্যন্তং ন স্যাদিতি, যত্র কারণমনুপপদ্যমানং পশ্যতি তন্নানুজানাতি—সোঽয়মেবং লক্ষণ ঊহস্তর্ক ইত্যুচ্যতে।

অনুবাদ। যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ ধর্ম্মে সংশয় হওয়ায় তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, এমন পদার্থে—"এই পদার্থকে (তত্ত্বতঃ) জানিব"[১] এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। অনন্তর জিজ্ঞাসিত পদার্থের বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মকে পৃথক্ ভাবে 'ইহা এইরূপ কি? অথবা এইরূপ নহে?' এইরূপ সংশয় করে। সন্দিহ্য-মান ধর্ম্মদ্বয়ের কোন একটি ধর্ম্মকে কারণের উপপত্তিবশতঃ অনুজ্ঞা করে। (কারণের উপপত্তি কি, তাহা বলিতেছেন) এই পদার্থে অর্থাৎ সন্দিহ্যমান ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে এই ধর্ম্মটিতে "কারণ" কি না "প্রমাণ"—"হেতু"—সম্ভব হয়। (অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানই সূত্রোক্ত কারণোপপত্তি)। (অনুজ্ঞা কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) কারণের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের সম্ভব প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন হইতে পারে না (অর্থাৎ এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই অনুজ্ঞা এবং উহাই তর্ক)। তদ্বিষয়ে অর্থাৎ এই তর্ক বিষয়ে উদাহরণ,—এই যে জ্ঞাতা

১। ভাষ্যে "জানীয়" এই পদটি বিধিলিঙের আত্মনেপদ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন। কর্ত্তার ফলবত্ত্ববিবক্ষা স্থলে উপসর্গহীন জ্ঞাধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। "অনুপসর্গাজ্জ্ঞঃ"— পাণিনিসূত্র, ১।৩।৭৬। গাং জানীতে (সিদ্ধান্তকৌমুদী)। ভাষ্যকার পরেও বলিয়াছেন,—"জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্ত্বতো জানীয়"।

জ্ঞাতব্য পদার্থ জানিতেছে, তাহাকে তত্ত্বতঃ জানিব, এইরূপ জিজ্ঞাসা হয়। (পরে) সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তি-ধর্ম্মক অর্থাৎ অনিত্য ? অথবা অনুৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ নিত্য ? এইরূপ সংশয় হয়। (পরে) সন্দিহ্যমান অজ্ঞাত-তত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ ঐ জ্ঞাতৃপদার্থে যে ধর্ম্মটির অনুজ্ঞার কারণ (প্রমাণ) উপপন্ন হয়, সেই ধর্ম্মটিকে অনুজ্ঞা করে। (সে কিরূপে, তাহা বলিতেছেন) যদি এই জ্ঞাতা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-পদার্থ আত্মা যদি অনাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে (করিতে পারে) এবং দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান, এই-গুলির পরপরটি পূর্ব্বপূর্ব্বটির কারণ। পরপরটির অপায় হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত (দ্বিতীয় সূত্রোক্ত) পদার্থগুলির পরপরটির অভাব হইলে, তাহাদিগের অনন্তরের অর্থাৎ তাহাদিগের পূর্ব্বপূর্ব্বটির অভাব প্রযুক্ত অপবর্গ হয়, সুতরাং সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে অর্থাৎ আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেই তাহার সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে। কিন্তু আত্মা উৎপত্তি-ধর্ম্মক অর্থাৎ দেহের সহিত উৎপন্ন হইলে (পূর্ব্বোক্ত সংসার ও অপবর্গ) হইতে পারে না। যেহেতু আত্মা উৎপন্ন হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং বেদনা অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহা অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ এই আত্মার অর্থাৎ উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত আত্মার স্বকৃত কর্ম্মের ফল হয় না। কারণ, উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না। অবিদ্যমান অর্থাৎ এই জন্মের পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্বই ছিল না, অথবা নিরুদ্ধ অর্থাৎ একেবারে অত্যন্ত বিনষ্ট সেই আত্মার (উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত আত্মার) স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ নাই ; সুতরাং এইরূপ হইলে এক আত্মার অনেক দেহের সহিত যোগ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার এবং শরীরের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ অর্থাৎ মোক্ষ হইতে পারে না। এইরূপে যে পদার্থে অর্থাৎ সন্দিহ্যমান ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে যে ধর্ম্মটিতে প্রমাণ অনুপপদ্যমান বুঝে, তাহাকে অনুজ্ঞা করে না। সেই এই, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত উহ, অর্থাৎ এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এইরূপ হইতে পারে না, এই প্রকার যে অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা নামক জ্ঞানবিশেষ, তাহা তর্ক নামে কথিত হয়।

বিবৃতি। কোন পদার্থের সামান্য জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞান সকলের থাকে না। বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা হইলে সেখানে দুইটি ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করে। যেমন আত্মা বলিয়া একটা পদার্থ আছে, ইহা জানিলেও, তাহা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা বুঝা যাইতেছে না, অর্থাৎ আত্মার নিত্যস্বরূপ বিশেষ তত্ত্বটি বুঝিবার ইচ্ছা হইলেও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কারণ, আত্মার

অনিত্যত্ব বিষয়ে সেখানে একটা সুদৃঢ় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াও তাহা কার্য্যকারী হইতেছে না। ঐ সুদৃঢ় সংশয়টা বিনষ্ট করিতে না পারিলে প্রমাণ কিছু করিতেও পারে না; এ জন্য সেখানে তর্ক আবশ্যক। যাঁহারা আত্মার সংসার ও অপবর্গ মানেন, তাঁহারা ঐ স্থলে বুঝেন যে, আত্মা নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে, অনিত্য হইলে তাহা হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মার নিত্যত্ব বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব; সুতরাং আত্মা নিত্য হইতে পারে, অনিত্য হইতে পারে না, এইরূপ জ্ঞানই এখানে তর্ক। উহার দ্বারা পূর্ব্বজাত সংশয়ের নিবৃত্তি হইলে আত্মার নিত্যত্বসাধক প্রমাণ আত্মার নিত্যত্ব সাধন করে। তর্ক এইরূপ অনেক স্থলে প্রমাণের সাহায্য করে, তর্ক নিজে প্রমাণ নহে, প্রমাণের সহকারী।

টিপ্পনী। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব নিরূপণের পরেই মহর্ষি তর্কের নিরূপণ করিয়াছেন। কারণ, পঞ্চাবয়বের দ্বারা প্রমাণ প্রদর্শন করিলেও অনেক স্থলে প্রমাণ-বিষয়ের অভাব-বিষয়ে সুদৃঢ় সংশয়বশতঃ প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ জন্য তর্ক আবশ্যক হয়। তর্ক শব্দের দ্বারা তর্কশাস্ত্র বুঝা যায় এবং আপত্তিবিশেষও বুঝা যায়, আবার অনুমানও বুঝা যায়। হেতু, তর্ক, ন্যায়, অন্বীক্ষা, এই চারিটি শব্দ প্রাচীনগণ অনুমান অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন, এ কথা উদ্যোতকরের কথাতেও পাওয়া যায়।

কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই সূত্রোক্ত তর্ক পদার্থ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত "উহ"। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কারণের উপপত্তিযুক্ত উহ। ভাষ্যকার এখানে কারণ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন— প্রমাণ। উপপত্তি শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সম্ভব। এই পদার্থে প্রমাণ সম্ভব হয়, এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার সূত্রকারোক্ত কারণোপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হেতু শব্দের দ্বারা পরে আবার পূর্ব্বোক্ত প্রমাণেরই পুনর্ব্ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ এবং হেতু শব্দ প্রাচীন কালে প্রমাণ অর্থেও প্রযুক্ত হইত। ভাষ্যকার এখানে তাহাই দেখাইয়া মহর্ষি-সূত্রোক্ত 'কারণ' শব্দের দ্বারা এখানে প্রমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তর্ক, প্রমাণের উপপত্তি-প্রযুক্ত একতর ধর্ম্মকে অনুজ্ঞা করে। এই অনুজ্ঞার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই বিষয়টির বিপর্য্যয় শঙ্কা অর্থাৎ তাহার অভাব বিষয়ে সংশয় হইলে, যে পর্য্যন্ত কোন অনিষ্ট আপত্তি ঐ উৎকট সংশয় নিবৃত্ত না করে, সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইলেই প্রমাণের নিজ বিষয়ে প্রমাণের সম্ভব হয়। ঐ প্রমাণ-সম্ভবকেই বলা হইয়াছে—প্রমাণের উপপত্তি। সেই প্রমাণের উপপত্তি কর্তৃক প্রমাণ অনুজ্ঞাত হইলে প্রমাণের বিষয়টি পরিশোধিত হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ে পূর্ব্বজাত সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়। তখন প্রমাণের সেই সংশয়রূপ অন্তরায় না থাকায় প্রমাণ তাহার নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার ফল সম্পাদন করে অর্থাৎ তখন তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার প্রথম সূত্র-ভাষ্য-বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় "তর্কঃ" প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, প্রমাণবিষয়ের

যুক্তাযুক্ত বিচাররূপ "তর্ক" যুক্ততত্ত্বে প্রবর্ত্তমান প্রমাণকে অনুজ্ঞা করতঃ অনুগ্রহ করে, তর্কানুগৃহীত প্রমাণ তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হয়। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথার ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য্য তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, "তর্ক প্রমাণকে অনুজ্ঞা করে" ইহার অর্থ এই যে, তর্ক প্রবর্ত্তমান প্রমাণের অনুকূলভাবে অবস্থান করে। "অনুগ্রহ করে" ইহার অর্থ নির্ব্ব্যাপার প্রমাণকে ব্যাপারবিশিষ্ট করে অর্থাৎ যে উৎকট সংশয় বশতঃ প্রমাণ নিজ বিষয়ে ব্যাপারশূন্য ছিল, সেই সংশয়রূপ অন্তরায়টিকে নিরস্ত করিয়া প্রমাণকে ব্যাপারযুক্ত করে অর্থাৎ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করে।

ভাষ্যকার এখানে তর্কের স্বরূপ বর্ণনার জন্য প্রথমেই বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরে সংশয় জন্মিলে, তর্ক সেই সন্দিহ্যমান ধর্ম্মদ্বয়ের একটিকে প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অনুজ্ঞা করে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও সংশয়ের পরেই জিজ্ঞাসা জন্মিয়া থাকে, তথাপি অনেক স্থলে জিজ্ঞাসার পরেও সংশয় জন্মে, সেই সংশয়ই এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। কারণ, জিজ্ঞাসার পরজাত সেই সংশয়ই তর্কোপস্থিতির অঙ্গ। তর্ক সেই সংশয়ের বিষয় দুইটি পক্ষের একটির নিষেধের দ্বারা অপরটিকে প্রমাণের বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করে; সুতরাং যে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, সেই বিষয়েই তর্ক উপস্থিত হয় অর্থাৎ যে বিষয়ে সংশয় হয় নাই, তদ্বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয় না। এ জন্য সংশয়কে তর্কোপস্থিতির অঙ্গ বলা হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রমাণের বিষয়ের অনুজ্ঞাকেই তর্ক বলিয়াছেন। "এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, অন্যরূপ হইতে পারে না" এইরূপ জ্ঞানবিশেষই ভাষ্যকারের মতে প্রমাণ-বিষয়ের অনুজ্ঞা। প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিরাসই ঐ তর্কের ফল। উহাকেই বলা হইয়াছে, তর্কের অনুগ্রহ। তর্ক প্রমাণকে অনুগ্রহ করে অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিরাস করে। উদয়নের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সূত্রকার যে উহকে তর্ক বলিয়াছেন, ভাষ্যকারের মতে যাহা প্রমাণবিষয়ে পদার্থের অনুজ্ঞা, উদ্দ্যোতকর সেই জ্ঞানকে সম্ভাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান বলিয়াছেন। তিনি বহু বিচারপূর্ব্বক এখানে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, "উহ" বা "তর্ক" সংশয়ও নহে, নির্ণয়ও নহে, ইহা এইরূপ হইতে পারে; এই প্রকার সম্ভাবনারূপ জ্ঞানই মহর্ষি সূত্রোক্ত উহ বা তর্ক। মহর্ষি সংশয়কে এবং নির্ণয়কে পৃথক্‌রূপে বলিয়া তর্কের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং মহর্ষি গোতমোক্ত তর্ক-পদার্থ, সংশয় ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন প্রকার জ্ঞান। প্রাচীন কালে কেহ কেহ এই তর্ককে সংশয়বিশেষ বলিতেন, কেহ নির্ণয়বিশেষ বলিতেন, কেহ অনুমান বলিতেন। উদ্দ্যোতকর সে সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন।

উদ্দ্যোতকরের মতানুসারে পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ সংশয় ও নির্ণয় ভিন্ন "সম্ভাবনা" নামক কোন জ্ঞান স্বীকার করেন নাই এবং ঐরূপ জ্ঞানকে "তর্ক" বলেন নাই। পরবর্ত্তিগণের মতে আপত্তি-বিশেষের নাম তর্ক। উদয়নাচার্য্য তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, অনিষ্টপ্রসঙ্গই তর্কের স্বরূপ। তিনি কিরণাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যাহা প্রসঙ্গস্বরূপ এবং যাহার অপর নাম "উহ", তাহাই "তর্ক।" তর্কের অপর নাম "প্রসঙ্গ", এ কথা এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারও লিখিয়াছেন। "প্রসঙ্গ" বলিতে এখানে প্রসক্তি; তাহার ফলিতার্থ আপত্তি। তার্কিক-

রক্ষাকার এই তর্কের স্বরূপ বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে[১], তর্ক বলিতে অনিষ্টপ্রসঙ্গ। অনিষ্ট দ্বিবিধ ;—(১) যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহার পরিত্যাগ এবং (২) যাহা অপ্রামাণিক, তাহার গ্রহণ। ইহার যে কোন অনিষ্টের যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি, তাহাকে তর্ক বলে। যেমন কেহ বলিলেন,—জলপান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। এই কথা শুনিয়া অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, "যদি জল পীত হইয়াও পিপাসার নিবর্ত্তক না হয়, তাহা হইলে পিপাসু ব্যক্তিরা জল পান না করুক ? তাহারা জল পান করিয়া থাকে কেন ?" এই স্থলে পিপাসু ব্যক্তিরা যে জল পান করিয়া থাকে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐ প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগরূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি প্রকাশ করায় উহা "তর্ক" হইল। এবং কেহ বলিলেন—জল পান করিলে ঐ জল অন্তর্দ্দাহ জন্মায়। তখন অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, "যদি পীত জল অন্তর্দ্দাহ জন্মায়, তাহা হইলে আমারও অন্তর্দ্দাহ উৎপাদন করুক, আমিও ত জল পান করিলাম ; আমার অন্তর্দ্দাহ জন্মায় না কেন ?" এখানে আপত্তিকারীর অন্তর্দ্দাহ অপ্রামাণিক, তাহার স্বীকারের প্রসঙ্গ বা আপত্তি প্রদর্শন করায় উহাও "তর্ক" হইবে। পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণও আপত্তিবিশেষকেই "তর্ক" বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সূত্র-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, (সূত্রে) কারণ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য, উপপত্তি শব্দের অর্থ আরোপ। 'কারণোপপত্তি' বলিতে এখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ। উহ শব্দের অর্থও আরোপ। তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত যে আরোপ, তাহাই "তর্ক"। যে পদার্থ থাকিলেই অপর একটি পদার্থ সেই সঙ্গে সেখানে থাকিবেই, সেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থটিকে ব্যাপ্য পদার্থ বলে এবং যে পদার্থটি তাহার সমস্ত আশ্রয়েই থাকে, তাহাকে ঐ পদার্থের ব্যাপক বলে। ব্যাপ্য থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক থাকিবে, সুতরাং ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থেরই আরোপ বা আপত্তি করা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত যে তাহার ব্যাপক পদার্থের আরোপ, তাহাই সূত্রকারের অভিমত "তর্ক"। যেখানে ব্যাপক পদার্থটি আছে, সেখানে তাহার আরোপ বা আপত্তি হয় না। ঐরূপ আপত্তি প্রকাশ করিলে তাহাকে বলে "ইষ্টাপত্তি"। পর্ব্বতে ধূমও আছে, বহ্নিও আছে, সেখানে যদি কেহ পর্ব্বতে ধূম আছে বলিলে, অপর ব্যক্তি বলেন যে, "যদি পর্ব্বতে ধূম থাকে, তাহা হইলে বহ্নি থাকুক," তাহা হইলে উহা "তর্ক" হইবে না। কারণ, পর্ব্বতে বহ্নি আছেই ; সুতরাং পর্ব্বতে বহ্নির আপত্তি ইষ্টাপত্তি। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যে স্থান ব্যাপক পদার্থশূন্য বলিয়া নিশ্চিত, সেই স্থানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, তাহাই তর্ক। বৃত্তিকার এইরূপেই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। "আরোপ" বলিতে ভ্রম জ্ঞান। ঐ ভ্রম জ্ঞান দ্বিবিধ। যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞান সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক আরোপ করা হয়, তাহাকে বলে "আহার্য্য

১। তর্কোঽনিষ্টপ্রসঙ্গঃ স্যাদনিষ্টং দ্বিবিধং মতম্।
প্রামাণিকপরিত্যাগস্তথেতরপরিগ্রহঃ।—তার্কিকরক্ষা, ১০ কারিকা।

ভ্রম"। উহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত্রিম ভ্রম বলিয়াই মনে হয়, নৈয়ায়িকগণ উহাকে "আহার্য্য" বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় কৃত্রিম অর্থে "আহার্য্য" শব্দের প্রয়োগ আছে[১]। আর যে ভ্রম ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বে তাহার প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞান জন্মে নাই, সেই ভ্রমকে বলা হইয়াছে "অনাহার্য্য ভ্রম"। তর্কের লক্ষণে বৃত্তিকার যে "আরোপ" বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত "আহার্য্য ভ্রম"। জলে বহ্নি নাই জানি, ধূম নাই—ইহাও জানি, কিন্তু কেহ যখন জলে ধূম আছে ইহা বলে, সমর্থন করে, তখন আপত্তি প্রকাশ করি যে, যদি জলে ধূম থাকে, তবে বহ্নি থাকুক। এখানে বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ ধূম বা বিশিষ্ট ধূমের জলে আরোপ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সেখানে তাহার ব্যাপক বহ্নির আরোপ করায় উহা "তর্ক" হইবে। ঐ স্থলে ঐ দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রযুক্ত। জলে ধূম নাই এবং বহ্নি নাই, ইহা জানিয়াই ঐরূপ আরোপ করায়, উহা "আহার্য্য" আরোপ। যে কোন পদার্থের আরোপ করিয়া তৎপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ "তর্ক" নহে। যেমন কেহ "এই গৃহে হস্তী থাকে" এই কথা বলিলে, যদি কেহ বলেন যে, "যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তাহা হইলে অশ্ব থাকুক", এইরূপ আরোপ "তর্ক" হইতে পারে না। কারণ, হস্তী অশ্বের ব্যাপ্য পদার্থ নহে, অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই যে সেখানে অশ্ব থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। "যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তাহা হইলে হস্তীর বন্ধন-স্তম্ভ থাকুক", এইরূপ আরোপ ঐ স্থলে "তর্ক" হইতে পারে। কারণ, হস্তী থাকিলে অর্থাৎ হস্তীর বাসগৃহ হইলে সেখানে তাহার বন্ধন-স্তম্ভ থাকিবেই। অবশ্য যদি সে গৃহে বন্ধন-স্তম্ভ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ আপত্তি "তর্ক" হইবে না, উহা ইষ্টাপত্তি হইবে। ফলকথা, নব্যমতে ঐরূপ আপত্তিবিশেষই তর্ক। উহা এক প্রকার মানস প্রত্যক্ষ। তার্কিক, বাক্যের দ্বারা তাঁহার ঐ আপত্তিরূপ মানস জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। তার্কিকের সেই আপত্তিই "তর্ক", তাঁহার বাক্য "তর্ক" নহে। আপত্তিস্থলে "আপাদ্য" ও "আপাদক" এই দুইটি পদার্থ আবশ্যক। যাহার আপত্তি করা হয়, তাহাকে "আপাদ্য" বলে, যে পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত আপত্তি হয়, তাহাকে "আপাদক" বলে। যেমন বিশিষ্ট ধূম আপাদক—বহ্নি আপাদ্য। আপাদ্যটি ব্যাপক হইবে, আপাদকটি তাহার ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপ্য থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক থাকিবেই; সুতরাং ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপকের আপত্তি করা যায়। এ জন্য ব্যাপ্য পদার্থটিই "আপাদক" হয়, ব্যাপক পদার্থটি তাহার "আপাদ্য" হয়। "ব্যাপ্য" পদার্থ থাকিলেই যেমন তাহার "ব্যাপক" পদার্থটি সেখানে থাকে, তদ্রূপ ঐ ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের অভাব থাকে; সুতরাং "তর্ক" স্থলে "আপাদ্য"রূপ ব্যাপক পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইলে তদ্দ্বারা সেখানে "আপাদক"রূপ ব্যাপ্য পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইয়া যাইবে। ঐরূপ নিশ্চয় অনুমিতি। নব্যমতে তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে ঐরূপ অনুমিতি জন্মে। এইরূপ হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার সংশয় হইলে তর্কের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। যেমন "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নিজন্য না হউক," এই প্রকার তর্ক উপস্থিত হইলে সেখানে ধূমে বহ্নিজন্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া ঐ

১। আহার্য্যশোভারহিতৈরমায়ৈঃ—(ভট্টিকাব্য, ২ সর্গ, ১৪ শ্লোক)।

হেতুর দ্বারা "ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নহে" এইরূপ অনুমিতি জন্মে। তাহার ফলে "ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না" এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয়। যাহা বহ্নিজন্য পদার্থ, অর্থাৎ বহ্নি ব্যতীত যাহার উৎপত্তিই হয় না, সেই ধূম বা বিশিষ্ট ধূম যেখানে থাকিবে, সেখানে বহ্নি থাকিবেই ; সুতরাং ধূম বা বিশিষ্ট ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার তর্কের ফলে এইরূপ অনুমিতি জন্মে। তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয়। ফলতঃ সংশয় নিবৃত্তিই তর্কের শেষ ফল। এই সংশয় নিবৃত্তি কোনরূপেই হইতে পারে না বলিয়া চার্ব্বাক এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে তাহার উত্তর দিয়াছেন। শ্রীহর্ষমিশ্র তাঁহার "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" গ্রন্থে উদয়নের ঐ কথার উপহাসের সহিত উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। "খণ্ডনোদ্ধার" গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্র এবং "তত্ত্বচিন্তামণি"র তর্ক প্রকরণে গঙ্গেশ শ্রীহর্ষের প্রতিবাদের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। (দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১ আঃ, ৩৮ সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।) পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ এই তর্ককে[১] পাঁচ প্রকার বলিয়াছেন এবং এই তর্কের পাঁচটি অঙ্গ বলিয়াছেন। সেই পঞ্চাঙ্গের কোনটি না থাকিলে তাহা তর্ক হইবে না ; তাহাকে বলে তর্কাভাস। "লাঘব", "গৌরব" প্রভৃতি আরও কতকগুলি প্রমাণের সহকারী আছে, সেগুলি আপত্তি পদার্থ নহে বলিয়া তর্ক নহে ; তবে তর্কের ন্যায় প্রমাণের সহকারী বলিয়া তর্কের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এ সকল কথারও যথাস্থানে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার তর্কের উদাহরণ বলিতে যথাক্রমে যে ভাবে তর্কের উত্থান হয়, তাহা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ "জ্ঞাতা আছে" এইরূপে জ্ঞাতার সামান্য জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতেছে, তখন এই জ্ঞানের অবশ্য কর্ত্তা আছে, এইরূপে জ্ঞাতা বা আত্মার সামান্যতঃ জ্ঞান হইলে পরে সেই জ্ঞাতাকে তত্ত্বতঃ জানিব অর্থাৎ আত্মা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা জানিব, এইরূপ ইচ্ছা জন্মে। তাহার পরে সেই আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি হয় অথবা আত্মার উৎপত্তি হয় না, আত্মা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, এইরূপ সংশয় জন্মে। তাহার পরে আস্তিকগণের এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে,—যদি আত্মার উৎপত্তি না হয় অর্থাৎ আত্মা নিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে দেহাদির উৎপত্তির পূর্ব্বেও আত্মা থাকে, সুতরাং একই আত্মার নানা দেহাদি সম্বন্ধবশতঃ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলের ভোগ এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এই বর্ত্তমান দেহাদি পরিগ্রহ হইতে পারে। ফলকথা, তাহা হইলে আত্মার সংসার হইতে পারে। ঐরূপ না হইলে আস্তিকগণের মতে আত্মার সংসার হয় না। আত্মা নিত্য হইলে বহু জন্মের কর্ম্মাদির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার মোক্ষলাভও হইতে পারে। আত্মার উৎপত্তি হইলে তাহার

১। আত্মাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।
অঙ্গপঞ্চকসম্পন্নস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে ॥
ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্য্যয়ে।
অনিষ্টাননুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্ ॥
অঙ্গান্যতমবৈকল্যে তর্কস্যাভাসতা ভবেৎ ॥—তার্কিকরক্ষা, ৭১।৭২।৭৩।

সংসার ও মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, আত্মার উৎপত্তি হয় বলিলে যে দেহের সহিত যে আত্মা উৎপন্ন হইবে, সেই দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ বলিতে হইবে; সেই দেহের পূর্ব্বে আর সে আত্মা ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উৎপন্ন বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না এবং উৎপন্ন ভাব পদার্থ চিরস্থায়ী হয় না, কোন দিন তাহা অত্যন্ত বিনষ্ট হইবেই (ন্যায়-মতে ইহাই সিদ্ধান্ত)। তাহা হইলে বর্ত্তমান অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ আত্মার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে আত্মা নাই, তাহার দেহাদি-সম্বন্ধ তাহারই কর্ম্মফল হইবে কিরূপে? এবং পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম ভিন্ন অভিনব দেহাদি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন বিচিত্র সুখদুঃখ-ভোগও তাহার হইতে পারে না। এবং শরীরের সহিত উৎপন্ন আত্মা শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইবে, সুতরাং আত্মার অপবর্গও হইতে পারে না। আত্মা চিরকাল থাকিবে, কিন্তু তাহার আর কখনও দেহাদি-সম্বন্ধ হইবে না, এই অবস্থাই আত্মার কৈবল্যাবস্থা। আত্মা নিত্য না হইলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ তর্ক পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় নিবৃত্ত করে, তখন আত্মার নিত্যত্বসাধক প্রমাণ আত্মার নিত্যত্বনিশ্চয় জন্মায়। ভাষ্যকারের সম্মত এইরূপ তর্কস্থলেও কিন্তু নব্যগণ-সম্মত প্রসঙ্গ বা আপত্তি আছে। যদি আত্মা অনিত্য হয় অর্থাৎ দেহাদির সহিত উৎপন্ন পদার্থ হয়, তাহা হইলে আত্মার সংসার ও অপবর্গ না হউক, এইরূপ আপত্তিই নব্য-মতে এখানে তর্ক হইবে। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন মতে ঐ স্থলে আত্মার অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব বিষয়েই প্রমাণকে উপপদ্যমান দেখিয়া "আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হইতে পারে অর্থাৎ তাহাই সম্ভব, উৎপত্তিধর্ম্মক হইতে পারে না অর্থাৎ তাহা সম্ভব নহে" এই প্রকার অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষই "তর্ক" হইবে। ভাষ্যকার যে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়-তত্ত্বটির অনুজ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষকেই তর্কের স্বরূপ বলিতেন, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যে পরিস্ফুট আছে।

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে কোন সংশয়ই হয় না, সুতরাং সেই পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ তর্ক হওয়া অসম্ভব। তাই মহর্ষি "অবিজ্ঞাত পদার্থে" এইরূপ কথা না বলিয়া "অবিজ্ঞাততত্ত্বে পদার্থে" এইরূপ কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে না, তাহার তত্ত্ববিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছে, এমন পদার্থেই তর্ক হইবে। যে পদার্থের তত্ত্ববোধ জন্মিয়াছে, ঐ পদার্থে ঐ তত্ত্ববোধ সুদৃঢ় করিবার জন্য সাংখ্যশাস্ত্রে শুশ্রূষা, শ্রবণ, ধারণ প্রভৃতি অন্তঃকরণ-ধর্ম্মকে "ঊহ" বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে সেই সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত "ঊহ" কেহ না বুঝেন, এই জন্য মহর্ষি সূত্রে "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে" এই অংশ বলিয়াছেন। যদিও সূত্রে "কারণোপপত্তি" শব্দ থাকাতেই ইহা বুঝা যায়, অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "ঊহ" যখন এই সূত্রোক্ত কারণোপপত্তি প্রযুক্ত নহে, তখন এই সূত্রোক্ত "ঊহ" সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "ঊহ" নহে, ইহা বুঝা যায়; তাহা হইলেও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে" এই কথা না বলিলে সূত্রোক্ত "কারণোপপত্তি" শব্দের যথোক্ত ব্যাখ্যা বুঝা যায় না, এই জন্য মহর্ষি সূত্রের প্রথমে ঐ অংশ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও এই কথা বলিয়া তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, সূত্রকার কোন বাক্য বলিলে তাহার একটা প্রয়োজন চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু মনে

রাখিবে, এখানে সূত্রকারের বাক্যলাঘবে কোন আগ্রহ ছিল না, তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। "তত্ত্বজ্ঞানার্থং" এই অংশের দ্বারা তর্কের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। অজ্ঞাততত্ত্ব পদার্থে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত "উহ"কে "তর্ক" বলিলে প্রমাণও তর্ক হইতে পারে; তাই বলিয়াছেন, "কারণোপপত্তিতঃ"। "কারণোপপত্তি"র ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "অবিজ্ঞাততত্ত্বে" এইরূপ কথা বলিলে অর্থাৎ ঐ কথার পরে অর্থ শব্দের প্রয়োগ না করিলে "অবিজ্ঞাততত্ত্ব" শব্দের দ্বারা যে ব্যক্তি তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে না, সেই ব্যক্তিকেও বুঝা যাইতে পারে অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের ভ্রম অথবা সংশয় হইতে পারে, তাই উহার পরে অর্থ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থ শব্দের প্রয়োগ থাকায় যে পদার্থের তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, সেই পদার্থকেই ঐ কথার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে। উদ্যোতকর এই সকল কথারস্থায় এখানে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, সূত্রে ঐ স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, ঐ স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হওয়াই উচিত। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্য কণাদের একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ঋষিসূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়াছেন।

ভাষ্য। কথং পুনরয়ং তত্ত্বজ্ঞানার্থো ন তত্ত্বজ্ঞানমেবেতি, অনবধারণাৎ, অনুজানাত্যয়মেকতরং ধর্ম্মং কারণোপপত্ত্যা, ন ত্ববধারয়তি ন ব্যবস্যতি ন নিশ্চিনোতি এবমেবেদমিতি। কথং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি, তত্ত্বজ্ঞানবিষয়াভ্যনুজ্ঞালক্ষণাদূহাদ্ভাবিতাৎ প্রসন্নাদনন্তরং প্রমাণস্য সামর্থ্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যত ইত্যেবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইতি। সোঽয়ং তর্কঃ প্রমাণানি প্রতিসন্দধানঃ প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রমাণসহিতো বাদেঽপদিষ্ট ইতি। অবিজ্ঞাততত্ত্বে ইতি যথা সোঽর্থো ভবতি তস্য তথাভাবস্তত্ত্বমবিপর্য্যয়ো যাথাতথ্যম্।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ কেন? তত্ত্বজ্ঞানই নয় কেন? (উত্তর) যেহেতু অবধারণ করে না। বিশদার্থ এই যে, এই তর্ক প্রমাণের উপপত্তি-প্রযুক্ত একতর ধর্ম্মকে অর্থাৎ সন্দিহ্যমান ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে যেটি যুক্ত, যেটি সেখানে প্রকৃত তত্ত্ব, তাহাকে অনুজ্ঞা করে। কিন্তু এই পদার্থ এই প্রকারই, এইরূপ অবধারণ করে না, ব্যবসায় করে না, নিশ্চয় করে না, অর্থাৎ তর্ক স্বয়ং তত্ত্ব-নিশ্চয়স্বরূপ নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্বনিশ্চয়ের সাধনও নহে, প্রমাণের দ্বারাই তত্ত্বনিশ্চয় হয়, তর্ক ঐ প্রমাণের সহকারিতা করে।

(প্রশ্ন)। (তর্ক) তত্ত্বজ্ঞানার্থ কিরূপে? অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্বতন্ত্র সাধন না হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থই বা হয় কিরূপে? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ের অর্থাৎ

যেটি প্রমাণের বিষয়, প্রকৃত তত্ত্ব তাহার অনুজ্ঞাস্বরূপ ভাবিত অর্থাৎ চিন্তিত, (অতএব) প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল যে উহ (তর্ক), তাহার অনন্তর অর্থাৎ বিশুদ্ধ তর্কের পরে প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়; এইরূপে (তর্ক) তত্ত্বজ্ঞানার্থ অর্থাৎ প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ প্রমাণের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাতে বিশুদ্ধ তর্ক আবশ্যক হয়, এই জন্যই তর্ককে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা হয়।

সেই এই তর্ক প্রমাণের অনুজ্ঞা করে বলিয়া, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ে প্রবর্ত্তমান প্রমাণের অনুকূলভাবে অবস্থান করে বলিয়া প্রমাণগুলিকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ সংশয়রূপ অন্তরায় নিবৃত্তি করিয়া প্রমাণকে নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, নির্ব্যাপার প্রমাণকে ব্যাপারযুক্ত করে, এ জন্য বাদসূত্রে প্রমাণ সহিত হইয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ তর্ক প্রমাণের বিশেষ সহায়তা করে, তর্ক ব্যতীত অনেক সময়ে প্রমাণ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মাইতে পারে না, এ জন্য একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়োদ্দেশে যে-বাদ বিচার হয়, সেই বাদের লক্ষণে (১।২।১ সূত্রে) প্রমাণের সহিত মহর্ষি তর্কেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

(সূত্রে) "অবিজ্ঞাততত্ত্বে" এই স্থলে সেই পদার্থটি যে প্রকার হয়, তাহার তথাভাব অর্থাৎ তদ্রূপতা, তত্ত্ব, অবিপর্য্যয়, যাথাতথ্য, অর্থাৎ সূত্রে ঐ স্থলে যে "তত্ত্ব" বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যে পদার্থ যেমন অর্থাৎ যে প্রকার, তাহার তদ্রূপতা। অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত ভাবই তাহার তত্ত্ব, তাহাকেই বলে অবিপর্য্যয়, তাহাকেই বলে যাথাতথ্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি-সূত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞান নহে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ এক প্রকার জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ইহাতে প্রশ্ন এই যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানই নয় কেন? তর্ককে তত্ত্বজ্ঞান না বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা হইয়াছে কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় করে না, তত্ত্বের অনুজ্ঞা করে। "তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় করে না" এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে, তর্ক তত্ত্বনিশ্চয় নহে। ঐ তাৎপর্য্যেই ঐরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অবধারণ, ব্যবসায় এবং নিশ্চয়, এই তিনটি একই পদার্থ। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এখানে তিনটি একার্থবোধক বাক্যের দ্বারা 'তর্ক' তত্ত্বনিশ্চয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, তত্ত্বনিশ্চয়কেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। তর্ক যখন তত্ত্বনিশ্চয় নহে, তখন তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। 'এই পদার্থ এই প্রকার হইতে পারে, অন্যপ্রকার হইতে পারে না' এইরূপ অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা জ্ঞানই তর্ক। উহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নহে। 'এই পদার্থ এই প্রকারই' এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তর্ক হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারিত। কিন্তু তর্ক ঐরূপ জ্ঞান নহে। ফলকথা, 'সংশয়'ও নহে, 'নিশ্চয়'ও নহে, 'ইহা এইরূপ হইতে পারে, অন্যরূপ হইতে পারে না' এই প্রকার বিজাতীয়

জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ভাষ্যকার তাহাকেই বলিয়াছেন—প্রমাণবিষয়ের অভ্যনুজ্ঞা অথবা তত্ত্বের অনুজ্ঞা। সংশয় ও নিশ্চয় হইতে ভিন্ন অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান উদ্যোতকর সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐরূপ জ্ঞান ভাষ্যকারেরও সম্মত বলিয়া বুঝা যায়, নচেৎ ভাষ্যকারের মতে তর্ক কিরূপ জ্ঞান হইবে? তাৎপর্য্যটীকাকারও এই মতের ব্যাখ্যায় এখানে তর্করূপ জ্ঞানের পূর্ব্বোক্তরূপ আকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

শেষে আবার প্রশ্ন হইয়াছে যে, তর্ক যদি তত্ত্ব নিশ্চয় না জন্মায়, তবে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানার্থই বা বলা যায় কিরূপে? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় যে তত্ত্ব, তাহার অনুজ্ঞাস্বরূপ। এই তর্ক সুচিন্তিত হইলে বিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধ তর্কের পরে প্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, এই জন্যই তর্ককে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যদিও প্রমাণই তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়, কিন্তু তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। তর্ক কিরূপে সহকারী হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানে প্রমাণের সামর্থ্য বলিয়া ভাষ্যকার তর্কের স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই প্রকটিত করিয়াছেন।

ভাষ্যে "উহাদ্ভাবিতাৎ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—"ভাবিতাচ্চিন্তিতাৎ অতএব প্রসন্নান্নির্ম্মলাদিতি"। তর্ক সুচিন্তিত হইলে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয়; সুতরাং বিশুদ্ধ হয়। যদি তর্কের প্রতিকূল কোন তর্কান্তর থাকে, তাহা হইলে তর্ক হয় না। ফলকথা, বিশুদ্ধ প্রকৃত তর্কের পরে সংশয় নিরস্ত হওয়ায়ও প্রমাণ নিজ সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। "ভাবিত" এবং "প্রসন্ন", এই দুইটি বিশেষণবোধক শব্দের দ্বারা যে বিশেষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসামর্থ্যের বিশেষণরূপেই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়া অনেকে বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ভাষ্যকারের সন্দর্ভানুসারে তাহা বুঝা যায় না। সুধীগণ ঐ সন্দর্ভে মনোযোগ করিবেন। ভাষ্যে "প্রতিসন্দধানঃ" এই স্থলে হেত্বর্থে "শান" প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ তর্ক প্রমাণকে প্রতিসন্ধান করে বলিয়াই বাদসূত্রে প্রমাণের সহিত কথিত হইয়াছে। প্রমাণকে প্রতিসন্ধান করে কেন, এ জন্য বলিয়াছেন—প্রমাণের অনুজ্ঞা করে বলিয়া। তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণবিষয়ের অভাববিষয়ে যে সংশয় জন্মে, তর্ক তাহাকে নিরস্ত করিয়া প্রমাণকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ নিজবিষয়ে প্রেরণ করে, ব্যাপারযুক্ত করে। এখানে প্রমাণের অনুজ্ঞা বলিতে প্রবর্ত্তমান প্রমাণের অনুকূলভাবে থাকা, অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্য করা।

মহর্ষি গোতম ন্যায়াঙ্গরূপে তর্কের উল্লেখ করিলেও এই তর্ক সর্ব্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক অর্থাৎ সহকারী। ভাষ্যকারও প্রথম সূত্রভাষ্যে "প্রমাণানামনুগ্রাহকঃ" এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার প্রত্যক্ষ এবং শব্দপ্রমাণের সহকারী তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসকগণ তর্ককে প্রমাণের ইতিকর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন। যাহা কোন কার্য্যে করণ, তাহা কার্য্য সাধন করিতে যাহাকে সহকারিরূপে অপেক্ষা করে, তাহাকে মীমাংসকগণ করণের ইতিকর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন। করণ হইলেই তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা আবশ্যক, ইহা মীমাংসকদিগের সমর্থিত সিদ্ধান্ত। তাৎপর্য্যটীকাকারও প্রমাণের উপপত্তিকে ইতিকর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন। ফলকথা, তর্ক

কেবল অনুমানপ্রমাণেরই অঙ্গ বা সহকারী নহে, বিচারস্থলে তর্ক সর্ব্বপ্রমাণেরই সহকারী হয়। এই জন্য তাৎপর্য্যটীকাকার যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্ব্বক নির্ণয়কেই মহর্ষি গোতমোক্ত নির্ণয় পদার্থ বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে[১] তর্ককে সর্ব্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক বলিয়াছেন। মীমাংসাচার্য্যগণও তর্ককে শব্দপ্রমাণেরও অনুগ্রাহক বলিয়া সিদ্ধান্ত[২] করিয়াছেন। ভগবান্ মনুও[৩] তর্ককে শব্দপ্রমাণের অনুগ্রাহক বলিয়া গিয়াছেন। তর্ক কেবল অনুমান-প্রমাণেরই সহকারী হয়, অন্য প্রমাণস্থলে কুত্রাপি তর্ক আবশ্যক হয় না, ইহা কেহই বলেন নাই। তার্কিকরক্ষাকার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, তর্ক প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অনুগ্রাহক[৪]। এবং এই তর্কসাধ্য 'অনুগ্রহ' কি, ইহা বলিতে তিনি অনুমান-প্রমাণের বিষয়ে সংশয়নিবৃত্তিকে তর্কের 'অনুগ্রহ' বলিয়া অন্য প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিবৃত্তিকেও তর্কের 'অনুগ্রহ' অর্থাৎ তর্কসাধ্য ফল বলিয়াছেন। ৪০।

ভাষ্য। এতস্মিংস্তর্কবিষয়ে।

সূত্র। বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। এই তর্কবিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তর্কস্থলে—সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ "নির্ণয়"।

ভাষ্য। স্থাপনাসাধনং, প্রতিষেধ উপালম্ভঃ। তৌ সাধনোপালম্ভৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়ৌ ব্যতিষক্তাবনুবন্ধেন প্রবর্ত্তমানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্যুচ্যেতে। তয়োরন্যতরস্য নিবৃত্তিরেকতরস্যাবস্থানমবশ্যংভাবি, যস্যাবস্থানং তস্যার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।

১। ইতরদপি প্রমাণমনুমানচ্ছায়য়ৈব বিচারাঙ্গং ভবতীতি তত্র তর্কমনন্যথাসিদ্ধিঞ্চ পুরস্কৃত্য প্রবর্ত্তত ইতি।—(আত্মতত্ত্ববিবেক)।

২। ধর্ম্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা।
ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি।—(ভট্টবার্ত্তিক।)

৩। আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।—(মনুসংহিতা ১২অঃ, ১০৬।)

[এখানে তর্ক শব্দের অর্থ অনুমান প্রমাণ, ইহা অনেকের মত। কিন্তু ভাষ্যকার মেধাতিথি পরে তাহা বলেন নাই]

৪। পক্ষে বিপক্ষজিজ্ঞাসা বিচ্ছেদস্তদনুগ্রহঃ।
উপলক্ষণমেতৎ। প্রমাণবিষয়ে তদ্বিপর্য্যয়াশঙ্কাবিঘটনং তর্কসাধ্যোঽনুগ্রহ ইত্যর্থঃ।—(তার্কিকরক্ষা।) বিপক্ষজিজ্ঞাসা সাধ্যরাহিত্যশঙ্কেত্যর্থঃ।—তার্কিকরক্ষার টীকাকার মল্লিনাথের ব্যাখ্যা।

নেদং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং সম্ভবতীতি,একো হি প্রতিজ্ঞাত-মর্থং তং হেতুতঃ স্থাপয়তি দ্বিতীয়স্য প্রতিষিদ্ধশ্চোদ্ধরতীতি, দ্বিতীয়েন স্থাপনাহেতুঃ প্রতিষিধ্যতে, তস্যৈব প্রতিষেধহেতুশ্চোদ্ধ্রিয়তে, স নিবর্ত্ততে, তস্য নিবৃত্তৌ যোঽবতিষ্ঠতে তেনার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।

উভাভ্যামেবার্থাবধারণমিত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা? একস্য সম্ভবো দ্বিতীয়স্যাসম্ভবঃ,—তাবেতৌ সম্ভবাসম্ভবৌ বিমর্শং সহ নিবর্ত্তয়তঃ,—উভয়সম্ভবে উভয়াসম্ভবে বাঽনিবৃত্তো বিমর্শ ইতি। বিমৃশ্যেতি বিমর্শং কৃত্বা। সোঽয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাববদ্যোত্য ন্যায়ং প্রবর্ত্তয়তীত্যুপা-দীয়ত ইতি। এতচ্চ বিরুদ্ধয়োরেকধর্ম্মিস্থয়োর্ব্বোদ্ধব্যম্। যত্র তু ধর্ম্মিসামান্যগতৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ হেতুতঃ সম্ভবতস্তত্র সমুচ্চয়ঃ, হেতুতো-ঽর্থস্য তথাভাবোপপত্তেঃ, যথা ক্রিয়াবদ্দ্রব্যমিতি লক্ষণবচনে যস্য দ্রব্যস্য ক্রিয়াযোগো হেতুতঃ সম্ভবতি, তৎ ক্রিয়াবৎ,—যস্য ন সম্ভবতি তদক্রিয়-মিতি। একধর্ম্মিস্থয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োর্ধর্ম্ময়োরযুগপদ্ভাবিনোঃ কাল-বিকল্পঃ,—যথা তদেব দ্রব্যং ক্রিয়াযুক্তং ক্রিয়াবৎ, অনুৎপন্নোপরতক্রিয়ং পুনরক্রিয়মিতি।

ন চায়ং নির্ণয়ে নিয়মো বিমৃশ্যৈব পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি। কিন্ত্বিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপ্রত্যক্ষেঽর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি। পরীক্ষাবিষয়ে—বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। বাদে শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জ্জং।

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

অনুবাদ। স্থাপনা অর্থাৎ আত্মপক্ষ সংস্থাপনকে সাধন বলে। প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনকে উপালম্ভ বলে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যাহার আশ্রয় অর্থাৎ একাধারে বিবাদের বিষয় দুইটি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা উদ্দেশ্য করিয়া যাহা করা হয় (এবং) যাহা ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পবস্পর মিলিত (এবং) যাহা অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া (প্রকৃতানুবর্ত্তী হইয়া) প্রবর্ত্তমান অর্থাৎ যাহার অবসানে একতর পক্ষের নির্ণয় হয়, এমন সেই (পূর্ব্বোক্ত) সাধন ও উপালম্ভ (এই সূত্রে) পক্ষ ও প্রতিপক্ষ এই দুই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধন ও উপালম্ভের কোন একটির নিবৃত্তি এবং কোন একটির অবস্থান অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকটে বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পর সাধন ও উপালম্ভ হইলে সেখানে সাধনের নিবৃত্তি হইয়া উপালম্ভ থাকিবে অথবা উপালম্ভের নিবৃত্তি হইয়া সাধনই থাকিবে। যাহার অর্থাৎ সাধনেরই হউক অথবা উপালম্ভেরই হউক, অবস্থান হইবে, তাহার অর্থাৎ সেই সাধনের অথবা সেই উপালম্ভের যে অর্থ অর্থাৎ পক্ষ অথবা প্রতিপক্ষরূপ পদার্থ, তাহার অবধারণ নির্ণয়।

(পূর্ব্বপক্ষ) এই অর্থাবধারণ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধন ও উপালম্ভ এই উভয়েরই দ্বারা হয় না। যেহেতু এক ব্যক্তি (প্রথমবাদী) সেই প্রতিজ্ঞাত পদার্থকে অর্থাৎ যে পদার্থটি সাধন করিতে ঐ বাদী প্রতিজ্ঞা বলিয়াছে, সেই পদার্থটি হেতুর দ্বারা স্থাপন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির (প্রতিবাদীর) প্রতিষেধকে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুর যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, ঐ দোষকে উদ্ধার করে, অর্থাৎ উহা দোষ হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে। (পরে) দ্বিতীয় ব্যক্তি (প্রতিবাদী) স্থাপনার হেতুকে অর্থাৎ বাদীর স্বপক্ষ সংস্থাপনের হেতুকে প্রতিষেধ করে অর্থাৎ তাহা ঠিক হেতু হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে এবং তাহারই (বাদীরই) প্রতিষেধের হেতুকে উদ্ধার করে। অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্ব্বে বাদীর কথিত হেতুর যে দোষ প্রদর্শন করে, তাহার পরে বাদী ঐ দোষের যে প্রতিষেধ করে, সেই প্রতিষেধের হেতুকে প্রতিবাদীই উদ্ধার করে। (তখন) তাহা অর্থাৎ বাদীরই হউক আর প্রতিবাদীরই হউক, হেতু এবং উপালম্ভ নিবৃত্ত হয়, তাহার নিবৃত্তি হইলে যাহা অর্থাৎ যে একটি মাত্র অবস্থান করে, তাহার দ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয় [অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে যখন মধ্যস্থের নির্ণয় হয়, তখন বাদী বা প্রতিবাদীর সাধন ও উপালম্ভ দুইটিই থাকে না। উহার একটি নিবৃত্ত হয়, একটি থাকে এবং যেটি থাকে, তাহার দ্বারাই সেখানে নির্ণয় হয়, তথাপি মহর্ষি সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়কেই নির্ণয়সাধন বলিয়াছেন কেন ?]

(উত্তর) উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এই জন্য বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিবশতঃ ? অর্থাৎ সাধন ও উপালম্ভ, এই দুইটিই যে নির্ণয়ের সাধন, তাহার যুক্তি কি ? (উত্তর) একটির সম্ভব, দ্বিতীয়টির অসম্ভব, অর্থাৎ বাদীর সাধনের সম্ভব, প্রতিবাদীর উপালম্ভের অসম্ভব এবং প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব, বাদীর উপালম্ভের অসম্ভব, সেই অর্থাৎ উক্ত প্রকার এই সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়া সংশয়কে নিবৃত্ত করে। উভয়ের সম্ভব হইলে অথবা উভয়ের অসম্ভব হইলে

অর্থাৎ যদি পূর্ব্বোক্ত সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত না হয়, কেবল সাধন ও উপালম্ভের সম্ভবই হয়, অথবা ঐ উভয়ের অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে সংশয় নিবৃত্ত হয় না। (সূত্রে) "বিমৃশ্য" এই কথার অর্থ সংশয় করিয়া। সেই এই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ এক পদার্থে বিভিন্নবাদীর স্বীকৃত দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে নিয়ত বিষয় করিয়া ন্যায়কে (পরার্থানুমানকে) প্রবৃত্ত করে অর্থাৎ উত্থাপিত করে ; এ জন্য অর্থাৎ সশংয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে ন্যায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া (এই সূত্রে) গৃহীত হইয়াছে।

ইহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংশয়-জ্ঞান কিন্তু একধর্ম্মিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কোন একই বিশেষ ধর্ম্মীতে যেখানে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞান হয়, তাহাই সংশয়। যেখানে কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় সামান্য ধর্ম্মিগত হইয়া প্রমাণের দ্বারা সম্ভব (উপপন্ন) হয়, সেখানে 'সমুচ্চয়' হয় অর্থাৎ সামান্য ধর্ম্মীতে ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞান হইলে, সে জ্ঞান সংশয় নহে, তাহা 'সমুচ্চয়' নামক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। কারণ, (সেখানে) প্রমাণের দ্বারা পদার্থের (সামান্যধর্ম্মীর) তথাভাবের (তদ্রূপতার) অর্থাৎ জ্ঞায়মান সেই ধর্ম্মদ্বয়যুক্ততার উপপত্তি হয়। যেমন 'ক্রিয়াযুক্ত পদার্থ দ্রব্য' এই লক্ষণবাক্যে (কণাদোক্ত দ্রব্যলক্ষণে) যে দ্রব্যের ক্রিয়াযোগ প্রমাণের দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা ক্রিয়াযুক্ত, যে দ্রব্যের সম্ভব হয় না, তাহা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে সক্রিয় দ্রব্যও আছে, নিষ্ক্রিয় দ্রব্যও আছে ; সামান্যতঃ দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এইরূপ জ্ঞান সংশয় নহে, উহা ঐ স্থলে সমুচ্চয় জ্ঞান এবং যথার্থ জ্ঞান।

এবং একধর্ম্মিগত বিভিন্ন কালভাবী বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের কালবিকল্প হয় অর্থাৎ কালবিশেষ বিষয় করিয়া সেখানে ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের যথার্থ নিশ্চয়ই হয়, সেখানেও ঐ জ্ঞান সংশয় নহে। যেমন সেই দ্রব্যই ক্রিয়াযুক্ত হইয়া সক্রিয় অর্থাৎ যখন তাহাতে ক্রিয়া জন্মিয়াছে, তখন সক্রিয় এবং অনুৎপন্নক্রিয় অথবা বিনষ্টক্রিয় হইলে অর্থাৎ যখন সেই দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মে নাই অথবা ক্রিয়া জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, তখন সেই দ্রব্যই আবার নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ কালভেদে এক দ্রব্যেও সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব থাকিতে পারে, উহা কালভেদে বিরুদ্ধ হয় না, সুতরাং কালভেদ বিষয় করিয়া ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের একই ধর্ম্মীতে জ্ঞান হইলেও তাহা সংশয় নহে।

সংশয় করিয়াই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধন ও উপালম্ভের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয় ; ইহাও নির্ণয় মাত্রে নিয়ম নহে অর্থাৎ উহাই নির্ণয়মাত্রের

লক্ষণ নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষ বশতঃ উৎপন্ন প্রত্যক্ষে অর্থের অবধারণ নির্ণয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্থলে "অর্থাবধারণ" এই মাত্রই নির্ণয়ের লক্ষণ। পরীক্ষাবিষয়ে অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকটে স্ব স্ব পক্ষ স্থাপনাদি করিয়া বস্তু বিচার করেন, তাদৃশ পরার্থানুমান স্থলে সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়।

বাদবিচারে অর্থাৎ কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, যাহাতে মধ্যস্থ নাই, সেই বাদ নামক কথাতে এবং শাস্ত্রে অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্য তত্ত্বনির্ণয় স্থলে সংশয় বর্জ্জন করিয়া অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ সেখানে বস্তুতঃ কাহারও সংশয়পূর্ব্বক নির্ণয় হয় না।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

বিবৃতি। প্রমাণের দ্বারা বস্তু নিশ্চয়কেই নির্ণয় বলে; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও হয়, শাস্ত্রের দ্বারাও হয়, আবার নিজে নিজে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও হয়, আবার জিজ্ঞাসু হইয়া গুরু প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত বিচার করিয়াও হয়, নীরবে গুরু প্রভৃতির কথা শুনিয়াও হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া আর এক প্রকার নির্ণয় আছে, তাহা উভয় পক্ষের বিচার শুনিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের হয়। যেখানে একই পদার্থে দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ লইয়া বাদী ও প্রতিবাদী দুইটি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন, সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিরা সংশয় করেন। তাহার পরে ঐ বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সংস্থাপন ও পরপক্ষ সাধনের খণ্ডন শুনিয়া একতর পক্ষের নির্ণয় করেন। মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের একতর পক্ষের নির্ণয় হইলে তাঁহারা সেই পক্ষেরই অনুমোদন করেন, সেই পক্ষের বিরুদ্ধবাদী নিরস্ত হন। মধ্যস্থের সংশয় দূর করিতে না পারিলে মধ্যস্থ একতর পক্ষের অনুমোদন করিতে পারেন না, সুতরাং মধ্যস্থের নির্ণয় সম্পাদনের জন্য বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিবেন। যেখানে ঐ স্থাপন ও খণ্ডন যথারীতি যথাশাস্ত্র চলিবে, সেখানে অবশ্যই উহার একটির নিবৃত্তি এবং অপরটির স্থিতি হইবে। কারণ, দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ একই পদার্থে কখনও প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারিবে না।

আত্মা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ইহা কখনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আত্মার নিত্যত্ববাদী ও অনিত্যত্ববাদী প্রকৃত মধ্যস্থের নিকটে পঞ্চাবয়ব ন্যায় প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিতে থাকিলে সেখানে একটি পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইবে। মধ্যস্থ তাহার নির্ণয় করিবেন। উভয়বাদীর সম্মানিত স্বীকৃত মধ্যস্থ যে পক্ষের নির্ণয় করিবেন, তাহাই সেখানে সিদ্ধান্ত হইবে। বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের নিশ্চয় করিয়াই বিচার করে, তাহাদিগের কোন সংশয় থাকে না। এইরূপ স্থলে মধ্যস্থেরই সংশয় হয়, মধ্যস্থেরই নির্ণয় হয়। মধ্যস্থ না থাকিলে এ নির্ণয়টি হইতে পারে না। কারণ, কয় জন বাদী স্বেচ্ছায় নিজের পক্ষ

ত্যাগ করেন, নিজের ভ্রম স্বীকার করেন ? মধ্যস্থের এইরূপ নির্ণয়ে রাজা এবং অন্যান্য সভ্যগণেরও ঐরূপ নির্ণয় হইয়া যায়। এই নির্ণয় ন্যায়-বিদ্যার একটি মুখ্য ফল। ইহা ন্যায়বিদ্যাসাধ্য। ইহার মূল মধ্যস্থগণের সংশয়। ঐ সংশয়ই বাদী ও প্রতিবাদীর পরার্থানুমান-প্রবৃত্তির মূল। সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায়প্রবৃত্তি হয় এবং তাহার ফল এই নির্ণয়। ইহাতে প্রমাণের সাহায্যের জন্য তর্ক আবশ্যক হয়। তাই ন্যায়বিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি গোতম তর্কের পরেই এই নির্ণয়ের উল্লেখ ও স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ইহা নির্ণয়মাত্রের লক্ষণ নহে।

টিপ্পনী। নির্ণয় অনেক প্রকারেই হয়, কিন্তু সকল নির্ণয় তর্কপূর্ব্বক নহে। তর্কবিদ্যার আচার্য্য মহর্ষি গোতম তর্কপূর্ব্বক নির্ণয়কেই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। এই নির্ণয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায় প্রয়োগ আবশ্যক হয়, মধ্যস্থের সংশয় দূর করিতে তর্কের উদ্ভাবন করিতে হয়; এ জন্য মহর্ষি পঞ্চাবয়ব এবং তর্ক নিরূপণ করিয়া তাহার ফল নির্ণয় নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাবধারণই নির্ণয় মাত্রের সামান্য লক্ষণ। সংশয়পূর্ব্বক পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা যে অর্থাবধারণ, তাহা নির্ণয়বিশেষের লক্ষণ।

একাধারে বিবাদের বিষয় দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মই এই শাস্ত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রকৃত অর্থ। মহর্ষি গোতম বাদসূত্রে এই অর্থেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারও মহর্ষি-সূত্রোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের ঐরূপ প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের ঐ অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ, এই সূত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ বলা হইয়াছে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে যখন বিবাদবিষয় দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, তখন তাহার দ্বারা অবধারণ বলা যায় না; ঐ দুইটি ধর্ম্মেরই একটির অবধারণ হইবে, তাহার দ্বারা অবধারণ হইবে না। যাহা অবধারণীয়, যাহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে, তাহার দ্বারাই কি তাহাকে বুঝিয়া লওয়া যায় ? অবধারণ করা যায় ? তাহা কখনই যায় না। এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে মহর্ষি যে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দ বলিয়াছেন, উহার দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সাধন ও উপালম্ভ বুঝিতে হইবে। মহর্ষি এখানে ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধন বলিতে সংস্থাপন, উপালম্ভ বলিতে তাহার খণ্ডন। একজন স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে অপর ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদী তাহার খণ্ডন করেন। এই সাধন ও উপালম্ভ শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। পরে অনেক স্থলে এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ হইবে। সর্ব্বত্র উহার অর্থ প্রকাশ করা যাইবে না। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের মুখ্য অর্থও মনে রাখিতে হইবে। মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধবিশেষকেই লক্ষণা বলে। মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গার অতি নিকটে বাস করিলে "তিনি গঙ্গাবাস করিতেছেন", এইরূপ কথা বলা হইয়া থাকে। এখানে গঙ্গা শব্দের মুখ্য অর্থ সেই জলবিশেষ না বুঝিয়া তাহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধযুক্ত গঙ্গাতীরকেই "গঙ্গা" শব্দের দ্বারা বুঝা হয়। ঐ সম্বন্ধবিশেষই ঐ স্থলে লক্ষণা। ঐ সম্বন্ধরূপ লক্ষণাজ্ঞানবশতঃ ঐ স্থলে ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝা যায়। অনেক স্থলে কোন প্রয়োজনবশতঃই লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ হইয়া

আসিতেছে। এখানে এই সূত্রে লাক্ষণিক পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ কেন করা হইয়াছে এবং উহার মুখ্যার্থের সহিত পূর্ব্বোক্ত লাক্ষণিক অর্থের সম্বন্ধই বা কি ? এই প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। এ জন্য ভাষ্যকার এখানে ঐ সাধন ও উপালম্ভরূপ লাক্ষণিক অর্থকে বলিয়াছেন "পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যাহার আশ্রয়। পক্ষকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সাধন করিতে হয় এবং প্রতিপক্ষ পদার্থটির উপালম্ভ না করিলেও অর্থাৎ তাহা অসম্ভব হইলেও ঐ প্রতিপক্ষ পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার সাধনের (সংস্থাপনের) উপালম্ভ (খণ্ডন) করা হয়, এ জন্য সাধন ও উপালম্ভ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের আশ্রিত। তাহা হইলে সাধন ও উপালম্ভের সহিত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পদার্থের ঐরূপ সম্বন্ধ (আশ্রয়াশ্রয়িভাব) থাকায় ঐ সাধন ও উপালম্ভ অর্থে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইতে পারে। ফলকথা, মহর্ষি পক্ষ ও প্রতিপক্ষের আশ্রিত সাধন ও উপালম্ভকেই এই সূত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সাধন ও উপালম্ভের দ্বারা অর্থাবধারণ হইয়া থাকে, সুতরাং মহর্ষির ঐ কথা অযোগ্য হয় নাই। মহর্ষি এই সূত্রে সাধন ও উপালম্ভ শব্দের প্রয়োগ করিলেই তাঁহার সূত্র স্পষ্টার্থ হইত। তিনি তাহা না করিয়া এবং মুখ্য শব্দ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? ভাষ্যকার ইহার উত্তর সূচনার জন্য আবার বলিয়াছেন,—"ব্যতিষক্তৌ"। ব্যতিষক্ত বলিতে এখানে পরস্পর মিলিত অথবা উভয় পক্ষে সম্বন্ধযুক্ত (বাদ-সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্য্য এই যে, সাধন ও উপালম্ভ বলিলে উহা যে উভয় পক্ষেই সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই, ইহা বুঝা যায় না। এ জন্য মহর্ষি এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা ঐরূপ সাধন ও উপালম্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পক্ষেও সাধন এবং উপালম্ভ থাকিবে এবং প্রতিপক্ষেও সাধন এবং উপালম্ভ থাকিবে। পক্ষে বাদীর সাধন, প্রতিবাদীর উপালম্ভ, প্রতিপক্ষে প্রতিবাদীর সাধন, বাদীর উপালম্ভ—এইরূপ হইলে, সেই সাধন ও উপালম্ভকে "ব্যতিষক্ত" বলা যায়। এইরূপ না হইলে তাহা ঐ স্থলে অর্থাবধারণের সাধনও হয় না। তাই মহর্ষি এইরূপ সাধন ও উপালম্ভকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই সূত্রে লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্রে "অবধারণ" না বলিয়া "অর্থাবধারণ" বলিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইলেই ন্যায়ের দ্বারা বস্তু পরীক্ষা স্থলে নির্ণয় হইবে না। যে অর্থ লইয়া অর্থাৎ যে বস্তু লইয়া বিচার, তাহারই অবধারণ হওয়া আবশ্যক। বিচারমাত্রেই যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইয়াই থাকে। প্রকৃতার্থের অবধারণ না হইলে তাহা সেখানে নির্ণয় হইবে না। বিচার্য্য বিষয়ে সাধন ও উপালম্ভ হইতে থাকিলে যেখানে ঐ সাধন ও উপালম্ভের একতরের নিবৃত্তি এবং একতরের স্থিতি অবশ্যই হইবে, সেখানেই একতর পক্ষের নির্ণয় হইবে। সাধন ও উপালম্ভের ঐরূপ অবস্থাই তাহাদিগের পরস্পর অনুবন্ধ বলা হইয়াছে। "অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রবর্ত্তমান" এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরস্পর অনুবন্ধবিশিষ্ট সাধন ও উপালম্ভকেই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি সূত্রে "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই উহা সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ

যে সাধন ও উপালম্ভের চরম ফল একতর নির্ণয়, তাহাই এখানে বুঝিতে হইবে। তাহাকেই বলে অনুবন্ধযুক্ত সাধন ও উপালম্ভ। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধন ও উপালম্ভের একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি অবশ্যই হইবে। কারণ, একই পদার্থে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। যেখানে সাধনের স্থিতি হয়, সেখানে সেই সাধনের যেটি অর্থ, অর্থাৎ যে পদার্থকে (পক্ষ বা প্রতিপক্ষ) আশ্রয় করিয়া ঐ সাধন করা হইয়াছে, তাহারই অবধারণ হয়। যেখানে উপালম্ভের স্থিতি হয় অর্থাৎ উপালম্ভের পরে বিরুদ্ধবাদী আর কিছু না বলিতে পারে, তাহার খণ্ডন করিতে না পারে, সেখানে ঐ উপালম্ভের যেটি অর্থ অর্থাৎ যে পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতিবাদী বাদীর সাধনের খণ্ডন করিয়াছেন, সেই পদার্থটিরই অবধারণ হইবে। এইরূপ অবধারণই পরীক্ষাস্থলে নির্ণয়। সংশয়ের পরে মধ্যস্থ ব্যক্তিরই এই নির্ণয় হইয়া থাকে। ভাষ্যোক্ত পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত সাধন ও উপালম্ভের যখন একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি হইবে, নির্ণয়ের পূর্ব্বে দুইটিই থাকিবে না, এ কথা ইহার পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, তখন সাধন ও উপালম্ভ, এই দুইটিকেই অর্থাবধারণের সাধন বলা যায় কিরূপে ? পূর্ব্বোক্ত সাধন ও উপালম্ভ মিলিত হইয়া ত নির্ণয়ের সাধন হয় না, উহার মধ্যে যেটির স্থিতি হয়, সেইটির দ্বারাই নির্ণয় হয়। উত্তর-পক্ষের তাৎর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপালম্ভের ফলে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। ঐ সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইলে সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না এবং ঐ উভয়ের স্থিতি হইলেও সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না। যদি বাদীর সাধনের সম্ভব এবং প্রতিবাদীর উপালম্ভের অসম্ভব হয়, অথবা প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব এবং বাদীর উপালম্ভের অসম্ভব হয়, তবে সেখানেই মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ যদি বাদীর সাধনকে প্রতিবাদী খণ্ডন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন, অথবা প্রতিবাদীর সাধনকে বাদী খণ্ডন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন, তবেই সেখানে এক পক্ষের অবধারণ হয়, সংশয় নিবৃত্ত হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপালম্ভের নিবৃত্তি হইল না, অথবা সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইয়া গেল, কোন বাদীই স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না, উভয়েই নিবৃত্ত হইয়া গেলেন, সেখানে সংশয় নিবৃত্তি হয় না ; সুতরাং সেখানে নির্ণয় হয় না। তাহা০ হইলে বুঝা গেল, পূর্ব্বোক্ত সাধন ও উপালম্ভের সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই নির্ণয়ের সাধন করে ; সুতরাং সাধন ও উপালম্ভ এই উভয়ই নির্ণয়ের সাধন। ঐ উভয়ের মধ্যে একের সম্ভব ও অপরটির অসম্ভব যখন নির্ণয়ে আবশ্যক, তখন ঐ উভয়কেই নির্ণয়ের সাধন বলিতে হইবে।

সূত্রে যে "বিমৃশ্য" এই কথাটি আছে, উহার অর্থ সংশয় করিয়া। মহর্ষি গোতম "বিমর্শ"-কেই সংশয় বলিয়াছেন। এই সূত্রে ঐ কথার প্রয়োজন কি ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয় পূর্ব্বোক্ত স্থলে ন্যায়প্রবৃত্তির মূল। যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম লইয়া বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায়প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডন হয়, সেই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে নিয়ত বিষয় করিয়া মধ্যস্থের সেখানে সংশয় হইয়া থাকে। ঐ সংশয়ই সেখানে

বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায়প্রবৃত্তির মূল। সুতরাং ঐরূপ স্থলে মধ্যস্থের সংশয়পূর্ব্বকই নির্ণয় হইয়া থাকে। এ জন্য এইরূপ নির্ণয়ে মহর্ষি সংশয়ের কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যে "পক্ষপ্রতিপক্ষৌ অবদ্যোত্য" এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দ এখানে মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত। "অবদ্যোত্য" এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন,—"নিয়মেন বিষয়ীকৃত্য"। ভাষ্যকার পূর্ব্বে যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে সংশয়ের কথা বলিয়াছেন, ঐ সংশয় একই সময়ে একই ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার শেষে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে কোন প্রকারে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে, সেখানে তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মে না। তজ্জন্য কোন বাদী ও প্রতিবাদীর "ন্যায়প্রবৃত্তি" হয় না। যেমন মহর্ষি কণাদ "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য-লক্ষণং" (বৈশেষিক-দর্শন, ১৫সূত্র) এই সূত্রে দ্রব্যের প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন ক্রিয়া। কিন্তু দ্রব্যমাত্রেরই ক্রিয়া নাই। আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য নিষ্ক্রিয় বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ। তাহা হইলেও "দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়" এইরূপ জ্ঞান সংশয় হইবে না। কারণ, দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্য সামান্যধর্ম্মী। তাহার মধ্যে দ্রব্যবিশেষ সক্রিয় এবং দ্রব্যবিশেষ নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও ধর্ম্মীর ভেদে উহা বিরুদ্ধ নহে। একই দ্রব্য ধর্ম্মীতে যদি সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একটি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান সংশয় হইবে। যখন কোন দ্রব্যে সক্রিয়ত্ব এবং কোন দ্রব্যে নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণসিদ্ধ, তখন সামান্যতঃ দ্রব্যধর্ম্মীতে সক্রিয়ত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্বের উল্লেখ করিলে তাহা সংশয় জন্মাইবে না। ঐ স্থলে দ্রব্যধর্ম্মীতে সক্রিয়ত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহাকে বলে সমুচ্চয়-জ্ঞান। অর্থাৎ দ্রব্য সক্রিয়ও বটে, নিষ্ক্রিয়ও বটে, কোন দ্রব্য সক্রিয়, কোন দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। এইরূপে বিভিন্ন দ্রব্যধর্ম্মীতে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বরূপ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়। ন্যায়াচার্য্যগণ এইরূপ জ্ঞানকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "সমুচ্চয়" শব্দের দ্বারা এই সমূহালম্বন জ্ঞানকেই প্রকাশ করিয়াছেন। সমূহালম্বন জ্ঞান বুঝাইতে সমুচ্চয় শব্দের প্রয়োগ[1] নব্য নৈয়ায়িকগণও করিয়াছেন। সংশয় জ্ঞানে একই ধর্ম্মীতে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয় হয়, অর্থাৎ "সংশয়" জ্ঞানে যে পদার্থ বিশেষ্য হইবে, তাহাতে একটিমাত্র বিশেষ্যতা থাকিবে। আর বিশেষণ যে কয়েকটি হইবে, তাহাতে সেই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা থাকিবে। "সমুচ্চয়" জ্ঞানে যে কয়েকটি বিশেষণ হয়, সেই কয়েকটি বিশেষ্য হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানে বিশেষণতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বিশেষ্যতাও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন। সমুচ্চয় ও সংশয় জ্ঞানের অন্ততঃ এই ভেদ সর্ব্বত্র থাকিবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার এখানে যে সমুচ্চয় জ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর ও

১। সংশয়বিশেষ্যতামাত্রস্যৈব প্রকারতাদ্বয়নিরূপিতত্বাদেবঞ্চ "নির্ব্বহ্নির্ব্বহ্নিমাংশ্চ পর্ব্বত" ইত্যাদি-সমুচ্চয়স্যাপি সাধ্যনিশ্চয়ত্বসম্ভবাৎ তৎসত্ত্বেহপি ন বহ্ন্যনুমিতিঃ, সমুচ্চয়স্থলে প্রকারতাদ্বয়নিরূপিত-বিশেষ্যতা-দ্বয়োপগমাৎ ইত্যাদি।—পক্ষতাবিচারে জাগদীশী।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐ সকল কথার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। "ক্রিয়াবদ্‌দ্রব্যমিতি লক্ষণ-বচনে" এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত কণাদ-সূত্রটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, মনে হয়। কণাদ ক্রিয়াকে দ্রব্যমাত্রের লক্ষণ বলেন নাই। আত্মা প্রভৃতি দ্রব্যে গমনাদি ক্রিয়া নাই। যাহাতে ক্রিয়া জন্মে, তাহা দ্রব্য পদার্থই হইবে; দ্রব্য ভিন্ন পদার্থে ক্রিয়া থাকে না, ইহাই কণাদের তাৎপর্য্য। প্রাচীনগণ কণাদ-সূত্রের ঐ অংশের এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং কণাদের ঐ দ্রব্যবিশেষের লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা সামান্যতঃ দ্রব্যমাত্রে ক্রিয়া আছে কি না, এইরূপ সংশয় হয় না। কারণ, কোন দ্রব্যে ক্রিয়া আছে, কোন দ্রব্যে ক্রিয়া নাই, ইহা বুঝিলে কণাদের ঐ কথা সংশয় জন্মায় না। কেহ যেন ঐ লক্ষণ-বাক্য শুনিয়া ঐরূপ সংশয় না করেন, ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার ঐ কথার অবতারণা করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। আবার কালভেদে একই দ্রব্যে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব থাকিতে পারে। গাড়ী যখন চলিতেছে, তখন গাড়ী সক্রিয়, যখন দাঁড়াইয়া আছে, তখন নিষ্ক্রিয়; ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং নাশও হয়; সুতরাং একই দ্রব্যকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বলিলে, ঐ সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব সেই দ্রব্যে কাল-ভেদে বুঝিতে হইবে। কালভেদে এক দ্রব্যেও উহা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নহে। ফলকথা, দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়, এইরূপ কথা বলিলে ঐ বাক্যের দ্বারা বোদ্ধা ব্যক্তির সংশয় জন্মে না। সেখানে উহা লইয়া কোন বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না।

সূত্রকারোক্ত এই নির্ণয়-লক্ষণ নির্ণয় মাত্রের লক্ষণ নহে। ন্যায়ের দ্বারা বস্তু পরীক্ষা স্থলে মধ্যস্থের যে নির্ণয়বিশেষ জন্মে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সেই ন্যায়ের ফল নির্ণয়েরই লক্ষণ বলিয়াছেন। অন্যত্র কেবল অর্থাবধারণই নির্ণয়ের লক্ষণ; এ কথা ভাষ্যকারও শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার কিন্তু প্রথম সূত্র-ভাষ্যে নির্ণয় ব্যখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্ব্বক নির্ণয় হইলে বস্তুতঃ তাহাও নির্ণয় হইবে অর্থাৎ তিনি সেখানে তর্কপূর্ব্বক নির্ণয়কেই মহর্ষি গোতমের নির্ণয় পদার্থ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে এবং শাস্ত্রে সংশয় পূর্ব্বক নির্ণয় হয় না। বাদবিচারে মধ্যস্থ আবশ্যক নাই; সুতরাং সেখানে কাহারও সংশয়, ন্যায়প্রবৃত্তি জন্মায় না। বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষে নিশ্চয় রাখিয়াই বিচার করে। বাদী ও প্রতিবাদীর সংশয় জন্য কোন স্থলেই ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না; সুতরাং বাদবিচারে যে নির্ণয় হয়, তাহা সংশয়পূর্ব্বক নহে। অর্থাৎ সূত্রে যে "বিমৃশ্য" এই কথাটি আছে, উহা বাদবিচার ভিন্ন বিচারাভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে।

বাদবিচার-স্থলীয় নির্ণয়ের লক্ষণ বুঝিতে সূত্রের "বিমৃশ্য" এই কথাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণয়ও সংশয় পূর্ব্বক নহে। অশ্বমেধ যাগ করিলে স্বর্গ হয়, ইহা বেদের দ্বারা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু ঐ নির্ণয়ের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ে অজ্ঞতা থাকিলেও সংশয় থাকে না। সুতরাং ঐ নির্ণয় সংশয়পূর্ব্বক নহে। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

ন্যায়সূত্রকার মহামুনি গোতমের ন্যায়সূত্রের প্রথম হইতে ৪১টি সূত্র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক নামে সম্প্রদায়ক্রমে প্রসিদ্ধ আছে। অনেকে বলেন, মহর্ষি গোতম তাঁহার শিষ্যদিগকে

যে সূত্রগুলি এক দিনে বলিয়াছিলেন, সেই সূত্রগুলিই ন্যায়সূত্রের আহ্নিক নামে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি দশ দিনে সমস্ত ন্যায়সূত্র বলিয়াছিলেন। এই জন্য ন্যায়সূত্রে দশটি আহ্নিক আছে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই "আহ্নিক" শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থের ব্যাখ্যা করেন নাই, তাঁহারা উহার অনুরূপ কোন ব্যাখ্যাও করেন নাই। তবে এক দিবসে নিষ্পন্ন, এইরূপ অর্থেও আহ্নিক[১] শব্দটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কণাদসূত্র এবং পাণিনি-সূত্রেরও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশ আহ্নিক নামে প্রসিদ্ধ আছে। সূত্রগ্রন্থের কোন কোন ভাষ্যেরও সূত্রানুসারে আহ্নিক দেখা যায়। পাণিনিসূত্রের আহ্নিক অনুসারেই মহাভাষ্যের আহ্নিক প্রসিদ্ধ আছে। ন্যায়সূত্র-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ভাষ্য করিয়া "ন্যায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত" এই কথা বলিয়া তাঁহার ভাষ্যের প্রথম আহ্নিকের সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে ন্যায়সূত্রেরও প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের এখানেই সমাপ্তি, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে।

ভাষ্য। তিস্রঃ কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি তাসাং

সূত্র। প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥১।৪২॥

অনুবাদ। কথা অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসন্দর্ভ ত্রিবিধ হয় ;—(১) বাদ, (২) জল্প এবং (৩) বিতণ্ডা।

সেই ত্রিবিধ কথার মধ্যে যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ অর্থাৎ স্বপক্ষ সংস্থাপন এবং পরপক্ষ সংস্থাপনের খণ্ডন হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং যাহাতে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হয়, এমন যে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাতে একই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের মধ্যে বাদী একটিকে এবং প্রতিবাদী অপরটিকে নিয়ম করিয়া স্বীকার করেন, এইরূপ যে বাক্যসন্দর্ভ, তাহা 'বাদ'।

বিবৃতি। বাদী ও প্রতিবাদীর যথারীতি পরস্পর বাদপ্রতিবাদরূপ বিচার দুই উদ্দেশ্যে হইতে পারে। একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অথবা জয়লাভের উদ্দেশ্যে। তাহার মধ্যে যে বিচার কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই হয়, তাহার নাম "বাদ" এবং যে বিচার জয়লাভের

১। তেন নির্ব্বৃত্তং।—পাণিনিসূত্র, ৫।১।৭৯।
অহ্না নির্ব্বৃত্তমাহ্নিকং।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

উদ্দেশ্যে হয়, তাহার নাম "জল্প" ও "বিতণ্ডা।" তন্মধ্যে বিতণ্ডায় বিতণ্ডাকারী আত্মপক্ষ সংস্থাপন করেন না, কেবল পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন; জল্প হইতে বিতণ্ডার ইহাই মাত্র বিশেষ। গুরু প্রভৃতির সহিত কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাদবিচার হয়, সুতরাং তাহাতে জিগীষার গন্ধও নাই, মধ্যস্থেরও আবশ্যকতা নাই। জিগীষুর বিচার জল্প বা বিতণ্ডা, তাহাতে মধ্যস্থ আবশ্যক। মধ্যস্থই সেখানে জয় ও পরাজয়ের ঘোষণা করেন। জল্প ও বিতণ্ডায় বিচারকদ্বয় ছল প্রভৃতি অসদুত্তরও করিতে পারেন এবং সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উল্লেখ করিতে পারেন। কারণ, যে কোনরূপে যে কোন দিক্ দিয়া বিপক্ষকে পরাস্ত করাই সেখানে বিচারকদ্বয়ের উদ্দেশ্য থাকে। বাদবিচারে তাহা উদ্দেশ্য নহে; তাহার উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়, সুতরাং তাহাতে 'ছল' প্রভৃতি অসদুত্তর করা হয় না এবং করা যায় না। এক অর্থে প্রযুক্ত বাক্যের অন্য অর্থ কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করাকে ছল বলে। বাদী নূতন কম্বল অর্থে "নব কম্বল" শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন,—"নয়খানা কম্বল কোথায়, তাহা ত নাই," এরূপ অসদুত্তর 'ছল'। এই ছল তিন প্রকার। অন্য প্রকারে আরও অনেক অসদুত্তর আছে; সেগুলির নাম 'জাতি'; তাহা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর অজ্ঞতা বা ভ্রম প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যাহা যে কোনরূপে যে কোন অংশে বাদী বা প্রতিবাদীর পরাজয় সূচনা করে, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে; এই নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকার। ইহার মধ্যে হেত্বাভাস একপ্রকার নিগ্রহস্থান। বাদী বা প্রতিবাদী যদি কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত স্থলে হেতু হয় না, তাহার দ্বারা অনুমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপক্ষ বিচারক তাহা উল্লেখ করিবেন;—এ হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা বুঝাইয়া দিবেন। বাদবিচারেও ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, সেখানে তত্ত্ব নির্ণয় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাহা তত্ত্ব নির্ণয়ের অনুকূল এবং যাহা উপেক্ষা করিলে সেখানে তত্ত্ব নির্ণয়েরই ব্যাঘাত ঘটে,তাহা সেখানে কখনই উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু-শিষ্যের বাদ-বিচার হইতেছে, গুরু আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন, আত্মা দেহাদি নহে—ইহা বুঝাইলেন, কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে ভ্রমবশতঃ বলিয়া ফেলিলেন—"আত্মা নিত্য, যেহেতু তাহার রূপ নাই; যেমন আকাশ, কাল, দিক্ প্রভৃতি।" তখন তত্ত্বনির্ণয়ার্থী শিষ্য অবশ্যই বলিবেন—এই হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা হেত্বাভাস। কারণ, রূপ না থাকিলেই তাহা নিত্য পদার্থ হইবে, এমন নিয়ম নাই। বায়ুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু নিত্য পদার্থ নহে। গুরু যদি তখন বায়ুমাত্রকে নিত্য বলিয়াই বসেন, তাহা হইলে উহা অসিদ্ধান্ত, ইহা শিষ্য অবশ্যই বলিবেন। কারণ, অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়া গেলে প্রকৃত বিষয়ে তত্ত্বনির্ণয় ঘটিবে না; বাদবিচারে যে তত্ত্ব নির্ণয়ই উদ্দেশ্য। "অপসিদ্ধান্ত" একটি "নিগ্রহস্থান", বাদবিচারে তাহার উদ্ভাবন আছে এবং হেত্বাভাস মাত্রেরই উদ্ভাবন আছে এবং স্থলবিশেষে আর দুই একটি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন আছে। জল্প ও বিতণ্ডার ন্যায় বাদবিচারে সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, ছল ও জাতির একেবারেই কোন সংস্রব নাই। বাদী ও প্রতিবাদী কেবল জয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় জল্প বিচার করিলেও ঐ বিচার ভাল ভাবে

চলিলে উহার দ্বারা অনেক সময়ে মধ্যস্থের তত্ত্বনির্ণয় হইয়া যায়। এই নির্ণয়ই মহর্ষি গোতমের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত নির্ণয় পদার্থ। ঐ নির্ণয় মধ্যস্থের সংশয় পূর্ব্বক। বাদবিচারে নির্ণয় ঐরূপ নহে।

ভাষ্য। একাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, প্রত্যনীকভাবাৎ, অস্ত্যাত্মা নাস্ত্যাত্মেতি। নানাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ন পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, যথা নিত্য আত্মা অনিত্যা বুদ্ধিরিতি। পরিগ্রহোঽভ্যুপগমব্যবস্থা। সোঽয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। তস্য বিশেষণং, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভঃ, প্রমাণৈস্তর্কেণ চ সাধনমুপালম্ভশ্চাস্মিন্ ক্রিয়ত ইতি। সাধনং স্থাপনা, উপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ। তৌ সাধনোপালম্ভৌ উভয়োরপি পক্ষয়োর্ব্যতিষক্তাবনুবদ্ধৌ, যাবদেকো নিবৃত্ত একতরো ব্যবস্থিত ইতি, নিবৃত্তস্যোপালম্ভো ব্যবস্থিতস্য সাধনমিতি। জল্পে নিগ্রহ-স্থানবিনিয়োগাদ্বাদে তৎপ্রতিষেধঃ। প্রতিষেধে কস্যচিদভ্যনুজ্ঞানার্থং "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ" ইতি বচনম্। "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ" ইতি হেত্বাভাসস্য নিগ্রহস্থানস্যাভ্যনুজ্ঞাবাদে। "পঞ্চাবয়বোপপন্ন" ইতি "হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনং," "হেতূদাহরণাধিকমধিক"মিতি চৈতয়োরভ্যনুজ্ঞানার্থমিতি। অবয়বেষু প্রমাণতর্কান্তর্ভাবে পৃথক্প্রমাণ-তর্কগ্রহণং সাধনোপালম্ভব্যতিষঙ্গজ্ঞাপনার্থং, অন্যথোভাবপি স্থাপনাহেতুনা প্রবৃত্তৌ বাদ ইতি স্যাৎ। অন্তরেণাপি চাবয়বসম্বন্ধং প্রমাণান্যর্থং সাধয়ন্তীতি দৃষ্টং, তেনাপি কল্পেন সাধনোপালম্ভৌ বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্প ইতি বচনাদ্-বিনিগ্রহো জল্প ইতি মাবিজ্ঞায়ি; ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভ এব জল্পঃ, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভো বাদ এবেতি মাবিজ্ঞায়ীত্যেবমর্থং পৃথক্-প্রমাণ-তর্কগ্রহণমিতি।

অনুবাদ। একাধারে অবস্থিত দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিরুদ্ধতাবশতঃ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন একই পদার্থে বাদীর স্বীকৃত একটি এবং প্রতিবাদীর স্বীকৃত একটি—এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলে। (যেমন) আত্মা আছে এবং আত্মা নাই, (এখানে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব পক্ষ এবং

তাহার নাস্তিত্ব প্রতিপক্ষ, আবার নিত্য আত্মার নাস্তিত্ববাদীর নাস্তিত্ব পক্ষ, অস্তিত্ব প্রতিপক্ষ)। বিভিন্ন আধারে স্থিত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না, যেমন আত্মা নিত্য, বুদ্ধি অনিত্য, (এখানে এক আত্মারই অথবা বুদ্ধিরই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বলা হয় নাই; সুতরাং উহা বিরুদ্ধ না হওয়ায় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে না)। পরিগ্রহ বলিতে (এখানে) স্বীকার ব্যবস্থা, অর্থাৎ এই পদার্থ এই প্রকারই হইবে, এই প্রকার হইবে না, এইরূপে স্বীকারের নিয়ম। সেই এই পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাতে পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নিয়মবদ্ধ স্বীকার থাকে, এমন বাক্যসন্দর্ভ 'বাদ'। তাহার বিশেষণ প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ, (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ ত্রিবিধ কথাতেই আছে, উহাই কেবল বাদের লক্ষণ হয় না, এ জন্য ঐ বাদলক্ষণে মহর্ষি বিশেষণ বলিয়াছেন—প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ,) প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা এই বাদবিচারে সাধন এবং উপালম্ভ করা হয়। সাধন বলিতে স্থাপন অর্থাৎ স্বপক্ষ সংস্থাপন, উপালম্ভ বলিতে প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন। সেই সাধন ও উপালম্ভ এই দুইটি উভয় পক্ষেই ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত এবং অনুবন্ধবিশিষ্ট হইবে। (ঐ উভয়ের অনুবন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন) যে পর্য্যন্ত একটি নিবৃত্ত হইবে, একটি ব্যবস্থিত হইবে। নিবৃত্তের সম্বন্ধে উপালম্ভ, ব্যবস্থিতের সম্বন্ধে সাধন হইবে।

জল্পে নিগ্রহস্থানের বিনিয়োগবশতঃ অর্থাৎ ইহার পরবর্ত্তী সূত্রে জল্প নামক বিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবার বিধি থাকায় বাদবিচারে তাহার নিষেধ হয় অর্থাৎ বাদবিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের নিষেধ বুঝা যায়। নিষেধ হইলেও কোন নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞার জন্য অর্থাৎ বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহ-স্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচনা করিবার জন্য (এই সূত্রে) "সিদ্ধান্তা-বিরুদ্ধ" এই কথাটি বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, এমন পদার্থ বিরুদ্ধ এই সূত্রবশতঃ (২।২।৬ সূত্র) বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞা হইয়াছে অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রে "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ" এই কথার দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদ-বিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

অন্যতম অবয়বশূন্য বাক্য ন্যূন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটির প্রয়োগ না করিলেও ন্যূন নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতুবাক্য অথবা উদাহরণবাক্য একটির অধিক হইলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই দুই সূত্রোক্ত (৫ অঃ,

২ আঃ, ১২।১৩ সূত্র) ন্যূন এবং অধিক নামক দুইটি নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞার জন্য অর্থাৎ বাদবিচারে ঐ দুইটিরও উদ্‌ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচনা করিবার জন্য (মহর্ষি এই সূত্রে) পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথাটি বলিয়াছেন।

অবয়বগুলিতে প্রমাণ এবং তর্কের অন্তর্ভাব থাকিলেও অর্থাৎ যদিও সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথা বলাতেই প্রমাণ ও তর্কের কথা পাওয়া যায়, তথাপি সাধন ও উপালম্ভের ব্যতিষঙ্গ জ্ঞাপনের জন্য অর্থাৎ উভয় পক্ষেই ঐ উভয়ের সন্বন্ধ থাকা আবশ্যক, ইহা বুঝাইবার জন্য (সূত্রে) পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে। অন্যথা সংস্থাপনের হেতুর দ্বারা প্রবৃত্ত (প্রকাশিত) উভয় পক্ষও বাদ হউক, অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন করিয়াছেন, কেহ কোন পক্ষের সংস্থাপনের খণ্ডন করেন নাই, সেখানে সেই সংস্থাপনও বাদ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কেবল সংস্থাপন বাদ হইবে না, উভয় পক্ষে সংস্থাপনের ন্যায় উভয় পক্ষে তাহার খণ্ডনও হওয়া চাই, ইহা সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি বিশেষ করিয়া এই সূত্রে প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন।

পরন্তু প্রমাণগুলি অবয়বসম্বন্ধ ব্যতীতও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়-বাক্যের প্রয়োগ না করিলেও পদার্থ সাধন করে, ইহা দেখা যায় অর্থাৎ ইহা অনুভব সিদ্ধ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সেই কল্পের দ্বারাও অর্থাৎ পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া বাদ হয়, ইহা প্রথম কল্প, পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও বাদ হয়, ইহা দ্বিতীয় কল্প; এই দ্বিতীয় কল্পেও বাদবিচারে সাধন এবং উপালম্ভ হয়, ইহা জানাইয়াছেন, অর্থাৎ মহর্ষি এই বাদলক্ষণ-সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা বলিলেও পৃথক্ করিয়া প্রথমেই যে "প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ" এই কথাটি বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চাবয়বযুক্ত না হইলেও প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ হইলে অর্থাৎ বাদবিচারের অন্যান্য লক্ষণ থাকিয়া পঞ্চাবয়ব সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা বাদ হইবে, মহর্ষি ঐ কথার দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন।

পরন্তু ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ যাহাতে হয়, তাহা জল্প, এই কথা (জল্পসূত্রে) আছে বলিয়া জল্প নিগ্রহশূন্য অর্থাৎ বাদবিচারে যে সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, জল্পে সেগুলি নাই, ইহা না বুঝে। বিশদার্থ এই যে, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ যাহাতে হয়, তাহাই জল্প, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ যাহাতে হয়, তাহা বাদই, ইহা না বুঝে অর্থাৎ বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থান জল্পে নাই, জল্পস্থলীয় নিগ্রহস্থান বাদে নাই, ইহা কেহ না

বুঝে, এই জন্য পৃথক্ করিয়া (এই সূত্রে) প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে (অর্থাৎ সূত্রে অতিরিক্ত বচনের দ্বারা ইহাও বলা হইয়াছে যে, বাদস্থলীয় নিগ্রহ-স্থানও জল্পে আছে, জল্পস্থলীয় নিগ্রহস্থানবিশেষও বাদে আছে)।

টিপ্পনী। ন্যায়সূত্রকার মহামুনি গোতম প্রথম আহ্নিকের দ্বারা প্রমাণ হইতে নির্ণয় পর্য্যন্ত (ন্যায় ও ন্যায়াঙ্গ) পদার্থের লক্ষণ বলিয়া অবশিষ্ট বাদ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত পদার্থগুলির লক্ষণ বলিতে দ্বিতীয় আহ্নিক বলিয়াছেন। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষাও করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথম পদার্থ বাদ। মহর্ষি দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথমেই সেই বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু একটি সূত্র একটি প্রকরণ হয় না, প্রকরণ ভিন্নও গ্রন্থ হয় না, এই কথা মনে করিয়া ভাষ্যকার বাদ-লক্ষণ-সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, "কথা তিনটি—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা"। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা—এই তিনটির নাম 'কথা'। ঐ তিন প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার কথা নাই—সামান্যতঃ 'কথা' বলিলে ঐ তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। ঐ ত্রিবিধ কথার পৃথক্ পৃথক্ তিনটি বিশেষ লক্ষণ-সূত্রই মহর্ষির একটি প্রকরণ। উহার নাম "কথালক্ষণ-প্রকরণ"। কথাত্বরূপে ঐ তিনটিই এক, সুতরাং ঐ তিনটিকে লইয়া একটি প্রকরণ অসঙ্গতও নহে। উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কথামাত্রই ত্রিবিধ, এইরূপ নিয়ম বলেন নাই। তিনি বিচার-বস্তুর নিয়ম বলিয়াছেন। যে বস্তু বিচার করিতে হইবে, তাহা বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, এই তিন প্রকারেই বিচার করিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন আর কোন প্রকারে বস্তু বিচার হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, যখন "বৃহৎ-কথা" প্রভৃতি ভাষ্যকারোক্ত ত্রিবিধ কথার অন্তর্ভূত নহে, তখন কথা মাত্রই ত্রিবিধ, ইহা ভাষ্যকার বলেন নাই। বিচার্য্য বিষয়ে একাধিক বক্তার যে বাক্য-সন্দর্ভ, তাহাই ভাষ্যকারের ঐ কথা শব্দের অর্থ এবং তাহাকেই তিনি ত্রিবিধ বলিয়াছেন[১]। তার্কিকরক্ষাকার প্রভৃতিও এই "কথা"র ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কথা শব্দ মহর্ষির সূত্রে নাই, উহা ভাষ্যকারের কথা, এই কথা কোন গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন; কিন্তু এ কথা সত্য নহে। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্র হইতেই যথোক্ত অর্থে[২] "কথা" শব্দ পাইয়া, তাহাই এখানে ব্যবহার করিয়াছেন এবং মহর্ষিপ্রোক্ত সেই কথা কি, তাহা এখানে বলিয়াছেন। ত্রিবিধ কথাতেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। বাদী যাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থটি বাদীর পক্ষ এবং প্রতিবাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। প্রতিবাদী যাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থটি প্রতিবাদীর পক্ষ এবং বাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। বিরোধী ব্যক্তিদ্বয়কেও অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীকেও পরস্পর পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হয়, কিন্তু ঐ বিরোধিত্ব বা বিরুদ্ধত্ব ধর্ম্মবশতঃ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ই এখানে পক্ষ ও

১। বিচারবিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ।
কথা তস্যাঃ ষড়ঙ্গানি প্রাহুশ্চত্বারি কেচন ॥—তার্কিকরক্ষা।

২। কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ কথাবিচ্ছেদো বিক্ষেপঃ।—ন্যায়সূত্র, ৫অঃ, ২আঃ, ১৯ সূত্র।
সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথাপ্রসঙ্গোঽপসিদ্ধান্তঃ।— ঐ, ২৩ সূত্র।

প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কেই সূত্রকারোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের মুখ্যার্থ বলিয়াছেন (নির্ণয়সূত্রভাষ্য টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। বাদী বলিলেন—আত্মা আছে অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে ; এই কথার দ্বারা বুঝা গেল, আত্মার নিত্যত্ব-ধর্ম্মই বাদীর পক্ষ। প্রতিবাদী নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ বলিলেন—আত্মা নাই অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা নাই ; এই কথা দ্বারা বুঝা গেল, আত্মার অনিত্যত্ব-ধর্ম্মই প্রতিবাদীর পক্ষ। তাহা হইলে আত্মার অনিত্যত্ব-ধর্ম্ম বাদীর প্রতিপক্ষ এবং আত্মার নিত্যত্ব-ধর্ম্ম প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, ইহাও বুঝা গেল। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্ম্ম আত্মার পক্ষে বিরুদ্ধ ; এক আত্মাতে দুইটি ধর্ম্ম কখনও থাকিতে পারে না। আত্মাতে নিত্যত্বই থাকিবে, অথবা অনিত্যত্বই থাকিবে। আত্মাতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষ লইয়া উভয় বাদীর বিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি একজন বলেন, আত্মা নিত্য আর অপর বাদী বলেন, বুদ্ধি অনিত্য, তাহা হইলে সেখানে উহা লইয়া কোন বিচার উপস্থিত হয় না। কারণ, আত্মা নিত্য হইলেও বুদ্ধি অনিত্য হইতে পারে। আত্মার নিত্যত্ব এবং বুদ্ধির অনিত্যত্বে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ভাব নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মও বিরুদ্ধ হয় না, বিরুদ্ধ না হইলেও তাহা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। এককালে একই ধর্ম্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মকে বিভিন্ন-বাদী উল্লেখ করিলে তাহাই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইয়া বিচার্য্য বিষয় হইয়া থাকে।

সূত্রকার মহর্ষি এই "পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ" বলিয়া বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রকারের পরিগ্রহ শব্দের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "অভ্যুপগমব্যবস্থা"। অভ্যুপগম বলিতে স্বীকার, ব্যবস্থা বলিতে নিয়ম ; তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা গেল—স্বীকারের নিয়ম। এই পদার্থ এইরূপই, ইহার অন্যরূপ নহে, এইরূপভাবে স্বীকার বা নিশ্চয়ের নিয়মই স্বীকারের নিয়ম বা নিয়মবদ্ধ স্বীকার। উহাই ভাষ্যকারের মতে সূত্রোক্ত পরিগ্রহ শব্দের অর্থ। পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের ঐ পরিগ্রহ অর্থাৎ স্বীকারের নিয়ম বা নিয়মবদ্ধ স্বীকার যাহাতে থাকে, তাহা বাদ, ইহাই ঐ কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সূত্রে "পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ" এই বাক্য বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে।

কিন্তু কেবল ঐ মাত্রই বাদের লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ জল্প ও বিতণ্ডাতেও থাকে। বিতণ্ডায় বিতণ্ডাকারী স্বপক্ষের সংস্থাপন না করিলেও তাহার স্বপক্ষের একটা স্বীকার আছেই, এ জন্য মহর্ষি ঐ বাদ-লক্ষণে বিশেষণ বলিয়াছেন,—"প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ"। প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ যাহাতে হয়, তাহাই প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ। সাধন বলিতে স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং উপালম্ভ বলিতে ঐ সংস্থাপন বা সাধনের খণ্ডন। বাদী সাধন করিলে, প্রতিবাদী ঐ সাধনেরই খণ্ডন করেন। বাদীর পক্ষ সেই পদার্থটির বস্তুতঃ খণ্ডন হয় না, এ জন্য উপালম্ভ বলিতে সর্ব্বত্রই সাধনেরই খণ্ডন বুঝিতে হয়।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, উপালম্ভ বস্তুতঃ সাধনেরও হয় না। স্বপক্ষ সংস্থাপনই সাধন, উহা বাক্য, তাহার খণ্ডন হইবে কিরূপে ? সে বাক্য তাহার প্রতিপাদ্য প্রকাশই

করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার সামর্থ্য নষ্ট করা যায় না। ঐ উপালম্ভ বস্তুতঃ সেই বাক্যবাদী পুরুষের। বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহই তাহার উপালম্ভ, তাহা তাহাদিগের সাধন-বাক্যকে অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়, এ জন্য সাধনের উপালম্ভ বলা হইয়াছে। সাধনের উপালম্ভই বা সূত্রে বলা হইয়াছে কৈ? পক্ষের সাধন এবং প্রতিপক্ষের উপালম্ভই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়, এ জন্য ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, "প্রতিপক্ষ" পদার্থটি যখন উপালম্ভের অযোগ্য, তখন সূত্রের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না, তাহা বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। সূত্রে যে "প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভ" এই বাক্যটি আছে, উহার দ্বারা "প্রমাণ-তর্কসাধন" এবং "প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ স্থলে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে। সমাসে একটি "সাধন" শব্দের লোপ হইয়াছে। কোন ভাষ্যপুস্তকে অতিরিক্ত ভাষ্য পাঠের দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যারও আভাস পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, এখন প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি এই বিশেষণের দ্বারা জল্প ও বিতণ্ডা হইতে বাদের বিশেষ কি বলিলেন? এতদুত্তরে ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, বাদে প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ভ হয়; এই নিয়মই মহর্ষির বিবক্ষিত। জল্প ও বিতণ্ডাতে ছল ও জাতির দ্বারাও উপালম্ভ হয়, বাদে তাহা হয় না; সুতরাং মহর্ষির ঐ বিশেষণের দ্বারা জল্প ও বিতণ্ডা বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় নাই। যদিও কোন জল্প-বিচারে কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ভ হইতে পারে, ছল ও জাতির কোন উল্লেখ না করিয়াও জল্প-বিচার হয়, তথাপি জল্প ও বিতণ্ডা ছল ও জাতির দ্বারা উপালম্ভের যোগ্য, তাহাতে উহা করিলে করা যায়; এ জন্য তাদৃশ জল্পবিশেষ বাদলক্ষণাক্রান্ত হইবে না। অর্থাৎ যাহা প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালম্ভের যোগ্য, তাহাই বাদ; এই পর্য্যন্তই মহর্ষির ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। যদিও তর্ক নিজে কোন প্রমাণ নহে, তাহা হইলেও প্রমাণের বিষয়-বিবেচক হইয়া প্রমাণের অনুগ্রাহক অর্থাৎ প্রমাণের বিশেষ সহকারী হয়। বিচারস্থলে তর্ক দ্বারা বিবেচিত বিষয়ই প্রমাণ নির্দ্ধারণ করে, এ জন্য এই সূত্রে প্রমাণের সহিত তর্কেরও উল্লেখ হইয়াছে। এখন কথা এই যে, সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই দুইটি কথার আর প্রয়োজন কি? বাদের লক্ষণে ঐ দুইটি কথার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরসূত্রে জল্পবিচারে নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভের কথা থাকায়, এই সূত্রোক্ত বাদবিচারে কোন নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন নাই অর্থাৎ বাদবিচারে উহা নিষিদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারে, এই জন্য মহর্ষি এই সূত্রে ঐ দুইটি কথার দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন করিবে। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যখন বাদ-বিচারেও উপালম্ভের কথা আছে, এই সূত্রে তাহা বলা হইয়াছে, তখন বাদবিচারেও নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা বুঝা যায়। তবে উহার দ্বারা বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থানই উদ্‌ভাব্য, ইহাও বুঝিতে পারে, এ জন্য মহর্ষি এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই দুইটি কথা বলিয়া বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাব্য নহে, নিগ্রহস্থানবিশেষই উদ্‌ভাব্য, এইরূপ নিয়ম

সূচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই বাদবিচারে ন্যূন, অধিক এবং হেত্বাভাস নামক নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, "অবয়বযুক্ত" এই কথা বলিলে "অবয়বাভাস" থাকিবে না, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে হেত্বাভাস থাকিবে না, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, অবয়বাভাস প্রয়োগ করিলে সেখানে হেত্বাভাসেরই প্রয়োগ হয়। সুতরাং যাহা মহর্ষির অন্য কথার দ্বারাই পাওয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা আবার তাহারই সূচনা করা নিরর্থক, তাহা মহর্ষি করেন নাই। তবে সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথা বলার প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচারে অবশ্য উদ্‌ভাব্য, ইহা সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি সূত্রে ঐ কথাটি বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণও উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যাকেই সংগত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ইহাই মনে হয় যে, সূত্রোক্ত পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারা হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্‌ভাব্য, ইহা সহজে বুঝা যায় না। পরন্তু পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথাটি মহর্ষি বাদবিচারমাত্রেই বলেন নাই। পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও বাদবিচার হইতে পারে, ইহা ভাষ্যকারের কথায় পরে ব্যক্ত হইবে। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথাটি মহর্ষি বাদবিচারমাত্রেই বলিয়াছেন। হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান বাদমাত্রেই উদ্‌ভাব্য, ইহাই যখন মহর্ষি সূচনা করিবেন, তখন বুঝা যায়, (বাদবিচারমাত্রেই মহর্ষি যে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটি বলিয়াছেন, সেই) সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটির দ্বারাই তাহা সূচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এই জন্য ভাষ্যকার এখানে তাহা বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি গোতমের বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যাহা স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, মহর্ষি তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, বাদবিচারে সিদ্ধান্তবিরোধী কিছু বলা যাইবে না, তাহা বলিলে প্রতিবাদী তাহার অবশ্য উদ্‌ভাবন করিবেন। উদ্যোতকর মহর্ষি-কথিত বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে হেত্বাভাসমাত্রই সিদ্ধান্তবিরোধী। হেত্বাভাসমাত্রেই বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ আছে, অর্থাৎ হেত্বাভাসমাত্রই "বিরুদ্ধ"। তাহ হইলে ভাষ্যকার মহর্ষির বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াও সমস্ত হেত্বাভাসকে গ্রহণ করিতে পারেন। এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা সিদ্ধান্তবিরোধী অর্থাৎ হেত্বাভাসমাত্রই বাদবিচারে উদ্‌ভাবন করিতে হইবে, ইহা সূচিত হইয়াছে, এ কথাও বলিতে পাবেন। ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন (২।২।৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ যে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন না করিলে বাদবিচারে তত্ত্বনির্ণয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাদবিচারে উদ্ভাবন করিতে হইবে; সুতরাং হেত্বাভাসের ন্যায় অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থানও বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য। ভাষ্যকার অপ-

সিদ্ধান্তের নাম করিয়া সে কথা না বলিলেও এই সূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ কথার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে যেটি গূঢ় প্রয়োজন, শেষে তাহারই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাদবিচারে কোন্ কোন্ নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য, তাহাদিগের সকলের নামোল্লেখ করা এখানে কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। মহর্ষি-সূত্র ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার একটি প্রয়োজন ব্যাখ্যা করাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাহাই করিয়াছেন ; তাহাতে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান ভাষ্যকারের মতে বাদবিচারে উদ্ভাব্য নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না।

প্রথম সূত্রভাষ্যেও ভাষ্যকার হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন বর্ণনায় বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা ন্যূন, অধিক ও অপসিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, বুঝিতে হইবে ; কেবল হেত্বাভাসেরই উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা বুঝিতে হইবে না। এইরূপে তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটি না বলিলেও ন্যূন নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতু ও উদাহরণ-বাক্য একের অধিক বলিলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্যকার এই দুইটি নিগ্রহস্থানের মহর্ষিপ্রোক্ত লক্ষণ-সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই দুইটিরও বাদবিচারে উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা সূচনা করিতে মহর্ষি পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা বলিয়াছেন। অবশ্য পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদবিচারেই এ কথা বলা হইয়াছে ; সেখানেই উহা সম্ভব। পরবর্ত্তী বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি বাদবিচারে ন্যূন ও অধিক নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উহা যখন প্রমাণের দোষ নহে, উহা বক্তার দোষ, তখন বক্তার অন্যান্য দোষের ন্যায় উহাও বাদবিচারে ধর্ত্তব্য নহে। একটা হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বেশী বলা হইলে অথবা একটা অবয়ব না বলিলে, তাহাতে তত্ত্বনির্ণয়ের আসে যায় কি ?

প্রাচীন মত সমর্থনে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অবয়বগুলি প্রমাণ না হইলেও প্রমাণ-মূলক বলিয়া প্রমাণ সদৃশ। সুতরাং অবয়বের ন্যূনতা বা আধিক্য কোন প্রমাণভ্রমবশতঃও হইতে পারে, এ জন্য বাদবিচারেও তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন বাদবিচারে এক পক্ষ প্রকৃত হেতু-বুদ্ধিতেই হেত্বাভাস প্রয়োগ করেন এবং সেই জন্যই বাদবিচারে তাহার উদ্ভাব্যতা আছে। প্রমাণের দোষ না দেখাইলে তত্ত্বনিশ্চয়েরই ব্যাঘাত হয়। তদ্রূপ ন্যূন, অধিক ও অপসিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলেও হেত্বাভাসের ন্যায় সাধ্যসাধনের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায়, উহারা প্রমাণ সদৃশ ; সুতরাং উহাদিগেরও উদ্ভাবন বাদবিচারে কর্ত্তব্য। বাদবিচারে নিজের বক্তব্যটি প্রতিপাদন করিতে না পারাই নিগ্রহ ; সেখানে পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই। জিগীষা না থাকায় বাদবিচারে পরাজয়রূপ নিগ্রহ হয় না।

পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেই প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধনাদি করা হয়। ফলকথা, পঞ্চা-বয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ, এই কথা পাওয়া যায়। আবার

প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ, এই কথা কেন ? অথবা প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ কেন ? কেবল সাধন ও উপালম্ভের কথা বলিলেই হইত ? পৃথক্ করিয়া আবার প্রমাণ ও তর্ক শব্দের প্রয়োজন কি ? অবশ্য কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই যেখানে সাধনাদি হইবে, যাহাতে ছল ও জাতির কোন সংস্রব নাই অথবা তাহার যোগ্যতাই নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা প্রমাণ ও তর্ক শব্দের গ্রহণ করিলেই হইতে পারে এবং তাহাই মহর্ষির ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ। নচেৎ পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ বুঝিতে হইলে, জল্পবিচার হইতে বাদবিচারের বিশেষ বুঝা হয় না ; সুতরাং পৃথক্‌ভাবে প্রমাণ তর্ক গ্রহণের প্রয়োজন পূর্ব্বেই ব্যক্ত আছে, তথাপি ভাষ্যকার যথাক্রমে উহার আরও তিনটি প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। এই তিনটি প্রয়োজন প্রসঙ্গপ্রাপ্ত, অর্থাৎ উহার মুখ্য প্রয়োজন একটি থাকিলেও উহার দ্বারা আরও তিনটি অতিরিক্ত প্রয়োজন সংগ্রহ করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম প্রয়োজন—সাধন ও উপালম্ভের ব্যতিষঙ্গজ্ঞাপন। ব্যতিষঙ্গ বলিতে উভয়ত্র পরস্পর মিলন। যেমন পক্ষের সাধন থাকা চাই, তদ্রূপ প্রতিবাদী কর্ত্তৃক ঐ সাধনের উপালম্ভও থাকা চাই। এবং যেমন প্রতিপক্ষের সাধন থাকা চাই, তদ্রূপ বাদী কর্ত্তৃক ঐ প্রতিপক্ষ-সাধনের উপালম্ভও চাই। বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের সাধন করিলেন, কেহ কোন সাধনের উপালম্ভ করিলেন না, সেখানে বাদ হইবে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যতিষঙ্গযুক্ত সাধন ও উপালম্ভই এখানে সূত্রকারের বিবক্ষিত। মহর্ষি পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ করিয়া ইহা সূচনা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হয়। কারণ, তত্ত্বনির্ণয়ই বাদবিচারের উদ্দেশ্য। পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিলেও প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং সূত্রোক্ত পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথাটি বাদমাত্রেই গ্রহণীয় নহে। পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া বাদ হইবে, ইহা এক কল্প এবং পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও অন্যান্য লক্ষণাক্রান্ত হইলে বাদ হইবে, ইহা দ্বিতীয় কল্প। সূত্রকারের পৃথক্ করিয়া "প্রমাণ-তর্ক-গ্রহণ" এই দ্বিতীয় কল্পটি সূচনা করিয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি, সূত্রে ঐ অতিরিক্ত কথার দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিচার হইতে পারে।

ভাষ্যকার তৃতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, জল্পলক্ষণে (পরসূত্রে) ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থানের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহা জল্প, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে কেহ বুঝিতে পারেন যে, জল্পে বাদবিচারে উদ্‌ভাব্য নিগ্রহস্থান নাই। কারণ, এই সূত্রে যদি প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ, এই কথাটা না বলা হয়, তাহা হইলে জল্পসূত্রে এ কথাটা পাওয়া যায় না। পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা হইতেই প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ বুঝিতে হয়। এবং ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ, এই কথার দ্বারাই জল্পে নিগ্রহস্থানের কথা বুঝা যায়। তাহা হইলে জল্পসূত্রের ঐ কথাটির দ্বারা কেহ বুঝিতে পারেন যে, বাদবিচারে যে সকল নিগ্রহ-স্থান উদ্‌ভাব্য, জল্পবিচারে সেগুলি নাই। তাহা বুঝিলে কিরূপ অর্থ বুঝা হয় ? ইহা বলিবার জন্যই ভাষ্যকার শেষে তাঁহার পূর্ব্বকথারই ফলিতার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, ছল, জাতি ও

নিগ্রহস্থানেরর দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহাই জল্প এবং প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহা বাদই, ইহা কেহ না বুঝেন, এই জন্ম সূত্রে পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যের বিনিগ্রহ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বাদগত নিগ্রহস্থানরহিত। শেষে বলিয়াছেন যে, বাদগত নিগ্রহ জল্পে নাই, জল্পগত নিগ্রহ বাদে নাই, ইহা বুঝিও না; বাদগত নিগ্রহও জল্পে আছে, ইহা মহর্ষি পৃথক্ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ করিয়া সূচনা করিয়াছেন। উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত কথার দ্বারা অতিরিক্ত ফলের সূচনা হইয়া থাকে, ইহা প্রাচীনগণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির অতিরিক্ত কথার দ্বারা সেই অতিরিক্ত ফলেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রে যে প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ, এই কথাটি আছে, উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ যাহাতে করেন, ইহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, তাহা অসম্ভব। বিচারে এক পক্ষ প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসকেই প্রমাণ ও তর্ক বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত পক্ষের অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বটিরই সাধন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ককে গ্রহণ করিয়া থাকেন। একাধারে দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ যখন কোন মতেই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, তখন এক পক্ষের ন্যায়াভাস হইবেই। যিনি প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসকেই অবলম্বন করিয়া বিচার করেন, তিনিও তাহাকে প্রমাণ ও তর্ক বলিয়াই গ্রহণ করেন এবং তদ্দ্বারা বস্তুতঃ সাধন ও উপালম্ভ না হইলেও তিনি তদ্দ্বারাই সাধন ও উপালম্ভ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই তাৎপর্য্যেই সূত্রে প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ, এই কথা বলা হইয়াছে।

ঐ ভাবে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন এবং উপালম্ভ ব্যতিষক্ত এবং অনুবদ্ধ হওয়া চাই। বাদবিচারে যখন তত্ত্বনির্ণয়ই উদ্দেশ্য, তখন তত্ত্বনির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাদবিচার চলিবেই। যে পর্য্যন্ত এক পক্ষের নিবৃত্তি এবং এক পক্ষের স্থিতি না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাদবিচারে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধন ও উপালম্ভ করিতেই হইবে, ইহাই সাধন ও উপালম্ভের পরস্পর অনুবন্ধ। ভাষ্যকার নির্ণয়-সূত্র-ভাষ্যেও ইহা বলিয়া আসিয়াছেন (নির্ণয়সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর এখানে বসুবন্ধু বা সুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বাদ-লক্ষণ তুলিয়া তাঁহাদিগের সহিত তুমুল বিবাদের পরিচয় দিয়া, বহু প্রতিবাদের পরে নিবৃত্ত হইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা আলোচিত হইল না।

উদ্যোতকর আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে কোন প্রশ্নকারীর আবশ্যকতা নাই। প্রশ্নকারীকে বুঝাইবার জন্যই যে বাদবিচার হয়, এমন নিয়ম নাই। প্রশ্নকারী অন্য ব্যক্তি না থাকিলেও গুরু প্রভৃতির সহিত বাদবিচার হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, দৈবাৎ যদি বাদবিচার স্থলে প্রশ্নকারী উপযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থরূপে তত্ত্ব নির্ণয়ের সাহায্যের জন্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বর্জ্জন করিবেন না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত 'কথা'র সামান্য লক্ষণ এবং কথার অধিকারীর লক্ষণ এবং বাদের অধিকারীর লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন।

তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভ, ইহার কোন একটির যোগ্য ন্যায়ানুগত বাক্য-সন্দর্ভই কথা। লৌকিক বিবাদ কথা নহে, তাই বলিয়াছেন—ন্যায়ানুগত বাক্য-সন্দর্ভ। বস্তুতঃ ন্যায়ানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিলেই প্রকৃত বিচার হয়। অন্যথা এখনকার অধিক সংখ্যক বিচার নামে প্রচলিত বাক্য-সন্দর্ভের ন্যায় একটা লৌকিক বিবাদ অথবা হট্টগোল হইয়া পড়ে। যেখানে বিচারে তত্ত্ব নির্ণয় অথবা জয়লাভের কোনটিই হইল না, কিন্তু বিচার চলিলে উহার একটি হইতে পারিত, এইরূপ বিচারও কথা হইবে। তাই বলিয়াছেন, তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভের কোন একটির যোগ্য; উহার কোন একটি হওয়াই চাই, নচেৎ তাহা কথা হইবে না, ইহা বলেন নাই। কিন্তু যেখানে তত্ত্ব নির্ণয় অথবা জয়লাভের যোগ্যতাই নাই, সেখানে ন্যায়ানুগত বাক্য-সন্দর্ভ হইলেও তাহা কথা হইবে না। বৃত্তিকারের এই কথা যুক্তিযুক্ত।

যাঁহারা তত্ত্ব নির্ণয় অথবা জয়লাভের অভিলাষী এবং সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং শ্রবণাদি কার্য্যে পটু এবং কথার উপযুক্ত বাদ-প্রতিবাদাদি কার্য্যে সমর্থ, অথচ কলহকারী নহেন, তাঁহারাই কথার অধিকারী।

কথার অধিকারীর মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বমাত্র-জিজ্ঞাসু এবং প্রকৃত বাদী ও প্রতিভাশালী এবং যাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ পদার্থ বুঝেন এবং মানেন এবং প্রতারক নহেন, তিরস্কার করেন না, তাঁহারাই বাদকথার অধিকারী। এই অধিকারীর লক্ষণগুলি বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়। যাঁহারা কথা ও বাদের এইরূপ অধিকারী নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা, তাঁহাদিগের প্রকৃতি, তাঁহাদিগের প্রাজ্ঞতা, এগুলিও চিন্তাশীলগণ অবশ্যই চিন্তা করিবেন।

বাদবিচারে সভার আবশ্যকতা নাই; জয়-পরাজয়ের ব্যাপার না থাকায় মধ্যস্থেরও আবশ্যকতা নাই। এ বিচার অতি পবিত্র। এই বিচারের কর্ত্তা, এই বিচারের শ্রোতা—সকলেই পবিত্র, সকলেই ধন্য। কালমাহাত্ম্যে এই বাদবিচারের অধিকারী এখন নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা, এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে এই বাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা ভগবানের বিভূতি। তাই ভগবান্ এই বাদকেই লক্ষ্য করিয়া গীতায় বলিয়াছেন,—"বাদঃ প্রবদতামহম্" ।১০।৩২। অর্থাৎ বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি বাদ। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর[১] এবং টীকাকার স্বামী শ্রীধরও ভগবদ্‌বাক্যের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোতমোক্ত পারিভাষিক বাদ শব্দই ঐ স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

১। বাদোঽর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রধানং, অতঃ সোঽহমস্মি। প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদানামেব বাদ-জল্পবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদতামিতি :—শাঙ্করভাষ্য। প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদ-জল্প-বিতণ্ডাখ্যিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তাসাং মধ্যে বাদোঽহং। বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বাৎ মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ :—শ্রীধরস্বামিটীকা।

সূত্র। যথোক্তোপপন্নশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ ॥২॥৪৩॥

অনুবাদ। যথোক্তোপপন্ন অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের শব্দলভ্য যে অর্থ, সেই অর্থযুক্ত, (পরন্তু) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ করা হয়, (করিতে পারা যায়), তাহা জল্প।

ভাষ্য। যথোক্তোপপন্ন ইতি "প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ," "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ," "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ," "পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহঃ"। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ ইতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনমুপালম্ভশ্চাস্মিন্ ক্রিয়ত ইতি, এবং বিশেষণো জল্পঃ।

ন খলু বৈ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনং কস্যচিদর্থস্য সম্ভবতি প্রতিষেধার্থতৈবেষাং সামান্যলক্ষণে বিশেষলক্ষণে চ শ্রূয়তে। 'বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলমিতি, 'সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি'রিতি, 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থান'মিতি, বিশেষলক্ষণেষ্বপি যথাস্বমিতি। ন চৈতদ্‌বিজানীয়াৎ প্রতিষেধার্থতয়ৈবার্থং সাধয়ন্তীতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালম্ভো জল্প ইত্যেবমপ্যুচ্যমানে বিজ্ঞায়ত এতদিতি।

প্রমাণৈঃ সাধনোপালম্ভয়োশ্ছলজাতীনামঙ্গভাবো রক্ষণার্থত্বাৎ ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ। যৎ তৎ প্রমাণৈরর্থস্য সাধনং তত্র ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবো রক্ষণার্থত্বাৎ, তানি হি প্রযুজ্যমানানি পরপক্ষবিঘাতেন স্বপক্ষং রক্ষন্তি। তথা চোক্তং "তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণব"দিতি। যশ্চাসৌ প্রমাণৈঃ প্রতিপক্ষস্যোপালম্ভস্তস্য চৈতানি প্রযুজ্যমানানি প্রতিষেধবিঘাতাৎ সহকারীণি ভবন্তি, তদেবমঙ্গীভূতানাং ছলাদীনামুপাদানং—জল্পে, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ, উপালম্ভে তু স্বাতন্ত্র্যমপ্যস্তীতি।

অনুবাদ। যথোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং

পঞ্চাবয়বযুক্ত, এমন (পূর্ব্বসূত্রোক্ত) পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ (অর্থাৎ পূর্ব্ব-সূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, এই সূত্রেও তাহার যোগ করিয়া এবং তাহার যথাযোগ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া জল্পের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, মহর্ষি এই সূত্রে যথোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন)। ছলজাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, এই জল্পে ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ করা হয়, করিতে পারা যায়। এইরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইলে জল্প হয়, অর্থাৎ বাদের ন্যায় কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা এবং কতিপয় নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ হইলে অর্থাৎ ছল প্রভৃতির অযোগ্য হইলে তাহা জল্প নহে। যাহাতে ছল, জাতি এবং সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ করা হয়, না করিলেও করিবার যোগ্যতা থাকে, তাহাই জল্প।

(পূর্ব্বপক্ষ) ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা কোন পদার্থের সাধন হইতেই পারে না। ইহাদিগের সমান্য লক্ষণ এবং বিশেষ লক্ষণে অর্থাৎ মহর্ষি এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের যে সামান্য লক্ষণ এবং বিশেষণ লক্ষণ-গুলি বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগের প্রতিষেধার্থতাই শ্রুত হইতেছে, অর্থাৎ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান পদার্থ সাধন করে না, উহারা সাধনের প্রতিষেধ অর্থাৎ খণ্ডনই করে, সেই খণ্ডনার্থই উহাদিগের উল্লেখ হয়, মহর্ষি-কথিত ছল প্রভৃতির লক্ষণেও সেই কথাই আছে ; সুতরাং এখানে ছল প্রভৃতির দ্বারা সাধনও হয়, ইহা কিরূপে বলা হইতেছে ? (মহর্ষি-কথিত ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থানের সামান্য লক্ষণ-সূত্র তিনটির উদ্ধার করিয়া এই পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন) "বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনার দ্বারা বাদীর বাক্য-ব্যাঘাতকে ছল বলে" (১ অঃ, ২ আঃ, ১০ সূত্র)—"সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের সাহায্যে দোষ কথনকে জাতি বলে" (১ অঃ, ২ আঃ, ১৮ সূত্র)—"বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে" (১ অঃ, ২ আঃ, ১৯ সূত্র) বিশেষ লক্ষণগুলিতেও (মহর্ষি-কথিত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষ লক্ষণগুলিতেও) ইহাদিগের যথাস্বরূপ অর্থাৎ সামান্য লক্ষণকে অতিক্রম না করিয়া প্রতিষেধার্থতাই অর্থাৎ উহারা খণ্ডনার্থ, সাধনার্থ নহে, ইহাই শ্রুত হইতেছে।

(যদি বল) প্রতিষেধার্থতাবশতঃই ইহারা পদার্থ সাধন করে, ইহা বুঝিবে ? অর্থাৎ এই ছল প্রভৃতি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করে বলিয়াই তদ্দ্বারা পদার্থ সাধন করে, ইহা বুঝিবার জন্যই উহাদিগের দ্বারা সাধনের কথাও বলা হইয়াছে ? ইহাও বলা যায় না। (কারণ) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাহাতে উপালম্ভ অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা যায়, তাহা জল্প, এইরূপ বলিলেও ইহা বুঝা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝান আবশ্যক হইলেও সূত্রে 'সাধন' শব্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল উপালম্ভ বলিলেও তাহার চরম ফল চিন্তা করিয়া উহা বুঝা যায়।

(উত্তর) প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মূলীভূত প্রমাণ-সমূহের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গভাব অর্থাৎ আবশ্যকতা আছে। কারণ, উহারা রক্ষার্থ, স্বতন্ত্র ইহাদিগের সাধনত্ব নাই। বিশদার্থ এই যে, প্রমাণের দ্বারা পদার্থের সেই যে (মহর্ষি-সূত্রোক্ত) সাধন, তাহাতে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গত্ব আছে; কারণ, তাহারা রক্ষার্থ, সেই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রযুজ্যমান হইয়া পরপক্ষ বিঘাতের দ্বারা অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়া স্বপক্ষ রক্ষা করে। মহর্ষি গোতম সেই প্রকারই বলিয়াছেন,—"তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য জল্প ও বিতণ্ডা আবশ্যক, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুর বা ক্ষুদ্র বৃক্ষ রক্ষার জন্য কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ আবশ্যক।"—(৪অঃ, ২ আঃ, ৫০ সূত্র)। আবার প্রমাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ প্রতিপক্ষ স্থাপনার এই যে উপালম্ভ, তাহার সম্বন্ধেও এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রযুজ্যমান হইয়া প্রতিষেধের বিঘাত করায় অর্থাৎ প্রতিবাদীর খণ্ডনের খণ্ডন করে বলিয়া (প্রমাণের) সহকারী হয়। অর্থাৎ এই প্রকারেও ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, সাধন ও উপালম্ভের অঙ্গ হয়। সুতরাং এই প্রকারে অঙ্গীভূত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের জল্পে গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ইহাদিগের সাধনত্ব নাই অর্থাৎ ইহারা স্বতন্ত্রভাবে সাধন করিতে পারে না। উপালম্ভে কিন্তু (ইহাদিগের) স্বাতন্ত্র্যও আছে।

টিপ্পনী। বাদ-লক্ষণের পরে ক্রমানুসারে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা জল্পের লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রে "প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ" ইত্যাদি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, তাহা এই সূত্রে যোগ করিয়া জল্পের লক্ষণ বুঝিতে হইবে—এই তাৎপর্য্যে এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন, "যথোক্তোপপন্নঃ"। ভাষ্যকারও ঐ "যথোক্তোপপন্নঃ" এই কথার উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার অর্থ ব্যাখ্যার

জন্য মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রোক্ত চারিটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পরে এই সূত্রোক্ত "ছল-জাতিনিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভঃ" এই অতিরিক্ত কথাটির উল্লেখ করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, জল্পে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ করা হয়; সুতরাং এইরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া জল্প হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত চারিটি বাক্যের যাহা শব্দলভ্য অর্থ, তদ্বিশিষ্ট হইয়া যাহা ছল, জাতি ও সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভের যোগ', এমন কথাই জল্প। বাদ এরূপ নহে, সুতরাং বাদ হইতে জল্প বিশিষ্ট।

উদ্যোতকর মহর্ষি-সূত্রের 'যথোক্তোপপন্নঃ' এই কথা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ধরিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে বাদলক্ষণে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এই সূত্রে জল্পলক্ষণে তাহা বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বসূত্রে দুইটি কথার দ্বারা বাদবিচারে নিগ্রহস্থানবিশেষের নিয়ম করা হইয়াছে, জল্পে তাহার নিয়ম নাই। জল্পে সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। এবং জল্পে ছল ও জাতির দ্বারাও সাধন ও উপালম্ভ করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বসূত্রোক্ত "প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ" এই কথার তাৎপর্য্যার্থ ইহার বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্ব্বসূত্রোক্ত কথাগুলি যে তাৎপর্য্যে বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই সূত্রে ঐ সকল কথার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। তবে মহর্ষি এই সূত্রে যথোক্তোপপন্নঃ, এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন? এতদুত্তরে উদ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ ইত্যাদি বাক্যের যাহা শব্দলভ্য অর্থ, তাহা জল্পে অসম্ভব নহে। পূর্ব্বসূত্রে ঐ সকল কথার দ্বারা যে সকল অর্থ সূচিত হইয়াছে, তাহা জল্পলক্ষণের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ঐ সকল অর্থলভ্য অর্থ এখানে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং শব্দলভ্য অর্থমাত্রই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য। উদ্যোতকর কণাদের দুইটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ঋষি-সূত্রে যে ঐরূপ তাৎপর্য্যে কথা বলা অন্যত্রও দেখা যায়, ইহা দেখাইয়া তাহার উত্তরপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, ইহাই মনে করিয়া উদ্যোতকর শেষে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা সূত্রে "যথোক্তোপপন্নঃ" এই বাক্যটি মধ্যপদলোপী সমাস। যেমন গোযুক্ত রথ, এই অর্থে "গোরথ" এই প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকরের অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বসূত্রে যথোক্ত পদার্থগুলির মধ্যে জল্পে যাহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত বা সম্ভব, জল্প তাহার দ্বারা উপপন্ন কি না যুক্ত, ইহাই যথোক্তোপপন্ন এই কথার দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন। মধ্যপদলোপী সমাসে একটি "উপপন্ন" শব্দের লোপ হইয়াছে। তবে ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রের বাদ-লক্ষণের ঐ সকল কথা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া এই সূত্রের যথোক্তোপপন্ন এই কথার ব্যাখ্যা করিলেন কেন? তিনি ত উহার মধ্যে যাহা উপপন্ন, তাহাই জল্পলক্ষণে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা বলেন নাই? এতদুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যথাক্রমে পূর্ব্বসূত্রের পাঠ জ্ঞাপনই ঐ স্থলে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। ঐ সূত্রপাঠের মধ্যে জল্পে যাহা উপপন্ন হয়, তাহাই জল্পে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, জল্পলক্ষণের অনুকূল যে পাঠক্রম, তাহাই ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, উহা হইতে পদার্থস্বরূপ অর্থাৎ শব্দলভ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা

পূর্ব্বসূত্রের ন্যায় অর্থলভ্য অর্থ এখানে বুঝিতে হইবে না, তাহা উহা দ্বারা এখানে বুঝা যায় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত মধ্যপদলোপী সমাস পক্ষ আশ্রয় করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐরূপ কোন কথা না বলায় উদ্যোতকরের প্রথম পক্ষই তাঁহার অভিপ্রেত মনে হয়। মধ্যপদলোপী সমাসই মহর্ষির অভিপ্রেত থাকিলে তিনি "উক্তোপপন্নঃ" এইরূপ কথাই বলেন নাই কেন ? যথা শব্দের প্রয়োগ কেন ? ইহাও চিন্তনীয়। মধ্যপদলোপী সমাসে সূত্রস্থ "উপপন্ন" শব্দটি কোন্ অর্থে প্রযুক্ত, ইহাও চিন্তনীয়। সুধীগণ সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রায় চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে একটি পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, সূত্রে যে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সংগত হয় না। কেন না, ছল প্রভৃতির দ্বারা কেবল উপালম্ভ বা প্রতিষেধই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইতে পারে। উহাদিগের সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণেও তাহাই বলা হইয়াছে। ফলকথা, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতেই উহাদিগের প্রয়োগ করা হয়, উহাদিগের দ্বারা পদার্থ সাধন বা পক্ষ স্থাপন হইবে কিরূপে ? তবে যদি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়াই পরম্পরায় উহারা স্বপক্ষের সাধক হয়, এই কথা বলিতে হয়, তাহা হইলেও সূত্রে সাধন শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালম্ভ, এইরূপ কথা বলিলেই তাহা বুঝা যায়।

এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ করিতে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান অঙ্গ হইয়া থাকে। উহারা সাধনেও অঙ্গ হয়। কারণ, স্বপক্ষ রক্ষার জন্য অনেক সময়ে উহাদিগের আশ্রয় করিতে হয়। মহর্ষি নিজেও তত্ত্বনিশ্চয় সংরক্ষণের জন্য ছলাদিযুক্ত জল্প ও বিতণ্ডার আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং ছল প্রভৃতি যখন পরপক্ষ স্থাপনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া স্বপক্ষ স্থাপনকে রক্ষা করে, তখন স্বপক্ষস্থাপনরূপ সাধনেও ইহারা অঙ্গ। ইহারা স্বতন্ত্র ভাবে পদার্থ সাধন করিতে না পারিলেও ঐ ভাবে পদার্থ সাধন করে এবং প্রমাণের দ্বারা যখন পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা হয়, তখন ইহারা প্রমাণের সহকারী হয়। ফলকথা, জল্পে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন ও উপালম্ভের অঙ্গীভূত ছল প্রভৃতির গ্রহণ করা হইয়াছে। উহারা স্বতন্ত্রভাবে পদার্থ সাধন করে না, তাহা বলাও হয় নাই। তবে উহারা স্বতন্ত্র ভাবে উপালম্ভ করিতে পারে। উদ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারের কথা গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে, ছল, জাতি প্রভৃতি যখন অসদুত্তর, তখন তাহা কোনরূপেই সাধন বা উপালম্ভের অঙ্গ হইতে পারে না। জিগীষাপরতন্ত্রতাবশতঃ পরপক্ষ স্থাপনকে ব্যাহত করিব, এই বুদ্ধিতেই ছল প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং ছল প্রভৃতির দ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া অনেক সময়ে জয়লাভ করে। বস্তুতঃ উহাদিগের দ্বারা কোন পক্ষের সাধন বা খণ্ডন হয় না, প্রমাণ ও তর্ক ব্যতীত তাহা আর কিছুর দ্বারা হইতেও পারে না। তবে ছল প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে তাহা বাদ হইবে না, ইহা জানাইতেই মহর্ষি এই সূত্রে ছল প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, মহর্ষিসূত্রে ছল, জাতি প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালম্ভের কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। এবং ছলাদিযুক্ত জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় রক্ষা হয়, ইহাও

মহর্ষি নিজে বলিয়াছেন। সুতরাং ছল প্রভৃতি কোনরূপে সাধন ও উপালম্ভের অঙ্গই হয় না, এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অবশ্য উহারা অসদুত্তরই বটে, অসদুত্তরগুলির বাস্তব পক্ষে কোন সাধন বা উপালম্ভের ক্ষমতা নাই, ইহাও সত্য, কিন্তু মহর্ষি যে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভের কথা বলিয়াছেন, তাহা কি উভয় পক্ষেই হইয়া থাকে? এক পক্ষ প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসকে প্রমাণ ও তর্করূপে গ্রহণ করিয়াই যখন সাধন ও উপালম্ভে প্রবৃত্ত হন এবং তাহার দ্বারা বস্তুতঃ সাধন ও উপালম্ভ না হইলেও যখন মহর্ষি তাহা বলিয়াছেন, তখন সেই ভাবে ছল প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালম্ভের কথাও বলিতে পারেন। জল্পবিচারে এক পক্ষ প্রমাণাভাস বলিয়া জানিয়াও তাহাকে প্রমাণ বলিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। কিন্তু বাদে কোন বাদীই তাহা করিতে পারেন না, অপ্রমাণকে নিজে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়া তাহার প্রয়োগ করিতে পারেন না; কারণ, প্রতারক ব্যক্তি বাদে অনধিকারী। তাহা হইলে এখন মূল কথা এই যে, যাহা বস্তুতঃ প্রমাণ ও তর্ক নহে, বস্তুতঃ যাহার সাধন ও খণ্ডনে ক্ষমতাই নাই, এক পক্ষ যখন তাহার দ্বারাও সাধন ও উপালম্ভ করেন, নচেৎ বিচারই হইতে পারে না; মহর্ষির প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ, এই কথাও নিতান্ত অসংগত হইয়া পড়ে, তখন ছল প্রভৃতিকে ভাষ্যকার যে ভাবে সাধন ও উপালম্ভের অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহা অসংগত হইবে কেন? যে কোনরূপেই যদি উহারা স্বপক্ষ সাধনের সহায়তা করিল, তাহা হইলে উহারা একেবারে সাধনের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইবে কেন? সাধন ও উপালম্ভ ইহাদিগের দ্বারা বস্তুতঃই হয় কি না, তাহা দেখিতে হইলে প্রমাণাভাসের দ্বারাও তাহা হয় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পরন্তু ভাষ্যকার ইহাদিগকে প্রকৃত প্রমাণের সহকারীও দেখাইয়াছেন। সেখানে সহকারিরূপে ইহারা বস্তুতঃই সাধন ও উপালম্ভের অঙ্গ হয়। প্রমাণাভাস কোন দিনই তাহা হইতে পারে না, তবে সাধন ও উপালম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনেক সময়ে অনেক স্থলে প্রতিপন্ন করিতে পারে। সেই ভাবের সাধন ও উপালম্ভও যদি বাধ্য হইয়া এখানে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ছলাদির দ্বারাও তাহা হয়। ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে ছলাদিও তাহার অঙ্গ হইতে পারে। সুধীগণ এ কথাগুলিও ভাবিয়া বিচার করিবেন।

পরবর্ত্তী কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক এই সূত্রে সাধন ও উপালম্ভ, এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া সাধনের উপালম্ভ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই ভাষ্যোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে গিয়াছেন।

এই জল্পবিচারে সভার অপেক্ষা আছে। কারণ, ইহা বিতণ্ডার ন্যায় জিগীষুর বিচার; ইহাতে পক্ষপাতিত্বাদি-দোষ-শূন্য উভয় পক্ষের স্বীকৃত সুপণ্ডিত মধ্যস্থ আবশ্যক। বিশ্বনাথ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে জনসমূহের মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কোনও উপযুক্ত ব্যক্তি বা ঐরূপ ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ থাকেন এবং আরও সভ্য পুরুষ থাকেন, সেই জনসমূহের নাম সভা। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে জল্প-বিচার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ (১) বাদী প্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার স্বপক্ষস্থাপন করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বপক্ষে পঞ্চাবয়ব ন্যায় প্রয়োগ করিয়া তাঁহার হেতুর নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শন করিবেন অর্থাৎ সামান্যতঃ তাঁহার হেতু হেত্বাভাস নহে এবং বিশেষতঃ তাঁহার হেতু বিরুদ্ধ নহে, ব্যভিচারী নহে, ইত্যাদি প্রকারে সম্ভাব্যমান দোষের নিরাকরণ করিবেন। তাহার পরে (২) প্রতিবাদী বাদীর কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বাদীর কথার অনুবাদ করিয়া হেত্বাভাস ভিন্ন নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন করিবেন; তাহার উদ্‌ভাবন সম্ভব না হইলে হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন-পূর্ব্বক বাদীর সাধনে দোষ প্রদর্শন করিয়া শেষে স্বপক্ষের স্থাপনা করিবেন। পরে (৩) বাদীও ঐ প্রকারে প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুবাদ করিবেন। কারণ, তিনি প্রতিবাদীর কথা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে হইবে; না বুঝিয়া দোষ প্রদর্শন করিলে পরে তাহা টিকে না, পরন্তু তাহাতে প্রকৃত কার্য্যে অনেক সময়নাশ হয় এবং না বুঝিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে যাইয়াই বিচারে প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতক এবং সভ্যগণের বিরক্তিকর বহু অনর্থ উপস্থিত করা হয়। সুতরাং বাদীও প্রতিবাদীর ন্যায় প্রতিবাদীর কথার অনুবাদ করিয়া, তিনি প্রতিবাদীর কথা বুঝিয়াছেন, ইহা অগ্রে প্রতিপন্ন করিবেন। পরে তাঁহার স্বপক্ষ-সাধনে প্রতিবাদি-প্রদর্শিত দোষগুলির উদ্ধার করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডন করিবেন, অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষস্থাপনায় প্রথমতঃ অন্যবিধ নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন করিবেন। এই প্রণালী অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বমতে দোষের উদ্ধার বা পরমতে দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন। বিচারকালে যিনি এই প্রণালীর কোনরূপ উল্লঙ্ঘন করেন অথবা অসময়ে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতে হয়, তদ্‌ভিন্ন সময়ে দোষ প্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত বা পরাজিত হন। তিনি যথার্থরূপে স্বপক্ষ সমর্থন করিলেও ঐ দোষে সেখানে নিগৃহীত বা পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। সভাপতি ও মধ্যস্থ সেই পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন। বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণ বিচারের যে নিয়ম বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনেক ভাবনা উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা বিচারের যে অধিকারী নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও ভাবনা বাড়িয়া যায়। তাঁহারা যে সত্যের অন্বেষণের জন্যই কেবল ভাবিতেন, কুতর্ক, কলহ-কোলাহলে মত্ত হইয়া নৈয়ায়িকের বর্ত্তমান অপবাদের বোঝা বহন করিতেন না, যাহাতে বিচারকালে কোনরূপে নীতি লঙ্ঘন না হয়, সত্যের পাছে পাছে যাওয়া হয়, চরিত্রের মালিন্য আরও বাড়িয়া না যায়, নিয়মের বন্ধনে চিত্ত, বাক্য, বুদ্ধি সংযত হয়, তাহা বুঝিতেন ও ভাবিতেন, ইহা তাঁহাদিগের কথাগুলি ভাবিলে ভুলিতে পারা যায় না। এখন তাঁহারাও নাই, তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে বিচারকদিগকে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত নেতাও নাই। নেতা থাকিলে বা উপযুক্ত ক্ষমতাশালী নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকিলে এখনকার প্রায় সকল বিচারকই পদে পদে নিগৃহীত হইতেন। এখন সকলেই বিচারক; কিন্তু বিচারের শাস্ত্রোক্ত নিয়মাদি অনেকেই জানেন না, জানিলেও মানেন না॥ ২॥

সূত্র। সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ॥ ৩ ॥৪৪॥

অনুবাদ। সেই জল্প, প্রতিপক্ষের স্থাপনাশূন্য হইয়া বিতণ্ডা হয়।

ভাষ্য। স জল্পো বিতণ্ডা ভবতি, কিংবিশেষণঃ? প্রতিপক্ষস্থাপনয়া হীনঃ। যৌ তৌ সমানাধিকরণৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্যুক্তৌ, তয়োরেকতরং বৈতণ্ডিকো ন স্থাপয়তীতি, পরপক্ষপ্রতিষেধেনৈব প্রবর্ত্তত ইতি। অস্তু তর্হি সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা?—যদ্বৈ খলু তৎপরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণং বাক্যং স বৈতণ্ডিকস্য পক্ষঃ, ন ত্বসৌ কঞ্চিদর্থং প্রতিজ্ঞায় স্থাপয়তীতি, তস্মাদ্‌যথান্যাসমেবাস্ত্বিতি।

অনুবাদ। সেই অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত জল্প—বিতণ্ডা হয়। (প্রশ্ন) কি বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া? অর্থাৎ জল্প হইতে বিতণ্ডার যখন ভেদ আছে, তখন জল্পকেই বিতণ্ডা বলা যায় না; তাহা বলিতে হইলে কোন বিশেষণ অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহার দ্বারা বিতণ্ডাতে জল্পের ভেদ বুঝা যায়; সুতরাং প্রশ্ন এই যে, কোন্ বিশেষণযুক্ত হইয়া জল্প বিতণ্ডা হইবে? (উত্তর) প্রতিপক্ষের স্থাপনাশূন্য হইয়া। সমানাধিকরণ অর্থাৎ একই আধারে বিভিন্নবাদীর স্বীকৃত সেই যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে, সেই দুইটির একটিকে অর্থাৎ যেটি প্রতিবাদী বৈতণ্ডিকের পক্ষ, কিন্তু বাদীর প্রতিপক্ষ, সেই ধর্ম্মটিকে বৈতণ্ডিক সংস্থাপন করেন না অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা সাধন করেন না। পরপক্ষপ্রতিষেধের দ্বারাই অর্থাৎ স্বপক্ষস্থাপনকারী বাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডনের দ্বারাই প্রবৃত্ত হন (অর্থাৎ আত্মপক্ষের স্থাপনা না করিয়া কেবল পরপক্ষ স্থাপনকেই খণ্ডন করিব, তাহার হেতুর দোষ প্রদর্শন করিব, এই বুদ্ধিতেই বৈতণ্ডিকের বিচারপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে)।

(পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে "সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা" এইরূপই সূত্র হউক? অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যখন কোন পক্ষ স্থাপন করেন না, তখন তাঁহার কোন পক্ষই নাই, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, যাহার স্থাপন হয় না, তাহা পক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং সূত্রে "প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন" না বলিয়া "প্রতিপক্ষহীন" এই কথা বলিলেই চলে এবং সূত্রকে স্বল্পাক্ষর করিবার জন্য ঐরূপ বলাই উচিত।

(উত্তর) সেই যে পরপক্ষপ্রতিষেধরূপ অর্থাৎ পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনরূপ বাক্য, তাহা বৈতণ্ডিকের পক্ষ, অর্থাৎ উহার দ্বারা তাঁহার পক্ষ সিদ্ধি হইবে মনে

করিয়াই বৈতণ্ডিক স্বপক্ষস্থাপন না করিয়া ঐ পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন, সুতরাং তাঁহার ঐ বাক্যই সেখানে তাঁহার পক্ষসিদ্ধির অভিমত উপায় বলিয়া পক্ষ। বৈতণ্ডিক কোন পদার্থকে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না, অতএব (সূত্র) যথাপাঠই থাকিবে, অর্থাৎ "সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা" এইরূপ যে সূত্র মহর্ষির উপন্যস্ত আছে, তাহাই থাকিবে। বৈতণ্ডিকের যখন পক্ষ থাকে, তখন "সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা" এইরূপ সূত্র মহর্ষি বলিতে পারেন না এবং সেই জন্যই তাহা বলেন নাই।

টিপ্পনী। বাদীর পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিবাদীর নিজের পক্ষই এখানে প্রতিপক্ষ। বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী যদি তাহার স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনেরই খণ্ডন করেন এবং তাহা যদি জল্পের অন্যান্য সকল লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিচার বিতণ্ডা হইবে। যদিও বাদীর পক্ষও প্রতিবাদীর পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিপক্ষ-শব্দবাচ্য, কিন্তু বাদী যদি প্রথম কোন পক্ষ স্থাপনই না করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী কিসের খণ্ডন করিবেন ? তাঁহার খণ্ডনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং এখানে প্রতিপক্ষ বলিতে প্রতিবাদীর পক্ষই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত জল্প প্রতিপক্ষ-স্থাপনাশূন্য হইলে বিতণ্ডা হয়, মহর্ষির এই কথার দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত জল্পে উভয় পক্ষের স্থাপনা থাকা চাই, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে ইহা না বলিলেও এই সূত্রের দ্বারা তাহা সূচনা করিয়াছেন। এই সূত্রে 'প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তিনি জল্প হইতে বিতণ্ডার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জল্পকেই প্রকাশ করিয়া বিতণ্ডায় জল্পের অন্যান্য লক্ষণ থাকা চাই, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রতিপক্ষ-স্থাপনা-হীনত্বরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট জল্পকেই বিতণ্ডা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে বিতণ্ডা যে বস্তুতঃ জল্পবিশেষ, ইহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, বিতণ্ডায় জল্পের সম্পূর্ণ লক্ষণ নাই। প্রতিপক্ষের স্থাপনা ভিন্ন বিতণ্ডায় জল্পের আর সমস্ত লক্ষণই থাকা চাই, ইহা বলিবার জন্যই মহর্ষি ঐরূপ সূত্র বলিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, সূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত জল্পের একদেশই গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ জল্পলক্ষণে যে 'উভয়পক্ষ-স্থাপনাযুক্ত' এই কথাটি বলিতে হইবে, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জল্পের অন্য অংশকে ধরা হইয়াছে। 'কারণ, উভয়পক্ষ-স্থাপনাযুক্তকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলা যায় না, উহা অযোগ্য বাক্য হয়।

তৎ-শব্দের দ্বারা ঐরূপ একদেশ গ্রহণ হইতে পারিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ এখানে ঐ কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা সুধীগণের চিন্তা করা উচিত। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে জল্পলক্ষণে 'উভয়পক্ষস্থাপনাযুক্ত' এইরূপ কথা বলেন নাই। এই সূত্রে বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলায় জল্প যে উভয় পক্ষের স্থাপনাযুক্ত, ইহা সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে জল্পকে যেরূপ বলিয়াছেন, এই সূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা যদি তাহাই মাত্র বুদ্ধিস্থ হয়, যদি এই সূত্রের দ্বারা সূচিত নিষ্কৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত জল্পই তাঁহার বুদ্ধিস্থ না হয়, তাহা হইলে মহর্ষি তাহাকে

প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলিতে পারেন। কারণ, পূর্ব্বসূত্রে জল্পকে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা উভয় পক্ষস্থাপনাযুক্তও হইতে পারে, প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনও হইতে পারে। মহর্ষি উক্তি-কৌশলে পরসূত্রের দ্বারাই জল্পের নিকৃষ্ট লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রে কোন বাক্যের দ্বারা জল্পকে উভয়পক্ষ-স্থাপনাযুক্ত বলিলে পরসূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা তাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলিতে পারেন না। যাহাকে উভয়পক্ষ-স্থাপনাযুক্ত বলিলেন, তাহাকেই আবার পরসূত্রেই প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলিবেন কিরূপে? সুতরাং মহর্ষি উক্তি-কৌশলে বাক্যসংক্ষেপ করিবার জন্য পরসূত্রেই জল্পের নিকৃষ্ট লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। ফলকথা, এই সূত্রে তৎ-শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্র-কথিত সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্টকেই যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলা যায়। নিকৃষ্ট জল্পলক্ষণাক্রান্ত পদার্থকে গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলা যায় না। মহর্ষি তৎ-শব্দের দ্বারা এখানে কাহাকে বুদ্ধিস্থ করিয়াছেন, সুধীগণ তাহা ভাবিয়া দেখুন। শূন্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতণ্ডিক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে প্রতিপক্ষহীন বিচারকেই বিতণ্ডা বলিতেন। তাঁহাদিগের কোন পক্ষ না থাকায় বৈতণ্ডিকের কোন পক্ষই নাই, এইরূপ কথা তাঁহারা বলিতেন। এ কথা প্রথম সূত্রভাষ্যে বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিকের কোন পক্ষই নাই, প্রতিপক্ষহীন বিচারই বিতণ্ডা, এই মত ভাষ্যকারের পূর্ব্ব হইতেই সম্প্রদায়বিশেষে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্যোতকরও ঐ মতকে উল্লেখ করিয়া ইহা কোন সম্প্রদায় বলেন—এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মতবাদী সম্প্রদায়বিশেষ মহর্ষি গোতমোক্ত বিতণ্ডা-সূত্রে স্থাপনা শব্দ নিরর্থক, এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেন। সেই জন্যই ভাষ্যকার এখানে সেই কথার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া সূত্রোক্ত স্থাপনা শব্দের সার্থকতা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, বৈতণ্ডিকের পক্ষ আছে, তাহাকেই বলে প্রতিপক্ষ; সুতরাং প্রতিপক্ষহীন বিচারকে বিতণ্ডা বলা যায় না। প্রতিপক্ষহীন কোন বিচারই হইতে পারে না। বৈতণ্ডিকের অন্তর্নিহিত পক্ষকে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না। পরপক্ষ-স্থাপনার খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই বৈতণ্ডিক কেবল পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন। ফলকথা, বিতণ্ডা প্রতিপক্ষের স্থাপনাহীন, কিন্তু প্রতিপক্ষহীন নহে; সুতরাং মহর্ষি যেরূপ সূত্র বলিয়াছেন, তাহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ থাকায় "সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা" এইরূপ সূত্র বলা যায় না, তাই মহর্ষি তাহা বলেন নাই।

ভাষ্যকার এখানে বৈতণ্ডিকের পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনরূপ বাক্যকে বৈতণ্ডিকের পক্ষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিকের সেই বাক্যই তাহার পক্ষ নহে। ভাষ্যকার সেই বাক্যে পক্ষ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বৈতণ্ডিক তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বপক্ষ সিদ্ধির জন্যই পরপক্ষসাধনের খণ্ডন করেন, নচেৎ তিনি কখনই তাহা করিতে যাইতেন না। বৈতণ্ডিক তাঁহার বাক্যকেই স্বপক্ষের সাধক বা জ্ঞাপক

মনে করেন এবং তাঁহার ঐ বাক্যের দ্বারাই বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, ইহা অনুমান করা যায়। এ জন্য বৈতণ্ডিকের সেই বাক্যকেই তাঁহার পক্ষ বলা হইয়াছে। অর্থবিশেষ জ্ঞাপনের জন্য এইরূপ গৌণ প্রয়োগ অনেক স্থানেই দেখা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে "যদ্বৈ খলু" এই স্থলে 'বৈ' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততা সূচিত হইয়াছে। খলু শব্দটি হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে হেতু বৈতণ্ডিকের পক্ষ আছে, অতএব পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। বিতণ্ডা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা প্রথম সূত্রভাষ্যে বিতণ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাৎ হেতুবদাভাসমানাঃ। ত ইমে।

সূত্র। সব্যভিচার-বিরুদ্ধপ্রকরণ-সমসাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ ॥৪॥৪৫॥

অনুবাদ। হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু অর্থাৎ প্রকৃত হেতু নহে, হেতুর সামান্য অর্থাৎ কোন সামান্য ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য থাকায় হেতুর ন্যায় প্রকাশমান অর্থাৎ যাহা এইরূপ পদার্থ, তাহা হেত্বাভাস।

সেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত এই হেত্বাভাস (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম, (৫) কালাতীত—অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচ প্রকার।

বিবৃতি। অনুমান করিতে হইলে হেতু আবশ্যক। যেখানে যে পদার্থকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেই পদার্থ যদি বস্তুতঃ হেতু হয়, প্রকৃত হেতু হয়, তবেই সেখানে অনুমান খাঁটি হইতে পারে। যে পদার্থে হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকে অর্থাৎ যে সকল ধর্ম্ম থাকিলে তাহাকে হেতু বলা যায়, তাহা থাকে, তাহাই প্রকৃত হেতু, তাহাই সাধ্যের সাধন। যাহা বস্তুতঃ সাধ্যের সাধন, তাহাই বস্তুতঃ হেতু। যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহা সাধ্যসাধন নহে, তাহা হেতু নহে। তবে তাহা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে হেতুর কোন সামান্য ধর্ম্ম বা সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এ জন্য অনেক সময়ে তাহাকে হেতু বলিয়া ভ্রম হয়, সুতরাং তাহার নাম হেত্বাভাস। পরবর্ত্তী কালে ইহাকে দুষ্ট হেতুও বলা হইয়াছে। এই হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতু মহর্ষি গোতম পাঁচটি নামে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম (১) সব্যভিচার। সব্যভিচার বলিলে বুঝা যায়, ব্যভিচার সহিত অর্থাৎ ব্যভিচারযুক্ত বা ব্যভিচারী। ব্যভিচার বলিতে কোন নিয়মবিশেষ না থাকা। বি—বিশেষতঃ, অভি—উভয়তঃ, চার—গতি (সম্বন্ধ)। অর্থাৎ যাহার গতি বা সম্বন্ধ কোন বিশেষ উভয় স্থানে আছে, তাহা ব্যভিচারী।

কোন পদার্থে যে পদার্থকে সাধন বা অনুমান করিতে হইবে, সেই অনুমেয় পদার্থটিকে সাধ্য বলা যায়। যাহা সেই সাধ্যযুক্ত স্থান এবং সেই সাধ্যশূন্য স্থান, এই উভয় স্থানেই থাকে, তাহা ঐ সাধ্যের ব্যভিচারী পদার্থ; তাহা সেখানে সাধ্যসাধন হয় না। এ জন্য তাহা সেখানে প্রকৃত হেতু নহে, তাহা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। যেমন যদি কেহ হস্তীর অনুমানে অশ্বকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেখানে অশ্ব সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। কারণ, অশ্ব হস্তিযুক্ত স্থানেও থাকে এবং হস্তিশূন্য স্থানেও থাকে। অশ্ব থাকিলেই সেখানে হস্তী থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং অশ্ব হস্তিরূপ সাধ্যের সাধন হয় না, উহা ঐ স্থলে হেত্বাভাস। আবার অশ্বের অনুমানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হস্তীও সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। হস্তীও অশ্বের সাধন হয় না। আবার কেহ যদি দাতৃত্বের অনুমানে ধনিত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, অথবা ধনিত্বের অনুমানে দাতৃত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ উভয় স্থলেই উহা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইবে। কারণ, ধনী মাত্রই দাতা নহে এবং দাতা মাত্রই ধনী নহে। ধনিত্ব দাতা ও অদাতা—উভয়েই আছে এবং দাতৃত্বও ধনী ও দরিদ্র—উভয়েই আছে।

আবার শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসক যদি বলেন—শব্দ নিত্য। কারণ, শব্দ স্পর্শশূন্য; শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কোন স্পর্শ শব্দে নাই; স্পর্শশূন্য পদার্থ হইলেই তাহা নিত্য পদার্থই হয়, যেমন আত্মা এবং স্পর্শযুক্ত পদার্থ হইলেই তাহা অনিত্য হয়, যেমন ফল, জল প্রভৃতি। শব্দ যখন স্পর্শশূন্য, তখন শব্দ নিত্য পদার্থ। এখানে মীমাংসকের গৃহীত স্পর্শশূন্যতা শব্দের নিত্যত্বানুমানে হেতু হয় না। কারণ, ঐ স্পর্শশূন্যতা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত আত্মা প্রভৃতি পদার্থেও আছে, আবার অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি পদার্থেও আছে। স্পর্শশূন্য হইলেই তাহা নিত্য পদার্থ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই; সুতরাং ঐ স্থলে স্পর্শশূন্যতা সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস।

দ্বিতীয়টির নাম (২) বিরুদ্ধ। যাহা সাধ্য পদার্থকে বিশেষরূপে রুদ্ধ করে, ব্যাহত করে, অর্থাৎ সাধ্যযুক্ত কোন স্থানেই না থাকিয়া কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, তাহা সাধ্যের বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। ইহা সাধ্যের সাধন না হইয়া সাধ্যের অভাবেরই সাধন হয়, সুতরাং স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষরূপ সাধ্যকেই ব্যাহত করে। যেমন যদি কেহ বলেন,—এই জগৎ একেবারে বিনষ্ট হয় না, ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। কেন না, এই জগৎ নিত্য পদার্থ নহে, ইহা চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে অবস্থায়ই হউক, এই জগৎ থাকে, ইহার একেবারে নাশও হয় না। এখানে ফলতঃ জগৎ নিত্য, ইহাই বলা হইল। কারণ, যাহার নাশ নাই, এমন ভাব পদার্থ নিত্যই হয়; কিন্তু এখানে পূর্ব্বে যে অনিত্যত্ব হেতু বলা হইয়াছে, তাহা এই নিত্যত্ব সাধ্যের বিরুদ্ধ। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একাধারে কখনই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঐ অনিত্যত্ব হেতু, জগতের নিত্যত্বরূপ স্বসিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষকে ব্যাহত করিবে। যে অনিত্যত্ব হেতু কোন কালে জগতের নাস্তিত্বই সাধন করে, তাহা জগতের সনাতনত্ব বা সর্ব্বকালে বিদ্যমানতারূপ নিত্যত্বের অনুমানে কখনই কোন পক্ষে হেতু হইতে

পারে না। কারণ, যে অনিত্যত্বকে পূর্ব্বে সাধকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সাধক না হইয়া বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষ নিত্যত্বের বাধকই হয়; সুতরাং ঐ স্থলে অনিত্যত্ব জগতের সদাতনত্বের অনুমানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, এমন পদার্থই সদাতন, এই সিদ্ধান্ত যিনি স্বীকার করেন, তিনি 'এই পৃথিবী জন্য পদার্থ অর্থাৎ ইহার উৎপত্তি হইয়াছে; কারণ, ইহা সদাতন,' এইরূপে পৃথিবীতে জন্যত্বের অনুমানে যদি সদাতনত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ স্থলে উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। কারণ, সদাতনত্ব জন্যত্বের বিরুদ্ধ; যাহার উৎপত্তি নাই, তাহাই ত সদাতন বলিয়া স্বীকৃত। পৃথিবীকে সদাতন বলিয়াও জন্য বলিলে ঐ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়। স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইলে তাহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে।

তৃতীয়টির নাম (৩) প্রকরণ-সম। বাদী ও প্রতিবাদী যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রকরণ বা প্রস্তাব করেন, তাহাই এখানে প্রকরণ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ যাহাকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে প্রকরণ। যেমন শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব। যাহা হইতে এই প্রকরণ সম্বন্ধে চিন্তা জন্মে অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে সংশয় জন্মে, এমন পদার্থ হেতুরূপে গ্রহণ করিলে ঐ পদার্থ প্রকরণ-সম নামক হেত্বাভাস। যেমন একজন বলিলেন,—শব্দ অনিত্য। কারণ, শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্ম্মের উপলব্ধি হইতেছে না। নিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি না হইলে সে পদার্থ অনিত্যই হয়, যেমন বস্ত্রাদি। তখন অপর বাদী এই হেতুর আর কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। শব্দে কোন নিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি তাঁহারও তখন হইতেছে না, কিন্তু তিনিও তখন বাদীর ন্যায় বলিয়া বসিলেন,—শব্দ নিত্য; কারণ, শব্দে কোন অনিত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের ধর্ম্ম উপলব্ধি হইতেছে না। তখন পূর্ব্ববাদী এই হেতুতেও কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না; শব্দে অনিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি তাঁহারও নাই, সুতরাং সেখানে কাহারও কোন পক্ষের অনুমান হইতে পারিল না। পরন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ একটা সংশয়ই সেখানে জন্মিল। কারণ, বিশেষের অনুপলব্ধি সংশয়ের একটা কারণ, তাহা উভয় পক্ষেই আছে। শব্দে নিত্যধর্ম্মের উপলব্ধি অথবা অনিত্য-ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিলে কখনই ঐরূপ সংশয় হইতে পারিত না। সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর ঐ বিশেষ ধর্ম্মের অনুপলব্ধি, যাহা সেখানে হেতুরূপে গৃহীত, তাহা সেখানে প্রকরণ-সম নামক হেত্বাভাস। যাহা প্রকরণের ন্যায় অনিশ্চায়ক, পরন্তু উভয় প্রকরণেই তুল্য, তাহা প্রকরণ বিষয়ে সংশয়েরই উৎপাদক, তাহা প্রকরণের নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত হইলে প্রকরণ-সম হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর দুই হেতুই দুষ্ট; দুই হেতুই প্রকরণ-সম। ঐরূপ সংশয়োৎপাদক পদার্থ অনুমানে হেতু হইতে পারে না।

চতুর্থটির নাম (৪) সাধ্যসম। যাহা অসিদ্ধ, তাহাই সাধ্য হয়। উভয়বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধ পদার্থ সাধ্য হয় না। অনুমানে এই সাধ্য ভিন্ন আর সমস্ত পদার্থই সিদ্ধ হওয়া চাই। হেতু সিদ্ধ পদার্থ না হইলে সাধ্যের সাধক হইতে পারে না। যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে পরকে কিরূপে

সাধন করিবে? যদি কোন স্থানে প্রযুক্ত হেতু সিদ্ধ না হয়, প্রতিবাদী ঐ হেতু না মানেন, তাহা হইলে ঐ হেতু সেখানে সাধন করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং ঐ হেতু সেখানে সাধ্যের তুল্য, উহা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধ্যসাধন হইতে পারে না; সুতরাং উহা প্রকৃত হেতু নহে, উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ অনুমান করিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ; কারণ, তাহার গতি আছে। কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ছায়াও সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। যাহা গমন করে, তাহা অবশ্যই দ্রব্য পদার্থ। দ্রব্য ভিন্ন আর কোনও পদার্থের গতি নাই। নৈয়ায়িক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকারের গতি সিদ্ধ পদার্থ নহে। গমনকারী পুরুষ আলোকের আবরক অর্থাৎ আচ্ছাদক হয়, এ জন্য তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে ছায়া পড়ে। ঐ স্থানে তখন আলোকের অভাব সর্ব্বসম্মত। যখন পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হয়, তখন তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী আলোকাভাবও উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়; এই জন্য পুরুষের ন্যায় ছায়াও ক্রমে তাহার পাছে পাছে গমন করিতেছে, এরূপ ভ্রম হয়। সুতরাং ছায়ার গতি আছে, ইহা স্বীকার করি না। ছায়া আলোকের অসন্নিধি মাত্র। ছায়ার গতি যদি প্রমাণসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে অবশ্য ছায়া দ্রব্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। ছায়ার গতি অসিদ্ধ, সুতরাং উহা সাধ্যের তুল্য। ছায়ার দ্রব্যত্বানুমানে উহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, উহা প্রকৃত হেতু নহে।

পঞ্চমটির নাম (৫) কালাতীত। যে হেতু কালের অতিক্রমযুক্ত, তাহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ বলিয়াছেন যে, শব্দ তাহার শ্রবণের পূর্ব্বেও থাকে, পরেও থাকে, উহা রূপের ন্যায় স্থির পদার্থ। কারণ, শব্দ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, অর্থাৎ শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগজন্য। ভেরী ও দণ্ডের সংযোগে এবং কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগে শব্দের উৎপত্তি হয় না, শব্দের অভিব্যক্তিই হয়। যাহার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সংযোগ-জন্য, তাহাকেই বলে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য। যাহা সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা অভিব্যক্তির পূর্ব্ব হইতেই থাকে এবং তাহার পরেও থাকে, যেমন রূপ। অন্ধকারে রূপ দেখা যায় না, এ জন্য যাহার রূপ দেখিব, তাহাতে আলোক সংযোগ আবশ্যক। আলোক সংযোগের পরেই রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। সেখানে রূপ পূর্ব্ব হইতেই আছে এবং পরেও থাকিবে। রূপ আলোক-সংযোগ-ব্যঙ্গ্য। সুতরাং যাহা সংযোগ-ব্যঙ্গ্য, তাহা পূর্ব্ব হইতেই থাকে, ইহা যখন রূপে দেখিতেছি, তখন শব্দও পূর্ব্ব হইতেই থাকে, ইহা অনুমান করিতে পারি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, তাহা পার না। কারণ, তোমার ঐ সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব হেতু ঐ স্থলে কালাতীত। কেন না, রূপের প্রত্যক্ষ আলোক সংযোগের সমকালেই হয়। আলোক-সংযোগ নিবৃত্ত হইলে আর হয় না। সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্য, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগ-জন্য হইতে পারে না। কারণ, কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকালেই দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, অনেক পরেই তাহার শব্দ শ্রবণ হয়। দূরস্থ শ্রোতা দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করে না, ক্রমে তাহার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই সে শ্রবণ করে। তখন পূর্ব্বজাত সেই কাষ্ঠ-কুঠার-সংযোগ থাকে না।

ফল কথা, ঐ সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, সুতরাং শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগ-জন্য বলা যায় না, শব্দকেই সংযোগ-জন্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে শব্দকে রূপের ন্যায় সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলা যায় না। শব্দের অভিব্যক্তি কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ-কালকে অতিক্রম করে, এ জন্য সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব মীমাংসকের পূর্ব্বোক্ত অনুমানে কালাতীত নামক হেত্বাভাস। অথবা যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করিতে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইবে, সেই ধর্ম্মীতে যদি সেই সাধ্য ধর্ম্ম বা অনুমেয় ধর্ম্মটি নাই, ইহা বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আর সেখানে সাধ্য সন্দেহের কাল থাকে না। সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে অর্থাৎ বলবৎ প্রমাণের দ্বারা অনুমানের আশ্রয়ে সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় স্থলে সেই সাধ্যের অনুমানে হেতুরূপে প্রযুক্ত পদার্থ কালাতীত নামক হেত্বাভাস। যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, কেহ অগ্নিতে অনুষ্ণতার অনুমান করিতে যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস হইবে।

টিপ্পনী। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডায় হেত্বাভাসের জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। এ জন্য মহর্ষি তাহার পরেই হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়া তাহার নিরূপণ করিয়াছেন। অনুমানের হেতু নির্দ্দোষ না হইলে অনুমান খাঁটি হয় না। অনেক সময়েই দুষ্ট হেতুর দ্বারা অনুমান করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয়। সুতরাং কোন্ হেতু সৎ এবং কোন্ হেতু অসৎ অর্থাৎ দুষ্ট, তাহা বুঝা নিতান্ত প্রয়োজন। ফলতঃ অনুমানের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ে এবং জল্প ও বিতণ্ডায় জয়লাভে হেত্বাভাস জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। যে হেতুতে ব্যভিচারাদি কোন দোষ নাই, তাহাই সৎ হেতু। যাহাতে ব্যভিচারাদি কোন দোষ আছে, তাহাই অসৎ হেতু বা দুষ্ট হেতু। ইহা বস্তুতঃ হেতু না হইলেও হেতুরূপে গৃহীত হয় এবং হেতুসদৃশ, এ জন্য ইহাতেও হেতু শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত অসৎ হেতু বা দুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন। "হেতুবদাভাসন্তে" অর্থাৎ যাহা হেতু নহে, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই মহর্ষি হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষি যেখানে পৃথক্ করিয়া সামান্য লক্ষণসূত্র বলেন নাই, কেবল বিভাগ-সূত্রের দ্বারা বিভাগ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার বিভাগসূত্রের দ্বারাই সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এ কথা প্রমাণ-বিভাগ-সূত্রের (তৃতীয় সূত্রের) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। সামান্য লক্ষণ ব্যতীত বিভাগ হয় না। বিশেষ জ্ঞানের জন্য যে বিভাগ, তাহা সামান্য জ্ঞান সম্পাদন না করিয়া করা যায় না। সুতরাং মহর্ষি এই বিভাগ-সূত্রেই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা অবশ্যই করিয়াছেন। "হেতোরাভাসাঃ" অর্থাৎ হেতুর দোষ, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে রঘুনাথ প্রভৃতি কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক হেতুর দোষগুলিকেও হেত্বাভাস বলিয়া তাহার সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ, এই পঞ্চবিধ হেতুর দোষকে পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়া তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশের হেত্বাভাস-সামান্য-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম সব্যভিচার অর্থাৎ ব্যভিচাররূপ দোষযুক্ত,

বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিরোধরূপ দোষযুক্ত ইত্যাদি পঞ্চবিধ দুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন। ঐ সব্যভিচার প্রভৃতির বিশেষ লক্ষণ-সূত্রেও ইহা সুব্যক্ত আছে। আভাস শব্দের দোষ অর্থও মুখ্য নহে। এই সমস্ত কারণে হেতুর দোষগুলিকে হেত্বাভাস নামে ব্যাখ্যা করা সমুচিত বলিয়া মনে হয় না। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও কিন্তু শেষে হেত্বাভাসের বিভাগ-বাক্যে সব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্ট হেতুরই বিভাগ করিয়াছেন। রঘুনাথের দীধিতির টীকাকার গদাধর প্রভৃতি সেখানে গঙ্গেশের অন্যরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিলেও গঙ্গেশ দুষ্ট হেতুরই সামান্য লক্ষণ বলিয়া তাহারই বিভাগ করিয়াছেন, ইহাই সহজে মনে আসে। গঙ্গেশের হেত্বাভাসের লক্ষণ তিনটির দুষ্ট হেতুর লক্ষণ পক্ষেও ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকে তাহাও করিয়াছেন। দীধিতিকার রঘুনাথ সে ব্যাখ্যাও বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, এখন হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ কি বুঝা যায়, তাহা বুঝিতে হইবে। হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা যাহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এমন পদার্থকে বুঝা যায়। হেতুর ন্যায় অর্থাৎ হেতুসদৃশ, এই কথা বলিলে তাহা হেতু নহে—অহেতু, ইহা বুঝা যায়। যাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই, তাহাই অহেতু। হেত্বাভাস পদার্থ যখন অহেতু, তখন তাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রস্থ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা সূচিত হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু। যে পদার্থকে যেখানে হেতুরূপে গ্রহণ করা না হয় অথবা যাহাতে হেতুর কোনরূপ লক্ষণ নাই, এমন পদার্থ সেখানে হেত্বাভাস নহে; কিন্তু কেবল অহেতু পদার্থকে হেত্বাভাস বলিলে সেখানে সেই পদার্থ এবং সর্ব্বত্র ঐরূপ অসংখ্য পদার্থ হেত্বাভাস হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, হেতুর সামান্য ধর্ম্ম বা সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান, অর্থাৎ যে পদার্থ হেতু নহে, কিন্তু হেতুর কোন সামান্য ধর্ম্ম থাকায় হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। বস্তুতঃ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায়।

হেত্বাভাসে হেতুর সামান্য ধর্ম্ম কি আছে? যাহার জন্য উহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়? এতদুত্তরে উদ্যোতকর প্রথম বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনন্তর প্রয়োগই সামান্য ধর্ম্ম। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে যেমন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতুরও প্রয়োগ হয়। পরে আবার বলিয়াছেন যে, যে সকল ধর্ম্ম থাকিলে তাহা প্রকৃত হেতু হয়, তাহার কোন না কোন ধর্ম্ম হেত্বাভাসেও থাকে, অর্থাৎ ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ হেতুর কোন ধর্ম্ম দুষ্ট হেতুতেও থাকে। সাধকত্ব ও অসাধকত্বই যথাক্রমে হেতু ও হেত্বাভাসের বিশেষ ধর্ম্ম। হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকাই তাহার সাধকত্ব এবং সমস্ত লক্ষণ না থাকা বা কোন লক্ষণ থাকাই হেত্বাভাসের অসাধকত্ব।

এখন হেতুর সমস্ত লক্ষণ কি, তাহা বলিতে হইবে। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের পরিভাষানুসারে যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, ঐ ধর্ম্মীর নাম পক্ষ এবং ঐ অনুমেয় ধর্ম্মটির নাম সাধ্য। যেমন পর্ব্বত-ধর্ম্মীতে বহ্নি-ধর্ম্মের অনুমান করা হইলে পর্ব্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য। এই

(১) পক্ষসত্ত্ব অর্থাৎ পক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম্ম। যাহা পক্ষে নাই, তাহা হেতু হইতে পারে না। পর্ব্বতে যদি ধূম থাকে, তাহা হইলেই সেখানে বহ্নির অনুমানে উহা বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে হেতু হইতে পারে। যে পদার্থ পূর্ব্বোক্ত সাধ্যযুক্ত বলিয়া নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত, তাহার নাম সপক্ষ; যেমন পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষ; কারণ, সেখানে বহ্নি আছে, ইহা সর্ব্বসম্মত। এই (২) সপক্ষসত্ত্ব অর্থাৎ সপক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত বহ্নির অনুমানে ধূমহেতু পাকশালা প্রভৃতি সপক্ষে আছে, সুতরাং উহাতে সপক্ষসত্ত্ব আছে। যেখানে সাধ্যযুক্ত বলিয়া নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত কোন পদার্থ নাই, অর্থাৎ যেখানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষসত্ত্ব হেতুর লক্ষণ হইবে না। যেখানে সপক্ষ আছে, সেখানেই হেতুতে সপক্ষসত্ত্ব আছে কি না, দেখিতে হইবে এবং সেখানেই সপক্ষসত্ত্ব হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম্ম। যে পদার্থ সাধ্যশূন্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত, তাহার নাম বিপক্ষ। এই (৩) বিপক্ষে অসত্তা অর্থাৎ বিপক্ষে না থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম্ম। যেমন পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে নদ-নদী প্রভৃতি বিপক্ষ। কারণ, তাহা বহ্নিশূন্য বলিয়া নিশ্চিত। বহ্নিশূন্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত পদার্থ আরও প্রচুর আছে; সেখানে ধূম নাই, থাকিতেই পারে না[১], সুতরাং ঐ স্থলে ধূম হেতুতে বিপক্ষে অসত্তা আছে। যেখানে বিপক্ষই নাই অর্থাৎ সাধ্যশূন্য বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থই নাই, সেখানে বিপক্ষে অসত্তা হেতুর লক্ষণ হইবে না, সেখানে উহা বলাই যাইবে না, সেখানে ঐটিকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য ধর্ম্মগুলিকেই হেতুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

যেখানে সাধ্যশূন্য পদার্থকেই পক্ষ করিয়া সেই সাধ্য সাধনে হেতুপ্রয়োগ করা হয়, তাহার নাম বাধিত হেতু; উহা হেতুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও হেতু হয় না; কারণ, উহা সাধ্য-সাধন হয় না। যেখানে সাধ্য নাই বলিয়াই বলবৎ প্রমাণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেখানে আর কোন হেতুই সাধ্যসাধন করিতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ পদার্থে সেখানে হেতুর কোন লক্ষণ নাই, ইহা বলিতেই হইবে। এ জন্য বলা হইয়াছে, (৪) অবাধিতত্ব হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম্ম। যে হেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাধিত, তাহাতে অবাধিতত্ব থাকে না, এ জন্য তাহা হেতু নহে। আবার যেখানে কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অনুমান করিতে গেলে, ঐ সাধ্যের অভাবের অনুমানে আর একটি পৃথক্ হেতু উপস্থিত হয় এবং উভয় পক্ষের উভয় হেতুই তুল্যবল হওয়ায় কেহ কাহাকে বাধা দিতে না পারে, সেখানে ঐ সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে একটা সংশয় উপস্থিত হয়, সেখানে ঐ উভয় হেতুকেই বলা হইয়াছে 'সৎপ্রতিপক্ষ' বা 'সৎপ্রতিপক্ষিত'। সেখানে দুই হেতুই পরস্পর প্রতিপক্ষ, সুতরাং যাহার প্রতিপক্ষ সৎ—কি না বিদ্যমান, তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলা যায়। ঐ দুই হেতুর কোনটিই সাধ্যসাধন করিতে না পারায় উহাকে হেতু বলা যায় না, সুতরাং অবশ্যই উহাতে হেতুর কোন লক্ষণ নাই বলিতে হইবে। তাই বলা

১। বহ্নির অনুমানে ধূমত্বরূপে ধূম বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে হেতু। বহ্নিশূন্য কোন স্থানেই ঐ বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে ধূম থাকে না। সামান্যতঃ সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধূমই বহ্নির অনুমানে হেতু। ২ অঃ, ১ আঃ, ৩৮ সূত্রে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে (৫) 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব' হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম্ম। যে দুইটি হেতু সৎপ্রতিপক্ষ, তাহাতে অসৎপ্রতিপক্ষত্ব থাকে না, এ জন্য তাহা হেতু নহে। হেতু সদৃশ বলিয়াই কিন্তু অহেতুতেও হেতু শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

এখন বুঝা গেল, (১) পক্ষসত্ত্ব, (২) সপক্ষসত্ত্ব, (৩) বিপক্ষে অসত্ত্ব, (৪) অবাধিতত্ব, (৫) অসৎ-প্রতিপক্ষত্ব—এই পাঁচটি ধর্ম্মই হেতুর লক্ষণ। এই পাঁচটি ধর্ম্ম থাকিলেই তাহাকে সাধ্যের গমক বা সাধক বলা হইয়াছে। এবং ঐ পাঁচটি ধর্ম্মকেই হেতুর "গমকতৌপয়িক রূপ" বলা হইয়াছে। গমকতার ফলিতার্থ অনুমাপকতা; ঔপয়িক বলিতে উপায় বা প্রযোজক। হেতু যে অনুমাপক হয়, সেই অনুমাপকতার প্রযোজকই ঐ পাঁচটি ধর্ম্ম। অবশ্য যেখানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষ-সত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া এবং যেখানে বিপক্ষ নাই, সেখানে বিপক্ষে অসত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত চারিটি ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি ধর্ম্ম এবং স্থলবিশেষে চারিটি ধর্ম্মকেই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী প্রায় সকল নৈয়ায়িকের মতেই অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী নামে হেতু ত্রিবিধ। এ সকল কথা অবয়ব-প্রকরণে হেতুবাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্রিবিধ হেতুবাদী নৈয়ায়িকদিগের মতে অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুস্থলে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি ধর্ম্মই হেতুতে থাকা আবশ্যক, নচেৎ তাহা হেতু হয় না। এবং অন্বয়ী বা কেবলান্বয়ী হেতুস্থলে বিপক্ষে অসত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া আর চারিটি ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। এবং ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী হেতু স্থলে সপক্ষসত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া আর চারিটি ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও তর্কামৃত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পক্ষসত্ত্ব প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম্মের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ হইয়াছে। কারণ, সম্ভবস্থলে ইহাদিগের কোন একটি ধর্ম্ম না থাকিলেও তাহা হেতু হয় না। ঐ পাঁচটি ধর্ম্মই গৌতম মতে হেতুর "গমকতৌপয়িক রূপ" অর্থাৎ অনুমাপকতার প্রযোজক, সাধকতার প্রযোজক। মহর্ষি গোতম কণ্ঠতঃ এ সকল কথা কিছু না বলিলেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাই ইহা সূচিত হইয়াছে। সূত্রে সকল কথার বিশদ প্রকাশ থাকে না, তাহা থাকিতেও পারে না; সূত্রে অনেক তত্ত্বের সূচনাই থাকে, তাই উহার নাম সূত্র। মহর্ষি হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিতে সাধ্যসাধন পদার্থকেই হেতুপদার্থ বলিয়া সূচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে উদাহরণ-বিশেষের সাধর্ম্ম্য এবং উদাহরণবিশেষের বৈধর্ম্ম্য বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি-সম্মত দ্বিবিধ হেতুপদার্থও পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে যে, কিরূপ পদার্থ হইলে তাহা সাধ্যসাধন পদার্থ হইয়া হেতু পদার্থ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা বুঝা যায়, পক্ষসত্ত্ব প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম্ম অথবা স্থলবিশেষে চারিটি ধর্ম্ম থাকিলেই তাহা সাধ্যসাধন হয় এবং মহর্ষি যে পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন, তাহার মূল চিন্তা করিলেও তাঁহার মতে যাহা হেত্বাভাসে থাকে না, এমন পাঁচটি ধর্ম্মই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এই সব চিন্তা করিয়াই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ধর্ম্মকেই গৌতম মতে হেতুর লক্ষণ বলিয়া

স্থির করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক শব্দের দ্বারা গৌতম মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে যে পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা প্রাচীন উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণই প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা সে দিনের নব্য ন্যায়ের কর্ত্তাদিগেরই আবিষ্কৃত নহে। উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক হইতে পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ অনেক কথা লইয়াছেন। ভাষ্যকারও সূত্রকারের ন্যায় অনেক কথার সূচনাই করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ধর্ম্মই যে হেতুর লক্ষণ, ইহা তিনি না বলিলেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ধর্ম্মকে হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা বলা হইল। এ সকল কথা না বলিলেও যে সকল ধর্ম্ম থাকিলে সে পদার্থ হেত্বাভাস হয় না, তাহা সাধ্যসাধন হয়, সেই সকল ধর্ম্মই যে হেতুর লক্ষণ, তাহা সকলকেই বলিতে হইবে। সেই ধর্ম্মগুলি যিনি যেরূপ বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন এবং যে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবেন, তাহাই হেতুর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ধর্ম্মই হউক, আর তাহার কম বা বেশী অন্য ধর্ম্মই হউক, তাহাতে ফলের কোন হানি নাই। এ জন্য অনেকে অন্যান্য প্রকারেও হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তবে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ধর্ম্মের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ হইয়াছে, ইহা অধিকাংশের মত। তাহা হইলে বুঝা গেল, যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহাই অসাধক; তাহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেত্বাভাস হইবে, ইহাই হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহা হেতু নহে অর্থাৎ যাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই অথচ যাহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। তাহা হইলে উহার দ্বারা হেতুর লক্ষণশূন্য হইয়া হেতুর ন্যায় প্রতীয়মানত্বই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রথমতঃ তাহাই বলিয়া এই বিভাগ-সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের কথায় বুঝা যায় যে, হেতুর সমস্ত লক্ষণ হেত্বাভাসে থাকিবে না, কিন্তু কোন লক্ষণ থাকিবে; এই জন্যই হেত্বাভাস অসাধক হইয়াও হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং ঐ ভাবই তাহার হেত্বাভাসত্ব বা অসাধকত্ব। কিন্তু যাহাতে হেতুর কোন লক্ষণই নাই অর্থাৎ যাহা একত্র পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই হয়, এমন হেত্বাভাসও নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার ও উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যানুসারে প্রকরণ-সম বা সৎপ্রতিপক্ষ সেখানে হইবে না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এই কথা বলিয়া প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত পক্ষসত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চধর্ম্মশূন্যতাই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চধর্ম্মই হেতুর লক্ষণ। পরে বলিয়াছেন যে, যখন কোন স্থলে সপক্ষ থাকে না এবং কোন স্থলে বিপক্ষ থাকে না, তখন পূর্ব্বোক্ত পঞ্চধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ না হওয়ায় ঐ পঞ্চধর্ম্মশূন্যতাকে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বলা যায় না। যেখানে কোন পদার্থেই ঐ পঞ্চধর্ম্ম সিদ্ধ নাই, সেখানে ঐ পঞ্চধর্ম্মশূন্যতাও একটা পদার্থ হইতে পারে না; সুতরাং সেখানে হেত্বাভাস কেহই হইতে পারে না। সুতরাং উহা হেত্বাভাসের লক্ষণ হয় না। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-ধর্ম্মের মধ্যে সম্ভবস্থলে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষ সত্ত্ব এবং বিপক্ষের অসত্ত্ব, এই তিনটি ধর্ম্ম থাকিবে না,

ইহা হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায় এবং অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব থাকিবে না, ইহাও হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চধর্ম্মের (সম্ভবস্থলে) কোন একটি ধর্ম্ম না থাকিলেও তাহা হেতু হয় না, তাহা অহেতু। হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা যখন হেতুলক্ষণশূন্য পদার্থই বুঝা যায়, তখন তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্রয়ের অভাব বুঝা যায়। তাহা হইলে উহার দ্বারা ফলে অনুমিতির কারণ যে জ্ঞান, তাহার বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে। কোন হেতুতে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্রয় নাই, ইহা বুঝিলে সেখানে অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্রয়শূন্য, এই কথার দ্বারা অনুমিতির কারণ জ্ঞানের বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে হয়। এইরূপ কোন হেতুকে বাধিত বা সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া বুঝিলে সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্বের অভাব যে বাধিতত্ব ও সৎপ্রতিপক্ষত্ব, তাহার দ্বারা ফলে অনুমিতি বিরোধী, এই পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল যে, যাহা জ্ঞায়মান হইয়া অনুমিতি অথবা তাহার কারণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান অথবা পরামর্শের বিরোধী, সেই পদার্থই হেত্বাভাস অর্থাৎ যাহা বুঝিলে অনুমিতি জন্মে না অথবা সেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে না অথবা পরামর্শ জন্মে না, সেই পদার্থগুলি হেতুর দোষ। সম্বন্ধবিশেষে ঐ দোষ যে পদার্থে থাকে, তাহা হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতু। ইহাই বৃত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার স্থূল তাৎপর্য্য।

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এক উক্তিতে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বুঝাইতে যাইয়া প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও রঘুনাথের কথা লইয়াই এখানে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণের চরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যার বিস্তার করেন নাই। তাঁহারা লক্ষণ বিষয়ে কিছু সূচনাই করিয়া গিয়াছেন, পদার্থ বিষয়ে যাহাতে একটি ধারণা জন্মিতে পারে, তাহাই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে পদার্থ নির্ব্বাচন করিবার জন্য পরে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বঙ্গের ন্যায়বীর আচার্য্যগণ ন্যায় বিষয়ে অদ্ভুত লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। মনে হয়, প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণ সর্ব্বত্র এক উক্তিতে হেত্বাভাসের একটি সামান্য লক্ষণ আবশ্যক মনে করেন নাই এবং উহা অসম্ভব মনে করিয়াও ঐ বিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই। যেখানে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চধর্ম্ম সিদ্ধই নাই, সেখানে যে চারিটি ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে অথবা যাহাই সেখানে হেতুর লক্ষণ বলা যাইবে, তাহার অভাবই সেখানে হেত্বাভাসের লক্ষণ হইবে। সর্ব্বত্র হেত্বাভাসের একটি লক্ষণ নাই বা হইল, আর তাহা হইবেই বা কিরূপে? অনুমানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতু সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন। এক উক্তিতে একটা লক্ষণ বলিতে পারিলেও ফলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নই হইবে। আর এক উক্তিতেই বা তাহা সর্ব্বস্থলের জন্য নিষ্কৃষ্টরূপে কি করিয়া বলা যাইবে? দীধিতিকার রঘুনাথও ত তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনিও হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণে কতকগুলি ভিন্ন কল্পের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও শেষে যাদৃশ পক্ষ, যাদৃশ সাধ্য ও যাদৃশ হেতু স্থলে যতগুলি হেত্বাভাস সম্ভব হয়, তাবৎ পদার্থের অন্যতমত্বই হেতুর

দোষরূপ হেত্বাভাসের একটি লক্ষণ বলিয়া সেই কল্পের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেখানে টীকাকার গদাধরও মতান্তরে সেই কল্পেই রঘুনাথের নির্ভর, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এবং সেই কল্পটিই যে কোন স্থলবিশেষের জন্য গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ স্থলবিশেষে যে হেত্বাভাসের লক্ষণ অগত্যা ঐরূপই বলিতে হইবে, ইহাও গদাধরের বিচারে সেখানে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্র হেত্বাভাসের একটি লক্ষণই ব্যাখ্যাত হইয়াছে কোথায়? গদাধর যাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন নাই, কেবল সকল লক্ষণের দোষ ব্যাখ্যা করিয়াই তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আশানুরূপ নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতে আর কাহারই বা শক্তি আছে? একটা ব্যাখ্যা করিলেই বা তাহার নির্দ্দোষত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় কৈ? নব্য ন্যায়ের অধ্যাপকগণ গদাধরের হেত্বাভাস বিচার স্মরণ করিলে সর্ব্বত্র হেত্বাভাসের একটি সামান্য লক্ষণ নির্দ্দোষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন। ফলকথা, প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে হেত্বাভাসের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণই বলিতেন; এ জন্য তাঁহারা হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যায় নব্যগণের ন্যায় কোন গুরুতর চিন্তা করিতে যান নাই। যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই অথচ যাহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কোন কারণে যাহাকে হেতু বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাই হেত্বাভাস, এইরূপ বলিলেই হেত্বাভাসের সামান্য জ্ঞান হইবে এবং বিশেষ লক্ষণ বলিলে বিশেষ জ্ঞান হইবে। বিশেষলক্ষণের দ্বারাও তাহাকে হেত্বাভাস বলিয়া বুঝা যাইবে, ইহাই প্রাচীনদিগের মনের কথা বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তী বিশেষ লক্ষণসূত্রগুলিতেই সব্যভিচার প্রভৃতি পাঁচটি নাম এবং তাহাদিগের লক্ষণ ব্যক্ত আছে। তবে আবার এই সূত্রটির প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাস বহু প্রকার আছে, সেগুলি সমস্তই এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ ভিন্ন আর কোন হেত্বাভাস নাই, এই বিশেষ নিয়ম জ্ঞাপনের জন্যই মহর্ষি এই বিভাগ-সূত্রটি বলিয়াছেন। হেত্বাভাস যে কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা উদ্যোতকর দেখাইয়াছেন এবং তাহার উদাহরণ ও সংখ্যার বর্ণনা করিয়াছেন। শেষে গিয়া তাহা অসংখ্যই হইয়া পড়িয়াছে॥ ৪ ॥

ভাষ্য। তেষাং।

সূত্র। অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥৫॥৪৬॥

অনুবাদ। সেই অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে যাহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ঐকান্তিক নহে, সাধ্য ও সাধ্যের অভাব, এই দুই পক্ষের কোন পক্ষেই নিয়ত নহে অর্থাৎ যাহা সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে, এমন পদার্থ সব্যভিচার (সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস)।

ভাষ্য। ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্ত্ততে ইতি সব্যভিচারঃ। নিদর্শনং—নিত্যঃ শব্দোঽস্পর্শত্বাৎ স্পর্শবান্

কুম্ভোঽনিত্যো দৃষ্টো ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দস্তস্মাদস্পর্শত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইতি। দৃষ্টান্তে স্পর্শবত্ত্বমনিত্যত্বঞ্চ ধর্ম্মৌ ন সাধ্যসাধনভূতৌ গৃহ্যেতে, স্পর্শবাংশ্চাণুর্নিত্যশ্চেতি। আত্মাদৌ চ দৃষ্টান্তে 'উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু'রিতি অস্পর্শত্বাদিতি হেতুর্নিত্যত্বং ব্যভিচরতি অস্পর্শা বুদ্ধিরনিত্যা চেতি। এবং দ্বিবিধেঽপি দৃষ্টান্তে ব্যভিচারাৎ সাধ্যসাধনভাবো নাস্তীতি লক্ষণাভাবাদহেতুরিতি। নিত্যত্বমেকোঽন্তঃ, অনিত্যত্বমেকোঽন্তঃ, একস্মিন্নন্তে বিদ্যত ইতি ঐকান্তিকঃ, বিপর্য্যয়াদনৈকান্তিকঃ, উভয়ান্তব্যাপকত্বাদিতি।

অনুবাদ। ব্যভিচার বলিতে কোন এক পক্ষে ব্যবস্থিতি না থাকা অর্থাৎ নিয়ম না থাকা। ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারবিশিষ্ট, এই অর্থে সব্যভিচার, অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত সব্যভিচার শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—ব্যভিচারী। সুতরাং বুঝা যায়, ব্যভিচারিত্বই সব্যভিচার নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ। নিদর্শন—অর্থাৎ এই সব্যভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। (প্রতিজ্ঞা) শব্দ নিত্য, (হেতু) স্পর্শশূন্যতা জ্ঞাপক, (উদাহরণ) স্পর্শবিশিষ্ট কুম্ভ অনিত্য দেখা যায়, (উপনয়) শব্দ সেই প্রকার (কুম্ভের ন্যায়) স্পর্শবিশিষ্ট নহে, (নিগমন) সেই স্পর্শশূন্যতা হেতুক শব্দ নিত্য। (এই স্থলে) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত কুম্ভে স্পর্শ এবং অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্ম্মকে সাধ্যসাধনভূত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ স্পর্শ হেতু, অনিত্যত্ব তাহার সাধ্য ;- যেখানে যেখানে স্পর্শ থাকে, সে সমস্তই অনিত্য, ইহা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না। (কারণ) পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট, অথচ নিত্য, অর্থাৎ পরমাণুতে স্পর্শ থাকিলেও তাহা যখন অনিত্য নহে, তখন স্পর্শ অনিত্যত্বের সাধন হয় না। আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তেও, অর্থাৎ যাহা যাহা স্পর্শশূন্য, তাহা নিত্য, যেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপে গৃহীত আত্মা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত স্থলেও 'উদাহরণের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু' (১ আঃ, ৩৪ সূত্র) এই সূত্রানুসারে 'অস্পর্শত্বাৎ' এই বাক্য প্রতিপাদ্য হেতু অর্থাৎ স্পর্শশূন্যতারূপ হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হইতেছে ; (কারণ) বুদ্ধি স্পর্শশূন্য অথচ অনিত্য, (অর্থাৎ স্পর্শশূন্য হইলেই যে সে পদার্থ নিত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি ঐ দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না। কারণ, বুদ্ধি পদার্থে উহার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে)। এইরূপে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারবশতঃ সাধ্য-সাধনত্ব নাই অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে শব্দে নিত্যত্বের অনুমান

করিতে যে স্পর্শশূন্যতাকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে নিত্যত্ব সাধ্যের সাধনত্ব নাই। এ জন্য লক্ষণের অভাব বশতঃ অর্থাৎ হেতুর লক্ষণ না থাকায় (উহা) অহেতু।

নিত্যত্ব একটি পক্ষ, অনিত্যত্ব একটি পক্ষ। একই পক্ষে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ একই পক্ষে নিয়মবদ্ধ, এই অর্থে 'ঐকান্তিক'। বৈপরীত্যবশতঃ অর্থাৎ এই ঐকান্তিকের বিপরীত হইলে অনৈকান্তিক। কারণ, (তাহাতে) উভয় পক্ষের ব্যাপকত্ব আছে অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধ্য ও সাধ্যাভাবরূপ যে দুইটি পক্ষ বা ধর্ম্মবিশেষ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের আশ্রয়েই যাহা থাকে, কোন একটি মাত্রের আশ্রয়ে থাকে না, এ জন্য তাহা ঐকান্তিক নহে—অনৈকান্তিক।

টিপ্পনী। সূত্রে অনৈকান্তিক এবং সব্যভিচার শব্দ একার্থবোধক পর্য্যায় শব্দ। যাহাকে অনৈকান্তিক বলে, তাহাকেই সব্যভিচার বলে। সুতরাং অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা সব্যভিচারের লক্ষণ প্রকাশ করা যায় কিরূপে? বৃক্ষের লক্ষণ বলিতে কি 'মহীরুহকে বৃক্ষ বলে' এইরূপ কথা বলা যায়? আর তাহা বলিলেই কি বলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? তাৎপর্য্যটীকাকার এ জন্য বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া মহর্ষি এই সূত্রে দুইটি শব্দকেই লক্ষ্য ও লক্ষণবোধকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু সব্যভিচার বলিলে বুঝে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—সব্যভিচারকেই অনৈকান্তিক বলে। যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু অনৈকান্তিক বলিলে বুঝে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—অনৈকান্তিককে সব্যভিচার বলে। সুতরাং বোদ্ধার ভেদে এই সূত্রের দুইটি শব্দই লক্ষ্যনির্দ্দেশ এবং লক্ষণনির্দ্দেশ। এই জন্য ভাষ্যকারও প্রথমে সব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, উহার দ্বারাই সব্যভিচার নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সব্যভিচার শব্দটিকেই প্রথমতঃ লক্ষণ-বোধকরূপে গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারাই লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে সব্যভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে তিনি সূত্রের অনৈকান্তিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ অনৈকান্তিক শব্দও এক পক্ষে লক্ষণ-বোধক, এ জন্য ঐ শব্দটির যৌগিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার উহার দ্বারাও শেষে সব্যভিচার নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ যাহার নাম সব্যভিচার, তাহার নামই অনৈকান্তিক।

তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ বলিলেও প্রথমতঃ মহর্ষি পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের নাম কীর্ত্তন করিতে সব্যভিচার শব্দই বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্রে সব্যভিচার শব্দকেই তিনি লক্ষ্য নির্দ্দেশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই কিন্তু মনে হয়। ভাষ্যকার নিজে সব্যভিচার শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াও সব্যভিচার নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ বুঝাইতে পারেন এবং উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারেন। পরে সূত্রকারের অনৈকান্তিক শব্দের যৌগিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রোক্ত লক্ষণেরও ব্যাখ্যা করিতে পারেন। সূত্রকারও লক্ষণসূত্রে লক্ষ্যবোধক শব্দটিকে পরেই উল্লেখ করিয়াছেন,

এ কথাগুলিও ভাবিতে হইবে। তবে একার্থবোধক পর্য্যায় শব্দের দ্বারা লক্ষ্য ও লক্ষণ বলিলে যদি দোষ হয়, তাহা তাৎপর্য্যটীকাকারের পক্ষেও হইবে না কেন? যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ অথবা অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ জানে, সে ত সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস কাহাকে বলে, তাহা জানেই; তাহাকে আর উহা বলিবার প্রয়োজনই বা কি? কোন শব্দবিশেষ না জানিলে পদার্থের অজ্ঞতা হয় না। মহর্ষি গোতম যাহাকে সব্যভিচার বলিয়াছেন, তাহাকে অন্য কোন শব্দের দ্বারা জানিলেও তাহার জ্ঞান সম্পন্ন হয়। সুতরাং মনে হয় যে, মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে সব্যভিচার শব্দের দ্বারা যে এক প্রকার হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন, সব্যভিচার শব্দের প্রতিপাদ্য সেই হেত্বাভাসের স্বরূপ বলিবার জন্যই এই সূত্রটি বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়, যাহা অনৈকান্তিক, তাহাই সব্যভিচার অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত সব্যভিচার শব্দের প্রতিপাদ্য হেত্বাভাস। বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রকারে একার্থবোধক শব্দের দ্বারাও লক্ষণ বলা যায়, তাহাতে পুনরুক্তি-দোষ হয় না। ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত-লক্ষণ ব্যাখ্যায় দীধিতিটীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও এ কথা বলিয়া গিয়াছেন।[১]

ভাষ্যকার প্রথমতঃ সব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াই সব্যভিচার নামক হেত্বাভাসের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। কারণ, তাহাও বুঝান যায় এবং এখানে তাহাও বুঝাইতে হয়। শব্দে নিত্যত্বের অনুমানে অস্পর্শত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা সব্যভিচার হেত্বাভাস। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ স্থলে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং যাহাতে অস্পর্শত্ব নাই অর্থাৎ যাহাতে স্পর্শ আছে, তাহা অনিত্য, যেমন কুম্ভ—এইরূপে কুম্ভকে বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য এবং তদনুসারে পরে বৈধর্ম্ম্যোপনয়-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের উদাহরণ-বাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অনিত্য কুম্ভ স্পর্শবিশিষ্ট দেখা যায়, ইহাই ভাষ্যার্থ বুঝিতে হইবে। কারণ, বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে যেখানে যেখানে সাধ্য নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতু নাই, ইহাই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকার কিন্তু বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেখানে সাধ্য নাই, এইরূপ কথাই পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন; তিনি এখানেও তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিশেষ মতটি পরবর্ত্তী সকলেই উপেক্ষা করিলেও উহা যে তাঁহার মত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্ব্বে ভাষ্যকারের ঐ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ভাষ্য ব্যাখ্যায় তাঁহার নিজ মতানুসারে অন্যরূপে ভাষ্য-সন্দর্ভের যোজনা কেন করিয়াছেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। ভাষ্যকারের মতানুসারে ঐরূপ যোজনা নিষ্ফল ও ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, পরে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেও যেখানে যেখানে অস্পর্শত্ব হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই নিত্যত্ব নাই, যথা কুম্ভ—এইরূপ অর্থই ঐ স্থলে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার ঐ ভাবেই বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য অন্যত্রও বলিয়াছেন (নিগমনসূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

প্রদর্শিত স্থলে ভাষ্যকার শেষে আত্মা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেও ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত স্থলে হেতুর নাম সাধর্ম্ম্য হেতু। ভাষ্যকার মহর্ষিপ্রোক্ত সাধর্ম্ম্যহেতুবাক্যের লক্ষণ-

১। তেন ব্যাপ্তিপদেনাপি তাদৃশসামানাধিকরণ্যোক্ত্যা ন পৌনরুক্ত্যম্।—সিদ্ধান্ত-লক্ষণ-দীধিতি, জাগদীশী।

সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তদনুসারে এখানে বাদী 'অস্পর্শত্বাৎ' এইরূপ সাধর্ম্ম্যহেতুবাক্য প্রয়োগ করিলেও ঐ অস্পর্শত্ব পদার্থ নিত্যত্বের ব্যভিচারী, ইহা দেখাইয়াছেন। ফলকথা, ঐ স্থলে অস্পর্শত্ব পদার্থ সাধর্ম্ম্যহেতুরূপেই গৃহীত হউক, আর বৈধর্ম্ম্যহেতুরূপেই গৃহীত হউক, উহা ঐ স্থলে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারী বলিয়া উহাতে সাধ্যসাধনত্ব নাই, সুতরাং উহাতে হেতুর লক্ষণ না থাকায় উহা ঐ স্থলে অহেতু, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যকার যে সাধ্যসাধনত্বকেই হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিতেন, ইহা এখানে তাঁহার কথায় পাওয়া যায়। এবং সাধ্যের ব্যভিচারী হইলে ঐ সাধ্যসাধনত্ব থাকে না, ইহাও এখানে তাঁহার কথায় পাওয়া যায়। মহর্ষির হেতুবাক্যের লক্ষণসূত্রেও সাধ্যসাধনত্বই হেতুপদার্থের লক্ষণ, ইহা সূচিত হইয়াছে। যে যে ধর্ম্ম থাকিলে এই সাধ্যসাধনত্ব থাকে, সেই সেই ধর্ম্মগুলি চিন্তা করিয়া তাহারই উল্লেখ করতঃ পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যায় সেই সকল কথা বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলে অস্পর্শত্ব অনৈকান্তিক হইলেই সূত্রানুসারে সব্যভিচার হইতে পারে। এ জন্য ভাষ্যকার শেষে সূত্রোক্ত অনৈকান্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া নিত্যত্বের অনুমানে অস্পর্শত্ব অনৈকান্তিক, ইহাও বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, নিত্যত্ব একটি 'অন্ত', অনিত্যত্ব একটি অন্ত। এখানে 'অন্ত' শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ হেত্বাভাস প্রস্তাবে অনেকান্ত শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"একত্রান্তো নিশ্চয়ো ব্যবস্থিতির্নাস্তীতি"। সেখানে টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, অন্ত শব্দ নিশ্চয়বাচক, সুতরাং উহার দ্বারা ব্যবস্থা বা নিয়মরূপ লাক্ষণিক অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, কোন এক পক্ষে যাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম নাই, তাহাই অনেকান্ত। অনেকান্ত, অনৈকান্ত এবং অনৈকান্তিক—এই ত্রিবিধ প্রয়োগই ঐ অর্থে দেখা যায়। মহর্ষি গোতম এবং ভাষ্যকারও অনৈকান্তিক শব্দের ন্যায় অনেকান্ত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। তার্কিক-রক্ষাকার ও মল্লিনাথের ব্যাখ্যানুসারে এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত অন্ত শব্দের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, ভাষ্যকার এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্ম্মকেই অন্ত বলিয়াছেন। উদ্যোতকরও তাহাই বলিয়াছেন। অন্ত শব্দের নিশ্চয় অর্থ থাকিলেও এখানে সেই অর্থ অথবা নিয়ম অর্থ সঙ্গত হয় না। উদ্যোতকর লিখিয়াছেন,—"একস্মিন্নন্তে নিয়ত ঐকান্তিকঃ"। অর্থাৎ কোন একটিমাত্র অন্তে যাহা নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ, তাহাই ঐকান্তিক। ফলকথা, ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়কেই অন্ত বলিয়াছেন। অন্ত শব্দের 'ধর্ম্ম' অর্থ অভিধানেও পাওয়া যায়। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কে অথবা কোন পদার্থ এবং তাহার অভাবরূপ দুইটি ধর্ম্মকেই দার্শনিক ভাষায় প্রাচীনগণ অন্ত শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করিতেন। জৈন দার্শনিক দিগম্বর সম্প্রদায় অনেকান্তবাদী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা বস্তুমাত্রকেই অনেকান্ত বলিতেন। সকল পদার্থেই কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম থাকে, ইহা তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত। এ জন্য তাঁহাদিগের মত "স্যাদ্বাদ" নামেও প্রসিদ্ধ। ন্যায়দীপিকা নামক জৈন ন্যায়গ্রন্থের শেষে এই অনেকান্ত-বাদের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে

"অনেকে অন্তা ধর্ম্মাঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। সুতরাং ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে প্রাচীন কালে অন্ত বলা হইত, ইহা বুঝা যায়। প্রকৃত স্থলে ভাষ্যকারও সেই অর্থেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে অন্ত বলিয়াছেন। অস্পর্শত্ব পদার্থ নিত্য পদার্থেও আছে এবং অনিত্য পদার্থেও আছে; সুতরাং অস্পর্শত্ব নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি অন্তে অর্থাৎ দুইটি পক্ষেই আছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"উভয়ান্তব্যাপকত্বাৎ"। ঐ কথার দ্বারা উভয় অন্তের আধারেই আছে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। উভয় অন্তের সকল আধারেই আছে, ইহা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা এখানে অসম্ভব। তাৎপর্য্যটীকাকারও বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় অনৈকান্তিকের চরম ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,—'উভয়পক্ষগামী'। সুতরাং তিনিও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ পক্ষকেই অনৈকান্তিক শব্দের অন্তর্গত অন্ত শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

মূলকথা, যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মরূপ এক পক্ষেই নিয়মবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কেবল সাধ্যধর্ম্মযুক্ত স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্ম্মশূন্য কোন স্থানেই থাকে না, সেই পদার্থই সাধ্যধর্ম্মের ঐকান্তিক, তাহাই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য। যে পদার্থ ইহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা সাধ্যধর্ম্মের আধারেও থাকে, সাধ্যধর্ম্ম-শূন্য স্থানেও থাকে, তাহাই ভাষ্যকারের মতে অনৈকান্তিক, তাহাই সব্যভিচার বা ব্যভিচারী। যে পদার্থ কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্ম্মযুক্ত স্থানে থাকে না, তাহা বিরুদ্ধ। তাহাকে ভাষ্যকার সব্যভিচার বলেন নাই। মহর্ষি সূত্রেও অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি বিরুদ্ধ নামক পৃথক্ হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক নৈয়ায়িক বিরুদ্ধ হেতুকে সব্যভিচারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সব্যভিচারের কোন প্রকার-ভেদ বলেন নাই।

হেতুকে সব্যভিচার বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার নিশ্চয় হইলে, তাহাতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মিতে পারে না; সুতরাং সেখানে ঐ হেতু সাধ্যের সাধন হয় না; তাই উহাতে সেখানে সাধ্যসাধনত্বরূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় উহা হেত্বাভাস। মহর্ষি এই যুক্তি অনুসারে সব্যভিচারকে হেত্বাভাস বলায় তাঁহার মতে হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের অব্যভিচারই ব্যাপ্তি, ইহা বুঝা যায় এবং এই সূত্রের দ্বারা ঐ অব্যভিচার বা ঐকান্তিকত্বকেই তিনি ব্যাপ্তিপদার্থরূপে সূচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। মহর্ষি গোতম প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে যে হেতু-বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তিনি ব্যাপ্তি পদার্থের সূচনা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের কথা সেখানেই বলা হইয়াছে। মহর্ষি ন্যায়সূত্রে অন্যত্রও অব্যভিচার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (২অ০, ২আ০, ১৫।১৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সেখানে তাঁহার কথিত হেতুতে ব্যভিচার নাই, ব্যাপ্তিই আছে, ইহা দেখাইতেই অব্যভিচার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার "ব্যভিচারাদহেতুঃ" (৪অ০, ১আ০, ৫সূত্র) এই সূত্রের দ্বারা ব্যভিচার থাকিলে যে হেতু হয় না, ইহ স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাহা হইলে হেতুতে অব্যভিচার থাকা আবশ্যক, ইহা বুঝা যায়। ঐ অব্যভিচার পদার্থ যদি ব্যভিচারের অভাবই মহর্ষির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও উহাকেই তিনি ব্যাপ্তি বলিয়াছেন

অর্থাৎ ঐ অব্যভিচার কথার দ্বারাই তিনি ব্যাপ্তিলক্ষণ সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। ব্যভিচারের অভাবরূপ অব্যভিচারই যে ব্যাপ্তি পদার্থ, ইহা পরবর্ত্তী অনেক নৈয়ায়িকও বলিয়াছেন। যদিও গঙ্গেশ এবং তন্মতানুবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহারা ব্যাপ্তির যে নিষ্কৃষ্ট স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাই যদি মহর্ষিসূত্রোক্ত অব্যভিচার পদার্থ হয় অর্থাৎ মহর্ষি যদি তাহাকেই অব্যভিচার শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়া থাকেন, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগেরই বা আপত্তি কি ? গঙ্গেশ অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তি-লক্ষণের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন, অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তিলক্ষণেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা করা যাইবে না কেন ? মহর্ষিসূত্রোক্ত অব্যভিচার শব্দকে পারিভাষিক বলিলেও উহার ঐরূপ একটা ব্যাখ্যা করা যায়। পরন্তু গঙ্গেশ ব্যাপ্তির বহুবিধ লক্ষণ বলিলেও শেষে ব্যাপ্ত্যনুগম গ্রন্থে তাঁহার কথিত কোন এক প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই লাঘববশতঃ অনুমিতির হেতু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্যভিচারের অভাবকে অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তি না বলিলেও যাহাকে অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, মহর্ষিসূত্রোক্ত অব্যভিচার শব্দের দ্বারা তাহাও বুঝা যাইতে পারে, তাহাও সূচিত হইতে পারে। পরন্তু গঙ্গেশের মত স্বীকার না করিয়া কোন নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সাধ্যশূন্য স্থানে অবর্ত্তমানতারূপ ব্যাপ্তিকেই অর্থাৎ ব্যভিচারের অভাবরূপ ব্যাপ্তিকেই লাঘববশতঃ সর্ব্বত্র অনুমিতির প্রয়োজক বলিয়াছেন। ব্যাপ্ত্যনুগমের টীকায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং কেবলান্বয্যনুমান-দীধিতির শেষে রঘুনাথ শিরোমণি ঐ মতের উল্লেখপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি অব্যভিচার শব্দের দ্বারা ঐ মতেরও সূচনা করিতে পারেন। ফলকথা, ন্যায়সূত্রে ব্যাপ্তির কোন কথা নাই, ব্যাপ্তিবাদ নব্য নৈয়ায়িকদিগেরই উদ্‌ভাবিত, এইরূপ মত প্রকাশ নিতান্তই অজ্ঞতার ফল। যে মহর্ষি পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, হেত্বাভাস নিরূপণ করিয়াছেন, সব্যভিচার হেতু সাধ্যসাধন নহে, উহা হেত্বাভাস, অব্যভিচার হেতুই সাধ্যসাধন, ইহা বলিয়াছেন, হেতু পদার্থে সাধ্য পদার্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণ-বাক্যকে তৃতীয় অবয়বরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ব্যাপ্তি পদার্থ জানিতেন না বা মানিতেন না, অথবা ন্যায়সূত্রে তাহার কিছুমাত্র সূচনা করেন নাই, ইহার ন্যায় অদ্ভুত কথা আর কি হইতে পারে ? মহর্ষি গোতম পঞ্চমাধ্যায়ে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া বা অন্যরূপে যত প্রকার অসদুত্তর হইতে পারে, সেগুলিকে জাতি নামে পরিভাষিত করিয়া তাহাদিগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন এবং সেগুলি অসদুত্তর কেন, তাহাও সেখানে বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি ঐগুলি পড়িয়া গোতমের ব্যাপ্তিবিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে গুরু-শুশ্রূষা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। মূলকথা, বুঝিতে হইবে যে, অনুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়ই ব্যাপ্তি পদার্থ জানিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থের প্রকাশ করিতেন। যে ব্যাপ্তি অনুমানের প্রধান অঙ্গ, সুতরাং যাহা অনাদিসিদ্ধ, তাহা কি ঋষিগণের অজ্ঞাত বা অনুক্ত থাকিতে পারে ? সাংখ্যসূত্রে পঞ্চশিখাচার্য্যের ব্যাপ্তি-

বিষয়ে মতের উল্লেখ আছে। ৫অ০ । ৩২। পঞ্চশিখ অতি প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য। মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও তাঁহার নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে ব্যাপ্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাপ্তি পদার্থ তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাংখ্যগুরু কপিলও ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন। সাংখ্যের ব্যাপ্তিলক্ষণ-সূত্রে ব্যাপ্তি শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়[১]। আবার অন্য সূত্রে ব্যাপ্তি অর্থে সম্বন্ধ ও প্রতিবন্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[২]। ব্যাপ্তি শব্দ না দেখিলেই যে সেই শাস্ত্রে বা গ্রন্থে ব্যাপ্তি নাই, ব্যাপ্তি জানিতেন না বা ব্যাপ্তি বলেন নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অজ্ঞতার ফল। প্রাচীন কালে ব্যাপ্তি অর্থে অব্যভিচার, অবিনাভাব, প্রতিবন্ধ, সম্বন্ধ, সময়, নিয়ম প্রভৃতি বহু শব্দের প্রয়োগ হইত। বৌদ্ধ ন্যায় ও জৈন ন্যায়ের গ্রন্থেও ব্যাপ্তি অর্থে অনেক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ব্যাপ্তি শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও ব্যাপ্তি অর্থে অন্যান্য শব্দের ন্যায় ব্যাপ্তি শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে ব্যাপ্তি অর্থে 'সময়' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কন্দলীকার শ্রীধর উহার ব্যাখ্যায় ব্যাপ্তি-বোধক অবিনাভাব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তিনি ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব ও অব্যভিচার শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ 'অবিনাভূত' শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (প্রশস্তপাদভাষ্যে অনুমান নিরূপণ দ্রষ্টব্য)। কণাদ-সূত্রে "প্রসিদ্ধি" শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থ সূচিত হইয়াছে[৩]।

বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব বলিতেন, গঙ্গেশ প্রভৃতি ঐ অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের খণ্ডন করিলেও তাহাতে ব্যাপ্তি পদার্থ খণ্ডিত হয় নাই। ব্যাপ্তির যাহা নির্দ্দোষ লক্ষণ হইবে, তাহাকেও কেহ অবিনাভাব শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন। পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে সকলেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং প্রশস্তপাদ ও কন্দলী-কার শ্রীধর অবিনাভাবকেও ব্যাপ্তি বলিতে পারেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ব্যাপ্তি বুঝাইতেই অবিনাভাববৃত্তি অর্থাৎ অবিনাভাবসম্বন্ধ বলিয়াছেন (২।২।২ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ঐ অবিনাভাব-সম্বন্ধই ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। উহাকেই ভাষ্যকার অনুমান লক্ষণ-সূত্র (৫) ভাষ্যে বলিয়াছেন—লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ। সুতরাং ভাষ্যকার ব্যাপ্তির কোন কথা বলেন নাই, ইহাও সত্য কথা নহে। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনগণ সংক্ষেপে উহা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়া ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল সম্বন্ধ শব্দের দ্বারাও অনেক প্রাচীন আচার্য্য ব্যাপ্তি পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তাহা করিয়াছেন

১। নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ। ৫।২৯।

২। প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানং। ১।১০০।
সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং। ৫।১১।

৩। প্রসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাদপদেশস্য। ৩।১।১৪।

(২।১।৫১ সূত্রভাষ্য।) শবর-ভাষ্যে অনুমানলক্ষণে "জ্ঞাতসম্বন্ধস্য" এই কথার দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের জ্ঞানই বলা হইয়াছে। সেখানে পার্থসারথিমিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কি ? অন্য সম্প্রদায় যে সকল সম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না ; তাহা বলিলে দোষ হয়। তাই ভট্টকুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, – "সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাঽত্র লিঙ্গ-ধর্ম্মস্য লিঙ্গিনা।"—অনুমানপরিচ্ছেদ, ৪। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নোক্ত লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধও ঐ ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে। পার্থসারথিমিশ্র কুমারিলের ব্যাপ্তি পদার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—নিয়ম। বস্তুতঃ নিয়ম শব্দও ব্যাপ্তি অর্থে প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও ব্যাপ্তি শব্দের ন্যায় ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। (গঙ্গেশের ব্যাপ্তিসিদ্ধান্ত-লক্ষণ-দীধিতি দ্রষ্টব্য)। ন্যায়সূত্রেও ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম শব্দের প্রয়োগ আছে (৩।২।১১।৬৮।৭০ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সেই সকল স্থলে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

ফলকথা, ব্যাপ্তি অনুমানের প্রধান অঙ্গ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই অনুমিতি হইতে পারে না। অনুমান বুঝিতে হইলে প্রথমেই ব্যাপ্তি বুঝা আবশ্যক। সুতরাং অনুমানতত্ত্বের উপদেশক সকল আচার্য্যই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। ঋষিগণ হইতে অনুমানবাদী সকল আচার্য্যই শিষ্যদিগকে ব্যাপ্তির বিস্তৃত উপদেশ করিয়াছেন। ঋষিগণ সূত্রগ্রন্থে সংক্ষেপে তাহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। পরে ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্রমে তাহারই বিস্তৃতি হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদিগের সুচিন্তিত ও শিষ্যদিগকে উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি সুবিস্তৃত গ্রন্থের দ্বারাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং বহু বিচারের ফলে ক্রমে ঐ সকল তত্ত্বে বহু মতভেদ হইয়াছে ; তাহা অবশ্যই হইবে। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিলেও লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির চরম কারণত্ববশতঃ প্রধান অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। কেহ ঐ পরামর্শরূপ জ্ঞানবিষয় হেতুকেই অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ পরামর্শ গ্রন্থে ঐ সকল মত খণ্ডন করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমানপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানচিন্তামণির প্রথমে গঙ্গেশ লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমিতির করণ, এই কথা বলিয়াছেন। গঙ্গেশের পরগ্রন্থ দেখিয়া ঐ লিঙ্গপরামর্শ শব্দের দ্বারা লিঙ্গে অর্থাৎ হেতুতে পরামর্শ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান—এইরূপ অর্থ বুঝা হয় বটে, কিন্তু গঙ্গেশ ব্যাপ্তিজ্ঞান না বলিয়া লিঙ্গপরামর্শ শব্দ প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, তাহা চিন্তনীয়। গঙ্গেশ প্রথমে কি উদ্যোতকরের মতানুসারেই ঐ কথা বলিয়াছেন ? পরে পূর্ব্বপক্ষনিরাসক বিচারের ফলে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ? চরম কারণ করণ হইতে পারে না, এই মতই সংগত মনে করিয়াছেন ? অথবা তিনি ব্যাপ্তিজ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ শব্দের দ্বারাও উল্লেখ করিতেন ? শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই ঐ বিরোধ ভঞ্জন করা হইয়া থাকে। কিন্তু নৈয়ায়িক গ্রন্থকারগণ যে কোন কোন স্থলে মতান্তর আশ্রয় করিয়াও বিরুদ্ধবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও ত দেখা যায়। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেও তাহা পাওয়া যাইবে। টীকাকার মথুরানাথ প্রভৃতিও ত কোন কোন স্থলে "ইদঞ্চ প্রাচীনমতানুসারেণ, ইদমাপাততঃ" ইত্যাদি কথাও

লিখিয়াছেন।[১] ফলকথা, অন্য প্রকারে ঐ বিরোধ ভঞ্জন করা যায় কি না, সুধীগণ চিন্তা করিবেন। অনুমান-সূত্র-ভাষ্যে এই তাৎপর্য্যেই উহা চিন্তনীয় বলিয়াছি। সেখানে গঙ্গেশের চরম সিদ্ধান্তের অপলাপ করি নাই। এইরূপ কেহ কেহ মনকেই অনুমিতির করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরামর্শদীধিতিতে রঘুনাথ শিরোমণি ঐ মতের আপত্তি নিরাস করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, পরবর্ত্তী কালে বহু ধীমান্ ব্যক্তির বহু বিচারের ফলে অনুমান বিষয়ে ঐরূপ অবান্তর বহু মতভেদ হইলেও অনুমানাঙ্গ ব্যাপ্তি প্রভৃতি মূল পদার্থ বিষয়ে কোন বিবাদ হয় নাই। উহা সুচিরকাল হইতেই ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে। নচেৎ অনুমানতত্ত্বের আলোচনাই হইতে পারে না।

এখন প্রকৃত বিষয়ে অবশিষ্ট বক্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি। পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ এই সব্যভিচার নামক হেত্বাভাসকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। (১) "সাধারণ" সব্যভিচার, (২) "অসাধারণ" সব্যভিচার, (৩) "অনুপসংহারী" সব্যভিচার। যাঁহারা সব্যভিচারের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ সাধ্য ও সাধ্যাভাবের কোন একটি পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই ঐকান্তিক। সেই ঐকান্তিকের বিপরীত হইলেই তাহা অনৈকান্তিক, ইহাই অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং যে ভাবেই হউক, যে হেতু পূর্ব্বোক্ত কোন একটি পক্ষেই নিয়ত নহে, তাহাকে অনৈকান্তিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে যে হেতু সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে, তাহা সাধারণ অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার। কারণ, ইহা সাধ্যযুক্ত এবং সাধ্যশূন্য, এই উভয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম। বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না হইলে ঐ সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানবশতঃ ঐরূপ স্থলে সাধ্যসংশয় হয়। ভাষ্যকার এই সাধারণ সব্যভিচারেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে হেতু সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে না, কেবল সাধ্যশূন্য স্থানেই থাকে, তাহাকেও সাধারণ সব্যভিচার বলিয়াছেন। যেমন গোত্বের অনুমান করিতে অশ্বত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাও ঐ মতে সাধারণ সব্যভিচার হইবে। প্রাচীন মতে কিন্তু ইহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে।

যে হেতু সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত স্থানেও থাকে না, সাধ্যশূন্য বলিয়া নিশ্চিত কোন স্থানেও থাকে না, তাহা অসাধারণ সব্যভিচার। যেমন শব্দে নিত্যত্বের অনুমানে শব্দত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা অসাধারণ সব্যভিচার হইবে। কারণ, শব্দত্ব শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না। শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, তাহা অনুমানের পূর্ব্বে অনিশ্চিত। সুতরাং শব্দত্ব নিত্য বলিয়া নিশ্চিত আত্মাদি পদার্থে এবং অনিত্য বলিয়া নিশ্চিত ঘটাদি পদার্থে না থাকায় উহা নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বের কোন একটি পক্ষে তখন নিয়ত বলা যায় না। তাহা হইলে ঐ স্থলে শব্দত্বকে অনৈকান্তিক বলা যায়। ঐকান্তিক না হইলে তাহাকে তখন অনৈকান্তিকই বলিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দত্ব অসাধারণ অনৈকান্তিক। বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চয় না হইলে ঐ শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান ঐ স্থলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মায়। ঐ স্থলে

১। ব্যাপ্তিগ্রহোপায়মাথুরী, বিশেষব্যাপ্তি মাথুরী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

শব্দে নিত্যত্বের অনুমিতি জন্মে না। (সংশয়-সূত্র-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী অনেক নব্য নৈয়ায়িকের মতে কেবল সাধ্যযুক্ত স্থানে না থাকিলেই সেই হেতু ঐ অসাধারণ সব্যভিচার হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দত্ব নিত্যত্বরূপ সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থে না থাকায় অসাধারণ সব্যভিচার হইবে।

যে ধর্ম্ম সর্ব্বত্র থাকে, যাহার অভাবই নাই, তাহাকে কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম বলে। যে ধর্ম্মীতে অনুমান করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মী যদি কোন কেবলান্বয়ী ধর্ম্মযুক্তরূপে সেখানে ধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে সেই স্থলীয় যে কোন হেতু অনুপসংহারী নামক সব্যভিচার হইবে। যেমন কেহ বলিলেন,—সমস্তই নিত্য, যেহেতু সমস্ত পদার্থই কোন না কোন শব্দের বাচ্য। এখানে সমস্তত্বরূপ কেবলান্বয়ী ধর্ম্মযুক্তরূপে সমস্ত পদার্থই অনুমানের ধর্ম্মী হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত পদার্থেই নিত্যত্ব সাধ্যের সন্দেহ রহিয়াছে। কোন স্থানেই ঐ স্থলীয় হেতুতে নিত্যত্ব সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় না থাকায় ঐ হেতু ব্যভিচারী। যাহা সাধ্য ও তাহার অভাবরূপ কোন একটি পক্ষে নিয়মবদ্ধ নহে, তাহাই যখন অনৈকান্তিক, তখন পূর্ব্বোক্ত স্থলে সমস্ত পদার্থে নিত্যত্ব সাধনে প্রযুক্ত হেতুও অনৈকান্তিক। উহার নাম অনুপসংহারী। পরবর্ত্তী অনেক নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত কেবলান্বয়ী ধর্ম্ম সাধ্যরূপে অথবা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে সেখানে ঐ হেতু অনুপসংহারী সব্যভিচার হইবে। এই সকল বিষয়ে পরবর্ত্তিগণ ভূরি চর্চ্চা করায় অনেক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল মতের বিশদ আলোচনা দেখিতে হইলে এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মতভেদ জানিতে হইলে গঙ্গেশের তত্ত্ব-চিন্তামণি এবং রঘুনাথের দীধিতি এবং জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে কেবল প্রসিদ্ধ মতভেদগুলিই উল্লিখিত হইল। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণানুসারে কিন্তু অনৈকান্তিকের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিভাগ পাওয়া যায় না ॥ ৫ ॥

সূত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥৬॥৪৭॥

অনুবাদ। সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক, তাহা বিরুদ্ধ, (বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস)।

ভাষ্য। তং বিরুণদ্ধীতি তদ্বিরোধী। অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি। যথা—সোঽয়ং বিকারো ব্যক্তেরপৈতি নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ, ন নিত্যো বিকার উপপদ্যতে, অপেতোঽপি বিকারোঽস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ, সোঽয়ং নিত্যত্বপ্রতিষেধাদিতিহেতুর্ব্যক্তেরপেতোঽপি বিকারোঽস্তীত্যনেন স্বসিদ্ধান্তেন বিরুধ্যতে। কথম্? ব্যক্তিরাত্মলাভঃ, অপায়ঃ প্রচ্যুতিঃ, যদ্যাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতো বিকারোঽস্তি নিত্যত্বপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে,

যদ্ব্যক্তেরপেতস্যাপি বিকারস্যাস্তিত্বং তৎ খলু নিত্যত্বমিতি, নিত্যত্বপ্রতিষেধো নাম বিকারস্যাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতেরুপপত্তিঃ। যদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে তদনিত্যং দৃষ্টং, যদস্তি ন তদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে। অস্তিত্বঞ্চাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতিরিতি বিরুদ্ধাবেতৌ ধর্ম্মৌ ন সহ সম্ভবত ইতি। সোঽয়ং হেতুর্যং সিদ্ধান্তমাশ্রিত্য প্রবর্ত্ততে তমেব ব্যাহন্তীতি।

অনুবাদ। তাহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে 'তদ্বিরোধী'। বিশদার্থ এই যে, স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করে, অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক বা বাধক হয়, তাহাই বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস।

(উদাহরণ) যেমন সেই এই বিকার (সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত) ব্যক্তি হইতে (আত্মলাভ হইতে) অর্থাৎ ধর্ম্ম-পরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম হইতে প্রচ্যুত হয় অর্থাৎ চিরকাল ঐ সকল বিকার পদার্থের ঐ ত্রিবিধ পরিণাম থাকে না ; কারণ, নিত্যত্ব নাই (অর্থাৎ) বিকার নিত্য বলিয়া উপপন্ন হয় না। প্রচ্যুত হইয়াও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিকার-পদার্থ আত্মলাভ বা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও থাকে ; কারণ, বিনাশ নাই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিকার পদার্থগুলির বিনাশ না থাকায় উহারা আত্মলাভ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব থাকে। সেই এই (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে পাতঞ্জল সিদ্ধান্তবাদীর গৃহীত) নিত্যত্বের অভাবরূপ হেতু, আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার থাকে—এই নিজ সিদ্ধান্তের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতু ঐ নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হইয়াছে।

(প্রশ্নপূর্ব্বক ইহা বুঝাইতেছেন)। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? (উত্তর) ব্যক্তি বলিতে আত্মলাভ, অপায় বলিতে প্রচ্যুতি। যদি আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার থাকে, (তাহা হইলে) নিত্যত্বের নিষেধ উপপন্ন হয় না। (কারণ) আত্ম-লাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকারের যে অস্তিত্ব, তাহাই ত (তাহার) নিত্যত্ব। নিত্যত্বের নিষেধ বলিতে বিকারের আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতির উপপত্তি, অর্থাৎ আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি হওয়াই বিকারের অনিত্যত্ব। যাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যে বস্তুর আত্মলাভ হইতে ভ্রংশ ঘটে, তাহা অনিত্য বলিয়াই নিশ্চিত। যাহা থাকে অর্থাৎ [illegible] বস্তুর অস্তিত্ব চিরকালই থাকিবে, তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয় না। অস্তিত্ব এবং আত্ম-

লাভ হইতে প্রচ্যুতি, এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মিলিত হইয়া থাকে না অর্থাৎ একাধারে থাকে না। সেই এই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিত্যত্বাভাবরূপ হেতু, যে সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বিকারের অস্তিত্ব বা সদাতনত্বরূপ যে সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত) হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তকেই অর্থাৎ বিকার-পদার্থগুলির চিরকাল অস্তিত্বরূপ সেই নিত্যত্ব সিদ্ধান্তকেই ব্যাহত করিয়াছে।

টিপ্পনী। সূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত শব্দের দ্বারা এখানে প্রকৃত সিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে না। যে বাদী যাহা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন, সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে। ফলকথা, সিদ্ধান্তের স্বীকারই এখানে সূত্রকারের বিবক্ষিত। সূত্রকার এই জন্য 'সিদ্ধান্ত-বিরোধী' এই কথা না বলিয়া সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া 'তদ্বিরোধী' এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। অচেতন হেতু পদার্থ কোন সিদ্ধান্ত স্বীকারের কর্ত্তা না হইলেও, হেতুবাদী ব্যক্তি সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, সেই কর্তৃত্বই তাহার প্রযুক্ত হেতুতে বিবক্ষা করিয়া মহর্ষি ঐরূপ সূত্র বলিয়াছেন। উদ্যোতকর মহর্ষি-সূত্রের ফলিতার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াছেন যে, যাহা স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ। ঐ কথার দ্বারা যাহা স্বীকৃত পদার্থকে বাধিত করে অর্থাৎ স্বীকৃত পদার্থের অভাবেরই সাধন হয় এবং যাহা স্বীকৃত পদার্থের বিরুদ্ধ হয়, এই দুই প্রকার অর্থই উদ্যোতকরের বিবক্ষিত। তিনি বলিয়াছেন যে, এইরূপ সূত্রার্থ হইলে আরও যে সকল বিরুদ্ধ হেত্বাভাস আছে, সেগুলিও এই সূত্রের দ্বারা বলা হয়। এইরূপ সূত্রার্থ না বলিলে অনেক হেত্বাভাস বলা হয় না, তাহাতে মহর্ষির হেত্বাভাস নিরূপণের ন্যূনতা থাকে। যাহা স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে পদার্থ স্বরূপতঃই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, অথবা যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের হেতুই হয় না, অর্থাৎ যাহাতে স্বীকৃত সিদ্ধান্তরূপ সাধ্যধর্ম্মের সাধনত্বই নাই; তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে উদ্যোতকর এইরূপে ভাষ্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, তাহা হইলে আর সব্যভিচার প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ হেত্বাভাস বলিবার প্রয়োজন কি? মহর্ষি-সূত্রোক্ত বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের যে লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হইল, এই লক্ষণ সব্যভিচার প্রভৃতি সমস্ত হেত্বাভাসেই আছে; কারণ, হেত্বাভাস মাত্রেই বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্তের অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের সাধনত্ব থাকে না, ঐরূপে সকল হেত্বাভাসই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। উদ্যোতকর এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাস মাত্রই এই সূত্রোক্ত বিরুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং হেত্বাভাস মাত্রই বিরুদ্ধ, ইহা সত্য অর্থাৎ এই বিরুদ্ধত্বরূপে হেত্বাভাসগুলি একই, ইহা সত্য। কিন্তু সব্যভিচার প্রভৃতি হেত্বাভাসে যে অন্য প্রকারে ভেদ আছে, সেই ভেদ ধরিয়াই হেত্বাভাসকে পঞ্চবিধ বলা হইয়াছে। যেমন প্রমেয়ত্বরূপে সকল পদার্থ এক হইলেও অন্য প্রকারে ভেদ ধরিয়া প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ বলা হইয়াছে। ফলকথা, উদ্যোতকরের ব্যাখ্যানুসারে হেত্বাভাস মাত্রই বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ-সব্যভিচার বিরুদ্ধ-সাধ্যসম ইত্যাদি প্রকার নামে বিরুদ্ধবিশেষই সূত্রোক্ত

অনৈকান্তিক প্রভৃতি শব্দের বাচ্য। অর্থাৎ অনৈকান্তিক প্রভৃতি হেত্বাভাসে (১) বিরুদ্ধত্ব এবং অনৈকান্তিকত্ব প্রভৃতির (২) কোন একটি, এই দুই ধর্ম্মই আছে, এই জন্য ঐগুলিতে বিরুদ্ধ নামেরও ব্যবহার হইবে। কিন্তু যে সকল হেত্বাভাসে অনৈকান্তিকত্ব বা সব্যভিচারত্ব প্রভৃতি চারিটি ধর্ম্মের কোন ধর্ম্ম নাই, তাহাতে কেবল বিরুদ্ধ নামেরই ব্যবহার হইবে অর্থাৎ সেই সকল হেত্বাভাস কেবল বিরুদ্ধই হইবে। এই জন্যই পৃথক্ করিয়া মহর্ষি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দোতকর যেরূপ বলিয়াছেন, ভাষ্যকারেরও তাহাই মত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, ভাষ্যকার বাদলক্ষণসূত্রে 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই কথার প্রয়োজন বর্ণনায় মহর্ষির এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা বাদবিচারে হেত্বাভাসের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে। হেত্বাভাসমাত্রই এই সূত্রোক্ত বিরুদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত না হইলে ভাষ্যকার সেখানে এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন কেন ? (বাদসূত্র-ভাষ্য-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ।

ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে এখানে যোগসূত্র-ভাষ্যপ্রদর্শিত কোন অনুমানকে[১] আশ্রয় করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যোক্ত বিকার শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। ঐগুলি সাক্ষাৎপরম্পরায় সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত মূলপ্রকৃতির বিকৃতি। মূল প্রকৃতি কাহারও বিকৃতি নহে। মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই বিকৃতি ; এ জন্য উহাদিগকে বিকারও বলা হয়। ঐ বিকার পদার্থের যে ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণাম হয়, ভাষ্যকার ঐ ত্রিবিধ পরিণামকেই উহাদিগের "ব্যক্তি" বলিয়াছেন।

যোগসূত্র এবং তাহার ভাষ্যে বিকারের পরিণাম ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মান্তরের আবির্ভাবের নাম ধর্ম্মপরিণাম। যেমন মৃত্তিকা পিণ্ডরূপে থাকিয়া ঘটরূপে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার পিণ্ডভাবের নিবৃত্তি হইয়া ঘটভাবের আবির্ভাব হইলে ধর্ম্মপরিণাম হয়। এক লক্ষণের তিরোভাবের পরে অন্য লক্ষণের আবির্ভাব লক্ষণপরিণাম। যেমন ঘটের আবির্ভাবের পরে যে লক্ষণ থাকে, ঘটের পাক হইলে তখন ঐ লক্ষণের তিরোভাব হইয়া অন্যরূপ লক্ষণের আবির্ভাব হয়। এইরূপ কোন অবস্থাবিশেষের তিরোভাব হইয়া অন্য অবস্থার আবির্ভাব হইলে তাহাকে অবস্থাপরিণাম বলে। যেমন ঘটের নূতন অবস্থার তিরোভাব হইয়া পুরাতন অবস্থা হয় ইত্যাদি।

১। যোগসূত্রভাষ্যে এইরূপ একটি সন্দর্ভ দেখা যায়,—"তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, কস্মাৎ ? নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ, অপেতমপ্যস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ।" (যোগসূত্র, বিভূতিপাদ, ১৩ সূত্রের ভাষ্য)। উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে এখানে এই সন্দর্ভটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের উদ্ধৃত পাঠে 'কস্মাৎ' এই কথাটি নাই। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি যোগসূত্রভাষ্যের নাম করিয়া ঐ কথার উল্লেখ না করিলেও ভাষ্যকার যে যোগসূত্র-ভাষ্য-প্রদর্শিত ঐ অনুমানকেই লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যা দেখিলেও তাহাই মনে আসে।

প্রলয়কালে বিকারের এই ত্রিবিধ পরিণাম থাকে না। কারণ, তখন সমস্ত বিকার পদার্থই প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন প্রকৃতিরই কেবল সদৃশ পরিণাম থাকে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত বিকার পদার্থের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণামকেই তাহাদিগের আত্মলাভ বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্য-টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায়। ভাষ্যকার "ব্যক্তি" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—আত্মলাভ। ব্যক্তি বলিতে অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব। সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সৎকার্য্যবাদীর মতে বস্তুর আবির্ভাবই বস্তুর আত্মলাভ, অর্থাৎ স্বরূপ লাভ। এবং প্রতি ক্ষণেই জড় বস্তুর পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার পরিণাম হইতেছে। প্রলয়কালে বিকার পদার্থ প্রকৃতিতে লীন হওয়ায় তাহাদিগের কোন প্রকার পরিণাম থাকে না। তখন তাহারা সর্ব্বপ্রকার পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহার হেতু বলা হইয়াছে—নিত্যত্বের অভাব। ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে,—বিকার পদার্থ নিত্য বলিয়া উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, বিকার পদার্থগুলি যখন মূল প্রকৃতির ন্যায় নিত্য নহে, তখন চিরকালই তাহাদিগের পরিণাম থাকিতে পারে না, তাহারা যখন প্রকৃতিতে লীন হইয়া মূল প্রকৃতিরূপে থাকিবে, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার ত্রিবিধ পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু তাহারা তখন পরিণামভ্রষ্ট হইলেও অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেলেও থাকিবে। তাহাদিগের অস্তিত্ব চিরকালই আছে। ইহার হেতু বলিয়াছেন—বিনাশের অভাব অর্থাৎ বিকার-পদার্থগুলির যখন একেবারে বিনাশ নাই, তখন উহারা পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও থাকে।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত অনুমান উল্লেখ পূর্ব্বক এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যে নিত্যত্বের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বিকারের সর্ব্বকালে অস্তিত্বরূপ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হওয়ায় বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিকারের নিত্যত্ব নাই, পরে বলা হইয়াছে, বিকারের বিনাশ নাই; সুতরাং বিকার সর্ব্বদাই থাকে, এই সর্ব্বদা অস্তিত্বই বিকারের নিত্যত্ব। পূর্ব্বোক্ত নিত্যত্বাভাবরূপ হেতু, এই নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত এবং পরোক্ত ঐ দুইটি বাক্য পরস্পর বাধিত। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যেখানে দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকে, সেখানেই সেই সাধ্যধর্ম্মের অনুমানে প্রযুক্ত হেতুকে 'কালাত্যয়াপদিষ্ট' বা বাধিত বলে। যেমন ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞাস্থলে যে পদার্থ হেতুরূপে গৃহীত হইবে, তাহা কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণের সর্ব্ববিধ সুরাপানই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ থাকায় ঐ স্থলে সুরাতে ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য পান-ক্রিয়ার অভাবই নিশ্চিত আছে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে দুইটি বাক্যই পরস্পর বিরুদ্ধ এবং তুল্যবল বলিয়া একটি অপরটিকে বাধা দিতে পারে না। এ জন্য ঐ স্থলে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত নামক হেত্বাভাস হইবে না। ঐ স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসই হইবে।

উদ্যোতকর পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যান্তর বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতুবাক্যের বিরোধ হইলেই সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের এই দ্বিতীয় কল্পের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "সেই এই বিকার আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়," এই

প্রতিজ্ঞা "নিত্যত্বের অভাবজ্ঞাপক," এই হেতুবাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, পরে বলা হইয়াছে যে, বিকার আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও থাকে। যেহেতু বিকারের একেবারে বিনাশ নাই, এই শেষোক্ত কথার দ্বারা 'বিকার নিত্য' ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞার অর্থ বুঝা গিয়াছে অর্থাৎ শেষোক্ত ঐ কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞার ঐ অর্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিকারের নিত্যত্বই ঐ প্রতিজ্ঞার প্রতিপাদ্য হইলে তাহাতে নিত্যত্বাভাবরূপ হেতু থাকিতে পারে না; সুতরাং ঐ স্থলে প্রতিজ্ঞার্থ এবং হেতু পদার্থ বিরুদ্ধ হওয়ায় বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। ভাষ্যে "স্বসিদ্ধান্তেন বিরুধ্যতে" এই স্থলে স্বসিদ্ধান্ত বলিতে স্বপক্ষ। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থে ভাষ্য সুগম। অর্থাৎ উদ্দ্যোতকরের শেষোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে সহজেই ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যা হয়। এই কল্পে আপত্তি এই যে, মহর্ষি প্রতিজ্ঞা-বিরোধ নামে এক প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধই তাহার অর্থ। মহর্ষি সেই প্রতিজ্ঞা-বিরোধকেই আবার বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিবেন কিরূপে ? উদ্দ্যোতকর এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যেখানে ঐ বিরোধটি প্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া হইবে, সেখানে উহা "প্রতিজ্ঞা-বিরোধ" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর যেখানে ঐ বিরোধ হেতুকে আশ্রয় করিয়া হইবে, সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। অর্থাৎ মহর্ষি ঐ বিরোধের আশ্রয়ভেদ বিবক্ষা করিয়াই প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ হইলে নিগ্রহস্থানও বলিয়াছেন এবং হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। (৫অ০, ২আ০, ৪সূত্র দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণস্থলে যোগসূত্র-ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, বিকারের ঐকান্তিক নিত্যতা নাই এবং একেবারে যে উহাদিগের বিনাশ, তাহাও হয় না। এ জন্য উহারা সর্ব্বথা অনিত্যও নহে। সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে নিত্য পদার্থ দ্বিবিধ; কূটস্থ নিত্য এবং পরিণামী নিত্য। যে পদার্থের কোনরূপ পরিণাম নাই, যাহা চিরকাল একপ্রকারই আছে ও থাকিবে, তাহাকেই বলে কূটস্থ নিত্য, তাহাই ঐকান্তিক নিত্য; যেমন চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। আর যে পদার্থের সর্ব্বদাই কোন প্রকার পরিণাম থাকে, কোন সময়েই যাহার অন্য পদার্থে লয়ের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে বলে পরিণামী নিত্য; যেমন মূলপ্রকৃতি। মহৎ প্রভৃতি বিকার-পদার্থগুলির যখন আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে, তখন তাহাদিগকে ঐকান্তিক নিত্য বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টীকায় পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের ন্যায় জগতের ঐকান্তিক নিত্যতা নাই এবং একেবারে যে সর্ব্বদা অনিত্যতা, তাহাও নাই অর্থাৎ প্রলয়েও প্রকৃতিরূপে জগৎ থাকে, তখন জগৎ অলীক নহে। পরিণামবাদী সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি সৎকার্য্যবাদীর মতে জগতের এই ভাবে কথঞ্চিৎ নিত্যতা এবং কথঞ্চিৎ অনিত্যতা বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু মহর্ষি গোতম অসৎ-কার্য্যপক্ষই[১] গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে যাহার কোন দিন একেবারে বিনাশ হইবে না, তাহা নিত্য। যাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাকে অনিত্যও বলিব, আবার নিত্যও বলিব, ইহা গোতম মতে সম্ভব নহে। সুতরাং বিকারকে অনিত্য বলিয়া শেষে আবার

১। ৪অ০, ১আ০, ৪৮।৪৯।৫০ সূত্র দ্রষ্টব্য।

নিত্য বলিতে গেলে, উহা বিরুদ্ধবাদ হইবে। ভাষ্যকার গৌতম সিদ্ধান্তানুসারেই যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যোক্ত অনুমানের হেতুকে বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, যে ধর্ম্মীতে কোন পদার্থের অনুমান করা হয়, ঐ ধর্ম্মী সিদ্ধ পদার্থই থাকে। প্রতিজ্ঞাবাক্যে ঐ ধর্ম্মিরূপ সিদ্ধ পদার্থের অন্তে সাধ্য পদার্থটি বলা হয়, এ জন্য সাধ্যধর্ম্মকেই এই সূত্রে সিদ্ধান্ত শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিয়া (অর্থাৎ তাহার সাধনের জন্য) প্রযুক্ত হেতু যদি ঐ সাধ্যধর্ম্মের বিরোধী হয় অর্থাৎ যদি সাধ্যধর্ম্মের অভাবেরই সাধক হয়, তাহা হইলে উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন জলে বহ্নির সাধনে জলত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে এবং কোন পদার্থে গোত্ব ধর্ম্মের অনুমান করিতে অশ্বত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, ঐ জলত্ব এবং অশ্বত্ব পদার্থ বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। ফলকথা, যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সাধন না হইয়া তাহার অভাবেরই সাধন হয় অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সহিত কোন স্থানেই মিলিত হইয়া থাকে না, সেই পদার্থ সেই সাধ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া সেই স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষিত হেতু স্থলে বাদীর প্রযুক্ত হেতুই তাহার সাধ্যধর্ম্মের অভাব সাধক হয় না, প্রতিবাদীর প্রযুক্ত অন্য হেতুই বাদীর সাধ্যধর্ম্মের অভাবের সাধকরূপে প্রযুক্ত হয়, সুতরাং বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস সৎপ্রতি-পক্ষিত হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন। নব্য নৈয়ায়িকগণও পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিরুদ্ধ হেতুকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। বিরুদ্ধ হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য, তাহাকে ঐ ভাবে বুঝিলে সাধ্যাভাবেরই সেখানে অনুমিতি হইয়া পড়ে; সুতরাং বাদীর সাধ্যানুমিতির বাধা হয়, এই জন্যই নব্যগণ ঐরূপ বিরুদ্ধ হেতুকে হেত্বাভাস বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

সূত্র। যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ ॥৭॥৪৮॥

অনুবাদ। যে পদার্থ-হেতুক প্রকরণের চিন্তা জন্মে অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত একটা চিন্তা বা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সেই পদার্থ, নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত হইলে প্রকরণসম অর্থাৎ প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস হয়।

ভাষ্য। বিমর্শাধিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবুভাবনবসিতৌ প্রকরণং,—তস্য চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাঙ্‌ নির্ণয়াদ্‌যৎ সমীক্ষণং, সা জিজ্ঞাসা যৎকৃতা, স নির্ণয়ার্থং প্রযুক্ত উভয়পক্ষসাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্ত্তমানঃ প্রকরণসমো নির্ণয়ায় ন প্রকল্পতে। প্রজ্ঞাপনন্ত্বনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানু-পলব্ধেরিত্যনুপলভ্যমাননিত্যধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং স্থাল্যাদি। যত্র সমানো

ধর্ম্মঃ সংশয়কারণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে স সংশয়সমঃ সব্যভিচার এব। যাতু বিমর্শস্য বিশেষাপেক্ষিতা উভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিশ্চ, সা প্রকরণং প্রবর্ত্তয়তি। যথা শব্দে নিত্যধর্ম্মো নোপলভ্যতে, এবমনিত্যধর্ম্মোঽপি, সেয়মুভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং প্রবর্ত্তয়তি। কথম্? বিপর্য্যয়ে হি প্রকরণনিবৃত্তেঃ, যদি নিত্যধর্ম্মঃ শব্দে গৃহ্যেত, ন স্যাৎ প্রকরণং, যদি বা অনিত্যধর্ম্মো গৃহ্যেত, এবমপি নিবর্ত্তেত প্রকরণং,— সোঽয়ং হেতুরুভৌ পক্ষৌ প্রবর্ত্তয়ন্নন্যতরস্য নির্ণয়ায় ন প্রকল্পতে।

অনুবাদ। সংশয়ের বিষয় অথচ অনির্ণীত, এমন পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ উভয় ধর্ম্মকে প্রকরণ বলে। সেই প্রকরণের চিন্তা কি না সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত যে আলোচনা, সেই জিজ্ঞাসা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চিন্তারূপ জিজ্ঞাসা যৎকৃত, অর্থাৎ যে পদার্থপ্রযুক্ত, সেই পদার্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইলে উভয় পক্ষে সমানতাবশতঃ প্রকরণকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অতিক্রম না করায় প্রকরণসম হইয়া নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না।

প্রজ্ঞাপন কিন্তু অর্থাৎ এই প্রকরণসমের উদাহণ কিন্তু—(প্রতিজ্ঞা) শব্দ অনিত্য, (হেতু) নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি জ্ঞাপক, (উদাহরণ) যাহাতে নিত্যধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, এমন স্থালী প্রভৃতি অনিত্য দেখা যায় (অর্থাৎ এইরূপ স্থাপনায় যে নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস)। যে স্থলে সমান ধর্ম্মরূপ সংশয়ের প্রযোজক (পদার্থটি) হেতু বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা অর্থাৎ হেতু বলিয়া গৃহীত সেই সমানধর্ম্ম সংশয়সম হওয়ায় সব্যভিচারই হইবে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণসম হইবে না। যাহা কিন্তু সংশয়ের বিশেষাপেক্ষিতা এবং উভয় পক্ষে বিশেষেম অনুপলব্ধি, তাহা প্রকরণকে প্রবৃত্ত করে। বিশদার্থ এই যে, যেমন শব্দে নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হইতেছে না, এইরূপ অনিত্য ধর্ম্মও উপলব্ধ হইতেছে না, সেই এই উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি, প্রকরণ-চিন্তাকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সম্বন্ধে আলোচনারূপ জিজ্ঞাসাকে প্রবৃত্ত করে, (উপস্থিত করে)। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি প্রকরণচিন্তার প্রবর্ত্তক হয় কেন? (উত্তর) যেহেতু বিপর্য্যয় হইলে প্রকরণের নিবৃত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যদি নিত্যধর্ম্ম শব্দে উপলব্ধ হইত, তাহা হইলে প্রকরণ অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষ

থাকিত না। অথবা যদি শব্দে অনিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হইত, এইরূপ হইলেও প্রকরণ নিবৃত্ত হইত। সেই এই হেতু অর্থাৎ শব্দে নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি এবং অনিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি উভয় পক্ষকে অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে প্রবৃত্ত করতঃ অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, কি নিত্য, এইরূপ একটা চিন্তা বা জিজ্ঞাসা উপস্থিত করে বলিয়া একতরের অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব অথবা নিত্যত্বের নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না।

টিপ্পনী। এইবার ক্রমানুসারে প্রকরণসম নামক হেত্বাভাসের নিরূপণ করিয়াছেন। প্রকরণ শব্দের অর্থ এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। শব্দে নিত্যত্বের সংশয় হইলে নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে। যিনি নিত্যত্ব সাধন করিতে যান, তাঁহার সম্বন্ধে নিত্যত্ব পক্ষ, অনিত্যত্ব প্রতিপক্ষ। আবার বিপরীতক্রমে অনিত্যত্ব পক্ষ, নিত্যত্ব প্রতিপক্ষ। বাদীর ভেদে আবার দুইটিই পক্ষ, সুতরাং ঐ দুইটিকে পক্ষ শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ফলকথা, (প্রক্রিয়তে সাধ্যত্বেনাবিক্রিয়তে) যাহা সাধ্যরূপে প্রকৃত বা অধিকৃত হয়, তাহাই এখানে প্রকরণ। কেহ শব্দে নিত্যত্বকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ অনিত্যত্বকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সেখানে ঐ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রকরণ। উহা বিমর্শের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় হইয়া যে পর্য্যন্ত 'অনবসিত' অর্থাৎ অনির্ণীত, সে পর্য্যন্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। সংশয়ের পরে একতর নির্ণয় হইয়া গেলে তখন আর ঐ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে না। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা নির্ণীত ধর্ম্মকে বুঝায় না। বাদী ও প্রতিবাদীর নির্ণয় থাকিলেও মধ্যস্থের সংশয় হওয়ায় ঐ দুইটি ধর্ম্ম সংশয়ের বিষয় হয়। বাদবিচারে মধ্যস্থ না থাকিলেও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিবার জন্য একটা সংশয় করিয়া লইতে হয়। নির্ণয় মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক না হইলেও বিচার সংশয়পূর্ব্বক, এ জন্য মহর্ষি সর্ব্বাগ্রে সংশয়ের পরীক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে এ কথা পরিস্ফুট হইবে। সূত্রের প্রকরণ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার শেষে চিন্তা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকণের যে আলোচনা, তাহাই প্রকরণচিন্তা। ভাষ্যোক্ত সমীক্ষণ শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন, আলোচন'; আবার তাহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—জিজ্ঞাসা। ভাষ্যকারও শেষে জিজ্ঞাসা বলিয়াই সূত্রোক্ত চিন্তার বিবৃতি করিয়াছেন। এই জিজ্ঞাসা কিসের জন্য হয়? তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন—তত্ত্বের অনুপলব্ধিবশতঃ হয়। শব্দে নিত্য-ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলে নিত্যত্বের নিশ্চয় হইয়া যায় এবং অনিত্য-ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলে অনিত্যত্বের নিশ্চয় হইয়া যায়। কিন্তু যদি নিত্যধর্ম্মেরও উপলব্ধি না হয় এবং অনিত্যধর্ম্মেরও উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় হয়; সুতরাং শব্দের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়,—ইহাই এই স্থলে প্রকরণচিন্তা। নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধিবশতঃ এবং অনিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধিবশতঃই ঐ জিজ্ঞাসা জন্মে; সুতরাং শব্দে অনিত্যত্বানুমানে ঐ নিত্য-

ধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস হইবে। উহা উভয় পক্ষেই সমান বলিয়া নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ কোন প্রকরণকে অতিক্রম করে না। এ জন্য প্রকরণসম নামে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণ যেমন নিশ্চায়ক নহে, তদ্রূপ উভয় পক্ষের বিশেষের অনুপলব্ধিও নিশ্চায়ক নহে। এ জন্য ঐ বিশেষানুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহাকে প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস বলা হইয়াছে। যাহা প্রকরণের তুল্য, তাহাকে প্রকরণসম বলা যায়।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ইহা প্রকরণসম শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র। কারণ, উভয় পক্ষে সমান বলিয়া সংশয়ের প্রয়োজক হইলেই যদি তাহা প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস হয়, তাহা হইলে সব্যভিচার নামক হেত্বাভাসও প্রকরণসম হইয়া পড়ে। তবে প্রকরণসম শব্দের প্রকৃতার্থ কি? তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সৎপ্রতিপক্ষ হেতুকেই প্রকরণসম বলে। পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ এই প্রকরণসমকে সৎপ্রতিপক্ষ এবং সৎপ্রতিপক্ষিত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যে হেতুর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী অন্য হেতু সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বাদী তাঁহার সাধ্যসাধনের জন্য যে হেতুকে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যের অভাব সাধনের জন্য যদি অন্য কোন হেতু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ হেতুদ্বয়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ; এই জন্য ঐ দুই হেতুকেই সৎপ্রতিপক্ষ বলা হয়। কিন্তু যদি ঐ দুইটি হেতুর কোন হেতু দুর্ব্বল হয় অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী যদি কোন হেতুর অন্যরূপ দোষ দেখাইতে পারেন, অথবা অন্যরূপ দোষের সংশয়ও জন্মাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই হেতু, অপর প্রবল হেতুটির প্রতিপক্ষ না হওয়ায়, সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ হইবে না। যেখানে উভয় পক্ষের দুইটি বিরুদ্ধ হেতুই তুল্যবল বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না, কেবল সাধ্য ও তাহার অভাব বিষয়ে সংশয়ই জন্মায়, সেখানেই ঐ দুই হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ হয়। এই সৎপ্রতিপক্ষের উদাহরণ নব্যগণ যেরূপ[১] বলিয়াছেন, ভাষ্যকার-প্রদর্শিত উদাহরণ তাহা হইতে বিশিষ্ট। ভাষ্যকার "প্রজ্ঞাপনন্ত" এই স্থলে তু শব্দের দ্বারা বৌদ্ধাদি-সম্মত উদাহরণ সংগত নহে, ইহা সূচনা করিয়াছেন। যাহার দ্বারা প্রজ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া হয়, এই অর্থে প্রজ্ঞাপন শব্দের দ্বারা এখানে উদাহরণ বুঝিতে হইবে। শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তখন প্রতিবাদী যদি শব্দে নিত্যত্বের অনুমান করিতে অনিত্য-ধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষের ঐ দুই হেতুই প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ হইবে (বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে যে কোন পদার্থ প্রকরণসম হইতে পারে না। উভয় পক্ষের বিশেষ ধর্ম্মের অনুপলব্ধিই হেতুরূপে গৃহীত হইলে তাহাই সূত্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার প্রবর্ত্তক বা নিষ্পাদক হওয়ায় প্রকরণসম বা সৎ-

---

১। বাদী বলিলেন,—"শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ"। প্রতিবাদী বলিলেন,—"শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ"। এইরূপ স্থলে সৎপ্রতিপক্ষের উদাহরণ বুঝা যাইতে পারে।

প্রতিপক্ষ হইবে। অন্য কোন পদার্থ হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সূত্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার প্রবর্ত্তক হয় না, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বোক্ত অনৈকান্তিক হইতে এই প্রকরণসমের ভেদ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যেখানে কোন সমান ধর্ম্ম সংশয়ের প্রয়োজক হয় এবং তাহাকেই হেতুরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা সব্যভিচারই হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, এখানে নিত্য-ধর্ম্মের অনুপলব্ধি, উভয়বাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থে নাই এবং অনিত্য-ধর্ম্মের অনুপলব্ধিও উভয়বাদিসিদ্ধ অনিত্য পদার্থে নাই, সুতরাং ঐ নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি এবং অনিত্য-ধর্ম্মের অনুপলব্ধি, হেতুরূপে গৃহীত হইলে সব্যভিচার হইতে পারে না। ঐ দুইটি পরস্পর সৎপ্রতিপক্ষ হওয়াতেই প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস হইবে। বস্তুতঃ যাহা উভয়বাদিসম্মত নিত্য পদার্থেও আছে এবং ঐরূপ অনিত্য পদার্থেও আছে, এমন পদার্থই নিত্যত্বের অনুমানে সব্যভিচার হইবে। মহর্ষি-কথিত সব্যভিচার-লক্ষণ ঐ স্থলে ঐরূপ পদার্থেই থাকে। যেমন শব্দে নিত্যত্বানুমানে অস্পর্শত্ব। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা নব্যসম্মত অসাধারণ ও অনুপসংহারীকে তিনি সব্যভিচার বলেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রাচীন মতে এই সৎপ্রতিপক্ষতা অনিত্য দোষ। অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কোন পক্ষের লিঙ্গ-পরামর্শের কোন অংশে ভ্রমত্ব নিশ্চয় না হইবে, সেই পর্য্যন্তই উভয় পক্ষের গৃহীত বিরুদ্ধ হেতুদ্বয় সৎপ্রতিপক্ষ থাকিবে। একই আধারে নিত্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্ম এবং অনিত্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্ম বস্তুতঃ কিছুতেই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঐরূপ ভাবে ঐ স্থলে উভয়বাদীর লিঙ্গপরামর্শ-দ্বয়ের কোন একটিকে কোন অংশে নিশ্চয়ই ভ্রম বলিতে হইবে। যে সময়ে সেই ভ্রমত্ব নিশ্চয় হইবে, তখন আর সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ হইবে না। এই ভাবে প্রাচীন মতে নির্দ্দোষ হেতুস্থলেও বিরুদ্ধ হেতুর ভ্রম পরামর্শ হইলে ঐ ভ্রমত্ব নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত সৎপ্রতিপক্ষ হইবে। তত্ত্ব-চিন্তামণিকার হেত্বাভাস সামান্য-লক্ষণ ব্যাখ্যা-প্রস্তাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও সৎপ্রতিপক্ষতার অনিত্য-দোষত্বই বুঝা যায়। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ হেতুর দোষমাত্রকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করায় তিনি গঙ্গেশের গ্রন্থের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রঘুনাথ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িক-গণের মতে যে ধর্ম্মীতে কোন সাধ্যের সাধন করিতে বাদী কোন একটি হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্য ধর্ম্ম যদি বস্তুতঃ থাকে, সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ হয়। যেমন জলে বহ্নির অভাবের ব্যাপ্য জলত্ব-ধর্ম্ম থাকায় জলে বহ্নির অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ হয়। এইরূপ দোষ নিত্যদোষ। কারণ, বহ্নির অভাবের ব্যাপ্যধর্ম্মটি জলে সর্ব্বদাই আছে। রত্ন-কোষকার সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় পক্ষেই সংশয়াকার অনুমিতি জন্মে, এই মত বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। গঙ্গেশ ঐ মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ॥৭॥

সূত্র। সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ ॥৮॥৪৯॥

অনুবাদ। সাধ্যত্ববশতঃ অর্থাৎ অসিদ্ধত্ব নিবন্ধন সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট

পদার্থ সাধ্যসম (সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস) অর্থাৎ যে পদার্থ অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য পদার্থের সদৃশ, তাহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস হয়।

ভাষ্য। দ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমত্ত্বাদিতিহেতুঃ সাধ্যেনাবিশিষ্টঃ সাধনীয়ত্বাৎ সাধ্যসমঃ। অয়মপ্যসিদ্ধত্বাৎ সাধ্যবৎ প্রজ্ঞাপয়িতব্যঃ, সাধ্যং তাবদেতৎ—কিং পুরুষবচ্ছায়াঽপি গচ্ছতি? আহো স্বিদাবরকদ্রব্যে সংসর্পতি আবরণসন্তানাদসন্নিধিসন্তানোঽয়ং তেজসো গৃহ্যত ইতি। সর্পতা খলু দ্রব্যেণ যো যস্তেজোভাগ আব্রিয়তে তস্য তস্যাসন্নিধিরেবাবিচ্ছিন্নো গৃহ্যত ইতি, আবরণন্তু প্রাপ্তিপ্রতিষেধঃ।

অনুবাদ। ছায়া দ্রব্য, ইহা সাধ্য অর্থাৎ ছায়ার দ্রব্যত্ব অথবা দ্রব্যত্ববিশিষ্ট ছায়া মীমাংসকদিগের সাধ্য। 'গতিমত্ত্বাৎ' এই বাক্য-প্রতিপাদ্য হেতু অর্থাৎ ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধনে মীমাংসকদিগের গৃহীত গতিমত্ত্ব বা গমনক্রিয়ারূপ হেতু সাধনীয়ত্ব-বশতঃ অর্থাৎ ছায়াতে ঐ গতিমত্ত্ব অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সাধ্যসম অর্থাৎ সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। (সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট কেন, তাহা বলিতেছেন) ইহাও অর্থাৎ হেতুরূপে গৃহীত গতিমত্ত্ব বা গমনক্রিয়াও অসিদ্ধত্ববশতঃ অর্থাৎ ছায়াতে সিদ্ধ নয় বলিয়া সাধ্যের ন্যায় অর্থাৎ ছায়াতে দ্রব্যত্বের ন্যায় প্রজ্ঞাপনীয় (সাধনীয়)। (ছায়াতে গতিক্রিয়া অসিদ্ধ কেন, তাহা বলিতেছেন) ইহা সাধ্য অর্থাৎ ইহা সাধন করিতে হইবে, পুরুষের ন্যায় ছায়াও কি গমন করে? অথবা আবরক দ্রব্য গমন করিতে থাকিলে অর্থাৎ আলোকের আচ্ছাদক পুরুষ যখন গমন করে, তখন আবরণের সমষ্টিবশতঃ ইহা আলোকের অসন্নিধির সমষ্টি অর্থাৎ আলোকসন্নিধানের অভাব-সমষ্টি উপলব্ধ হয়। বিশদার্থ এই যে, গমন করিতেছে যে দ্রব্য, তৎকর্তৃক অর্থাৎ গমনবিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক যে যে আলোকাংশ আবৃত হয়, সেই সেই আলোকাংশের অবিচ্ছিন্ন অসন্নিধানই উপলব্ধ হয়। আবরণ কিন্তু প্রাপ্তির অভাব অর্থাৎ আলোকের সম্বন্ধের অভাবই আলোকের আবরণ।

টিপ্পনী। সূত্রে সাধ্যাবিশিষ্ট এই কথার দ্বারা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ সূচনা হইয়াছে। ইহাকেই পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ অসিদ্ধ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা সাধ্যের ন্যায় সিদ্ধ পদার্থ নহে অর্থাৎ অসিদ্ধ, তাহাকে সাধ্য সাধনের জন্য হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সাধ্যসম নামক অথবা অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে,

এই অসিদ্ধ (১) স্বরূপাসিদ্ধ, (২) একদেশাসিদ্ধ, (৩) আশ্রয়াসিদ্ধ এবং (৪) অন্যথাসিদ্ধ—এই চারি প্রকারে হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার অসিদ্ধই অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট। সুতরাং সাধ্যাবিশিষ্ট, এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার অসিদ্ধই সংগৃহীত হইয়াছে। এবং অসিদ্ধ শব্দের দ্বারা লক্ষণ না বলিয়া সাধ্যাবিশিষ্ট শব্দের দ্বারা লক্ষণ বলার উদ্দেশ্য এই যে, অত্যন্ত অসিদ্ধই যে কেবল সাধ্যসম, তাহা নহে, যাহা কোন বাদীর সিদ্ধ, কিন্তু প্রতিবাদীর তাহা অসিদ্ধ, সুতরাং সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় ঐ পদার্থও হেতুরূপে গৃহীত হইলে সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস হইবে। কিন্তু বাদী ঐ পদার্থের সাধন করিতে পারিলে তখন আর তাহা সাধ্যসম হইবে না। কারণ, তখন ঐ পদার্থ উভয় মতেই সিদ্ধ হওয়ায় সাধ্য হইতে বিশিষ্ট হইয়া যায়। তখন সে পদার্থে সাধ্যত্ব থাকে না। সূত্রে "সাধ্যত্বাৎ" এই স্থলে সাধ্যত্ব শব্দের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে—অসিদ্ধতা। অসিদ্ধ পদার্থই সাধ্য হইয়া থাকে, সিদ্ধ পদার্থে সাধ্যতা থাকে না, সাধ্য পদার্থেও সিদ্ধতা থাকে না, সুতরাং সূত্রোক্ত সাধ্যত্ব শব্দের দ্বারা অসিদ্ধতাই ফলিতার্থ বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে অত্যন্ত অসিদ্ধ পদার্থও অসিদ্ধতাবশতঃ সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সাধ্যসম হইতে পারিবে। কোন পদার্থের সর্ব্বদা অসিদ্ধতা আছে, কোন পদার্থের সাময়িক অসিদ্ধতা আছে; কিন্তু অসিদ্ধত্বরূপে সর্ব্বপ্রকার অসিদ্ধই সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার অসিদ্ধই সাধ্যসম হইতে পারিবে অর্থাৎ সূত্রোক্ত এই সাধ্যসমের লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যেই আছে। তবে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ না থাকিলে তাহা কোন বিশেষ হেত্বাভাসও হইবে না। কারণ, বিশেষ লক্ষণ সামান্য লক্ষণ-সাপেক্ষ।

ভাষ্যকার এই সাধ্যসমের উদাহরণ প্রদর্শনের সহিতই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। মীমাংসক সম্প্রদায় ছায়া বা অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধনে তাঁহারা গতিমত্ব বা গমন-ক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, কোন মনুষ্য গমন করিতে থাকিলে তখন তাহার পাছে পাছে ছায়াও গমন করে, ইহা দেখা যায়; সুতরাং ছায়া বা অন্ধকারে গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। গতিক্রিয়া থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্থই হয়, দ্রব্য ভিন্ন আর কোন পদার্থে গতিক্রিয়া থাকে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বিশেষতঃ নৈয়ায়িকগণের ইহা সমর্থিত সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে ঐ গতিক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন করা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ছায়া বা অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ নহে, উহা কতকগুলি আলোকের অভাববিশেষ। গতিক্রিয়া থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্থই হয় বটে, কিন্তু ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ নহে। ভাষ্যে "সাধনীয়ত্বাৎ" এই কথাটি সূত্রের "সাধ্যত্বাৎ" এই কথার ব্যাখ্যা নহে। ছায়াতে গতিক্রিয়া সাধনীয় অর্থাৎ অসিদ্ধ, ইহাই ঐ কথার দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মীমাংসকের গৃহীত গতিক্রিয়ারূপ হেতুকে ছায়াতে অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ছায়াতে দ্রব্যত্বরূপ সাধ্য পদার্থকে অথবা দ্রব্যত্বরূপে ছায়াকে মীমাংসক যেমন সাধন করিবেন, তদ্রূপ ছায়াতে গতিক্রিয়াও সাধন করিতে হইবে। ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ না হইলে

উহা হেতু হইতে পারে না, উহাতে হেতুর লক্ষণ থাকে না, সুতরাং ঐ স্থলে উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস।

ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ নয় কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য চলিয়া যাইতে থাকিলে তখন সেই মনুষ্যের ন্যায় ছায়াও গমন করে কি না, ইহা সাধ্য ; ছায়া পুরুষের ন্যায় তাহার পাছে পাছে গমন করে, ইহা সাধন করিতে হইবে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কারণ, আমরা উহা স্বীকার করি না। কারণ, কোন মনুষ্য গমন করিতে থাকিলে সেই স্থানীয় যে সকল তৈজসিক অংশ ঐ মনুষ্য কর্তৃক আবৃত হয়, সেই সকল তৈজসিক অংশের অর্থাৎ আলোকের অভাবগুলিই ঐ স্থানে অবিচ্ছিন্নরূপে অনুভূত হয়, ইহা বলিতে পারি। যে স্থানের সহিত ঐ তৈজসিক অংশগুলির বা আলোকগুলির প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইত, সেই স্থান দিয়া মনুষ্য গমন করে বলিয়া সেই স্থানে সেই আলোকগুলির সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই সেখানে আলোকের আবরণ। ফলতঃ উহা সেখানে কতকগুলি আলোক-সম্বন্ধের অভাব। ঐ সম্বন্ধের অভাববশতঃই সেখানে কতকগুলি আলোকের অভাবই অনুভূত হয় অর্থাৎ কতকগুলি আলোকের অবিচ্ছিন্ন অভাবসমষ্টিই ছায়া বা অন্ধকার, উহা ভাব পদার্থ নহে। তাহা হইলে উহাতে গতিক্রিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব পদার্থে গতিক্রিয়া সর্ব্বমতেই অসিদ্ধ। সুতরাং ছায়া বা অন্ধকারের গতিক্রিয়া অসিদ্ধ বলিয়া উহা পূর্ব্বোক্ত স্থলে হেতু হয় না, উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। (বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যে সন্তান শব্দের অর্থ সমষ্টি। আবরণ শব্দের অর্থ সম্বন্ধের অভাব। গমনকারী ব্যক্তি কর্তৃক আবৃত আলোকসমূহের যতগুলি সম্বন্ধাভাব, তৎপ্রযুক্ত ঐ আলোকগুলির অভাবসমূহ অনুভূত হয়। ঐ আলোকসমূহের অসন্নিধি বা অভাব অবিচ্ছিন্নভাবে অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে স্থান পর্য্যন্ত ছায়া দেখা যায়, সেই স্থানের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্ত প্রকার আলোকের অসন্নিধি বা অভাব অনুভূত হয়, ইহাই ভাষ্যকারের গ্রন্থার্থ।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার-প্রদর্শিত সাধ্যসমের উদাহরণটি স্বরূপাসিদ্ধ, আশ্রয়াসিদ্ধ এবং অন্যথাসিদ্ধের সাধারণ উদাহরণ, উদ্দ্যোতকর তাহা বুঝাইয়াছেন। যেমন ছায়াতে দ্রব্যত্ব সাধ্য, তদ্রূপ গতিক্রিয়াও সাধ্য অর্থাৎ ছায়াতে গতিক্রিয়া স্বরূপতঃই অসিদ্ধ, তাই উহা স্বরূপাসিদ্ধ সাধ্যসম। মীমাংসক যদি বলেন যে, ছায়াকে যখন দেশান্তরে দেখি, তখন তাহার গতিক্রিয়া আছে, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের অন্যত্র দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না,—এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও ঐ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। কারণ, ছায়া দ্রব্য হইলেই তাহার দেশান্তরে দর্শন বলা যাইতে পারে। ছায়ার দ্রব্যত্ব যখন সিদ্ধ হয় নাই, তখন ঐ কথা বলা যাইতে পারে না। যিনি ছায়াকে দ্রব্যরূপে মানিয়া লইয়া তাহার দেশান্তর-দর্শনের দ্বারা তাহার গতিক্রিয়ার অনুমান করিবেন, তাঁহার পক্ষে ঐ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। কারণ, দ্রব্যরূপ ছায়া সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া দেশান্তরে দর্শনকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে ঐ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ হইবে। আর যদি ছায়ার দেশান্তরে দর্শন স্বীকারই করা যায়,

তাহা হইলেও ঐ দেশান্তরে দর্শনরূপ হেতু অন্যথাসিদ্ধ। কারণ, ছায়াকে আলোকবিশেষের অভাববিশেষ বলিলেও তাহার দেশান্তরে দর্শন হইতে পারে। যাহা অন্য প্রকারেও অর্থাৎ ছায়া দ্রব্য না হইলেও সিদ্ধ হইতে পারে, সেই দেশান্তরে দর্শন হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছায়াতে গতিক্রিয়ার অনুমান করা যায় না। ঐ হেতু ঐ স্থলে অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসম বা অসিদ্ধকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার যে একদেশাসিদ্ধ নামেও এক প্রকার অসিদ্ধ বলিয়াছেন, উদ্যোতকরের মতে তাহা স্বরূপাসিদ্ধের অন্তর্গত।

নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সাধ্যসমের নাম বলিয়াছেন "অসিদ্ধ"। এবং আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ—এই নামত্রয়ে ঐ অসিদ্ধকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করিতে হেতু প্রয়োগ হইবে, ঐ ধর্ম্মীকে আশ্রয় বলে। নব্যগণ ঐ ধর্ম্মীকে পক্ষ বলিয়াছেন এবং আশ্রয়ও বলিয়াছেন। ঐ আশ্রয় অসিদ্ধ হইলে ঐ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। যেমন আকাশ-কুসুমে কেহ গন্ধের অনুমান করিতে গেলে তাহার প্রযুক্ত হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ এবং স্বর্ণময় আকাশ শব্দের কারণ, এইরূপে কেহ অনুমান করিতে গেলে আকাশে স্বর্ণময়ত্বরূপ বিশেষণ না থাকায় ঐ আশ্রয় অসিদ্ধ। সুতরাং ঐ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই আশ্রয়াসিদ্ধ। যে হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হইবে, ঐ হেতু পদার্থ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মী বা পক্ষে না থাকিলে তাহা স্বরূপা-সিদ্ধ। যেমন জলে বহ্নির অনুমানে ধূমকে হেতু বলিলে এবং শব্দে নিত্যত্বের অনুমানে চাক্ষুষত্বকে হেতু বলিলে ঐ ধূম জলে না থাকায় এবং চাক্ষুষত্ব শব্দে না থাকায় উহা স্বরূপাসিদ্ধ হইবে। কোন স্থলে হেতু পদার্থ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মীতে সন্দিগ্ধ হইলেও তাহা স্বরূপাসিদ্ধ হইবে। তাহাকে বলে সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। যেখানে সাধ্য পদার্থ অথবা হেতু পদার্থ অপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মে প্রযুক্ত বিশেষণটি সাধ্যধর্ম্মে নাই অথবা হেতু পদার্থে প্রযুক্ত বিশেষণটি হেতু পদার্থে নাই, সেখানে ঐ হেতুর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যেমন পর্ব্বতে স্বর্ণময় বহ্নির অনুমান করিতে গেলে স্বর্ণময়ত্ব বিশেষণটি বহ্নিতে না থাকায় ঐ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইবে। এবং পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে স্বর্ণময় ধূমকে হেতু বলিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইবে। এবং পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে নীল ধূমকে হেতু বলিলেও অনেকের মতে ঐ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইবে। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে ধূম হেতুতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ। কেবল ধূমকে সম্বন্ধবিশেষে হেতু বলিলেই চলিতে পারে। পরন্তু ধূমত্বরূপেই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, ধূমে ব্যর্থ বিশেষণের প্রয়োগ করিলে সেইরূপে তাহাতে ব্যাপ্যত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় ঐরূপ স্থলে ঐ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইবে। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ইহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, হেতু পদার্থে কোন ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে হেতুর কোন দোষ হইতে পারে না। সেইরূপ স্থলে হেতুবাদী ব্যক্তিরই দোষ হইবে। ঐরূপ হেতু-বাদীই "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান-প্রযুক্ত সেখানে নিগৃহীত হইবেন। ফলকথা, বহ্নির অনুমানে নীল ধূমকে হেতু বলিলে ব্যর্থ বিশেষণ প্রযুক্ত উহা কোন হেত্বাভাস হইবে না, ইহাই রঘুনাথের

সিদ্ধান্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ নব্য মতানুসারে সূত্র-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু যদি কোন অংশে কোন প্রকারে অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, ইহাই সূত্রার্থ। সূত্রে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্ম—এই কথাটির অধ্যাহার না করিলে সূত্রের দ্বারা কেবল স্বরূপাসিদ্ধেরই লক্ষণ পাওয়া যায়, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা ॥ ৮ ॥

সূত্র। কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ॥৯॥৫০॥

অনুবাদ। যে পদার্থ কালাত্যয়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব নির্ণয় হওয়ায় সাধ্য সংশয়ের কাল অতীত হইলে যাহা ঐ সাধ্যসাধনের জন্য হেতুরূপে গৃহীত, সেই পদার্থ কালাতীত (কালাতীত নামক হেত্বাভাস)।

ভাষ্য। কালাত্যয়েন যুক্তো যস্যার্থৈকদেশোঽপদিশ্যমানস্য স কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীত উচ্যতে। নিদর্শনম্—নিত্যঃ শব্দঃ সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ রূপবৎ, প্রাগূর্দ্ধঞ্চ ব্যক্তেরবস্থিতং রূপং প্রদীপ-ঘটসংযোগেন ব্যজ্যতে, তথা চ শব্দোঽপ্যবস্থিতো ভেরী-দণ্ডসংযোগেন ব্যজ্যতে দারুপরশুসংযোগেন বা, তস্মাৎ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইত্যয়মহেতুঃ কালাত্যয়াপদেশাৎ। ব্যঞ্জকস্য সংযোগস্য কালং ন ব্যঙ্গ্যস্য রূপস্য ব্যক্তি-রত্যেতি। সতি প্রদীপসংযোগে রূপস্য গ্রহণং ভবতি, নিবৃত্তে সংযোগে রূপং ন গৃহ্যতে নিবৃত্তে দারুপরশুসংযোগে দূরস্থেন শব্দঃ শ্রূয়তে বিভাগ-কালে, সেয়ং শব্দস্য ব্যক্তিঃ সংযোগকালমত্যেতীতি ন সংযোগনির্ম্মিতা ভবতি। কস্মাৎ? কারণাভাবাদ্ধি কার্য্যাভাব ইতি। এবমুদাহরণসাধর্ম্ম্য-স্যাভাবাদসাধনময়ং হেতুর্হেত্বাভাস ইতি।

অবয়ববিপর্য্যাস-বচনন্তু ন সূত্রার্থঃ। কস্মাৎ? "যস্য যেনার্থসম্বন্ধো দূরস্থস্যাপি তস্য সঃ। অর্থতো হ্যসমর্থানামানন্তর্য্যমকারণং" ইত্যেতদ্-বচনাদ্‌বিপর্য্যাসেনোক্তো হেতুরুদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুলক্ষণং ন জহাতি, অজহদ্ধেতুলক্ষণং ন হেত্বাভাসো ভবতীতি। অবয়ব-বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালমিতি নিগ্রহস্থানমুক্তং, তদেবেদং পুন-রুচ্যত ইতি অতস্তন্ন সূত্রার্থঃ।

অনুবাদ। অপদিশ্যমান অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুজ্যমান যে পদার্থের অর্থৈক-দেশ অর্থাৎ হেতু পদার্থের বিশেষণ কালাত্যয় যুক্ত হয় অর্থাৎ কালবিশেষকে অতিক্রম করে, সেই পদার্থ কালাত্যয়ে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হওয়ায় কালাতীত নামে কথিত হয় অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থকেই কালাতীত নামক হেত্বাভাস বলে।

নিদর্শন অর্থাৎ ইহার উদাহরণ (বলিতেছি)। (প্রতিজ্ঞা) শব্দ নিত্য অর্থাৎ শব্দ তাহার শ্রবণের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, (হেতু) সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব জ্ঞাপক। (উদাহরণ) যেমন রূপ। অভিব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে এবং পরে বিদ্যমান রূপ (ঘটের রূপ) প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়। (উপনয়) শব্দও সেই প্রকার অর্থাৎ ঘটরূপের ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকিয়া ভেরী ও দণ্ডের সংযোগের দ্বারা অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয় অর্থাৎ শ্রুত হয়। (নিগমন) সেই সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব-হেতুক শব্দ নিত্য (পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত)। ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব অহেতু (হেতু নহে, হেত্বাভাস)। কারণ, কালাত্যয়যুক্ত প্রয়োগ হইয়াছে। (সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন) ব্যঙ্গ্য রূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগজন্য যে রূপপ্রত্যক্ষ হয়, ঐ রূপপ্রত্যক্ষ ব্যঞ্জক সংযোগের (প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগের) কালকে অতিক্রম করে না। (কারণ) প্রদীপের সংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই রূপ প্রত্যক্ষ হয়, সংযোগ নিবৃত্ত হইলে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ঘটের সহিত প্রদীপের সংযোগ থাকে, সেই পর্য্যন্তই ঘটের রূপের প্রত্যক্ষ হয়, (কিন্তু) কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইলে বিভাগের সময়ে অর্থাৎ যখন কাষ্ঠ হইতে কুঠারের বিভাগ হয়, সেই কাষ্ঠ হইতে কুঠারের উত্তোলন-কালে দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করে। সেই এই শব্দের অভিব্যক্তি (শ্রবণ) অর্থাৎ যাহা কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগকালে জন্মে না, বিভাগ-কালেই জন্মে, তাহা সংযোগের কালকে (কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ-কালকে) অতিক্রম করে; এই হেতু (উহা) সংযোগজন্য হয় না অর্থাৎ ঐ শব্দ শ্রবণ ঐ স্থলে কাষ্ঠের সহিত কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ-জন্য, ইহা বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, তাহাতে ঐ শব্দ-শ্রবণ ঐ সংযোগ-জন্য হইবে না কেন? (উত্তর) যেহেতু কারণের অভাব প্রযুক্ত কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে (অর্থাৎ যদি ঐ স্থলে কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগ ঐ শব্দ শ্রবণের কারণ হইত, তাহা হইলে ঐ সংযোগের অভাবে ঐ শব্দ শ্রবণরূপ কার্য্য

হইতে পারিত না। যাহা কারণ, তাহা কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিবে এবং তাহার অভাবে কখনই কার্য্য হইবে না। প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ নিবৃত্ত হইলে ঘটের রূপ দর্শন তখন হয় না, সুতরাং সেখানে ঘটরূপ প্রত্যক্ষ ঐ সংযোগ-জন্য, সুতরাং ঘটের রূপ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য; কিন্তু শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্য নহে, সুতরাং শব্দকে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য বলা যায় না)। এইরূপ হইলে উদাহরণের সাধর্ম্ম্য না থাকায় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনুমানে দৃষ্টান্ত যে ঘটের রূপ, তাহার সাধর্ম্ম্য যে সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব, তাহা ঐ অনুমানে সাধ্যধর্ম্মী যে শব্দ, তাহাতে না থাকায় এই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তানুমানে হেতুরূপে গৃহীত সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব সাধন না হওয়ায় (হেতু-লক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায়) হেত্বাভাস।

অবয়বের বিপরীতক্রমে উল্লেখ কিন্তু সূত্রার্থ নহে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া শেষে হেতুবাক্য বলিলে ঐ হেতু কালাত্যয়ে প্রযুক্ত হওয়ায় কালাতীত হইবে, ইহা কিন্তু সূত্রার্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যে বাক্যের সহিত যে বাক্যের অর্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ অর্থের কি না সামর্থ্যের সহিত সম্বন্ধ আছে, সেই বাক্য দূরস্থ হইলেও তাহার সেই অর্থ সম্বন্ধ থাকে। যে হেতু অর্থতঃ অসমর্থ বাক্যগুলির অর্থাৎ যে বাক্যগুলির পরস্পর মিলিত হইয়া বাক্যার্থ-বোধে সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের আনন্তর্য্য অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিতা (বাক্যার্থবোধে) কারণ নহে, অর্থাৎ বাক্যগুলি মিলিত হইয়া বাক্যার্থবোধে সমর্থ হইলে তাহারা যথাস্থানে কথিত না হইয়া বিপরীতক্রমে কথিত হইলেও বাক্যার্থবোধ জন্মায়। বাক্যার্থবোধে সামর্থ্য থাকিলে তাহা দূরস্থ বাক্যেও থাকে, এই বচন প্রযুক্ত বিপরীতক্রমে কথিত হেতু অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া হেতুবাক্যের দ্বারা যে হেতু-পদার্থ বলা হয়, তাহা উদাহরণের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত এবং উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হওয়ায় হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না। হেতুর লক্ষণ ত্যাগ না করিলেও তাহা হেত্বাভাস হয় না। (পরন্তু) অবয়বের বিপরীতক্রমে বচন অপ্রাপ্তকাল (৫ অ০, ২ আ০, ১১ সূত্র) এই সূত্রের দ্বারা (মহর্ষি) নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। ইহা তাহাই পুনরায় বলা হয়, এ জন্য তাহা সূত্রার্থ নহে। অর্থাৎ অবয়বের যদি ক্রম ভঙ্গ করিয়া প্রয়োগ হয়, তাহাকে মহর্ষি পরে অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এই সূত্রের যদি ঐরূপই অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে মহর্ষির পুনরুক্তি-দোষও হইয়া পড়ে; সুতরাং এ জন্যও বুঝা যায়, এই সূত্রের ঐরূপ অর্থ নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পঞ্চম হেত্বাভাসকে বলিয়াছেন—কালাতীত। অনেক পুস্তকে হেত্বাভাসের বিভাগসূত্রে (২ আ০ ৪ সূত্রে) 'অতীত কাল' এইরূপ নাম দেখা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ এ জন্য এই সূত্রে কালাতীত শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অতীতকাল এবং কালাতীত, এই দুইটি সমানার্থক শব্দ বলিয়া মহর্ষি এই সূত্রে কালাতীত শব্দের দ্বারা অতীত কাল নামক হেত্বাভাসকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি পূর্ব্বেও কালাতীত শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিভাগসূত্রে অতীত কাল, এইরূপ নাম বলিয়া তাহার লক্ষণ-সূত্রে কালাতীত নামে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবেন কেন? অর্থ এক হইলেও ঐ নাম দুইটি যখন পৃথক্, তখন মহর্ষি বিভাগ-সূত্রে যে নাম বলিয়াছেন, লক্ষণ-সূত্রেও সেই নামই বলিয়াছেন, ইহাই সম্ভব; কারণ, সেইরূপ বলাই উচিত। বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়সূচীনিবন্ধ প্রভৃতি অনেক পুস্তকে বিভাগ-সূত্রেও 'কালাতীত' এইরূপ পাঠই আছে। মুদ্রিত ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্ধৃত সূত্রে ঐ স্থলে 'অতীতকাল' পাঠ থাকিলেও উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি গোতম কালাত্যয়াপদিষ্ট, এই কথার দ্বারা এই সূত্রে কালাতীত নামক পঞ্চম হেত্বাভাসের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। সাধ্য-সন্দেহের কালই হেতু প্রয়োগের কাল। নির্ণীত পদার্থে ন্যায়প্রয়োগ হয় না, এ কথা ভাষ্যকারও প্রথম সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করিতে হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেই ধর্ম্মীতে যদি ঐ অনুমেয় ধর্ম্মটি নাই, ইহা দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে আর সেখানে ঐ সাধ্যধর্ম্ম আছে কি না, এইরূপ সংশয়ও হয় না। জলে বহ্নি নাই, ইহা নির্ণীত হইলে আর কি সেখানে বহ্নির সংশয় হইতে পারে? ফলকথা, যে পর্য্যন্ত সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের সংশয় আছে, সেই পর্য্যন্তই তাহাতে সাধ্যধর্ম্মের অনুমানের জন্য হেতু প্রয়োগ করিলে, ঐ হেতুতে আর কোন দোষ না থাকিলে, উহা হেতু হইতে পারে, উহা সেখানে সাধ্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীতে অনুমেয় ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলেই তাহা সাধ্য-সন্দেহের কালকে অতিক্রম করায় অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হওয়ায় সাধ্যধর্ম্মের সংশয়ের কাল চলিয়া গেলে প্রযুক্ত হয়, এ জন্য উহা কালাত্যয়ে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত); সুতরাং তাহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস। ঐরূপ স্থলে অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে আর কোন পদার্থই সেখানে সেই সাধ্যের সাধন হইতে পারে না, এ জন্য ঐরূপ স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত পদার্থ মাত্রই হেত্বাভাস। ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে যে ন্যায়াভাসের কথা বলিয়াছেন, সেই ন্যায়াভাস স্থলীয় হেতুই ইহার উদাহরণ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমান স্থলে প্রযুক্ত হেতুই এই সূত্রোক্ত কালাতীত নামক হেত্বাভাস। পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ ইহাকেই বাধিত নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে সূত্রার্থ বর্ণন ও উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃতার্থ এবং ভাষ্যকারেরও ইহাই মনোগত অর্থ। ভাষ্যকার পূর্ব্বে ন্যায়াভাসের কথা বলিয়াই তাঁহার নিজ মতানুসারে এই কালাতীত নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এ জন্য এখানে নিজ মতে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করেন নাই। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ

এই সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যেরূপ উদাহরণ বলিতেন, ভাষ্যকার এখানে সেই উদাহরণেরই উল্লেখ করিয়া এই কালাতীত নামক হেত্বাভাস বিষয়ে মতান্তর বিজ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রথমতঃ সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার কৌশলে একই ভাষায় পরমতের ব্যাখ্যার ন্যায় নিজ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে হেতুর অর্থৈকদেশ অর্থাৎ একদেশরূপ পদার্থ, ফলিতার্থ এই যে, যে হেতুর বিশেষণ-পদার্থ কালাত্যয়যুক্ত হইবে, সেই হেতু কালাতীত ; এইরূপে পরমতানুসারে ঐ ভাষ্যের ব্যাখ্যা হইবে। এই পরমতানুসারেই ভাষ্যকার শব্দের নিত্যত্বানুমানে মীমাংসকের গৃহীত সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতুকে কালাতীত হেত্বাভাস বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতুর একদেশ অর্থাৎ বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা ঐ স্থলে কালাত্যয়যুক্ত হওয়ায় ঐ হেতু কালাতীত হেত্বাভাস হইয়াছে। রূপের প্রত্যক্ষে রূপযুক্ত বস্তুতে আলোক-সংযোগ আবশ্যক। কারণ, অন্ধকারে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং রূপ প্রত্যক্ষ সংযোগজন্য, তাহা হইলে রূপকে সংযোগব্যঙ্গ্য বলা যায়। যাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ-জন্য, তাহাকে সংযোগ-ব্যঙ্গ্য পদার্থ বলে। কিন্তু রূপ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য হইলেও শব্দ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য নহে। কারণ, যে সংযোগ-জন্য শব্দ জন্মে, সেই সংযোগের নিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগজন্য না হওয়ায় শব্দ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য নহে। শব্দের প্রত্যক্ষ শব্দজনক সংযোগের কালকে অতিক্রম করায় সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্বরূপ হেতুর একদেশ বা বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা ঐ স্থলে কালাত্যয়যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানে সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতু কালাতীত নামক হেত্বাভাস (বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। সংযোগব্যঙ্গ্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য হয় না। আলোক-সংযোগের সাহায্যে যে ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সংযোগ-ব্যঙ্গ্য ঘটাদি পদার্থে নিত্যত্ব নাই, তবে নিত্যত্বের অনুমানে সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্বকে হেতু বলা হইয়াছে কিরূপে ? এতদুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে 'শব্দ নিত্য' এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ এই যে, শব্দ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। যাহা পূর্ব্বে থাকে না, তাহা সংযোগব্যঙ্গ্য নহে। শব্দ যখন সংযোগব্যঙ্গ্য, তখন শব্দ স্থির পদার্থ, শব্দ ঘটাদির রূপের ন্যায় প্রত্যক্ষের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাদীর তাৎপর্য্য। ঐরূপে শব্দের স্থিরত্ব সাধন করিয়া মীমাংসক শব্দের নিত্যত্ব সাধনের জন্য অন্য হেতুর প্রয়োগ করিয়াছেন (দ্বিতীয়াধ্যায়ে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থলে যখন ঘটাদির রূপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দের স্থিরত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতারূপ নিত্যতা ঘটাদির রূপে নাই। এবং সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব বলিতেও সংযোগজন্য প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব বুঝা যায়। সংযোগের দ্বারা যাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে সংযোগব্যঙ্গ্য শব্দের প্রতিপাদ্য নহে। কারণ, মীমাংসক মতে শব্দও যদি ঐরূপ সংযোগব্যঙ্গ্য বলা যায়, তাহা হইলেও ঘটাদি রূপের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব সংযোগজন্য নহে। সামান্যতঃ সংযোগজন্য বলিলে জন্য জ্ঞানের উৎপত্তি আত্মমনঃসংযোগ-জন্য, কিন্তু ঐ জন্য জ্ঞান নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে। ফলকথা, যাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-বিশেষ-জন্য, তাহাকেই সংযোগ-

ব্যঙ্গ্য বলিয়া রূপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শব্দের স্থিরত্ব সাধন করিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্বকে হেতু বলা হইয়াছে। ঐ হেতুতে যে ঐ স্থলে আর কোন দোষ নাই, তাহা নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ঐ স্থলে সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব সাধ্যসম নামক হেত্বাভাসই হইয়াছে; উহার জন্য আর পৃথক্ করিয়া কালাতীত নামক হেত্বাভাস বলা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা কালাতীত হেত্বাভাসের ঐ উদাহরণ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যার এই দোষ স্থূল, সকলেই উহা বুঝিয়া লইতে পারিবে, ইহাই মনে করিয়া ভাষ্যকার ঐ দোষের উদ্ভাবন করেন নাই; তিনি কেবল তাহাদিগের ঐ উদাহরণটিকেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, ভাষ্যকারের কথায় কিন্তু তাহা মনে আসে না। তবে ভাষ্যকারের নিজের মতকে নির্দোষ রাখিবার জন্য গত্যন্তর না থাকায় তাৎপর্য্যটীকাকার সম্ভবতঃ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ অনুসারেই ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের মূল কথা এই যে, ভাষ্যকার এখানে একই ভাষায় নিজের মতে এবং পরের মতে সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া পরের মতেই উদাহরণ বলিয়া গিয়াছেন। প্রথম সূত্র-ভাষ্যে ন্যায়াভাসের কথা বলাতে ভাষ্যকারের নিজ সম্মত কালাতীত হেত্বাভাসের উদাহরণ বলাই হইয়াছে, আর তাহার পুনরুক্তি করেন নাই। ভাষ্যকারের নিজ মত অনুসারে সূত্রার্থবোধক ভাষ্যের ব্যাখ্যা এই যে, অপদিশ্যমান যে পদার্থের অর্থৈকদেশ অর্থাৎ প্রযুজ্যমান হেতু পদার্থের অর্থ কি না—সাধনীয় যে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী (সাধ্যধর্ম্মী), তাহার একদেশ অর্থাৎ বিশেষণরূপ একাংশ যে সাধ্যধর্ম্ম, তাহা যদি কালাত্যয়যুক্ত হয় অর্থাৎ কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হওয়ায় সাধ্য সন্দেহের কালকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে প্রযুজ্যমান সেই হেতু সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে প্রযুক্ত হওয়ায় কালাতীত নামক হেত্বাভাস হয়।

তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরেই হেতুবাক্য প্রয়োগের কাল। সেই কালকে অতিক্রম করিয়া যদি পরে অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্যের পরে হেতু প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু কালাতীত নামক হেত্বাভাস হয়। সেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িক এইরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এই ব্যাখ্যানুসারে কালাতীত নামক কোন হেত্বাভাস স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, কালাতীত নামক কোন হেত্বাভাস নাই, ইহাই সমর্থন করিয়া মহর্ষি-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করিয়াই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের ব্যাখ্যাত ঐ দোষের পরিহার করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের ঐরূপ অর্থ নহে। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়া, তাহার পরে যদি কেহ হেতু প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তজ্জন্য প্রয়োগকর্ত্তার দোষ হইতে পারে। ঐরূপ স্থলে প্রযুক্ত হেতুতে যদি হেতুর লক্ষণ থাকে অর্থাৎ উহা যদি উদাহরণের সাধর্ম্ম্য অথবা উদাহরণের বৈধর্ম্ম্য হইয়া সাধ্যসাধন হয়, তাহা হইলে হেত্বাভাস হইতে পারে না। যাহাতে হেতুপদার্থের সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাহা কখনই হেত্বাভাস হয় না। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য মিলিত হইয়া যে বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, তাহাতেও হেতুবাক্যটি প্রতিজ্ঞাবাক্যের দূরস্থ

হইলেও কোন হানি নাই। ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য এখানে যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ কারিকাটি কোন্ গ্রন্থের, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানেও পাই নাই। নানাগ্রন্থদর্শী অনুসন্ধিৎসু অনেক মনীষীও উহার সংবাদ পান নাই, জানিয়াছি। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই কারিকাস্থ অর্থসম্বন্ধ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"অর্থেন সামর্থ্যেন সম্বন্ধোঽর্থসম্বন্ধঃ।" তিনি এই কারিকা সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের উদ্ধৃত কারিকাস্থ 'অর্থসম্বন্ধে'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—সামর্থ্য-সম্বন্ধ। যে বাক্য অন্য বাক্যের সহিত মিলিত হইয়া অর্থাৎ একবাক্যতা লাভ করিয়া বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা আবশ্যক। উহাকে বাক্যের সামর্থ্যও বলা হয় (নিগমন-সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ঐ সামর্থ্য-সম্বন্ধ বা আকাঙ্ক্ষা দূরস্থ বাক্যেও থাকে, উহা না থাকিলে নিকটস্থ বাক্যও মিলিত হইয়া শাব্দ বোধ জন্মাইতে পারে না, ইহাই ঐ কারিকার তাৎপর্য্যার্থ। ইহা প্রাচীন মত। এই মত সর্ব্বসম্মত নহে। মনে হয়, এই জন্যই ভাষ্যকার শেষে অন্য একটি যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি পঞ্চমাধ্যায়ে যাহা অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এই সূত্রের দ্বারা তাহাই হেত্বাভাসের মধ্যে বলিবেন কিরূপে? ঐ ভাবে ঐরূপ পুনরুক্তি মহর্ষি কখনই করিতে পারেন না। সুতরাং উহা মহর্ষি-সূত্রের অর্থ নহে।

মহর্ষি-সূত্রের অর্থ তাৎপর্য্যটীকাকার যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই অনুবাদে গৃহীত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরও ভাষ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উহা যে মতান্তরে ব্যাখ্যা বা মতান্তর জ্ঞাপন, তাহা কিছুতেই মনে হয় না। তবে উদ্দ্যোতকরের পর হইতেই মহর্ষি গোতমোক্ত কালাতীত নামক হেত্বাভাস বাধিত এবং বাধিতসাধ্যক ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য কালাতীত প্রভৃতি নামের ব্যবহারও পরবর্ত্তী গ্রন্থে স্থলবিশেষে দেখা যায়। বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে কালাত্যয়াপদিষ্ট নামেরও ব্যবহার করিয়াছেন। মূলকথা, যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমানের জন্য হেতু প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যধর্ম্মটি নাই, ইহা যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত, সেই স্থলীয় হেতুকেই উদ্দ্যোতকরের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ স্পষ্ট ভাষায় মহর্ষি গোতমোক্ত পঞ্চম হেত্বাভাস বলিয়া অর্থাৎ কালাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।[১] প্রথম সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার যে ন্যায়াভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন, সেখানেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায়াভাস স্থলেই এই কালাতীত নামক হেত্বাভাস থাকে। এ জন্য মহর্ষি ন্যায়াভাস নাম করিয়া কোন কথা আর বলেন নাই। হেত্বাভাস বলাতেই ন্যায়াভাস বলা হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাভাস, দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতিও[২] তাহাতেই বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কোন কোন ন্যায়ৈকদেশী 'অনধ্যবসিত' নামে ষষ্ঠ হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু

১। কালাতীতো বলবতা প্রমাণেন প্রবাধিতঃ।—তার্কিকরক্ষা, ।৮৬।

২। ন সূত্রিতং কিমিতি চেদ্দৃষ্টান্তাভাসলক্ষণং।
অন্তর্ভাবো যতস্তেষাং হেত্বাভাসেষু পঞ্চসু।—ঐ।

তাহাও গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেই অন্তর্ভূত হওয়ায় মহর্ষি ষষ্ঠ কোন হেত্বাভাস বলেন নাই। যে হেতুতে ব্যভিচার সংশয়-নিরাসক অনুকূল তর্ক নাই, তাহাকে অপ্রযোজক বলে। যে হেতুতে ঐরূপ অনুকূল তর্ক আছে, তাহাকে প্রযোজক[১] বলে। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত অপ্রযোজক নামে হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ উহাকে 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ' বলিয়া ঐ নামে কোন অতিরিক্ত হেত্বাভাস স্বীকার অনাবশ্যক বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও ঐ মত খণ্ডন করিয়া অপ্রযোজক নামে পৃথক্ কোন হেত্বাভাস নাই, উহা গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেই অন্তর্ভূত, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

মহর্ষি কণাদ হেতুকে বলিয়াছেন—অপদেশ, হেত্বাভাসকে বলিয়াছেন—অনপদেশ। তাঁহার মতে (১) অপ্রসিদ্ধ, (২) অসৎ, (৩) সন্দিগ্ধ, এই নামত্রয়ে[২] হেত্বাভাস ত্রিবিধ। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ অনধ্যবসিত নামক এক প্রকার হেত্বাভাস বলিলেও উহা কণাদসূত্রের অপ্রসিদ্ধ অথবা সন্দিগ্ধ, এই কথার দ্বারাই সংগৃহীত বলিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, কণাদসূত্রের বৃত্তিকার সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই কণাদের সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে। কারণ, কণাদ যে হেত্বাভাসত্রয়বাদী, এ বিষয়ে প্রাচীন প্রবাদ[৩] আছে। বস্তুতঃ গোতমোক্ত প্রকরণসম ও কালাতীত নামক হেত্বাভাসকে কণাদ হেত্বাভাস-মধ্যে গণ্য করেন নাই, ইহাই প্রচলিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের মূল যুক্তি এই যে, যে হেতু সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য বলিয়া এবং সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত, তাহা কখনও অহেতু অর্থাৎ হেতুলক্ষণশূন্য হয় না। পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষে অসত্ত্ব—এই তিনটি ধর্ম্মই কণাদের মতে হেতুর সাধকতার প্রযোজক। ঐ লক্ষণাক্রান্ত হেতু স্থলে যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতি না হয় অথবা হইলেও তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে ঐ হেতুর কোন দোষ বলা যায় না। হেতুর সম্পূর্ণ লক্ষণ যাহাতে আছে, তাহাকে অহেতু কিছুতেই বলা যায় না। ঐরূপ হেতু স্থলে অনুমিতির অন্য প্রতিবন্ধক যদি উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐ হেতু কখনই দুষ্ট বা হেত্বাভাস হইতে পারে না। যে স্থলে অনুমিতির যে কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে, সেই স্থলীয় হেতু মাত্রকে দুষ্ট হেতু বলিলে হেত্বাভাস আরও নানাপ্রকার হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান হেতু যদি বাধিত অথবা সৎপ্রতিপক্ষিত হয়, তাহা হইলেও

১। যস্যানুকূলতর্কোঽস্তি স এব স্যাৎ প্রযোজকঃ।
তদভাবেঽন্যথাসিদ্ধিস্তস্যাঃ স হি নিবারকঃ।
অতোঽপ্রযোজকস্য স্যাদ্ব্যাপ্যাসিদ্ধেরসিদ্ধতা।—তার্কিকরক্ষা।

২। অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্ সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ।—কণাদ-সূত্র, ।৩।১।১৫।
ন্যায় সূত্রেও কোন স্থলে হেত্বাভাস বলিতে অনপদেশ বলা হইয়াছে।২।২।৩৪।

৩। বিরুদ্ধাসিদ্ধ-সন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ। এই শ্লোকার্দ্ধ প্রশস্তপাদভাষ্যে দেখা যায়। কন্দলীকার উহা প্রশস্তপাদ-বাক্য ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বাক্যটি আরও অতি প্রাচীন প্রবাদ, এইরূপও প্রবাদ শুনা যায়।

ঐ হেতু দুষ্ট হইবে না। কারণ, হেতুর প্রকৃত লক্ষণ তাহাতে আছেই, সুতরাং ঐ হেতু হেত্বাভাসের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি।

ন্যায়াচার্য্য মহর্ষি গোতমের অভিপ্রায় মনে হয় এই যে, যে হেতুস্থলে অনুমিতি হইলে যথার্থ অনুমিতিই হয়, তাহাকেই হেতু বলা উচিত। যে হেতু সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান হইলেও কোন স্থলে সাধ্যধর্ম্মীতে বস্তুতঃ সাধ্যধর্ম্ম না থাকায় যথার্থ অনুমিতির প্রযোজক হইতেই পারিবে না, সেখানে অনুমিতি হইলেও ভ্রম অনুমিতি হইবে, সেই হেতু বাধিত। এবং যে হেতুর তুল্যবল প্রতিপক্ষ অন্য হেতু প্রযুক্ত হওয়ায় সেখানে সাধ্য-সংশয়ই জন্মিবে, অনুমিতি জন্মিতেই পারিবে না, তাহা সৎপ্রতিপক্ষিত হেতু। এই বাধিত ও সৎ-প্রতিপক্ষিত হেতু যখন কোথায়ও কখনও যথার্থ অনুমিতির প্রযোজক হয় না, তখন ঐরূপ হেতুকে প্রকৃত হেতু বলা যায় না। কারণ, সাধ্যসাধনত্বই হেতুর লক্ষণ; তাহা ঐরূপ হেতুতে না থাকায় উহা অহেতু, উহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে হেত্বাভাসই হইবে। মূলকথা হইল যে, হেত্বাভাস শব্দের মধ্যে যে হেতু শব্দ আছে, বৈশেষিক মতে তাহার অর্থ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্ম্মীতে বর্ত্তমান হেতু, আর ন্যায়মতে উহার অর্থ সাধ্যসাধন বা যথার্থ অনুমিতির প্রযোজক হেতু। ইহা হইতেই বৈশেষিক ও ন্যায়ে হেত্বাভাস ত্রিবিধ এবং পঞ্চবিধ, এই দুই মতের সৃষ্টি হইয়াছে। (২ আ০, ৪ সূত্র-টিপ্পনীতে ন্যায়সম্মত হেতুর লক্ষণ দ্রষ্টব্য)॥ ৯ ॥

ভাষ্য। অথ ছলম্

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ হেত্বাভাস নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) ছল (নিরূপণ করিয়াছেন)।

সূত্র। বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং ॥১০॥৫১॥

অনুবাদ। বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ-কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে।

ভাষ্য। ন সামান্যলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহর্ত্তুং বিভাগে তূদাহরণানি।

অনুবাদ। সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ দেওয়া যায় না। বিভাগে কিন্তু অর্থাৎ ছলের বিশেষ লক্ষণেই উদাহরণগুলি বলিব।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে হেত্বাভাসের পরেই ছলের নাম বলা হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে মহর্ষি হেত্বাভাসের পরেই তাঁহার উদ্দিষ্ট ছল পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার "অথ ছলং" এই কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রে 'অর্থবিকল্প' বলিতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনা। ঐ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা বাদীর বাক্যের বিঘাত করাই ছল। অর্থাৎ যে অর্থ বাদীর তাৎপর্য্যবিষয় নহে, বাদীর বাক্যের সেই অর্থ কল্পনা করিয়া বাদীর প্রযুক্ত

হেতুতে যে দোষ প্রদর্শন, তাহাই ছল। এই ছল বাক্যবিশেষ। বিরুদ্ধার্থ কল্পনাই ছলবাদীর উপপত্তি বা যুক্তি, উহা ছাড়া তাহার আর কোন উপপত্তি নাই। সুতরাং বাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ বা বাদীর তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ ছাড়া বাদীর বাক্যের আর একটা অর্থও ব্যাখ্যা করিতে পারা চাই, নচেৎ ছল হইতে পারিবে না। এই অর্থান্তর-কল্পনা কেবল কোন শব্দবিশেষকে ধরিয়াই যে হইবে, এমন কথা নহে ; যে দিক্ দিয়াই হউক, বাদীর তাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য তাৎপর্য্যের কল্পনা করিয়া বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিলেই তাহা ছল হইবে। এই ছলের উদাহরণ বিশেষ-লক্ষণে বলা হইয়াছে। কারণ, সেই বিশেষ ছল ভিন্ন ছলের উদাহরণ প্রদর্শন অসম্ভব। ছলের উদাহরণ দেখাইতে হইলেই কোন একটি বিশেষ ছলের উদাহরণকেই উল্লেখ করিতে হইবে। সেই বিশেষ ছলের লক্ষণ না বলিলেও তাহার উদাহরণ দেখান যাইবে না। এ জন্য ছলের বিশেষ লক্ষণগুলিতেই অর্থাৎ সেই বিশেষ লক্ষণ-সূত্রত্রয়ের ভাষ্যেই ছলের উদাহরণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যে "বিভাগে তু" এই স্থলে বিভাগ শব্দের দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন,—"বিভজ্যত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণম্" ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। বিভাগশ্চ।

সূত্র। তৎ ত্রিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলমুপ-চারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১॥৫২ ॥

অনুবাদ। বিভাগ অর্থাৎ ছলের বিভাগ-সূত্র। সেই ছল তিন প্রকার,— (১) বাক্‌ছল, (২) সামান্যছল এবং (৩) উপচারছল।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ছলের সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়া এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি ছলের বিভাগ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলির উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নাম কীর্ত্তনকে বিভাগ বলে। উহা উদ্দেশেরই অন্তর্ভূত। উহা না করিলে বিশেষ লক্ষণ বলা যায় না, এ জন্য উহা করিতে হয়। পরন্তু নিয়মের জন্যও উহা করা হয়। ছল বহু প্রকার হইতে পারিলেও এই সূত্রোক্ত তিন প্রকারের মধ্যেই সমস্ত ছল আছে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার ছল আর নাই, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্যও মহর্ষি ছলের এই বিভাগসূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যে বিভাগ শব্দের দ্বারা এখানে বিভাগসূত্র বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন,—"বিভজ্যতেঽনেনেতি বিভাগঃ সূত্রমুচ্যতে"।

এই সূত্রের শেষে একটি 'ইতি' শব্দ অনেক পুস্তকেই দেখা যায়। মুদ্রিত ন্যায়বার্ত্তিকেও উহা দেখা যায়। কিন্তু এখানে 'ইতি' শব্দের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার ন্যায়সূচীনিবন্ধে ইতিশব্দান্ত সূত্র গ্রহণ করেন নাই। "তৎ ত্রিবিধং" এই অংশও অনেকে ভাষ্যকারের কথা বলিয়া সূত্রে গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ উহা সূত্রের অন্তর্গত। অনুমান-সূত্রে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন আছে (পঞ্চম সূত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য) ॥১১॥

ভাষ্য। তেষাং

সূত্র। অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্‌চ্ছলম্ ॥ ১২॥৫৩ ॥

অনুবাদ। সেই ত্রিবিধ ছলের মধ্যে অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ দ্বিবিধ অর্থের বোধক সমান শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ বিষয়ে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা অর্থাৎ ঐরূপ অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা যে দোষ প্রদর্শন, তাহা বাক্‌ছল।

ভাষ্য। নবকম্বলোঽয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ। অত্র নবঃ কম্বলোঽস্যেতি বক্তুরভিপ্রায়ঃ। বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে। তত্রায়ং ছলবাদী বক্তুরভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমন্যমর্থং নবকম্বলা অস্যেতি তাবদভিহিতং ভবতেতি কল্পয়তি। কল্পয়িত্বা চাসম্ভবেন প্রতিষেধতি, একোঽস্য কম্বলঃ কুতো নবকম্বলা ইতি। তদিদং সামান্যশব্দে বাচি ছলং বাক্‌চ্ছলমিতি।

অনুবাদ। 'এই বালক নবকম্বলবিশিষ্ট' এইরূপ প্রয়োগ হইল। এই প্রয়োগে এই বালকের নূতন কম্বল, ইহাই বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ অভিপ্রেত। বিগ্রহে অর্থাৎ 'নবকম্বল' এই বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যেই বিশেষ আছে, সমাসে বিশেষ নাই। সেই প্রয়োগে এই ছলবাদী বক্তার অভিপ্রেত ভিন্ন—কি না অবিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তা যে অর্থ বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ 'এই বালকের নয়খানা কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন', এইরূপে কল্পনা করে। কল্পনা করিয়া অসম্ভব হেতুক প্রতিষেধও করে। (সে প্রতিষেধ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) এই বালকের একখানা কম্বল, নয়খানা কম্বল কোথায়? সেই এই সামান্য শব্দ অর্থাৎ উভয় অর্থেই সমান শব্দরূপ বাক্যনিমিত্তক ছল বাক্‌ছল।

টিপ্পনী। মহর্ষি-কথিত ত্রিবিধ ছলের মধ্যে প্রথম বাক্‌ছল। বাক্যনিমিত্তক যে ছল অর্থাৎ উভয় অর্থে বাক্যটি সমান হওয়ায় এবং সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করাতেই ছল করিতে পারায় বাক্য যে ছলের নিমিত্ত, সেই ছলকে বাক্‌ছল বলে। ইহাই বাক্‌ছল শব্দের বুৎপত্তি-লভ্য অর্থ। ভাষ্যে "বাচি ছলং" এই কথার দ্বারা শেষে বাক্‌ছল শব্দের এই বুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ স্থলে 'বাচি' এখানে নিমিত্তার্থে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। সূত্রে 'অবিশেষাভিহিত' এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উভয়ার্থে সমান শব্দকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উদ্যোতকর ঐ কথার দ্বারা সমান বাক্য বা সমান পদই বুঝিতে বলিয়াছেন। তাহা হইলে যে বাক্য বা যে পদ নির্ব্বিশেষে অভিহিত অর্থাৎ উভয় অর্থেই সমানরূপে উচ্চারিত, তাহাই সূত্রে বলা

হইয়াছে "অবিশেষাভিহিত"। ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থ বিষয়ে যে অর্থান্তরের কল্পনা, তাহা বাক্‌ছল। সূত্রে 'অর্থ' শব্দের প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শব্দে অর্থান্তর কল্পনা নহে, ঐরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার একটি অর্থে আর একটি অর্থের কল্পনা অর্থাৎ যে অর্থটি বক্তার তাৎপর্য্যবিষয় নহে, সেই অর্থকে বক্তার তাৎপর্য্যবিষয় বলিয়া কল্পনা। সূত্রে "বক্তুরভিপ্রায়াৎ" এই কথা থাকায় এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। উদ্যোতকর সূত্রে অর্থ শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন। সূত্রে অভিপ্রায় শব্দের অর্থ এখানে 'অভিপ্রেত'। অভিপ্রায় শব্দের 'ইচ্ছা' অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রে কোনরূপ উপপত্তি (বক্তুরভিপ্রায়ং উপেক্ষ্য অবিজ্ঞায় ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া) করিতে পারিলেও ভাষ্যে অভিপ্রায় শব্দের অভিপ্রেত অর্থই সুসঙ্গত মনে হয়। বক্তার অভিপ্রেত হইতে অন্য, অর্থাৎ বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। তাহারই বিবরণ অবিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তা যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ।

এখন এই বাক্‌ছলের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কোন বালক একখানা নূতন কম্বল গাত্রে দিয়া আসিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া কোন বাদী বলিলেন,—"নবকম্বলোঽয়ং মাণবকঃ" অর্থাৎ এই বালক নূতন কম্বলবিশিষ্ট। এখানে 'নবকম্বল' এইটি বহুব্রীহি সমাস। "নবঃ কম্বলোঽস্য" এইরূপ ব্যাসবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা যায়, এই ব্যক্তির নূতন কম্বল আছে। "নব কম্বলা অস্য" এইরূপ ব্যাসবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা যায়, এই ব্যক্তির নয়খানা কম্বল আছে। দ্বিবিধ ব্যাসবাক্যেই নবকম্বল এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হয়, সুতরাং সমাসে কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ উভয় অর্থেই 'নবকম্বল' এইটি সমান শব্দ, ব্যাসবাক্যেই কেবল বিশেষ আছে। এবং এক পক্ষে নব শব্দ, অন্য পক্ষে নবন্ শব্দ। নব শব্দের অর্থ নূতন, নবন্ শব্দের অর্থ নব সংখ্যক, কিন্তু উভয় পক্ষেই 'নবকম্বল' এই বাক্যটি সমান। "নবকম্বল" বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থদ্বয়ের মধ্যে 'নূতন কম্বলবিশিষ্ট' এইরূপ অর্থই বক্তার অভিপ্রেত এবং সেখানে ঐরূপ অর্থই সম্ভব, দ্বিতীয় অর্থটি সম্ভবও নহে। কিন্তু ছলবাদী প্রতিবাদী বলিয়া বসিলেন—কৈ, এই বালকের নয়খানা কম্বল কোথায়? ইহার ত একখানা ছাড়া আর কম্বল দেখি না। প্রতিবাদী ঐরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া অসম্ভবের দ্বারা এখানে বাদীর কথার প্রতিষেধ করিলেন। এই ছল ঐ স্থলে 'নবকম্বল' এই বাক্যনিমিত্তক। বাদী নব কম্বল না বলিয়া যদি 'নূতন কম্বল' এইরূপ কথা বলিতেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী ঐ ছল করিতে পারিতেন না, বিরুদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপত্তি ঘটিত না, সুতরাং ঐরূপ ছল বাক্‌ছল। যখন কোন বাদী অনুমানের দ্বারা অপরকে বুঝাইতে যাইবেন,—"নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলত্বাৎ, আঢ্যোঽয়ং নবকম্বলত্বাৎ" অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল দেশ হইতে আসিয়াছে অথবা এই ব্যক্তি ধনী, কারণ, এই ব্যক্তি নবকম্বলবিশিষ্ট, এতাদৃশ নবকম্বল নেপাল ভিন্ন আর কোথাও মিলে না এবং দরিদ্র লোকেও ক্রয় করিতে পারে না। এইরূপ স্থাপনায় ছলকারী প্রতিবাদী যদি বলেন, এই ব্যক্তির নয়খানা কম্বল নাই, তাহা হইলে তিনি বাদীর হেতুকে সাধ্যসম বা অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিলেন। অর্থাৎ তোমার প্রযুক্ত হেতু এই ব্যক্তিতে নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহাই তাঁহার প্রকৃত বক্তব্য। সুতরাং ঐরূপ অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুর দোষ প্রদর্শনই ঐ স্থলে ছলের

প্রকৃত উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ তাহাতে বাদীর হেতুর অসিদ্ধত্ব প্রদর্শন হয় না। কারণ, বাদীর হেতু নূতন কম্বলবিশিষ্টত্ব, তাহা সেই ব্যক্তিতে আছেই। বাদীর বিবক্ষিত হেতুতে দোষ প্রদর্শন না হওয়ায় ঐ ছল সদুত্তর নহে, ঐ জন্যই উহা অসদুত্তর। বাদীর হেতুতে যদি অন্য কোন দোষও থাকে, তথাপি ছলকারী যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ, ছলকারী অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ দেখাইতে পারেন নাই।

পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ এইরূপে নবকম্বলত্ব হেতু গ্রহণ করিয়াই বাক্‌ছলের পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার নবকম্বলত্বকে সাধ্যধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপেও ছল হইতে পারে। নবকম্বলত্ব সাধন করিতে যে হেতু প্রয়োগ করা হইবে, সেই হেতু বাধিত, উহা সাধ্যধর্ম্মশূন্য ধর্ম্মীতে থাকায় হেত্বাভাস, ইহাই সেখানে ছল-বাদীর শেষ বক্তব্য হইবে। ফলকথা, যে দিকেই হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুতে যে কোনরূপ দোষ প্রদর্শনই বাক্‌ছলের উদ্দেশ্য। এইরূপ "গৌর্ব্বিষাণী" এইরূপ প্রয়োগ করিলে যদি কেহ বলেন,—বাণের শৃঙ্গ কোথায়? বাণের শৃঙ্গ নাই; সুতরাং বাণে শৃঙ্গ সাধন করিতে তুমি যে হেতু প্রয়োগ করিবে, তাহা বাধিত হইবে। গো শব্দের অনেক অর্থ অভিধানে কথিত হইয়াছে। ন্যায়মতে শ্লিষ্ট শব্দের সবগুলি অর্থ ই মুখ্য। গো শব্দের গো অর্থের ন্যায় বাণ অর্থও মুখ্য। বাদী গো অর্থে এখানে গো শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবাদী 'বাণ' অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথা বলিলে তাহা বাক্‌ছল হইবে। এবং বিষাণ শব্দের পশুশৃঙ্গ এবং হস্তিদন্ত এই উভয় অর্থই অভিধানে অভিহিত আছে। (পশুশৃঙ্গেভ-দন্তয়োর্ব্বিষাণং ইত্যমরঃ)। কোন বাদী "গজো বিষাণী" এইরূপ প্রয়োগ করিলে যদি কেহ বিষাণ শব্দের শৃঙ্গ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন, হস্তীর শৃঙ্গ কোথায়? হস্তীর শৃঙ্গ নাই, তাহা হইলেও বাক্‌ছল হইবে। বাদী ঐ স্থলে হস্তিদন্ত অর্থেই বিষাণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং বাদীর অভিপ্রেত অর্থে কোন দোষ নাই। এইরূপ কোন বাদী বলিলেন,—"শ্বেতো ধাবতি"। শ্বেত শব্দের দ্বারা শ্বেতরূপ-বিশিষ্ট অর্থই এখানে বাদীর অভিপ্রেত। পূর্ব্বোক্ত বাদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী বাদীর 'শ্বেতঃ' এই কথার মধ্যে 'শ্বা ইতঃ' এইরূপে সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া যদি বলেন, এই স্থান দিয়া ত কুক্কুর যাইতেছে না, কুক্কুর কোথায়? তাহা হইলে এখানেও বাক্‌ছল হইবে। শ্বন্ শব্দের কুক্কুর অর্থ প্রসিদ্ধই আছে। শ্বন্ শব্দের প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে 'শ্বা' এইরূপ পদ হয়, সুতরাং 'শ্বা ইতো ধাবতি' এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাদিবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিবাদী ঐরূপ ছল করিতে পারেন, কিন্তু বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ না হওয়ায় উহা সদুত্তর হইবে না। সর্ব্বত্রই বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ প্রদর্শন না হওয়ায় ছল মাত্রই অসদুত্তর। বাদীর অভিপ্রেত অর্থ বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা দোষোদ্‌ভাবন করিলে ছল করা হয়। অন্যান্য ছলেও তাহা হইতে পারে, অর্থাৎ বাদীর অভিপ্রেত অর্থ বুঝিয়াও ছল করা যাইতে পারে, উদ্যোতকর ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই বাক্‌ছলের বৈচিত্র্যটি গ্রহণ করিয়াই আলঙ্কারিকগণ শ্লেষবক্রোক্তি নামে অলঙ্কার গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন "কে যূয়ং স্থল এব সম্প্রতি বয়ং" ইত্যাদি

কবিতায় প্রশ্ন হইয়াছে—"কে যূয়ং" অর্থাৎ তোমরা কে ? উত্তরবাদী 'ক' শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'কে' এই পদ ধরিয়া এবং 'ক' শব্দের জল অর্থ অভিধানে অভিহিত থাকায়, ঐ জল অর্থ গ্রহণ করিয়া 'কে যূয়ং' এই প্রশ্ন-বাক্যের 'জলে যূয়ং' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ বাদীর অভিপ্রেত অর্থ হইতে অন্য অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদ করিলেন—'স্থল এব সম্প্রতি বয়ং' অর্থাৎ আমরা জলে কোথায় ? আমরা সম্প্রতি স্থলেই আছি। এই বক্রোক্তি কাব্যে বাগ্‌বৈচিত্র্য সম্পাদন করায় শব্দালঙ্কার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। মনে হয়, গোতমোক্ত বাক্‌ছলই এই বক্রোক্তি অলঙ্কার উদ্‌ভাবন করাইয়াছে।

ভাষ্য। অস্য প্রত্যবস্থানং—সামান্যশব্দস্যানেকার্থত্বেঽন্যতরাভিধান-কল্পনায়াং বিশেষবচনং। নবকম্বল ইত্যনেকার্থস্যাভিধানং, নবঃ কম্বলোঽস্য নবকম্বলা অস্যেতি। এতস্মিন্ প্রযুক্তে যেয়ং কল্পনা, নব-কম্বলা অস্যেত্যেতদ্‌ভবতাঽভিহিতং তচ্চ ন সম্ভবতীতি। এতস্যামন্যতরা-ভিধানকল্পনায়াং বিশেষো বক্তব্যঃ, যস্মাদ্‌বিশেষোঽর্থবিশেষেষু বিজ্ঞায়-তেঽয়মর্থোঽনেনাভিহিত ইতি। স চ বিশেষো নাস্তি, তস্মান্মিথ্যাভিযোগ-মাত্রমেতদিতি।

প্রসিদ্ধশ্চ লোকে শব্দার্থসম্বন্ধোঽভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ, অস্যা-ভিধানস্যায়মর্থোঽভিধেয় ইতি, সমানঃ সামান্যশব্দস্য, বিশেষো বিশিষ্টশব্দস্য, প্রযুক্তপূর্ব্বাশ্চেমে শব্দা অর্থে প্রযুজ্যন্তে নাপ্র-যুক্তপূর্ব্বাঃ, প্রয়োগশ্চার্থসম্প্রত্যয়ার্থঃ, অর্থপ্রত্যয়াচ্চ ব্যবহার ইতি। তত্রৈবমর্থগত্যর্থে শব্দপ্রয়োগে সামর্থ্যাৎ সামান্যশব্দস্য প্রয়োগ-নিয়মঃ। অজাং গ্রামং নয়, সর্পিরাহর, ব্রাহ্মণং ভোজয়েতি। সামান্যশব্দাঃ সন্তোঽর্থাবয়বেষু প্রযুজ্যন্তে সামর্থ্যাৎ, যত্রার্থক্রিয়াচোদনা সম্ভবতি তত্র প্রবর্ত্তন্তে নার্থসামান্যে, ক্রিয়াচোদনাঽসম্ভবাৎ। এবময়ং সামান্যশব্দো নবকম্বল ইতি, যোঽর্থঃ সম্ভবতি নবঃ কম্বলোঽস্যেতি তত্র প্রবর্ত্ততে, যস্তু ন সম্ভবতি নবকম্বলা অস্যেতি তত্র ন প্রবর্ত্ততে। সোঽয়মনুপপদ্যমানার্থ-কল্পনয়া পরবাক্যোপালম্ভো ন কল্পত ইতি।

অনুবাদ। এই বাক্‌ছলের প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ বা খণ্ডন (বলিতেছি) অর্থাৎ ইহা যে সদুত্তর নহে, তাহা বাদী যেরূপে বুঝাইবেন, তাহা বলিতেছি। সামান্য শব্দের অনেকার্থতা থাকিলে অর্থাৎ কোন একটি সামান্য শব্দের যদি একাধিক

মুখ্যার্থ থাকে, তবে সেখানে একতর অর্থের অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ অর্থের কথন কল্পনা করিলে বিশেষ বলিতে হয়। বিশদার্থ এই যে, নবকম্বল শব্দের দ্বারা একাধিক অর্থের কথন হয়, (সে কি কি অর্থ, তাহা বলিতেছেন) ইহার নূতন কম্বল আছে (এবং) ইহার নয়খানা কম্বল আছে। এই নবকম্বল শব্দ প্রয়োগ করিলে ইহার নয়খানা কম্বল আছে, ইহা আপনি বলিয়াছেন, এই যে কল্পনা—তাহা সম্ভব হয় না। (কারণ) এই একতর অর্থের কথন কল্পনা করিলে অর্থাৎ ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এই অর্থবিশেষই নবকম্বল শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা কল্পনা করিলে বিশেষ বলিতে হইবে। যে বিশেষ বশতঃ অর্থবিশেষগুলির মধ্যে এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ অভিহিত হইয়াছে, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ অর্থবিশেষ বুঝা যায়, সে বিশেষ কিন্তু নাই, অর্থাৎ এখানে নবকম্বল শব্দের দ্বারা ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এই অর্থ ই বুঝিতে হইবে, এই বিষয়ে কোন বিশেষ অর্থাৎ প্রকরণ প্রভৃতি নিয়ামক নাই, সুতরাং ইহা মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। (তাৎপর্য্য এই যে, যখন নবকম্বল শব্দের দ্বারা মুখ্যরূপেই দুইটি অর্থের বোধ হয় এবং তন্মধ্যে এখানে ইহার নূতন কম্বল আছে, এই অর্থ ই সম্ভব, তখন ঐ সম্ভব অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এইরূপ অসম্ভব অর্থটির গ্রহণ করা এবং বাদী ঐরূপই বলিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অনুচিত)।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধই আছে। (সে সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন) অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ শব্দ এবং তাহার বাচ্য অর্থের যে নিয়ম, তদ্বিষয়ে নিয়োগ, অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থ ই বুঝিতে হইবে, এইরূপ সঙ্কেত। (অভিধান ও অভিধেয়ের নিয়ম কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) এই শব্দের এই অর্থ ই অভিধেয় (বাচ্য), অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম বিষয়ে যে শব্দ-সংকেত, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ। (এই সম্বন্ধ) সামান্য শব্দের সমান অর্থাৎ সামান্য, বিশিষ্ট শব্দের বিশেষ। (শব্দ ও অর্থের এইরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কি ? এ জন্য বলিতেছেন) প্রযুক্তপূর্ব্ব এই সকল শব্দই অর্থে (সেই সেই বাচ্য অর্থে) প্রযুক্ত হইতেছে, অপ্রযুক্তপূর্ব্ব এই সকল শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে না অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধানুসারে পূর্ব্ব হইতেই এই সকল শব্দের সেই সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, এই সকল শব্দের পূর্ব্বে কখনও প্রয়োগ হয় নাই, এমন নহে। (তাহাতেই বা কি ? এ জন্য বলিতেছেন) অর্থ বোধের জন্যই প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ বশতঃই ব্যবহার হইতেছে। (এ যাবৎ যাহা

বলিলেন, প্রকৃত স্থলে তাহার যোজনা করিতেছেন) অর্থবোধার্থ অর্থাৎ অর্থবোধই যাহার প্রয়োজন, এমন সেই এই প্রকার শব্দ প্রয়োগে সামান্য শব্দের সামর্থ্য বশতঃ প্রয়োগের নিয়ম আছে। (উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝাইতেছেন) 'ছাগীকে গ্রামে লইয়া যাও', 'ঘৃত আহরণ কর', 'ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও'। সামান্য শব্দ হইয়াও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অজা, সার্পিষ্ এবং ব্রাহ্মণ শব্দ যথাক্রমে সামান্যতঃ ছাগী মাত্র, ঘৃত মাত্র এবং ব্রাহ্মণ মাত্রের বোধক হইয়াও সামর্থ্য বশতঃ ঐ সকল অর্থের অংশবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ঐ তিনটি শব্দ যথাক্রমে ছাগীবিশেষ, ঘৃতবিশেষ এবং ব্রাহ্মণবিশেষই বুঝাইতেছে। (সামর্থ্য কি, তাহা বলিতেছেন) যে অর্থে প্রয়োজন নির্ব্বাহের উপদেশ সম্ভব হয়, সেই অর্থে (শব্দগুলি) প্রবৃত্ত হয়, অর্থসামান্যে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ, (অর্থসামান্যে) প্রয়োজন নির্ব্বাহের উপদেশ সম্ভব হয় না। (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে ছাগী মাত্রকে গ্রামে লওয়া, ঘৃতমাত্রকে আহরণ করা এবং ব্রাহ্মণ মাত্রকে ভোজন করান অসম্ভব, সুতরাং ঐরূপ উপদেশ বা আদেশ সম্ভব নহে, এ জন্য ঐ স্থলে অজা শব্দ ছাগীবিশেষ অর্থে, সর্পিষ্ শব্দ ঘৃতবিশেষ অর্থে এবং ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রাহ্মণবিশেষ অর্থেই প্রযুক্ত হয়, বুঝিতে হইবে)।

এইরূপ 'নবকম্বল' এইটি সামান্য শব্দ ; 'ইহার নূতন কম্বল আছে' এইরূপ যে অর্থ (এখানে) সম্ভব হয়, সেই অর্থে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সেই অর্থ ই বুঝায়। ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এইরূপ যে অর্থ কিন্তু সম্ভব হয় না, সেই অর্থে প্রবৃত্ত হয় না অর্থাৎ তাহা বুঝায় না, ঐ স্থলে ঐরূপ অসম্ভব অর্থে উহার প্রয়োগ হয় না। (সুতরাং) অনুপপদ্যমান অর্থাৎ যাহা উপপন্ন হয় না, যাহা অসম্ভব, এমন অর্থের কল্পনার দ্বারা সেই এই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরবাক্য-প্রতিষেধ যুক্তিযুক্ত হয় না।

টিপ্পনী। প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছল করিলে, বাদী উহা যে অসদুত্তর, উহা একটা মিথ্যা অনুযোগ বা অভিযোগ মাত্র, ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইবেন ; তাহাকেই বলে ছলের প্রত্যবস্থান। প্রতিকূল ভাবে অবস্থানই প্রত্যবস্থান। ছলবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না, তাঁহার কল্পনা অযুক্ত, ইহা বুঝাইলেই তাঁহার ছলের প্রতিকূল ভাবে অবস্থান হয়। ফলতঃ প্রতিবাদ পূর্ব্বক কাহারও প্রতিষেধ করা বা খণ্ডন করাকেই প্রত্যবস্থান বলে এবং বস্তুতঃ প্রতিষেধ না হইলেও তাহাকে প্রত্যবস্থান বলা হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার এখানে শিষ্য-হিতের জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রদর্শিত বাক্ছলের কিরূপে প্রতিষেধ

করিতে হইবে, তাহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ সংক্ষেপে একটি সন্দর্ভের দ্বারা বক্তব্যটি বলিয়া পরে নিজেই তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাকেই বলে স্বপদবর্ণন, ভাষ্যগ্রন্থের উহা একটি লক্ষণ। বহু স্থলে কেবল স্বপদবর্ণন থাকাতেই ভাষ্যত্বনির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

ভাষ্যকারের প্রথম কথার মর্ম্ম এই যে, যে সকল অনেকার্থ-বোধক সামান্য শব্দ আছে, যেমন গো শব্দ, হরি শব্দ এবং নবকম্বল প্রভৃতি বাক্যরূপ শব্দ, ইহাদিগের দ্বারা কোন একটি বিশেষ অর্থ বুঝিতে হইলে দেশ, কাল, প্রকরণ, ঔচিত্য প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ামক বুঝা আবশ্যক, নচেৎ প্রকৃত স্থলে কোন্ অর্থ বক্তার অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত, তাহা বুঝা যায় না। নবকম্বল এইরূপ বহুব্রীহি সমাসসিদ্ধ বাক্যের দ্বারা যে দুইটি অর্থ বুঝা যায়, তাহার মধ্যে বাদীর কোন্ অর্থ বিবক্ষিত, তাহা বুঝিতে হইলে কোন্ অর্থ সেখানে সম্ভব, তাহা চিন্তা করিতে হইবে এবং কোন একটি অর্থবিশেষের ব্যাখ্যা করিতে গেলেও কেন সেই অর্থবিশেষের ব্যাখ্যা করিতেছি, কোন্ বিশেষ বা নিয়ামক দেখিয়া সেই বিশেষ অর্থটিই বাদীর বিবক্ষিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহা বলিতে হইবে, তাহা না বলিলে লোকে সে কল্পনা শুনিবে কেন? স্বেচ্ছানুসারে একটা ব্যাখ্যা করিয়া কাহারও কথায় দোষ ধরিলে তাহাই বা টিকিবে কেন? সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে ছলবাদী বাদীর অনেকার্থপ্রতিপাদক 'নবকম্বল' এই সামান্য শব্দ শ্রবণ করিয়া যে বাদীকে বলিলেন—আপনি এই ব্যক্তির নয়খানা কম্বল আছে বলিয়াছেন, তাহার এই কল্পনা করিতে তিনি ঐ স্থলে ঐ অর্থ বুঝিবার পক্ষে কোন্ বিশেষ বা নিয়ামক পাইয়াছেন, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাহা যখন তিনি বলিতে পারেন না, সেই বিশেষ এখানে যখন কিছুই নাই, তখন তাঁহার এই কল্পনা অসম্ভব। কোন বিশেষ না থাকিলে অনেকার্থ-প্রতিপাদক বাক্য বা শব্দের কোন একটি বিশেষ অর্থের কথন কল্পনা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বাদীর কথিত বালকের গাত্রে যদি পুরাতন কম্বল থাকিত অথবা অন্য কোন এমন বিশেষ বা নিয়ামক সেখানে থাকিত, যাহার দ্বারা বাদী সেই বালক নূতন কম্বলবিশিষ্ট, এ কথা বলিতে পারেন না, তাহা হইলে প্রতিবাদী ঐরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন। তাহা যখন নাই, তখন ছলবাদীর ঐ কল্পনা বা ঐরূপ কথা মিথ্যা অনুযোগ বা অভিযোগ মাত্র, উহা নিরর্থক দোষারোপ বা নিরর্থক প্রশ্ন। অনেক ভাষ্য-পুস্তকে "মিথ্যা নিয়োগমাত্রং" এইরূপ পাঠ আছে। কোন পুস্তকে "মিথ্যাভি-যোগমাত্রং" এইরূপ পাঠ আছে। মিথ্যানুযোগ স্থলে মিথ্যানিয়োগ, এইরূপ কথাও প্রমাদবশতঃ মুদ্রিত বা লিখিত হইতে পারে। মূলে "মিথ্যাভিযোগমাত্রং" এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে, ঐরূপ পাঠ কোন পুস্তকেও দেখা যায়। "মিথ্যানিয়োগমাত্রং" এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বকথায় আপত্তি হইতে পারে যে, বাদী 'নবকম্বল' এইরূপ অনেকার্থপ্রতিপাদক সাধারণ শব্দেরই বা কেন প্রয়োগ করেন? বাদী যদি 'নূতন কম্বল' এইরূপ অসাধারণ বা বিশেষ শব্দের দ্বারাই তাহার বিশেষ অর্থ টি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ত প্রতিবাদী ঠিক্ বুঝিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থান্তর কল্পনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং

এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ছলকারীরই অপরাধ কেন ? ঐরূপ বাক্যবক্তা বাদীরই অপরাধ নয় কেন ? এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—"প্রসিদ্ধশ্চ" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের ঐ কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ লোক-প্রসিদ্ধ পদার্থ। যিনি উহা জানেন না, তিনি বিচারে অধিকারীই নহেন। যিনি লোক-প্রসিদ্ধ পদার্থেও অজ্ঞ, তাঁহার সহিত কোন বিচারই হইতে পারে না। বাচক শব্দকে (অভিধীয়তেঽনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে) অভিধান বলে। এবং তাহার বাচ্য অর্থকে অভিধেয় বলে। এই শব্দের এই পদার্থটি অথবা এই পদার্থগুলি অভিধেয়, এইরূপ নিয়ম আছে। সকল অর্থই সকল শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য নহে। এই নিয়ম বিষয়ে যে নিয়োগ অর্থাৎ এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ অথবা এই অর্থগুলি বুঝিতে হইবে, এইরূপ যে সঙ্কেত, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ। এই সঙ্কেতকেই শব্দের শক্তি বলে। (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের শেষভাগ দ্রষ্টব্য)। এই সংকেতানুসারেই শব্দগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে পূর্ব্ব হইতেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এই সংকেতও সামান্য ও বিশেষ, এই দুই প্রকার আছে। নানার্থবোধক সামান্য শব্দ হইলে তাহার সংকেত সামান্য। বিশিষ্টার্থ-বোধক বিশেষ শব্দ হইলে তাহার সংকেত বিশেষ। এই সংকেতানুসারেই শব্দগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে সুচিরকাল হইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অর্থবোধের জন্যই এই শব্দ প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ প্রযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রয়োগ ও বৃদ্ধ-ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা স্থির থাকাতেই লোকে সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থের প্রকাশ করিতেছে এবং অন্য লোকেও সেই শব্দ শুনিয়া সেই অর্থ বুঝিতেছে এবং সেই পদার্থের ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং যখন অর্থবোধের জন্যই শব্দ প্রয়োগ হইতেছে, তখন এই শব্দ প্রয়োগে সামর্থ্যবশতঃই সামান্য শব্দের প্রয়োগ নিয়ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দ নিখিল ব্রাহ্মণের বাচক। ব্রাহ্মণ-সমষ্টিই ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও, এইরূপ বাক্যে ব্রাহ্মণ—এইরূপ সামান্য শব্দের যে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, ঐ প্রয়োগ নিখিল ব্রাহ্মণ অর্থে হইতেছে না, সামর্থ্যবশতঃ কতিপয় ব্রাহ্মণ বা কোনও ব্রাহ্মণ অর্থেই হইতেছে। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ যে ব্রাহ্মণ-সমষ্টি, তাহার অবয়ব অর্থাৎ অংশ বা ব্যষ্টি ব্রাহ্মণেই ঐরূপ সামান্য ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ হইতেছে; যিনি বোদ্ধা, তিনি সেখানে তাহাই বুঝিয়া থাকেন। ভাষ্যকার সামর্থ্যবশতঃ সামান্য শব্দের প্রয়োগ নিয়ম আছে বলিয়াছেন। এই সামর্থ্য কি, তাহা দেখাইতে হয়। তাই শেষে বলিয়াছেন যে, যে অর্থে অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব হয়, সামান্য শব্দ সেই অর্থেই প্রবৃত্ত হয়। অর্থ বলিতে প্রয়োজন, ক্রিয়া বলিতে নির্ব্বাহ বা সম্পাদন। বস্তুমাত্রই কোন না কোন প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে। এ জন্য দার্শনিক ভাষায় বস্তুমাত্রকেই বলা হয়—অর্থক্রিয়াকারী। যাহা অর্থক্রিয়াকারী নহে, তাহা বস্তু নহে, তাহা অলীক। ঐ অর্থক্রিয়া বা কোন প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য যে উপদেশ-বাক্য বা প্রবর্ত্তক বাক্য, তাহাই অর্থক্রিয়াচোদনা। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও, ছাগীকে গ্রামে লইয়া যাও, ঘৃত আহরণ কর ইত্যাদি বাক্যগুলি কোন প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য উপদেশ-বাক্য বা প্রবর্ত্তক বাক্য। সমস্ত ছাগী, সমস্ত ঘৃত এবং

সমস্ত ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। সুতরাং যে ছাগী, যে ঘৃত এবং যে ব্রাহ্মণ অর্থে ঐরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় অর্থাৎ প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য যে ছাগী প্রভৃতি তাৎপর্য্যে ঐরূপ উপদেশ-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই ছাগী প্রভৃতিই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগে অজা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয়, বোদ্ধা ব্যক্তি তাহাই বুঝিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগে অজা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ছাগীবিশেষ প্রভৃতি বুঝিলেও লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারা এখানে বুঝা যায় অর্থাৎ বক্তার তাৎপর্য্য বুঝিয়াই ঐরূপ বিশেষ অর্থ বুঝা যায়। যেখানে যে অর্থে সামান্য শব্দের সামর্থ্য আছে, তাহা বুঝিয়াই বক্তার তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। সামান্য শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ বুঝিলে লক্ষণার আশ্রয় করা হয়; কারণ, বিশেষ-রূপে বিশেষ অর্থে সামান্য শব্দের শক্তি নাই, ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত হইলেও বক্তার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সামান্যরূপে বিশেষ অর্থও লক্ষণা ব্যতিরেকে সামান্য শব্দের দ্বারা স্থলবিশেষে বুঝা যায়, ইহা নব্য নৈয়ায়িকও বলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চমূলী, সপ্তশতী ইত্যাদি প্রয়োগই তাহার দৃষ্টান্ত। পঞ্চমূলী বলিতে যে কোন পাঁচটি মূল বুঝায় না, মূলপঞ্চকবিশেষই বুঝাইয়া থাকে। সপ্তশতী বলিতে যে কোন গ্রন্থের যে কোন স্থানের সাত শত শ্লোক বুঝায় না, মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্যের তদাদি তদন্ত সাত শত শ্লোকই বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং এ সব স্থলে সামান্য শব্দের বিশেষার্থই গ্রহণ করিতে হয়। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার এখানে তাৎপর্য্যানুসারেই বিশেষার্থ গ্রহণের কথা বলিয়া গিয়াছেন[১]। লক্ষণার আশ্রয় করিলে ঐ দুই স্থলে দ্বিগুসমাস হইতে না পারায় ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। দ্বিগুসমাসে লাক্ষণিক অর্থের বোধ হয় না, এ জন্য ত্রিকটু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি প্রয়োগে লক্ষণার আশ্রয় করিয়া কর্ম্মধারয় সমাসই হইয়া থাকে, ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের সিদ্ধান্ত। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকার দ্বিগুসমাস-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ফল কথা, ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, লক্ষণা ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণত্বরূপে ব্রাহ্মণ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণবিশেষ বুঝা যায়। এইরূপ অন্যান্য সামান্য শব্দের দ্বারাও সামর্থ্যবশতঃ ঐরূপ বুঝা যায় এবং বুঝিতে হয়। ব্রাহ্মণ শব্দ প্রভৃতি সামান্য শব্দ হইলেও সর্ব্বত্র তাহার অর্থসামান্যে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, অর্থসামান্যে পূর্ব্বোক্ত অর্থক্রিয়ার উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। অর্থক্রিয়ার জন্য উপদেশ-বাক্য বলিলে তাহার মধ্যে সামান্য শব্দগুলি যথাসম্ভব ঐরূপ বিশেষ অর্থই বুঝাইবে। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাঁহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, শব্দগুলি সংকেতানুসারেই পূর্ব্ব হইতেই সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে এবং অর্থবোধের জন্যই শব্দ প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে এবং শব্দের অর্থবোধ প্রযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে। শব্দের মধ্যে যেগুলি সামান্য শব্দ, তাহার যেখানে যে অর্থ সম্ভব, সেই বিশেষ অর্থই সেখানে বুঝিতে হয়, সেইরূপ অর্থেই সেখানে তাহার প্রয়োগ হয়। নবকম্বল—এইটি সামান্য শব্দ। ইহার যে অর্থ সেখানে সম্ভব, সেই অর্থই

১। পঞ্চমূলীত্যাদৌ তু মূলপঞ্চকত্বেনৈব মূলবিশেষেষু তাৎপর্য্যাং ন তু বিশেষরূপেণাপি ইত্যাদি।—(শব্দশক্তি-প্রকাশিকা)।

বুঝিতে হইবে। সামান্য শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত থাকিলে দেশ, কাল, প্রকরণ, ঔচিত্য প্রভৃতির দ্বারা সেখানে কোন বিশেষ অর্থই বুঝিতে হইবে। সংকেতানুসারে সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিলে তজ্জন্য বাদী অপরাধী হইতে পারেন না। বাদী বিশেষ শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, তিনি নানার্থ সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন,ইহা বাদীর অপরাধ বলা যায় না। কারণ, বাদী সংকেতানুসারেই সামান্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সামান্য শব্দে ঐরূপ সংকেত থাকে কেন? এই বলিয়া সংকেতকে অপরাধী বলিতে পার, বল; কিন্তু বাদীকে অপরাধী বলিতে পার না। বাদীকে ঐরূপ সামান্য শব্দ প্রয়োগের জন্য অপরাধী বলিলে, ছলকারী প্রতিবাদীকেও ঐ ভাবে অপরাধী হইতে হইবে। কারণ, তাঁহার উচ্চারিত বাক্যগুলির মধ্যেও সামান্য শব্দ পাওয়া যাইবে অথবা যে কোনরূপে তাঁহার কথাতেও কোনরূপ ছল করা যাইবে; তিনি সংকেতানুসারেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইত্যাদি বলিয়া আর তখন নিজের নিরপরাধত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, বাদী সামান্য শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার যে বিশেষ অর্থটি যেখানে উপপন্ন হয় না, সেই অর্থের কল্পনা করিয়া বাদীর বাক্যের প্রতিষেধ করা অযুক্ত, ঐরূপ করিলে তজ্জন্য ছলকারী প্রতিবাদীই অপরাধী। বাদীর ঐ স্থলে কোনই অপরাধ নাই। ছলকারী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়াও ছল করেন, তাহা হইলে উহা সত্য বুঝিয়াও সত্য গোপন, অথবা কপটতামূলক সত্যের অপলাপ। আর যদি বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিয়া ছল করা হয়, তাহা হইলে ছলকারীর অজ্ঞতারূপ দোষ অপরিহার্য্য। পরন্তু বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিলে বাদীর নিকটে প্রশ্ন করিয়া তাহা বুঝা উচিত। ছলকারী বুঝিতে পারেন নাই এবং প্রশ্ন করিয়াও বুঝিয়া লন নাই, এই ক্ষেত্রে বাদীর অপরাধ কি? ফলকথা, যে ভাবেই ছল করা হউক, সেখানে ছলকারী প্রতিবাদীই অপরাধী, বাদীর ঐ স্থলে কোনই অপরাধ নাই।

এই শব্দ এই অর্থের বাচক অথবা এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপ সংকেত ভিন্ন ন্যায়মতে শব্দ ও অর্থের কোন সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। ভাষ্যকার এখানে শব্দ-সংকেতের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে "নবকম্বল" বাক্যরূপ শব্দেরও সংকেত তিনি স্বীকার করিতেন, ইহা মনে আসে। পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যে শক্তি স্বীকার না করিলেও প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝিবার হেতু পাওয়া যায়। যথাস্থানে এ কথার আলোচনা পাওয়া যাইবে। (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের শেষভাগ ও দ্বিতীয় আহ্নিকের শেষভাগ দ্রষ্টব্য)।

প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকগুলিতে 'অর্থক্রিয়াদেশনা' এইরূপ পাঠ আছে। দেশনা বলিতেও উপদেশ-বাক্য[১] বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার 'অর্থক্রিয়াচোদনা' এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করায় উহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাক্যকে প্রাচীনগণ 'চোদনা' বলিয়াছেন[২]। শবর স্বামীর চোদনা শব্দের ব্যাখ্যায়[৩] ভট্ট কুমারিল শব্দমাত্রই চোদনা শব্দের গৌণার্থ,ইহা বলিয়াছেন ॥১২॥

১। দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ। ইত্যাদি (বোধিচিত্তবিবরণ)।

২। চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুঃ। (শবরভাষ্য) ২ সূত্রে।

৩। চোদনেত্যত্রগৌণ্যাত্র শব্দমাত্রবিবক্ষয়া। ইত্যাদি।—মীমাংসাদ্বিতীয়সূত্রভাষ্যবার্ত্তিকের ৭ শ্লোক।

সূত্র। সম্ভবতোঽর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থ-কল্পনা সামান্যচ্ছলম্ ॥১৩॥৫৪॥

অনুবাদ। সম্ভাব্যমান পদার্থের অর্থাৎ ইহা হইতে পারে, ইহা সম্ভব, এইরূপ তাৎপর্য্যে কথিত পদার্থের অতি সামান্য ধর্ম্মের যোগবশতঃ অর্থাৎ যে সামান্য ধর্ম্মটি ঐ সম্ভাব্যমান পদার্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্ম্মটিতে যে পদার্থ অসম্ভব, বক্তা যাহা বলেনও নাই, সেই পদার্থের যে আরোপ, ফলিতার্থ এই যে, ঐরূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা যে বাক্যব্যাঘাত বা প্রতিষেধ, তাহা সামান্যছল।

ভাষ্য। 'অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন' ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ 'সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্প'দিতি। অস্য বচনস্য বিঘাতোঽর্থবিকল্পো-পপত্ত্যাঽসম্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে। যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবতি ব্রাত্যেঽপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোঽপি ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যস্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন ইতি। যদ্‌বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যেতি চ তদতিসামান্যম্। যথা ব্রাহ্মণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং ক্বচিদাপ্নোতি ক্বচিদত্যেতি। সামান্যনিমিত্তং ছলং সামান্যচ্ছলমিতি।

অনুবাদ। আহা, এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন, এই কথা (কেহ) বলিলে কেহ অর্থাৎ দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি বলিলেন,—ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব। (এখানে) অসম্ভূত অর্থের কল্পনারূপ অর্থবিকল্পোপপত্তির দ্বারা অর্থাৎ (ছলের সামান্য লক্ষণসূত্রোক্ত) বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা এই বাক্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়বাদীর বাক্যের বিঘাত (ছলকারী কোন তৃতীয় ব্যক্তি) করে। (সে কিরূপে, তাহা বলিতেছেন)। যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও অর্থাৎ যাহার উপনয়নের কাল গিয়াছে, তবুও উপনয়ন হয় নাই, বেদাধ্যয়ন হয় নাই, এমন ব্রাহ্মণেও সম্ভব হউক ? বিশদার্থ এই যে, ব্রাত্য ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, তিনিও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন ? যাহা বিবক্ষিত পদার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহা অর্থাৎ সেই ধর্ম্মকে অতিসামান্য বলে। যেমন ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পৎকে কোন স্থলে (বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে) প্রাপ্ত হয়,

কোনও স্থলে (ব্রাত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণে) অতিক্রম করে, (অর্থাৎ প্রকৃত স্থলে ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্মই বিদ্যাচরণসম্পদের অতি সামান্য ধর্ম্ম, উহা বক্তা বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে বলেন নাই এবং উহাতে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব সম্ভবও নহে, কিন্তু ছলকারী ঐ ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণত্ব ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও আছে, সেখানে বিদ্যাচরণ-সম্পদ্ নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু হইতে পারে না, ইহাই ছল-কারীর বক্তব্য)। সামান্যনিমিত্তক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্ম্মনিমিত্তক ছল (এ জন্য) সামান্য ছল, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্ম্মনিমিত্তক ছল বলিয়াই ইহার নাম সামান্যছল।

টিপ্পনী। বাক্‌ছলের লক্ষণ বলিয়া মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত সামান্যছলের লক্ষণ বলিয়াছেন। সামান্যছল পূর্ব্বোক্ত বাক্‌ছলের ন্যায় শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া হয় না। সামান্যধর্ম্ম-নিমিত্তক ছল বলিয়াই ইহার নাম সামান্যছল। সামান্য ধর্ম্ম বলিতে যে কোনরূপ সামান্য ধর্ম্ম এখানে বুঝিতে হইবে না। এই জন্য সূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন,—'অতিসামান্যযোগাৎ।' ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে ধর্ম্মটি বক্তার বিবক্ষিত অর্থকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকে অতিক্রমও করে, এমন ধর্ম্মই সূত্রোক্ত অতিসামান্য ধর্ম্ম। যেমন কোন ব্যক্তি কোন একজন বেদাধ্যয়ন-শীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন। বেদবিদ্যার অধ্যয়নাদি-রূপ আচরণই ব্রাহ্মণের সম্পৎ। উপনিষৎ ঐরূপ ব্রাহ্মণকে 'অনূচান' বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাচরণসম্পৎ সকল ব্রাহ্মণেই থাকে না। যিনি উপনীত হইয়া বেদবিদ্যার অধ্যয়নাদি করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাঁহাতেই ঐ সম্পৎ থাকে। শিশু ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাত্য ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া ব্রাহ্মণ। দেহগত ব্রাহ্মণত্ব জাতি তাহাদিগেরও আছে, কিন্তু ঐ সকল ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ নাই। ঐ সকল ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবই নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্রাহ্মণ-বিশেষেই উহা সম্ভব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যস্থলে ব্রাহ্মণবিশেষের বিদ্যাচরণ-সম্পত্তিই সূত্রোক্ত 'সম্ভবৎ' পদার্থ এবং উহাই পূর্ব্ববক্তার বিবক্ষিত এবং পূর্ব্ববক্তার ঐ বাক্যটি প্রশংসার্থ। ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার জন্য ঐ বাক্যের সমর্থন করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব। অর্থাৎ ইনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ইহাঁর বিদ্যাচরণসম্পৎ থাকাই সম্ভব। এই বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণ-সম্পদের হেতু বলা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইবেন, ইহা বলা দ্বিতীয় বক্তার উদ্দেশ্য নহে, দ্বিতীয় বক্তা তাহা বলেন নাই। কিন্তু ঐ স্থলে তৃতীয় কোন বক্তা দ্বিতীয় বক্তার তাৎপর্য্য বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে ধরিয়া দোষপ্রদর্শন করিলেন,—যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউক? তৃতীয় বক্তার কথা এই যে, ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণ-সম্পদের হেতু

বলিয়াছ, তাহা বলিতে পার না। ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব আছে, কিন্তু সেখানে বিদ্যাচরণ-সম্পত্তি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব জাতি বিদ্যাচরণসম্পদের ব্যভিচারী বলিয়া উহা তাহার সাধন হয় না। এখানে ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্মটি বিদ্যাচরণসম্পৎকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে অর্থাৎ বিদ্যাচরণসম্পন্ন ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে, ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে, এ জন্য উহা বক্তার বিবক্ষিত এবং সম্ভবপদার্থ যে বিদ্যাচরণসম্পৎ, তাহার পক্ষে অতি সামান্য ধর্ম্ম। ব্রাত্য ব্রাহ্মণে উহার যোগ বা সম্বন্ধ থাকাতে তৃতীয় বক্তা অসম্ভব অর্থ কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এ জন্য তৃতীয় বক্তার ঐ দোষ প্রদর্শন সামান্যছল হইয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্মে বিদ্যাচরণ-সম্পদের হেতুত্ব অসম্ভূত পদার্থ, অর্থাৎ উহা সম্ভব নহে। তৃতীয় বক্তা ঐ অসম্ভব হেতুত্বের কল্পনা বা আরোপ করিয়া ব্রাত্য ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বরূপ অতি সামান্য ধর্ম্ম আছে বলিয়া এখানে ছল করিয়াছেন।

ভাষ্য। অস্য চ প্রত্যবস্থানং। অবিবক্ষিতহেতুকস্য বিষয়ানুবাদঃ, প্রশংসার্থত্বাদ্বাক্যস্য, তদত্রাসন্তূতার্থকল্পনানুপপত্তিঃ যথাসম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্তু ক্ষেত্রং প্রশস্যতে। সোঽয়ং ক্ষেত্রানুবাদো নাস্মিন্ শালয়ো বিধীয়ন্ত ইতি। বীজাত্তু শালিনির্ব্বৃত্তিঃ সতী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যা-চরণসম্পদিতি, সম্পদ্বিষয়ো ব্রাহ্মণত্বং ন সম্পদ্ধেতুঃ, ন চাত্র হেতুর্ব্বি-বক্ষিতঃ,—বিষয়ানুবাদস্ত্বয়ং, প্রশংসার্থত্বাদ্বাক্যস্য। সতি ব্রাহ্মণত্বে সম্পদ্ধেতুঃ সমর্থ ইতি। বিষয়ঞ্চ প্রশংসতাবাক্যেন যথাহেতুতঃ ফল-নির্ব্বৃত্তির্ন প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোঽসম্ভূতার্থকল্পনয়া নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। এই সামান্য ছলেরও প্রত্যবস্থান অর্থাৎ সমাধান বা উত্তর (বলিতেছি)। যিনি হেতুবিবক্ষা করেন নাই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলেন নাই, সেই দ্বিতীয় বক্তার (ঐ বাক্যটি) বিষয়ের অনুবাদ। কারণ, (ঐ) বাক্যটি প্রশংসার্থ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার জন্যই দ্বিতীয় বক্তা ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার সেই বাক্যের ব্যাঘাতের) উপপত্তি হয় না। [একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন]। যেমন এই ক্ষেত্রে শালি (কলম প্রভৃতি ধান্যবিশেষ) সম্ভব। (এই বাক্যের দ্বারা) বীজ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাকৃত হয় নাই, বিবক্ষিতও হয় নাই,

অর্থাৎ যিনি ঐরূপ কথা বলেন, তিনি এই ক্ষেত্রে বীজ রোপণ না করিলেও শালি জন্মে, ইহা বলেন না এবং বীজাদি কারণের দ্বারা এই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, এইরূপ কথাও তিনি বলেন না, ঐরূপ বলা সেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্র ঐ বাক্যের দ্বারা প্রশংসিত হয়, অর্থাৎ ঐ স্থলে কেবল ক্ষেত্রকে প্রশংসা করাই বক্তার উদ্দেশ্য। বিশদার্থ এই যে, সেই এইটি (পূর্ব্বোক্ত বাক্যটি) ক্ষেত্রের অনুবাদ। এই বাক্যে (ক্ষেত্রে) শালি বিহিত হয় না অর্থাৎ ঐ বাক্যেব দ্বারা বক্তা বীজ ব্যতীতও সেই ক্ষেত্রে শালির বিধান করেন না এবং বীজ হইতে শালির যে উৎপত্তি হয়, তাহাও (ঐ বক্তার) বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে সেই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, ইহা বলাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

এইরূপ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব, এই স্থলে ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়[1], বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু নহে, এই বাক্যে হেতু বিবক্ষিতও নহে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা বক্তার উদ্দেশ্যও নহে, বক্তা তাহা বলেনও নাই, কিন্তু এই বাক্যটি বিষয়ের অনুবাদ ; কারণ, বাক্যটি প্রশংসার্থ।

[ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের প্রকৃতস্থলে প্রশংসা কি, তাহা বলিতেছেন]। ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু (অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদি) সমর্থ হয় অর্থাৎ বিদ্যাচরণসম্পদ্ জন্মাইতে সামর্থ্যশালী হয়। বিষয়ের প্রশংসাকারী বাক্যের দ্বারা যথাহেতু হইতে ফলের উৎপত্তি নিষেধ করা হয় না, (অর্থাৎ যে প্রকার হেতুর দ্বারাই যে ফল জন্মে, সেই প্রকার হেতুর দ্বারাই সেই ফল জন্মিবে। অধ্যয়ন প্রভৃতি বিদ্যাচরণসম্পদের যেগুলি হেতু, তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইতে পারেন না। কেহ কোন বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা করিলে তাহাতে ব্রাহ্মণত্বই বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইতে অধ্যয়নাদি কারণ আবশ্যক নাই, এ কথা বলা হয় না। কেবল ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা করাই হয়)। সুতরাং এইরূপ হইলে অসম্ভব পদার্থের অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব জাতিতে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব যাহা অসম্ভব, যাহা ঐ স্থলে দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিতও নহে, তাহার কল্পনার অর্থাৎ আরোপের দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার) বাক্যব্যাঘাত উপপন্ন হয় না।

১। বিষয় শব্দের দেশ অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়। এ জন্য স্থান বা আধার বুঝাইতেও প্রাচীনগণ বিষয় শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণের বিষয়, এই কথা বলিলে বিদ্যাচরণের স্থান বুঝা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণের স্থান, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য। ব্রাহ্মণত্বই ব্রাহ্মণকে বিদ্যাচরণের বিষয় বা স্থান করিয়াছে, তাই ব্রাহ্মণত্বকে বিষয় বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষিপ্রোক্ত সামান্য ছলের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে তাহারও সমাধান বা প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমাধানের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম বক্তা ব্রাহ্মণবিশেষের প্রশংসার জন্য যে বাক্য বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা সেই বাক্যের অনুমোদন করিতে ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসাই করিয়াছেন। ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ইহা তিনি বলেন নাই। সুতরাং তৃতীয় বক্তা ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থে কোন দোষ না হওয়ায় উহা অসদুত্তর। দ্বিতীয় বক্তা যদি ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তৃতীয় বক্তার প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত প্রকার দোষ হইত। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তার তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে; ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে তিনি বেদবিদ্যার অধিকারী এবং যে কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, সেই কর্ম্মফল ব্রাহ্মণকে বিদ্যার আচরণে প্রবৃত্ত করে এবং ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি শাস্ত্রানুসারে বিদ্যার আচরণ করিতে বাধ্য, ব্রাহ্মণের চিরাচরিত আচারও ঐরূপ, সুতরাং ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণ-সম্পদ্ সম্ভব, এইরূপ তাৎপর্য্যে যাহা বলা হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণত্বই বিদ্যাচরণসম্পদের কারণ, অধ্যয়নাদি না করিলেও ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, ইহা বলা হয় না। অধ্যয়নাদি ব্যতীত ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইতে পারেন না। বিদ্যাচরণ-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণও চিরকালই আছেন। অত্রিসংহিতায় দশবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায়। সর্ব্ববিধ ব্রাহ্মণেরই দেহগত ব্রাহ্মণত্ব জাতি আছে, কিন্তু অধ্যয়নাদি কারণের অভাবে বিদ্যাচরণসম্পত্তি সকল ব্রাহ্মণের নাই, তাহা থাকিতেই পারে না। পূর্ব্বোক্ত স্থলে দ্বিতীয় বক্তা ব্রাহ্মণত্বকেই ঐ বিদ্যাচরণসম্পত্তির কারণ বলেন নাই। তিনি বিদ্যাচরণসম্পত্তি লাভে অধ্যয়নাদি কারণের অপলাপ করিয়া, যেহেতু ইনি ব্রাহ্মণ, অতএব অবশ্যই ইনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, ইহা বলেন নাই, তিনি ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্ববক্তা যে ব্রাহ্মণত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা তাহার প্রশংসার জন্য সেই ব্রাহ্মণত্বের পুনরুল্লেখ করিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তার বাক্যটি ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার্থ, এ জন্য উহা ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের অনুবাদ। সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলেন—এই ক্ষেত্রে শালি উৎপাদন করিবে, তখন দ্বিতীয় বক্তা যদি বলেন যে, এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বীজাদি কারণ ব্যতীতই শালি উৎপন্ন হয়, এ কথা বলা হয় না। বীজাদি কারণের দ্বারা শালি উৎপন্ন হয়, ইহা বলাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; ক্ষেত্রের প্রশংসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব অর্থাৎ এই ক্ষেত্র শালি জন্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র, এইমাত্র বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ঐ বাক্যটি প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্রের অনুবাদ। ঐ বাক্যে শালি বিহিত হয় নাই, সুতরাং উহা বিধায়ক বাক্য নহে। পূর্ব্বে কোন বক্তা সেই ক্ষেত্রে শালি বিধায়ক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা পূর্ব্ববাদীর উক্ত ক্ষেত্রের প্রশংসার্থ সেই ক্ষেত্রের অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, এইরূপ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব; এই বাক্য ও ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের অনুবাদ ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়, কিন্তু হেতু নহে; হেতু বলা বক্তার উদ্দেশ্যও নহে। ব্রাহ্মণত্ব

থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পত্তির হেতুগুলি সমর্থ হয়, তাই ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়। বিষয় শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার এখানে যাহা থাকিলে অর্থাৎ যাহার আধারে প্রকৃত-কার্য্যের কারণগুলি সমর্থ বা সামর্থ্যশালী অর্থাৎ সফল হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐরূপ বিষয় পদার্থ প্রকৃত কার্য্যে হেতু নহে, ইহাই ভাষ্যকারের কথা। পূর্ব্বোক্ত প্রকার সামান্য ছল অনেক সময়েই হইয়া থাকে। বক্তার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ঐরূপ প্রতিবাদ হয় এবং ভাষ্যোক্তরূপে আবার তাহার প্রতিবাদ হয়। লৌকিক বিষয়েও যে কত বাদ-প্রতিবাদ ঐ ভাবে হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল চিন্তা করুন ॥১৩॥

সূত্র। ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশেঽর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্ ॥১৪॥৫৫॥

অনুবাদ। ধর্ম্মবিকল্পের নির্দ্দেশ হইলে অর্থাৎ শব্দের ধর্ম্ম যে যথার্থ প্রয়োগ, তাহার যে বিকল্প অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ মুখ্য, তাহা হইতে ভিন্নার্থে প্রয়োগ, তাহার নির্দ্দেশ হইলে, ফলিতার্থ এই যে, লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, অর্থসদ্ভাবের দ্বারা যে প্রতিষেধ, অর্থাৎ মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন, তাহা উপচারছল।

ভাষ্য। অভিধানস্য ধর্ম্মো যথার্থপ্রয়োগঃ। ধর্ম্মবিকল্পোঽন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র প্রয়োগঃ। তস্য নির্দ্দেশে ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশে। যথা—মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি অর্থসদ্ভাবেন প্রতিষেধঃ, মঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি। কা পুনরত্রার্থবিকল্পোপপত্তিঃ ? অন্যথা প্রযুক্তস্যান্যথাঽর্থকল্পনং, ভক্ত্যা প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং। উপচারবিষয়ং ছলমুপচারছলং। উপচারো নীতার্থঃ, সহচরণাদিনিমিত্তেনাতদ্ভাবে তদ্বদভিধানমুপচার ইতি।

অনুবাদ। অভিধানের অর্থাৎ শব্দের ধর্ম্ম যথার্থ প্রয়োগ। ধর্ম্মের বিকল্প বলিতে (এখানে) অন্য অর্থে দৃষ্ট শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ, অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থে সামান্যতঃ প্রয়োগ দেখা যায়, কোন বিশেষবশতঃ তাহা হইতে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগই এই সূত্রোক্ত ধর্ম্মবিকল্প। তাহার নির্দ্দেশে (এই অর্থে সূত্রে বলা হইয়াছে) ধর্ম্মবিকল্প-নির্দ্দেশে। (উদাহরণ) যেমন মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এই স্থলে অর্থাৎ কেহ ঐ বাক্য বলিলে অর্থসদ্ভাবের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের সদর্থ বা মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়া নিষেধ করা হয়। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) মঞ্চস্থিত পুরুষগণ রোদন করিতেছে, কিন্তু মঞ্চ (কাষ্ঠের আসনবিশেষ) রোদন

করিতেছে না। (প্রশ্ন) এই স্থলে অর্থবিকল্পরূপ উপপত্তি কি ? অর্থাৎ ছলের সামান্য লক্ষণে যে অর্থ-বিকল্পরূপ উপপত্তি বলা হইয়াছে, যাহা ছল মাত্রেই আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে কি আছে ? (উত্তর) অন্যপ্রকারে প্রযুক্ত শব্দের অন্য প্রকার অর্থকল্পনা। বিশদার্থ এই যে, লক্ষণার দ্বারা প্রয়োগ হইলে প্রধানের দ্বারা অর্থাৎ শক্তির দ্বারা কল্পনা (অর্থান্তর কল্পনা)। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে মঞ্চস্থিত পুরুষ বুঝাইতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু ছলকারী প্রতিবাদী মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ যে মঞ্চ, তাহা অবলম্বন করিয়া নিষেধ করিয়াছেন যে, মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ পুরুষগণই রোদন করিতেছে। তাহা হইলে মঞ্চ-শব্দের অর্থ বিকল্প বা অর্থান্তর কল্পনা-রূপ উপপত্তির দ্বারাই এখানে ছল হইয়াছে। উপচার-বিষয়ক ছল—উপচার-ছল। অর্থাৎ লাক্ষণিক বা গৌণ প্রয়োগরূপ উপচারকে বিষয় করিয়া (আশ্রয় করিয়া) পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছল করা হয় ; এ জন্য ইহার নাম উপচারছল। উপচার 'নীতার্থ', অর্থাৎ সাহচর্য্য প্রভৃতি কোন নিমিত্ত কর্ত্তৃক যেখানে কোন শব্দ মুখ্য অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ প্রাপিত হয়, তাহাই উপচার। তদ্‌ভাব না থাকিলেও সাহচর্য্য প্রভৃতি (কোন) নিমিত্তবশতঃ তদ্বৎকথন উপচার। (অর্থাৎ যে অর্থে যে শব্দের বাচ্যতা নাই, সাহচর্য্য প্রভৃতি কোন নিমিত্তবশতঃ সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থের কথনই উপচার, ইহা মহর্ষি গোতম নিজেই বলিয়াছেন)।

টিপ্পনী। সূত্রে প্রথমেই যে ধর্ম্ম শব্দটি আছে, উহার দ্বারা শব্দের ধর্ম্মই মহর্ষির বিবক্ষিত। যাহার দ্বারা কোন অর্থ অভিহিত হয়, এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা ভাষ্যের প্রথমে 'অভিধান' বলিতে শব্দ বুঝিতে হইবে। যে শব্দটি যে অর্থে সামান্যতঃ প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগই তাহার যথার্থ প্রয়োগ, উহা শব্দের ধর্ম্ম। যেমন জল শব্দের জল অর্থে প্রয়োগ, মঞ্চ শব্দের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসনবিশেষ অর্থে প্রয়োগ, এইগুলি শব্দের যথার্থ প্রয়োগ। শব্দের মুখ্যার্থ হইতে অন্য অর্থে প্রয়োগই এখানে ভাষ্যকারের মতে ধর্ম্মবিকল্প। যেমন মঞ্চ শব্দের 'মঞ্চস্থিত পুরুষ' অর্থে প্রয়োগ। উহা মঞ্চ শব্দের মুখ্যার্থ নহে ; উহাকে বলে লাক্ষণিক অর্থ। ঐ অর্থেও মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এইরূপ ধর্ম্মবিকল্পের নির্দ্দেশকেই সূত্রোক্ত ধর্ম্মবিকল্প-নির্দ্দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্দের ধর্ম্ম প্রয়োগ। তাহার বিকল্প বলিতে দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগ দ্বিবিধ ;—মুখ্য এবং গৌণ। শব্দের সামান্যতঃ মুখ্য প্রয়োগই হয়। কোন বিশেষবশতঃ কোন কোন স্থলে গৌণ প্রয়োগও হয়। সেই ধর্ম্ম-বিকল্পপ্রযুক্ত যে নির্দ্দেশ অর্থাৎ বাক্য, তাহাই ধর্ম্ম-বিকল্প-নির্দ্দেশ। যাহার দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, এই অর্থে সূত্রে নির্দ্দেশ শব্দের দ্বারা বাক্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যের প্রচলিত পাঠানুসারে তাৎপর্য্য-

টীকাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যব্যাখ্যা বলা যায় না। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের কথার উল্লেখ করিয়াই এখানে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রচলিত পাঠই মূলে গৃহীত হইয়াছে। সকল পুস্তকেই ঐরূপ পাঠ দেখা যায়।

প্রকৃত কথা এই যে, অনেক শব্দের অর্থবিশেষে গৌণ বা লাক্ষণিক প্রয়োগ সুচিরকাল হইতেই লোকসিদ্ধ আছে। উহাকে প্রাচীনগণ 'উপচার' বলিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৫৯ সূত্রে সাহচর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিত্তবশতঃ এই উপচার হয়, এ কথা বলিয়াছেন। যেমন কোন ব্যক্তি মঞ্চস্থ ব্যক্তিদিগের রোদন শুনিয়া বলিলেন,—মঞ্চগণ রোদন করিতেছে। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদ করিলেন যে, মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ ব্যক্তিরাই রোদন করিতেছে। মঞ্চ অচেতন পদার্থ, তাহা রোদন করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। মঞ্চস্থ ব্যক্তিরা মঞ্চে অবস্থান করায় ঐ স্থানরূপ নিমিত্তবশতঃ মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের উপচার প্রসিদ্ধই আছে (২ অ০, ২ আ০, ৫৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। প্রতিবাদী ঐ উপচারকে বিষয় করিয়া ঐ স্থলে মঞ্চ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা যে নিষেধ করিলেন, তাহা উপচার-ছল। মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসনবিশেষ। তাহা অচেতন পদার্থ বলিয়া রোদন করিতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে অর্থ-সদ্ভাবের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের যে অর্থের সদ্ভাব বা মুখ্যতা আছে, সেই মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়াই ঐ স্থলে প্রতিবাদী ঐরূপ নিষেধ করিয়াছেন। উদ্যোতকরের মতে অর্থ-সদ্ভাবের প্রতিষেধই সূত্রোক্ত অর্থ-সদ্ভাব-প্রতিষেধ। মূলকথা, বাদী যে মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়া মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এই কথা বলিয়াছেন, প্রতিবাদী তাহা বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ ধরিয়া, মঞ্চের রোদন অসম্ভব বলিয়া বাদীর বাক্যের যে ব্যাঘাত করিলেন, তাহা উপচারছল। ছলমাত্রেই অর্থবিকল্পরূপ উপপত্তি চাই, এখানেও তাহা আছে ; কারণ, লক্ষণার দ্বারা মঞ্চ শব্দের 'মঞ্চস্থ ব্যক্তি' অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, শক্তির দ্বারা প্রতিবাদী তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনা করিয়াছেন। মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ যখন এখানে বাদীর বিবক্ষিত নহে, তখন ঐ মুখ্য অর্থ গ্রহণ এখানে ছলকারীর অর্থান্তর কল্পনাই হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এক অর্থে চিরপ্রযুক্ত শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা হইলে সকল শব্দেরই সকল অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে অর্থাৎ সকল অর্থেই সকল শব্দের উপচার হইতে পারে। এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"উপচারো নীতার্থঃ।" তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নীতার্থঃ প্রাপিতার্থঃ সহচরণাদিনা নিমিত্তেনেতি"। অর্থাৎ উপচার নিজের ইচ্ছা-মত হয় না। সাহচর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কোন নিমিত্ত যেখানে কোন শব্দকে অন্য অর্থ প্রাপ্ত করায়, সেখানেই সেই অর্থে সেই শব্দের উপচার বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, সেইরূপ প্রয়োগই উপচার। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ ব্যাখ্যার পরে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, এক অর্থে দৃষ্ট শব্দের যে অন্য অর্থে প্রয়োগ, তাহা সেই শব্দের মুখ্য অর্থের

সহিত গৌণ অর্থের কোন সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্তই হয়, সুতরাং যে কোন শব্দের যে কোন অর্থে ঐরূপ উপচার বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হইতে পারে না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কেহ কেহ মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়াও উপচার-ছল হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় লাক্ষণিক অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহাই উপচার-ছল বলিয়া বুঝা যায়। অবশ্য মুখ্য অর্থের ন্যায় গৌণ অর্থ ধরিয়াও প্রতিষেধ হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে গৌণ অর্থ গ্রাহ্য নহে। সুতরাং মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধকে ভাষ্যকার উপচার-ছল বলেন নাই। মহর্ষির সূত্রের দ্বারাও সরল ভাবে তাহা বুঝা যায় না। উপচার-ছল, এই নামের দ্বারাও সহজে তাহা বুঝা যায় না। মনে হয়, এই সকল কারণেই ভাষ্যকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

ভাষ্য। অত্র সমাধিঃ, প্রসিদ্ধে প্রয়োগে বক্তুর্যথাভিপ্রায়ং শব্দার্থয়োরনুজ্ঞা-প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ। প্রধানভূতস্য শব্দস্য ভাক্তস্য চ গুণভূতস্য প্রয়োগ উভয়োর্লোকসিদ্ধঃ। সিদ্ধপ্রয়োগে যথা বক্তুরভিপ্রায়স্তথা শব্দার্থাবনুজ্ঞেয়ৌ, প্রতিষেধ্যৌ বা ন ছন্দতঃ। যদি বক্তা প্রধানশব্দং প্রযুক্তে যথাভূতস্যাভ্যনুজ্ঞা প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ, অথ গুণভূতং তদা গুণভূতস্য, যত্র তু বক্তা গুণভূতং শব্দং প্রযুঙ্ক্তে, প্রধানভূতমভিপ্রেত্য পরঃ প্রতিষেধতি, স্বমনীষয়া প্রতিষেধোঽসৌ ভবতি ন পরোপালম্ভ ইতি।

অনুবাদ। এই উপচার-ছল বিষয়ে সমাধান (বলিতেছি)। প্রসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে শব্দ এবং অর্থের অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ হয়, ছলের দ্বারা অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে হয় না। বিশদার্থ এই যে, প্রধানভূত শব্দের অর্থাৎ মুখ্য শব্দের এবং ভাক্ত কি না গুণভূত (অপ্রধান) শব্দের প্রয়োগ উভয় পক্ষে লোকসিদ্ধ, অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ এই দ্বিবিধ শব্দের প্রয়োগই যে লোকসিদ্ধ, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত। সিদ্ধ প্রয়োগে অর্থাৎ লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার যে প্রকার অভিপ্রায়, তদনুসারে শব্দ ও অর্থকে অনুজ্ঞা করিবে, অথবা নিষেধ করিবে,—ছলের দ্বারা অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে করিবে না। বক্তা যদি প্রধান শব্দ প্রয়োগ করেন, (তাহা হইলে) যথাভূত অর্থাৎ সেখানে ঐ শব্দ এবং তাহার অর্থ যে প্রকার, তাহারই অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ করিতে হইবে, স্বেচ্ছানুসারে করিতে হইবে না, আর যদি বক্তা গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান বা লাক্ষণিক শব্দ

প্রয়োগ করেন, (তাহা হইলে) গুণভূতের অর্থাৎ সেই অপ্রধান শব্দ ও অর্থের অনুজ্ঞা ও প্রতিষেধ হয় (স্বেচ্ছানুসারে প্রতিষেধ হয় না)। যে স্থলে কিন্তু বক্তা অপ্রধান শব্দ প্রয়োগ করেন, অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী (ঐ শব্দকে) প্রধানভূত মনে করিয়া নিষেধ করেন, এই নিষেধ নিজ বুদ্ধির দ্বারা হয়, (উহার দ্বারা) পরের অর্থাৎ বাদীর উপালম্ভ (বাক্য-ব্যাঘাত বা নিগ্রহ) হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার উপচার-ছলের সমাধান বলিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, শব্দের মুখ্য প্রয়োগ এবং গৌণ প্রয়োগ লোক-সিদ্ধ। বক্তা যদি মুখ্য শব্দেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই মুখ্য শব্দ এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিষেধের কারণ থাকিলে নিষেধ করা যায় অর্থাৎ তাহাতে কোন দোষ থাকিলে সেই দোষ প্রদর্শন করা যায়, আর তাহা নিষেধ করিবার কোন কারণ না থাকিলে সেই মুখ্য শব্দ এবং তাহার অর্থের অনুজ্ঞাই করিতে হয়। নিজের ইচ্ছানুসারে শব্দ ও অর্থের অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ করা যায় না। আর যদি বক্তা কোন ভাক্ত শব্দের অর্থাৎ অপ্রধান শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে সেই শব্দ ও তাহার প্রতিপাদ্য লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিষেধ বা অনুজ্ঞা করিতে হয়। বক্তা কোন স্থলে গৌণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া কোন গৌণ অর্থ প্রকাশ করিলেন, সেখানে বক্তার ঐ শব্দটিকে মুখ্য শব্দ বলিয়া কল্পনা করিয়া এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ ধরিয়া নিষেধ করিলে তাহা নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিজের ইচ্ছানুসারে নিষেধ হয়, ঐ নিষেধে বাদীর বাক্যের বস্তুতঃ ব্যাঘাত হইতে পারে না, উহাতে বাদীর কথিত পদার্থের কোন নিষেধ হয় না। বাদী যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাহাই গ্রহণ করিয়া যদি তাহার নিষেধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই বাদীর উপালম্ভ বা পক্ষদূষণ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী মঞ্চস্থ ব্যক্তি বুঝাইতে মঞ্চ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন ; উহা উপচার এবং উহা লোক-সিদ্ধ। প্রতিবাদীও ঐরূপ প্রয়োগের লোক-সিদ্ধতা স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং ঐরূপ লোক-সিদ্ধ গৌণ প্রয়োগ করাতে বাদীর কোন অপরাধ নাই। প্রতিবাদী, বাদীর প্রযুক্ত ঐ গৌণ শব্দকে প্রধান শব্দ ধরিয়া অর্থাৎ মঞ্চ শব্দটি যে অর্থের বাচক, যে অর্থ বুঝাইতে উহা প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দ, সেই অর্থ ধরিয়া বাদীর অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করিয়া নিষেধ করিলেন—মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ ব্যক্তিরাই রোদন করিতেছে। মঞ্চগুলি অচেতন পদার্থ, তাহাদিগের রোদন অসম্ভব, ইহা বাদী জানেন, বাদী সেই মঞ্চের রোদন বলেনও নাই। প্রতিবাদী বাদীর অভিপ্রায় বুঝিয়াও ঐরূপ গৌণ অর্থ ধরিয়া নিষেধ করিলে উহা প্রতিবাদীরই অপরাধ। আর বাদীর বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ নিষেধ করিলেও গৌণ প্রয়োগ বিষয়ে নিজের অনভিজ্ঞতা তাঁহারই দোষ। পরন্তু বাদীর বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিলে প্রতিবাদীর তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝা উচিত, তাহা না করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে বাদীর প্রযুক্ত গৌণ শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ প্রদর্শন কখনই উচিত নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি গৌণ প্রয়োগ বলিয়াই উপপত্তি

করা যায়, তাহা হইলে আর কাহারও কোন বাক্যে দোষ থাকিতেই পারে না, সর্ব্বত্রই শব্দের একটা গৌণ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া উপপত্তি করা যায়। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রধান-ভূত শব্দ এবং ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ আছে অর্থাৎ লোক-সিদ্ধ গৌণ প্রয়োগই করিতে হইবে, নিষ্প্রয়োজনে নূতন কোনরূপ গৌণ প্রয়োগ করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত স্থলে মঞ্চ শব্দের মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে গৌণ প্রয়োগ অর্থাৎ মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ লোক-সিদ্ধই আছে, ঐরূপ প্রয়োগ বাদী নূতন করেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও ভাষ্য-কারের এখানে ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ আছে, এইমাত্রই বক্তব্য, উহা বলিলেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাস হয়, তাহা হইলেও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই প্রধান শব্দের কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দের প্রয়োগ যেমন লোক-সিদ্ধ, তদ্রূপ ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগও লোক-সিদ্ধ। লোক-সিদ্ধ প্রয়োগে বাদীর কোন অপরাধ হইতে পারে না। স্বেচ্ছানু-সারে নূতন করিয়া লাক্ষণিক প্রয়োগ করিলে দোষ বলা যাইতে পারে।

যে অর্থটি যে শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ, সেই অর্থে সেই শব্দকে প্রধান শব্দ ও মুখ্য শব্দ বলে। যে শব্দের মুখ্যার্থের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত অপর একটি অর্থ ঐ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ঐ অর্থে ঐ শব্দকে ভাক্ত শব্দ বলে। ভাক্ত শব্দ গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান। যেমন মঞ্চ শব্দটি মঞ্চ অর্থে মুখ্য শব্দ, মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে ভাক্ত শব্দ। প্রাচীনগণ লক্ষণাকে ভক্তি বলিতেন। ঐ ভক্তি শব্দ হইতেই ভাক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন,[১] তাহাতে বুঝা যায়, ভক্তি বলিতে সাদৃশ্যবিশেষ। "উভয়েন ভজ্যতে" অর্থাৎ উভয় পদার্থ যাহাকে ভজনা বা আশ্রয় করে, এই অর্থে ভক্তি শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য বুঝা যায়। এক পদার্থে সাদৃশ্য থাকে না, সাদৃশ্য উভয়াশ্রিত। তাহা হইলে সাদৃশ্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণা অর্থাৎ যাহাকে গৌণী লক্ষণা বলা হইয়াছে, তাহাই ভক্তি শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয় এবং ঐরূপ লক্ষণাস্থলেই সেই শব্দকে ভাক্ত বলিতে পারা যায়। ভাষ্যকার কিন্তু মঞ্চস্থ পুরুষে লাক্ষণিক মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়াও এখানে ঐ শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং সামান্যতঃ লাক্ষণিক শব্দমাত্রই ভাক্ত, ইহা তাঁহার কথায় বুঝা যায়। "ভাক্তস্য গুণভূতস্য" এই স্থলে গুণভূত শব্দের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ স্থলে গুণভূত বলিতে অপ্রধান অর্থাৎ লাক্ষণিক। ভাষ্যে "ছন্দতঃ" এই স্থলে ছন্দ শব্দের অর্থ ইচ্ছা বা স্বেচ্ছা। অভিধানে ছন্দ শব্দের অভিপ্রায় অর্থ পাওয়া যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার "ছন্দতঃ" ইহার ব্যাখ্যা বলিয়াছেন ছদ্মনা।" ছদ্মন্ শব্দের অর্থ কপট। কোন পুস্তকে ঐ স্থলে "ছলতঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায় ॥১৫॥

১। ভক্তির্নাম অতথাভূতস্য তথাভাবিভিঃ সামান্যং, উভয়েন ভজ্যতে ইতি ভক্তিঃ, যথা বাহীকস্য মন্দামন্দঃ সংজ্ঞামুপাদায় বাহীকো গৌরিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক, ২।১।৩৬ সূত্র।

সূত্র। বাক্‌চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবি-শেষাৎ ॥১৫॥৫৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) উপচারছল— বাক্‌ছলই ; কারণ, তাহা হইতে বিশেষ নাই। অর্থাৎ বাক্‌ছলে যেমন অর্থান্তরকল্পনা, উপচারছলেও তদ্রূপ অর্থান্তর-কল্পনা, সুতরাং উপচারছল ও বাক্‌ছলে কোন ভেদ না থাকায় ছল দ্বিবিধ, ত্রিবিধ নহে।

ভাষ্য। ন বাক্‌চ্ছলাদুপচারচ্ছলং ভিদ্যতে, তস্যাপ্যর্থান্তরকল্পনায়া অবিশেষাৎ। ইহাপি স্থান্যর্থো গুণশব্দঃ প্রধানশব্দঃ স্থানার্থ ইতি কল্পয়িত্বা প্রতিষিধ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) বাক্‌ছল হইতে উপচারছল ভিন্ন নহে। কারণ, সেই উপচারছলের সম্বন্ধেও অর্থান্তর কল্পনার বিশেষ নাই। বিশদার্থ এই যে, এই উপচারছলেও স্থানীর বোধক অপ্রধান শব্দ (অর্থাৎ মঞ্চস্থ ব্যক্তির বোধক মঞ্চশব্দটি) স্থানার্থ অর্থাৎ মঞ্চরূপ স্থানের বাচক প্রধান শব্দ, ইহা কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ করা হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি ষোড়শ প্রকার পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণ বলিয়া উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা, এই তিন প্রকারেই মহর্ষি শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছেন। পরীক্ষা-প্রকরণে সকল পদার্থেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। যে পদার্থে সংশয় হইবে, সেই পদার্থে মহর্ষির প্রদর্শিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই কথা দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়া গিয়াছেন। ছল পদার্থের ত্রিবিধত্ব বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া মহর্ষি এখানেই ছলের পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষা-প্রকরণে ছলের পরীক্ষা করিলে প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ছলের পূর্ব্বকথিত অনেক পদার্থ উল্লঙ্ঘন করিয়া সে পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে ঐ পরীক্ষা-প্রকরণের পূর্ব্বকথার সহিত সংগতি থাকে না। পরন্তু পরীক্ষা-প্রকরণও নিকটবর্ত্তী। মহর্ষির শিষ্যগণও পরীক্ষা-চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাই মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণেও ছলের লক্ষণের পরে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ সংশয়, পরে পূর্ব্বপক্ষ, তাহার পরে সিদ্ধান্ত, এই ভাবেই পদার্থের পরীক্ষা হয়। মহর্ষি-কথিত উপচারছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন কি না ? এইরূপ সংশয়ে মহর্ষি তাহার পরীক্ষার জন্য প্রথমেই পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, উপচারছল বাক্‌ছল হইতে অভিন্ন। কারণ, উপচারছলও শব্দের অর্থান্তর কল্পনামূলক, বাক্‌ছলও শব্দের অর্থান্তর কল্পনামূলক। সুতরাং উভয় স্থলেই যখন শব্দের অর্থান্তর কল্পনার কোন বিশেষ নাই, তখন উপচারছল বাক্‌ছলের মধ্যেই গণ্য। ফলকথা, ছল

ত্রিবিধ নহে, বাক্‌ছল এবং সামান্যছল, এই দুই নামে ছল দ্বিবিধ। ভাষ্যকার তাঁহার প্রদর্শিত উপচারছলের উদাহরণে বাক্‌ছলের ন্যায় অর্থান্তর কল্পনা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত উপচারছলেও স্থানীর বোধক অপ্রধান শব্দকে স্থানার্থপ্রধান শব্দ বলিয়াই কল্পনা করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, মঞ্চ শব্দের মুখ্যার্থ মঞ্চ নামক স্থান। ঐ অর্থে মঞ্চ শব্দটি প্রধান শব্দ। ঐ মঞ্চস্থিত পুরুষগণ স্থানী; কারণ, তাহারা মঞ্চে অবস্থান করিতেছে। মঞ্চ তাহাদিগের স্থান, সুতরাং তাহারা স্থানী। মঞ্চ শব্দ যখন ঐ স্থানী অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষকে বুঝাইবে, তখন মঞ্চ শব্দটি ঐ স্থানী অর্থে অপ্রধান শব্দ বা ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ। বাদী মঞ্চ শব্দটিকে ঐ স্থলে মঞ্চস্থিত পুরুষরূপ স্থানী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; প্রতিবাদী মঞ্চ শব্দের স্থানরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং বাক্‌ছলের ন্যায় এই উপচারছলেও শব্দের অর্থান্তর কল্পনা রহিয়াছে। তাহা হইলে উপচারছল বাক্‌ছলবিশেষই। উহা বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন কোন প্রকার ছল নহে ॥ ১৫ ॥

সূত্র। ন তদর্থান্তরভাবাৎ ॥ ১৬ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ উপচারছল বাক্‌ছলই নহে; কারণ, উপচারছলে যে অর্থসদ্‌ভাব প্রতিষেধ হয়, অর্থান্তর কল্পনা হইতে তাহার ভেদ আছে।

ভাষ্য। ন বাক্‌চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং, তস্যার্থসদ্‌ভাবপ্রতিষেধস্যার্থান্তরভাবাৎ। কুতঃ ? অর্থান্তরকল্পনাৎ। অন্যা হ্যর্থান্তরকল্পনা অন্যোঽর্থসদ্‌ভাবপ্রতিষেধ ইতি।

অনুবাদ। (উত্তর) উপচারছল বাক্‌ছলই নহে; কারণ, সেই অর্থসদ্‌ভাব প্রতিষেধের অর্থাৎ উপচারছলে যে অর্থসদ্‌ভাব প্রতিষেধ হয়, তাহার অর্থান্তর ভাব অর্থাৎ ভিন্নপদার্থতা বা ভিন্নত্ব আছে। (প্রশ্ন) কি হইতে ? অর্থাৎ কি হইতে অর্থসদ্‌ভাব-প্রতিষেধের ভেদ আছে ? (উত্তর) অর্থান্তরকল্পনা হইতে। বিশদার্থ এই যে, অর্থান্তরকল্পনা ভিন্ন পদার্থ, অর্থসদ্‌ভাবপ্রতিষেধ ভিন্ন পদার্থ। (ঐ দুইটি একই পদার্থ নহে; সুতরাং উপচারছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন)।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করা হইয়াছে, এই সূত্রের দ্বারা তাহার নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, উপচারছলে অর্থসদ্‌ভাব-প্রতিষেধ হয়, আর বাক্‌ছলে তাহা হয় না, কেবল অর্থান্তর কল্পনার দ্বারাই দোষ প্রদর্শন হয়। অর্থসদ্‌ভাব-প্রতিষেধ, আর অর্থান্তরকল্পনা এক পদার্থ নহে, ঐ দুইটি ভিন্ন পদার্থ; সুতরাং উপচারছল বাক্‌ছল হইতে ভিন্ন। উদ্যোতকরের মতে অর্থসদ্‌ভাবের নিষেধই সূত্রোক্ত অর্থসদ্‌ভাব-প্রতিষেধ। অর্থসদ্‌ভাব বলিতে বস্তুর সত্তা। তাহার নিষেধ বাক্‌ছলে হয়

না। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, মঞ্চগণ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা মঞ্চে রোদনরূপ বস্তুর অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মঞ্চে রোদন পদার্থের সত্তাই অস্বীকার করা হয়, কিন্তু বাক্‌ছলে এই বালকের নবসংখ্যক কম্বল নাই, এই কথার দ্বারা তাহার কম্বলের সত্তার নিষেধ করা হয় না। বাদী, এই বালক নবকম্বলবিশিষ্ট এই বাক্যের দ্বারা বালকবিশেষে যে নবত্ববিশিষ্ট কম্বলের বিধান করিয়াছেন, সেই বিধীয়মান কম্বল সেই বালকে আছে, ইহা স্বীকার করিয়া অর্থাৎ তাহার প্রতিষেধ না করিয়া তাহার বিশেষণ যে নবত্ব, তাহারই নিষেধ করা হয়। কিন্তু উপচারছলে (পূর্ব্বোক্ত স্থলে) মঞ্চে বিধীয়মান রোদন পদার্থেরই প্রতিষেধ করা হয়, সুতরাং বাক্‌ছল ও উপচারছলে বিশেষ ভেদ আছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও উপচারছল ও বাক্‌ছলের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভেদ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারেরও ইহাই মূল তাৎপর্য্য ॥ ১৬ ॥

সূত্র। অবিশেষে বা কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদেক-চ্ছল-প্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৫৮॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে—বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ যদি বাক্‌ছল ও উপচার-ছলের ঐ বিশেষ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত এক ছলের আপত্তি হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে ছল একই হইয়া পড়ে, ছল দ্বিবিধও হইতে পারে না।

ভাষ্য। ছলস্য দ্বিত্বমভ্যনুজ্ঞায় ত্রিত্বং প্রতিষিধ্যতে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যাৎ, যথা চায়ং হেতুস্ত্রিত্বং প্রতিষেধতি তথা দ্বিত্বমপ্যভ্যনুজ্ঞাতং প্রতিষেধতি, বিদ্যতে হি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যং দ্বয়োরপীতি। অথ দ্বিত্বং কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যান্ন নিবর্ত্ততে ত্রিত্বমপি ন নিবর্ৎস্যতি।

অনুবাদ। ছলের দ্বিত্ব স্বীকার করিয়া কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য বশতঃ ত্রিত্বকে নিষেধ করা হইতেছে অর্থাৎ বাক্‌ছল ও উপচারছলে কিছু সাধর্ম্ম্য থাকায় ঐ দুইটিকে এক বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী ছলকে দ্বিবিধ বলিতেছেন, ছলের ত্রিত্ব বা ত্রিবিধত্ব খণ্ডন করিতেছেন। (তাহা হইলে) যেমন এই হেতু অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যরূপ হেতু (ছলের) ত্রিত্বকে নিষেধ করিতেছে, তদ্রূপ স্বীকৃত দ্বিত্বকেও নিষেধ করিতেছে। যেহেতু কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্য দুই ছলেও আছে অর্থাৎ বাক্‌ছল ও সামান্যছল নামে যে দ্বিবিধ ছল স্বীকার করা হইতেছে, তাহাতেও কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য থাকায় ছল দ্বিবিধও হইতে পারে না। আর যদি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য বশতঃ দ্বিত্ব নিবৃত্ত না হয়, (তাহা হইলে) ত্রিত্বও নিবৃত্ত হইবে না।

টিপ্পনী। আপত্তি হইতে পারে যে, বাক্‌ছলে এবং উপচারছলে কোন অংশে বিশেষ

থাকিলেও অর্থান্তরকল্পনা ঐ উভয় ছলেই আছে, সুতরাং অর্থান্তরকল্পনারূপ সাধর্ম্ম্যবশতঃ উপচারছলকে বাক্‌ছলই বলিব, উহার মধ্যে আর কোন বিশেষ গ্রহণ করিব না। এতদুত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যদি অর্থান্তরকল্পনারূপ কোন একটি সাধর্ম্ম্য লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ছলকেও এক বল, তাহা হইলে ছল দ্বিবিধও বলিতে পার না। তাহা হইলে ছল পদার্থ একই হইয়া পড়ে, ছলের আর কোন প্রকার-ভেদ থাকে না। কারণ, যে কোনরূপে অর্থান্তরকল্পনা ছল মাত্রেই আছে। অর্থান্তরকল্পনা ব্যতীত কোনরূপ ছলই হয় না। সামান্য ছলেও পূর্ব্বোক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্ব-ধর্ম্মে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্বরূপ অর্থান্তর (অর্থাৎ সেখানে যাহা বক্তার বিবক্ষিত নহে, এমন অর্থ) কল্পনার দ্বারা দোষ প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং অর্থান্তরকল্পনারূপ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য ছল মাত্রেই থাকায় ছল একই হইয়া পড়ে, ছলের দ্বিবিধত্বও থাকে না।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যরূপ যে হেতুকে গ্রহণ করিয়া ছলের ত্রিবিধত্ব নিষেধ করিতেছেন, সেই কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যরূপ হেতুই তাঁহার স্বীকৃত ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক হইতেছে। ফলতঃ পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত হেতুর দ্বারা যখন তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত হইতেছে, তখন উহা ঐ স্থলে হেতু হইতে পারে না। যদি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যরূপ হেতু তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ছলের দ্বিবিধত্বের বাধক না হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু ছলের ত্রিবিধত্বেরও বাধক হইতে পারে না। মূলকথা, যে যুক্তিতে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য ছলের ত্রিবিধত্বের বাধক বলা হইতেছে, সেই যুক্তিতেই উহাকে ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাধক বলা যাইবে। অন্ততঃ ছলত্ব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য ছলমাত্রেই আছে। সুতরাং ছলকে একই বলিতে হইবে, ছলকে দ্বিবিধও বলা যাইবে না। পরিশেষে তাহাই স্বীকার করিলে অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যবশতঃ ছলকে একই বলিলে কোন পদার্থেরই প্রকার-ভেদ বলিতে পারিবে না। কারণ, বস্তু মাত্রেরই বস্তুত্ব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য আছেই, অতএব বস্তু মাত্রেরই প্রকার-ভেদের উচ্ছেদ হইয়া যায়। সুতরাং পদার্থের যে অংশে যে ভেদ আছে, ঐ ভেদ বা বিশেষকে গ্রহণ করিয়াই পদার্থের প্রকার-ভেদ বলিতে হইবে। তাহা হইলে বাক্‌ছল ও উপচারছলের যে অংশে ভেদ আছে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া ছলকে ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে। মহর্ষি গোতম তাহাই বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। ছললক্ষণাদূর্দ্ধম্।

অনুবাদ। ছলের লক্ষণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন)।

সূত্র। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ॥১৮॥৫৯॥

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র কোন সাধর্ম্ম্যবিশেষ অথবা বৈধর্ম্ম্য-বিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ—জাতি।

ভাষ্য। প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে স জাতিঃ। স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপালম্ভঃ প্রতিষেধ ইতি। উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যস্যোদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানম্। উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যস্যোদাহরণ-সাধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং, প্রত্যনীকভাবাৎ। জায়মানোঽর্থো জাতিরিতি।

অনুবাদ। হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ কোন বাদী কোন সাধ্য সাধনের জন্য কোন হেতু অথবা হেত্বাভাস প্রয়োগ করিলে যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা জাতি। সেই প্রসঙ্গ কিন্তু সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান কি না উপালম্ভ, প্রতিষেধ। উদাহরণের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য হেতু স্থলে উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। উদাহরণের বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য হেতু স্থলে—উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানকে জাতি বলে; কারণ, প্রত্যনীকভাব অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানে প্রতিকূল ভাব বা বিরুদ্ধতা আছে। জায়মান পদার্থ জাতি, অর্থাৎ বাদী হেতু অথবা হেত্বাভাসের প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রত্যবস্থান জন্মে, এই জন্য উহার নাম জাতি। যাহা জন্মে, তাহাকে জাতি বলা যায়।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে ছল পদার্থের পরেই জাতি নামক পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং লক্ষণ-প্রকরণে ছলের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত জাতির লক্ষণ বক্তব্য। মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা করা হইলেও ছলের লক্ষণের পরে অন্য কোন পদার্থের লক্ষণ বলা হয় নাই। যথাক্রমে মহর্ষি ছলের লক্ষণের পরে জাতিরই লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সেই কথা বলিয়াই জাতি-লক্ষণ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রতিকূল ভাবে অবস্থানকে প্রত্যবস্থান বলে। বাদী কোন সাধ্য সাধনের জন্য হেতু অথবা হেত্বাভাস প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ বাদী তাঁহার স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন একটি দোষ প্রদর্শন বা আপত্তি করিয়া প্রত্যুত্তর করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিকূল ভাবে দাঁড়াইলেন; তাই প্রত্যবস্থানকে ভাষ্যকার উপালম্ভ বলিয়াছেন, শেষে প্রতিষেধ বলিয়া আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার নাম উপালম্ভ এবং প্রতিষেধ, সূত্রে তাহাকেই প্রত্যবস্থান বলা হইয়াছে। কেবল প্রত্যবস্থান মাত্রকেই জাতি বলা যায় না। তাহা বলিলে ছল নামক পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসদুত্তর এবং সদুত্তরগুলিও জাতির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; কারণ, সেগুলিও উপালম্ভ বা প্রতিষেধ, সুতরাং সেগুলিও প্রত্যবস্থান। এজন্য মহর্ষি বলিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং।" অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য মাত্র অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাই জাতি। সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত কোন প্রকার ছল হয় না। সদুত্তরগুলিও কেবল

সাধর্ম্ম্য অথবা কেবল বৈধর্ম্ম্যমাত্র ধরিয়া হয় না, তাহা হইলে সে উত্তর সদুত্তরই হয় না। পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ প্রত্যুত্তরকেই জাতি বলে, উহা অসদুত্তর। যেমন কোন বাদী বলিলেন—আত্মা নিষ্ক্রিয়, যেহেতু আত্মাতে বিভুত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব আছে, যাহা যাহা সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, তাহা নিষ্ক্রিয়, যেমন গগন। এখানে কোন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি নিষ্ক্রিয় গগনের সাধর্ম্ম্য বিভুত্ব থাকাতেই আত্মা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে সক্রিয় ঘটের সাধর্ম্ম্য সংযোগ আত্মাতে আছে বলিয়া আত্মা সক্রিয় হউক। আত্মা সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ আত্মার সহিত সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থের সংযোগ আছে, সুতরাং ঘট প্রভৃতি ক্রিয়াযুক্ত পদার্থের সহিতও আত্মার সংযোগ আছে, তাহা হইলে ক্রিয়াযুক্ত ঘটের সাধর্ম্ম্য যে সংযোগ, তাহা আত্মাতে থাকায় আত্মা ক্রিয়াযুক্ত হউক। প্রতিবাদী এই কথা বলিয়া বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, ঐ দোষ প্রকৃত দোষ নহে। কারণ, সংযোগ থাকিলেই যে সে পদার্থ সক্রিয় হইবে, এমন নিয়ম নাই। প্রতিবাদী কেবল সংযোগরূপ সাধর্ম্ম্যটি লইয়া ঐরূপ আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার গৃহীত সংযোগরূপ সাধর্ম্ম্যে সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তি নাই। প্রতিবাদী ঐ ব্যাপ্তির কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্ম্যমাত্র অবলম্বনে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রতিষেধ করায়, উহা জাতি হইবে। ঐরূপ জাতিকে সাধর্ম্ম্যসমা জাতি বলে। এবং যদি কোন বাদী বলেন যে, শব্দ অনিত্য—যেহেতু শব্দ জন্য এবং ভাব পদার্থ, যাহা যাহা অনিত্য নহে, তাহা জন্য ও ভাবপদার্থ নহে। এই স্থলে যদি কোন প্রতিবাদী বলেন যে, শব্দ যদি নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্ম্য জন্য-ভাবত্ব হেতুক অনিত্য হয়, তাহা হইলে অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য যে শ্রাব্যতা সেই শ্রাব্যতাহেতুক শব্দ নিত্য হউক। ঘট, শ্রবণেন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, সুতরাং শ্রাব্যতা ঘটে না থাকায় উহা ঘটের বৈধর্ম্ম্য। ঘট অনিত্য, ইহা উভয়বাদীরই সম্মত। সুতরাং প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য যে শ্রাব্যতা, তাহা শব্দে আছে বলিয়া শব্দে নিত্যত্বের আপত্তি করিলে অর্থাৎ ঐ আপত্তির দ্বারা বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, উহা কেবল বৈধর্ম্ম্য মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিষেধ হওয়ায় জাতি হইবে, এইরূপ জাতিকে বৈধর্ম্ম্যসমা জাতি বলে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে শ্রাব্যতা-রূপ বৈধর্ম্ম্যে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই, অর্থাৎ শ্রাব্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। প্রতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল বৈধর্ম্ম্য মাত্র অবলম্বনে ঐ স্থলে প্রতিষেধ করায় তাঁহার ঐ উত্তর জাতি হইয়াছে। এই জাতি নামক উত্তর অসদুত্তর। কারণ, যে প্রণালীতে প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত প্রকার উত্তর করিয়াছেন, সেই প্রণালীতেই তাঁহার ঐ উত্তর খণ্ডিত হয়। বাদী প্রতিবাদীর প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন যে, যদি কেবল একটা সাধর্ম্ম্য থাকিলেই ঐ সাধর্ম্ম্যের সহচর ধর্ম্মটি সেখানে সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রমেয়ত্বরূপ অপ্রমাণের সাধর্ম্ম্য থাকায় প্রতিবাদীর উত্তরেও অপ্রমাণত্ব সিদ্ধ হইবে। এইরূপ কোন বৈধর্ম্ম্য থাকাতে প্রতিবাদীর উত্তরেও অপ্রমাণত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ প্রতিবাদী যেমন কোন একটি সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্র অবলম্বন করিয়া বাদীর পক্ষ ব্যাহত করিবেন, সেইরূপ কোন একটি সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষকেও ঐ ভাবে যখন খণ্ডন করা যায়, তখন জাতি নামক উত্তর কখনই সদুত্তর হইতে পারে না।

এই জন্যই প্রাচীনগণ জাতিকে স্বব্যাঘাতক উত্তর বলিয়াছেন। কেহ কেহ স্বব্যাঘাতক উত্তরকেই জাতির স্বরূপ বলিয়াছেন[১]। এই জাতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। মহর্ষি গোতম পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে সেই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির বিশেষ নাম ও বিশেষ লক্ষণগুলি বলিয়াছেন। সেখানে এই জাতির পরীক্ষাও করিয়াছেন। তাহাতে এই জাতি অসদুত্তর কেন, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যথাস্থানে জাতি পদার্থ বিষয়ে সকল কথা সুব্যক্ত হইবে।

ভাষ্যে হেতু প্রযুক্ত হইলে এইরূপ কথা আছে, কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু অথবা হেত্বাভাস প্রয়োগ করিলে যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা জাতি। বস্তুতঃ হেত্বাভাস প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী জাতি নামক অসদুত্তর করিতে পারেন। ভাষ্যে প্রসঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার শেষে উহারই ব্যাখ্যায় সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান বলিয়াছেন। প্রসঙ্গ শব্দের দ্বারা প্রসক্তি বা আপত্তি বুঝা যায়। সর্ব্বত্রই জাতি নামক উত্তরে একটা আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। ভাষ্যকার সেই তাৎপর্য্যেও এখানে প্রসঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি-সূচক প্রতিষেধ-বাক্যই জাতি।

উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সূত্রে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য শব্দের দ্বারা যে কোন পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার যে শেষে উদাহরণ-সাধর্ম্ম্য এবং উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্য বলিয়াছেন উহা সূত্রকারের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য শব্দের ব্যাখ্যা নহে। ভাষ্যকার একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই ঐরূপ কথা শেষে বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন উদাহরণের সহিত সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য, তদ্রূপ যাহা উদাহরণ নহে, তাহার সহিতও সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য। ফলিতার্থ এই যে, যে কোন পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া প্রতিষেধ করিলেই জাতি হইবে। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ সূত্রার্থ না হইলে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতির লক্ষণ বলা হয় না। কারণ, সর্ব্ববিধ জাতিই উদাহরণের সাধর্ম্ম্য অথবা উদাহরণের বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু জাতিমাত্রই যে কোন পদার্থের সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত হইয়াই থাকে, সুতরাং তাহা বলা যাইতে পারে। মহর্ষি সর্ব্বপ্রকার জাতির সামান্য লক্ষণ বলিতে তাহাই বলিয়াছেন।

উদ্যোতকর এইরূপ বলিলেও ভাষ্যকারের কথার দ্বারা কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উদাহরণের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত হেতু প্রয়োগ করিলে উদাহরণের কোন একটি বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা এবং উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত হেতু প্রয়োগ করিলে উদাহরণের কোন একটি সাধর্ম্ম্যের দ্বারা যে প্রত্যবস্থান, তাহাই এখানে সূত্রকারের অভিমত। কারণ, ঐরূপ প্রতিষেধে বিরুদ্ধ ভাব আছে। ভাষ্যকার শেষে এইরূপ কথার দ্বারা সূত্রেরই তাৎপর্য্যার্থ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে জাতিমাত্রের লক্ষণ বলা হয় না, ইহা সত্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, সূত্রকার

১। প্রযুক্তে স্থাপনাহেতৌ দূষণাশক্তমুত্তরম্।
জাতিমাহুরথান্যে তু স্বব্যাঘাতকমুত্তরম্ ॥—তার্কিকরক্ষা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১ম কারিকা

এই সূত্রের দ্বারা জাতির সামান্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বলেন নাই ; যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জাতির সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে[১] । অর্থাৎ ছল প্রভৃতি ভিন্ন দূষণাসমর্থ উত্তর, অথবা স্বব্যাঘাতক উত্তর জাতি, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা জাতিমাত্রের সামান্য লক্ষণ বুঝা গিয়াছে। জন ধাতু হইতে জাতি শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং যাহা জন্মে, তাহাকে জাতি বলা যায়। ভাষ্যকার শেষে জায়মান পদার্থ জাতি, এই কথা বলিয়া এই জাতি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা জাতি শব্দের একটা ব্যুৎপত্তি মাত্র। জায়মান পদার্থমাত্রই জাতি নহে ; পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি। ঐ অর্থে মহর্ষির এই জাতি শব্দটি পারিভাষিক। পঞ্চম অধ্যায়ে এই জাতির সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিবৃত হইবে। সেখানেই এই জাতির সমস্ত তত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে ॥ ১৮ ॥

সূত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহ-স্থানম্ ॥ ১৯ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান এবং অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাবিশেষ নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে।

ভাষ্য। বিপরীতা বা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তির্ব্বিপ্রতিপত্তিঃ, বিপ্রতিপদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি, নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ। অপ্রতিপত্তিস্ত্বারম্ভবিষয়ে অনারম্ভঃ। পরেণ স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি, প্রতিষেধং বা নোদ্ধরতি। অসমাসাচ্চ নৈতে এব নিগ্রহস্থানে ইতি।

অনুবাদ। বিপরীত অথবা কুৎসিত জ্ঞান বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপদ্যমান ব্যক্তি অর্থাৎ যাহার ঐরূপ বিপ্রতিপত্তি আছে, সেই ব্যক্তি পরাজয় প্রাপ্ত হয়। নিগ্রহস্থানই পরাজয় লাভ। অপ্রতিপত্তি কিন্তু আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) পর কর্ত্তৃক স্থাপিত পক্ষকে প্রতিষেধ করে না অথবা (পরকৃত) প্রতিষেধকে উদ্ধার করে না। সমাস না করায় অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি, এই দুইটি শব্দের সমাস না করিয়া উল্লেখ করায় (বুঝিতে হইবে যে) এই দুইটিই অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে।

টিপ্পনী। জাতি-লক্ষণের পরে মহর্ষি এই সূত্রদ্বারা তাঁহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের

১। তেন চ সন্দর্ভেণ দূষণাসমর্থত্বং স্বব্যাঘাতকত্বং বা দর্শিতং। তথাচ ছলাদিভিন্নদূষণাসমর্থমুত্তরং স্বব্যাঘাতকমুত্তরং বা জাতিরিতি সূচিতং, সাধর্ম্ম্য-সমাদি-চতুর্ব্বিংশত্যাস্থান্তত্বং তদর্থ ইত্যপি বদন্তি—বিশ্বনাথ বৃত্তি।

লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। সূত্রে যে বিপ্রতিপত্তি শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্মবিষয়ক জ্ঞান বিপরীত জ্ঞান, স্থূলবিষয়ক জ্ঞান কুৎসিত জ্ঞান। অর্থাৎ যদিও কুৎসিত জ্ঞানও বিপরীত জ্ঞানই, বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ ভিন্ন তাহা কুৎসিত জ্ঞান হয় না, তাহা হইলেও সূক্ষ্ম বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে বিপরীত জ্ঞান বলিয়াছেন, আর স্থূল বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে কুৎসিত জ্ঞান বলিয়াছেন। এইরূপ বিষয়ভেদেই ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তিকে বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের ঐ কথার ইহাই তাৎপর্য্য মনে হয়। পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান হইবে কি প্রকারে? এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিযুক্ত ব্যক্তি পরাজয় লাভ করে অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিপ্রতিপত্তি জন্মে, তাহার পরাজয় হয়। পরাজয় হইলেই নিগ্রহ হইল, নিগ্রহস্থান ও পরাজয়লাভ, ফলে একই কথা। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলা যাইতে পারে। এবং আরম্ভ বিষয়ে আরম্ভ না করাই এখানে অপ্রতিপত্তি। বিপক্ষ ব্যক্তি স্বপক্ষ স্থাপনা করিলে তখন তাহার প্রতিষেধ বা খণ্ডন করিতে হইবে, অথবা প্রতিষেধ করিলে তাহার উদ্ধার করিতে হইবে, তাহা না করাই আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ, ইহা অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃই হয়, এ জন্য ইহাকে অপ্রতিপত্তি বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি বলিয়াই মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে যে প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণও বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক এবং কতকগুলি অপ্রতিপত্তিমূলক। এই জন্য এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি শব্দের দ্বারাই মহর্ষি নিগ্রহস্থানগুলির সামান্য লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলা যায় না, এই কথা বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি—ইহার কোন একটির অনুমাপক ধর্ম্ম আছে, তাহাই নিগ্রহস্থান[1], এই পর্য্যন্তই মহর্ষির তাৎপর্য্যার্থ। নিগ্রহস্থানের দ্বারা পরাজয় লাভ হয়, এ জন্য ভাষ্যকার এখানে নিগ্রহস্থানকেই পরাজয়লাভ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয় লাভের কারণ।

মহর্ষি এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি শব্দের সমাস করিয়া 'বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্তী' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই কেন? ঐরূপ বাক্য বলিলে তাঁহার শব্দ-লাঘবই হইত। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই দুইটিই নিগ্রহস্থান নহে, ইহা সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি সমাস করেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন আরও নিগ্রহস্থান আছে। মহর্ষি এই সূত্রে সমাস না করিয়া

১। যদ্যপ্যেতদন্যতরৎ পরনিষ্ঠং নোদ্ভাবয়িতুমর্হং প্রতিজ্ঞা-হান্যাদের্নিগ্রহস্থানত্বানুপপত্তিশ্চ তথাপি বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যন্যতরোন্নায়ক-ধর্ম্মবত্ত্বং তদর্থঃ ইত্যাদি।—বিশ্বনাথ-বৃত্তি।

গ্রন্থগৌরবের দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন নিগ্রহস্থানও এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে মহর্ষি গোতমোক্ত নিগ্রহস্থানের মধ্যে কতকগুলিকে অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়া অবশিষ্টগুলি বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান, এই কথা বলিয়াছেন। এখানে যদি বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি ভিন্ন কোন নিগ্রহস্থানও (তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে) সূত্রকারের কথিত বলিয়া ভাষ্যকারের অভিমত হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার ঐরূপ কথা কিরূপে বলিয়াছেন, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন।

মহর্ষি এই সূত্রে ঐ স্থলে সমাস না করিয়া বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে, ইহাই সূচনা করিয়াছেন অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি পদার্থই নিগ্রহস্থান নহে, তন্মূলক প্রতিজ্ঞা-হানি প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য বুঝিলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা হয়; পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যেরও সুসংগতি হয়। বস্তুতঃ মহর্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি নিগ্রহস্থান, বিপ্রতিপত্তি পদার্থ অথবা অপ্রতিপত্তি পদার্থ নহে। উহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি বুঝা যায় এবং উহার মধ্যে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক এবং কতকগুলি অপ্রতিপত্তিমূলক। বিপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকেই ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকে অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি পদার্থই নিগ্রহস্থান নহে, সুতরাং সূত্রকার ও ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলকথা, যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদী নিগৃহীত বা পরাজিত হইয়া থাকেন, তাহাই নিগ্রহস্থান। নিগ্রহস্থানের বিশেষ তত্ত্ব পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে পরিস্ফুট হইবে ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। কিং পুনর্দৃষ্টান্তবজ্জাতিনিগ্রহস্থানয়োরভেদোঽথ সিদ্ধান্তবদ্ভেদ ইত্যত আহ।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) জাতি ও নিগ্রহস্থানের কি দৃষ্টান্ত পদার্থের ন্যায় অভেদ? অথবা সিদ্ধান্ত পদার্থের ন্যায় ভেদ আছে? এই জন্য বলিয়াছেন—

সূত্র। তদ্বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থান-বহুত্বম্ ॥২০॥৬১॥

অনুবাদ। সেই সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ কল্প আছে বলিয়া এবং বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্প আছে বলিয়া জাতি এবং নিগ্রহস্থানের বহুত্ব আছে অর্থাৎ জাতিও বহুপ্রকার, নিগ্রহস্থানও বহুপ্রকার।

ভাষ্য। তস্য সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিবহুত্বং তয়োশ্চ বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোর্ব্বিকল্পান্নিগ্রহস্থানবহুত্বম্। নানাকল্পো

বিকল্পঃ, বিবিধো বা কল্পো বিকল্পঃ। তত্রাননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা-বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা-পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণমিত্যপ্রতিপত্তির্নিগ্রহস্থানং, শেষস্তু বিপ্রতিপত্তিরিতি।

ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থা উদ্দিষ্টা যথোদ্দেশং লক্ষিতা যথালক্ষণং পরীক্ষিষ্যন্ত ইতি, ত্রিবিধাঽস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তির্ব্বেদিতব্যেতি।

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

অনুবাদ। সেই সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্পবশতঃ জাতির বহুত্ব এবং সেই বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ নিগ্রহস্থানের বহুত্ব। নানা কল্প বিকল্প অথবা বিবিধ কল্প বিকল্প। তন্মধ্যে অর্থাৎ বহুবিধ নিগ্রহস্থানের মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, এইগুলি অর্থাৎ এই সকল নামে যে নিগ্রহস্থান, তাহা অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান। অবশিষ্ট কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহস্থান ভিন্ন আর যে সকল নিগ্রহস্থান আছে, সেগুলি বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান।

এই প্রমাণাদি পদার্থগুলি অর্থাৎ প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া উদ্দেশানুসারে লক্ষিত হইল, অর্থাৎ মহর্ষি গোতম তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের উদ্দেশ পূর্ব্বক যথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। লক্ষণানুসারে অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপানুসারে পদার্থগুলি পরীক্ষা করিবেন, এইরূপে এই শাস্ত্রের (ন্যায় দর্শনের) তিন প্রকার (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা) প্রবৃত্তি (উপদেশ-ব্যাপার) জানিবে।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম তাঁহার কথিত প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলিয়া এই লক্ষণ-প্রকরণেই শেষে আবার এই সূত্র বলিয়াছেন কেন? আর এখানে অন্য সূত্রের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির এই সূত্রটির প্রয়োজন ব্যাখ্যার জন্য একটি প্রশ্ন করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষির শিষ্যগণের এইরূপ প্রশ্ন হওয়াতেই মহর্ষি এই সূত্রটি শেষে বলিয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন এই যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান নামে যে দুইটি পদার্থের লক্ষণ বলা হইল, ঐ দুইটি পদার্থ কি

দৃষ্টান্ত পদার্থের ন্যায় অভিন্ন ? অর্থাৎ জাতিরও আর ভেদ নাই, নিগ্রহস্থানেরও আর ভেদ নাই ? অথবা সিদ্ধান্ত পদার্থের ন্যায় জাতিরও ভেদ আছে, নিগ্রহস্থানেরও ভেদ আছে ? মহর্ষি এই প্রশ্নের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জাতিও বহুবিধ, নিগ্রহস্থানও বহুবিধ। কারণ, সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা বহু প্রকারেই হইতে পারে, উহার বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ কল্প আছে এবং বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্প আছে, অর্থাৎ উহাও বহুবিধ।

সুতরাং জাতি ও নিগ্রহস্থান বহুবিধ। এখানে মহর্ষি তাঁহার শিষ্যগণের প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা জানিতে বলবদিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া শিষ্য-জিজ্ঞাসানুসারে পরীক্ষারম্ভ করাই কর্ত্তব্য মনে করায় জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষ নাম ও লক্ষণগুলি বলেন নাই। প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষার পরে পঞ্চমাধ্যায়ে উহাদিগের বিশেষ লক্ষণাদি বলিয়াছেন।

প্রশ্নবাক্যে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত পদার্থের ন্যায় অভেদ, এইরূপ কথা বলেন কিরূপে ? দৃষ্টান্ত পদার্থও সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-ভেদে দ্বিবিধ, সুতরাং দৃষ্টান্তের প্রকারভেদ থাকায় তাহার ন্যায় অভেদ, এরূপ কথা সঙ্গত হইতে পারে না।

এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থ বস্তুতঃ দ্বিবিধ হইলেও মহর্ষি তাহার লক্ষণ একটিই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সেই লক্ষণের অভেদকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ সেই অভিপ্রায়েই এখানে দৃষ্টান্তের ন্যায় অভেদ, এই কথা বলিয়াছেন। সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ এবং মহর্ষি তাহার প্রত্যেকের পৃথক্ লক্ষণ বলিয়াছেন, সুতরাং সিদ্ধান্ত পদার্থের ন্যায় ভেদ, এই কথা সর্ব্বথা সঙ্গত হইয়াছে।

সূত্রোক্ত বিকল্প শব্দের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার কল্পদ্বয়ে নানা কল্প এবং বিবিধ কল্প বলিয়াছেন। তাহাতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, পদার্থের স্বরূপ ধরিয়া নানা কল্প, এবং প্রকার ধরিয়া বিবিধ কল্প।

অননুভাষণ এবং অজ্ঞান প্রভৃতি নিগ্রহস্থানবিশেষের নাম। ভাষ্যোক্ত ঐ নিগ্রহস্থানগুলি অপ্রতিপত্তিমূলক বলিয়া উহাদিগকে অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলা হইয়াছে। ঐগুলি ভিন্ন মহর্ষি-কথিত নিগ্রহস্থানগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক বলিয়া তাহাদিগকে বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নিগ্রহস্থান মহর্ষি বলিয়াছেন, ইহা ভাষ্যকারের অভিমত হইলে, ভাষ্যকার এখানে ঐরূপ কথা বলিতে পারিতেন না।

জাতির লক্ষণ-সূত্র হইতে তিন সূত্রে একটি প্রকরণ। ন্যায়সূচীনিবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহা 'পুরুষাশক্তি-লিঙ্গদোষ-সামান্য-লক্ষণ-প্রকরণ' নামে কথিত আছে। জাতি ও নিগ্রহস্থানরূপ দোষ, বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষের অশক্তি কি না অক্ষমতার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। বাদী বা প্রতিবাদী সদুত্তর করিতে সক্ষম হইলে জাতি নামক অসদুত্তর করেন না। সুতরাং জাতি নামক অসদুত্তরের দ্বারা উত্তরবাদীর অক্ষমতা বুঝা যায়। নিগ্রহস্থানের দ্বারাও নিগৃহীত পুরুষের অক্ষমতা বুঝা যায়। সুতরাং জাতি ও নিগ্রহস্থানরূপ দোষ পুরুষের অক্ষমতার লিঙ্গ। তাদৃশ দোষের সামান্য লক্ষণ-প্রকরণকে পুরুষাশক্তি-লিঙ্গদোষ-সামান্য-লক্ষণ-প্রকরণ বলা যায়।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, বেদপ্রামাণ্য-বিশ্বাসী আস্তিক, নাস্তিকের সহিত বিচারে সহসা সদুত্তরের স্ফূর্ত্তি না হইলে জাতি নামক অসদুত্তর করিয়াও নাস্তিকের পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিবেন। নচেৎ প্রজার আশ্রয় রাজা নাস্তিকের জয়লাভ দেখিয়া নাস্তিকমত-পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে পারেন। তাহা হইলে রাজা বা ঐরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের চরিতানুবর্ত্তী প্রজাগণের ধর্ম্মবিপ্লব অনিবার্য্য; সুতরাং জল্প-বিচারে নাস্তিককে পরাজিত করিতে জাতি-প্রয়োগও অবশ্য-কর্ত্তব্য। কোন স্থলে হেতু অথবা হেত্বাভাস প্রযুক্ত হইলে না বুঝিয়াই অর্থাৎ অসদুত্তর করিতেছি, ইহা না বুঝিয়াই জাতি প্রয়োগ সম্ভব হয়, সুতরাং স্থলবিশেষে সদুত্তর বোধেও জাতি নামক অসদুত্তর করা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মিশ্রের কথাগুলিতে ভাবিবার বিষয় আছে।

ন্যায়দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এই শাস্ত্রের অভিধেয়, প্রয়োজন এবং ঐ উভয়ের সম্বন্ধ প্রকটিত হওয়ায় ঐ দুইটি সূত্র একটি প্রকরণ। উহার নাম (১) অভিধেয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধ-প্রকরণ। তাহার পরে ৬ সূত্র (২) প্রমাণ-লক্ষণ-প্রকরণ। তাহার পরে ১৪ সূত্র (৩) প্রমেয়-লক্ষণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্র (৪) ন্যায়পূর্ব্বাঙ্গ-লক্ষণ-প্রকরণ। সংশয়-প্রয়োজন এবং দৃষ্টান্ত, এই তিনটি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ। তাহার পরে ৬ সূত্র (৫) ন্যায়াশ্রয়-সিদ্ধান্ত-লক্ষণ-প্রকরণ। তাহার পরে পঞ্চাবয়বের বিভাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়া পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়ের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। এ জন্য সেই ৮ সূত্র (৬) ন্যায়-প্রকরণ। তাহার পর ২ সূত্র (৭) ন্যায়োত্তরাঙ্গ-লক্ষণ-প্রকরণ। তর্ক ও নির্ণয় ন্যায়ের উত্তরাঙ্গ। এই ৭টি প্রকরণে ৪১টি সূত্রে ন্যায়দর্শনের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে। পরে দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম হইতে ৩ সূত্র (১) কথা-লক্ষণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৬ সূত্র (২) হেত্বাভাস-লক্ষণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ সূত্র (৩) ছল-লক্ষণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্র (৪) পুরুষাশক্তিলিঙ্গদোষ-সামান্য-লক্ষণ-প্রকরণ। এই চারিটি প্রকরণে ২০টি সূত্রে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে। দুই আহ্নিকে এক অধ্যায়। সুতরাং এখানেই ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হওয়ায় বাৎস্যায়নের ভাষ্যেরও প্রথম অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহা জানাইবার জন্যই এখানে তাঁহার ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই তিন প্রকার এই শাস্ত্রের ব্যাপার। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পরীক্ষা হইবে।

প্রথম হইতে ৬১ সূত্রে ১১ প্রকরণে দুই আহ্নিকে ন্যায়দর্শনের

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	কিরূপ	কিরূপে
৯	মমাংসা	মীমাংসা
২১	নির্দ্দে	নির্দ্দেশ
	ব্যা বাক্যের	ব্যাসবাক্যের
২৮	দৃষ্টহেতু	দুষ্টহেতু
	হইতেছে।	হইতেছে,
৩৭	"আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা"	আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা
৪০	পুরন্ত্রীগণের	পুরন্ধ্রীগণের
৫০	অব্যভিচারী	ব্যভিচারী
৫৭	সৎ	সৎসু
	পদর্থ	পদার্থ
৫৮	বষ্টি	ব্যষ্টি
৬১	নিস্র্ত্বতীতি	নিবর্ৎস্যতীতি
	প্রমাণনি	প্রমাণানি
৬২	প্রবর্ত্তমন	প্রবর্ত্তমান
৭১	পাওয়ায়	পাওয়া যায়।
১৩০	মুহষি	মহর্ষি
১৩৩	প্রমাণসমুচ্চয়ম্	প্রমাণসমুচ্চয়
১৩৮	জৈন্য	জৈন
১৪৪	নির্ভক্তস্য, শব্দস্য	নির্ভক্তস্য শব্দস্য,
১৪৬	সং পদার্থ	সৎ পদার্থ
১৫৫	অনুমান প্রমাণ	উপমান প্রমাণ
১৬৩	সমস্ত সুখসাধনের	সমস্ত সুখ দুঃখ সাধনের
২১৫	অ গ্রহণ	অর্থ গ্রহণ
২৩৪	ভেদ থাকিলে	ভেদ না থাকিলে
২৪৮	উৎপত্তিধর্ম্মধর্ম্মকত্বাৎ	উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ
২৬৭	ব্যাপ্ত্যুপদর্শকো	ব্যাপ্ত্যুপদর্শকো
২৭৭	বৈধর্ম্মোদাহরণ	বৈধর্ম্মোদাহরণ
২৯৫	নাবপচ্ছ	নাবগচ্ছ

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৮	প্রমাণবিষয়ে	প্রমাণবিষয়
৩১৫	হওয়ায়ও	হওয়ায়
৩২৪	বিশেষতা	বিশেষ্যতা
৩২৬	নির্ব্বত্ত	নির্ব্বৃত্ত
৩২৭।৩৩৭	৪২ সূ০	১ সূ০
৩৩৩	তহা	তাহা
৩৩৭	উপালস্ত	উপালম্ভ
৩৩৯।৩৪৩	৪৩ সূ০	২ সূ০
	বেষাং	বৈষাং
৩৪০	বিশেষণলক্ষণ	বিশেষ লক্ষণ
৩৫২	উপলব্ধি হয়	উপলব্ধ হয়
৩৬২	ব্যাখায়	ব্যাখ্যায়
৩৬৪	ইহ	ইহা
৩৭৪	অনিতও	অনিত্যও
৩৭৬	বিশেষেম	বিশেষের
৩৮৮	অতিক্রম বরায়	অতিক্রম করায়
৪০৩	সত্যে অপলাপ	সত্যের অপলাপ
৪০৬	সম্ভূতার্থ	সম্ভূতার্থ
	নির্বৃত্তি ন	নির্বৃত্তির্ন